প্রতীচ্য ভাবনা ও বঙ্গীয় নারী জাগরণ

অরুণা প্রকাশন
২, কালিদাস সিংহ লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ২৭ এপ্রিল, ২০০০

প্রকাশক

শ্যামল ভট্টাচার্য
২ কালিদাস সিংহ লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

হরফ সজ্জা ও প্রচ্ছদ ঃ
অরুণা প্রিন্টার্স
২ কালিদাস সিংহ লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক ঃ
অরুণা প্রিন্টার্স
২ কালিদাস সিংহ লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

আমার বাবা
ঁকিরণময় ঘটকের
স্মৃতির উদ্দেশে

মুখবন্ধ

নারী, পুরুষের মতোই, সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ, ইতিহাসের চিরায়ত সত্তা। অথচ নারী সমাজবদ্ধ ইতিহাসের সবচেয়ে অবহেলিত বিষয়। নারীর অবরুদ্ধ ক্রন্দন কোনদিন সমাজের উৎসমুখে নিজে প্রকাশ ঘটাতে পারেনি। বাংলাদেশে এই প্রকাশ শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের সময় থেকে। পুরুষের সহমর্মিতার সূত্র ধরে নারী জাগরণের সূচনা এবং শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই বাংলাদেশে পুরুষের সাথে নারীর কথা বলতে শুরু করেছে নারী নিজেই। পুরুষের কৃতকাজ, তাঁর লেখা ও তাঁর যাবতীয় কর্মসূচীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে নারীর নিজস্ব চিন্তাভাবনার প্রারম্ভিক সূচনা হয়েছে। এইভাবে নারী ও পুরুষের বলার কথা এবং কৃতকাজ থেকে যে ছবি পাওয়া যায় তাকে সামনে রেখে উনিশ শতকে নারীমুক্তির ঐতিহাসিক দৃশ্যপটকে বোঝা সহজ হয়ে ওঠে। এইরকম চেষ্টা বিগত কয়েক দশক ধরে বিশেষভাবে দক্ষ গবেষকরা করে আসছেন। এই রকম অসংখ্য গবেষকের আহৃত তথ্য এবং জ্ঞানভাণ্ডার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মননভূমিতেই বর্তমান গবেষণার প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি রচিত হয়েছিল। এই অর্থে বর্তমান সন্দর্ভটি বাংলাদেশের শতাব্দীসঞ্চিত চিন্তাধারার ক্রমপ্রসারমানতার অংশীদার এবং একই সঙ্গে নিজস্ব তথ্য উৎখনন ও স্বকীয় ভাবনায় সার্বভৌম।

কোন গবেষকের লেখা ইতিহাসের শেষ কথা বলে না। এই সন্দর্ভে কোন বক্তব্যই একান্তভাবে কোন কর্তৃত্বধর্মী বক্তব্য নয়। একজন সাধারণ গবেষিকা অত্যন্ত সযত্নে নানা প্রামাণ্য রচনা ও মৌলিক আকর গ্রন্থ থেকে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেছে তাদের একটি পরিশীলিত চিন্তার নীড়ে আনা হয়েছে। এই অর্থে বর্তমান সন্দর্ভ নানা ভাবনার নীড়বন্ধন মাত্র। ভাবনা আর তথ্য এক নয়। তথ্য বয়ে আনে বার্তা। বার্তা থেকে জন্ম নেয় ভাবনা আর ভাবনা সুগ্রথিত হয়ে জ্ঞানের উদ্ভাবন ঘটায়। এইভাবে তথ্য, বার্তা, জ্ঞানের একটি ত্রিমাত্রিক অন্বয়কে যে আধারের মধ্যে ধরা হয় সে আধারের একটি ক্ষুদ্ররূপ হল বর্তমান সন্দর্ভ। শ্রমের সঙ্গে উৎখনিত তথ্য, পরিশীলিত ভাবনার দ্বারা সামঞ্জস্যবিধানের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে এই সন্দর্ভে পরিবেশিত হয়েছে। অতএব এখানে কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষী আত্মঘোষণা নেই। আছে শুধু তথ্যভিত্তিক ইতিহাসচর্চার কৃতাঞ্জলিবদ্ধ নম্র অনুসরণ।

এই সন্দর্ভ সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত।

প্রথম পরিচ্ছেদের বিষয় হল পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে কিভাবে বঙ্গসমাজ পরিচিত হয়েছিল, এবং নারীকুলের উন্নতির ইচ্ছা ও পদ্ধতির প্রয়াসের সূচনা হয়েছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে নারীদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার কিভাবে হয়েছিল এবং নারীরা পাশ্চাত্য শিক্ষাকে কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রতি মহিলাদের প্রতিক্রিয়া ও দাম্পত্য জীবনে নারীর নতুন ভূমিকার একটি রূপরেখা দেওয়া হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদের বিষয় হল পুরুষের সংস্কারমনস্কতার মধ্যে প্রগতি ও রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্ব এবং সংস্কার কর্মসূচীতে বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্দ্রের মানসিকতার প্রতিফলন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে যে বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে তা হল নারীর ঐতিহ্যিক জীবনযাপন প্রণালীর পরিপ্রেক্ষিতে নারীর মাতৃত্বের ধারণা, কর্তব্য এবং গার্হস্থ্য জীবনের পরিবর্তন এবং গার্হস্থ্যের বাইরে নারীর পদার্পণ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে যে নারীর মধ্যে প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল এই দুই ধারাই বহমান ছিল, ঠিক যেমন ছিল পুরুষের মধ্যে। কিন্তু এই দোলাচলেও নারী তাঁর চিন্তার মৌলিকত্ব বজায় রেখেছিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদের প্রতিপাদ্য হল সমাজ সংস্কারকদের মধ্যে রক্ষণশীলতার চিহ্ন সুস্পষ্ট হলেও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী এসেছিল, যা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সমন্বয়-সাধনের মধ্যেও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠছিল এবং নারীর উন্নয়ন ও স্বাধীনতা সেই ধারণার ভিত্তিতে করার প্রয়াস দেখা যাচ্ছিল।

সন্দর্ভের এই হল মূল বিষয়। এই বিষয়ে যাবতীয় অনুসন্ধানের মধ্যে প্রথাগত সন্ধিৎসাকে টিকিয়ে রেখে কিছু কিছু নতুন প্রশ্ন ও নতুন তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। সব প্রশ্নের মীমাংসা যেহেতু একটি ছোট গবেষণাভিত্তিক সন্দর্ভে প্রকাশ করা যায় না সেজন্য এই সন্দর্ভ তার অপ্রয়োজনীয় বাহুল্যকে বর্জন করে নিজের প্রসারকে একটি সীমার মধ্যে বেঁধে রাখার প্রয়াস পেয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো আলোচনাকে দীর্ঘায়িত করা যেত কিন্তু অপ্রয়োজনীয় বাগ্‌জাল অপটুত্বের নিদর্শন বলে সচেতনভাবে সেই প্রচেষ্টার নিবৃত্তি ঘটানো হয়েছে। এ বিষয়ে পাঠকের সহানুভূতি ও সমর্থন পাওয়া যাবে এই আকাঙ্ক্ষা করে বর্তমান সন্দর্ভকে সংযত করা হল। বর্তমান সন্দর্ভে যদি কোথাও কোন ত্রুটি ও বৈসাদৃশ্য থাকে তার জন্য বর্তমান লেখিকাই দায়ী অন্য কেউ নয়। যদি তা তাঁর দৃষ্টিগোচর করা হয় তবে যুক্তিনিষ্ঠ মন নিয়ে তার সংস্কার করা হবে। এ বিষয়ে আবেগ নয়, যুক্তিই হবে শেষ কথা।

ভূমিকা

বাংলাভাষায় মানবী বিদ্যার চর্চা একটি ইদানীং এর ঘটনা। পাশ্চাত্যে এ চর্চা শুরু হয়েছিল অনেক আগে — বলা যেতে পারে ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকেই। সেই সময়ে যখন মানুষের অধিকারের ইস্তাহার রচিত হচ্ছিল ঠিক তখনই মেরী ওলস্টোনক্র্যাফ্‌ট (Mary Wollstonecraft) সোচ্চারে ঘোষণা করেছিলেন যে, যে অধিকার পুরুষকে দেওয়া হচ্ছে সে অধিকার নারীকেও দিতে হবে।এমন দাবি ভারতীয় নারী সমাজ করতে শিখেছিল অনেক পরে — বিংশ শতাব্দীতে। নারী দাবি করতে পারে যখন তার মধ্যে শিক্ষা আসে। শিক্ষা আনে চেতনা — চেতনা দেয় মুক্তির আগ্রহ। এই আগ্রহে এক সময়ে স্পন্দিত হয়েছিল বাঙালি নারীর অন্তর্লোক, আধুনিকতার অভিমুখে পা বাড়িয়েছিল বঙ্গনারী। কীভাবে তাসম্ভব হল তা নিয়ে এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন ড: তপতী ভট্টাচার্য্য। কেন এই গ্রন্থটি লিখলেন ড: ভট্টাচার্য্য? অবশ্যই গ্রন্থটি একটি পি. এচ্‌ডি গবেষণার সন্দর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছে। এই গবেষণাটি গ্রন্থকর্ত্রী করেছিলেন আমার পরিচালনায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে। গবেষণা চলাকালীন সময়েই আমি লক্ষ্য করেছিলাম কি নিপুণ নিষ্ঠা ও কাতরতাবিহীন শ্রম অনুশীলনের মধ্য দিযে তিনি এ কাজ করছেন। এরকম অভিনিবেশের মগ্নতা না থাকলে কোন গবেষণা তার সৌষ্ঠব লাভ করেনা এ কথা বোঝার মত পরিণত মনস্কতা তাঁর ছিল বলেই শেষ পর্যন্ত সুচিন্তাব এমন সুচারু ফসল আমরা লাভ করলাম। তাই প্রথমেই এ গ্রন্থের লেখিকাকে সাধুবাদ জানাই।

এই গ্রন্থ লেখার পেছনে দুটি প্রেরণা কাজ করেছিল বলে আমার মনে হয়। প্রথমটি তাঁর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা। একটি কলেজে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করতে করতে তিনি অজস্র কিশোরী মেয়ের উন্মেষের মুহূর্তটির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন, তাদের হাসি-কান্নার অনেক অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়েছিলেন তিনি। বুঝতে পেরেছিলেন যে মেয়েদের জীবনে শিক্ষা কতখানি প্রয়োজন, কতখানি প্রয়োজন সমাজবন্ধন থেকে তাদের মুক্তি। এই মুক্তির লক্ষ্যে তাদের সহযোগী হতে হলে জানা দরকার নারীর উজ্জীবনের ইতিহাস, তাদের আজকের উদ্বোধনের অন্তর্পটের সাধনা। তাই হয়ত এই বিষয়কেই তিনি গবেষণার বিষয় করেছিলেন। তার সঙ্গে ছিল অন্য একটি তাড়না। সেটি ছিল বই লেখার দ্বিতীয় প্রেরণা। এই সময়ে আমি নারীভাবনা নিয়ে গবেষণা করছিলাম, আর লিখছিলাম সেই গবেষণা-সঞ্জাত একটি গ্রন্থ — **ভাবিত পুরুষ অ-ভাবিত নারী : নারী প্রশ্নের সেকাল-একাল**। তখন আমার সঙ্গে আমার এই তন্নিষ্ঠ গবেষিকা-ছাত্রীর নানা বিষয়ে আলোচনা হত। বিশ্বজুড়ে বন্ধন-অসহিষ্ণু নারীর শৃঙ্খল-মোচনের

ইতিহাসটি আমরা পড়তাম — শিক্ষক ও ছাত্রী —পুরুষ ও নারী — উভয়ের চোখ দিয়ে উভয়ই দেখে নিতাম নারীর — ইতিহাসের অনালোকিত সত্তার —উদ্বোধনের ইতিহাসটি। ইতিহাস পড়তে পড়তে এক গবেষিকা নারী ফিরে যেত সেখানে — কালান্তরের ছায়াচ্ছন্নতায় আবৃত সেই অবরোধের অলিন্দে যেখানে অনাদিকালের মাতা-মাতামহী, পিতামহীদের দেখা যেত — অবগুণ্ঠিত, কালের তমিস্রা বোরখা পরিয়ে রেখেছে যাঁদের — তাঁরা সবাক হয়ে উঠতেন -প্রাণিত হয়ে উঠত গবেষিকার অনুসন্ধিৎসা।

এই অনুসন্ধিৎসার থেকে জন্ম নিয়েছে এই বই। তাই এই বইয়ের একটি অভিমুখ আছে, তা হল সত্যের অনুসন্ধান। কেমন করে বাংলার নারী ঔপনিবেশিক পরিমন্ডলে নিজের অস্তিত্বকে অবরোধ থেকে বের করে আনতে পারল, তার জাগরণের জিয়ন কাঠিটি কে ছুঁইয়েছিল তার চোখে, পুরুষ? না নারীর নিজের অন্তরতর সত্তা? কতখানি প্রতীচ্য ভাবনা সমাজকে নাড়িয়েছিল, কতখানি সমাজ নড়েছিল নারীর অন্তরমথিত আপন অঙ্গীকারে — তারই ইতিহাস লেখা হয়েছে এই গ্রন্থে। এ গ্রন্থ লিখে শ্রীমতী তপতী ভট্টাচার্য্য এক অভিনবত্বের সূচনা করলেন। প্রতীচ্য ভাবনার মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে দিলেন বাঙালি নারীকে — তার আত্ম-আবিষ্কারের মুহূর্তগুলিকে পরিশীলিত বিন্যাসে বেঁধে ফেল্লেন একটি সময়কালের প্রগতিফলকের চিহ্ন রূপে। এটি ঐতিহাসিকের কাজ। ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের তফাৎ এইখানে। ইতিহাসের উদ্দেশ্য সত্যের অনুসন্ধান। সাহিত্যের লক্ষ্য রসসৃষ্টি। শ্রীমতী ভট্টাচার্য্য ইতিহাসের নির্মোহ সত্যকে খুঁজেছেন, তাই অলীকের মায়াজাল তাঁকে ছিন্ন করতে হয়েছে। তিনি একথা বলেননি যে নারী একাই স্বয়ম্ভু, বলেননি যে ঔপনিবেশিক শোষণ-বঞ্চনার অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা সত্ত্বেও অন্তরালে কোন প্রেরণা ছিলনা, বলেননি যে পুরুষ সততই আত্মতৃপ্তির আনন্দে ঔদাসীন্যের ঘেরাটোপে রেখে দিয়েছিল নারীকে। এমন কথা আজকাল নারীবাদী লেখার সংযমহীন অতিকথনে আমরা প্রায় দেখতে পাই। এই বইয়ে আছে অতি কথনের স্থলে মিতকথন, আছে যুক্তির বন্ধনে ভাবের বোধন। তথ্যের বাহুল্যে, তত্ত্বের আবর্জনায় ঘটে যায় বিকৃত বিদ্যার সংক্রমণ। এ গ্রন্থ সে সম্ভাবনা থেকে মুক্ত।

এ গ্রন্থের বিশেষত্ব চারটি। প্রথমত, এই গ্রন্থে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্যের প্রেরণা, প্রতীচ্যের অভিঘাতকে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে যে যুক্তি ও সত্যের সমন্বয় ঘটিয়ে পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা বাংলাদেশে নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে এক যথাযোগ্য দেয়া-নেয়ার ভিত্তিতে স্থাপন করেছে। প্রথম পরিচ্ছেদে এমন কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সতর্কতা বজায় রাখা হয়েছে যাতে বিদেশী শাসন ও সভ্যতা সম্বন্ধে মুগ্ধতা কোন আড়ষ্টতার সৃষ্টি না করে। গ্রন্থের দ্বিতীয় বিশেষত্ব রয়েছে তথ্যের প্রগাঢ় উৎখননে। সমকালের পত্রপত্রিকা ও আধুনিক

কালের বিষয়-সংশ্লিষ্ট নানা রচনাকে সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অনেক সময়ে মানবীবিদ্যার চর্চায় মডেল তৈরীর ঝোঁক দেখা যায়। সে ঝোঁক এখানে পরিহার করা হয়েছে। তথ্যবিহীন বক্তব্যের উৎক্ষেপন এখানে নেই বরং তথ্যের উৎখননে এখানে তৈরী করা হয়েছে ভাবনার প্রত্নতত্ত্ব। এই বইয়ের তৃতীয় বিশেষত্ব তার ভাষা যা তরল না হয়েও সরল, প্রখর হয়েও কখনোই অকারণে মুখর নয়। সর্বশেষের যে বিশেষত্ব এই বইকে আকর্ষণীয় করেছে তা হল মানবীবিদ্যার চর্চায় পুরুষদের উপস্থিতি। এই গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায় যার শিরোনাম 'প্রগতির পদসঞ্চারে শতাব্দীর পুরুষ' একটি অনবদ্য রচনা যেখানে দেখানো হয়েছে যে ইতিহাসের ঘটনা কি রকমভাবে পরিবর্তনের অনুঘটক রূপে কাজ করে কেমন করে পুরুষ হয়ে ওঠে নিজের বিশ্বাস ও আচরণের বৈপরীত্যে ইতিহাসের করুণ এক মানবিক উপস্থাপনা। এ সমস্ত কিছুই লেখিকা পেশ করেছেন সহজভাবে এক প্রত্যয়শীল আঙ্গিকের মাধ্যমে যেখানে যুক্তি তথ্যের সংলগ্ন থেকে ভাষাকে তেজস্বী হতে সাহায্য করেছে। কখনোই তাকে বিমুক্তবোধের কণ্ঠলগ্ন হতে দেয়নি।

মনে রাখতে হবে যে বর্তমান গ্রন্থটি নারী জাগরণের ইতিহাস। লেখিকা 'পাশ্চাত্য ভাবনা ও বঙ্গীয় নারী প্রগতি, 'আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গীয়নারী', 'বাঙালি নারীর আধুনিকায়ন' এমন সব শিরোনাম ব্যবহার করেননি। বাংলার ইতিহাসে উনিশ শতকের সমস্তটাই হচ্ছে নারী জাগরণের কাল — নারীর প্রগতি চেতনা এসেছিল অনেক পরে — বিংশ শতাব্দীতে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকে ১৯২১ সালে গান্ধীবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে বঙ্গীয় নারী সমাজ বাইরে আসতে শিখেছিল। অন্তঃপুরিকার অবরোধ ঘুঁচেছিল তখনই, তার আগে নয়।১৮৪৯ সালে ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলে (১৮৬২তে নাম হয় বেথুন বিদ্যালয় বা Bethune School) চালু হওয়ার পর থেকে কিঞ্চিৎ - অধিক পঞ্চাশ বছর সময় লেগেছিল নারীজাগরণের — এই সময় নিয়ে বর্তমান গ্রন্থের বিষয় সূচি তৈরি হয়েছে। প্রতীচ্য ভাবনা দেশে এনে দিয়েছিল বিমূর্ত বোধ, নারী অবস্থানের অপূর্ণতা সম্বন্ধে চেতনা। আত্মজাগরণের প্রভাতসঙ্গীতের সূচনা করেছিলেন রামমোহন, তাঁকে 'হাফ-লিবারেল' বলে কটাক্ষ করেও তাঁর অসমাপ্ত কাজকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন নব্যবঙ্গীয়রা — ইয়ং বেঙ্গলের এক উত্তাল যুবগোষ্ঠী যারা ডিরোজিওর কাছ থেকে পেয়েছিল যুক্তি ও জ্ঞানান্বেষণের তাড়না, যারা নিজেদের মধ্যে গড়ে তুলেছিল মুক্তির আকুলতা। সমাজের আড়ষ্টতাকে পিষে দিয়ে অবাধ অস্তিত্বের সোচ্চার আত্মঘোষণার মধ্যে এই যুবাপুরুষরা এক বড় মাপের বৈপ্লবিক ঘটনাকে ঘটিয়ে দিলেন — তারা তাদের ধ্যানের মধ্যে নিয়ে এলেন তাদের আকাঙ্ক্ষিত এক নন্দিনী নারীকে — যিনি শুধু কামিনী নন, রমণী, শুধু জননী নন জায়া, শুধু ভামিনী নন. স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী —

এক কথায় অনবগুণ্ঠিতা জীবন সঙ্গিনী। এই নারীর প্রতিমাগড়ার প্রাতিষ্ঠানিক উদ্বোধন হল ১৮৪৯ সালে ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে। এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছিলেন ব্রাহ্মসমাজের সদস্যরা যারা নারীজাগরণের পরিণতিকে এক নিরতিশয় সমাজকল্যাণের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথানিবারণে সাহায্য করে নারীর অপমৃত্যু রোধ করেছিলেন। তাকে জীবনের মধ্যে সংস্থাপিত করেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সূচনা করে নারীকে ফিরিয়ে দিলেন তার জীবনে পূর্ণতার অঙ্গীকার। নারীর জৈবিক অস্তিত্বের সংরক্ষণ থেকে তার সামাজিক অস্তিত্বের পূর্ণতায় প্রত্যাবর্তন কখনোই সম্ভব হত না যদি তার অন্তরের আঁধার না মুছে যেত। এই আঁধার কীভাবে মুছল তার ইতিবৃত্ত আছে এই গ্রন্থে। মনের অন্ধকার মোছে যে আলোয় তা আসে শিক্ষা থেকে। উনিশ শতকে যখন নারী শিক্ষার সূচনা হয়েছিল তখন প্রশ্ন উঠেছিল যে নারী শিক্ষা কার স্বার্থে — ব্যক্তির স্বার্থে, না সমাজের স্বার্থে, না গার্হস্থ্য স্বার্থে। আবার প্রশ্ন উঠেছিল যে শিক্ষাপ্রাপ্তা নারীর আদর্শ কী হবে? তারা কী সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর অনুসারী হবে না নাকি বহির্মুখী, মুক্তমনা, আত্মপ্রত্যয়শীল, আত্মলীনা রমণী হয়ে উঠবে? এ দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে করতে বেশ কয়েক দশক কেটে গেল। তপতী লিখলেন :

> "১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন বিদ্যালয় থেকে চন্দ্রমুখী ও কাদম্বিনী বি.এ. পাশ করলেন। এইভাবে প্রায় নিঃশব্দে এবং বিনাবাধায় একটি যুগান্তর ঘটে গেল। উদারপন্থী ব্যক্তিরা মনে করলেন যে এর ফলে সমাজের প্রগতির দ্বার উন্মুক্ত হল। যে সব পুরুষরা মেয়েদের উচ্চশিক্ষার বিরোধিতা করেছিলেন তাঁরা পরাস্ত হয়েও হেরে যাওয়া যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন এই ভেবে যে শিক্ষিতা মহিলারা সমাজে তাদের প্রাধান্য নষ্ট করবে। তাই ১৮৮৩ সালে সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দিতে গিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বললেন উচ্চশিক্ষা লাভ করলেও ভারতীয় মহিলারা দেশাচার লঙ্ঘন করবেন না বা তাদের চারিত্র বৈশিষ্ট্য হারাবেন না" (পৃ.৩৫)

এই হল নববিধানে নারী জাগরণ। একদিকে ছিল দেশাচারের গন্ডিবদ্ধ ব্যবস্থার নিজস্ব অবরোধ যাকে সময় সময় কুর্ণিশ জানিয়ে নারীশিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক উদ্ভাবন ঘটাতে হয়েছে। অন্যদিকে ছিল যুগপরিবর্তনের নতুন চাহিদা — শিক্ষিত স্বামীর সহচারিণী হওয়ার আহ্বান। উনিশ শতকের শেষ থেকেই পুরুষরা ঘর ছাড়ছে, কর্মসূত্রে যাচ্ছে স্থানান্তরে, থাকছে সেখানে, অনিবার্য ভাঙনে পা বাড়াচ্ছে যৌথ পরিবার — স্বামীর সঙ্গে কখনো কখনো স্ত্রীও যাচ্ছেন পুরোগামী পতির অনুগামিনী দয়িতারূপে — বিংশ শতাব্দীতে যাকে আমরা নিউক্লিয়ার পরিবার বলি তার

জন্মবীজ মুকুলিত হতে শুরু করেছে এই সময়ে — বিশেষ করে উনিশ শতকের শেষ দিকে। পুরাতনের প্রয়াণমুহূর্তেই এল অপটু স্ত্রী, অশিক্ষিত জায়ার নিমীলিত চোখে দৃষ্টিদানের এক সন্ধিলগ্ন। কে ঠেকাবে ইতিহাসের অমোঘ গতি।

> "কাদম্বিনী বিলাতে গিয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিপ্লোমা লাভ করলেন, চন্দ্রমুখী এম.এ. পাশ করলেন, কৃষ্ণভামিনী বিলাতবাসের অভিজ্ঞতায় স্বচ্ছল আত্মনির্ভরশীল মেয়েদের দেখে মুগ্ধ হলেন। কুমুদিনী লীলাবতী অবরোধের বেড়া ভেঙে মেয়েদের অর্থকরী শিল্পকার্যে নিযুক্ত হতে বললেন।" (পৃ.৯১)

দিনবদলের অনিবার্যতায় এল প্রত্যাসন্ন সেই মুহূর্ত যখন বাঙালি নারী নিজের বিধুর অস্তিত্বের মধ্যেও খুঁজে পেল সংগোপন এক প্রতিশ্রুতি — শিক্ষা, কাজ, স্বামীর সঙ্গে একান্তের সহমর্মিতা ঘন একক জীবন — অবরোধের পর্দা তুলে কত নতুন জীবনের হাতছানি। এটি হল সেই পরিবর্তন যাকে লেখিকা বলেছেন 'সংশয় থেকে প্রত্যয়'। পৈতৃক পরিবার থেকে বের হয়ে আসা পুরুষের, যৌথ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন নারীর দাম্পত্য নৈকট্য এই প্রত্যয়কে ঘনীভূত করেছিল। এতে কোন সন্দেহ নেই।

বাঙালী নারীর বিস্ময়কর জাগরণে এক পরিবর্তনশীল নেতৃত্ব কাজ করেছিল। ডিরোজিয়ানদের থেকে বিদ্যাসাগর হয়ে কেশবচন্দ্র সেন পর্যন্ত যে সময় তার মধ্যেই ঘটেছিল সেই অদ্ভুৎ সংযোগ --- ইতিহাসের নির্ধারিত কাল ও তার নির্বাচিত মানুষ — এ দুইয়ের মিলন যা সহজে ঘটেনা। ডিরোজিয়ানরা নারীমুক্তিকে তাঁদের পাঠ্যসূচির মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিলেন, তাঁদের কর্মসূচিতে তাকে কোন রূপ দেননি। বিদ্যাসাগর মহাশয় ভাবনাকে অব্যবস্থার বিড়ম্বনা থেকে ব্যবস্থিত চিত্ততার শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন। শৃঙ্খলার অন্তঃপুরে বিদ্যাসাগর পুরে দিয়েছিলেন বহ্নিমান এক আগ্রহকে যাকে পরবর্তীকালে কেশবচন্দ্র নববিধানের উজ্জীবিত মশাল করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। কেশবচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত প্রখর ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। তাই নারী মুক্তির সুচারু সংগঠন তিনি তৈরী করেছিলেন ঠিকই, প্রতিকূলতাকে বিদীর্ণ করার কোন বর্শাফলক তিনি উদ্ভাবন করতে পারেননি। কথার থেকে কাজ, কাজের মধ্যে সমারোহ — ডিরোজিয়ানদের থেকে বিদ্যাসাগর হয়ে কেশবচন্দ্রের এই হল বিবর্তন।

নেতৃত্বের হাত ধরে বাঙালি নারীর বিবর্তনের রূপটি চমৎকারভাবে বর্তমান গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'জায়া জননী গৃহিনী', আরেকটির নাম 'চিরায়মানা ও নবীনা'। জননী-জায়া বস্তুত চিরায়মানা। এককসুখে গৃহিনী নির্দ্বিধায় নবীনা। বর্ণনার যে অসাধারণ আঙ্গিক এখানে লেখিকা ব্যবহার করেছেন তার দ্বারা বঙ্গনারীর

আধুনিকায়নের চিত্রটি সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আধুনিকায়নের এই যাত্রাপথে পুরুষের অবস্থান কী? পুরুষ তার ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, স্পর্ধা ও শাসন — সব নিয়ে কীভাবে নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল নারী জাগরণের সমস্ত কলরোলে নিনাদিত কর্মসূচিকে? উপসংহারে বর্তমান লেখিকা এ প্রশ্নকে নতুন আঙ্গিকে পেশ করেছেন।

তিনি লিখেছেন : "আসলে উনিশ শতকে কোন একটি ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর কাজের ফলে নারী মুক্তির ঘটনাবহুল ইতিহাস রচিত হয়নি। নারী পুরুষের দ্বৈত ভূমিকা শেষ পর্যন্ত এক অদ্বৈত আকাঙক্ষার অর্থবহ পরিণতি ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল" (পৃ.৩৮৯)। "পুরুষের শাসন ও নারীর নিমজ্জন সমাজের ভারসাম্য নষ্ট করে দিচ্ছিল। উনিশ শতকে নারী মুক্তির সমস্ত আকাঙক্ষা, সমস্ত প্রয়াস এবং সমস্ত কর্মসূচী এই ভারসাম্যকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা মাত্র" (তদেব) স্পষ্টতই লেখিকা নারীভাবনার বিবদমান যুক্তিগুলিকে এক সমন্বয়ের স্তবকে গাঁথতে চেয়েছেন। বোধের তীক্ষ্ণতা দিয়ে তথ্যের তেজস্বী উপস্থাপনা সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে যে একটি বিভাস এনে দিয়েছে তাকে অস্বীকার করা যায়না। তথ্য থেকে আসে জ্ঞান, জ্ঞান থেকে আসে প্রজ্ঞা। এ বইয়ে তথ্য প্রচুর, জ্ঞান তারই বিস্ফারিত লীলা — ছত্রে ছত্রে, অনুচ্ছেদে অনুচ্ছেদে। গবেষণার স্নায়ুতে থাকে শিহরণ — বোধ-উদ্ভাবন-উপস্থাপনা — সমস্ত কিছুর শিহরণ। এ শিহরণ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে এ গ্রন্থ। এখানে পূর্বসূরীদের প্রতি কোন অবজ্ঞা নেই। আত্ম-উৎক্ষেপনের প্রয়াসও এখানে নেই। সমগ্র অর্থেই এ গ্রন্থ নিরপেক্ষ — স্বাধীন ও সার্বভৌম সাধনার সেই ফসল যা বর্তমানের উপযোগী হয়েও ভবিষ্যতের পক্ষে অপরিহার্য। মানবীবিদ্যার দর্প এখানে নেই, কারণ এখানে পন্ডিতি নেই। জাগরনের প্রলাপ এখানে অনুপস্থিত। কারণ বোধ এখানে অনায়াস, ভাষা এখানে প্রতারণাহীন। এ গ্রন্থ পাঠকের মনোরঞ্জন করবে না, শুধু মনোজ্ঞ করবে তার দৃষ্টিকে, স্বচ্ছ করবে তার প্রতীতীকে। ইতিহাসের এক উন্মীলন মুহূর্ত ঘটবে নবযুগের মানবী-উদ্বোধন।

সূচিপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাশ্চাত্যের প্রেরণা ও প্রাণিত বঙ্গসমাজ

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রথম স্পর্শ

"প্রাচ্য" ও "পাশ্চাত্য" এই পৃথকীকরণ কিছু মানুষের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সৃষ্টি, বলেছেন এডওয়ার্ড সাইদ।[১] যেমন পাশ্চাত্য তেমনই প্রাচ্য হল একটি ধারণাবিশেষ, যার ইতিহাস ও চিন্তার ঐতিহ্য আছে, কল্পনা এবং শব্দসঞ্চয় তাকে পাশ্চাত্যের জন্য বাস্তবতা ও অস্তিত্ব দিয়েছে। এইভাবে, এই দুই ভৌগোলিক অস্তিত্ব পরস্পরকে সমর্থন ও প্রতিবিম্বিত করেছে।[২] কিন্তু পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সম্পর্ক হল ক্ষমতার, আধিপত্যের ও কর্তৃত্বের।[৩]

পলাশীর যুদ্ধ প্রথমে বাংলায় ও পরে সারা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি স্থাপন করল ঠিকই কিন্তু অভিজ্ঞতা ও প্রস্তুতির অভাব তাদের প্রকৃত শাসনক্ষমতা নিজের হাতে নিতে দিল না। ফলে তারা অন্তরালে থেকে প্রকৃত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে লাগল আর প্রকাশ্যে রইল পুতুল সরকার। এমনকি যখন ক্লাইভ ১৭৬৫ সালে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করলেন তখন দেশীয় শাসনব্যবস্থা ও দেশীয় কর্মচারী সবই বজায় রইল, যাকে সকলে কুখ্যাত দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা বলে জানে।

কিন্তু ক্রমশ দেশীয় শাসনপদ্ধতি তার যোগ্যতা হারাতে লাগল এবং ব্রিটিশ শাসকরা বাধ্য হলেন তাঁদের নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে, বিশেষত রাজস্ব ও বিচারের ক্ষেত্রে। কিন্তু সমাজ সম্পর্কে তাঁরা *Laissez-faire* অবলম্বন করেছিলেন। ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও প্রশাসন সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব ছিল প্রশংসামূলক। যাতে ভারতবর্ষ ভবিষ্যৎ বিকাশের পথে এগিয়ে যেতে পারে সেজন্য তারা ভারতীয় সংস্কৃতিকে রক্ষা করাই কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন।[৪] এই দৃষ্টিভঙ্গী এবং মানসিকতা থেকে ওয়ারেন হেস্টিংস প্রাচ্য বিদ্যাচর্চায় উৎসাহ দান করতে লাগলেন। হ্যালহেড তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু আইনের ইংরাজী অনুবাদ করলেন। তিনি ইংরাজী ভাষায় একটি বাংলা ব্যাকরণও রচনা করলেন। মুসলমান ভদ্রলোকদের আবেদন

---

১ Edward Said, *Orientatism*, *Penguin Rept. in 1995.*

২ "…. as much as the West itself, the Orient is an idea that has a history and a tradition of thought, imagery, and vocabulary that have given it reality and presence in and for the West. The two geographical entities thus support and to an extent reflect each other." — তদেব পৃ: ৫।

৩ The relationship between Occident and Orient is a relationship of power, of domination, of varying degrees of a complex hegemony." — তদেব।

৪ Bela Datta Gupta, Sociology of India, Centre for Sociological Research, Calcutta, 1972, পৃ: ২৫।

ও স্মারকলিপির সম্মান রেখে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে হেস্টিংস কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করার অনুমতি দিলেন। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম জোন্স্ প্রতিষ্ঠা করলেন এশিয়াটিক সোসাইটি। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে বেনারসের রেসিডেন্ট জোনাথান ডানক্যান প্রতিষ্ঠা করলেন বেনারস সংস্কৃত কলেজ। এই সমস্ত কার্যকলাপের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় ধর্ম, আইন ও সাহিত্যের সংরক্ষণ এবং চর্চা।[৫] তখনও কোম্পানী মনে করত যে বাংলায় তারা মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তরসূরী। তাই সাধারণ লোকের ধর্ম-অভ্যাস ও বিশেষ আইনসমূহ বজায় রাখা উচিত।[৬]

এই দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সম্পূর্ণ সাযুজ্য রেখে লর্ড ওয়েলেসলী ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। এই কলেজের উদ্দেশ্য ছিল তরুণ ইংরাজ অফিসারদের দেশীয় ভাষা, রীতিনীতি, ইতিহাস, আইন ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে তোলা। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন তখনকার দিনের বিখ্যাত বাঙালী পণ্ডিতরা, যেমন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু প্রমুখ। এঁরা উপযুক্ত পাঠ্য বইয়ের অভাব মেটানোর জন্য নিজেরাই সহজ-সরল ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে লাগলেন। এর ফলে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন গদ্যরীতির প্রবর্তন ঘটল। বর্তমান আলোচনায় এর গুরুত্ব এই যে এর ফলে বিখ্যাত ইংরাজী পুস্তকগুলি অনূদিত হতে থাকল আর এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাশ্চাত্য ধারণা ও মূল্যবোধ বাঙালী জীবন ও চিন্তায় প্রবেশ করে গভীর প্রভাব বিস্তার করতে লাগল।[৭]

এই প্রভাবের একটি বাহ্যিক দিক হল বাঙালীদের তরফে ইংরাজী ভাষা শেখার প্রচেষ্টা। অবশ্য ইংরাজী ছিল শাসক শ্রেণীর ভাষা। সুতরাং এই ভাষা জানা থাকলে অনেক সুবিধা, বিশেষত অর্থকরী দিক দিয়ে। এই ধরনের চিন্তাও বাঙালীদের ইংরাজী শিক্ষার দিকে অগ্রসর করেছিল।[৮] ফলে "কিছুদিনের মধ্যে কলিকাতায় অনেক ইংরাজী শিক্ষাদানের স্কুল গজিয়ে উঠল"।[৯] এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আর্চারের স্কুল, ডেভিড ড্রামন্ডের ধর্মতলা একাডেমি, শোরবোর্ণের স্কুল, লসন বিবির স্কুল ইত্যাদি।[১০] বাঙালীরাও , যেমন রামজয় দত্ত, আনন্দীরাম দাস, কৃষ্ণমোহন বসু, রামলোচন নাপিত প্রমুখ, ইংরাজী স্কুল স্থাপনের ব্যাপারে পিছিয়ে রইলেন না।[১১] তবে এই সমস্ত স্কুলগুলোতে ইংরাজী শব্দ ও তার অর্থ শেখানোর দিকেই বেশি নজর

---

৫ A.F. Salahuddin Ahmed, Social Ideas and Social Change in Bengal, 1818-1835, Riddhi, Calcutta, Second Edition, June 1976, পৃ: ১৫৭।

৬ Eric Stokes, The English Utilitarians and India, Indian Print, 1982. Oxford University Press, 1982 পৃ: ৩।

৭ A.F. Salahuddin Ahmed, পূর্বোক্ত, পৃ: ২১।

৮ তদেব, পৃ: ২২।

৯ স্বপন বসু, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস*, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৮৫, পৃ: ৯।

১০ তদেব।

১১ তদেব।

দেওয়া হতো। এখানে জ্ঞানার্জনের বড় সুযোগ ছিল না। শুধুমাত্র জীবিকা নির্বাহ ও সেইসূত্রে সৌভাগ্যের দ্বার খোলার জন্য এই স্কুলগুলি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।[১২]

উনিশ শতকীয় কলিকাতার বিশিষ্ট ধনী পরিবারগুলি প্রায় সবই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে চাকরি করে যেমন প্রচুর অর্থ আয় করেছিলেন, তেমনই ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করে ইউরোপীয় চিন্তাভাবনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন।[১৩] "আধুনিক বাংলার প্রথম চিন্তানায়ক হিসাবে স্বীকৃত" রামমোহন রায় ছিলেন কোম্পানীর দেওয়ান। তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুগামী দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন ২৪-পরগণার কালেক্টার ও সল্ট এজেন্ট মিঃ প্লাউডেনের দেওয়ান। দ্বারকানাথ আবগারি বিভাগেও (লবণ এবং আফিম) দেওয়ানের কাজ করেছিলেন। মতিলাল শীল ছিলেন বিদেশ থেকে আসা জাহাজের মুৎসুদ্দি। প্রসন্নকুমার ঠাকুর ছিলেন তমলুকের সল্ট এজেন্টের দেওয়ান। ১৮৩৪ সালে তিনি কলিকাতার সল্ট বোর্ডের দেওয়ান হয়েছিলেন। ১৮২৮ সালে কলুটোলার সেন পরিবারের রামকমল সেন ডাঃ উইলসনের অধীনে টাঁকশালের দেওয়ান ছিলেন। ১৮৩২ সালে তিনি বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান হয়েছিলেন। ধর্মসভার একনিষ্ঠ সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বহু জায়গার দেওয়ানি করেছিলেন।[১৪] এঁরা সকলেই যে আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত থেকে পয়সা উড়িয়েছিলেন তা নয়, অনেকেই অবসর সময়ে সমকালীন সমাজ-ধর্ম ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা করেছিলেন।

ইংরাজদের সঙ্গে ওঠা-বসার সুবাদে কিছুটা উদার দৃষ্টিভঙ্গী এবং ইংরাজের প্রতি কৃতজ্ঞতামিশ্রিত সম্ভ্রমবোধ নিয়ে তাঁরা আত্মসমীক্ষার পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। এই আত্মসমীক্ষা তাঁদের চোখে হিন্দুসমাজের অবক্ষয়ের চেহারাটিকে সংশয়াতীতভাবে তুলে ধরল।[১৫] এই অবক্ষয়ের চেহারাটি স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রচারে ও লেখায়। ইউরোপীয় বাণিজ্যিক কোম্পানীগুলোর সাথে সাথেই এদেশে এসেছিলেন খ্রীষ্টান মিশনারীরা। ধর্মপ্রচারের সঙ্গে তাঁরা শুরু করলেন হিন্দুধর্ম ও সমাজের সমালোচনা। লর্ড কর্ণওয়ালিসের প্রধান উপদেষ্টা চার্লস্ গ্রান্ট ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়ে ক্ল্যাপহ্যাম গোষ্ঠীর একজন প্রথম সারির সদস্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ভারতবর্ষে কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি লিখলেন : "Observations on the state of society and the Asiatic subjects of Great Britain, particularly with respect to morals; and on the Means of improving it".[১৬]

১২ তদেব।

১৩ Bela Datta Gupta, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩২।

১৪ স্বপন বসু, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪।

১৫ R.C. Majumdar ed., British Pramountcy and Indian Renaissance, Part II. Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, পৃ:পৃ:২১-২২।

১৬ ১৭৯৭ সালে গ্রান্ট এই প্রতিবেদনটি কোর্ট অব ডিরেক্টর্স এর কাছে পেশ করেছিলেন। ১৮১৩ এবং ১৮৩৩ সালে এটি পার্লামেন্টারি পেপার্স এ প্রকাশিত হয়েছিল। Eric stokes, The English Utilitarians and India, পূর্বোক্ত, পৃ:২৯।

এদেশের সমাজ সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে গ্রান্ট লিখলেন : "এই দেশ বিশেষভাবে প্রকৃতির সুবিধাদানে পুষ্ট, ফলে এদেশের অধিবাসীদের সমৃদ্ধি আরো বৃদ্ধি পেতে পারে, কিন্তু সবদিক বিবেচনা করে একথা স্বীকার না করে পারা যায় না যে হিন্দুস্তানের অধিবাসীরা অত্যন্ত নীচ ও অধঃপতিত, তাদের নৈতিক দায়বদ্ধতার চেতনার খুব সামান্যই অবশিষ্ট আছে, যেটুকু আছে তাও তারা অমান্য করতে বদ্ধপরিকর, তারা চালিত হয় অপকারী ইন্দ্রিয়সুখকর আবেগ দ্বারা, সমাজের ওপর এর ফল হল সাধারণ ও ব্যাপকভাবে আচরণগত দুর্নীতি, যা তাদের নিমজ্জিত করেছে পাপের দুর্দশায়।"[১৭] গ্রান্ট আরো মনে করতেন যে হিন্দুসমাজের দুর্নীতি ও কুসংস্কার দূর করার একমাত্র উপায় হল শিক্ষা, যার দ্বারা পাশ্চাত্য মনোজগৎকে ভারতে প্রবিষ্ট করানো যাবে।[১৮]

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা মনে করতেন যে তাঁরা ভারত তথা বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক অধিকার লাভ করেছেন, তা মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার। সেজন্য তাঁরা প্রাচ্যবিদ্যা চর্চায় উৎসাহিত হয়েছিলেন, যাতে ভারতীয়দের উন্নতি ও সমৃদ্ধি তাদের নিজেদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পথেই বিকশিত হতে পারে। চার্লস্ গ্রান্টের "পর্যবেক্ষণ"[১৯] ও তাঁর সুপারিশ প্রমাণ করল যে ভারতে কোম্পানীর প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনের উৎস ছিল ইংল্যান্ডে। যখন ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তখন ইংরাজদের মনোজগতের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী চিন্তানায়ক ছিলেন উপযোগিতাবাদের প্রবক্তা জেরেমি বেন্থাম। বেন্থামের অনুগামীরা অর্থাৎ উপযোগিতাবাদীরা ব্রিটেনের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ পোষণ করতেন। স্বাভাবিকভাবেই ভারতের প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলিও তাঁদের চোখে জীর্ণ, অক্ষম এবং দুর্বল বলে প্রতিভাত হয়েছিল।[২০] ঐ একই সময়ে ব্রিটেনে সংঘটিত হচ্ছিল শিল্প বিপ্লব। রক্ষণশীল, অভিজাত-প্রভাবিত একটি প্রধানত গ্রামীণ ও হস্তশিল্প

১৭ "Upon the whole then, we cannot avoid recognising in the people of Hindostan, a race of men lamentably degenerate and base, retaining but a feeble sense of moral obligation; yet obstinate in their disregard of what they know to be right, governed by malevolent and licentious passions, strongly exemplifying the effects produced on society by a great and general corruption of manners, and sunk in misery by their vices, in a country peculiarly calculated by its natural advantages, to promote the Prosperity of its inhabitants." Eric Stokes, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩১-তে উদ্ধৃত। মূল নিবন্ধটি ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ছাপা হয়েছিল। উদ্ধৃতিটি ঐ নিবন্ধের পৃ: ৭১-এ রয়েছে।

১৮ পূর্বোক্ত, পৃ: ৩১।

১৯ "Observations on the State of Society ..." ইত্যাদি, পূর্বোক্ত।

২০ Ketaki Kushari Dyson ed., The Various Universe : A study in The Journals and Memoirs of British Men and Women in the Indian sub-continent, 1765-1856, Oxford University Press, 1978, পৃ: ২২।

অর্থনীতির দ্বারা পরিচালিত ব্রিটিশ সমাজ যখন শিল্পায়িত হয়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবশালী একটি আত্মবিশ্বাসী সমাজে পরিণত হল তখন স্বভাবতই ব্রিটিশ সমাজের দ্বন্দ্ব ও উত্তেজনা ভারতেও বাহিত হয়েছিল এবং ভারতে ব্রিটিশ কার্যকলাপের মধ্যে তার প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল। উভয় দেশেই পুরাতন সমাজব্যবস্থা আমূল পরিবর্তনকামী দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল এবং নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছিল।[২১]

১৮১৭ সালে একজন উৎসাহী বেন্থাম অনুগামী ও উপযোগিতাবাদী জেম্‌স্ মিল প্রকাশ করলেন তাঁর History of India, যে গ্রন্থে তাঁর দৃঢ় সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়েছিল যে ভারতীয় সভ্যতা ইউরোপের মধ্যযুগীয় সভ্যতা থেকেও নিম্নমানের। যদিও ভারত সম্পর্কে মিলের কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না তবুও তাঁর এই বইটি ব্যাপকভাবে পঠিত হয়েছিল। যেহেতু মিল লণ্ডনের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করেছিলেন সেহেতু ব্রিটেনের ভারতীয় নীতিতে মিল যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।[২২]

লক্ষ্যণীয় এই যে ঐ ১৮১৭ সালে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল হিন্দু কলেজ। এই কলেজের প্রতিষ্ঠা হল এমন একটি সময় যখন ব্যবহারিক সুবিধার জন্য ইংরাজী শিখতে গিয়ে বাঙালীরা স্বাদ পাচ্ছে পাশ্চাত্য ধ্যান, ধারণা ও আদর্শের, পাশ্চাত্যের আরো পরিচয় পাবার জন্য তারা উন্মুখ হয়ে উঠছে, যখন খ্রীষ্টান মিশনারীরা খ্রীষ্টের জয়গানে ও ধর্মান্তরকরণের উগ্র আগ্রহে হিন্দুসমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো পরতে পরতে মেলে ধরছে, যখন ব্রিটিশ প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রাচীন হিন্দুসমাজের অস্তিত্বের পক্ষে প্রতিকূল। অর্থাৎ সমস্ত দিকেই যখন চলছে নূতনের আবাহন তখন ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের যৌথ উদ্যোগে স্থাপিত হল হিন্দু কলেজ। এখানে ইউরোপীয় ও ভারতীয় ভাষা ও ইউরোপীয় ও এশীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষাদানের কথা বলা হলেও ঝোঁক সবটুকুই ছিল ইউরোপীয় ভাষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের দিকে। কালক্রমে হিন্দু কলেজ হয়ে উঠল "পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডারের উন্মোচক।"[২৩]

বৃদ্ধ বয়সে হতাশ হয়ে রবীন্দ্রনাথ লিওনার্ড এল্‌ম্‌হার্স্টকে লিখেছিলেন যে দেশে শিক্ষা নামে যা প্রচলিত আছে তা এক কৃত্রিম মানদণ্ড তৈরী করে মিথ্যা গৌরব সৃষ্টি করেছে, তা লাভ করার জন্য "আমাদের ভদ্রলোকবৃন্দ" আকুল। এদের বাইরে যে বিশাল জনসাধারণ তারা এই ব্যয়সাধ্য শিক্ষালাভের কথা ভাবতেও পারে না।[২৪] তবুও রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করতে

---

২১ তদেব, পৃ:পৃ: ২২-২৩।

২২ তদেব।

২৩ স্বপন বসু, পূর্বোক্ত, পৃ: ১০।

২৪ Rabindranath Tagore to Leonard Elmhirst, 19 December, 1937, Rabindranath Tagore Papers, Ravindra Bhavan, Santiniketan. Rajat Kanta Ray ed., Mind, Body and Society, Life and Mentality in Colonial Bengal, Oxford University Press, 1995, গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ: ৪।

পারেননি যে পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে বাংলার সমাজে এক নতুন ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গী, মূল্যবোধ, রুচি এবং অনুভূতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, রবীন্দ্রনাথ নিজেই যার উজ্জ্বলতম উদাহরণ।[২৫]

এই নবলব্ধ মানসিকতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল যুগ্ম দৃষ্টিভঙ্গী—যার সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদ। যা যুক্তিগ্রাহ্য নয় তা সত্য নয় আর এর সঙ্গে সংযুক্ত হল জন্ম নির্বিশেষে মানুষের মর্যাদায় বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন : "য়ুরোপের সংস্রব একদিকে আমাদের সামনে এনেছে বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্যকারণবিধির সার্বভৌমিকতা, আর একদিকে ন্যায়-অন্যায়ের সেই বিশুদ্ধ আদর্শ যা কোনো শাস্ত্রবাক্যের নির্দেশে, কোনো চিরপ্রচলিত প্রথার সীমাবেষ্টনে, কোনো বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিধিতে খণ্ডিত হতে পারে না।"[২৬]

যুক্তিবাদে আক্রান্ত নতুন প্রজন্মের বাঙ্গালী বিশ্বাস করত যে বিশুদ্ধ যুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে ইউরোপ জ্ঞানের জগৎ জয় করেছে। অভিজ্ঞতাভিত্তিক এই নতুন যুক্তি শেখাল সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে পরীক্ষা করে দেখতে। যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যুক্তির অনুশাসনের সঙ্গে খাপ খেত না বাঙালী অনুভব করল যে ঐ প্রতিষ্ঠানের সংশোধন এবং পরিবর্তন প্রয়োজন। যুক্তিবাদ মানুষকে শেখাল যে ঈশ্বরের কাছে সব মানুষ সমান। মানুষের অবস্থা ভেদে এই সাম্যের কোন পরিবর্তন হয় না। "নতুন শাসনে যে আইন এল তার মধ্যে একটি বাণী আছে, সে হচ্ছে এই যে, ব্যক্তিভেদে অপরাধের ভেদ ঘটে না। ব্রাহ্মণই শূদ্রকে বধ করুক বা শূদ্রই ব্রাহ্মণকে বধ করুক, হত্যা অপরাধের পঙ্‌ক্তি একই, তার শাসনও সমান — কোনো মুনি-ঋষির অনুশাসন ন্যায়-অন্যায়ের কোনো বিশেষ দৃষ্টি প্রবর্তন করতে পারে না। .... আসল এই কথাটাই দেশের সাধারণের মনে বাজছে যে, যেটা অন্যায় সেটা প্রথাগত, শাস্ত্রগত বা ব্যক্তিগত গায়ের জোরে শ্রেয় হতে পারে না, শংকরাচার্য উপাধিধারীর স্বরচিত মার্কা সত্ত্বেও সে শ্রদ্ধেয় নয়।"[২৭]

হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেছিল যে সব তরুণ হিন্দু যুক্তিবাদের প্রয়োগে তারা হিন্দুধর্মকে নস্যাৎ করে দিতে চাইল। হিউমের অভিজ্ঞতাবাদ, বেন্থামের উপযোগিতাবাদ, শেলী ও বায়রনের রোমান্টিকতা তাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে আচ্ছন্ন করল। ১৮২০-র দশকে বেন্থাম যে যুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন ইংল্যাণ্ডে, তার প্রতিধ্বনি ভারতেও এসে পৌঁছেছিল। হিন্দু কলেজের শিক্ষক হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও তা বাংলায় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ডিরোজিওর শিক্ষক ডেভিড ড্রামণ্ড তাঁকে যুক্তিবাদে দীক্ষিত করেছিলেন। ড্রামণ্ড নিজেও ছিলেন মানবতাবাদী ও যুক্তিবাদী। স্কট দার্শনিক ডেভিড হিউম ও স্কট কবি রবার্ট বার্ণসের রচনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ড্রামণ্ড অনুভব করেছিলেন যে "যুক্তি সহযোগে মানুষই ঐহিক সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা সবকিছুরই নিয়ামক এবং যতকিছু দোষ-ত্রুটি থাকুক না কেন, মানুষ মানুষই"।[২৮] এই ড্রামণ্ডের উজ্জ্বল

২৫ তদেব।

২৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "কালান্তর", রবীন্দ্র রচনাবলী, সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩৯৭, ইংরেজী ১৯৮৮, পৃ:পৃ: ৫৩৯-৫৪০।

২৭ তদেব, পৃ:পৃ: ৫৩৮-৫৩৯।

২৮ অমর দত্ত, *ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ানস্‌*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মার্চ, ১৯৯৬, পৃ: ২।

ছাত্র ডিরোজিও পরবর্তীকালে নিজে শিক্ষক হয়ে ছাত্রদের বিচারবুদ্ধি ও যুক্তির পথে পরিচালিত করেছিলেন। হিন্দু কলেজের কমিটি অব্ ম্যানেজমেণ্ট তাঁর জন্য নিম্নলিখিত পাঠ্যসূচী প্রস্তুত করেছিলেন : গোল্ডস্মিথের ইংল্যাণ্ড, গ্রীস ও রোমের ইতিহাস, রাসেলের মডার্ণ ইউরোপ, রবার্টসনের চার্লস্ দ্য ফিফ্থ, গে'র ফেব্ল্স্, ড্রাইডেনের ফেব্ল্স্, হোমারের ইলিয়ড ও ওডিসি, মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট, শেক্স্পীয়রের যে কোন একটি ট্র্যাজেডি।[২৯] কিন্তু পাঠ্যসূচীর চৌহদ্দীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে কলেজের শ্রেণীকক্ষের বাইরে তাঁর "ঘনিষ্ঠ ছাত্রবন্ধুদের" ডিরোজিও বেকন, হিউম, অ্যাডাম স্মিথ, টমাস ব্রাউন, জেরেমী বেন্থাম, ডুগাল্ট স্টুয়ার্ট, টমাস পেন, লক রীডের যুগান্তকারী চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত করিয়েছিলেন। এছাড়াও, তিনি সমকালীন বিশ্বের চলমান কিছু ঘটনাস্রোতের কথা ছাত্রদের শুনিয়েছিলেন। এর ফলে ছাত্ররা অর্জন করলেন এমন এক যুক্তিবোধ, "যা যুগপ্রচলিত বিশ্বাসের প্রতি সংশয়ের জন্ম দিল, অনেক জিজ্ঞাসা তাঁরা তুলে ধরলেন — যার প্রচলিত উত্তর অন্তত তাঁদের নবার্জিত যুক্তিবোধের সঙ্গে মেলে না। তাই শুরু হল প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক সংস্কার ইত্যাদির প্রতি তাঁদের আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণের পালা।[৩০]

ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যরা যাঁদের "হাফ্ লিবারেল" বলে সমালোচনা করতেন সেই রামমোহন ও তাঁর অনুগামীরাও কিন্তু যুক্তিবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। পাটনাতে তিনি অ্যারিষ্টট্লের যুক্তিধারার সঙ্গে পরিচিত হন আরবী ভাষার মাধ্যমে, এই যুক্তির প্রয়োগ করে তিনি প্রচলিত ধর্মসমূহের প্রতি সংশয়বাদী হয়ে ওঠেন।[৩১] জন ডিগবি নামে একজন সিভিলিয়ানের দেওয়ান হিসাবে রামমোহন ইংরাজী ভাষা ও সমকালীন ইউরোপীয় ধ্যানধারণার সঙ্গে পরিচিত হলেন। এছাড়াও, তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন জেরেমি বেন্থামের শিষ্য জেম্স্ ইয়ং। "ক্যালকাটা জার্নাল" পত্রিকার আমূল পরিবর্তন পন্থী সম্পাদক জেমস্ সিল্ক বাকিংহাম ও মানবতাবাদী শিক্ষাবিদ ডেভিড হেয়ার ছিলেন রামমোহনের বন্ধুগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী সদস্য।[৩২] সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংস্কারকের যে ভূমিকায় রামমোহন অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাতে তাঁর প্রধান হাতিয়ার ছিল যুক্তি। তিনি সর্বপ্রথম তা নারীদের উন্নতির চেষ্টায় প্রয়োগ করেছিলেন। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে প্রচার করতে গিয়ে তিনি শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর আসল প্রহরণ ছিল যুক্তি, যার দ্বারা নারীদের প্রতি প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গী তিনি নাকচ করে দিয়েছিলেন। তিনি মানতেন না যে নারীরা বুদ্ধিবলে সীমাবদ্ধ আর স্বভাবগতভাবে চঞ্চল তাই বৈধব্যাবস্থায় বাঁচতে দিলে তারা ব্যভিচারিণী হবে। তিনি যুক্তি দেখালেন যে মেয়েদের বুদ্ধি পরীক্ষা হল কোথায় যে তাদের নির্দ্বিধায় অল্পবুদ্ধি বলা হচ্ছে? বরঞ্চ 'সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত

২৯ টমাস এডওয়ার্ডস্, হেনরী ডিরোজিও, উদ্ধৃত, অমর দত্ত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ৬।

৩০ স্বপন বসু, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৮।

৩১ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত, কলিকাতা, ১৮৮১, পৃ: পৃ: ১৪-১৫, উদ্ধৃত, এ. এফ. সালাহ্উদ্দিন আহমেদ (A. F. Salahuddin Ahmed), পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ৩৭।

৩২ সালাহ্উদ্দিন আহ্মেদ (Salahuddin Ahmed), পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পাদটীকা, পৃ: ৩৯।

বিচারে' তিনি ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর উদাহরণ দিয়ে সর্বোচ্চ স্তরের জ্ঞানাভ্যাসে নারীর অধিকার সাব্যস্ত করেছিলেন। সহমরণ বিষয়ক বিতর্কে যখন বিধবাদের পক্ষ থেকে ব্রহ্মচর্য পালনীয়তার কথা বলা হল তখনও রামমোহন তাকে স্থূল অর্থে ধরলেন না। তাঁর কাছে ব্রহ্মচর্য অর্থ ছিল নিষ্কাম জ্ঞানাভ্যাস, ইহজগতে 'তৈলমাংস মৈথুনাদি' বর্জন নয়।[৩৩] চাঞ্চল্যের কথায় তিনি মাথা গণনা করে দেখতে বলেছিলেন কজন স্ত্রী তাঁর স্বামীকে প্রতারণা করে? আর তুলনায় বিশ্বাসভঙ্গকারী স্বামীর সংখ্যা কজন? বিশেষত হিন্দুরা বিবাহের সময় পত্নীকে অর্ধাঙ্গিনী বলে স্বীকার করে কিন্তু বাস্তবে তারা স্ত্রীদের সঙ্গে পশুর চেয়েও খারাপ ব্যবহার করে।[৩৪]

রাধাকান্ত দেব ছিলেন রামমোহনের বিরুদ্ধাচারী। রামমোহনের প্রতিটি আদর্শের বিরুদ্ধে তিনি প্রতি-আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। রামমোহনকে যদি প্রগতিশীলতার প্রতিভূ বলে ধরা যায় তবে রাধাকান্ত ছিলেন রক্ষণশীলতার প্রতিমূর্তি। "শোভাবাজার রাজপরিবারের রাজা রাধাকান্ত দেব তাঁর সঙ্গে রক্ষণশীল এবং গোঁড়া হিন্দু-র মতো অভিধা বহন করছিলেন, কারণ তাঁকে সর্বদাই হিন্দু ধর্ম এবং রীতির সংস্কারের বিরোধী রূপে পাওয়া যেত।"[৩৫] কিন্তু তাঁর ভাষাও ছিল যুক্তিবাহিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, তিনি যখন সতীদাহ প্রথা সমর্থন করে পাল্টা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, তখন তাঁর যুক্তি ছিল এইরকম যে "বিদেশী শাসক কেন আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত করবেন"?[৩৬] আবার এই রাধাকান্ত দেব স্ত্রী-শিক্ষা সমর্থন করেছিলেন এই যুক্তিতে যে জাতির নৈতিক চরিত্র ও সামাজিক সুখবৃদ্ধির জন্য স্ত্রী-শিক্ষা প্রয়োজন।[৩৭]

কিন্তু রামমোহন ও রাধাকান্ত সতর্ক এবং কখনো কখনো উভয়েই ছিলেন স্ববিরোধিতায় পূর্ণ। এমনকি সতীদাহ প্রথা নিবারণে তাঁর প্রচেষ্টা সম্বন্ধেও প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে। এর উচ্ছেদকল্পে আইন প্রণয়নের উপযোগিতা সম্পর্কে তিনি সন্দিহান ছিলেন এবং বেন্টিঙ্ককে তিনি ধীরে চলার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এজন্য উত্তরকালে এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে

৩৩ মালিনী ভট্টাচার্য, "রামমোহন, দেবী চৌধুরানী ও নারীশিক্ষা", সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি বেথুন বিদ্যালয় সম্পাদিত, বেথুন বিদ্যালয় সার্ধশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ। ১৮৪৯- ১৯৯৯, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬, মে ১৯৯৯, পৃ: ২১৬।

৩৪ তপন রায়চৌধুরী, "The Pursuit of Reason in Nineteenth Century Bengal", রজত কান্ত রায় সম্পাদিত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ৪৯।

৩৫ "Raja Radhakanta Deb of the Shovabazar Raj of Colonial Calcutta had has been carrying with him epithets like conservative and Orthodox Hindu since he had always been found opposing reforms in Hindu religion and ritual." — Shyamalendu Sengupta, A Conservative Hindu of Colonial India; Raja Radha Kanta Deb and his milieu, 1784-1867, Navrang, New Delhi, 1990, Introduction, পৃ: ১।

৩৬ স্বপন বসু, পূর্বোক্ত, পৃ: ২২।

৩৭ তদেব, পৃ: ১৬৮।

তিনি সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের বিরোধী ছিলেন। আসলে রামমোহন জানতেন যে সতীদাহ প্রথা নৃশংস হলেও এর ঐতিহ্য জনমানসে এত বদ্ধমূল যে জোর করে তা বন্ধ করতে গেলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। তাই, তিনি যে তিনটি উপায় অবলম্বন করেছিলেন তা হল এই যে ইংরাজী ও বাংলায় গ্রন্থরচনা করে সতীদাহ প্রথাকে অশাস্ত্রীয় প্রমাণ করা, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় আক্রমণ করা আর শ্মশানে শ্মশানে ঘুরে স্বামীর চিতায় আত্মহননেচ্ছু বিধবাদের নিবৃত্ত করবার প্রচেষ্টা চালানো। তবে যখন বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আইন পাশ করলেন, তখন রামমোহন তাঁকে দ্বিধাহীনভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন।[৩৮] বহুবিবাহ প্রথার সমালোচনা করে তিনি লিখেছেন: "আর যাহার স্বামী দুই তিন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করে, তাহারা দিবারাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়, অথচ অনেকে ধর্মভয়ে এ সকল ক্লেশ সহ্য করে; কখন এমত উপস্থিত হয় যে, এক স্ত্রীর পক্ষ হইয়া অন্য স্ত্রীকে সর্বদা তাড়ন করে, এবং নীচ লোক ও বিশিষ্ট লোকের মধ্যে যাহারা সৎসঙ্গ না পায়, তাহারা আপন স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ ত্রুটি পাইলে অথবা নিষ্কারণ কোন সন্দেহ তাহাদের প্রতি হইলে চোরের তাড়না তাহারদিগকে করে, অনেকেই ধর্মভয়ে লোকভয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে, যদ্যপিও কেহ তদৃশ যন্ত্রণায় অসহিষ্ণু হইয়া পতির সহিত ভিন্নরূপে থাকিবার নিমিত্ত গৃহত্যাগ করে, তবে রাজদ্বারে পুরুষের প্রাবল্য নিমিত্ত পুনরায় প্রায় তাহারদিগকে সেই সেই পতিহস্তে আসিতে হয়, পতিও সেই পূর্বজাতক্রোধের নিমিত্ত নানা ছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়, কখন বা ছলে প্রাণবধ করে, এ সকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং অপলাপ করিতে পারিবেন না। দুঃখ এই, যে এই পর্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্বক দাহ হইতে রক্ষা পায়।[৩৯] রামমোহন একথাও বলেছিলেন যে কোন ব্যক্তি যদি এক স্ত্রী বর্তমানে পুনর্বার বিয়ে করতে চায়, তবে তাকে ম্যাজিস্ট্রেট বা অন্য কোন রাজকর্মচারীর কাছে স্ত্রীর শাস্ত্রনির্দিষ্ট দোষ প্রমাণ করতে হবে নতুবা সে পুনর্বার বিবাহ করতে পারবে না।[৪০] অথচ এই রামমোহনই ব্যক্তিগত জীবনে তিনবার বিবাহ করেছিলেন, ৯ বছরে, ১০ বছরে, আর ২১ বছরে। শোনা যায় যে তাঁর দত্তকপুত্র রাজারাম তাঁর যবনী উপপত্নীর সন্তান ছিলেন।[৪১] রাধাকান্ত দেব রক্ষণশীল ছিলেন, কিন্তু স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের প্রথম পর্বে এই মানুষটির অবদান অপরিমেয়। "তিনি স্বদেশীয় বালিকাদের বিদ্যাধ্যয়নের বিষয়েও পোষকতাচারণ করিয়াছেন। স্মরণ হয় যে ১৮২২ সালের আরম্ভকালে ত্রিশজন বালিকার বিদ্যার পরীক্ষা লইতে তাঁহার বাটিতে দেখা গিয়াছে।.... তিনি বালিকাদের যাহাতে বিদ্যাশিক্ষাতে

---

৩৮ দিলীপ কুমার বিশ্বাস, রামমোহন-সমীক্ষা, সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা ৬, মার্চ ১৯৮৩, পৃ:পৃ: ৩৪১-৪৫।

৩৯ রামমোহন রায়, *রামমোহন রায় রচনাবলী*, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩, "প্রবর্তক নিবর্তক দ্বিতীয় সম্বাদ", পৃ: ২০৩

৪০ শীলা বসাক, "রামমোহন ও নারীর স্বাধিকার", *পশ্চিমবঙ্গ*, রামমোহন সংখ্যা, ১৪০৩, পৃ: ১৮৬।

৪১ Geraldine Forbes, *Women in Modern India, The New Cambridge History of Modern India*, Vol. IV. 2. First Indian Edition 1996, পৃ: ১০।

উত্তেজনা হয় এমত অনেক প্রস্তাব্যোপদেশ তাহারদিগকে দিয়াছেন এবং বিদ্যালাভে কীদৃশ উপকার এমতও তাহারদিগকে অনেক উপদেশকতা করিতে তাঁহাকে দেখা গিয়াছে।"[৪২] কিন্তু রাধাকান্ত কখনো প্রকাশ্যে বিদ্যালয়ে মেয়েদের পাঠানো সমর্থন করতে পারেননি।[৪৩]

যখন বাংলাদেশে পাশ্চাত্য ভাবনার সূত্রপাত ঘটল তখন বাঙালী অনুভব করতে শিখল মানুষের স্বাধীনতাকে, তার পারিপার্শ্বিকতা জয় করার ক্ষমতাকে, তার সামাজিক গণ্ডীর মত ও সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করার সাহসকে।[৪৪] এই মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গোঁড়া হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে ধিক্কার দিয়েছিল ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী। ঠিক যেমন ক্যাথলিক ধর্মের অনাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ইউরোপের মানবতাবাদীরা চরমপন্থী হয়েছিলেন সেই রকম কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। মানবতাবাদ দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে জন্মগত সাম্যে বিশ্বাসী করে তুলেছিলে। তাই যেমন তিনি ভারতবর্ষের দুঃখ-দুর্দশার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকে দায়ী করেছেন, তেমনই স্ত্রী-জাতির দুঃখ মোচনে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করেছেন। সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে দেশের সমগ্র জনহিতকর কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে নিজেকে জড়িত করেছিলেন কিশোরী চাঁদ মিত্র। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন *Hindu Theo Philanthropic Society* (১৮৪৩)। রামতনু লাহিড়ী বিশ্বাসী হলেন নারীর মানবিক মর্যাদায়। তাই, উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করলে তিনি তা সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেছিলেন। বালিকার পাণিগ্রহণে অস্বীকৃত হয়ে সারাজীবন অবিবাহিত রইলেন রাধানাথ শিকদার। এছাড়াও, রাধানাথ শিকদার সারা জীবন সমাজ সংস্কারের কাজে নিজেকে লিপ্ত রেখেছিলেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে কিশোরী চাঁদ মিত্রের গৃহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে *Hindu Theo philanthropic Society* তার কার্যনির্বাহক কমিটি ও সাধারণ সদস্যপদে নব্যবঙ্গগোষ্ঠীর যে সব তরুণ ছিলেন, তাঁদের মধ্যে রাধানাথ শিকদার অন্যতম। এঁরা এই সভার হয়ে বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ নিবারণ, নিষ্ঠুর ও অশালীন সামাজিক উৎসব অপসারণ ইত্যাদি কাজ করার চেষ্টা করেছিলেন।[৪৫] বেথুন সাহেবের সঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে সহযোগিতা করে হরচন্দ্র ঘোষ নারীর মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় নিজের বিশ্বাসকে প্রমাণ করেছিলেন।[৪৬]

শুধু তাই নয়, ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত *Hindu Pioneer* পত্রিকা ছিল ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর অন্যতম মুখপত্র। এই পত্রিকায় '*On Women*' নামক একটি প্রবন্ধে নারীর মানবিক

৪২ সমাচার দর্পণ, ২৭.৬.১৮৩২।

৪৩ স্বপন বসু, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৬৮।

৪৪ Priya Ranjan Sen, Western Influence on Bengali Literature, University of Calcutta, Calcutta, 1932, পৃ: ৩২৩।

৪৫ রামমোহন-সমীক্ষা, পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ৪৮১-৪৮৩।

৪৬ অমর দত্ত। পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ৪৭-৪৮।

অধিকারের স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছিল। নারীর মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা এবং পূর্ণ বিকাশের জন্য পুরুষের দায়িত্ব সর্বাধিক। কারণ, পুরুষের পরিপূর্ণতার জন্য নারীজাতির উন্নতি প্রয়োজন। তাই নারীকে নিছক পুরুষের ক্রীড়নক করে না রেখে তাকে শিক্ষিতা করে পুরুষের সমকক্ষ করে তুলতে হবে।[৪৭]

শাস্ত্রের জন্য মানুষ নয়। মানুষের জন্য শাস্ত্র — এই দৃষ্টিভঙ্গীর থেকে ইয়ংবেঙ্গল শাস্ত্রকে দূরে রেখে নারীর মানবিক মহিমার প্রতিষ্ঠা কামনা করেছেন — "কেননা তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যে নারীর মুক্তির মধ্যে সমাজ জীবনের অগ্রগতির শক্তি নিহিত আছে। নারীকে পিছনে ফেলে রাখলে নারী আমাদের পিছনে ঠেলে দেবে।"[৪৮]

লক্ষণীয়, এই সময় বঞ্চিত নিপীড়িত মানবের প্রতি মমতা, তাদের দুঃখ নিরসনের সচেতন প্রয়াস, তাদের দুঃখ দূর করে মনুষ্যত্বের সম্মান দেওয়া — এই ধরনের কর্মপ্রচেষ্টা প্রায় চোখেই পড়ে না। তাই বৃহত্তর অর্থে মানবতাবাদ বাঙালীদের প্রভাবিত করেছিল একথা বলা যাবে না। আসলে, পাশ্চাত্য সাহিত্য পাঠ করে বাঙ্গালী তার দৈবনির্ভরতা ত্যাগ করে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। বাঙ্গালী জীবন কিছুটা মানবমুখী হয়ে উঠল। এই সময় থেকে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র স্বীকারের প্রবণতা তাই বাঙ্গালী সমাজে দেখা গেল।

মানুষ কেবল একজন একক ব্যক্তি নয়, সে সমগ্র মানব জাতির প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্য, তদুপরি তার ক্ষমতা অসীম। এই অসীম ক্ষমতায় সে তার পারিপার্শ্বিকতাকে জয় করার, তার সামাজিক গণ্ডীর মত ও সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করার সাহস অর্জন করল। প্রচলিত রীতিনীতির গণ্ডী পেরিয়ে বাঙ্গালী স্বাধীন হতে চাইল। এইভাবে বাঙ্গালী তার নিজের মধ্যে সমগ্র বিশ্বের মানবজাতির অস্তিত্ব ও শক্তি অনুভব করেছে। রবীন্দ্রনাথের 'প্রভাত-সংগীত' কবিতায় এই ভাবটি সুন্দরভাবে ধরা হয়েছে —

"জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।"

বাঙ্গালী যে শুধু শৃঙ্খলমুক্ত হল তা নয়, বাঙ্গালী আরো সদর্থক গুণের অধিকারী হল, তার জীবন হয়ে উঠল প্রাচুর্যময়। তার জীবন পরিপূর্ণভাবে সকলদিকে বিচ্ছুরিত হতে লাগল। কোন চিন্তা তাকে রোধ করতে বা বাধা দিতে পারল না।

আমি মৃণ্ময়, আমি চিন্ময়,
আমি অজর অমর অক্ষয়, আমি অব্যয়।

৪৭ তদেব, পৃ:পৃ: ১০০-১০২।
৪৮ তদেব, পৃ: ১০৮।

আমি মানব দানব দেবতার ভয়,
বিশ্বের আমি চির দুর্জ্জয়,
জগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,
আমি তাথিয়া তাথিয়া মাথিয়া ফিরি
এ স্বর্গ পাতাল মর্ত্ত্য।"[৪৯]

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে ব্যক্তিকে পরমপুরুষের সাথে অভিন্ন করে দেখার যে দৃষ্টিভঙ্গী হিন্দু দর্শনে রয়েছে, তার থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গী সূক্ষ্মভাবে পৃথক। আবার, 'গীতা'-তে ভগবান যেভাবে বিশ্বের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন বলে প্রতিপন্ন করেছেন তার থেকেও এ ভাব আলাদা। জার্মান দার্শনিক ফিক্‌টে *(Fichte)* যেভাবে 'অহং' এর ধারণা গড়ে তুলেছিলেন, যা সীমাকে অতিক্রম করার নিরন্তর প্রচেষ্টা — তার সঙ্গে এই ভাব সমান্তরাল।[৫০]

মানুষ আগে যে জগতে বাস করত তা ছিল দেবদেবীর দ্বারা অধ্যুষিত। কিন্তু এখন মানুষ নিজেকে নিয়ে নিমগ্ন হল। এখন সে প্রশ্ন করতে শুরু করল মানুষ কোথায় অবস্থিত, কোথায় সে যাচ্ছে?

"কি জানি শুধাই কারে, কোথায় যে যেতে চাই।
কি জানি কোথা কে ডাকে, ছুটেছি পাগল তাই,
কি জানি নূতন ভাষা প্রাণের ভিতরে ভাষে,
কি মধুর আলো এক আঁখির উপরে হাসে,
ভাষা সে মধুর ভাষা, আমিই বুঝি না ভাল,
আমি অন্ধপ্রায়, কিন্তু আলো সে উজ্জ্বল আলো।"[৫১]

মানুষ তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্রকে বেশী গুরুত্ব দিতে চাইল বলে যৌথ পরিবারে সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলার পুরানো মানসিকতা বদলে গেল। ফলে পারিবারিক সম্পর্কগুলির মধ্যে এল পরিবর্তন। সাহিত্যে এই পরিবর্তিত মানসিকতা ও তজ্জনিত পরিবর্তনের আভাস পাই এভাবে :

---

৪৯ কাজী নজরুল ইসলাম, "বিদ্রোহী"।

৫০ Priya Ranjan Sen, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩২৫।

৫১ কামিনী রায়, 'কোথায়' কবিতা, *আলো ও ছায়া* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত, বাণী রায় সম্পাদিত, কবি *চতুষ্টয়ী,* মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৭৩, আশ্বিন, ১৩৮৮, গ্রন্থে উদ্ধৃত কবিতাটি-সহ *আলো ও ছায়া* গ্রন্থটি সঙ্কলিত হয়েছে। উদ্ধৃত অংশটি পৃ: ৩২৫ এ আছে।

"এই পরিবারটির মধ্যে কোনও রকমের গোল বাধিবার কোনও সঙ্গত কারণ ছিল না — অবস্থাও স্বচ্ছল, মানুষগুলিও কেহ মন্দ নহে, কিন্তু তবুও গোল বাধিল।"[৫২]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংযোগে পুরুষ ও নারীর দেয়া-নেয়ার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল। "বাঙ্গালীরা ইউরোপীয় ও হিন্দু এই দুই ধারার সমন্বয়ে নরনারীর সম্পর্কের যে একটা নূতন ধারণা করিয়াছিল — যাহার প্রকাশ সমস্ত বাংলা সাহিত্য জুড়িয়া আছে এবং যে ধারণাকে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনেও অনেকটা কাজে পরিণত করিয়াছিল, উহা নূতন সাহিত্য, গান, রাজনৈতিক কার্যকলাপ বা ধর্মান্দোলনের মত বর্তমান যুগের বাঙ্গালীর একটা বড় কীর্তি।"[৫৩] যে অসীম ভদ্রতাবোধ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসসমূহে মেয়েদের চরিত্র এঁকেছেন তা বাঙলা সাহিত্যে অভূতপূর্ব। পরবর্তী লেখকরা তা অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর লেখায় মেয়েরা পুরুষদের অধীনস্থ হয়ে না থেকে গার্হস্থ্যের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এসে তাদের নর্মসহচরী হয়ে উঠেছিল।[৫৪] নারীর প্রতি এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ধরা পড়েছে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা গীতিনাট্যে। সেখানে নারী দেবী নয় — যাকে পূজার ছলে দূরে রাখা যায়, আবার সে ঘৃণার পাত্রী নয় যাকে সর্বদা অসম্মানে পিছনে রাখা যায়, সে একজন দরদী বন্ধু, যে সঙ্কটে ও দুঃখে পাশে এসে দাঁড়াতে পারে। এইভাবেই নারীকে পুরোপুরিভাবে বোঝা সম্ভব এবং তার ক্ষমতার পুরো বিকাশ সম্ভব।

"দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি' রাখিবে মাথায়, সে-ও আমি
নই, অবহেলা করি' পুষিয়া রাখিবে
পিছে সে-ও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর'
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।"[৫৫]

ঔপনিবেশিক ভারতে প্রকৃত বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগের বড়ই অভাব ছিল। ভারতে যেভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ঘটছিল তার দ্বারা পরীক্ষামূলক পদ্ধতির দ্বারা বিজ্ঞান বিষয়গুলি

---

৫২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "হালদার গোষ্ঠী"।

৫৩ নীরদ চন্দ্র চৌধুরী, *বাঙ্গালী জীবনে রমণী,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৭৩, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আশ্বিন ১৩৯৬, পৃ: ২০।

৫৪ Priya Ranjan Sen, পৃ:পৃ: ৩৩১-৩৩২।

৫৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "চিত্রাঙ্গদা"।

শিক্ষা করা সম্ভবপর ছিল না। তাই পাশ্চাত্য সংস্পর্শের ফলে লব্ধ যে নতুন জ্ঞান — তা যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যাই হোক না কেন—তা প্রযুক্ত হয়েছিল সমাজচিন্তা ও দর্শনের ক্ষেত্রে।[৫৬] ভারতে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংযোগের ক্ষেত্রে এটি একটি বড় ধরনের সীমাবদ্ধতা এতে কোন সন্দেহ নেই।

এশিয়ার মধ্যে বাঙ্গালীরা ছিল প্রথম সামাজিক গোষ্ঠী যাদের মানসিক জগৎ পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এসে রূপান্তরিত হয়েছিল। বাঙ্গালী জীবন এর ফলে এক নূতন চেহারা পেয়েছিল এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। পাশ্চাত্য অভিঘাতের প্রথম পর্যায়ে বাঙ্গালী আধুনিকতার ভগীরথরা প্রায় সকলেই পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করতেন।[৫৭] রামমোহন রায় লিখেছিলেন: "বর্তমানে অল্প কয়েকটি প্রদেশ ব্যতীত সমগ্র সাম্রাজ্য ব্রিটিশ ক্ষমতার অধীনস্থ এবং ইতিমধ্যেই এর শাসকদের বিচক্ষণ তত্ত্বাবধানের কিছু কিছু সুফল পাওয়া যাচ্ছে, এই শাসককুলের সাধারণ চারিত্রবৈশিষ্ট্য থেকে বোঝা যাচ্ছে ভবিষ্যতে শান্তি ও সুখ ন্যায্যভাবেই আশা করা যেতে পারে। পরবর্তী প্রজন্ম অবশ্য এই শাসনব্যবস্থার প্রকৃত সুফল সম্বন্ধে আরো ভালভাবে বলতে পারবে।"[৫৮] তাই রামমোহন চাইছিলেন, শুধু ইংরেজ নয় — অন্যান্য সমস্ত ভদ্র ও উন্নতমনা ইউরোপীয়দের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে ও সহযোগিতায় ভারতবাসীর বৈষয়িক এবং মানসিক চিন্তা-চেতনা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির সর্বতোমুখী বিকাশ ও উন্নতি ঘটুক। তাই ১৮২৮ সালের ১৮ই আগষ্ট তারিখে ক্রোফোর্ডকে লেখা একটি পত্রে রামমোহন এই মত প্রকাশ করলেন যে "মনে করা যাক কয়েকশত বছর পরে ইউরোপের সঙ্গে ক্রমাগত মেলামেশার ফলে ভারতীয়দের চরিত্রের উন্নতি ঘটেছে এবং তারা আধুনিক শিল্প ও বিজ্ঞানে, রাজনীতিতে এবং সাধারণ জ্ঞান অর্জন করেছে, এ কি সম্ভব যে তখনও তারা একটি অন্যায় ও দমনমূলক শাসন-ব্যবস্থার, যা

৫৬ তপন রায়চৌধুরী, পূর্বোল্লিখিত নিবন্ধ : পৃ: ৫৩।

৫৭ তদেব, পৃ: ৫৮।

৫৮ 'At present the whole empire (with the exception of a few provinces) has been placed under British power and some advantages have already been derived from the prudent management of its rulers from whose general character a hope of future quiet and happiness is justly entertained. The succeeding genertion will however, be more adequate to pronounce on the real advantages of this government'. ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত "*Brief Remarks Regarding Modern Encroachment on the Ancient Rights of Females according to the Hindoo Law of Inheritance*" গ্রন্থের ভূমিকায় রামমোহন এই মন্তব্য করেছেন। এই গ্রন্থটি The English Works of Raja Ram Mohun Roy ed. Kalidas Nag and Debajyoti Burman, Parts I-VI, Calcutta 1945-51, এই গ্রন্থাবলীর Part V -এ অন্তর্ভুক্ত। দিলীপ কুমার বিশ্বাস, রামমোহন সমীক্ষা, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৭।

তাদের সামাজিকভাবে অধঃপতিত করছে, কার্যকরীভাবে বিরোধিতা করার আত্মিক শক্তি লাভ করতে পারবে না?"[৫৯]

অক্ষয় কুমার দত্ত মনে করতেন যে যুক্তি ও সত্যের সমন্বয় ঘটিয়ে ইউরোপ পৃথিবীতে স্বর্গরচনা করেছে।[৬০] তাই "কর্তব্যানুষ্ঠান বিষয়িনী নীতি বিদ্যা" রচনা করতে গিয়ে তিনি "দম্পতীর পরস্পর ব্যবহার" কিরকম হওয়া উচিত তার উদাহরণ নিয়েছেন পাশ্চাত্য দাম্পত্য জীবন থেকে। অক্ষয় কুমার দত্ত লিখেছেন : 'সক্স'-কোবর্গ নিবাসী লিওপোল্ড ও তাঁহার সহধর্মিণী শার্লট এ বিষয়ের উত্তম উদাহরণস্থল। ..... (তাঁহারা) যেমন একত্র আমোদ প্রমোদ অধ্যয়নাদি করিতেন, সেইরূপ একত্র ধর্মানুষ্ঠানও করিতেন। তাঁহারা নিরূপিত সময়ে পরিবারস্থ অন্য সকলের সহিত একত্র মিলিত হইয়া তদ্‌গান্তঃকরণে জগৎপতি জগদীশ্বরের আরাধনা করিতেন। স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, এবং উভয়ে সুশিক্ষিত ও এক-ধর্মানুরক্ত হওয়া কিরূপ সুখের বিষয়, গুণসাগর লিওপোল্ড ও তাঁহার গুণবতী ভার্যা শার্লট্ তাহার সুন্দর দৃষ্টান্তস্থল।"[৬১]

তবে এই যে বিদেশী শাসন ও সভ্যতা সম্পর্কে মুগ্ধতা তার বিপরীতে কিছু সামাজিক ও মানসিক বাধা কাজ করেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষিত বাঙ্গালীদের নতুন ধারণা এবং দৃষ্টিভঙ্গীর উৎস ছিল এক ঔপনিবেশিক সরকার, যা তাদের রাজনৈতিকভাবে পরাধীন করে রেখেছিল এবং যা তাদের একই সঙ্গে আকর্ষণ করত ও দূরে ঠেলে দিত। ফলে কখনো বা ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে মনে হয়েছে যে তা ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে অনেক উঁচুদরের আবার কখনো বা মনে হয়েছে যে ভারতীয় সংস্কৃতির যে ঐতিহ্য রয়েছে তা অনেক সমৃদ্ধ। বিশেষ করে ধর্মীয় বিশ্বাস এবং গার্হস্থ্য আচরণের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য আদর্শকে সর্বদাই অনুসরণযোগ্য বলে মনে করা হয়েছে, আবার আত্মসমীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেছে যে নিজেদের ঐতিহ্যকেই শ্রেষ্ঠতর বলে মনে হয়েছে।[৬২] ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের রচনার মধ্যে এই টানাপোড়েন চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। "(১) ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বৃত্তিবিহীন হইয়া অন্নচিন্তায় বিব্রত হইয়াছেন। তাঁহারা শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপন পূর্বের ন্যায় মনঃসংযোগ সহকারে নির্বাহ করিতে পারেন না। সুতরাং

৫৯ "Supposing that some 100 years hence the Native character becomes elevated from constant intercourse with Europeans and the acquirements of general and political knowledge as well as modern arts and science, is it possible that they will not have the spirit as well as the inclination to resist effectually any unjust and oppresive measures serving to degrade them in the scale of society". তদেব।

৬০ তপন রায়চৌধুরী, পূর্বোল্লিখিত নিবন্ধ, পৃ: ৫৮।

৬১ অক্ষয় কুমার দত্ত, ধর্মনীতি, প্রথম ভাগ, নবম মুদ্রণ, কলিকাতা, দি নিউ সংস্কৃত প্রেস, ১৮৮০ পৃ:পৃ: ৯০-৯১।

৬২ Tapan Roychoudhury, *Europe Reconsidered : Perceptions of the West in Nineteenth Century Bengal*, Oxford University Press, Second Impression, 1989, Preface, p. XI.

শাস্ত্রীয় বিধির সম্বন্ধে তাঁহার নিজের এবং জনসাধারণের অজ্ঞতা জন্মিয়া যাইতেছে। (২) বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাব বৃদ্ধি হওয়াতে শাস্ত্রীয় বিধির প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা জন্মিতেছে। এখন শৈশবাবধি যে ইংরাজী বিদ্যার শিক্ষা হয়, তাহাতে শাস্ত্রীয় বিধির কিছুমাত্র উল্লেখ থাকে না; প্রত্যুত সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে দেশীয় শাস্ত্রজাতের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশই থাকে। সুতরাং শিক্ষার কাল হইতেই লোকের মনে শাস্ত্রাচারের প্রতি অবিশ্বাস জন্মিয়া যায়।"[৬৩] আশ্চর্য এই যে বিজাতীয় অর্থাৎ ইউরোপীয় শিক্ষার কুফল দূর করার জন্য ঐ "বিজাতীয় শিক্ষা"র সহায়তা গ্রহণে ভূদেব পরাঙ্মুখ নন।

"যেমন মলিন বস্তুর দ্বারা বলবৎ ঘর্ষণে তৈজসাদির পূর্ব্ব-মলিনতা বিদূরিত হয়, তেমনি যে বিজাতীয় শিক্ষা আচার-মালিন্য জন্মায়, তাহারই সম্যক অনুশীলনে ঐ মালিন্য অপনীত হইবার সম্ভাবনা। ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্যার বিশেষ অনুশীলনের দ্বারা স্বদেশীয় শাস্ত্রাচারের সারবত্তা বহু পরিমাণে যুক্তিমুখেও সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে।"[৬৪] যে সমস্ত গুণ ইংরাজদের এদেশে রাজনৈতিক প্রাধান্য দিয়েছে সেই সমস্ত গুণ অনুসরণ করেই বাঙ্গালীরা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারবে — এই মত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ভূদেব লিখলেন :

"যে ইংরাজ জাতি এক্ষণে ভারতবর্ষে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রাবল্যের প্রকৃত হেতু কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলেই দৃষ্ট হয় যে ঐ প্রাধান্যের হেতু অনাচার বা অত্যাচার নহে, উহার হেতু তাঁহাদের স্বদেশের ও স্বধর্ম্মের উপযোগী আচার রক্ষা নিবন্ধন শরীর এবং মনের দৃঢ়তা এবং পটুতা এবং পরস্পর ঐকান্তিক সমানুভূতি। আমাদেরও শাস্ত্রোক্ত আচারগুলির উদ্দেশ্য বিচার করিলে সুস্পষ্টরূপেই অনুভূত হয় যে, শাস্ত্রাচার দ্বারা শরীরের সারবত্তা, তেজস্বিতা এবং পটুতা জন্মে এবং মনে উদারতা এবং সাত্ত্বিকতা সম্বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং শাস্ত্রোক্ত আচার রক্ষাদ্বারাই এতদ্দেশীয় জনগণ ইংরাজদিগের অপেক্ষাও উচ্চতর গুণের অধিকারী হইতে পারেন।"[৬৫]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে হিন্দু ঐতিহ্য ও বিদেশী সভ্যতা — এই দুইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা হত। উভয় ক্ষেত্র থেকেই শ্রদ্ধার্হ উপাদানগুলি বেছে নেওয়া হত আর উভয় সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধা পাশাপাশি সহাবস্থান করত। প্রথমটি বিকশিত হয়েছিল সমাজের উন্নতি করার মানসিকতার মধ্য দিয়ে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ঐতিহ্যের প্রতি ক্রমবর্ধমান গর্ববোধের মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় ধরনের শ্রদ্ধার উৎস ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি এক বিস্ময়ের অনুভূতি যে ভারত এক বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের অংশ এবং এই বিশ্বাস যে ব্রিটিশ সরকারের উদার পরিচালনায় সে উন্নতির পথে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হবে।

৬৩ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আচার প্রবন্ধ, হুগলী, ১৩০১ সাল, পৃ: ১।

৬৪ তদেব, পৃ: ২।

৬৫ তদেব, পৃ:পৃ: ২-৩।

"যখন এশীয় দেশগুলি পাশ্চাত্য প্রযুক্তি এবং ধারণা গ্রহণ করেছিল তখন তাদেব নিজস্ব পদ্ধতি তারা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করেনি। তখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ফলে পুরানো রীতির চিন্তাধারার পাশাপাশি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠেছিল। কিন্তু যে পরিবর্তন ঘটেছিল তার পূর্ণতা বা গতি যাই হোক না কেন এশীয় সমাজসমূহ এমন এক জীবনরীতি সৃষ্টি করেছে বা করছে যা তাদের আধুনিক বিশ্বসমাজে অংশগ্রহণের জন্য সম্পূর্ণ পারদর্শী করে তুলেছে।"[৬৬]

ঊনবিংশ শতকের শেষ তিন দশকের বাংলা সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাস পর্যালোচনা করে প্রায় অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন অপর এক ঐতিহাসিক।[৬৭] দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়[৬৮] নামক এক সমালোচক এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে যখন একজন সম্পন্ন বাঙালী ইংরাজী শিক্ষা লাভ করে তখন তার সামনে দুটি পৃথক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উন্মোচিত হয়। এর ওপর যদি সে সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করতে পারে তবে সে তৃতীয় একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচয় লাভ করতে পারে। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন এমন একজন লেখক যিনি ইউরোপীয় পদ্ধতি অবলম্বন করে সংস্কৃত ঐতিহ্যের ব্যাখ্যার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের বিশ্লেষণ করেছিলেন ও নিজের মধ্যে ইউরোপীয় মনীষা ও ভারতীয় ঐতিহ্যিক মনীষার সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন।[৬৯]

তবুও ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে বাংলাদেশের সমাজে বিদেশী ভাবধারার যে তরঙ্গাঘাত শুরু হয়েছিল, তাকে উপেক্ষা করার সাধ্য বাঙ্গালী সমাজের ছিল না। ফলে অনিবার্যভাবে মানসিক জগতে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা দিল। বোঝা গিয়েছিল যে পুরনো সঞ্চয়, পুরনো বিশ্বাস নিয়ে দিন অতিবাহিত করার সময় ফুরিয়ে গেছে। এক নতুন বিশ্বাস, নতুন জীবনবোধ নিয়ে এল এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। ফলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিশ্বাসের জগতে এক সর্বব্যাপী পরিবর্তনের সূচনা হল। যার আলো অন্দরমহলের ভেতরে গিয়েও পড়ল। যে অবরুদ্ধ মেয়েরা এতদিন

৬৬ "When Asian countries 'adopted" Western techniques and ideas, they did not entirely relinquish their ways. There was super-imposition of institutions, various forms of syncretism, new attitudes arising side by side with ancient modes of thought. But whatever the fulness of change that took place, or its pace, Asian societies have created, or are creating a way of life that enables them to participate fully in a modern world community." G. S. Metraux, "Preface" *The New Asia : Readings in the History of Mankind* (New York : New American Library, 1965), পৃ: X quoted in David Kopf, *British Orientalism and Bengal Renaissance*, Cambridge University Press, London, ১৯৬৯, পৃ: ২৭৭।

৬৭ Lou Raate, *The Uncolonised Heart*, Orient Longman, 1995, যত্রতত্র।

৬৮ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, "জাতীয় সাহিত্যের আবশ্যকতা কি?", সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, ১৮৯৪, পৃ: ৪৪, উদ্ধৃত, Lou Raate, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ১৫।

৬৯ Lou Raate, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ২২।

কালাতিপাত করছিল সবার চোখের আড়ালে এখন তারাও এই নতুন দৃষ্টির আলোতে উদ্ভাসিত হল।

এর ফলে আলোচ্য শতকে বাঙ্গালী সমাজে যে পরিবর্তনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হল তার কেন্দ্রভূমিতে অধিষ্ঠিত ছিল মেয়েরা। কারণ ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ঘটল। তাই সমকালীন সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ে নতুন করে চিন্তা শুরু করেছিলেন সমাজ সচেতন ব্যক্তিরা। এই চিন্তাই নির্দেশ করেছিল যে বাঙ্গালী সমাজে মেয়েদের স্থান অত্যন্ত অবহেলিত। কারণ বিদেশী সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হবার ফলে ভিনদেশী সমাজে মেয়েদের অপেক্ষাকৃত উন্নত স্থান বাঙ্গালীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বিদেশী পর্যবেক্ষকরা যাঁরা এদেশে এসেছিলেন তাঁদের লেখাতে এদেশের সমাজে মেয়েদের দুরবস্থার ওপর ব্যাপক আলোকপাত ঘটেছিল। এভাবে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ধীরে ধীরে মেয়েদের সম্বন্ধে চিন্তা করতে শুরু করে দেখলেন যে হিন্দু সমাজকে অবক্ষয়ের পথে নিয়ে গেছে মেয়েদের প্রতি ঔদাসীন্য এবং অবহেলা।

প্রতীচ্য ভাবনা ও প্রথম জাগরণ (১৮০৭-১৯০৫)

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হিন্দু সমাজের অবক্ষয়ের চেহারাটি ছিল সংশয়াতীত। সারা বিশ্বের প্রগতির সঙ্গে এই মৃতপ্রায় সমাজটির কোন যোগ ছিল না। শিক্ষার পদ্ধতি ছিল গতানুগতিক ও নিষ্প্রাণ। এর দ্বারা যুক্তিবোধের থেকে অন্ধবিশ্বাস লালিত হত বেশী। এই সমস্তকিছুর প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল ব্যক্তিগত ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে।[১০] এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন ঘটেছিল নারীদের প্রতি ঔদাসীন্যে আর অবহেলায়। স্বাভাবিকভাবেই মহিলাদের নানা সামাজিক উৎপীড়নের বলি হতে হয়েছিল।

এই উৎপীড়নের একটি স্পষ্ট ও নির্ভীক চিত্র অঙ্কন করেছিল "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকা। একা কৌলীন্য প্রথাই যে মহিলাকুলকে কি কলঙ্কপাথারে নিমজ্জিত করেছিল তার বর্ণনা করতে গিয়ে এই পত্রিকাটি কোন মোলায়েম ভাষার আস্তরণ দিয়ে বাস্তব চিত্রকে আবৃত ও অস্পষ্ট করার চেষ্টা করেনি।[১১] তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নির্দ্বিধায় মন্তব্য করল "এ দেশের কোন কোন বর্ণের মধ্যে উক্ত রীতির (কৌলীন্য প্রথা) এত প্রাবল্য আছে, যে ঐ বর্ণের এক এক ব্যক্তি শতাধিক নারীর পাণিগ্রহণ করিয়া থাকে, উহাদিগের মধ্যে অনেকে বিবাহকে একপ্রকার উপার্জনের পথ জ্ঞান করে। উহাদিগের আচার ব্যবহার দেখিলে বোধ হয় যে অর্থোপার্জন ভিন্ন উদ্বাহের অপর কোন তাৎপর্য উহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই।[১২] প্রকৃতই এই কৌলীন্য

১০ *British Paramountcy and Indian Renaissance, Part II,* পূর্বোক্ত, পৃ: ২১-২২।

১১ বিনয় ঘোষ সম্পাদিত, সাময়িক পত্রে বাংলার সামজচিত্র ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭৮, ভূমিকা, পৃ: ৫৮।

১২ "বহুবিবাহ" তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা চৈত্র ১৭৭৭ শক, ১৫২ সংখ্যা, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, পূর্বোক্ত ২য় খণ্ড, পৃ:পৃ: ১৭১-১৭২।

প্রথার দৌরাত্ম্যে বিবাহের মতো একটি পবিত্র সামাজিক অনুষ্ঠান শেষপর্যন্ত ব্যবসায়ে পর্যবসিত হয়েছিল। এরই ফলে সৃষ্টি হয়েছিল বালবৈধব্যের মতো একটি করুণ সমস্যা।[৭৩] শুধু কি তাই? "বিধবা বিবাহ প্রতিষেধ ও বল্লাল প্রতিষ্ঠিত কৌলীন্য মর্য্যাদা" এই দুই কুরীতি সমাজকে ব্যভিচারে পরিপূর্ণ করে তুলেছিল। তাই কলিকাতা নগরীতে "বেশ্যা ও জারজের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। বেশ্যাগৃহের অশুদ্ধ উল্লাসধ্বনি গৃহিণীগণের অন্তঃপুর মধ্যেও প্রবেশ করিতেছে এবং জারজদিগের লজ্জা ও সঙ্কোচ দূরীভূত হইয়া সদ্বংশজাত ভদ্র সন্তানদিগের অবমাননা করিতেছে।"[৭৪]

সতীদাহ বাল্যবিবাহ বা কৌলীন্য প্রথার মতো সামাজিক অন্যায় ও ব্যভিচার তখন যে জনজীবনে কতটা দৃঢ়মূল ছিল তা বোঝা যায় যখন সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণ আইন রদ করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে ১১৪৬ জনের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদনপত্র পেশ করা হয়েছিল। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ১২০ জন পণ্ডিত ও বহু সমাজ শিরোমণিও ছিলেন।[৭৫]

শুধু তাই নয়, মহিলাদের অবস্থার কোনরকম উন্নতি সাধনই পুরুষদের অভিপ্রেত ছিল না। বঙ্গদর্শন পত্রিকায় "প্রাচীনা ও নবীনা" প্রবন্ধে লেখা হচ্ছে — "আবার দিনকতক ধূম পড়িল, স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার সংস্কার কর, স্ত্রীশিক্ষা দাও, বিধবার বিবাহ দাও, স্ত্রীলোককে গৃহপিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া উড়াইয়া দাও। বহু বিবাহ নিবারণ কর এবং অন্যান্য প্রকারে পাঁচী, রামী, মাধীকে বিলাতি মেম করিয়া তুল।"[৭৬]

বলা বাহুল্য এই পরিস্থিতিতে নারীদের শিক্ষার মাধ্যমে আলোকপ্রাপ্ত করার কথা ছিল অচিন্ত্যনীয়। তাই, স্বাভাবিকভাবেই পাদ্রী অ্যাডামস্ লক্ষ্য করেছিলেন যে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়টিই ছিল অজানা। তাই কোন নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান যে থাকবে না তা বলার অপেক্ষা রাখে না। স্ত্রীশিক্ষার এই সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীনতার পশ্চাতে ছিল এক অদ্ভুত কুসংস্কারজাত বিশ্বাস যে বিদ্যাবতী নারীর বৈধব্য অখণ্ডনীয়। তাই অ্যাডামস্ দেখেছিলেন যে গোটা মুর্শিদাবাদ জেলায় মাত্র ৯ জন মহিলা লিখতে, পড়তে, হস্তাক্ষর পড়তে ও স্বাক্ষর করতে জানেন। অন্যান্য অঞ্চলের মহিলারা ন্যূনতম লেখাপড়াও জানতেন না। তবে, কোন কোন জমিদার পরিবারে বা কোন বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে নারীশিক্ষার প্রচলন ছিল।[৭৭]

৭৩ সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, ভূমিকা, পৃ: ৫৮।

৭৪ তদেব।

৭৫ *British Paramountcy and Indian Renaissance, Part II*, পূর্বোক্ত, পৃ: ২২।

৭৬ বঙ্গদর্শন পত্রিকা, ৩য় বর্ষ (১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা ৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফাল্গুন, ১৩৩৬, পৃ: ২৪৯।

৭৭ Adam's Report, *1838 — quoted in British Paramountcy etc.* পূর্বোক্ত, পৃ: ১৯।

এই রকম পরিস্থিতি সত্ত্বেও খ্রীষ্টান মিশনারীরা ১৮১৩ সাল থেকেই স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কারণ, তাঁদের ধারণা ছিল যে হিন্দুনারীদের মন থেকে পৌত্তলিকতা আর কুসংস্কার দূর করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। যাই হোক্, তাঁরা নারীশিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় যে কোনও তথাকথিত উচ্চবর্ণের বালিকারা এখানে পড়তে এল না। প্রথম কুড়ি বৎসর যাবৎ কেবলমাত্র বেদে, ব্যাধ, বৈরাগী, বাগদী শ্রেণীর, এমনকি দেহোপজীবিনীর মেয়েরা মিশনারীদের স্কুলে প্রাথমিক লেখাপড়া শিখত। এই ছাত্রীদের নগদ অর্থ পুরস্কার দিয়েও বিদ্যালয়ে নিয়মিত আসতে বাধ্য করা যেত না। আবার, ন'দশ বছর বয়স হলেই এদের বিদ্যালয় থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া হত। এদের উপস্থিতি হেতু ভদ্রপরিবারের মেয়েরা কখনো বিদ্যালয়ের সীমানা অতিক্রম করত না।[৭৮]

মিশনারীদের শিক্ষাদানের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল সে সম্বন্ধে "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় লেখা হল এই খেদোক্তিসহ যে স্ত্রীশিক্ষার গতি কোন্‌দিকে যাচ্ছে তাতে বাঙ্গালী স্ত্রীগণের কি উপকার সাধিত হচ্ছে তা নিয়ে কেউ চিন্তিত হচ্ছেন না অথচ "ইহা অপেক্ষা গুরুতর সামাজিক তত্ত্ব আর নাই।"[৭৯] লেখক অভিযোগ তুলেছেন যে "আত্মপক্ষপাতী পুরুষগণ, যতদূর আত্মসুখের প্রয়োজন, ততদূর পর্যন্ত স্ত্রীগণের উন্নতির পক্ষে মনোযোগী, তাহার অতিরেক তিলার্দ্ধ নহে।"[৮০] এই অল্পবিদ্যার ফল হয়েছে এই যে "প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রঘটিত ধর্ম্মের মূলের অলীকত্ব" সম্বন্ধে বোধ জন্মায় কিন্তু "প্রাকৃতিক যে সত্যধর্ম্ম" তা চিনবার ক্ষমতা জন্মায় না। তাই লেখকের জিজ্ঞাসা "আপনারা বালিকাদিগের হৃদয় হইতে প্রাচীন ধর্মবন্ধন বিযুক্ত করিতেছেন তাহার পরিবর্ত্তে কি সংস্থাপন করিতেছেন?"[৮১]

এইরকম অবস্থার মধ্যে একটু অন্যরকম সুর শোনা গেল ১৮২২ সালে প্রকাশিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার প্রণীত "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক" গ্রন্থে। গৌরমোহন বলতে চাইলেন যে প্রাচীনকালে উচ্চবর্ণের হিন্দুনারীরা শিক্ষালাভ করতেন। তাই, স্ত্রীশিক্ষা ক্ষতিকারক বা অসম্মানজনক তো নয়ই উপরন্তু তা নৈতিকতা ও মননশীলতার বিকাশে এবং গার্হস্থ্য শান্তি ও সুখ প্রতিবিধানের ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

১৯শ শতকের গোড়ায় মিশনারীরা যা ভেবেছিলেন বা "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক" প্রবন্ধে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার যে মত প্রকাশ করেছিলেন "সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তার প্রায় প্রতিধ্বনি শোনা গেল। "স্ত্রীবিদ্যা" নামক এই প্রবন্ধটিতে লেখক অকপটে স্বীকার করেছেন "...... এদেশের অবিদ্যারা বিদ্যাবতী না হওয়াতেই সকল প্রকারে

৭৮ তদেব, পৃ:পৃ: ২৮৫-২৮৬।

৭৯ বঙ্গদর্শন পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৫০।

৮০ তদেব, পৃ: ২৫১।

৮১ তদেব, পৃ: ২৫৪।

অনিষ্ট হইতেছে। দ্বেষ, হিংসা, দ্বন্দ্ব, ক্রোধ, অহঙ্কার, বিচ্ছেদ, আলস্য, মূর্খতা এবং দুঃখ প্রভৃতির এদেশে এত আধিক্য শুদ্ধ স্ত্রীজাতির দোষেই কহিতে হইবেক।"[৮২]

তাঁর এইরকম ধারণা যে ভিত্তিহীন নয় তাঁর প্রমাণ দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন — একটি পাঁচ বছরের শিশুকন্যা তার অনিশ্চিত ও অদেখা সতীনের মৃত্যুকামনা করে ব্রত করে ও এই মন্ত্রোচ্চারণ করে —

"হাতা হাতা হাতা
খা সতীনের মাথা,
বেড়ী বেড়ী বেড়ী
সতীন বেটী চেড়ী।"[৮৩]

লেখক স্বপ্ন দেখেছেন "সেই দিবস কি সুখের দিবস হইবেক — যে দিবসে জননী এবং ভগিনী পুত্র এবং সহোদরগণকে কুনীতি শিক্ষাদানের বিনিময়ে পুস্তক ধরিয়া বিদ্যা বিষয়ের উপদেশ প্রদান করিতে থাকিবেন।" লেখকের আত্মবিশ্বাসী ভবিষ্যদ্বাণী যে স্থৈর্যে ধৈর্যে নারী পুরুষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা তারা যদি বিদ্যাশালিনী হন তবে সংসারের অতীব মঙ্গল কারণ তাহলে "পুরুষেরা সর্বদা সুনীতির বর্ত্মে ভ্রমণ করিতে পারিবেন।"[৮৪]

যাদের শিক্ষাদান বিষয়ে এত ভাবনাচিন্তা তর্কবিতর্ক তাঁরা কি ভাবছেন? "স্ত্রীবিদ্যা" প্রণেতা তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন এক বিদ্যানুরাগিণী বালিকার।[৮৫] লেখক ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু এই বালিকাকে ছন্দ বন্ধনে একটি প্রশ্ন দিয়েছিলেন —

"লেখাপড়া নাহি শিখে এদেশের মেয়ে
কোন্ অংশে ছোট তারা পুরুষের চেয়ে?"

বালিকাটি যে উত্তর দিয়েছিল তা-ও ছন্দে ধৃত। এতে সে লেখাপড়া শেখার সুফল বর্ণনা করে বলেছে যে—

"লেখাপড়া শেখে যেই প্রফুল্ল হৃদয়,
না শিখিলে লেখাপড়া অন্ধ হয়ে রয়।"

লেখাপড়া না শিখেই যে মেয়েদের যত অসম্মান তা-ও সে উপলব্ধি করেছে —

৮২ "সংবাদ প্রভাকর", ১০ই মে, ১৮৪৯, বিনয় ঘোষ সম্পাদিত, *সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র* — ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃ: ৩০৬।

৮৩। তদেব।

৮৪। তদেব।

৮৫। তদেব।

"বিদ্যা না শিখিলে রামা পশুর সমান,
অবলা বলিয়া লোক নাহি রাখে মান।"

তবে নারীর মর্যাদা রক্ষায় পুরুষেরা যে ব্যর্থ নিজেদের দোষে তা-ও এই বালিকাটির অবোধ্য থাকেনি —

"মেয়ে বিনে পুরুষ তো না হয় কখন
তবে কেন মেয়েদের না করে যতন
মেয়ে বলে পুরুষেতে করয়ে হেলন
ভেতরের গুণ তার না করে গ্রহণ।"[৮৬]

১৮৪৯ সালের ৭ই মে উত্তর কলিকাতার সুকিয়া স্ট্রীটে শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা জন এলিয়ট ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। এই সংবাদটি অত্যন্ত আলঙ্কারিক ভাষা প্রয়োগে ঘোষণা করল ঐ একই দিনে প্রকাশিত "সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকা।[৮৭]

এই উপলক্ষ্যে উদ্বোধনী ভাষণে বেথুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলেন এই-ভাবে — "বঙ্গ দেশের লোকেরা ৩০ বৎসর কাল শিক্ষণ করিয়া যে প্রকার উপকৃত ও তম্মর্মজ্ঞ হইয়াছে, তাহাতে অপর অর্দ্ধাংশে বিদ্যাভ্যাস অনতিবিলম্বেই প্রয়োজনীয় হইবেক ....।"[৮৮] বেথুন আরো বলেছিলেন যে শিক্ষিত পুরুষরা শীঘ্রই "বিদ্যা রসগ্রাহী হইয়া গুণযুক্তা সঙ্গি নীগণের অভাব বুঝিতে পারিবে।" শুধু তাই নয়, "এক জাতি অপর জাতি হইতে যত অধিক সভ্য হয় ততই তাহাদিগের অঙ্গনাগণ অধিক বিদ্যানুরাগিণী ও সভ্যা ভব্যা হইতে পারে।"[৮৯]

স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য কি? "বালক বালিকাগণের যখন বুদ্ধির স্ফূর্তি হইতে থাকে তখন যে মাতার অধীনে তাহারা রক্ষিত হয়, সেই জননী দ্বারাই সৎজ্ঞানের উপদেশ পাইয়া মহৎ ও সৎ হইতে পারে, অতএব স্ত্রীগণের স্বভাবগুণে এতদ্দেশীয় লোকেরাও সচ্চরিত্র হইবেন বিচিত্র কি ...।"[৯০]

বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনার প্রস্তাব সমাপন করে বেথুন নিজেই মনে করলেন যে "এখানে কি প্রকার বিদ্যাশিক্ষা হইবে আমার তাহাও প্রকাশ করা উচিত।" তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে অন্যান্য সরকারী বিদ্যালয়ের মতো এখানে কোনরকম ধর্মচর্চা হবে না।[৯১] "বঙ্গভাষানুশীলনই এখানকার

৮৬ তদেব।
৮৭ তদেব পৃ: ৩০৬।
৮৮ সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার রচনা সংকলন, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র — প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩০৪।
৮৯ তদেব।
৯০ তদেব।
৯১ তদেব।

মূল শিক্ষা হইবেক তবে গরিষ্ঠগুণ বিবেচনায় বিশেষতঃ পিতামাতার সম্মতিক্রমে ইহার পর ইংরাজী শিক্ষা হইতে পারিবেক।"[৯২] এছাড়াও শেখানো হবে "সহস্র প্রকার শিল্পবিদ্যাদি" যার দ্বারা একাদিক্রমে গৃহের শোভা বৃদ্ধি পাবে এবং "সৎকার্যে সতত প্রবর্ত্ত" থেকে কালযাপন করা যাবে।

এর আগে দেখা গেছে যে মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে মেয়েরা বিশেষত "ভদ্রকুলজাত" মেয়েরা পড়তে যাচ্ছে না। রমেশচন্দ্র মজুমদার এর কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন মিশনারীদের ধর্ম প্রচারের বাড়াবাড়ি, মেয়েদের নয়-দশ বছর হতে না হতেই তাদের বিদ্যালয় থেকে ছাড়িয়ে আনা, তথাকথিত নিম্নবর্ণের এমনকি দেহপসারিণীকুলের মেয়েদের উপস্থিতি ইত্যাদি।[৯৩]

এই পরিস্থিতিতে বেথুন স্কুল হল সরকারী তরফে প্রথম প্রচেষ্টা যেখানে উপরোক্ত অসুবিধাগুলি মোচনের চেষ্টা করা হল। এ যে কেবল অনুমান নয় তা প্রমাণিত হয় বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার সাত বৎসর পরে "সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন দ্বারা। বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক কমিটি এই মর্মে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে "বালিকারা যখন বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকে, প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ সভাপতির স্পষ্ট অনুমতি ব্যতিরেকে, নিযুক্ত পণ্ডিত ভিন্ন অন্য কোন পুরুষ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পান না।" সুতরাং, বাঙালী রমণীর চারিত্রিক শুচিতা লঙ্ঘিত হবার কোন আশঙ্কা ছিল না। "ভদ্রপরিবারের মেয়েদের" যাতে স্পর্শদোষ না ঘটে তার জন্য "যাবৎ কমিটির অধ্যক্ষদের প্রতীতি না জন্মে অমুক বালিকা সদ্বংশজাতা এবং যাবৎ তাঁহারা নিযুক্ত করিবার অনুমতি না দেন তাবৎ কোন বালিকাই ছাত্ররূপে পরিগৃহীত হয় না।"[৯৪]

কিন্তু এত করেও স্ত্রীশিক্ষা ও রমণীকুলের ওপর এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কি হতে পারে তা নিয়ে সংশয়, সন্দেহ, আশঙ্কা ও উদ্বেগ দূর করা যায়নি। "সংবাদ ভাস্কর" পত্রিকায় একটি চিঠিতে লেখা হচ্ছে যে বেথুন সাহেব "ভদ্র বালিকাদিগের কলেজে বিদ্যাশিক্ষার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন" এর ফলে "বালিকাদিগের ভীরুতা ও লজ্জাশীলতার অভাব হইবে এবং বিবাহকালে পিতা ভ্রাতাদির মনোনীত পাত্রে চিত্ত প্রসন্ন না হইলে অনায়াসে প্রতিবাদ করিবে এবং যৌবনকালে বিলাতীয় সভ্য ব্যবহারানুরূপ পুরুষের সহিত পত্রাদি প্রসক্তি, কথোপকথন, পথভ্রমণ, সহভোজন ইত্যাদি কার্যে যত্নবতী হইবে ....।"[৯৫]

---

৯২ তদেব।

৯৩ *British Paramountcy and Indian Renaissance, Part-II*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪।

৯৪ সংবাদ প্রভাকর ১৮৫৬ ইং, ১.১০.১২৬৩ বঙ্গাব্দ, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৬৫।

৯৫ সম্বাদ ভাস্কর, ২৯শে মে ১৮৪৯ খ্রী., সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা ১৯৮০ পূর্বোক্ত, পৃ: ৪০৬।

এর বহু পরে "তত্ত্ববোধিনী" লিখছে "যে পর্য্যন্ত না অন্তঃপুর শিক্ষাপ্রণালী বিশিষ্টরূপে অবলম্বিত হইতেছে সে পর্য্যন্ত আমাদিগের দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিশেষ ফলোপধায়িনী হইবে এমন আশা করা যাইতে পারে না।"[৯৬] বালিকা বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রীরা কন্থা সীবন অপমানের কার্য্য জ্ঞান করে," উপরন্তু "পাকক্রিয়ার প্রতি গৃহস্থের রমণীদিগের অবস্থা শোচনীয় বলিতে হইবে।"[৯৭]

আবার, এর বিপরীত মতও দেখতে পাওয়া যায়। উদাহণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে "সংবাদ ভাস্কর" পত্রিকার সম্পাদকীয়টি। এতে একাধিক পরিবারের সনাম উল্লেখ রয়েছে যেখানে মেয়েরা শিক্ষাপ্রাপ্তা হওয়া সত্ত্বেও পতির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতেন না। বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে হরসুন্দরী দাসী (ঁসুখময় রায়বাহাদুরের পুত্র ঁশিবচন্দ্রের কন্যা) তাঁর স্বামীকে যদি হরসুন্দরী গ্রন্থ পাঠ করতে বলতেন তবে ঐ ব্যক্তি লজ্জিত হইয়া স্ত্রীর নিকট হইতে পলায়ন করিতেন" কারণ "ইনি পুস্তক পাঠ করিতে জানিতেন না।"[৯৮]

অবশ্য স্ত্রীশিক্ষার সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছ হতে শুরু করেছিল বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার বছর দুয়েকের মধ্যেই। 'সর্বশুভকরী' পত্রিকা নামে এক স্বল্পায়ু সাময়িক পত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতে অনামা লেখক প্রথমে স্ত্রীশিক্ষা বিরোধীদের অভিযোগগুলি উল্লেখ করেছেন। তারপর পর্যায়ক্রমে তার উত্তর দিয়েছেন। অভিযোগগুলি সংখ্যায় ছিল পাঁচটি। এর মধ্যে চতুর্থ ও পঞ্চম অভিযোগ দুটি এই নিবন্ধের পক্ষে প্রাসঙ্গিক। চতুর্থ অভিযোগটি ছিল এইরকম যে স্ত্রীজাতিকে শিক্ষা দিলে সে "স্বেচ্ছাচারিণী ও মুখরা হইবেক, বিদ্যার অহংকারে মত্ত হইয়া পিতা মাতা ভর্ত্তা প্রভৃতি গুরুজনকে অবজ্ঞা করিবেক এবং পরিশেষে স্বয়ং পতিত হইবেক ও স্বকীয় পবিত্রকুলকে পতিত করিবেক।"[৯৯]

এর উত্তরে "সর্বশুভকরী" পত্রিকার লেখক বলছেন যে "স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ সুশীলা বিনয়বতী ও লজ্জাবতী ইহাদের তো কথাই নাই। বিদ্যাভাস করিলে নিতান্ত উদ্ধত অবিনীত ও চঞ্চল ব্যক্তিরাও একান্ত বিনীত, শান্ত ও সুধীর হইবে সন্দেহ নাই।"[১০০] "দুর্বিনয় দোষ ও অধর্ম্মপ্রবৃত্তিরূপ মহারোগের শান্তি নিমিত্ত বিদ্যাই একমাত্র মহৌষধ। .... অতএব বিদ্যালোক

৯৬ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৮ শক, ১৮৭৭ ইং, ৩৯৪ সংখ্যা, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত পৃ: ৪৪০।

৯৭ তদেব, পৃ: ৪৪১।

৯৮ সম্বাদ ভাস্কর, ২২ সংখ্যা, ৩১শে মে, ১৮৪৯ খ্রী., সম্পাদকীয়, *সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, ৩য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪০৯।

৯৯ সর্বশুভকরী পত্রিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা, আশ্বিন মাস, ১৭৭২ শক (১৮৫১ ইং), *সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, ৩য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫৪২।

১০০ তদেব, পৃ: ৫৪৭।

সম্পন্ন কি পুরুষ কি স্ত্রী কেহই দুশ্চরিত্র ও অধর্মপরায়ণ হইতে পারে না, তাহা হইলে বিদ্যার মহিমা এতাদৃশ গুরুতর রূপে কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিই অঙ্গীকার করিতেন না।"[১০১]

এখানে একটি পত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে যা প্রকাশিত হয়েছিল "বিদ্যাদর্শন" পত্রিকায় চিঠিপত্র স্তম্ভে। এই পত্রটির লেখিকা এক দেহপসারিণী। তাঁর কাছে এক পণ্ডিত সর্বদা যাতায়াত করতেন যিনি এই মহিলাটিকে সময়ে সময়ে "বিদ্যাদর্শন" পত্রিকা পাঠ করে শোনাতেন। মহিলাটি তাঁর মত ঐ পণ্ডিতকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে "বিদ্যাদর্শন" পত্রিকায় প্রেরণ করেছিল এবং যেহেতু বিদ্যাদর্শন" পত্রিকা ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য না রেখে তাঁর যুক্তি ও অভিপ্রায়ের দিকে দৃষ্টি রাখত সেহেতু ঐ পত্রিকায় লেখাটি প্রকাশিত হল। পত্রলেখিকা তাঁর পত্রে "স্ত্রীলোকের ব্যভিচারের কারণ" অনুসন্ধান করেছেন নিজের জীবনের আলোতে। তিন বছর বয়সের সময় পত্রলেখিকার বিবাহ হয় কোন কুলীন পাত্রের সঙ্গে। ১৬ বৎসর বয়সের সময় পঞ্চাশোর্দ্ধ কুরূপ স্বামীকে তিনি প্রথম চাক্ষুষ করেন। "তাঁহার মূর্ত্তি যেমন কুৎসিত রজনীতে তাঁহার ব্যবহারও তদ্রূপ প্রত্যক্ষ হইল।" পরদিন প্রভাতে কুলীনপুঙ্গব পত্রলেখিকার পিতার কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে চিরকালের মতো প্রস্থান করে। নিজের বিবাহিত জীবনের এই ছবি পত্রলেখিকার মনে এমন এক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যার ফলে সে যদিও মাসাধিক কাল নিতান্ত চেষ্টা করেছিল "সৎপথে রহিব এবং কুলধর্ম্মের রক্ষা করিব" কিন্তু শেষপর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি। কলিকাতার মেছোবাজার বাসিনী হয়ে সে দেখেছিল আরো ২০ জন মেয়েকে, যারা একই রকম ভাগ্যবিপর্যয়ের শিকার হয়েছিল।[১০২] এই পত্রটি শিহরণ সৃষ্টিকারী এইজন্য যে লেখিকার মতো একটি মেয়ে, সে শিক্ষিতা কিনা তা-ও নিশ্চিত নয়, তবুও সে কৌলীন্য প্রথার মতো একটি জঘন্য প্রথার ফলে মেয়েদের কি পরিণতি হয়ে থাকে সে সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন।

আবার, "সর্বশুভকরী" পত্রিকার প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। আলোচ্য প্রবন্ধটির পঞ্চম যুক্তিতে বলা হয়েছিল যে বিদ্যা শিক্ষা করে "স্ত্রীজাতি চাকুরী করিতে পারিবে না, আদালতে গতায়াত করিয়া কোন রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেক না এবং হাটবাজারে বসিয়া বা কোন দেশ দেশান্তরে গমন করিয়া বাণিজ্য কার্যও সম্পন্ন করিতে পারিবেক না।"[১০৩] তবে তাদের বিদ্যাশিক্ষায় কি ফল?

লেখকের উত্তর হল যে ধনোপার্জনই কি বিদ্যার একমাত্র সার্থকতা? কোন কোন ভারতীয় মনে করেন যে ধনোপার্জন, সভা ও সমাজস্থানে বক্তৃতা ও রাজপুরুষগণের সন্নিধানে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করা সবই বিদ্যাভ্যাসের মুখ্য ফল। কিন্তু তা নয়। যথার্থ বিদ্যা হল "এই মনুষ্য আর মনুষ্য হয়। তাহার বুদ্ধিবৃত্তি সকল নৈসর্গিক দোষসমূহ নির্মুক্ত হইয়া কেবল গুণগ্রামে গুম্ফিত হয়।"[১০৪]

---

১০১ তদেব।

১০২ "বিদ্যাদর্শন" পত্রিকা, ৫ সংখ্যা, ১৭৬৪ শক, কার্ত্তিক (১৮৪৩ খ্রী.), তদেব, পৃ: ৫৭২।

১০৩ তদেব, পৃ: ৫৪৩।

১০৪ তদেব, পৃ: ৫৪৮।

তবুও যদি ধনোপার্জনে একান্ত গুরুত্ব দিতেই হয়, তাহলেও স্ত্রীশিক্ষায় আপত্তির কিছু নেই। কারণ শিক্ষিতা রমণীরা গৃহের হিসাবপত্রাদি নিজেরাই রাখতে পারবে। তারা "গ্রন্থাদির রচনা ও অনুবাদ করিয়া তদ্বারা ভূরিভূরি অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থা হইবে।"[১০৫] শিশুসন্তানদের বিদ্যারম্ভ তাদের মায়েদের হাতেই সম্পন্ন হতে পারবে। এতে পাঠশালার ব্যয় যেমন বাঁচবে তেমনি শিশুদের শিক্ষার বনিয়াদও মজবুত হবে।

পরোক্ষভাবেও স্ত্রীশিক্ষায় সংসারের সাশ্রয় হতে পারে। শিক্ষিতা স্ত্রীরা নিরর্থক ব্যয়সাধ্য ব্রতপূজার দিকে আকৃষ্ট হবে না। শাড়ী গয়নার জন্য কখনো তাদের স্বামীদের বিরক্ত করবে না। এ ছাড়াও বিদ্যার গুণে তারা অবসর কাল এমনভাবে অতিবাহিত করবে না, যাতে ব্যভিচার দোষ ঘটতে পারে। তারা সৎ ও সুন্দরভাবে কাল কাটাবে।

কিন্তু "সর্বশুভকরী" পত্রিকার লেখকের মতো সকলেই মহিলাদের এরকম ছিমছাম জীবন চাইতেন না। এমনকি বেশীর ভাগ লোকই চাইতেন না। তাই "সম্বাদ ভাস্কর" পত্রিকার যে সম্পাদকীয়[১০৬] প্রকাশিত হয়েছিল তাতে আন্দুল নিবাসী ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের পত্নী শ্যামাসুন্দরী দাসীর প্রাত্যহিক কর্মপদ্ধতির বিবরণ দেওয়া হয়েছিল। শ্যামাসুন্দরী খাঁটি হিন্দু আচার ব্যবহার বজায় রেখেছেন। গঙ্গাজলে স্নান, বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত জপ তপ পূজা পাঠ ইত্যাদি, ব্রাহ্মণ বাড়িতে সিধা পাঠানো ইত্যাদি সমস্ত তিনি নিষ্ঠাভরে পালন করেন। সম্পাদক ধনী স্ত্রীলোকদের জন্য এইরকম ধর্ম কর্ম করাব কথা ভাবলেও মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র রমণীরা কি করবেন তা বলেননি। আরো আশ্চর্য এই যে "সম্বাদ ভাস্কর" পত্রিকায় শ্যামাসুন্দরী নিজে স্বাক্ষর করে চিঠি পাঠিয়ে তাঁর সম্বন্ধে লেখার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং আশীর্বাদ চেয়েছেন তাঁর যেন ধর্মে মতি অক্ষুণ্ণ থাকে। শ্যামাসুন্দরী যে বিলক্ষণ আলোকপ্রাপ্তা ছিলেন তা তাঁর নাম স্বাক্ষর থেকে বোঝা যায়। আর এ সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্যও হয়েছিল। কারণ শ্যামাসুন্দরী দেবী বা দাসী না লিখে সরাসরি স্বামীর পদবী বসুমল্লিক লিখেছিলেন। "সম্বাদ ভাস্কর" সম্পাদক এতে খুশী হয়েছিলেন কারণ "সভ্যজাতির মধ্যে ইহা প্রচলিত আছে, যথা লেডী বেন্টিং, লেডী কেনিং ইত্যাদি।"[১০৭]

এ পর্যন্ত দেখা গেল যে মেয়েদের শিক্ষার উদ্দেশ্য তখনও পর্যন্ত ছিল গার্হস্থ্য জীবনের উন্নতি, ইংরাজী শিক্ষিত স্বামীর উপযুক্ত সঙ্গিনী হওয়া, ধর্মকর্ম আগের মতোই বজায় রাখা ইত্যাদি। অর্থাৎ তখনও পর্যন্ত নারীরা কেবলই পুরুষেরই ছায়ানুসারিণী হবেন। মাঝে মাঝে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দুই চারিটি স্পন্দন দেখা গেলেও নারীকুল কিন্তু তখনও তেমনভাবে যুগপরিবর্তনে কোনও প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করেনি। কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী ছিল। শিক্ষাপ্রাপ্তা মেয়েরা পুরুষদের চিন্তাভাবনার অনুসারিণী হয়ে চিরকাল কাটাবে এ কখনো সম্ভব ছিল না। তাই, একদিন তারা নিজস্ব প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে তা শুধু সময়ের অপেক্ষার নামান্তর ছিল।

১০৫ তদেব পৃ:পৃ: ৫৫০-৫৫১।

১০৬ "সম্বাদ ভাস্কর" পত্রিকা, ৮৯ সংখ্যা, ১১ নভেম্বর, *সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, ৩য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ৩৩৪-৩৫।

১০৭ "সম্বাদ ভাস্কর" পত্রিকা, ১৮ সংখ্যা, ২রা ডিসেম্বর, ১৮৫৬, তদেব, পৃ: ৩৪২।

বঙ্গ আধুনিকায়ন (১৮৫৬-১৯০৫)

কারণ বাংলাদেশে ব্রিটিশ উপনিবেশের প্রতিষ্ঠা বাঙ্গালী সমাজকে একটি ভিন্ন ধরনের সংস্কৃতির সংস্পর্শে নিয়ে এসেছিল। মহিলাদের দুরবস্থা সম্পর্কে চেতনা এরই পরিণতি একথা অনস্বীকার্য। ব্রিটিশ সংস্কৃতির বাহন হল ইংরাজী শিক্ষা — যার প্রতি নিঃশর্ত বিশ্বাস ঊনবিংশ শতকের সমাজ সংস্কারকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে মহিলাদের ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত করে না তুললে তাঁদের নিজেদের ও সমাজের সার্বিক অবস্থার কোন উন্নতি সম্ভব হবে না। পরিবারস্থ মহিলাদের শিক্ষিত করার এই প্রয়াস মহিলাদের মূল্যবোধ, মনোভাব, এমনকি নিজেদের সম্পর্কে নিজেদের ধারণারও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল।[১০৮]

শিক্ষার অভিসারী শতাব্দীর রথ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে মহিলাদের যে কোন ধরনের শিক্ষার ওপরই কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল। উইলিয়ম অ্যাডাম্‌স্ লক্ষ্য করেছিলেন যে বাঙালী সমাজে এ ধারণা বদ্ধমূল যে বিদুষী মহিলার বৈধব্য অনিবার্য। তবে, বিদুষী মহিলার বিবাহ হওয়াও শক্ত কারণ পুরুষদের আশঙ্কা ছিল যে লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা পুরুষদের অধীনস্থ না-ও থাকতে পারে। মেয়েরা লিখতে শিখে পরপুরুষের সঙ্গে অবৈধ পত্রালাপ করবে — এরকম অর্থহীন আশঙ্কাও বিরল ছিল না।[১০৯] অ্যাডাম্‌সের পর্যবেক্ষণের সমর্থন পাওয়া যায় "বামাবোধিনী" পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রচনায় যার শিরোনাম "স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা", এখানে জ্ঞানদা ও সরলা নাম্নী দুজন মহিলার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে স্ত্রীশিক্ষার বৈধব্য ও ব্যভিচার দোষ খণ্ডন করা হয়েছে :

"স : আমার বোধ হয় মেয়েদের লেখাপড়ায় দোষ আছে। এক ত শুনি এতে মেয়েরা বিধবা হয়।

জ্ঞা : আজও তোমার এত ভুল। লেখাপড়ার ভিতর কি আছে যে একজনের স্বামীকে মেরে ফেলবে? সে কালের যে সকল মেয়েদের কথা বললাম তারা তো সব সধবা ছিল। লেখাপড়াতেই যদি বিধবা করে তাহলে ইংরাজদের দেশের সব মেয়ে বিধবা হতো। বিধবা লেখাপড়া শিখে হলেই কি লেখাপড়ার দোষ হল?

স : কিন্তু ভাই অনেক মেয়ে এতে খারাব হয়ে যায়।

জ্ঞা : তুমি লেখাপড়ার কিছু জান না বলে এমন কথা কও। যার স্বভাব খারাব, যে খারাব সংসর্গে থাকে সে লেখাপড়া করুক আর না করুক প্রায় খারাব হয়। অনেক মন্দ মেয়েমানুষ খারাব মতলবেই একটু লিখতে পড়তে শিখে, খারাব বই পড়ে খারাব পত্র লিখতে শেখে, তা

১০৮ গোলাম মুরশিদ, সংকোচের বিহ্বলতা : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণীর প্রতিক্রিয়া, ১৮৪৯-১৯০৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ: ১০। অতঃপর শুধু "সংকোচের বিহ্বলতা" বলে উল্লিখিত হবে।

১০৯ Meredith Bothwick, *The Changing Role of Women in Bengal 1849-1905*, Princeton University Press, New Jersey, 1985, পৃ: ১০।

বলে কি লেখাপড়ার দোষ? টাকা নে অনেকে মন্দ কর্ম করে তবে আর কারুর টাকা রোজগার করা উচিত নয়? খারাব মতলব থাকলে একরকমে না পারে আর একরকমে যায়। তারা ত জ্ঞান পাবার জন্য লেখাপড়া করে না।"[১১০]

মেরেডিথ বোর্থউইকের মতে মহিলাদের শিক্ষা যে নিরুৎসাহজনক ছিল তার কারণ হল এই যে মেয়েদের শিক্ষা কোনদিক দিয়েই অর্থকরী ছিল না। লেখাপড়া শিখলেও মেয়েরা চাকরি করত না, আবার এমন মেয়েদের বিয়ে হওয়াও দুরূহ ছিল। লেখাপড়া শেখাতে যেমন অর্থ ব্যয় করতে হত, তেমন গৃহকর্ম নির্বাহের জন্য নগদ বেতন দিয়ে গৃহভৃত্য রাখতে হত। শিক্ষা লাভ করে মেয়েরা গৃহকর্ম বিমুখ হয়ে পড়ত ফলে ব্যয় সংকোচের কোন উপায় ছিল না।[১১১]

এসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করতে এগিয়ে এলেন খ্রীষ্টান মিশনারীরা। এবার ভদ্রলোক পুরুষরা ভয় পেলেন যে পাদ্রীরা বুঝি মেয়েদের ধর্মান্তরিত করে ফেলেন। তাই কোন ভদ্রপরিবারের মেয়েরা এই সব বিদ্যালয়ে সাধারণত পড়তে আসত না। এখানে পড়তে আসত সাধারণ নিম্নশ্রেণীর হিন্দু মেয়ে অথবা বেশ্যাকন্যারা, তা-ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আর্থিক পুরস্কারের লোভে।[১১২]

ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগের শেষে "প্রগতিশীল" রামমোহন, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ আর "রক্ষণশীল" রাধাকান্ত দেব স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। রাধাকান্ত দেবের উৎসাহে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক" রচনা করলেন।

১৮২০-র দশকের শেষদিকে ডিরোজিওর নেতৃত্বে ইয়ং বেঙ্গল দল সোচ্চার হয়ে শিক্ষাদান সহ মহিলাদের সমমর্যাদা দাবী করলেন। এঁরা হিউমের অভিজ্ঞতাবাদ, বেন্থামের উপযোগবাদ এবং শেলী ও বায়রনের রোমান্টিক বিদ্রোহের আদর্শের দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত ছিলেন। এই গোষ্ঠী ঐতিহ্যাশ্রিত হিন্দুধর্মের তীব্র বিরোধী ছিলেন। তাঁরা যুক্তিবাদের সাহায্যে যাচাই করার পক্ষপাতী ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁরা *Thomas Paine*-এর *Age of Reason* দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।[১১৩] সেজন্য নারীশিক্ষা সম্বন্ধে হিন্দুসমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাবকে এঁরা কঠোরভাবে আক্রমণ করতে থাকেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করলেন মহেশচন্দ্র দেব। এতে তিনি স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ে দ্বিধাহীন বলিষ্ঠ মত প্রকাশ করলেন। ইয়ংবেঙ্গল দলের মুখপত্র জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার সপক্ষে দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করলেন। স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহ দানের জন্য রামগোপাল

১১০ বামাবোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র, ১২৭০।

১১১ *The Changing Role of Women in Bengal*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৬১।

১১২ গীতশ্রী বন্দনা সেনগুপ্ত, *স্পন্দিত অন্তর্লোক*, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলিকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ: ৭০।

১১৩ A.F. Salahuddin Ahmed, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৮।

ঘোষ উক্ত বিষয়ে শ্রেষ্ঠ দুই প্রবন্ধ রচনাকারীর জন্য ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক ঘোষণা করেন এবং মধুসূদন দত্ত ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে পুরস্কার দুটি লাভ করেন।[১১৪]

এ ছাড়াও ইংল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রে মহিলা ও শ্রমিকদের উন্নতিকল্পে যে ইউনিট্যারিয়ান আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা এদেশের রামমোহন ও তাঁর অনুগামীদের এবং পরবর্তীকালে অক্ষয় কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর, কিশোরী চাঁদ মিত্র, দুর্গামোহন দাস, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। উইলিয়ম অ্যাডাম ও কয়েক দশক পরে মেরী কার্পেন্টার ও অ্যানেট অ্যাক্রয়েডের মতো ইউনিট্যারিয়ানরা এদেশে এসে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন।[১১৫]

এদিকে সমাজে স্বল্পসংখ্যক লোকের হলেও স্ত্রীশিক্ষার অনুকূলে একটি মত তৈরী হয়েছিল। তাই তাঁরা প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্য থেকে উদাহরণ নিয়ে প্রমাণ করতে চাইলেন যে প্রাচীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষা ধর্মসঙ্গত ছিল। ১৮২২ সালে প্রকাশিত 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' এই ধরনের একটি প্রচার পুস্তিকা। রাধাকান্ত দেবের উৎসাহে এই পুস্তিকাটি রচনা করেছিলেন গৌরমোহন বিদ্যালংকার, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা গ্রহণে স্ত্রীলোকদের আগ্রহ সৃষ্টি করা।[১১৬] তবে বাংলাদেশের মেয়েরা যে আদপেই লেখাপড়া জানতেন না তা নয়। অ্যাডাম্সের যে প্রতিবেদনের কথা এই নিবন্ধের গোড়াতেই আছে তাতে দেখা যায় যে জমিদারী দেখাশোনা করতে শেখানোর জন্য জমিদার তনয়াদের অনেক সময় লেখাপড়া শেখানো হত। উনিশ শতকের রক্ষণশীল পুরুষশাসিত সমাজেও হটী বিদ্যালঙ্কার, হটু বিদ্যালঙ্কার বা দ্রবময়ী পণ্ডিত বলে পরিগণিত হয়েছিলেন। ব্যতিক্রমী এই মহিলাদের উদাহরণ খুব উৎসাহব্যঞ্জক ছিল না। খুব সীমিত ক্ষেত্রে ভদ্রপরিবারের মেয়েদের কখনো কখনো প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হত। এইভাবেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশ্রূমাতা কঠিন দর্শন, তন্ত্র, পুরাণ এমনকি অভিধানও পড়তেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "আধ্যাত্মিকা" গ্রন্থের ভূমিকায় প্যারীচাঁদ মিত্র (জন্ম, ১৮১৪) লিখেছিলেন যে তাঁর ঠাকুরমা, মা-ও কাকীরা বাংলা বই পড়তেন এবং বাংলা লিখতে ও হিসাব রাখতে জানতেন।[১১৭]

সাংসারিক জীবনে স্ত্রীশিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ — এই সিদ্ধান্তই সে সময়ে প্রচারিত হয়েছিল সবচাইতে বেশী। স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা বোঝাতে গিয়ে মদনমোহন তর্কালংকার কয়েকটি উপযোগিতার কথা উল্লেখ করলেন, যেমন, ইচ্ছে করলে মেয়েরা অর্থ উপার্জন করতে পারবে,

১১৪ *স্পন্দিত অন্তর্লোক*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৭১-৭২।

১১৫ *সংকোচের বিহ্বলতা*, পৃ: ১৬।

১১৬ ডঃ বসন্ত কুমার সামন্ত, সম্পাদিত, বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম দুটি মুদ্রিত গ্রন্থ, সাহিত্যলোক, কলিকাতা-৬, অক্টোবর, ১৯৯৪, সম্পাদকের কথা, পৃ: ১৫।

১১৭ সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, অন্দরে অন্তরে, স্ত্রী, কলিকাতা ২৬, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫, পৃ: ৩৮।

সংসারের আয়ব্যয়ের হিসাবপত্র রাখতে পারে। ছেলেমেয়েদের পড়াতে পারে এবং শিক্ষিতা হলে সুস্থ ও সুখী দাম্পত্য জীবন সম্ভব হয়।[১১৮]

স্ত্রীশিক্ষা যৌথ পরিবারকে ভাঙ্গার বদলে টিকিয়ে রাখবে — এই অনুমান স্ত্রীশিক্ষা সমর্থকদের একটি বড় সান্ত্বনা ছিল। কারণ, শিক্ষিতা মেয়েরা স্বামীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে এবং অযথা বিবাদে লিপ্ত হবে না। আসলে, মেয়েদের শিক্ষা দিতে চাওয়া হয়েছিল সংসার তথা সমাজ তথা পুরুষদের উন্নতি বিধানের জন্য। শিক্ষিতা মা, বোন ও পত্নীরা শিক্ষিত পুত্র, ভ্রাতা ও স্বামীদের সমন্বয়ে একটি সুস্থ সমাজ গড়ে তুলবে। এজন্য, মেয়েদের মাতৃরূপকল্পকে কিভাবে মহিমান্বিত করা হয়েছিল বিদ্যাসাগরের মাতৃবিষযক উপকথাগুলি তার প্রমাণ দেয়।[১১৯]

কিন্তু মহিলারা যখন একবার শিক্ষার স্বাদ পেলেন, তখন তাঁরা এই চাপিয়ে দেওয়া পুরুষপালিকার ভূমিকা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। নিজেদের নিরানন্দ জীবনে একটুখানি আনন্দের ছোঁয়া পাবার জন্য তাঁরা শিক্ষাকে সাদবে বরণ করলেন।

বরঞ্চ, মহিলাদের জেগে ওঠার আহ্বান জানাতে গিয়ে, কোন কোন মহিলা রাজবালা দেবীর মতো পুরুষদের অভিযোগ করলেন। কৈলাসবাসিনী দেবী বললেন যে পুরুষদের ভয় ছিল শিক্ষিতা মহিলারা পুরুষদের ও গৃহকর্মকে উপেক্ষা করে কেবল শাস্ত্রপাঠ করবে। তাহেরেননেসা বা রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের মত মহিলারা পুরুষ ও নারীর সমতার উপর জোর দিয়ে বলেছিলেন যে সমাজের অগ্রগতি কখনো সম্ভব হবে না যদি মহিলারা পিছিয়ে থাকে। এক অজ্ঞাতনামা মহিলা প্রশ্ন তুলেছিলেন যখন শরীরের এক অংশ অসুস্থ তখন অপর অংশও সুস্থ থাকতে পারে না।[১২০]

তবুও, স্ত্রীশিক্ষার সবচেয়ে প্রবল বিরোধী ছিলেন মহিলারা নিজেরাই। বিশেষত পরিবারের বয়স্কা সদস্যারা মেয়েদের হাতে কাগজ দেখলে প্রচণ্ড রাগ করতেন কারণ তাঁদের দৃঢ়মূল বিশ্বাস ছিল এই যে শিক্ষা পেলে মেয়েরা হয় অসতী, অবাধ্য ও অপয়া। তাই মহিলারা লেখাপড়া জানলেও তা সাধারণত গোপন করতেন। কৈলাসবাসিনী দেবী লিখলেন যে লেখাপড়া জানা মেয়েদের "দেখিলে কুলকামিনীগণ আপনাদিগের তনয়া ও সুসাগণকে সাবধানপূর্বক রক্ষা করিতেন। যেমন প্রসূতিগণ স্বীয় সন্তানগণকে ডাইন, যোগিনী প্রভৃতির নিকটে যাইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করেন, তেমনি ইহারাও উহাদিগকে দর্শন করিলে আস্তে আস্তে আত্মরক্ষা করিতে যত্নবতী হইতেন।"[১২১]

১১৮ মদনমোহন তর্কালঙ্কার, 'স্ত্রীশিক্ষা', সর্বশুভকরী পত্রিকা, আশ্বিন, ১৭৭২ শকাব্দ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, তৃতীয় খণ্ড, সর্বশুভকরী পত্রিকা, রচনা সংকলন, যত্রতত্র।

১১৯ *The Changing Role of Women in Bengal*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৬।

১২০ *সংকোচের বিহ্বলতা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫।

১২১ কৈলাসবাসিনী দেবী, *হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি*, কলিকাতা, ১৭৮৭ শক, পৃ: ১৫।

তবে, ভদ্রলোক বুদ্ধিজীবীগণ প্রগতিশীল বা রক্ষণশীল নির্বিশেষে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রগতিবাদীরা ভাবতেন যে শিক্ষিতা মহিলারা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, অন্যদিকে রক্ষণশীলরা ভাবতেন যে শিক্ষিতা মেয়েরা সমাজের চিরাচরিত কাঠামোটি বজায় রাখতে পারবেন। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার লিখলেন যে স্বামী শহরবাসী বা অরণ্যবাসী, পাপী বা মহাত্মা, ধনী বা দরিদ্র, গুণবান বা অপদার্থ হোক, সে অট্টালিকা বা কুটিরে বাস করুক, সুন্দর বা কুৎসিত হোক, স্ত্রীর কর্তব্য তার অনুগত হওয়া। শাস্ত্রে কথিত আছে যে গুণবতী স্ত্রীর চেয়ে বড় সম্পদ একজন স্বামীর আর থাকতে পারে না। অতএব, মেয়েদের উচিত সমগ্র অবসর সময় জ্ঞান ও নৈতিকতার চর্চায় ব্যয় করা, কারণ বিদ্যাচর্চা ও নীতিকথার মধ্যে তাদের পক্ষে চরম সুখের সন্ধান পাওয়া সুনিশ্চিত।[১২২] অক্ষয় কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, প্যারীচাঁদ মিত্র, বা প্যারীচরণ সরকারের মতো লেখকরা সকলেই এই মত প্রকাশ করলেন যে মহিলাদের অবস্থার উন্নতি ব্যতীত কোন জাতি সুসভ্য হতে পারে না, আর তা সম্ভব একমাত্র স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব বাঙালী পুরুষদের মধ্যে এমন একটি অভাববোধের সৃষ্টি করেছিল যা ভারতীয় ইতিহাসে অভিনব ছিল। এই প্রথম পুরুষরা অনুভব করতে পারলেন যে পত্নীদের সঙ্গে তাঁদের মানসিক ব্যবধান দুস্তর। রামমোহন, দ্বারকানাথ, বিদ্যাসাগর, প্রসন্ন কুমার প্রমুখ নামজাদা সংস্কারকরা তো পত্নীদের সমর্থন ও সাহচর্য থেকে বঞ্চিত ছিলেনই, এমনকি সাধারণ নব্যশিক্ষিত তরুণরাও শিক্ষিতা স্ত্রীর অভাবে তাঁদের জীবন "কাব্য ও রোমান্স" বর্জিত বলে মনে করতে লাগল।[১২৩] এরা যে নতুন চিন্তাদর্শ ও ব্যক্তিগত অভ্যাসে জীবনগঠন করেছিলেন তার সঙ্গে তাঁদের অভিভাবক ও স্ত্রীদের মানসিক সাযুজ্যের দুরতিক্রম্য ব্যবধান গড়ে উঠেছিল। ফলে অনেকেই মূলপরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। এই সংঘাতময় পরিবেশে তাঁরা নিজেদের জীবনের প্রয়োজনে, দাম্পত্য তৃপ্তির প্রয়োজনে এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির প্রয়োজনে শিক্ষিত ও আলোকপ্রাপ্তা স্ত্রীর অভাব অনুভব করেছিলেন।[১২৪]

শুধু উপযুক্ত সঙ্গিনী গড়ে তোলার ইচ্ছাই নয়, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে কন্যাদের প্রতি পিতার মনোভাবও যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়েছিল বলে গোলাম মুরশিদ মনে করলেন।[১২৫] তবে

১২২ গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক, কলিকাতা ১৮২২, পৃ: ২৪।

১২৩ সংকোচের বিহ্বলতা, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৭।

১২৪ Sumit Sarkar, A Critique of Colonial India, Calcutta 1985, পৃ: ২৭, পৃ: ৭২।

১২৫ *সংকোচের বিহ্বলতা*, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৯।

তিনি এ বিষয়ে আর কোন বিশদ তথ্য বা প্রমাণ না দিলেও ব্রাহ্মনেতা কালীনারায়ণ গুপ্তের জীবনী বা দুর্গামোহন দাসের পুত্রী শ্রীমতী ব্রাহ্মময়ী দেবীর জীবনকথা পড়লে তা বোঝা যায়।[১২৬]

এইভাবে যখন স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল, তখন প্রশ্ন দেখা দিল পদ্ধতি নিয়ে। সাধারণভাবে তিন রকম পদ্ধতি হতে পারত — গৃহশিক্ষা, জেনানা শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। সে সময়কার অসংখ্য জীবনী ও আত্মজীবনী থেকে[১২৭] জানা যায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গৃহশিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করা হতো। তবে, এই পদ্ধতির বড় অন্তরায় ছিলো পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠাদের বিরোধিতা। শিক্ষক থাকতেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রগতিশীল স্বামীরা। কিন্তু, প্রচলিত পারিবারিক প্রথা অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎ ঘটত গভীর রাত্রে, তখন আর শিক্ষাগ্রহণের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা থাকত না শিক্ষাগ্রহনেচ্ছু মেয়েটির।

গৃহশিক্ষকতা বা জেনানা শিক্ষার ভার পেতেন সাধারণত মিশনারী মহিলারা। এতে পর্দাপ্রথা মানা হলেও ধর্মান্তরকরণের ভয় থেকেই যেত। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্রবধূ বালা সুন্দরী দেবী এই পদ্ধতিতে শিক্ষিত হয়ে খ্রীষ্টান হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এছাড়াও জেনানা শিক্ষা পদ্ধতি ছিল ব্যয়বহুল। একমাত্র ধনীরাই এর ব্যয়ভার গ্রহণ করতে পারত। আর এই শিক্ষা পদ্ধতি সাধারণত ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান পরিবারগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। রক্ষণশীল পরিবারে এর প্রভাব পড়েছিল সামান্যই। সর্বোপরি, মহিলা শিক্ষিকার সংখ্যা এতই কম ছিল যে এই পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ সম্ভব ছিল না। তবুও জেনানা শিক্ষা বাঙালী মহিলাদের জীবনে একঝলক মুক্ত হাওয়া বয়ে এনেছিল।[১২৮]

ফলে, মহিলাদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল। ১৮১৮ সালে পাদ্রী রবার্ট মে চুঁচুড়ায় প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। চার্চ মিশনারী সোসাইটির পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮২৩ থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে মিস মেরী অ্যান কুক অন্তত ৩০টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। "সমাচার দর্পণ" পত্রিকার সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে ঐ সব বিদ্যালয়ে বেশ কিছু সংখ্যক দেশীয় বালিকা শিক্ষালাভ করেছিল।[১২৯] কিন্তু ১৮৪৫ সালে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যখন একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারী অনুদান চাইলেন, কোম্পানী তা বাতিল করে দিল। কারণ, মহিলাদের দ্বারা ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের চাহিদা মেটানো যাবে না বলে ইংরাজ সরকার স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে আদৌ কোন

১২৬ বঙ্কুবিহারী কর, ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্তের জীবন বৃত্তান্ত, কলিকাতা, ১৩৩১, যত্রতত্র, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, জীবনালেখ্য, আখ্যাপত্র পাওয়া যায়নি, যত্রতত্র।

১২৭ যেমন, মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রীমতী সরস্বতী সেনের সংক্ষিপ্ত জীবনী, সুনীতি মল্লিকের অকাল-কুসুম, প্রকাশ চন্দ্র রায়ের অঘোর প্রকাশ ইত্যাদি।

১২৮ *The Changing Role of Women in Bengal*, পৃ: ৭১।

১২৯ *সংকোচের বিহ্বলতা*, পৃ: ১০।

উৎসাহ দেখাতেন না।[১৩০] বাঙালী ভদ্রলোকরাও বিদ্যালয়ে মেয়েদের পাঠাতে চাইতেন না পর্দাপ্রথার জন্য আর ধর্মান্তরকরণের ভয়ে।[১৩১]

এত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও প্যারীচরণ সরকার ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বারাসত বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। রক্ষণশীলদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ২০টি ছাত্রী নিয়ে প্রথম বিদ্যালয়টি টিকে গেল। ১৮৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হল নিবাধাই বালিকা বিদ্যালয়। ১৮৪৯ সালে এই দুই পূর্বসুরীকে ছাপিয়ে কাউন্সিল অব এডুকেশনের সভাপতি বেথুন সাহেব শুরু করলেন ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল, ১৮৬২ সাল থেকে যা পরিচিত হল বেথুন বিদ্যালয় নামে। বেথুন, তদানীন্তন ভদ্রলোকদের সামনে একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ এনেছিলেন এইভাবে পর্দাপ্রথা মেনে বাংলাভাষার মাধ্যমে তিনি বাঙালী মেয়েদের মহিলাজনোচিত কাজ শেখানো ও গুণাবলী অর্জন করার কথা বললেন, যাতে তারা একাধারে গৃহকর্মের প্রয়োজন মেটাতে পারে আবার নির্দোষ সম্মানজনক পেশাও অর্জন করতে পারে। যদিও মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বা রামগোপাল ঘোষের মতো ভদ্রলোকরা বেথুন স্কুলে মেয়েদের পাঠালেন, শিক্ষাদান হল ধর্মনিরপেক্ষ এবং মেয়েদের যাতায়াত হতে লাগল ঢাকা গাড়ীতে তবুও বেথুন স্কুল প্রাথমিকভাবে সাফল্য অর্জন করতে পারল না কারণ তখনও পর্যন্ত বেশির ভাগ ভদ্রলোকই মনে করতেন যে মেয়েরা বিদ্যালয়ে গেলে তাদের নারীসুলভ গুণ বিনষ্ট হবে। সেই সঙ্গে পরিবারের মান সম্মানও বিনষ্ট হবে।[১৩২] বামাবোধিনী পত্রিকা এই ব্যর্থতায় দুঃখ প্রকাশ করল।[১৩৩]

এই ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মেরেডিথ বলেছেন যে বিদ্যালয় তত্ত্বাবধায়িকা মিস্ পিগট ভালো প্রশাসনিক ছিলেন না, বা মাসিক ১ টাকা বেতন দেওয়া অধিকাংশ মধ্যবিত্তের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু তার চেয়েও বড় কারণ ছিল এই যে অল্পবয়স্কারা বিদ্যালয়ের বাঁধাবাঁধি পছন্দ করত না। অপেক্ষাকৃত বয়স্কা বিবাহিতা মহিলারা তেমনি এই বিদ্যালয়ে পড়তে পেতেন না, অথচ স্ত্রীশিক্ষার গুরুত্ব এঁরাই উপলব্ধি করতেন বেশী।[১৩৪]

এমতাবস্থায়, জেনানা পদ্ধতি আবার গুরুত্ব লাভ করল। কেশব চন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অত্যুৎসাহে এই পদ্ধতির উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করলেন কারণ এঁরা সকলেই স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন অথচ মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে রাজী ছিলেন না। জেনানা শিক্ষার আর্থিক সহায়তা দান করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হল ব্রাহ্মবন্ধু সভা। ১৮৬৩ সালে বামাবোধিনী সভা একটি "অন্তঃপুর শিক্ষা" কার্যক্রমে চালু করে বৎসরান্তিক পরীক্ষার আয়োজন করল। যদিও, এই কর্মসূচীর গুণগত মান সম্পর্কে সন্দেহ ছিল তবুও এর আওতায় এসে বহু

১৩০ *The Changing Role of Women in Bengal*, পৃ: ৭৩।

১৩১ সংকোচের বিহ্বলতা, পৃ: ২২।

১৩২ "সম্বাদ ভাস্কর", ২২ সংখ্যা, ১৩ই মে, ১৮৪৯, "ভাস্কর পাঠক হইতে প্রাপ্ত", সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র ৩য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ৪১১-৪১২।

১৩৩ বামাবোধিনী পত্রিকা, "শিক্ষা সংক্রান্ত বিবরণ" জ্যৈষ্ঠ ১২৭৬।

১৩৪ *The Changing Role of Women in Bengal*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৩।

মহিলাই শিক্ষালাভ করেছিলেন। গোলাম মুরশিদ অবশ্য তথ্যের দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে শিক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন খ্রীষ্টান যেমন তরুদত্ত, ব্রাহ্ম যেমন সৌদামিনী, জ্ঞানদানন্দিনী, কুমুদিনী, ব্রহ্মময়ী প্রমুখ। ব্রাহ্ম প্রভাবিত হিন্দু যেমন, কৈলাসবাসিনী দেবী, বামাসুন্দরী, প্রমুখ। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন গোঁড়া হিন্দু মহিলা দ্রবময়ী যিনি পিতার টোলে শিক্ষালাভ করেছিলেন।[১৩৫]

জেনানা শিক্ষাকে কেন্দ্র করে শুরু হল স্ত্রীশিক্ষার পাঠ্যসূচী নিয়ে প্রবল বিতর্ক। কারণ মেয়েদের এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা ঘরের কাজকে ঘৃণা করতে না শেখে। বেথুন স্কুলের পাঠ্যসূচী অবশ্য ছেলেদের মতোই ছিল। মদনমোহন তর্কালঙ্কার ১৮৬১ সালে রচনা করলেন "স্ত্রীশিক্ষা"। এই গ্রন্থে তো বটেই এমনকি মেরি কার্পেন্টারের সুপারিশেও মেয়েদের সাহায্যকারিণীর ভূমিকাকে প্রাধান্য দেওয়া হল।

১৮৭১ সালে ইংলন্ড থেকে ফিরে কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠা করলেন *Native Ladies Normal School* ও বামাহিতৈষণী সভা। কেশব স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন যে মেয়েদের হতে হবে ভাল স্ত্রী, মা, কন্যা ও ভগ্নী, কিন্তু, তাঁর অনুসৃত পাঠ্যসূচীও "নারীসুলভ" হল না। আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র, "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকা ও কেশবচন্দ্রের মতের অনুসারী ছিলো: "আমরা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী নহি। স্ত্রীজাতি জ্ঞানানুশীলন করিয়া চিরন্তন কুসংস্কারের হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারে এবং সভ্যসমাজে গৃহীত ও সম্মানিত হয় ইহা অবশ্যই প্রার্থনীয়, কিন্তু এক্ষণে যে প্রণালীক্রমে স্ত্রীজাতিকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, আমরা তাহার বিরোধী। স্ত্রীশিক্ষার যে বিষময় ফল দাঁড়াইতেছে তাহা কেবল এই প্রণালীর দোষ।..... আমরা স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষার বিরোধী নহি ..... কিন্তু যে সমস্ত পুস্তক পাঠ করিলে স্ত্রীজাতি উৎকৃষ্ট গৃহিণী ও মাতা হইতে পারে তাহাই তাহাদের বিশেষ পাঠ্য।...... বর্তমানকাল বিলাসপ্রধান কাল, অধিকাংশ স্ত্রীলোক গার্হস্থ্য কার্যে উদাসীন, কেবল বিলাস লইয়াই ব্যস্ত।...... গৃহকার্য দূরে থাক গৃহিণীগণের পুত্রকন্যা প্রতিপালনও অন্যের হস্তে।"[১৩৬] গোলাম মুরশিদ মনে করেন যে নারীসুলভ পাঠ্যসূচী অনুসরণ করতে না পারার জন্য দায়ী উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব।[১৩৭] তবুও কেশবের তরুণতর অনুগামীরা যেমন — শিবনাথ শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, অন্নদাচরণ খাস্তগীর প্রমুখ দাবী তুললেন যে মহিলাদের সকল বিষয়ে জ্ঞানার্জনের অধিকার আছে।[১৩৮]

অ্যানেৎ অ্যাক্রয়েড কলিকাতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যসূচী নিয়ে বিতর্কটি তীব্র আকার ধারণ করল। ১৮৭৩ সালে পাঁচজন ব্রাহ্ম বালিকা নিয়ে তিনি হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় খুললেন এবং ছাত্রীদের বিশুদ্ধ ইংরাজী শিক্ষা দিতে লাগলেন। অ্যানেতের অনমনীয় মনোভাব এবং

১৩৫ *সংকোচের বিহ্বলতা*, পৃ: ২৯-৩০।

১৩৬ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, "স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতা", নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৭৮।

১৩৭ সংকোচের বিহ্বলতা, পৃ:পৃ: ৩৬-৩৭।

১৩৮ শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, স্বাক্ষরতা প্রকাশন, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, কলিকাতা ৭৩, পৃ:পৃ: ১১৪ ১১৫।

মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতার অভাব তাঁকে আশানুরূপ সাফল্য দিল না ঠিকই কিন্তু তাঁর বিদ্যালয়ের প্রভাব সহজে হারিয়ে গেল না। ১৮৭৫ সালে *Henry Beveridge, I.C.S.*-এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে যাবার ফলে দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং আনন্দমোহন বসু তাঁর স্কুলের ভার নেন ও নাম পাল্টে রাখেন বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়। এখানে, জ্ঞানের যে কোন ক্ষেত্রে আগ্রহী মহিলাদের সুযোগ করে দেওয়া হত।[১৩৯]

ভদ্রলোকদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের সঞ্চার হতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী মহিলাদের ঐতিহ্যিক রূপকল্পটি আবার প্রাধান্য পেতে শুরু করল। মহিলাদের পাঠ্য হওয়া উচিত সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, গার্গী, দুর্গাবতী প্রমুখ প্রাচীন সাধ্বী মহিলার জীবনী ও রামায়ণ, মহাভারত, গীতা প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ, যাতে তারা হিন্দুধর্মের উচ্চ আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে।

একদিকে যেমন হিন্দু পুনরুত্থানবাদের ঝোঁক দেখা গেল আরেকদিকে আবার বেথুন স্কুল মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ দিতে লাগল। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি প্রমুখের চাপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চন্দ্রমুখী বসুকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার অনুমতি দিল পুরুষ ও মহিলাদের প্রশ্নপত্রের কোন পার্থক্য না রেখেই। ১৮৭৮ সালে মহিলাদের এফ.এ. ও বি.এ. পরীক্ষার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে নিয়মকানুন তৈরী করল তা-ও পুরুষদের প্রায় অনুরূপ হল, শুধু মেয়েদের স্বতন্ত্র কক্ষে পরীক্ষা দিতে বলা হল আর গণিতের বদলে তারা ইচ্ছা করলে *Political Economy* নিতে পারত।[১৪০]

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন বিদ্যালয় থেকে চন্দ্রমুখী ও কাদম্বিনী বি.এ. পাশ করলেন। এইভাবে প্রায় নিঃশব্দে এবং বিনাবাধায় একটি যুগান্তর ঘটে গেল। উদারপন্থী ব্যক্তিরা মনে করলেন যে এর ফলে সমাজের প্রগতির দ্বার উন্মুক্ত হল। যেসব পুরুষরা মেয়েদের উচ্চশিক্ষার বিরোধিতা করেছিলেন তাঁরা পরাস্ত হয়েও হেরে যাওয়া যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন এই ভেবে যে শিক্ষিতা মহিলারা সমাজে তাঁদের প্রাধান্য নষ্ট করবে। তাই ১৮৮৩ সালে সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দিতে গিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বললেন উচ্চশিক্ষা লাভ করলেও ভারতীয় মহিলারা দেশাচার লঙ্ঘন করবেন না বা তাদের চারিত্র-বৈশিষ্ট্য হারাবেন না।

নববিধান ব্রাহ্মগোষ্ঠীও মেয়েদের উচ্চশিক্ষা লাভের বিরোধিতা করল এই বলে *Bachelor* বা *Master of Arts* এই অভিধাগুলি মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলে তা হাস্যকর হয়ে দাঁড়াবে। ব্রিটিশরাই যেখানে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দিতে উৎসাহ দেখাল না তখন এখানে তার কি দরকার?

উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদের ভূমিকা কি হবে তা নিয়েও যথেষ্ট আলোচনা শুরু হল। স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে যাঁরা এতদিন সোৎসাহ ছিলেন তাঁরাই এখন সন্দেহ পোষণ করতে লাগলেন যে মহিলারা আদৌ গৃহকর্ত্রী, পত্নী ও মাতার ভূমিকা পালন করতে পারবে কিনা?

---

১৩৯ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা ৬, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬২, পৃ:পৃ: ১২-১৩।

১৪০ Hundred Years of the University of Calcutta, Calcutta 73, 1957, পৃ:পৃ: ১২১-১২২।

তবুও, মেয়েরা তাঁদের গার্হস্থ্য ভূমিকাকে মেনে নিয়েও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। কেশবচন্দ্রের *Native Female Normal School*-এ প্রশিক্ষণপ্রাপ্তা শিক্ষিকা রাধারাণী লাহিড়ী বলেছিলেন যে স্ত্রীশিক্ষা থেকে ভাল ছাড়া খারাপ কিছু হতে পারে না। ১৮৮০-র দশক থেকে অন্তত শহরে মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার হার ছিল ক্রমবর্ধমান। যদিও মোট মহিলা জনসংখ্যার তুলনায় এই হার ছিল অতি নগণ্য। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার ঊনবিংশ শতকের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তা মহিলাদের সামনে এক অনন্ত অভিজ্ঞতার জগৎ খুলে দিয়েছিল।

বহু বাধা পেরিয়ে শিক্ষার অধিকার লাভ করে বাঙালী মহিলার মনোজগতে যে নতুন চিন্তার তরঙ্গাঘাত ঘটল তার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার আদর্শ, উদ্দেশ্য, পরিণতি, সম্ভাবনা এককথায় শিক্ষার সমস্ত কিছুকে ঘিরে মেয়েরা নিজেরাও ভাবনাচিন্তা শুরু করেছিল। এ ভাবনা সর্বদা যে পুরুষের চিন্তার ধারা মেনে চলেছে তা নয়। তাদের ভাবনায় যথেষ্ট চমক ছিল, নিজস্বতা ছিল, পরিবর্তনের ইচ্ছাও ছিল। স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে পুরুষের চিন্তার সাথে ব্যাপক পরিচিত হওয়া এইজন্যই প্রয়োজন যে পুরুষের চিন্তার জগতে পাশ্চাত্য প্রভাব যে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, তা জানা থাকলে মেয়েদের চিন্তার পরিবর্তন বোঝা সম্ভব হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সংশয় থেকে প্রত্যয় : আধুনিকায়নে শতাব্দীর অগ্রগতি

পূর্বপট

ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশে ব্রিটিশ উপনিবেশের প্রতিষ্ঠা বাঙালীদের একটি ভিন্ন ধরনের সংস্কৃতির সংস্পর্শে নিয়ে এসেছিল। একথা অনস্বীকার্য যে মহিলাদের দুরবস্থা সম্পর্কে চেতনা এরই পরিণতি। ব্রিটিশ সংস্কৃতির বাহন হল ইংরাজী শিক্ষা — যাকে বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সমার্থক করে দেখা হয়। এই পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি নিঃশর্ত বিশ্বাস উনবিংশ শতকের সমাজসংস্কারকদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। এই বিশ্বাস তাঁদের এই উপলব্ধি দিয়েছিল যে বঙ্গমহিলাকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে না তুললে তাঁদের নিজেদের অবস্থার তো বটেই সমাজের সার্বিক অবস্থারও কোন উন্নতি করা যাবে না। এইভাবে বাঙালী পুরুষরা তাঁদের পরিবারের মেয়েদের অংশতঃ আধুনিক করে তোলার প্রয়াস পেয়েছিলেন। এর ফলে মহিলাদের মূল্যবোধ, মনোভাব এমনকি নিজেদের সম্পর্কে নিজেদের ধারণারও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছিল।[১]

কিন্তু তার মানে এই নয়, ব্রিটিশ আমলে এসেই বাঙ্গালী মেয়েরা প্রথম শিক্ষার স্বাদ পেলেন। প্রাক্-ব্রিটিশ কালে বাঙ্গালী মেয়েদের প্রথাগত শিক্ষার বিশদ বিবরণ পাওয়া না গেলেও চৈতন্যদেবের প্রয়াণের কিছুদিনের মধ্যেই জাহ্নবীদেবী বা সীতাদেবীর মত কয়েকজন মহিলা ভক্তের নাম পাওয়া যায়। শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা দেবী ছিলেন বৈষ্ণবপদ রচয়িত্রী।[২] এরপর বহুদিন পর্যন্ত বৈষ্ণবীরা অন্তঃপুরে জ্ঞানের চর্চা প্রবহমান রেখেছিল। এর সাক্ষ্য দেন উইলিয়াম অ্যাডাম। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে যখন অজ্ঞানতা সর্বব্যাপী, তখন একমাত্র বৈষ্ণবরাই বিদ্যাচর্চা করতো। তিনি নাটোরে ১৪০০ বা ১৫০০ বৈষ্ণবের খোঁজ পেয়েছিলেন, যারা তাদের মেয়েদের শিক্ষার প্রতি যত্ন নিত।[৩] এভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ও উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় গঙ্গামণি দেবী, আনন্দময়ী দেবী, রূপমঞ্জরী, হটী বিদ্যালঙ্কার, দ্রবময়ী পণ্ডিত, শ্যামমোহিনী দেবী প্রভৃতি বিদ্যাবতী মহিলার কথা প্রমাণ করে যে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা সীমিতভাবে প্রচলিত ছিল।[৪] ঠাকুরবাড়িতেও যে বৈষ্ণবীরা এসে মেয়েদের শিক্ষাদান করত তার উল্লেখ পাওয়া যায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী গ্রন্থে : "......... মা গোঁসাই ছাড়া আর এক শ্রেণীর বৈষ্ণবী শিক্ষয়িত্রী সে যুগে পরিবারে পরিবারে গমন করিয়া মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইতেন। দ্বারকানাথের পরিবারেও তাহা করা হইত। ... তাঁহারা প্রতিদিন পড়াইতে আসিতেন, অনেক সময়ে ছাত্রীদের বাটীতেও থাকিতেন। এই সকল বৈষ্ণবীর শিক্ষাদান কেবল বাংলায় শেষ

---

১ গোলাম মুরশিদ, *সংকোচের বিহ্বলতা*, পূর্বোক্ত, পৃ: ১০।

২ সুকুমার সেন, *মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙ্গালী*, কলিকাতা, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ, পৃ: ৪৪।

৩ অনাথ নাথ বসু সম্পাদিত, *Adam's Report on the State of Education in Bengal, Calcutta*, 1941, পৃ: ১৮৯।

৪ ডঃ বসন্ত কুমার সামন্ত সম্পাদিত, *বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম দুটি মুদ্রিত গ্রন্থ*, *সাহিত্যলোক*, কলিকাতা ৬, অক্টোবর ১৯৯৪, পৃ.পৃ: ১৬-১৭।

হইত না, তাঁহারা সংস্কৃত ও বৈষ্ণব স্তবগুলিও অর্থের সহিত শিক্ষা দিতেন।"[৫] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও ছোটবেলায় দেখেছেন যে অন্দরমহলে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য একজন "ভব্যিযুক্ত তিলক কাটা" বৈষ্ণবী আসতেন।[৬]

বৈষ্ণবী শিক্ষয়িত্রীরা যে বিষয় পাঠ্য হিসাবে নির্বাচন করতেন তা ছিল বেশির ভাগই বৈষ্ণবধর্ম সংক্রান্ত। এছাড়া থাকত রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি। রাসসুন্দরী দেবী তাঁর আত্মকথায় জানিয়েছেন ঃ "আমার মন যেমন পুস্তক পড়ার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল, তেমনি পুস্তক পড়িয়া পরিতুষ্ট হইয়াছে। ঐ বাটীতে যে কিছু পুস্তক ছিল, ক্রমে ক্রমে আমি সকল পড়িলাম, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত আঠার পর্ব, জৈমিনিভারত, গোবিন্দলীলামৃত, বিদগ্ধমাধব, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, বাল্মীকিপুরাণ এই সকল পুস্তক ঐ বাটীতে ছিল।"[৭] বোঝা যাচ্ছে যে তখন মহিলাদের সামনে যে মূল্যবোধগুলি তুলে ধরা হতো তা হল মূলত বিশ্বাস ও ভক্তির আদর্শ। সীতা সাবিত্রীর পাতিব্রত্য ছিল মেয়েদের কাছে দাম্পত্য জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ।[৮] এ বিষয়ে নবীনচন্দ্র সেন তাঁর আত্মজীবনীতে জানাচ্ছেন ঃ ... "সন্ধ্যার সময়ে গ্রামটি মনসা পুঁথির পাঠের উচ্চ ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইত। প্রত্যেক বাড়ী বাড়ী তাহা মহাসমারোহে পঠিত হইত। সেরূপ অপরাহ্নে ও সন্ধ্যার সময়ে সমস্ত বৎসর বাড়ী বাড়ী রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কণ পাঠ হইত। এক এক জন কি মধুর কণ্ঠে কি ভাবতরঙ্গ তুলিয়া সে সকল পবিত্র কাব্য পাঠ করিতেন। নবীনা, প্রবীণা, বাল বৃদ্ধ দিবসের কার্য্য সারিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সেসকল উপাখ্যান শুনিতে শুনিতে শোক ও ভক্তিতে অশ্রুবর্ষণ করিতেন, এবং প্রেমে পবিত্রিত, বীরত্বে উদ্দীপিত, পুণ্যে মোহিত, পাপে রোমাঞ্চিত হইতেন। এই মহাগ্রন্থ সকল তাঁহাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়া, তাঁহাদের শোণিতে শোণিতে সঞ্চারিত হইয়া, তাঁহাদের শরীর ও চরিত্র গঠন করিত এবং কর্মে নিষ্কামতা, ধর্মে ভক্তি, অবিচলতা, অধর্মে ঘৃণার পরাকাষ্ঠা, পুণ্যে প্রবৃত্তি, পাপে নিবৃত্তি, জীবে দয়া, সত্যনিষ্ঠা, সতীত্বে সুখ শিক্ষা দিত। এমন উচ্চ শিক্ষা, তাহার এমন সহজ উপায়, তাহার এমন দেশব্যাপী সুফল, আর কোনো দেশ কি কখনও দেখাইতে পারিয়াছে?"[৯]

শুধু যে বৈষ্ণবী শিক্ষয়িত্রীরাই মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতেন তা নয়, বরঞ্চ মেয়েদের মধ্যে ব্যবহারিক শিক্ষারও চল ছিল তা জানা যায় অ্যাডামের রিপোর্ট থেকে। জমিদাররা প্রায় সকলেই তাঁদের মেয়েদের গোপনে শিক্ষা দিতেন, কারণ বৈধব্য ঘটলে তাঁরা যেন স্বামীর সম্পত্তি রক্ষা করতে পারেন। এমনও ঘটত যে বৈধব্যের পর জমিদারের কন্যা এবং পত্নীরা লেখাপড়া শিখতে শুরু করেছেন। কেবল রাজশাহী জেলাতেই পঞ্চাশ ষাটটি প্রধান জমিদারির

৫ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আত্মজীবনী*, কলিকাতা ১৯৬২, পৃ:পৃ: ২৫২-২৫৩।

৬ বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়, *জ্যোতিরিন্দ্রনাথের* জীবনস্মৃতি, কলিকাতা ১৩৮৯, বঙ্গাব্দ, পৃ: ২৫।

৭ নরেশচন্দ্র জানা, মানু জানা ও কমল কুমার সান্যাল সম্পাদিত *আত্মকথা*, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা ১৯৮১, গ্রন্থে "*আমার জীবন*" রাসসুন্দরী দেবীর আত্মকথা, পৃ: ৪১।

৮ সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, অন্দরে অন্তরে, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৫।

৯ নবীন চন্দ্র সেন, *নবীনচন্দ্র-রচনাবলী* গ্রন্থে আমার জীবন, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা ৬, সম্পাদক সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ : ৫ বৈশাখ ১৩৬৬, পৃ: ৬৯।

প্রায় অর্ধেকই মহিলারা পরিচালনা করতেন। এঁদের মধ্যে রাণী সূর্যমণি ও রাণী কমলমণি দাসী বাংলাভাষাতেও যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিসম্পন্না ছিলেন।[১০] শুধু অ্যাডামের রিপোর্টেই নয়, সমসাময়িক পত্রপত্রিকা এবং কিছু পরবর্তীকালের স্মৃতিকথাতেও মেয়েদের লেখাপড়া করার বিষয় জানা যায়। ১৮২২ সালের ৬ই এপ্রিল তারিখের "সমাচার দর্পণ" পত্রিকায় রাজশাহীর রাজা রামকান্ত রায়ের স্ত্রী মহারাণী ভবানীর কথা আছে যিনি "বিদ্যাভ্যাস দ্বারা রাজ্যশাসন" করতেন, কাশীতে তাঁর অন্নপূর্ণা খ্যাতি আছে এবং তিনি প্রাতঃস্মরণীয়া। ঐ একই সংখ্যায় ব্রাহ্মণ কন্যা হটী বিদ্যালঙ্কার ও শ্যামাসুন্দরীর কথা আছে। হটী কাশীতে অধ্যাপনা করতেন এবং সেখানে তিনি সমাদৃতা ছিলেন। শ্যামাসুন্দরীও "ব্যাকরণাদি ন্যায় পর্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন।"[১১] প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁর "আধ্যাত্মিক" পুস্তকের ইংরাজী ভূমিকায় লিখেছিলেন : "আমি যখন পাঠশালার ছাত্র, তখন আমি বাড়িতে ঠাকুরমা, মা ও খুড়ি-পিসিগণের সকলকেই বাংলা বই পড়তে, বাংলা লিখতে ও হিসাব রাখতে দেখেছি।"[১২] "সম্বাদ ভাস্কর" পত্রিকার সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ লিখলেন ঃ "কলিকাতা নগরে মান্য লোকদিগের বালিকারা প্রায় সকলেই বিদ্যাভ্যাস করেন, ঁপ্রাপ্ত রাজা সুখময় রায় বাহাদুরের পরিবারগণের মধ্যে বিদ্যাভ্যাস স্বাভাবিক প্রচলিত রূপ হইয়াছিল, বিশেষত রাজা সুখময় রায় বাহাদুরের পুত্র প্রাঁপ্ত রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুরের কন্যা ঁপ্রাপ্তা হরসুন্দরী দাসী সংস্কৃত, বাঙ্গলা, হিন্দী এই তিন ভাষায় এমত সুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন পণ্ডিতেরাও তাহাকে ভয় করিতেন।"[১৩] ঐ একই সংখ্যায় উল্লিখিত হয়েছে "শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব (সাতুবাবু) মহাশয়ের কন্যা গৌড়ীয় ভাষা, উর্দুভাষা, ব্রজভাষায় সুশিক্ষিতা হইয়াছেন এবং দেবনাগরাক্ষর লিখন পঠন বিষয়ে পণ্ডিতেরাও তাহার ধন্যবাদ করেন, বিশেষত শিল্পবিদ্যায় ঐ কন্যার যে প্রকার ব্যুৎপত্তি হইয়াছে অনুমান করি ইংলন্ড দেশীয়া প্রধানা শিল্পকারিকারাও তাঁহার শিল্পকর্ম দর্শনে হর্ষ প্রকাশ করিবেন।"[১৪] সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় মহিলাদের বিদ্যাবত্তার পরিচয়ই শুধু প্রকাশিত হত না, তখনকার বাঙালী সমাজে ধীরে ধীরে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ঘটছে আর এ সম্বন্ধে পুরুষদের মনোভাব পরিবর্তিত হচ্ছে তা-ও প্রকাশ পেতে থাকল। "সমাচার দর্পণ" (১৩ই এপ্রিল, ১৮২২) একটি সংবাদ পরিবেশন করল "ইদানীন্তন বিদ্যাবতী অনেক স্থানে অনেক স্ত্রী আছেন। এই কলিকাতা মহানগরের মধ্যে ভাগ্যবান লোকেরদিগের অনেক স্ত্রী প্রায় লেখাপড়া জানেন"[১৫] এখানে লক্ষণীয় যে স্ত্রীর লেখাপড়া জানাকে বাঙালী স্বামীরা সৌভাগ্যের সূচক বলে মনে করছেন।

তবে, মেয়েদের লেখাপড়া শেখার চল প্রধানত ধনবান সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল আর সব মেয়েরাই যে খুব বেশী লেখাপড়া জানতেন তা নয়। ১৮৩৭ সালে জন্মগ্রহণকারিণী

১০ *Adam's Report on the State of Education in Bengal*, পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ১৮৭-৮৯।

১১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা* প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, পৃ: ১১২।

১২ "While a pupil of the Pathsala at home I found my grandmother, mother and aunts reading Bengali books. They would write in the Bengali and keep accounts", প্যারীচাঁদ মিত্র, আধ্যাত্মিকা, কলিকাতা ১২৮৬ সাল, পৃ: i

১৩ "সম্বাদ ভাস্কর", সম্পাদকীয়, ৩১মে ১৮৪৯, ২২ সংখ্যা বিনয় ঘোষ সম্পাদিত, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, তৃতীয় খণ্ড পৃ: ৪০৯।

১৪ তদেব।

১৫ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৩।

কৈলাসবাসিনী দেবী বলেছেন "... ধনবন্ত ব্যক্তিরা জমিদারি প্রথানুসারে আপনাপন দুহিতাগণকে বাটীর রক্ষিত গুরু মহাশয়ের হস্তে শিক্ষার্থে অর্পণ করিতেন। কন্যাগণ নবম বা দশম বর্ষবয়ঃক্রমাবধি শুভঙ্করী ধারানুসারে কড়া, গণ্ডা, গুণকিয়া, চৌকিয়া ইত্যাদি অঙ্ক ও গুরুদক্ষিণা গঙ্গাবন্দনা ও চাণক্যশ্লোকের দুই এক পদ মাত্র শিক্ষা করিয়া বিদ্যার পরিসমাপ্তি করিতেন, পরে বয়োবৃদ্ধি হইলে যখন সংসারে ব্রতী হইতেন, তখন দুই একখানি সামান্য গ্রন্থপাঠ এবং প্রাত্যহিক ইষ্টপূজাকালীন শ্রীফলদলে উপাস্যদেবতার সহস্রনাম চন্দনদ্বারা অঙ্কিতকরত: পূজা করিতেন ... ।"[১৬] এছাড়া, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ উল্লেখ করেছেন যে একটি সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে এক বয়স্কা রমণী বিদ্যাভ্যাস করেছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পুত্রের মৃত্যুতে সান্ত্বনা লাভ করাব জন্য স্তোত্র পাঠ করতে শেখা।[১৭] রাজা রাধাকান্ত দেবও ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে রচিত *Female Education* গ্রন্থে দাবী করেছেন যে তাঁর পরিবারের প্রায় প্রত্যেক মহিলাই কমবেশি সুশিক্ষা লাভ করেছিলেন।[১৮] তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ব্রিটিশরা এদেশে আসার আগে বা ব্রিটিশ পর্বের প্রথমাবস্থায় এদেশের মেয়েরা যে সকলেই নিরক্ষর ছিলেন তা নয়। তবে একথাও সত্য যে মেয়েদের লেখাপড়া জানা ব্যতিক্রম ছিল। অ্যাডাম লক্ষ কবেছেন যে মেয়েদের মধ্যে সাধারণত লেখাপড়ার প্রচলন ছিল না : "চরম এবং অসহায় অজ্ঞানতা ছিল তাদের ভাগ্য। পিতামাতার চিন্তায় একথা কখনো প্রবেশ করত না যে শিশু কন্যাদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে, আর বালিকারা ঐ ত্রুটিপূর্ণ গার্হস্থ্য শিক্ষার থেকেও বঞ্চিত হত যা কখনো কখনো ছেলেদের দেওয়া হত।"[১৯] মেয়েদের লেখাপড়া শেখা যে অনুমোদিত হত না তা বোঝা যায় যে অনেক সময় মহিলারা তা গোপন করার চেষ্টা করতেন। তাঁর স্মৃতিকথায় জ্ঞানদানন্দিনী লিখেছেন : "সে সময় ওদেশে মেয়েদের লেখাপড়া বড় নিন্দনীয় ছিল। আমি একদিন রাত্রে হঠাৎ জেগে উঠে মাথা তুলে দেখি যে আমার মা কি লিখছেন না পড়ছেন, আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি সেগুলো সব ঢেকে ফেললেন, পাছে আমি ছেলেমানুষ কাউকে বলে ফেলি। আমাদের এক প্রতিবেশিনী বয়স্কা আত্মীয়া লেখাপড়া জানতেন, লোকনিন্দার ভয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে হিসেব কিতাব চিঠিপত্র লিখতেন। তবু কিরকম করে' টের পেয়ে লেখাপড়া করেন বলে পাড়ার লোকে তাঁর নিন্দা করত।"[২০] এই লোকনিন্দা হওয়ার কারণ ছিল এই যে স্বামীরা স্ত্রীশিক্ষাকে অশুভ বলে মনে করত। অ্যাডাম লক্ষ করেছেন যে মেয়েদের লেখাপড়া শেখান একটি গর্হিত অপরাধের মধ্যে গণ্য হত এবং লিখতে পড়তে পারে এমন মেয়েকে কেউ বিয়ে করতে চাইত না।

১৬ কৈলাসবাসিনী দেবী, *হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস* ও তাহার সমুন্নতি, কলকাতা, ১৭৮৭ শক, পৃ:পৃ: ২৩-২৪।

১৭ সীতারাম তত্ত্বভূষণ, Social Reform in Bengal (1904), Calcutta 1982, p. 70. *অন্দরে অন্তরে* গ্রন্থের পৃ: ৭৫ পাদ টীকায় উল্লিখিত।

১৮ তদেব।

১৯ "Absolute and hopeless ignorance is in general their (women's) lot. The notion of providing the means of instruction for female children never enters into the minds of parents; and girls are equally deprived of the imperfect domestic instruction which is sometimes given to boys." — Adam's Report, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৮৭

২০ *জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর* স্মৃতিকথা, এক্ষণ পত্রিকা, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৯৭, পৃ: ৪।

বিয়ের পরে যদি প্রকাশ পেত যে তাদের স্ত্রীরা লেখাপড়া জানে তবে স্বামীরা প্রতারিত বোধ করত।[২১] কৈলাসবাসিনী দেবীর লেখা থেকেও মেয়েদের লেখাপড়া করার প্রতি বিরুদ্ধভাব ছিল একথাই প্রতিপন্ন হয় : "তৎকালীন পণ্ডিতগণ কহিতেন যে সংস্কৃত শাস্ত্রে অবলা জাতির অধিকার নাই, আর স্ত্রীগণ গৃহমধ্যে কালির অঙ্কপাত করিলে লক্ষ্মী ত্যাগ হয়, এবং উহারা যে কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করুক না কেন তাহাতেই উহাদিগের বিষমানিষ্টের সম্ভাবনা, আরও কহিতেন যে স্ত্রীগণ বিদ্যাধ্যয়ন করিলে অকালে বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হয়। অতএব এইরূপ নানাবিধ অসঙ্গত বাক্যের দ্বারা তাহারা বামাগণকে বঞ্চনা করিতেন...।[২২] রাসসুন্দরী দেবীও একই কথা বলেছেন : "সেকালে মেয়েছেলের বিদ্যাশিক্ষা ভারী মন্দকর্ম বলিয়া লোকের মনে বিশ্বাস ছিল"।[২৩] বিদুষী মহিলার বৈধব্য অনিবার্য এ আশঙ্কা যে সমাজে কিরকম বদ্ধমূল ছিল তার অভিজ্ঞতা হয়েছিল বরিশাল নিবাসিনী সৌদামিনী রায়ের। মেধাবিনী হওয়া সত্ত্বেও পাঠশালা থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন এই অজুহাতে। এ ছাড়াও আরো নানা রকম আশঙ্কা তখনকার সমাজে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে কাজ করত। পুরুষদের আশঙ্কা ছিল যে লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা পুরুষদের অধীনস্থ নাও থাকতে পারে। মেয়েরা লিখতে শিখে পরপুরুষের সঙ্গে অবৈধ পত্রালাপ করবে — এরকম অর্থহীন আশঙ্কাও বিরল ছিল না।[২৪] কৈলাসবাসিনী, রাসসুন্দরী বা সৌদামিনীদের বহু পরেও স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে সমাজের মনোভাব যে খুব পরিবর্তিত হয়েছিল তা নয়। নবীনচন্দ্র সেন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন : "এত দিন অনেক চেষ্টা করিয়া, অনেক বক্তৃতা করিয়া, অনেক সমাজ সংস্কারের দোহাই দিয়া একটি বালিকারও লেখাপড়া আরম্ভ করাইতে পারি নাই। এরূপ প্রস্তাব করিলেই অভিভাবকেরা একবাক্যে বলিয়া উঠিতেন—"কেন? মেয়েদের লেখাপড়ার কি প্রয়োজন? তাহারা-কি চাকরি করিবে?" চাকরি করাই যে এই হতভাগ্য দেশে লেখাপড়া শেখার একমাত্র উদ্দেশ্য তাহা বোধহয় এখন দেশব্যাপী বিশ্বাস। তাহার উপর সকলের স্থির বিশ্বাস, লেখাপড়া শিখিলে মেয়ে বিধবা হইবে, দুশ্চরিত্র ত হইবেই।"[২৫]

স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সমাজের এরকম সার্বিক প্রতিকূল মনোভাব কেন ছিল নানা দৃষ্টিকোণ থেকে তা আলোচনা করা যেতে পারে। অ্যাডাম তাঁর রিপোর্টে বলেছেন যে পুরুষরা শিক্ষিতা মেয়ে বিবাহ করতে ভয় পেত এই কারণে যে বিদ্যার ধারণাতীত শক্তি হয়তো মহিলাদের আর পুরুষদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে না। এ ছাড়াও, তারা ভয় পেত আরও এই ভেবে যে লিখতে জানা মহিলার পক্ষে পরপুরুষের সঙ্গে অবৈধ পত্রালাপ করা অসম্ভব নয়।[২৬] আসলে

২১ রেভারেন্ড জেম্‌স্ লঙ (সম্পাদিত) Adam's Reports on Vernacular Education in Bengal and Bihar, London 1868, পৃ: ৭৬।

২২ কৈলাসবাসিনী দেবী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৭।

২৩ নরেশচন্দ্র জানা, মানু জানা ও কমল কুমার সান্যাল সম্পাদিত, *আত্মকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৭০।

২৪ বিনয় ঘোষ সম্পাদিত, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, তৃতীয় খণ্ড পৃ. ৫৪২।

২৫ নবীন চন্দ্র সেন, আমার জীবন, পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৮।

২৬ *The Changing Role of Women in Bengal 1849-1905*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৬১।

এ দেশে বাল্যবিবাহ শাসিত এবং অবরুদ্ধ মেয়েদের জীবনে শিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হত না, আর স্ত্রীশিক্ষার সুযোগ ছিল দুর্লভ। কারণ বাল্যবিবাহ রীতি প্রচলিত থাকার ফলে মেয়েরা ছোটবেলা থেকে সংসারের কাজে নিয়োজিত হত। তাই তাদের লেখাপড়া শেখার সময়ও থাকত না, আর তার আবশ্যকতাও কেউ বোধ করত না। কাজেই এদেশে স্ত্রীশিক্ষার দুটি প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল বাল্যবিবাহ এবং অবরোধ প্রথা।[২৭] স্ত্রীশিক্ষার প্রতি বিরোধিতার আরেকটি কারণ হল এই যে স্ত্রীশিক্ষা অর্থকরীভাবে লাভজনক ছিল না। যেখানে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর পেছনে নানারকম কুসংস্কার কাজ করত সেখানে তাদের চাকরী করতে পাঠানো সুদূরপরাহত ছিল। তাই তাদের শিক্ষা দিয়ে লাভ কি এরকম একটি মনোভাব স্ত্রীশিক্ষাহীনতার জন্য দায়ী ছিল। বিপরীত পক্ষে, মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো বেশ ব্যয়সাপেক্ষ ছিল। বইখাতা কেনা, স্কুলে যাবার পোশাক, যানবাহনের ব্যয়, আনুষঙ্গিক উপকরণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে অর্থের প্রয়োজন হত। মেয়েরা শিক্ষাগ্রহণে ব্যস্ত থাকার ফলে তারা গৃহকর্মে সময় ও শ্রম কোনটাই ব্যয় করতে পারত না, এর জন্য আবার বেতন দিয়ে সাহায্যকারী রাখতে হত। সর্বোপরি এই আশঙ্কা ছিল যে শিক্ষিতা মহিলারা হবেন গৃহকর্মবিমুখ।[২৮] এই ধারণা যে সমাজে কতভাবে প্রোথিত ছিল তা বোঝা যায় যখন নবীনচন্দ্র সেন তাঁর আত্মজীবনীতে লেখেন : "যদি অশিক্ষিতা শাশুড়ীর, কি আত্মীয়ার, কি শিক্ষিত 'প্রিযতমে'র ঘাড়ে গৃহকর্ম, এমনকি, সন্তান প্রতিপালন পর্যন্ত চাপাইয়া দিয়া বাঙ্গালার উপন্যাস ও বিদ্যাসুন্দর পাঠ করাই শিক্ষা হয়, তবে আজ দেশ স্ত্রীশিক্ষায় টলটলায়মান। যদি কথায় কথায় সূর্যমুখীর মত গৃহত্যাগ, কুন্দনন্দিনীর মত বিষপান, ভ্রমরের মত দারুণ অভিমান স্ত্রীশিক্ষা হয়, তবে আজ স্ত্রীশিক্ষায় দেশ টলটলায়মান। যদি বিমলার চতুরতা, গিরিজায়ার চটুলতা, এবং আসমানীর বণিকতার অনুকরণ স্ত্রীশিক্ষা বল, তবে আজ স্ত্রীশিক্ষায় দেশ টলটলায়মান। যদি অহোরাত্রি স্বামীর দোষ অনুসন্ধান ও তস্য শাসন, উপন্যাসোদ্ধৃত তীব্র বাক্যানলে তস্য অস্থি মজ্জাদাহন ও পরিবারবর্গের মর্মপীড়ন স্ত্রীশিক্ষা, তবে আজ স্ত্রীশিক্ষায় সত্যসত্যই দেশ টলটলায়মান। যদি সংসারে অসচ্ছলতা, হৃদয়ে অশান্তি, কর্তব্যে ভ্রান্তি, স্ত্রীশিক্ষার ফল হয়, তবে আর ভাবনা নাই, আজ স্ত্রীশিক্ষায় দেশ টলটলায়মান।"[২৯] স্ত্রীশিক্ষার সম্বন্ধে তখনকার সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী কিরকম ছিল এই উদ্ধৃতিতে তার সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে।

এরকম পরিস্থিতিতে মিশনারীরাই বাংলাদেশে মেয়েদের জন্য প্রথম পৃথক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। ১৮১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন সোসাইটির উদ্যোগে শ্রীরামপুরস্থ তাঁদের একটি বালকদের বিদ্যালয়ে মাদুরের বেড়া দিয়ে পৃথক করে কিছু দেশীয় বালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল।[৩০] কিন্তু এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন লন্ডন মিশনারী সোসাইটির যাজক রবার্ট মে। তিনি ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে

২৭ গীতশ্রী বন্দনা সেনগুপ্ত, *স্পন্দিত অন্তর্লোক*, পূর্বোক্ত, পৃ: পৃ: ৬৬-৬৭।

২৮ Meredith Borthwick, *The Changing Role of Women in Bengal*, 1849-1905 পূর্বোক্ত, পৃ: ৬১।

২৯ নবীন চন্দ্র সেন, *আমার জীবন*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৮-৬৯।

৩০ বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম দুটি মুদ্রিত গ্রন্থ, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৪।

হুগলী জেলার চুঁচুড়া শহরে ১৪ জন ছাত্রী নিয়ে যে বিদ্যালয় শুরু করলেন, তাই হল এদেশের প্রথম স্বতন্ত্র বালিকা বিদ্যালয়।[৩১] অবশ্য ঐ বৎসর ১২ই আগষ্ট মে সাহেবের অকালমৃত্যুতে ঐ স্কুলটি বন্ধ হয়ে গেল। কারণ, মে সাহেবের পর লন্ডন মিশনারী সোসাইটি আর বাংলার স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহী রইল না, তৎকালীন কোম্পানী সরকার বিদ্যালয়টি বন্ধ করে দিলেন। এরপর ১৮১৯ সালের জুন মাসে কলিকাতা শহরে প্রতিষ্ঠিত হল *The Female Juvenile Society for the Establishment and Support of Bengalee Female Schools* নামে একটি খ্রীষ্টান মহিলা সমিতি। এদের উদ্যোগে নন্দনবাগান, গৌরীবেড়ে, জানবাজার ও চিৎপুর অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হল। যে মহিলাদের আর্থিক পোষকতায় বিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হয়েছিল তাঁদের মাতৃভূমির নামেই সেগুলির নামকরণ হয়েছিল, যেমন—লিভারপুল স্কুল, বার্মিংহাম স্কুল, সালেম স্কুল ইত্যাদি।[৩২] ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির বিদ্যালয় সংখ্যা ক্রমে কুড়িটিতে পৌঁছেছিল। কলিকাতা এবং কলিকাতার উপকণ্ঠে ছাড়া কাটোয়া এবং বীরভূমেও সোসাইটির কয়েকটি বিদ্যালয় ছিল। ১৮২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে স্কুল সোসাইটির ছাত্রদের সঙ্গে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির স্কুলের ছাত্রীরাও পরীক্ষা দেয় এবং প্রশংসালাভ করে।[৩৩] *British and Foreign Society* নামে বিলেতের খ্রীষ্টান মিশনারীদের সহযোগিতায় এবং শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনারী উইলিয়াম ওয়ার্ডের অনুপ্রেরণায় ১৮২১ সালের নভেম্বর মাসে মিস মেরী অ্যান কুক এদেশে এলেন নারীশিক্ষা বিস্তারের সংকল্প গ্রহণ করে। মিস কুক কলিকাতা এসে চার্চ মিশনারী সোসাইটিতে যোগদান করলেন।[৩৪] এক বছরের মধ্যেই তাঁর চেষ্টায় কলিকাতার ঠনঠনিয়া, মির্জাপুর, শোভাবাজার, শ্যামবাজার, মল্লিকবাজার, কুমোরটুলি প্রভৃতি অঞ্চলে আটটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল।[৩৫] ১৮২৪ সালের ২৫শে মার্চ লেডী আমহার্স্ট-এর পৃষ্ঠপোষণায় প্রতিষ্ঠিত হল Ladies' Society for Native Female Education-এই সভা মিস কুক প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। এই সোসাইটির একজন উৎসাহী অনুরাগী ছিলেন ডেভিড হেয়ার। স্কুলের বিভিন্ন পরীক্ষায় তিনি আগ্রহের সঙ্গে উপস্থিত থাকতেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিদ্যালয় সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াল ত্রিশ।[৩৬] মিস কুকের স্কুলগুলি শহরের চারিদিকে দূরে দূরে ছড়িয়ে ছিল বলে চার্চ মিশন স্থির করল যে একটি সেন্ট্রাল ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করবে। সেই মত ১৮২৬ সালের ১৮মে, কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারের পূর্ব কোণে এই কেন্দ্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপনা হয়। রাজা

৩১ তদেব, পৃ: ১৩।

৩২ The Calcutta Journal, 11 March, 1822.

৩৩ যোগেশ চন্দ্র বাগল, বাংলার স্ত্রীশিক্ষা, কলিকাতা, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ, পৃ:পৃ: ৩-৭।

৩৪ স্পন্দিত অন্তর্লোক, পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ৬৯-৭০।

৩৫ Priscilla Chapman, *Hindoo Female Education,* London 1939, p.p. 75-80, বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ, প্রথম ওরিয়েন্ট লংম্যান সংস্করণ, (৩ খণ্ড একত্রে) পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৩, গ্রন্থের পাদটীকা, ৫৮৪ পৃ:-তে উল্লিখিত।

৩৬ স্পন্দিত অন্তর্লোক, পূর্বোক্ত, পৃ: ৭০।

বৈদ্যনাথ রায় ২০,০০০ টাকা দান করলেন। ১৮২৮ সালের ১লা এপ্রিল থেকে এই বিদ্যালয়ের কার্যারম্ভ হয় ৫৮ জন ছাত্রী নিয়ে। ১৮২৯-৩০ সালের মধ্যে ছাত্রীসংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৫০-২০০। এদের ২০টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল। ৪টি শ্রেণীর ৫০ জন ছাত্রী পড়ত ম্যাথুর গসপেল আর পিয়ার্সের ভূগোল আর শ্লেটে শ্রুতলিপি লিখত। ৬টি শ্রেণীর ৬০ জন ছাত্রী পড়ত বাইবেল, ইতিহাস ও প্রাথমিক পুস্তক। ১০ টি শ্রেণীর ছাত্রীদের বর্ণপরিচয় করানো হত।[৩৭]

এইভাবে মিশনারীদের উদ্যোগে এবং মিস কুক-এর বিশেষ আগ্রহে বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচার শুরু হল। এ প্রসঙ্গে মুসলমানদের সক্রিয়তার কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮২৫ সালে Ladies' Association নামে আরেকটি মহিলা সমিতি স্থাপিত হল। এরও প্রেসিডেন্ট ছিলেন মিস কুক, ততদিন অবশ্য তিনি রেভারেন্ড উইলসনের সঙ্গে বিবাহিত হয়ে মিসেস উইলসন নামে পরিচিত হয়েছেন। এই Ladies' Association প্রধানত মুসলমানপ্রধান জানবাজার ও এন্টালি অঞ্চলে কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই সব অঞ্চলের স্থানীয় মুসলমানরাই বালিকা বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠার কাজে উৎসাহ ও সহায়তা দিয়েছিল। এর আগে ১৮২২ সালে মিস কুক যখন শ্যামবাজাব অঞ্চলে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তখন একজন মুসলমান মহিলা নিজে বাড়ী বাড়ী ঘুরে বিদ্যালয়ের জন্য বালিকা সংগ্রহ করেছিলেন এবং নিজের পাড়ায় একটি বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার উৎসাহের জন্য পরে এই স্কুলটির বেশ উন্নতি হয়েছিল এবং ছাত্রীসংখ্যাও বেড়েছিল। যে সময় মুসলমান পুরুষরাও ইংরাজী শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহী, সে সময় একজন মুসলমান মহিলা ইংরাজী শিক্ষার প্রসারে সচেষ্ট হয়েছেন, তা-ও আবার মুসলমান নারীদের জন্য, তা খুবই বিস্ময়জনক। এছাড়া মির্জাপুর, এন্টালি জানবাজার প্রভৃতি অঞ্চলের স্থানীয় মুসলমানরাও মিস কুককে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছিলেন।[৩৮] মিস কুকের শিক্ষাদান পদ্ধতি যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল এবং কেন করেছিল তা জানা যায় ১৮২৩ সালের ৮ই মার্চ তারিখের "সমাচার দর্পণ" পত্রিকা থেকে : "প্রথমত, কতকদিন পর্যন্ত বালিকারা ক খ লিখে তাহাতে প্রস্তুতা হইলে পর বাঙ্গালী ইতিহাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠ করে তাহাতে নৈপুণ্য জন্মিলে পর শিল্প বিদ্যাশিক্ষা করে এই কর্মে যত লাভ হয় তাহা তাহাদিগেরকে পারিতোষিকের মত দেওয়া যায় সেই লাভ দেখিয়া শিল্পকর্ম করিতে অনেকের লোভ জন্মিয়াছে তাহাতে ছয় পাঠশালাতে প্রায় এক হাজারখানা গামছা কিনারা সিলাই হইয়াছে এবং কোন কোন পাঠশালাতে মোজা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে এখন পোনর পাঠশালাতে তিনশত বালিকা শিক্ষা পাইতেছে।[৩৯] কলিকাতার আশেপাশেও যে এইভাবে পারিতোষিক দিয়ে ছাত্রীদের আকর্ষণ করা হত তাও "সমাচার দর্পণ" পত্রিকাই

৩৭ *বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ*,, পূর্বোক্ত, পৃ: ২১৩।

৩৮ তদেব, পৃ:পৃ: ২১৩-২১৪।

৩৯ সংবাদপত্রে সেকালের কথা (প্রথম খণ্ড) পূর্বোক্ত, পৃ: ১৪।

জানায়। ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দের ১০ই এপ্রিল তারিখের সংখ্যা থেকে জানা যায় যে শ্রীরামপুরের গোপাল মল্লিকের বাড়িতে যে পরীক্ষা নেওয়া হয় তাতে মোট তেরটি বিদ্যালয়ের ২৩০ জন ছাত্রী উপস্থিত হয়েছিল। "পরীক্ষার পর বিবি মার্সমন (মার্শম্যান) উঠিয়া বালিকাদিগকে বস্ত্র ও সিকি ও পয়সা ও ছবি ইত্যাদি পারিতোষিক দিলেন এবং অপর সকলে সন্দেশ পাইয়া সন্তুষ্টা হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।"[৪০]

মিশনারীদের স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের প্রয়াসে যথেষ্ট আন্তরিকতা ও সদুদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ সম্ভ্রান্ত হিন্দুসমাজের দুর্ভেদ্য অন্তঃপুরে বিশেষ কোনো সাড়া জাগাতে পারেনি। তার প্রধান কারণ ছিল যে মিশনারীদের উৎসাহকে তাঁরা সন্দেহের চোখে দেখতেন। পুরুষ শিক্ষক দিয়ে লেখাপড়া শেখানোর বিভিন্ন অসুবিধার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ধর্মান্তরকরণের ভয়, তাঁরা মনে করতেন যে শিক্ষার প্রসারের চেয়ে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য এবং স্ত্রীশিক্ষার সূত্র ধরে খ্রীষ্টান মহিলারা যদি একবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারেন, তাহলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিপর্যয় ঘটবে। এর মধ্যে ছেলেদের দিয়েই তার কিছু আভাস তাঁরা পেয়েছিলেন, তাই মেয়েদের আর খ্রীষ্টান মহিলা ও পাদরীদের হাতে সমর্পণ করতে ভরসা পেলেন না।[৪১] প্রসন্নকুমার ঠাকুরের লেখায় এই আশঙ্কার প্রতিফলন ঘটল : "স্ত্রী-বিদ্যালয়ে উদারতর শিক্ষাব্যবস্থার জন্য আমরা সুপারিশ করব। এখানকার ছাত্রীদের সাধারণ জ্ঞান অর্জনের শিক্ষা দেওয়া হোক এবং এই বিদ্যালয়ের পরিচালকবৃন্দ যাদের শিক্ষা দিতে চাইছেন তাদের সংস্কারজনিত জাতীয় অনুভূতির প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করুন। তখন তাঁদের প্রশংসনীয় উদ্দেশ্য সফল হওয়ার সম্ভবনা থাকবে এবং পুরুষদের মধ্যে হিন্দু কলেজ যেভাবে এগিয়েছে, তাঁদের প্রতিষ্ঠান সেইভাবে হিন্দু স্ত্রীলোকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে সক্ষম হবে।"[৪২] কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারের পূর্ব কোণে যে কেন্দ্রীয় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার পাঠ্যসূচী ও পরীক্ষা ব্যবস্থায় খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্তি দেখে প্রসন্নকুমার ঠাকুর এই মন্তব্য করেছিলেন। এই কারণে মিশনারীদের স্ত্রীশিক্ষার প্রচেষ্টা হিন্দু সমাজের অবহেলিত অসহায় স্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮৩১ সালের ২৫শে জুন "সমাচার দর্পণ"-এ "বাঙ্গালা সমাচারপত্রের মর্ম্ম" অংশে "বঙ্গদূত" পত্রিকার একটি রচনার উদ্ধৃতি দেওয়া

৪০ তদেব, পৃ: ১৫।

৪১ *বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ*, পূর্বোক্ত, পৃ: ২১৪।

৪২ "We would recommend a more liberal system of education to be adopted in the female school. Let its pupils be initiated with general knowledge, and let its managers pay a particular attention to the national perjudices of those whom they wish to educate. They will then be more likely to succeed in the laudable object of their undertaking, and we have no doubt their instruction will commence to cause the spread of knowledge amongst the Hindu females, which the Hindu College has done amongst the men." — The Reformer, 19th December, 1931. বাংলা অনুবাদ করেছেন বসন্ত কুমার সামন্ত। তাঁর সম্পাদিত "বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম দুটি মুদ্রিত গ্রন্থ-এর পৃ: ২৩ এ।

হয়েছিল : "মিসিনারি সাহেবরা প্রায় বিংশতি বৎসরাবধি বাজারে ২ বালিকা পাঠশালা করিয়া বহুবিধ বিত্তব্যয় ও ব্যসনপূর্বক বাগদী ব্যাধ ব্যেদে বেশ্যা বৈরাগি বালিকাদের বাঙ্গালা বিদ্যা বিতরণার্থ বিস্তার ব্যাপার করিতেছেন কিন্তু তাহার ফল কেবল ফলা বানান পর্যন্ত দৃষ্ট হইতেছে অধিক হওনের বিষয় কি"।[৪৩] তাহলে দেখা যাচ্ছে যে একদিকে ধর্মান্তকরণের ভয়, অন্যদিকে নীচজাতীয়া রূপোপজীবিনী মেয়েদের সঙ্গে সংসর্গের ফলে জাত হারানোর আশঙ্কা এই দুই কারণে মিশনারীদের প্রয়াস সার্থকতা লাভ করেনি। এ বিষয়ে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মত উল্লেখ্য। যদিও প্রসন্নকুমার কেন্দ্রীয় বালিকা বিদ্যালয় সম্পর্কে এ মত প্রকাশ করেছিলেন তবুও স্ত্রীশিক্ষার সামগ্রিক বাধা সম্পর্কে তা প্রাসঙ্গিক : এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরা বেশির ভাগ নিম্নতম শ্রেণীর, যারা সম্মানীয় দেশীয় লোকদের বাড়ি যাবার সুযোগ প্রায় পায় না। এইসব মহিলাদের জন্য সম্মানীয় মহিলাদের সুযোগ পাওয়া কঠিন হবে, বিশেষ করে যখন জানা যাচ্ছে যে তাদের শিক্ষা প্রধানত হবে নতুন বাইবেল এবং ধর্মীয় ঘটনাবলী নিয়ে। জাতের কুসংস্কার এবং খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে দেশীয় লোকেরা যে বলবত্তর কুসংস্কার বহন করে— বর্তমানে এই দুটিই তাঁদের প্রচেষ্টার সার্থকতার পথে অনতিক্রম প্রতিবন্ধক বলে মনে হয়।"[৪৪] এসব কারণে মিশনারীরা যেসব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেখানে দীর্ঘদিন পর্যন্ত কোন ভদ্রবাড়ির মেয়েরা পড়তে আসত না কারণ ভদ্রপরিবারের মেয়েদের পক্ষে বাইরে যাওয়া দূষণীয় উনবিংশ শতকের দীর্ঘসময় জুড়ে এই মূল্যবোধ ক্রিয়াশীল ছিল। "যে মেয়ে বাইরে যায় সে হয় নীচ জাতীয়া নইলে সর্বজনগমা"[৪৫] এই মানসিকতার ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে মেয়েরা প্রকাশ্যে বিদ্যালয়ে যাওয়ার স্বাধীনতাও পেত না অধিকাংশ ভদ্র পরিবারে। সে কারণেই মিশনারীরা ছাত্রীদের আকর্ষণ করার জন্য অর্থ পুরস্কারেরও ব্যবস্থা রেখেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের নারীশিক্ষা বিস্তারের প্রত্যক্ষ ফল খুব আশাপ্রদ নয়। কিন্তু পরোক্ষে এই প্রয়াস শিক্ষিত মানুষের মনে সচেতনতা সৃষ্টি করেছিল। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁরা নিজেদের ধর্মীয় স্বার্থে যেটুকু সাড়া জাগিয়েছিলেন তাতে পরবর্তীকালে কিছুটা সুফল ফলেছিল।

সেকালে শিক্ষিত বাঙ্গালীরা ধর্মান্তর করার এই প্রয়াসের নিন্দা করলেও মিশনারীরা দেশীয় ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সমালোচনা করেন, তার আংশিক সত্যতা অস্বীকার করতে পারেননি। তা ছাড়া, ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদরা প্রাচীন ভারতের গৌরবময় অতীতকে

৪৩ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদিত, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা (দ্বিতীয় খণ্ড)*, কলিকাতা, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃ:পৃ: ৯১-৯২।

৪৪ "The pupils of this institution consist for the most part of the lowest classes, who are not permitted to frequent the houses of the respectable natives. For these women it will be difficult to find access to the respectable females, particularly when it is known that their education consists chiefly of the knowledge of the New Testament and The Religious Facts. Prejudice of caste and the stronger prejudice which the generality of natives continue to entertain against the success of their endevaours." The Reformer, 19th December, 1831.

৪৫ *অন্দরে অন্তরে*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৫।

আবিষ্কার করতে গিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে সমকালীন ধর্মীয় এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রাচীন রীতিনীতির বর্বর বিকার ছাড়া আর কিছুই নয়। এর ফলে শিক্ষিত ব্যক্তিরা সচেতন ভাবে নিজেদের সামাজিক রীতিনীতির বিশ্লেষণ এবং পুনর্মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। যে সময় মিশনারীরা বা প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদরা ভারতীয় সামাজিক অবস্থার সমালোচনা করেছিলেন সে সময় পাশ্চাত্য দুনিয়াতেও মেয়েদের খুব উঁচু নজরে দেখা হত না। ১৮৪৫ সালে প্রকাশিত রাশিয়ার একটি সরকারী প্রতিবেদনে বলা হল : "প্রকৃতিই নিম্নশ্রেণীর জীব হিসাবে মহিলাদেরকে অপরের ওপর নির্ভরশীল করে সৃষ্টি করছে।"[৪৬] এর অনেক পরে ১৯১২ সালের ২৮শে মার্চ তারিখের *The Times* পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রে তখনকার একজন নামকরা শল্য চিকিৎসক স্যার এ. ই. রাইট দাবি করেন যে মেয়েদের মানসিক ক্ষমতা পুরুষের চেয়ে কম এবং তাদের মানসচিত্র বিকৃত।[৪৭] কাজেই ইংল্যান্ডের মতো সুশিক্ষিত এবং উদারনীতিতে বিশ্বাসী সমাজ যদি মেয়েদের সম্পর্কে এমন হীন ধারণা পোষণ করতে পারে তবে বঙ্গদেশে মেয়েদের সম্পর্কে যে শ্রদ্ধাবোধ থাকবে না, তা সহজেই অনুমেয়। তবুও বাঙালী মেয়েদের সঙ্গে পশ্চিমী মেয়েদের পার্থক্য ছিল। কারণ পশ্চিমী মহিলাদের লেখাপড়া বা নাচ-গান শেখার উপরে কোন বাধানিষেধ ছিল না। তাঁরা অন্তঃপুরের চার দেওয়ালের মধ্যে বদ্ধ নন, কিংবা জ্ঞানের আলোক থেকেও বঞ্চিত নন। এভাবে পাশ্চাত্য সমাজের সঙ্গে তুলনা করে এদেশের নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিরা মহিলাদের হীন দশা সম্পর্কে ধীরে ধীরে সচেতন হলেন এবং তাঁদের উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হলেন। এইভাবেই রাজা রামমোহন রায় প্রথম বাঙালী মহিলাদের হীনাবস্থা সম্পর্কে সোচ্চার হলেন। তিনি জেরেমি বেন্থাম ও রবার্ট আওয়েনের বন্ধু ও তাঁদের রচনার পাঠক হিসাবে মহিলাদের দুর্দশা সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। তিনি যখন ইংলন্ড গিয়েছিলেন তখন সেখানকার মেয়েদের গুণাবলী ও উৎকর্ষতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং উপলব্ধি করেছিলেন যে শিক্ষাদান ব্যতীত মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়।[৪৮] কলকারখানার শ্রমিক এবং নারীদের অবস্থার উন্নতির জন্য ইংলন্ড ও যুক্তরাষ্ট্রে যে ইউনিট্যারিয়ান আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল রামমোহন তার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। উইলিয়াম অ্যাডাম, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সহায়তায় তিনি কলিকাতাতে একটি ইউনিট্যারিয়ান সভা স্থাপন করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই রামমোহন ও তাঁর বন্ধুরা এবং পরবর্তীকালে অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরী চাঁদ মিত্র, দুর্গামোহন দাস, শিবনাথ শাস্ত্রী এমনকি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও ইউনিট্যারিয়ান আন্দোলনের প্রভাবে মহিলাদের উন্নতি করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

৪৬ R.T. Evans, The Feminists : Women's Emancipation Movement in Europe, America and Australia (London : Croom Helm, 1977) পৃ: ১১৪, সংকোচের বিহ্বলতা, পূর্বোক্ত, পৃ: ১২-তে উল্লিখিত।

৪৭ C. Rover, Love, Morals and The Feminists (London · Routledge and K. Paul, 1970) পৃ: ১৪৯, তদেব, পৃ: ১৩-তে উল্লিখিত।

৪৮ গোলাম মুরশিদ, *সংকোচের বিহ্বলতা*, পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ১৩-১৫।

এইভাবে ইংরেজী শিক্ষিত সমাজে মহিলাদের সম্পর্কে একটি নতুন মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটল, যা আবার একটি নতুন সমস্যা রূপে দেখা দিল। এই সমস্যাটি হচ্ছে স্বামী স্ত্রীর সাংস্কৃতিক বৈষম্য। এতদিন পর্যন্ত শিক্ষিত পুরুষ তাদের অশিক্ষিতা স্ত্রীদের নিয়ে আদৌ ভাবিত ছিলেন না। যেমন, রামমোহনের দুই স্ত্রীর মধ্যে একজনও শিক্ষিতা ছিলেন না, বা তাঁর আধুনিক চিন্তা ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। রামমোহনের বন্ধু দ্বারকানাথের স্ত্রীও স্বামীর কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরও স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগের অভাব অনুভব করেছিলেন। এঁদের পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের দাম্পত্য জীবনও এইরকম নিঃসঙ্গ ছিল। এই সমস্যা যে তখন শিক্ষিত সম্প্রদায়কে ভাবিয়ে তুলেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় "সমাচার দর্পণ" পত্রিকায় প্রকাশিত এক ব্রাহ্মণ পাঠকের এই চিঠি থেকে: "এইক্ষণকার লোক ও শিশুগণ বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছেন তাঁহারা অবশ্যই উচ্চ ও উত্তম কার্যে বড় হইবেন। ...পুরুষদের এইরূপ অবস্থার পরিবর্তন হইলে কি মূর্খ স্ত্রীদের সঙ্গে তাঁহাদের সম্প্রীতি হইবেক। দিবসীয় মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমের পর পুরুষের যে সান্ত্বনা ও সাহায্যের আবশ্যকতা তাহা কি তিনি ঐ অজ্ঞান স্ত্রীর নিকটে পাইতে পারিবেন।"[৪৯] নতুন ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ শিক্ষিত বাঙালীর কাছে দাম্পত্যজীবনের আদর্শ এবং চাহিদা হল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিকতা। এর জন্য দরকার ছিল স্বামী-স্ত্রীর বুদ্ধির সমতা। স্বামী-স্ত্রীর মানসিকতার গঠনে পার্থক্য ঘোচানো কখনই সম্ভব নয় যদি না স্ত্রী কিছুটা শিক্ষিত হয়। মানসিক দূরত্ব হ্রাস করার জন্য শিক্ষিত বাঙালীরা চাইতেন শিক্ষিত মেয়েকে বিয়ে করতে কিংবা স্ত্রীদের লেখাপড়া শেখাতে। "জ্ঞানাঙ্কুর" পত্রিকায় লেখা হল : "এক্ষণকার যুবকেরা শিক্ষিত স্ত্রী চাহেন, কেনইবা না চাহিবেন? যুবকদিগকে লেখাপড়া শিখাইলে স্ত্রীদিগকেও অবশ্য লেখাপড়া শিখাইতে হইবে। যুবকদিগকে মূর্খ করিয়া রাখ, তাহা হইলে স্ত্রীশিক্ষার অভাব বোধ হইবে না, কিন্তু যদি কেবল যুবকদিগেরই মাথায় বিদ্যা পুরিয়া দেও এবং স্ত্রীলোকদিগকে কিছুই না দেও, তাহা হইলে পাষাণ ঠিক থাকিবে না।"[৫০]

প্রগতি প্রস্তাবনায় দ্বান্দ্বিকতা

শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্তদেবের উৎসাহে পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার শিক্ষা গ্রহণে স্ত্রীলোকদের আগ্রহ সৃষ্টি করতে "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক" অর্থাৎ পুরাতন ও ইদানীন্তন ও বিদেশীয় স্ত্রীলোকদের দৃষ্টান্ত"[৫১] নামে একটি গ্রন্থ রচনা করলেন। ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে এই বইটি প্রকাশ করলেন ও বিনামূল্যে বিতরণ করলেন। এই

৪৯ সমাচার দর্পণ, ৩রা মার্চ, ১৮৩৮, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা,* পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৯৯।

৫০ "স্ত্রীশিক্ষা" জ্ঞানাঙ্কুর, আশ্বিন, ১২৮২ বঙ্গাব্দ, পৃ: ৫২৪, *অন্দরে অন্তরে,* গ্রন্থের পৃ: ৪৯-তে উদ্ধৃত।

৫১ *"An apology for Hindoo Female Education containing Evidence of the Education of Hindoo Females."* জন এলিয়েট ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুনের সূত্রে জানা যায় যে গ্রন্থটির প্রকৃত রচয়িতা রাধাকান্ত দেব। বেথুন লিখেছেন : "The Pamphlet is called Stree Shika Bidhyak

পুস্তিকাতে স্ত্রীশিক্ষার বহুবিধ উপযোগিতার কথা তুলে ধরা হয়েছিল। যেমন, শিক্ষিতা স্ত্রী প্রবাসী স্বামীকে পত্র লিখতে পারেন, স্বামীর অনুপস্থিতিতে সংসারের হিসাবনিকাশ রাখতে পারেন, স্বাস্থ্যসচেতন শিক্ষিতা মা স্বাস্থ্যবান শিশু গড়ে তুলতে পারেন। এমনকি কাব্য বা গদ্য রচনা দ্বারা স্বামীর মনোরঞ্জন করতে পারেন।[৫২] "মাসিক" পত্রিকা নামে মহিলাদের একটি পত্রিকায় লেখা হয়েছিল স্বামী-স্ত্রীর কাল্পনিক সংলাপ। এখানে স্বামী নানারকম যুক্তি দ্বারা স্ত্রীকে শিক্ষার সুফল বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। শেষপর্যন্ত যখন তিনি বললেন যে শিক্ষিতা হলে স্ত্রী স্বামীর অবর্তমানে সম্পত্তি দেখেশুনে রক্ষা করতে পারবেন তখন স্ত্রী শিক্ষার উপযোগিতা বুঝতে পারলেন। কারণ তাঁর নিজের অভিজ্ঞতায় দেখা ছিল যে তাঁর যে জ্ঞাতিভগ্নী শিক্ষিতা তাঁকে তাঁর ভাসুর প্রতারণা করতে পারেননি, অথচ অপর এক অশিক্ষিতা জ্ঞাতিভগ্নীর ক্ষেত্রে ঠিক তাই ঘটেছিল।[৫৩] "আলালের ঘরের দুলাল" গ্রন্থে মোক্ষদা ও প্রমদা এই দুই ভগ্নীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। মোক্ষদা বিধবা ও প্রমদা কৌলীন্য প্রথার শিকার, দুজনেই সংসারে অবহেলিত ও নির্যাতিত। এহেন প্রমদা তার দিদিকে বলছে : "ভাগ্যে কিছুদিন মামার বাড়ী ছিলাম তাই একটু লেখাপড়া ও হুনুরি কর্ম শিখিয়াছি। সমস্ত দিন কর্ম কাজ ও মধ্যে মধ্যে লেখাপড়া ও হুনুরি কর্ম করিয়া মনের দুঃখ ঢেকে বেড়াই।"[৫৪] "বামাতোষিণী" গ্রন্থের ভূমিকায় লেখা হল ঃ "হিন্দু মেয়েদের পক্ষে কন্যা, স্ত্রী এবং মা হিসেবে তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান থাকা খুব প্রয়োজন, সর্বোপরি ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য, যাঁর প্রতি ভালবাসা শৈশব থেকেই প্রোথিত হওয়া উচিত। স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও তাঁদের সঠিক ধারণা থাকা উচিত আর তাঁদের জানা উচিত শিশুকে উপযুক্তভাবে পালন করতে।"[৫৫] সংসারে গৃহিণী সুশিক্ষিত হলে সে সমঝদার হয় এবং সংসারে সুখ বৃদ্ধি

which I understand implies an Essay on the propriety of educating females. I believe Raja Radhakanta's name was never printed with this Essay of which a third edition was published in 1824, but it was well-known to be his and he yesterday admitted the authorship of it to me unequivocally"— দ্বিশততম জন্মবার্ষিক স্মরণিকা — রাজা রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৯৮৪), শোভাবাজার রাজবাটি, ১৯৮৫, 'রাজা রাধাকান্ত দেব ও স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধ লেখিকা ডঃ লতিকা দত্ত, পৃ: ১৩-১৪। শ্রী বসন্ত কুমার সামন্ত তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থের ১৬ পৃ:-তে পাদটীকায় এ তথ্য দিয়েছেন।

৫২ *The Changing Role of Women in Bengal*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৩।

৫৩ "গৃহকথা" মাসিক পত্রিকা, ১ম পৃ:, তদেব, পৃ: ৬৪।

৫৪ টেকচাঁদ ঠাকুর, *আলালের ঘরের দুলাল*, কলিকাতা (রোজারিও কোম্পানির যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত) ১২৬৪ বঙ্গাব্দ (১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ) পৃ:পৃ: ৩২-৩৩।

৫৫ "It is very necessary that Hindu girls should acquire a correct knowledge of their duties as daughters, wives and mothers and above all, their duty to God the love for whom should be instilled from childhood. They should also possess correct ideas on sanitation and know how to bring up childhood properly." শ্রী প্যারীচাঁদ মিত্র প্রণীত বামাতোষিণী, কলিকাতা, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং কর্তৃক বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে স্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, সন ১২৮৮ বঙ্গাব্দ, ইংরাজী ১৮৮১ সাল, Preface, পৃ: ii.

পায় — বইটিতে নানা উদাহরণ সহযোগে তা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এই আখ্যায়িকার কেন্দ্রীয় চরিত্র গোপাল চন্দ্র দেবের স্ত্রী শান্তিদায়িনী স্বামীর উদ্বৃত্ত আয় পুত্রকন্যার শিক্ষায় ব্যয় করতে চান, সামান্য গৃহশিক্ষক স্বামীর সংসার মিতব্যয়ে নির্বাহ করতেন। এই গোপাল চন্দ্র আইন অধ্যয়নের জন্য বিলাত গিয়ে স্ত্রীকে সেখানকার নারীশিক্ষা প্রণালী বিষয়ে লিখেছিলেন, "ধনী ব্যক্তিরা আপনাদিগের কন্যাদিগকে বাটিতে শিক্ষা দেন। মধ্যবর্তী ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা কন্যাদের পাঠশালায় প্রেরণ করে।"[৫৬] গোপাল চন্দ্র এ-ও লক্ষ করেছিলেন যে ভদ্রবাড়ীতে সুন্দর প্রণালীতে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হত। পশুপাখী, বৃক্ষ, তারা ইত্যাদি বিষয়ক ছোট ছোট বই তাদের হাতে দেওয়া হত। ঘরে অনেক ছবিও টাঙানো হত। রাতে আগুন পোহাবার সময় তারা মায়ের কাছে ইচ্ছামত প্রশ্ন করত ও মা সস্নেহে সে সব প্রশ্নের উত্তর দিতেন। এ ধরনের শিক্ষা কোন বিদ্যালয়ে হওয়া সম্ভবপর নয় বলে গোপাল চন্দ্র অভিমত প্রকাশ করেছেন।[৫৭]

হতে পারে যে স্ত্রীশিক্ষা কুণ্ঠিত সাধারণ বাঙালী সমাজের চোখের সামনে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার উপযোগিতা তুলে ধরতে না পারলে স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে কোন মনোভাব গড়ে তোলা সম্ভবপর ছিল না। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় চাকুরী জীবনে উন্নতির জন্য পুরুষদের প্রয়োজন ছিল শিক্ষিতা মাতা ও পত্নীর। শিক্ষিতা মাতা নতুন যুগের উপযোগী সন্তান গড়ে তুলবেন। শিক্ষিতা পত্নী বিদেশী শাসকের সঙ্গে সামাজিক আদান-প্রদানে সহায়তা করবে। অশিক্ষিতা স্ত্রী ইংরাজী শিক্ষিত নব্যযুবকদের এই সমস্ত চাহিদা মেটাতে পারত না, তারা ইংরাজ মহিলাদের মত "হেল্পমীট" (*helpmeet*) বা সামাজিকক্ষেত্রে স্বামীর সহচারিণী" হতে পারবেন না।[৫৮] তাই "সম্বাদ প্রভাকর" পত্রিকা লিখল : "যখন তাঁহারাই এরূপ হইলেন আমরা কত ভাল হইব? সুতরাং বিদ্যা দ্বারা তাঁহারদিগের ঐ কুসংস্কার বিনষ্ট হইলে অস্মৎপক্ষে কত কুশল হওনের সম্ভাবনা। আহা! সেই দিবস কি সুখের দিবস হইবেক— যে দিবসে জননী এবং ভগিনী পুত্র এবং সহোদরকে সুনীতি শিক্ষা দানের বিনিময়ে পুস্তক ধরিয়া বিদ্যাবিষয়ের উপদেশ প্রদান করিতে থাকিবেন।"[৫৯] এখানে লক্ষ করার বিষয় হল এই যে স্ত্রীশিক্ষা সংক্রান্ত যে কোন আলোচনায় নারীর নিজস্ব প্রয়োজনের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে তার স্বামী, পুত্র কিংবা সমাজের প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে আরেক ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন শ্রীমতী জেরালডাইন ফোর্বস্। তিনি বলতে চেয়েছেন যে ব্রিটিশরা চেয়েছিল যে তাদের অধীনস্থ ভারতীয় সিভিলিয়ানরা যদি শিক্ষিতা মেয়ে বিবাহ করে তবে তাদের আনুগত্য আরো প্রশ্নাতীত হবে। আর এই শিক্ষা হতে হবে ইংরাজী শিক্ষা, কারণ যদি ভারতীয় রাজপুরুষদের পত্নীরা অশিক্ষিতা

৫৬ তদেব, পৃ:পৃ: ২-৩, ২১-২২।

৫৭ তদেব, পৃ:পৃ: ২১-২২।

৫৮ ভারতীয় রায় সম্পাদিত, সেকালের নারীশিক্ষা, বামাবোধিনী পত্রিকা, উইমেন্স স্টাডিজ রিসার্চ সেন্টার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৯৪, ভূমিকা, পৃ: ২৪।

৫৯ বিনয় ঘোষ সম্পাদিত, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, তৃতীয় খণ্ড, পৃ:পৃ: ৩০৬-০৭।

কিংবা শুধুই দেশীয় প্রথায় শিক্ষিতা হন তবে তাদের গৃহ দুইভাগে বিভক্ত হবে, কারণ ব্রিটিশরা নিশ্চিত ছিলো যে বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র জন্মায় এবং পুষ্ট হয় অপ্রবেশ্য জেনানামহলে। তারা বিশ্বাস করতেন যে ইংরাজী শিক্ষিত ভারতীয় মহিলারা তাঁদের সন্তানদেরও ইংরাজ সমর্থক করে গড়ে তুলবেন।[৬০] স্পষ্টতঃই স্ত্রীশিক্ষার এই উপযোগিতা ভারতীয় পুরুষদের ভাবনা থেকে স্বতন্ত্র ছিল। তাঁরা ব্যক্তিগতস্তরে চেয়েছিলেন যে শিক্ষিতা স্ত্রীরা তাঁদের জটিল কর্মজগতে সাহচর্য দেবেন, আর জাতীয় স্তরে চেয়েছিলেন যে শিক্ষিতা মেয়েরা আবার সমাজের পিছিয়ে পড়া মেয়েদের সামনে নিয়ে আসতে সাহায্য ও চেষ্টা করবে। তাঁরা যখন রাজনীতিতে জড়িত হয়ে পড়লেন, তখন পুরুষরা এই আশা করেছিলেন যে মেয়েরাই সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব বহন করবেন।[৬১] দেখা যাচ্ছে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাতে মহিলাদের কাছে পুরুষদের প্রত্যাশায় এক ধরনের পরিবর্তন এসেছিল। পুরুষরা একদিকে চাইছিলেন যে জটিল ও প্রতিকূল কর্মজীবনে তাঁদের স্ত্রীরা হবেন মরূদ্যান স্বরূপ, কর্মক্লান্ত পুরুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধায়ক শান্তির নীড়, অন্যদিকে ঔপনিবেশিক প্রশাসনে দাবী ছিল সম্পূর্ণ অনুগত এক আমলা শ্রেণী, যা পুরুষানুক্রমে ব্রিটিশ সরকারের সেবায় নিয়োজিত থাকবে, তাই শিক্ষিতা, আরো সঙ্কুচিত অর্থে ইংরাজী শিক্ষিতা স্ত্রীর প্রয়োজন। এই বিষয়টি অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে স্ত্রীশিক্ষার অনুকূলে আরো একটি উপাদান খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। সমকালীন একজন লেখক এই মত প্রকাশ করেছেন যে ইংরাজ রাজত্বকালে সামগ্রিকভাবে কন্যাদের প্রতি পিতাদের স্নেহ বৃদ্ধি পেয়েছে।[৬২] এ বিষয়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত বেথুন স্কুলে প্রথম ২১ জন[৬৩] ছাত্রীর মধ্যে দুজন ছিলেন মদন মোহন তর্কালঙ্কারের দুইকন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালা। দূর থেকে ছাত্রীদের স্কুলে নিয়ে আসার জন্য বেথুন সাহেব একটি ঘোড়ার গাড়িরও ব্যবস্থা করেন। ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে ঐ বিদ্যালয়ের

৬০ Geraldine Forbes, Women in Modern India, Part IV-2, in the series entitled The New Cambridge History of India, Cambridge University Press, First Indian edition 1996, p. 60.

৬১ তদেব, পৃ: ৬১।

৬২ "বঙ্গমহিলার বর্তমান অবস্থা", তমলুক পত্রিকা, প্রথম বর্ষ (১২৮১) পৃ: ২২০, সংকোচের বিহ্বলতা, পূর্বোক্ত গ্রন্থের পৃ: ১৯, পাদটীকা।

৬৩ ভারতী রায় তাঁর সম্পাদিত সেকালের নারী শিক্ষা : বামাবোধিনী পত্রিকার ভূমিকায় (২২) পৃষ্ঠায় সংখ্যাটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু গোলাম মুরশিদ তাঁর "*সংকোচের বিহ্বলতা*" গ্রন্থে বলেছেন যে "বেথুন স্কুল শুরু হয়েছিল ১১ জন ছাত্রী নিয়ে, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে এ সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ৭-এ দাঁড়ায়"। গোলাম মুরশিদ এ সংখ্যার উৎস নির্দেশ করেছেন Selection from Educational Records, II, p.p. 52-53. শুধু তাই নয়, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "আর্য রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা", কলিকাতা : এলগিন প্রেস, ১৯০০, পৃ: ২২৮, এই সূত্র মাবফৎ তিনি আরো জানাচ্ছেন যে "এক পর্যায়ে বিদ্যালয়ে মাত্র তিনটি ছাত্রী ছিলো, — তার মধ্যে দুটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কন্যা"। — গোলাম মুরশিদ, "*সংকোচের বিহ্বলতা*" পূর্বোক্ত, পৃ: ২৫।

সম্পাদকের পদ গ্রহণ করে বিদ্যাসাগর সেই গাড়ির পাশে "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ" — এই শাস্ত্রবচনটি খোদাই করে দেন।[৬৪] এখানে বিদ্যাসাগরের সেই চিরাচরিত শাস্ত্রপ্রিয়তার ফাঁকে চোখে পড়ে মেয়েদের প্রতি সমকালীন পুরুষদের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গী। মদনমোহন "সর্বশুভকরী"[৬৫] পত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে রক্ষণশীলদের আপত্তি খণ্ডন করতে গিয়ে লিখতে দ্বিধা করলেন না : "বিশ্বপিতা স্ত্রী ও পুরুষের কেবল আকারগত কিঞ্চিৎ ভেদ সংস্থাপন করিয়াছেন মাত্র। মানসিক শক্তি বিষয়ে কিছুই ন্যূনাধিক্য স্থাপন করেন নাই। অতএব বালকেরা যেরূপ শিখিতে পারে, বালিকারা সেরূপ কেন না পারিবেক?[৬৬] "স্ত্রীশিক্ষা" এই প্রবন্ধটিতে মদনমোহন মেয়েদের সম্বন্ধে পরিবর্তিত প্রত্যাশাকে এতদূর নিয়ে গিয়েছিলেন যে তিনি একথা ভাবতে দ্বিধা বোধ করেননি যে শিক্ষিতা মেয়েদের পক্ষে অর্থোপার্জন সম্ভব : "আর যদ্যপি অস্মদ্দেশীয় লোকেরা নিতান্তই ধনোপার্জনের নিমিত্ত লালায়িতচিত্ত হন, স্ত্রীজাতি বিদ্যাবতী হইলে তাঁহাদিগকে একেবারেই যে নিরাশ করিবে এমত কদাপি সম্ভাবনীয় নহে। আমরা সাহসপূর্বক বলিতে পারি তাহারা অবশ্যই তাঁহাদের ধনোপার্জনের মনোরথ সম্পন্ন করিতে পারিবে। তাহারা অন্তঃপুরে বসিয়া নানাবিধ শিল্পকার্য ও কারুকর্ম নির্মাণ করিবে তদ্বারা অনায়াসে অভিলষিত অর্থেরও অধিগম হইতে পারিবে। পুরুষেরা গৃহে বসিয়া যে সকল লেখাপড়া করেন স্ত্রীজাতিরা তদ্বিষযে সম্পূর্ণ সাহায্য দান করিতে পারিবে। গৃহস্থালী ব্যাপারে আয়ব্যয় বিষয়ক লিখন পঠন নির্বাহার্থে যে সমুদয় লোক নিযুক্ত করিতে হয় গৃহের গৃহিণীরা ও নন্দিনীরা অনায়াসে তৎসমুদায় সম্পাদন করিতে যে সমর্থা হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? এবং তাহারা স্বয়ং গ্রন্থাদির রচনা ও অনুবাদ করিয়া তদ্দ্বারা ভূরি ভূরি অর্থ উপাজন করিতে সমর্থা হইবে।"[৬৭] কেমনভাবে এ সোনালী স্বপ্ন সম্ভব হবে? এ কি শুধুই দিবাস্বপ্ন না এর কোন বাস্তব ভিত্তি আছে? মদনমোহন উদাহরণ পেশ করলেন ইউরোপীয় মহিলাদের : ".... ফ্রান্সদেশীয় মেড্যাম ডি স্টেল নামে এক পণ্ডিতা রমণী অনেক বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এবং তত্তৎ বিষয়ে সেই সেই গ্রন্থ অদ্যাপি অত্যুৎকৃষ্টরূপে পরিগণিত আছে। তাঁহার ঐ সকল গ্রন্থ প্রস্তুত হইবামাত্রই মুদ্রাকরেরা যথেষ্ট অর্থ দান পূর্বক ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত, এইরূপে তিনি অপর্যাপ্ত ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। মিস এজওয়ার্থ নাম্নী ইংলন্ডবাসিনী এক রমণী নানাবিধ পুস্তক রচনা করিয়া অনায়াসে ধন সংগ্রহ করিয়াছেন এমত শত শত ব্যক্তির নাম আমরা উল্লেখ করিতে পারি। আর চিত্রকর্ম শিল্পকর্ম্ম ও অন্যবিধ কারুকর্ম্ম দ্বারা বিলাতের যে রমণী অর্থোপার্জ্জন করিতে না পারেন

৬৪ *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, পূর্বোক্ত, পৃ: ২১৮।

৬৫ ১৮৫০ সালে ঠনঠনিয়ার 'সর্বশুভকরী সভা'র মুখপত্র হিসাবে এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। — তদেব, ২২১।

৬৬ মদনমোহন তর্কালঙ্কার, 'স্ত্রীশিক্ষা', *সর্বশুভকরী পত্রিকা*, আশ্বিন, ১৭৭২ শকাব্দ, তদেব, পৃ: ২২১।

৬৭ উপরোক্ত প্রবন্ধ, *সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র*, তৃতীয় খণ্ড সর্বশুভকরী পত্রিকা, রচনা সংকলন, শিক্ষা, পৃ: ৫৪৯।

এমত স্ত্রীলোকই দেখিতে পাওয়া যায় না"[৬৮] শিক্ষিতা মহিলাদের প্রতি এই প্রত্যাশার অনুরণন দেখা যায় তারাশঙ্কর তর্করত্নের রচনায় ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা" (*"The Zenana Opened or A Brahmin advocating female emancipation"*) গ্রন্থে তিনি সপ্রশ্ন মন্তব্য করেছিলেন : "হায় কত কালের পর এদেশ পণ্ডিতময় হইবে, স্ত্রীলোকেরা গ্রন্থকর্ত্তা হইবে, পুরুষদিগের চিন্তা হ্রাস পাইবে ও আমাদিগের আশা পরিপূর্ণ হইবে।"[৬৯] উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় তাই দেখা যাচ্ছে যে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে যেমন বিরোধিতা ছিল, তেমন সমর্থনও ছিল। তবে এই সমর্থনের মধ্যে গুণগত বিভিন্নতা ছিল। স্ত্রীশিক্ষার সমর্থকদের মধ্যে সতর্ক পদক্ষেপ ছিল, যেমন রাধাকান্ত দেব বা কেশবচন্দ্র সেনের মধ্যে দেখা যায়, তেমন সুদূর ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ছবি আঁকবার মতো আশাবাদীও দেখতে পাওয়া যায় মদনমোহন তর্কালঙ্কার বা তারাশঙ্কর বিদ্যারত্নের মধ্যে। এই বর্ণময় পটভূমিকায় বাংলাদেশে যুগপৎ সাবধানী ও স্বপ্নদর্শী পুরুষদের হাতেই স্ত্রীশিক্ষার সূচনা হল।

রক্ষণশীল হলেও এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছিলেন রাধাকান্ত দেব। তাঁর উৎসাহে অথবা তাঁর নিজের রচনা 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' গ্রন্থটি স্ত্রীশিক্ষার ধারণা এবং উপযোগিতার কথা জনসমক্ষে প্রচার করতে খ্রীষ্টান মিশনারীদের সাহায্য করেছিল। ১৮২২ সালে প্রকাশিত হয়ে ১৮২৪ সালে এই বইটির তিনটি সংস্করণ হওয়া প্রমাণ করে যে এই বইটি সুধীসমাজে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে এই বইয়ের কিছু কিছু অংশ পাঠ্য ছিল। এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের অন্যতম সারথী জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন এই পুস্তকের গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করে তা পুনর্মুদ্রণের জন্য রাধাকান্তের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন।[৭০] কিন্তু রাধাকান্ত দেব মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য বিদ্যালয়ে পাঠাবার পক্ষপাতী ছিলেন না। ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির সভাপতি *W. H. Pearce*-কে রাধাকান্ত দেব একটি চিঠিতে লেখেন : "বিবাহের আগে আমরা আমাদের মেয়েদের বাড়ীতেই বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিই যদিও সমস্ত দেশীয় ব্যক্তি তা করেন না।"[৭১] তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে ভদ্র দেশীয় পরিবারের মেয়েরা আদৌ ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির বিদ্যালয়ে পড়তে যাবে কিনা। ১৮২১ সালের নভেম্বর মাসে মিস্ মেরী অ্যান কুক ভারতে আসেন স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে। তখন *Pearce* সাহেব রাধাকান্ত দেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কিভাবে মিস্ কুকের উদ্যোগকে সবচেয়ে ভালভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। তখন রাধাকান্ত দেব ১৮২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর একটি চিঠিতে আবার লেখেন যে হিন্দু সম্প্রদায় তাদের মেয়েদের বাড়ীতে দেশীয় শিক্ষক নিযুক্ত করে বাংলা শিক্ষা দিতে বেশী আগ্রহী। আর

৬৮ তদেব।

৬৯ বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম দুটি মুদ্রিত গ্রন্থ, পূর্বোক্ত, পৃ ৯।

৭০ যোগেশ চন্দ্র বাগল, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃ.পৃ: ২৫৪-২৫৫।

৭১ Report of the Calcutta School Society (Manuscripts), Radha Kanta to W.H. Pearce, dated 1st July 1819. শ্যামলেন্দু সেনগুপ্ত তাঁর পূর্বোক্ত বইয়ের পৃ: ৫৪-তে এই তথ্য দিয়েছেন।

এই শিক্ষাদান চলে তাদের বিয়ের আগে পর্যন্ত। কাজেই রাধাকান্ত দেব *Pearce*-কে পরামর্শ দিলেন যে তাঁরা দরিদ্র অথচ উচ্চকুলজাত হিন্দু মেয়েদের যদি ইউরোপীয় হস্তচালিত অথবা যান্ত্রিক কারিগরি বিদ্যায় প্রশিক্ষণ দেন তবে তারাই শিক্ষপ্রাপ্ত হয়ে ভদ্র হিন্দু পরিবারে নিযুক্ত হয়ে মেয়েদের শিক্ষা দিতে পারবে। তাহলে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ঘটবে অথচ স্মরণাতীত সময় থেকে হিন্দুদের মধ্যে যে আচরণবিধি প্রচলিত আছে তার কোন ব্যত্যয় ঘটবে না।[৭২] উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ইংল্যান্ডের বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে প্রধানত যে হস্তশিল্প শিক্ষা দেওয়া হত তা হল সূচীশিল্প। যথারীতি তা কলিকাতাতেও শুরু হল এবং জনপ্রিয় হয়ে উঠল। শীঘ্রই এখানকার মেয়েরা মোজা, রুমাল, ব্যাগ এবং তোয়ালে তৈরী করতে শিখে গিয়েছিল। এই সব সুন্দর হাতের কাজের কিছু কিছু আবার ইংল্যান্ডে রপ্তানী করা হল।[৭৩] কিন্তু রাধাকান্ত মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার দিকেও নজর রেখেছিলেন। কলিকাতা স্কুল সোসাইটির স্কুলগুলির সাথে সাথে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির স্কুলসমূহের ছাত্রীদের যে পরীক্ষা নেওয়া হত তা অনুষ্ঠিত হত রাধাকান্তদেবের বাড়ীতেই।[৭৪] তাহলে দেখা যাচ্ছে যে রাধাকান্ত দেব স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক হলেও তাঁর রক্ষণশীল মানসিকতাকে অতিক্রম করতে পারেননি। তিনি কিছুতেই মেয়েদের স্কুলে পাঠানো সমর্থন করেননি। তা সত্ত্বেও তিনি অন্যান্য রক্ষণশীল ব্যক্তিদের সমালোচনা এড়াতে পারেননি। রামমোহনের সমাজসংস্কার আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতি-আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য রাধাকান্ত দেবের বাড়ীতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ধর্মসভা। এই ধর্মসভার সভ্যরাই সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন যখন বেথুন "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়কে"র প্রশংসা করে মন্তব্য করলেন যে এই গ্রন্থটি স্ত্রীশিক্ষার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেছে। এই বিরোধিতা এত দূর পৌঁছেছিল যে *"The Hindu Intelligencer"* পত্রিকায় জনৈক বিশ্বেশ্বর মিত্র রাধাকান্ত দেবকে একটি খোলা চিঠি দিয়ে অভিযোগ করলেন যে পাছে গভর্নমেন্ট হাউসের তালিকা থেকে বাদ পড়েন এবং তাঁর উচ্চ অবস্থান থেকে বিচ্যুত হন তাই তিনি বেথুনের বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করার প্রস্তাব সমর্থন করেছেন। শুধু তাই নয়, রাধাকান্ত দেব ইংরাজী পুস্তক থেকে গৃহীত ইংরাজ আদর্শ শিক্ষা দেওয়ার কথা মেনে নিয়েছেন। পত্র লেখক আরো অভিযোগ করেছেন যে বেথুন তাঁকে স্বমতে নিয়ে আসার জন্য প্রায় ২০ বছর আগে প্রকাশিত "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক" পুস্তিকার কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে বাবু রাধাকান্ত মন্তব্য করেছেন যে শিক্ষা না দিলে মেয়েরা অশুভ ও শিথিল চিন্তার বশবর্তী হবে। তিনি বিস্মৃত হয়েছেন যে এদেশের মহিলারা তাদের পিতামাতার মহান আদর্শের বলেই গুণসম্পন্না হন। তাঁরা মৌখিক শিক্ষা এবং প্রচলিত ঐতিহ্য থেকেই শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে থাকেন। এখন বাবু রাধাকান্ত যদি এইসব মন্তব্য রহিত করে একটি পাল্টা বিবৃতি না দেন তবে পত্রলেখকসহ অনেকেই বাবু

---

৭২ তদেব।

৭৩ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ৫-১৯, এই গ্রন্থে সমাচার দর্পণ, ১৮২৩ সালে ৮ই মার্চ, ১৮২৪ সালের ১০ই এপ্রিল, ১৮২৮ সালের ২৮শে জুন তারিখের পত্রিকায় এই তথ্য দেওয়া হয়েছে।

৭৪ অন্দরে অন্তরে, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৩।

রাধাকান্তের দল ত্যাগ করে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুনারীর রক্ষক বাবু প্রমথনাথ দেবের দলে যোগদান করবেন।[৭৫] ধর্মসভার একজন গুরুত্বপুর্ণ সদস্য একদিকে হিন্দুধর্ম রক্ষার কথা বলবেন অন্যদিকে স্ত্রীশিক্ষা সমর্থন করবেন এটা ধর্মসভার অন্যান্য সদস্যরা বরদাস্ত করতে রাজী ছিল না। অথচ রাধাকান্ত দেব ১৮৫১ সালের ২০ মার্চ একটি পত্রে বেথুনকে লিখলেন : "বর্তমানে আপনি যে মহৎ উদ্দেশ্যসাধনে ব্রতী হয়েছেন, আমি এতকাল উপদেশ ও নিজের কাজের দ্বারা দেশবাসীকে জানাতে চেয়েছি যে আমি স্ত্রীশিক্ষার প্রধান সমর্থক। .... ১৮১৯ সালে আমি পাদরি পিয়ার্সকে লিখে জানিয়েছিলাম যে বিবাহের আগে মেয়েদের আমরা ঘরেই বাংলা লেখাপড়া শেখাই, তাই কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা বাইরের স্কুলে লেখাপড়া করতে যাবে না। এরপর আমি বরাবরই একথা বলে এসেছি। নীতির দিক থেকে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা আমি করিনি। তবে প্রকাশ্য বালিকা-বিদ্যালয়ের সার্থকতা সম্বন্ধে আমার মনে আগাগোড়াই সন্দেহ ছিল।"[৭৬] স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে রাধাকান্ত দেবের মনে রক্ষণশীলতা ও আধুনিকতার টানাপোড়েন ছিল। তিনি মেয়েদের শিক্ষিত করে তুলতে চাইতেন অথচ মেয়েদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করা পছন্দ করতে পারেননি। তবুও তিনি যে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে একজন অগ্রদূত ছিলেন তা বোঝা যায় স্বয়ং বেথুনের প্রশংসা থেকে : "যে কৃতিত্ব আপনার প্রাপ্য আমি তা দিতে আগ্রহী যে আপনি হলেন প্রথম দেশীয় ব্যক্তি যিনি অধুনা এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে মেয়েদের সম্পূর্ণ অজ্ঞতার মধ্যে বড় হতে দেওয়া কি মূর্খতা এবং দুর্বলতা, আর হিন্দুশাস্ত্রে এ সম্পর্কে কোন নির্দেশ বা সমর্থন নেই।"[৭৭] এই উক্তি রাধাকান্ত দেবের স্ত্রীশিক্ষা প্রচারকের ভূমিকার যথার্থ পরিচয় দেয় কিন্তু তিনি আজীবন তাঁর এই প্রাগ্রসর ভূমিকাকে রক্ষণশীলতার আবরণে ঢাকা দিয়ে রেখেছিলেন।

রাধাকান্ত দেব যেমন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিরোধী ছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টায় তেমন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার কাজে তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন বেথুন স্কুলের সঙ্গে জড়িত হওয়ার সুবাদে। শিক্ষাসংসদের সভাপতি হিসাবে বেথুন আগে থেকেই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, এবং তাঁকে একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত এবং অক্লান্ত কর্মী হিসাবে শ্রদ্ধা করতেন। স্কুল প্রতিষ্ঠার পরেই বেথুন বিদ্যাসাগরকে

৭৫ The Hindu Intelligencer, Vol.IV, No.27, Monday, July 2, 1849, p. 210.

৭৬ Radhakanta to Bethune, dated 20 March, 1851, *বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ, পূর্বোক্ত, গ্রন্থের পৃ. ২১৫-তে উদ্ধৃত।*

৭৭ "I am anxious to give you the credit which justly belongs to you of having been the first native of India, who in modern times has pointed out the folly and weakness of allowing women to grow up in utter ignorance, and that this is neither enjoined nor countenanced by any thing in the Hindu Sastras."—Raja Rajendra Narayan Deb Bahadur (ed.), Rajah Sir Radhakant Deb Bahadur, KCSI. A Brief Account of his life and character, Calcutta, 1880, p. 30-*তে উদ্ধৃত।*

স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে তার অবৈতনিক সম্পাদকরূপে কাজ করার জন্য অনুরোধ করেন। ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর সাগ্রহে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।[৭৮] ১৮৬৭ সালে যখন বেথুন স্কুলের দুর্দিন উপস্থিত হল এবং স্কুলটি বন্ধ হবার উপক্রম হল তখন বিদ্যাসাগর তাঁর তীক্ষ্ণ যুক্তিবাণ প্রয়োগ করে ব্রিটিশ সরকারকে বোঝালেন শহরের প্রাণকেন্দ্রে একটি সংগঠিত বালিকা বিদ্যালয় মডেল হিসাবে অন্যান্য দূরবর্তী বিদ্যালয়গুলিকে এবং সাধারণভাবে দেশীয় সমাজকে নৈতিকভাবে প্রভাবিত করবে। এভাবে বেথুন স্কুল রক্ষা পেল।[৭৯] ১৮৫০ সালের ২৯শে মার্চ বেথুন লর্ড ডালহৌসীকে একটি চিঠিতে লেখেন যে উত্তরপাড়া, বারাসত, নিধুদিয়া, সুখসাগর, যশোহর প্রভৃতি স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হচ্ছে ঠিকই কিন্তু স্থানীয় লোকেরা পদে পদে প্রতিষ্ঠাতাদের ভয় দেখিয়ে নির্যাতন করে বাধা দেবার চেষ্টা করছে। তাই বেথুন ডালহৌসীকে অনুরোধ করলেন শিক্ষাসংসদকে এই মর্মে একটি নির্দেশ দিতে যাতে শিক্ষাসংসদ স্ত্রীশিক্ষা তত্ত্বাবধান করে এবং বিভিন্ন স্থানের উৎসাহী ব্যক্তিদের বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যথাসাধ্য সাহায্য করে। এই অনুরোধ রক্ষা করে ভারত সরকারের সেক্রেটারি হ্যালিডে ১৮৫০ সালের ১১ই এপ্রিল বাংলা সরকারকে একটি চিঠি দিলেন যাতে বেথুনের সুপারিশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হল।[৮০] ১৮৫৪ সালে প্রেরিত উডের প্রতিবেদনে শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারী অনুদান দেবার যে নীতি গৃহীত হল তা স্ত্রীশিক্ষার প্রতিও যেন প্রযুক্ত হয় এরকম নির্দেশ দেওয়া হল। হ্যালিডে জানতেন যে বিদ্যাসাগরের কাছে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার হল ভালবাসার জন্য শ্রমদান। ১৮৫৭ সালের মে মাস থেকে তিনি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারী অনুদান প্রার্থনা করতে লাগলেন। যখন সরকারের তরফ থেকে তাঁকে হুগলী জেলার জন্য দুটি ও বর্ধমান জেলার জন্য দুটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য অনুদান দেওয়া হল তখন তিনি ভুল করে ভাবলেন যে সরকার বুঝি গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য উদারনীতি গ্রহণ করেছেন। উৎসাহের বশে তিনি ধরে নিলেন যে সরকারী আর্থিক অনুদান পাওয়া যাবে। তাই তিনি একের পর এক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে যেতে লাগলেন। ১৮৫৭ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৮৫৮ সালের জুন মাসের ভেতর তিনি ৪০টি বিদ্যালয় স্থাপন করলেন যাদের ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১,৩৪৮ জন।[৮১] কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিদ্যাসাগর সরকারী সাহায্য পেলেন না। ১৮৫৮ সালের ৭ই মে ভারত সরকার

৭৮ Amales Tripathi, *Vidyasagar : A Traditional Moderniser,* Punascha, Calcutta-9, 1998, p.68 এবং বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ, পূর্বোক্ত, পৃ: ২১৭-১৮।

৭৯ *Vidyasagar : A Traditional Moderniser,* পূর্বোক্ত, p. 69.

৮০ বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ, পূর্বোক্ত, পৃ: ২১৯।

৮১ General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1857-58, Appendix A, p.p. 179-80, কিন্তু Consultations of the Education Department No. 16, 5th August, 1858, No. 16 এই নথিতে যে হিসেব দেওয়া হয়েছে তা হল এই রকম মোট ৩৫টি বিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১৩০০। হুগলী জেলায় ২০টি, বর্ধমান জেলায় ১১টি, মেদিনীপুরে ৩টি, নদীয়াতে ১টি, বিদ্যালয়গুলির জন্য মাসিক খরচ হত ৮৪৫ টাকা।

জানালেন যে স্থানীয় লোকের সাহায্য যদি যথেষ্ট পরিমাণে না পাওয়া যায় তবে এরকম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না করাই ভাল। আরো সমস্যা হল শিক্ষকদের বেতন। সমস্ত আর্থিক দায় বিদ্যাসাগরের ওপর এসে পড়ল। এরপর বিদ্যাসাগর—শিক্ষা অধিকর্তা—বাংলা সরকার—ভারত সরকার, এই ক্রমানুসারে অসংখ্য পত্র বিনিময়ের পর ভারত সরকার বালিকা বিদ্যালয়ের যে ৩,৪৩৯ টাকা খরচ হয়েছে তার দায় থেকে বিদ্যাসাগরকে মুক্তি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একথা জানাতেও ভুললেন না যে এরপর থেকে আর কোন বালিকা বিদ্যালয়ের আর্থিক দায় বহন করা সম্ভব হবে না।[৮২] বিদ্যাসাগরের বন্ধু 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ যদিও তাঁর সমালোচনা করে লিখলেন যে স্বদেশ হিতৈষণা বিদ্যাসাগরকে মাঝে মাঝে অত্যুৎসাহবশতঃ অদূরদর্শী করে তুলত, তখন বর্তমান বিরাট আকার ধারণ করে ভবিষ্যৎকে আড়াল করত[৮৩] কিন্তু বিদ্যাসাগর ছিলেন অদম্য। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলি বাঁচিয়ে রাখার জন্য গড়ে তুললেন নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাণ্ডার। এই প্রতিষ্ঠানে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপ চন্দ্র সিংহের মতো বহু সম্ভ্রান্ত ধনবান ব্যক্তি এবং ছোটলাট বিডন সাহেবের মতো উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা নিয়মিত অর্থসাহায্য করতেন। এইভাবে বিদ্যাসাগর হাল ছেড়ে দেননি তবুও তিনি বিলক্ষণ হতাশ হয়েছিলেন, তাঁর এই হতাশা ধরা পড়েছিল শিক্ষিকা শিক্ষণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময়।[৮৪] এ দেশীয় শিক্ষিকা গড়ে তোলার জন্য মিস মেরী কার্পেন্টার বেথুন স্কুলে একটি নর্মাল স্কুল স্থাপনের চেষ্টা করতে লাগলেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৬৬ সালের ১লা ডিসেম্বর ব্রাহ্মসমাজ একটি সভা ডেকে যখন নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠার 'প্রস্তাব করল তখন বিদ্যাসাগর তার বিরোধিতা করলেন। তাঁর যুক্তি ছিল এই যে সমাজের বর্তমান অবস্থা এবং দেশবাসীর মনোভাব বিবেচনা করলে এ ধরনের কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সাফল্য পাওয়া সম্ভব নয়। বিদ্যাসাগরের আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত করে তিন বছর চলার পরে বেথুন স্কুল সংলগ্ন ফিমেল নর্মাল স্কুলটি বন্ধ করে দিতে সরকার বাধ্য হল।[৮৫] যদি নর্মাল স্কুল সফল হত তবে বাঙ্গালী মেয়েরা উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পারতেন কিন্তু তৎকালীন সময়ে তা অচিন্তনীয় ছিল। বরঞ্চ সমাজ আলোড়িত হয়েছিল এই শঙ্কায় যে কারা নর্মাল স্কুলে পাঠ নিয়ে স্কুলে স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ গ্রহণ করবে? হিন্দু কুলবধূরা প্রকাশ্য স্থানে পাঠ গ্রহণ বা দান কোনটাই করবেন না, ব্রাহ্মমহিলারা হিন্দু মহিলাদের কাছে ধর্মান্তরের ভয়ে গ্রহণযোগ্য হবেন না, আর ভদ্রবংশীয়া বিধবারা যদি শিক্ষিকার কাজ করার জন্য বাইরে আসেন তবে তাঁদের চারিত্রিক বিশ্বাসযোগ্যতা থাকবে না এ মত জ্ঞাপন করলেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর। এর আগে বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ আন্দোলন করে বিধবাদের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন কিন্তু এখন তিনি তাঁদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার

৮২ Consultations of Education Department, 20 Jan, 1859, No. 9.
৮৩ বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৫।
৮৪ তদেব, পৃঃ ২২৬।
৮৫ তদেব, পৃঃ ২২৯-২৩৬।

সম্ভাবনার কথা ভেবেও দেখলেন না। যখন সেই সুযোগ এসেছিল সমাজের মনোভাব এবং দেশাচারের কাছে নতিস্বীকার করে তিনি তা বাতিল করে দিলেন। একথা স্বীকার্য যে এর আগে সমাজ সংস্কার করতে গিয়ে তিনি প্রবল বিরোধিতার শিকার হয়েছিলেন, কিছুদিন আগেই মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েও তাঁর যথেষ্ট তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এই সমস্ত ব্যর্থতা তাঁকে হয়ত কিছুটা নৈরাশ্যবাদী করে তুলেছিল। কিন্তু যে অদম্য দৃঢ়তা তাঁকে তাঁর আরব্ধ কাজে শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখত নর্মাল স্কুলের ক্ষেত্রে তিনি সেই মানসিকতাকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় রেখেছিলেন। তাই রাধাকন্ত দেব রক্ষণশীল হয়েও প্রগতিবাদী বলে বিবেচিত হলেন আর যে প্রগতিশীলতা বিদ্যাসাগরের সহজাত কবচ কুণ্ডলের মতো ছিল তা রক্ষণশীলতার অলঙ্ঘ্য প্রাচীরে বাধা পেয়ে গতিহারা হল।

১৮৫৭ সালে তরুণ কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করলেন। এখন থেকে সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টা ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ কর্মসূচী হয়ে উঠল, যার শিরোভাগে ছিল স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার। কেশবচন্দ্র অন্তঃপুর শিক্ষা প্রণালীর প্রধান রূপকার হলেও তাঁর হাতে মহিলা বিদ্যালয়ের স্থাপনা ঘটেছিল। তিনি মনে করতেন যে অন্তঃপুরে শিক্ষালাভ করা মেয়েদের পক্ষে সুবিধাজনক হলেও বহির্জগতের সংস্পর্শে না এলে তাদের শিক্ষা সর্বাঙ্গীণ হবে না। ১৮৬১ সালের ৩রা অক্টোবর ব্রাহ্মসমাজের একটি অধিবেশনে কেশবচন্দ্র তাঁর স্ত্রীশিক্ষা কর্মসূচীর একটি খসড়া পেশ করেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল এইরকম যে নারীমন এতই শক্তিশালী যে তা খারাপ বা ভাল উভয়ের প্রতি সমানভাবে প্রতিক্রিয়া করে। শিক্ষিতা এবং কর্তব্যপরায়ণ মায়েরা যে কোন স্কুল বা কলেজের চেয়ে সভ্যতার পথে দেশকে বেশী এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তাই পুরুষদের উচিত তাদের স্ত্রী এবং ভগ্নীদের সঙ্গে শিক্ষার আর্শীবাদ ভাগ করে নেওয়া।[৮৬] ১৮৬৩ সালে (১৭৮৫ শক) প্রতিষ্ঠিত হল ব্রাহ্মবন্ধুসভা, উদ্যোক্তা কেশবচন্দ্র। এই সভার অন্যতম লক্ষ্য ছিল স্ত্রীশিক্ষা বিধান। "ঈশ্বর প্রসাদে এতদ্দেশ্যে স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্ত কতিপয় বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু বালিকাগণ বিদ্যালয়ে দুই-তিন বৎসরের অধিক পড়িতে না পারায় যথাবাঞ্ছিত ফল উৎপন্ন হইতেছে না। যাহাতে বালিকাগণ উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করিতে পারে এইরূপ একটি প্রণালী কলিকাতার ব্রাহ্মবন্ধুসভা অবলম্বন করিয়াছেন। এই প্রণালীক্রমে বালিকাগণ বিদ্যালয়ে না গিয়া বাটীতে নিযুক্ত শিক্ষক দ্বারা বা পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি দ্বারা সুশিক্ষিত হইতে পারিবেন। বৎসরে দুইবার বালিকাদিগকে পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত পাত্রীদিগকে পারিতোষিক দেওয়া যাইবেক যাঁহারা এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া আপন আপন পরিবারস্থ বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে চাহেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের নাম, ধাম, বয়স, পাঠ্য পুস্তক ও পাঠে কতটুকু উন্নতি হইতেছে, এই সমুদয় বিবরণসহ আমাকে পত্র লিখিবেন। আমার নামে পত্র কলুটোলার শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট পাঠাইবেন।..........

৮৬ Kashinath Kayal, Keshub Chunder Sen : A Study in Encounter and Response, Minerva Associates (Publications) Private Limited, Calcutta 29, 1998, p. 93.

কলিকাতা শ্রী হরলাল রায়

ব্রাহ্মবন্ধুসভা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সম্পাদক।[৮৭]

বহুল প্রসারের উদ্দেশ্যে সম্পাদক হরলাল রায় ১২৭০ বঙ্গাব্দের ১৭ই অগ্রহায়ণ "তত্ত্ববোধনী"র সম্পাদকের কাছে একখানি পত্র লেখেন। তাতে তিনি বলেন, সর্বত্রই যত্নের অভাবে "অন্তঃপুরে" স্ত্রীশিক্ষার প্রসার হচ্ছে না তাই ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত শাখাকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য ওই পত্রিকার সম্পাদককে তিনি অনুরোধ করেন। সেইমতো "তত্ত্ববোধিনী"র পক্ষ থেকে প্রচারিত একটি আবেদনে বলা হয়, "বঙ্গদেশের যে যে স্থানে ব্রাহ্মসমাজ আছে তথায় উপরোক্ত প্রণালী অনুযায়িক স্ত্রীশিক্ষা অবিলম্বে আরম্ভ হয় এই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা ....।[৮৮] এই ইচ্ছা অনুযায়ী বাংলার বিভিন্ন স্থানে ব্রাহ্মদের দ্বারা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হয়। এইসব প্রচেষ্টার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঢাকা এবং ময়মনসিংহের অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার সভা। ব্রাহ্মসমাজের বাইরেও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের প্রচেষ্টায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে চোরবাগান, বরিশাল, কোরহাটী, ময়মনসিংহ ইত্যাদি স্থানে যে ব্যবস্থা হয়েছিল তা উল্লেখযোগ্য।[৮৯]

কিন্তু অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী যত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল গুণগত দিক দিয়ে তত উন্নত ছিল কিনা তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। ১৮৭৭-৭৮ সালে বালিকা বিদ্যালয়গুলির পরিদর্শিকা তাঁর প্রতিবেদনে জানালেন যে এই পদ্ধতিতে শিক্ষার মান আদৌ বাড়ছে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষিকারা প্রতি সপ্তাহে প্রতি বাড়ীতে ২ ঘণ্টা মাত্র সময় দেন এর ভেতরে পাঠ দান, সূচীশিল্প শিক্ষা, বাইবেল পাঠ সবই সম্পন্ন হত। পরীক্ষা নেবার সময় প্রহরা প্রায় থাকত না। এর ফলে অসদুপায় প্রশ্রয় পেত। হয়ত স্বামীরা তাদের অন্যায়ভাবে সাহায্য করত। পরিদর্শিকা এমনও দেখেছিলেন যে ছাত্রীরা পরীক্ষায় যে বই পাঠ্য রয়েছে তার থেকে নিম্নমানের বই কেবল পড়তে পারছে।[৯০] এছাড়াও উপযুক্ত শিক্ষিকার অভাব স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের পথে প্রধান অন্তরায় দেখে কেশবচন্দ্র সেন ১৮৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্থাপন করলেন নেটিভ লেডিস্ নর্মাল স্কুল (*Native Ladies Normal School*)। এই বিদ্যালয় সম্পর্কে প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার লিখলেন: "উচ্চকুলজাত প্রায় পঞ্চাশ জন মহিলা প্রতিদিন এই বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিত হচ্ছেন, তাঁরা জ্ঞানের সর্বাপেক্ষা অগ্রবর্তী শাখাসমূহে শিক্ষালাভ ও দান করছেন। অন্তঃপুর থেকে এত বেশী সংখ্যক মহিলা এর আগে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য জমায়েত হননি। ছাত্রী শিক্ষিকাদের মাতৃভাষা ও ইংরাজী এই দুই ভাষাতেই শিক্ষা

---

৮৭ আচার্য্য কেশবচন্দ্র, আদি বিবরণ, কলিকাতা, মঙ্গলাগঞ্জ মিশন প্রেসে শ্রী বিশ্বনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮১৩ শক (১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ) পৃ:পৃ: ১৬১-১৬২।

৮৮ বিনয়ভূষণ রায়, অন্তঃপুরের স্ত্রীশিক্ষা, নয়া উদ্যোগ, কলিকাতা, জানুয়ারি, ১৯৯৮, পৃ: ৩৪।

৮৯ তদেব, পৃ:পৃ: ৪৪-৪৭।

৯০ General Report on Public Instruction in Bengal for 1877-78, Calcutta, 1878, p.p.79-80.

দেওয়া হচ্ছে আর কয়েকজন তরুণী বেশ উচ্চপর্যায়ের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।"[৯১] এখানে লক্ষ্যণীয় এই যে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী সচল রাখার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আবশ্যিক হয়ে পড়ল। তা বাদেও কেশব *Bengal Social Science Association*-এর সভায় বক্তৃতাদানকালে মেয়েদের বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাবার সুপারিশ করলেন যে যোগ্য এবং অভিজ্ঞ ইংরেজ দেশীয় মহিলারা আমন্ত্রণপূর্বক এশিয়াটিক মিউজিয়াম এবং সেখানকার বিভিন্ন কৌতুহলোদ্দীপক বিষয়, উদাহরণ সহকারে বুঝিয়ে দেন তবে তা তাদের মনের পক্ষে এত ভাল হবে যা কোন পুস্তকলব্ধ জ্ঞান করতে পারবে না। বর্তমান অবরোধ থেকে তাদের পক্ষে বহির্জগৎ সম্বন্ধে ন্যূনতম ধারণা করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু উল্লিখিত স্থানে গেলে তারা বুঝতে পারবে যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে কলা এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কত জ্ঞান জমা হয়ে আছে। আর প্রকৃতির মাঝে তারা দেখতে পাবে ফুল, ফসল, প্রস্তর এবং নদী, সৃষ্টির যা কিছু মহৎ এবং সুন্দর, তা তাদের মনকে প্রসারিত করবে, কুসংস্কার দূর করবে এবং জ্ঞানকে মনোহারী করে তুলবে।[৯২] দেখা যাচ্ছে যে অন্তঃপুর শিক্ষাপ্রণালী সুপারিশ করেও কেশবচন্দ্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রণালীকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেননি। একই রকম ভাবে, তাঁর শিক্ষাসূচীও সর্বদা তাঁর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করতে পারেনি। কেশবচন্দ্র যদিও স্ত্রীশিক্ষার প্রবল উৎসাহী সমর্থক ছিলেন তবুও তিনি মনে করতেন যে মহিলাদের শিক্ষাসূচী কখনোই পুরুষদের মতো হওয়া উচিত নয়। ১৮৮৩ সালের ১লা জানুয়ারী নেটিভ লেডিস নরম্যাল স্কুল ও মেট্রোপলিট্যান গার্লস স্কুল নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল ভিক্টোরিয়া কলেজ। এখানে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হল যাতে পুরুষোচিত শিক্ষা এড়িয়ে গিয়ে এমন শিক্ষাসূচী গৃহীত হয় যে নারী মনের কোমলতা বৃদ্ধি পায়। তাই সাধারণ পাঠ্য বিষয় ছাড়াও বিশেষ নজর দেওয়া হল গার্হস্থ্য অর্থনীতি, অঙ্কন, সঙ্গীত, রন্ধন, সূচীশিল্প এবং স্বাস্থ্য বিধির পাঠদান বিষয়ে। কেশবচন্দ্র চেয়েছিলেন যে এই কলেজের পাঠ্যবিষয় ছাত্রীরা বাড়ীতে তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের মাঝে সম্পন্ন করতে পারবে এবং কলেজ থেকে তারা মাঝে মাঝে সাপ্তাহিক পাঠদানে যোগদান করে অতিরিক্ত সাহায্য লাভ করতে পারবে। তাঁর মত ছিল এই যে মাত্র দুয়েকজন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ করতে পারেন কিন্তু বেশির ভাগ মেয়েদের উচিত স্ত্রীজনোচিত শিক্ষা লাভ করা।[৯৩] সামাজিক সংস্কারের একজন মুখ্য প্রবক্তা হয়েও

৯১ "Nearby fifty ladies, all from the high class Hindu families regularly attended the school everyday giving and receiving instruction in the most advanced branches of knowledge. Never before had women from the zenana mustered so strong to receive the light of western education ... Pupil teachers were regularly trained both in the English and vernacular language, and some of the young ladies attained the high order of proficiency." —P.C. Mazoomder, Life and Teachings of Keshub Chunder Sen, Calcutta Baptist Mission Press, Calcutta, 1887, পৃ:পৃ: ১০০-১০১।

৯২ Bela Datta Gupta, Sociology in India, পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ২১৬-২১৭।

৯৩ Indian Mirror, March 18, 1883.

কেশবচন্দ্র যে সতত স্ববিরোধিতার শিকার ছিলেন তা ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রেও একইভাবে তা উপস্থিত রয়েছে। তিনি মনে করতেন যে মেয়েদের হীনাবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার প্রাথমিক শর্ত হল শিক্ষা। স্ত্রীশিক্ষা সমাজ সংস্কারের অবিচ্ছেদ্য অংশ, একে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করে দেখলে হবে না। ভারতের সামাজিক ও ধর্মীয় পুনর্জাগরণের সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা গভীরভাবে জড়িত। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা হবে কেবলমাত্র স্ত্রীজাতির জন্যই। এই শিক্ষার লক্ষ্যবস্তু হবে ভারতের পুনর্জ্জাগরণ, সেজন্য প্রয়োজন সুন্দর গৃহ, যা মেয়েরাই গড়ে তুলবে মাতা, স্ত্রী, ভগ্নীরূপে। মেয়েদের এই ভূমিকাগুলো যাতে আরো বিকশিত হয স্ত্রীশিক্ষার কর্মসূচী রচিত হবে সেইভাবেই। উদ্দিষ্টকে এভাবে উদ্দেশ্যের মহত্ত্বের আড়ালে আবৃত করে এদেশে নারীদের অবস্থার উন্নয়ন চেয়েছিলেন কেশবচন্দ্র।

রাধাকান্ত দেবের রক্ষণশীলতা, বিদ্যাসাগরের সীমিত প্রয়াস এবং কেশবচন্দ্রের স্ববিরোধিতা সব মিলিয়ে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের কাজটি ছিল বেশ কঠিন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৮৫০ ও ১৮৬০-এর দশকে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার সম্ভবপর হয়েছিল। এই সময় সম্পূর্ণভাবে মহিলাদের উন্নতিকল্পে প্রকাশিত পত্রিকা যেমন, মাসিক পত্রিকা, বামাবোধিনী পত্রিকা বা অবলাবান্ধব পত্রিকা — এরা কেবল যে স্ত্রীশিক্ষার ধারণাকে জনপ্রিয় করেছিল তা নয়, মহিলাদেরও স্বশিক্ষিত হতে সাহায্য করেছিল। ১৮৬০-এর দশকে কৈলাসবাসিনী দেবী, তাহেরেননেসা, সৌদামিনী দেবী, মধুমতী গাঙ্গুলী, কৃষ্ণকামিনী, কামিনীসুন্দরী প্রমুখ লেখিকদের রচনা প্রকাশিত এবং প্রশংসিত হয়। ফলে রক্ষণশীলতা কিছুটা হলেও হ্রাস পেল।[১৪] এর আগেই লক্ষ্য করা গেছে যে মেয়েদের কাছে বাঙ্গালী শিক্ষিত পুরুষের প্রত্যাশার পরিবর্তন ঘটেছিল। ১৮৭০-এর দশক থেকে শিক্ষিত শহুরে ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষিতা স্ত্রীর চাহিদা খুব বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সমকালীন সাহিত্যে এর প্রভাব লক্ষণীয়। দীনবন্ধু মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্রনাথ দাস বা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — এদের রচিত গ্রন্থে নায়িকাদের প্রায় সকল নায়িকাই ছিলেন সুশিক্ষিতা।[১৫] এর ফলে শিক্ষিত ব্যক্তিরা স্ত্রীশিক্ষার যৌক্তিকতা স্বীকার করতে শুরু করেছিলেন। তাই ১৮৬৩ সালে যেখানে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯৫ এবং ছাত্রীসংখ্যা ২,৪৮৬, ১৮৯০ সালে সেখানে বিদ্যালয়ের সংখ্যা হল ২,২৩৮ এবং ছাত্রীসংখ্যা ৭৮,৮৬৫।[১৬] এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে রক্ষণশীল বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা যতই মেয়েদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে পাঠাবার বিরোধী হোন না কেন, আস্তে আস্তে এই বিরোধিতা কমে আসছিল। আসলে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী ছিল বেশ ব্যয়বহুল। ১৮৫৫ সালে প্রস্তাবিত একটি কর্মসূচীতে প্রস্তাব করা হয়েছিল যে শহরে

---

১৪ মাসিক পত্রিকা ১৮৫৪ সালে, বামবোধিনী পত্রিকা ১৮৬৩ সালে এবং অবলাবান্ধব পত্রিকা ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। তাহেরেননেসা প্রথম বাঙ্গালি মুসলমান গদ্য লেখিকা, কৃষ্ণকামিনী দাসীর প্রথম কাব্য সংগ্রহ "*চিত্তবিলাসিনী*" ১৮৫৬-তে প্রকাশিত হয়। কামিনী সুন্দরী ১৮৬৬ থেকে ১৮৭১ সালের মধ্যে দুটি নাটক এবং একটি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। —*সংকোচের বিহ্বলতা*, পৃ:পৃ: ৩০-৩১, মূল পাঠ্যাংশ এবং পাদটীকা উভয়ই দ্রষ্টব্য।

১৫ তদেব, পৃ: ৩২।

১৬ General Report on Public Instruction in Bengal for the years 1863-64 এবং 1890-91.

প্রতিমাসে খরচা ধরা হবে মাসে ১৬্ টাকা আর শহরতলিতে প্রতি মাসে ২৫্ টাকা।[৯৭] এত টাকা ব্যয় করা মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবীর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। কাজেই যে ভদ্রলোকেরা স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক ছিলেন, তাঁরা মেয়েদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে পাঠানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। ১৮৪৭ সালে স্থানীয় প্রগতিশীল ভদ্রলোকদের প্রচেষ্টায় ও উৎসাহে প্যারীচরণ সরকার প্রতিষ্ঠা করলেন বারাসাত বালিকা বিদ্যালয়। ১৮৪৮ সালে স্থাপিত হল নিবাধাই বালিকা বিদ্যালয়। ১৮৪৯ সালের ৭ই মে কাউন্সিল অব এডুকেশনের সভাপতি জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হল ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল, যা ১৮৬৩ সালে পরিচিতি লাভ করল বেথুন বিদ্যালয় নামে। বারংবার বলা হয়েছে যে প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে মেয়েদের পাঠানোতে ভদ্রলোকদের প্রবল আপত্তি ছিল। বারাসাত বালিকা বিদ্যালয়ে মেয়েদের পড়তে পাঠানোর অপরাধে সেখানকার প্রগতিশীল গোষ্ঠী স্থানীয় রক্ষণশীল গোষ্ঠীর নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন।[৯৮] বেথুন বিদ্যালয়ও প্রথমদিকে খুব সফল হয়েছিল তা বলা যায় না। প্রতিষ্ঠার ১৫ বছর পরেও এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা ছিল মাত্র ৬৪। তবুও এই বিদ্যালয়ে স্ত্রীশিক্ষা প্রথমবারের মতো প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করেছিল। এর অনুসরণে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়ায় একই বছর একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন আর দুই তিন বছরের মধ্যেই কিশোরীচাঁদ মিত্র রাজশাহীতে অনুরূপ একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন।[৯৯] এরপর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতিতে যে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার করতে চেয়েছিলেন তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এভাবে, পর্দাপ্রথার যে বাধানিষেধ মেয়েদের লেখাপড়া শেখার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল তা ক্রমে শিথিল হয়ে গেল। আরো একটি বিদ্যালয় এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করল, তা হল নেটিভ লেডিস্ নর্ম্যাল স্কুল। ছাত্রীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণে নিয়ে গিয়ে এই বিদ্যালয় পর্দা প্রথা ভঙ্গ করেছিল। তখনকার দিনে, যখন মেয়েদের স্কুলে আনতেই অনেক কাঠখড় পোড়াতে হত, তখন আবার স্কুল থেকে বাইরে নিয়ে মেয়েদের শিক্ষা দেবার ঘটনা নিঃসন্দেহ বৈপ্লবিক ছিল। এছাড়া এই বিদ্যালয়ে মেয়েদের ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন ঘটানো হয়েছিল। সে সময় মেয়েদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়াই দস্তুর ছিল। কাজেই মেয়েদের ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া একটি ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ বলে অনায়াসেই গণ্য হতে পারে। সর্বোপরি, ১৮৭০ এবং ১৮৮০-র দশকে যে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ব্যাপকতা লাভ করল তার কারণ হল অন্তঃপুর শিক্ষা কার্যক্রম এবং নেটিভ লেডিস্ নর্ম্যাল স্কুলে যে মহিলারা লেখাপড়া শিখেছিলেন তাঁরা অনেকেই এ সময়ে শিক্ষকতা আরম্ভ করেছিলেন। ফলে মহিলা শিক্ষক না থাকায় রক্ষণশীলরা তাঁদের বাড়ীর মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারছিলেন না এই অজুহাত আর রইল না।[১০০] ১৮৭১-৭৩ সালে সরকার প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে যে ক্যাম্পবেল স্কীম গ্রহণ

৯৭ Meredith Borthwick, *The Changing Role of Women in Bengal*, 1849-1905, পূর্বোক্ত, পৃ: ৭১।

৯৮ তদেব, পৃ: ৭৩।

৯৯ *সংকোচের বিহ্বলতা*, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৫।

১০০ তদেব, পৃ:পৃ: ৩৩-৩৪।

করে তার ফলে সরকারী অর্থসাহায্য পাওয়া সম্ভব হল এবং গ্রামে গ্রামে শত শত প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। এই বিদ্যালয়গুলির মধ্যে ছিল প্রায় দু'হাজার বালিকা বিদ্যালয়। ১৯০১ সালের আদমসুমারির প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মদের মধ্যে, যাদের মধ্যে প্রায় সবাই ছিলেন উচ্চবর্ণের হিন্দু, শিক্ষার শতকরা হার ছিল ৫৫.৬ ভাগ আর ইংরাজী শিক্ষিতের হার ছিল শতকরা ৩০.৯ ভাগ।[১০১]

নবায়নে নারী

এই প্রসঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি স্বয়ং মহিলারা কি ধরনের মনোভাব পোষণ করতেন তার প্রতি আলোকপাত করা যেতে পারে। এ পর্যন্ত স্ত্রীশিক্ষার সূচনা ও বিস্তার সম্পর্কে যে আলোচনা আমরা করেছি তাতে দেখা গেছে যে বহু শতাব্দী ধরে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে সামাজিক স্বীকৃতি ছিল না। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বহু কুসংস্কার প্রচলিত ছিল, যেমন, লেখাপড়া শিখলে বিধবা হতে হয়, বা মেয়েরা কালির আঁচড় দিলেও সংসারে দুর্ভাগ্য নেমে আসে, এমনকি এরকম বিশ্বাস ছিল যে শিক্ষা পেলে মেয়েরা অসতী হয় এবং স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের অবাধ্য হয়। এরকম পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই যে মহিলারা লেখাপড়া শিখেছিলেন তাঁদের মনোভাব ছিল ভীরু, পদক্ষেপ ছিল কুণ্ঠিত। রাসসুন্দরীর জীবন এই ধরনের প্রতিক্রিয়ার সাক্ষ্য বহন করে। সরলা ও সুকুমারমতি রাসসুন্দরীকে সঙ্গিনীদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁর স্নেহশীল অভিভাবকরা তাঁদেরই বহির্বাটীতে গ্রামের স্কুলে মেমসাহেব শিক্ষিকার পাশে বসিয়ে রাখতেন। রাসসুন্দরীর জন্ম ১৮০৯ সালে এবং তিনি আট বছর বয়সে স্কুলে যেতে আরম্ভ করেন অর্থাৎ ১৮১৭-১৮ সাল নাগাদ রাসসুন্দরী স্কুলে বসে ছেলেদের পড়া শুনে মনে মনে ক-খ শিখে ফেলেছিলেন। কিন্তু তাঁর অভিভাবকরা আদৌ তাঁর বিদ্যাশিক্ষা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন না, হয়তো বা তাঁর অক্ষর পরিচয়ের ঘটনা সম্পূর্ণ গোপন করেছিলেন। বারো তেরো বছরে অর্থাৎ ১৮২১-২২ সালে রাসসুন্দরী বিবাহিত জীবনে পা রাখেন। কিন্তু বাল্যকালে পিতৃগৃহে তাঁর যে অক্ষর পরিচয়ের সূচনা হয়েছিল, তাঁর দৌলতে প্রায় অবিশ্বাস্য পদ্ধতিতে শ্বশুরবাড়ীতে গৃহকর্মের ফাঁকে ফাঁকে তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন। তিনি স্বামীর কাছে নাম শুনে চৈতন্যভাগবত পুঁথিটি চিনে রেখেছিলেন এবং গোপনে তার একখানি পাতা চুরি করে রান্নাঘরের "খোড়ী"র নীচে লুকিয়ে রেখেছিলেন। একই ভাবে আট বছর বয়সী বড় ছেলের হাতের লেখা অভ্যাস করা একটি তালপাতার পাতা তিনি সংগ্রহ করেন। এইবার, বাল্যকালে চেনা অক্ষর, তালপাতার অক্ষর ও চৈতন্যভাগবতের অক্ষর মিলিয়ে দেখে দেখে অনেক পরিশ্রমের শেষে পড়তে শিখেছিলেন। এই সমস্ত ঘটেছিল রান্নার ফাঁকে ফাঁকে এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে, বুঝতে কষ্ট হয় না যে কি বিরল নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে রাসসুন্দরী লেখাপড়া শিখেছিলেন। আস্তে আস্তে তিনি ছাপার অক্ষর পড়তে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। কলকাতায় পাঠরত পঞ্চম পুত্র তাঁর জন্য একটি মুদ্রিত বাল্মীকি রামায়ণ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই কলিকাতা প্রবাসী পুত্রদের

১০১ Census of India, 1901, Vol. VIA, Part II, Calcutta : Bengal Secretariat Press, 1902, p.p.106-11.

তাগিদেই রাসসুন্দরী লিখতে শেখেন। তাঁরাই তাঁদের মাকে লেখার সাজসরঞ্জাম দিয়ে পত্রের উত্তর দেবার জন্য বারংবার পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। স্বামীর চিকিৎসার জন্য তাঁকে দীর্ঘদিন গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর থাকতে হয়েছিল, একান্নবর্তী পরিবারের আওতার বাইরে এসে তাঁর গৃহকাজ অনেক কম হওয়াতে তাঁর অবকাশ অনেক বেশী হয়েছিল এবং তিনি পড়তে শেখার মতই সম্ভবতঃ কারো সাহায্য ছাড়াই লিখতে শিখেছিলেন। রাসসুন্দরী মনে করতেন বিদ্যাহীন মানুষ পশুর সমান, কারো সাহায্য ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় তিনি লেখাপড়া শিখে খোলা আকাশের স্বাদ লাভ করেছিলেন এবং কথঞ্চিৎ হলেও স্বাধীনতা অনুভব করেছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ যখন অল্প কিছু কিছু মেয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করছিল তা দেখে রাসসুন্দরী আনন্দিত হয়েছিলেন। নিজের অবস্থার কথা স্মরণ করে তাঁর মনে হয়েছিল যে এই মেয়েরা নিষ্কণ্টক স্বাধীনতা ভোগ করছে।[১০২]

রাসসুন্দরীর জীবন ও বিদ্যাশিক্ষা অবরোধ ও কুসংস্কারের দুর্গম এক কষ্টসাধ্য তীর্থযাত্রা। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক থেকে কিছু কিছু বাঙ্গালী পুরুষ মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো আবশ্যক মনে করতে থাকেন এবং এরই ফলে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করেছিল। কিন্তু অন্দরমহলে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার চল ছিল। আর এভাবেই কোন কোন মহিলা বেশ ভাল লেখাপড়া শিখতে পেরেছিলেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুন থেকে যখন "সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকা দৈনিক হিসাবে প্রকাশিত হতে শুরু করল তখন অজ্ঞাতনামা এক বালিকার রচনা ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হল। এই সম্বন্ধে "সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকা বিশদ বিবরণ প্রকাশ করল : "চারি দিবস হইল আমারদিগের কোন কবিবন্ধু তাহার ক্ষমতার সীমা পরীক্ষার নিমিত্ত এক প্রশ্ন দেন্ যথা।

'লেখা পড়া না শিখিলে বৃথায় জীবন'
বালা এই চরণ শুনিয়া তাঁহার সাক্ষাতে তাহা পূরণ করিল, যথা।
'মূর্খ পুত্র হলে সুখি নহে তো মা-বাপ্,
তাহার কারণে পায় অশেষ সন্তাপ,
মূর্খ পুত্র হোলে বংশে জন্মে কুলক্ষণ
লেখাপড়া না শিখিলে বৃথায় জীবন।'

....

এদেশের অবিদ্যারা বিদ্যা শিক্ষায় কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা প্রাপ্তা হইলে কি এক অনির্ব্বচনীয় সুখের বিষয় হয়। এই বিষয় মিথ্যা ভাবিয়া কেহ পরিহাস করিবেন না, ইহা অতি যথার্থ।"[১০৩] "দৈবশক্তি" শিরোনামে একটি লেখায় এই আশ্চর্য প্রতিভাশালিনী বালিকার সম্বন্ধে পাঠকসমাজকে অবহিত করা হয়েছিল : "এতন্মহানগরীয় কোন সম্ভ্রান্ত বংশ্য কুলীন কায়স্থের

১০২ রাসসুন্দরী দেবী, *আমার জীবন, যত্রতত্র*।
১০৩ "সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকা, ২১শে এপ্রিল, ১৮৪৯ সাল।

নবমবর্ষ বয়স্কা এক সুরূপসী অবিবাহিতা কন্যা দৈবশক্তির অনুকম্পায় গদ্যপদ্য রচনা বিষয়ে অতি অদ্ভুত ক্ষমতাপ্রাপ্তা হইয়াছে, ঐ বালিকা রীতিপূর্ব্বক শিক্ষা করে নাই, কাহারো নিকট উপদেশ পায় নাই, কেবল আপনার যত্ন দ্বারাই শিক্ষিতা হইতেছে, দশ বর্ষ বয়স্ক তাহার একটি সহোদর স্কুলে ইংরাজী লেখাপড়া করে, এবং বাটীতে বসিয়া মধ্যে মধ্যে বাংলা লিখিয়া থাকে, তাহার সেই লেখা দেখিয়া অক্ষর চিনিয়াছিল, এবং পড়া শুনিয়া বানান্ করিতে শিখিয়াছে,..... বিদ্যানুরাগিণী বালিকা শুদ্ধ সমাচারপত্র পাঠ করিয়াই আপন চেষ্টায় ব্যুৎপত্তিশালিনী হইতেছে, ..."[১০৪]।

রাসসুন্দরী তাঁর বিদ্যা শিক্ষাকালে স্বামীর কোন সহযোগিতা পাননি। তিনি নিজেই গোপনে লেখাপড়া শিখেছিলেন বলে স্বামীর বিরোধিতার সম্মুখীনও হননি। আসলে, তাঁর স্বামী তাঁর গৃহপালয়িত্রী ভূমিকার বাইরে আর কিছু থাকতে পারে একথা কখনো ভাবেনি। রাসসুন্দরীও তাঁর স্বামীর সহানুভূতিহীনতাকে তখনকার কালের স্বাভাবিক রীতি বলেই মেনে নিয়েছিলেন, স্বামীর বিরুদ্ধে তাঁর কোন অভিযোগ ছিল না, তেমনি তিনি তাঁর পিতৃগৃহের অভিভাবকদের বিরুদ্ধেও কোন অসন্তোষ প্রকাশ করেননি, যাঁরা তাঁকে স্কুলে বসিয়ে রেখেও লেখাপড়া শেখানোতে কোনরকম যত্ন করেননি। কিন্তু, বঙ্গমহিলা কর্তৃক রচিত প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ "চিত্তবিলাসিনী" কাব্যের রচয়িত্রী কৃষ্ণকামিনী দাসী (মিত্র মুস্তৌফী) স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেও শ্বশুরালয়ে বিদ্যোৎসাহী বিদ্বান স্বামীর সহযোগিতায় সামান্য শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন। প্রতিভাময়ী এই নারী সেই সামান্য পুঁজি সম্বল করে স্বামীর অকুণ্ঠ সাহায্যের বলে কাব্যরচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন।[১০৫] গ্রন্থের ভূমিকায় লেখিকা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে "পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, যে এই ক্ষুদ্র পুস্তক রচনার সময় আমার প্রাণবল্লভ যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন এবং তিনি এ বিষয়ে মনোযোগী না হইলে কেবল আমা হইতে ইহা সম্পন্ন হইবার কোন প্রকার সম্ভাবনা ছিল না।"[১০৬] মূল পুস্তকের "আত্মপরিচয়" কবিতাতেও কৃষ্ণকামিনী তাঁর স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন :

"কনিষ্ঠের বংশধর শ্রীশশিভূষণ।
অধিনীর প্রাণের বল্লভ সেই জন।।
তাঁর আনুকূল্যে আমি করেছি মনন।
"চিত্তবিলাসিনী" গ্রন্থ করিতে রচন।।"[১০৭]

এই কাব্যগ্রন্থে "বাদী-প্রতিবাদী" কবিতায় লেখিকা স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর মত জ্ঞাপন করেছেন, অত্যন্ত আকর্ষণীয় উপায়ে এখানে বাদী অম্বিকা নিবাসী শ্রী বেণীমাধব মল্লিক মহিলা বিদ্বেষী

১০৪ তদেব।
১০৫ বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম দুটি মুদ্রিত গ্রন্থ, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫২।
১০৬ চিত্তবিলাসিনী — তথ্যসূত্র, তদেব। পাদটীকা। এই গ্রন্থের পৃ: ৯৬-তে চিত্তবিলাসিনী কাব্যের ভূমিকা মুদ্রিত হয়েছে।
১০৭ তদেব, পৃ: ৯৮।

ও স্ত্রীশিক্ষা বিরোধী, নারীজাগরণকে তিনি সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর ভাবেন। অপরদিকে প্রতিবাদী শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মুস্তৌফী, স্পষ্টতঃই লেখিকার উদারহৃদয় স্বামী বা তাঁর বংশের প্রতীক, মনেপ্রাণে নারীব বন্দিদশা থেকে মুক্তি কামনা করেন এবং নাবীর মহীয়সী ভূমিকাতে আস্থা স্থাপন করেন। এঁবা দুজন নব্যসম্প্রদায়ের কয়েকজন ব্যক্তির উপস্থিতিতে নারীশিক্ষা ও নারীজাগরণ সম্পর্কে তর্কযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। এরকম পরিস্থিতিতে প্রতিবাদী স্ত্রীশিক্ষার সুফল থেকে সমাজকে বঞ্চিত করার জন্য পুরুষকুলকে দায়ী করছেন :

"বিদ্যাপতি গুণবতী নারী যদি হয়।
অনিষ্ট সাধনে তার মন নাহি লয়।।
অতএব স্ত্রীগণেরে বিদ্যা শিখাইলে।
সন্দেহ নাহিক তায় শুভ ফল ফলে।।
বিনা দোষে দোষ দেওয়া অতি অনুচিত।
অনিষ্টের সৃষ্টিকর্ত্তা পুরুষ নিশ্চিত।।"[১০৮]

মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলে ব্যভিচারিণী হবে, তারা আর স্বামীর অধীনস্থা থাকবে না। স্ত্রীশিক্ষার সূচনায় এই ভয় সমাজে সুপরিব্যাপ্ত ছিল, যা প্রতিধ্বনিত হয়েছে বাদীর কণ্ঠে :

"রমণী কুটিল জাতি
সতত কুপথে মতি
অবিরত রত কুচিন্তায়।
লেখাপড়া শিখাইলে,
শেষে এই ফল ফলে,
চিঠি লিখে মানুষ আনায়।।[১০৯]

তখন প্রতিবাদী তার উত্তর দিচ্ছে :

"চিঠি লিখে মানুষ আনিবে নারীগণ।
লেখাপড়া শিখে কভু না হয় এমন।।
বিদ্যা হৈতে জ্ঞান জ্ঞান ধর্ম্মের কারণ।
ধর্ম্ম ভয়ে কুপথেতে না করে গমন।।"[১১০]

কৃষ্ণকামিনী দেবীর গ্রন্থটি প্রথম মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থ আর ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত বামাসুন্দরী দেবীর "কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে শীঘ্র এ দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে?" প্রথম

---

১০৮ "চিত্তবিলাসিনী" কাব্য, তদেব, পৃঃ ১২৬। এখানে উল্লেখ কবা প্রয়োজন যে গ্রন্থে "বাদী প্রতিবাদী" বলে কোন শিরোনাম নেই। লেখিকা না দিলেও আলোচনার সুবিধার্থে এই নাম হয়েছে। দ্রষ্টব্য পাদটীকা, তদেব, পৃঃ ১২৪।

১০৯ তদেব, পৃ· ১২৭।

১১০ তদেব, পৃ ১২৯।

মুদ্রিত গদ্য পুস্তক। ১২৬৭ বঙ্গাব্দের ১৫ই ফাল্গুনের "সোমপ্রকাশ" পত্রিকায় এই রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। লোকনাথ মৈত্রেয়, যিনি বামাসুন্দরীকে কন্যাসম পরমাত্মীয় বলে জ্ঞান করতেন, তিনি এই রচনাটি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করেছিলেন। বামাসুন্দরী সম্পর্কে আরো উল্লেখযোগ্য তথ্য এই যে তিনি মাত্র তিন বছর বিদ্যাচর্চা করে গ্রন্থকর্ত্রী হয়েছিলেন এবং গভীর বিষয়ে আলোচনা করার ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। তা দেখে লোকনাথ মৈত্রেয় মন্তব্য করেছিলেন : "যত্ন সহকারে বিদ্যার্জ্জনে নিবিষ্টমনা হইলে আমাদের দেশীয় রমণীগণ যে কত অল্পকাল মধ্যে বিদ্যা ও জ্ঞানালঙ্কারে ভূষিতা হইতে পারেন, তাহা এদেশের লোকের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচার করিবার অন্যতম উদ্দেশ্য।"[১১১] "বামাবোধিনী" পত্রিকা "নতুন সংবাদ" শিরোনামে জানাল যে আঁকনা নিবাসিনী শ্রীমতী কল্পলতা এক স্ত্রী বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। ঐ প্রসঙ্গে আরোও জানানো হল : "ইতিপূর্ব্বে পাবনা-নিবাসিনী শ্রীমতী বামাসুন্দরী মহাশয়া আপন গৃহে একটি বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়াছেন। আমাদের দয়ালু গভর্নমেন্ট অর্থ দ্বারা সেই বিদ্যালয়ের সাহায্য করিতেছেন। তিনি ২০ টাকা মাসিক বেতনে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। এক্ষণে এই দুই জনই আমাদের বামাগণের গৌরবস্বরূপ।"[১১২] বামাসুন্দরী শিক্ষালাভ করে শুধু গ্রন্থই রচনা করেননি, তিনি শিক্ষিকা হয়ে অর্থোপার্জ্জন করেছিলেন, এমন একটা সময়ে, যার বহু পরেও স্ত্রীশিক্ষা যেন মেয়েদের নৈতিক উন্নতি সাধনের সহায়ক হয়, তার অর্থকরী ভূমিকা না থাকলেও চলবে, অর্থোপায়ের জন্য পুরুষরাই রয়েছে, এ মত জ্ঞাপন করছে মেয়েরা নিজেরাই। তাই বামাসুন্দরী নিজের মানসিক শক্তিবলে নিজের পারিপার্শ্বিককে বহুদূর অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। তাই নারী সমাজের দুর্দশা যে পুরুষদের সৃষ্টি, আর নিজেদের স্বার্থে পুরুষরা তা মোচনে উদাসীন, একথা বলতে এতটুকুও কুণ্ঠিত হননি বামাসুন্দরী : "স্ত্রী-জাতির দুঃখে যদি তাহারা দুঃখিত হইতেন, তবে হতভাগিনীদিগের এত কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। তাঁহারা দুঃখিত হইবেন কেন? তাঁহাদের চাকরাণীর কাজ, রসুয়ের কাজ অনায়াসে চলিয়া যাইতেছে। তাঁহারা আমাদের দুঃখ মোচনের চেষ্টা কেন করিবেন?"[১১৩] স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধেও তার অভিমত খুব সংশয়হীন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন যে শিক্ষার দ্বারা মেয়েদের সার্বিক উন্নতি সাধিত হতে পারে। মুর্খ স্ত্রীলোক জানে না কিভাবে গৃহকার্য সম্পন্ন করতে হয়, কিভাবে পরিজনবর্গের সাথে ব্যবহার করতে হয়, কিভাবে সন্তান লালন পালন করতে হয়। শিক্ষার অভাবে গর্ভাবস্থায় নিজের ও সন্তানের নিরাপত্তার জন্য তাদের কি করা উচিত তা জানা না থাকায় তারা যা করা উচিত নয় তা করে। নানাপ্রকার অনিষ্টকর দ্রব্য খায়। এভাবে তারা অজ্ঞানতাবশতঃ গর্ভস্থ সন্তানের যে ক্ষতি সাধন করে তা সময়ে সময়ে সংশোধনাতীত হয়ে দাঁড়ায়। মেয়েদের লেখাপড়া শেখালে তারা জানতে পারে যে পিতামাতা ,স্বামী, শ্বশুর শাশুরী, প্রভৃতি গুরুজনকে মান্য করা উচিত। শিক্ষিতা

১১১ তদেব, পৃ.পৃ: ৭৮-৮০।
১১২ *বামাবোধিনী পত্রিকা*, '*নূতন সংবাদ*', জ্যৈষ্ঠ ১২৭১।
১১৩ *সোমপ্রকাশ পত্রিকা*, ১০ই ভাদ্র ১২৬৯ (২৫শে আগস্ট, ১৮৬২), পৃ: ৪৯২।

মেয়েরা কখনো ব্যভিচারিণী হয় না, কৃতবিদ্য স্বামীর যদি মূর্খ স্ত্রীলাভ ঘটে তবে তার চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক আর কিছু হয় না, এই রকম দাম্পত্য সম্পর্ক শুধু সংশ্লিষ্ট দম্পতিরই নয় সমগ্র পরিবার মধ্যে ঘোরতর অনিষ্ট নিয়ে আসে।[১১৪] "এই রূপ এক লেখাপড়ার জ্ঞানাভাবে তাহাদিগকে যাবজ্জীবন অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়. . .।" তাই তিনি আহ্বান জানালেন : " হে দেশীয় রমণীকুল। তোমরা স্ব স্ব গৃহকার্য্যাবকাশে বিদ্যানুশীলন কর,. . . ."[১১৫] যে পুরুষকে মেয়েদের সমস্ত দুর্দশার জন্য দায়ী করছেন বামাসুন্দরী, সেই পুরুষশাসিত পরিবারকে শ্রীমণ্ডিত করার চেষ্টা করেছেন তিনি। তাঁর রচনায় মেয়েদের গৃহপালয়িত্রী ভূমিকা যেন বজায় থাকে ও উন্নত হয় একথাই বারংবার বলা হয়েছে, কিন্তু বলা হয়নি মেয়েরা লেখাপড়া শিখে পরিবারের গণ্ডী ছেড়ে বেরিয়ে আসুক, শিক্ষাকে তারা অপরাপর শিক্ষাবঞ্চিত মেয়েদের মধ্যে প্রসারিত করুক. তাবা গ্রন্থকর্ত্রী হোক, তারা বিদ্যালয় স্থাপন করে স্বনির্ভরতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করুক।

লেখাপড়া শিখে মেয়েদের আব বশে রাখা যাবে না, তারা পুরুষদের অমান্য করবে, গৃহকার্যকে উপেক্ষা করবে, অবরোধ মানবে না বা ব্যভিচারিণী হবে, এই ভয়েই তারা অর্থাৎ পুরুষরা মেয়েদের শিক্ষাদানে বিরত থাকে একথা মনে করতেন কৈলাসবাসিনী গুপ্তা।[১১৬] "কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রিষ্টান, সকল জাতীর শাস্ত্রেই কথিত আছে যে পত্নী পতির অর্ধঅঙ্গ স্বরূপ এবং সুখদুঃখের সমভাগী, কিন্তু ভারতবর্ষীয়েরা সেই শাস্ত্রোক্ত বাক্যের অর্ধেক প্রতিপালন ও অপরার্ধেক পরিত্যাগ করিতেন অর্থাৎ দুঃখের অংশটি বিলক্ষণরূপে প্রদান করিতেন কিন্তু সুখের অংশটি দিতে অতিশয় কাতর হইতেন, নচেৎ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিবেন কেন? তাঁহারা বণিতাগণকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে রাখিবার অভিপ্রায়েই তাহাদিগকে বিদ্যারসের সুধাময় মাধুর্য আস্বাদন করাইতে ইচ্ছা করিতেন না অথবা পাছে তাঁহারা বিদ্যাবলে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া পুরুষগণকে অগ্রাহ্য করে কিংবা গৃহকার্যে উপেক্ষারত কেবল শাস্ত্রালাপেই রত থাকে ও অন্তঃপুর হইতে বহির্গতা হইতে ইচ্ছা করে অথবা পত্রদ্বারা আমন্ত্রণ করত অন্য পুরুষকে বরণ করিতে অভিলাষিণী হয়, এই প্রকার বিবিধ আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া তাঁহারা স্ত্রীগণকে নিতান্তই নির্বোধ ও বিদ্যাভাসে অশক্তা বলিয়া নির্দেশ করিতেন। তাঁহারা কহিতেন যে অবলাগণকে ঈশ্বর স্বভাবতই নির্বোধ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আর উহাদিগের অর্থ উপার্জন করিতে হইবেক না, উহারা গৃহকর্ম নির্বাহ করিবে, গৃহকর্মে বিদ্যার কী আবশ্যক, তবে যদি এরূপ হয় যে তাহারা লেখাপড়া শিখিয়া রাণী ভবানী প্রভৃতির ন্যায় স্ব স্ব বিষয়

১১৪ বামাসুন্দরী দেবী, "কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে শীঘ্র এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে", বসন্ত কুমার সামন্ত সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত, যত্রতত্র।

১১৫ তদেব।

১১৬ কৈলাসবাসিনী গুপ্তা, "*হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভাস*", ১৮৬৫, সুতপা ভট্টাচার্য, সংকলিত ও সম্পাদিত, বাঙ্গালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য — উনিশ শতক, সাহিত্য একাদেমি, নিউ দিল্লী, ১৯৯৯, পৃ: ১৫৫-৫৭-তে পুনর্মুদ্রিত।

সম্পত্তি রক্ষা কহিতে সমর্থ হয় তবে উহাদিগের বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন বটে, নচেৎ উহাদিগের বিদ্যাভ্যাসের কোন আবশ্যক নাই, আর আমরা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, আমাদিগের বণিতাগণের বিদ্যাভ্যাসে কোনো প্রয়োজন নাই — এইরূপ নানা প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া তাঁহারা স্ব স্ব বণিতাগণকে বিদ্যাপথে পদার্পণ করিতে দিতেন না, পরে তাঁহাদিগের কন্যাপুত্রগণও সেই পৈতৃক প্রথা অনুসারে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন।"[১১৭] কৈলাসবাসিনীর আপত্তি ছিল এইখানে যে পুরুষেরা মনে করতেন যে অর্থকরী প্রয়োজন না থাকলে বিদ্যাশিক্ষার আর কোন প্রয়োজন নেই, তাই অর্থশালিনী মহিলাদের পক্ষে যদিও বা শিক্ষা প্রয়োজন, মধ্যবিত্ত মহিলারা সচরাচর গৃহকর্ম করে থাকে বলে তাদের আর লেখাপড়া শেখানোর প্রয়োজন নেই।

কৈলাসবাসিনীর অভিযোগের উত্তর পাওয়া যায় তাহেরণ লেছার রচনায়।[১১৮] তাহেরণ লেছা লিখলেন, "বিবেচনা করিতে গেলে এমন কোন গর্হিত কর্ম্মই নাই যে তাহা মূর্খ দ্বারা হয় না। এই অসার সংসারে, মূর্খ হইয়া কুলকামিনীগণের কলেবর ধারণ করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।. . . বিদ্যোপার্জ্জন দ্বারা যদি স্ত্রীগণের হৃদয়আকাশ জ্ঞানশশির আলোকে আলোকিত হয়, তবে তাহারা এই নিখিল ভূমণ্ডলে সুশৃঙ্খলার সহিত সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক আপনার ও স্বীয় পরিবারের যে কত অনির্ব্বচনীয় আনন্দোৎপত্তি করিতে পারে তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না ।. . . . এদেশীয় পূর্বতন রমণীগণ মধ্যেও এবিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, লীলাবতী, খনা, রানী ভবানী প্রভৃতি স্ত্রীগণ আপন আপন বিদ্যাপ্রভাবে কিরূপ যশোরাশী বিস্তার করতঃ পিতৃ ও স্বামী বংশ উজ্জ্বল করিয়া জীবনের সফলতা লাভ করিয়া গিয়াছেন তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। . . . . . অতএব হে দেশীয় সভ্যমহোদয়গণ, আপনারা আর *স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিতে উদাসীন থাকিবেন না। যদি এ ধরাধামকে আপনাদের প্রকৃতই* সুখধাম দেখিতে ইচ্ছা থাকে তবে অগ্রে আপনাদের স্ত্রীগণকে বিদ্যাশিক্ষায় ভূষিত করিতে চেষ্টা পান,"[১১৯] গৃহকর্মে রত স্ত্রীজাতির লেখাপড়া শেখার দরকার নেই ও অবজ্ঞার তাচ্ছিল্যের সমুচিত উত্তর দিয়েছেন তাহেরণ লেছা, যে যদি মেয়েদের সংসারের কাজে আবদ্ধ থাকতেই হয় তাহলেও ঐ সাংসারিক ক্ষেত্রকে সুন্দরতর করে তোলার জন্য তাদের লেখাপড়া শেখানো আবশ্যিক।

যেখানে অর্থোপার্জনের প্রশ্ন আসে না সেখানে মেয়েদের লেখাপড়ার দরকার কি এই প্রশ্নের যোগ্য জবাব পাওয়া যায় খৈ-পাড়া নিবাসিনী শ্রীমতী কামিনী দত্তের রচনায়।[১২০] "বিদ্যা

১১৭ তদেব, পৃ: ১৫৫।

১১৮ শ্রীমতী বিবি তাহেরণ লেছা। বোদা বালিকা বিদ্যালয়, ১ম শ্রেণীস্থ ছাত্রী, সম্পাদককে লেখা পত্র, *বামাবোধিনী পত্রিকা* ফাল্গুন ১২৭১, ভারতী রায়, সংকলিত ও সম্পাদিত সেকালের নারীশিক্ষা, *বামাবোধিনী পত্রিকা*, উইমেন্স স্টাডিজ্ রিসার্চ সেন্টার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪, পৃ:পৃ: ২৬-২৭।

১১৯ তদেব।

১২০ শ্রীমতী কামিনী দত্ত, খৈ-পাড়া, "স্ত্রীশিক্ষা" *বামাবোধিনী পত্রিকা*, ভাদ্র ১২৭৪, তদেব, পৃ:পৃ: ৪৫-৪৭।

কি কেবল পুরুষদের উপার্জনের জন্যই হইয়াছে? আমাদের দেশের রমণীগণও এইরূপ ভাবিয়া থাকেন, তাহা না হইলে তাঁহারা স্বয়ং কন্যাগণকে গুণবতী করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিতেন তাহার সন্দেহ নাই।. . . . যদি শিক্ষার উপায় সত্ত্বে স্ত্রীগণ শিক্ষায় ঔদাস্য প্রকাশ করিতেন তাহা হইলে তাহারাই ভর্ৎসনার পাত্রী হইতেন কিন্তু এক্ষণে তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিলে অকারণে নিরপরাধিনীকে ভর্ৎসনা করার দোষে দোষী হইতে হয় পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিবেচনা করিলে অস্মদ্দেশীয় পুরুষবৃন্দকেই দোষারোপ করিতে হয়। তাহাদিগেরই বিবেচনা করা কর্তব্য যে যতদিন এদেশের স্ত্রীলোকেরা গুণবতী না হইবেন ততদিন কোন বিষয়ে উন্নতির সম্ভবনা নাই। . . . . . স্ত্রী যদি স্বামীর ন্যায় জ্ঞানালঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইতেন এবং স্বীয় পতির ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত করিতেন এবং তিনি কুসংস্কার বর্জিত হইতেন তাহা হইলে সেই দম্পতির এই পৃথিবীতে স্বর্গানুভব হইত তাহাতে সন্দেহ কি।. . . হে সহোদরাসম বঙ্গদেশীয়া মহিলাগণ . . . . দেখ ভিন্নদেশীয় স্ত্রীগণ বিদ্যার গুণে স্বাধীনতাকে লাভ করিয়া আপনাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন। তোমরা তাহাদের ন্যায় বিদ্যানুশীলন করিয়া স্বাধীনতা লাভ এবং মনুষ্য জীবন সার্থক কর।"[১২১] শ্রীমতী কামিনী বিদ্যাকে অর্থোপার্জনের মাধ্যমের চেয়েও আরো বড়ো কিছু ভাবতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন বিদ্যালাভ করে মেয়েরা তাদের অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পাক। শিক্ষা তাদের জীবনের সার্বিক উন্নতি ঘটাবে, আর তা হলে শুধু এককভাবে সংসার বা পরিবার নয়, উন্নতি ঘটবে সমাজের। এর প্রতিধ্বনি শোনা গেল শ্রীমতী সৌদামিনী দেবীর লেখায়। "বামাবোধনী" পত্রিকার সম্পাদকের কাছে তিনি চিঠি লিখলেন : " পরমেশ্বর স্ত্রী ও পুরুষ জাতিকেই বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মবৃত্তি প্রদান করিয়া এই অমৃতময় সংসারে স্বাধীন করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ফলতঃ ইহাই যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে পুরুষগণ কেন, আমাদিগকে এরূপ নিকৃষ্টাবস্থায় রাখিয়াছেন? আমরা কি পরম পিতার সন্তান নই? পুরষেরা নানারূপে বিদ্যাভ্যাস করিয়া পরম জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ইহকালেই পরমাত্মার রসাস্বাদনে অনুপম সুখানুভব করিতে পারেন। আমরা কি উক্ত সুখের কণামাত্রও প্রাপ্ত হইব না। হে পরমাত্মন, আমাদের এইরূপ দুরবস্থার কত দিনে অবসান হইবে, এবং কত দিনেই বা এই ঘৃণিত দেশাচারের বশীভূত হইয়া থাকিব। আহা। যদি মনুষ্যজন্ম ধারণ করিয়া অজ্ঞানতিমিরাবস্থায় কাল যাপন করিতে হইল, তবে আমাদের জীবিত থাকা বিড়ম্বনা মাত্র। হে করুণাময়। আর কত দিন আমরা এই শৃঙ্খলরূপ গৃহরুদ্ধা থাকিব। ভালো আমাদের কি সুখভোগে অভিলাষ হয় না। আহা, দুঃখের কথা স্মরণ হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, অতএব স্বদেশবাসী ভ্রাতাদিগের নিকট করপুটে নিবেদন করি, যে তাঁহারা স্ব স্ব কলত্র ও কন্যাদিগকে বিদ্যারূপ অমূল্য রত্ন প্রদানকরতঃ এই ঘৃণিত দেশাচার সমূলে নির্মূল করিতে মনোযোগী হইবেন। তাহা না হইলে আর বঙ্গ অঙ্গনাগণের মঙ্গলের পথ দৃষ্টিগোচর হয় না।"[১২২]

১২১ তদেব।

১২২ বামাবোধিনী পত্রিকা। ভাদ্র ১২৭২, বাঙ্গালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য — উনিশ শতক, পূর্বোক্ত গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত, পৃ:পৃ: ১৫৭-১৫৮।

মেয়েরা লেখাপড়া শিখে অর্থ উপার্জন করবে না। তাহলে তাদের লেখাপড়া করবার দরকার কি — এই যুক্তি তখন স্ত্রীশিক্ষা বিরোধীরা বারংবার ব্যবহার করতেন। মহিলারা এর জবাব লিখিত রচনার মাধ্যমে দিয়েছিলেন। শালিগ্রাম নিবাসিনী শ্রীমতী মধুমতী মুখোপাধ্যায় লিখলেন : "এ দেশের স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাবতী হইলে পুস্তক রচনা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া ইচ্ছামত ব্যয় করিতেও পারেন এবং দৈববশতঃ যদি দৈন্যদশায় পতিত হয়েন তাহা হইলে সংসারযাত্রাও নির্ব্বাহ করিতে পারেন। সন্তানদিগের শিক্ষা বিষয়েও অধিক অর্থব্যয় করিতে হয় না। মাতার নিকট উপদেশ পাইয়া কখনই সন্তানেরা কুসংস্কারাপন্ন হইতে পারে না।"[১২৩]

অবশ্য পুরুষদের স্ত্রীশিক্ষার প্রতি অনীহা নয় স্ত্রীশিক্ষা প্রসারিত না হওয়ার অপরাপর কারণও ভেবে দেখেছিলেন মেয়েরা আর এ নিয়ে লেখালেখিরও অন্ত ছিল না। কোন্নগর থেকে কোন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শ্রীর. সু. দা. এই স্বাক্ষরে লিখলেন : "যদিও কাহার সদাশয় পিতা আপনার কন্যাকে বিদ্যানুশীলনে প্রবৃত্তা করান, তবে তাহাতে তাহাদের কিছুই শ্রেয় সাধন হয় না। কারণ তাঁহারা কন্যার বর্ণজ্ঞান হইতে না হইতেই বিবাহরূপ প্রবল তরঙ্গ দ্বারা উক্ত জ্ঞানাঙ্কুর সমূলে উন্মুলিত করিয়া দেন। পরে যদিও কেহ কেহ বিদ্যানুশীলনে যত্নবতী হয়েন, কিন্তু তাহাতে প্রায় কোন শুভ ফল দর্শে না। কেননা শিক্ষকের নিকট সুরীতিক্রমে বিদ্যাশিক্ষা না করিলে ও সদুপদেশ প্রাপ্ত না হইলে, কখনই ভ্রমরূপকণ্টকী সমূলে বিনাশিত হইতে পারে না। বরং অল্প বিদ্যাভ্যাস জন্য হিতাহিত বিবেচনা না করিতে পারিয়া প্রায় সকলেই কুপুস্তক পাঠ দ্বারা আপনাদের ভ্রমান্ধতা আরও শতগুণে বৃদ্ধি করেন।"[১২৪] এই রচনাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে এটি লেখিকার সমাজ সচেতনতা প্রকাশ করেছে। তখনকার সামাজিক অবস্থা যে স্ত্রীশিক্ষার অন্তরায় তা লেখিকা যেমন বুঝতে পেরেছেন, তেমন তিনি এও উপলব্ধি করেছেন এই অবস্থা সৃষ্টি করেছেন পুরুষেরা। তিনি আরো বলেছেন যে মেয়েদের যদি নিয়মানুগভাবে লেখাপড়া শেখানো না হয় তাহলে তা তাদের কোন কাজেই লাগবে না। বরঞ্চ অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী হয়ে তা তাদের ক্ষতিসাধন করবে। লেখিকা যে কত দূরদর্শী ছিলেন তা বোঝা যায় যখন ১৮৮০-র দশকেও এই একই কথা অপর এক লেখিকার রচনায় উল্লিখিত হতে দেখি। এই রচনার লেখিকাও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ছিলেন। শ্রী—এই মাত্র স্বাক্ষর করে তিনি এই মত প্রকাশ করেছেন : " অল্প শিক্ষা বহু অমঙ্গলের প্রসূতি। প্রথমত, অল্পশিক্ষা অহঙ্কারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়। অনেক অনেক নারী একটু আধটু মাত্র লিখিতে পড়িতে শিখিয়া মনে করেন, আমরা লেখাপড়া শিখিয়াছি কিন্তু কি শিখিয়াছি তা একবারও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না । তা হবেই ত, যিনি যত বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে উন্নতি লাভ করেন, তাঁহার নিজ মূর্খতা তত বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়।[১২৫]

১২৩ বামাবোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১২৭২।
১২৪ তদেব, জ্যৈষ্ঠ ১২৭৫।
১২৫ বামাবোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১২৯১।

যদিও বা স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা গেল বাধা হয়ে দাঁড়াল অবরোধ প্রথা। পুরুষ শিক্ষকের কাছে, কারণ তখন মহিলা শিক্ষিকা দুর্লভ, প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে বাড়ীর অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে মেয়েরা শিক্ষালাভ করবে, এ ভাবনায় পুরুষ সমাজ শিহরিত হলেন। এইভাবে জন্ম নিল অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী। অবশ্য আগে থেকেই অন্তঃপুরের নিজস্ব শিক্ষা পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল বৈষ্ণবী শিক্ষয়িত্রীর মাধ্যমে কিন্তু তাদের শিক্ষাদান পদ্ধতি নতুন ঔপনিবেশিক যুগের শিক্ষার চাহিদার সঙ্গে সাযুজ্যময় ছিল না। মেয়েদের আধুনিক যুগোপযোগী শিক্ষা দিতে হবে অথচ তাদের অবরোধ লঙ্ঘন করা চলবে না — এই দুই পরস্পরবিরোধী চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য সৃষ্টি হল অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী। "বামাবোধনী" পত্রিকা এইরকম একটি অন্তঃপুর শিক্ষা কর্মসূচী পরিচালনা করত। কৃতী ছাত্রীদের পুরস্কার দেওয়া হত এবং তাদের রচনা পত্রিকায় প্রকাশ করা হত। কিন্তু এই ধরনের শিক্ষাসূচী অনিবার্যভাবে নানা ত্রুটি পরিপূর্ণ ছিল তা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার প্রধান প্রতিবন্ধক ছিলেন বাড়ীর বয়স্কা মহিলারা। তাঁরা কিছুতেই বয়ঃকনিষ্ঠাদের লেখাপড়া শেখাকে সমর্থন করতেন না। কাজেই মেয়েরাই মেয়েদের অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে এটি মস্ত অন্তরায় হয়ে উঠেছিল। এই সমস্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হয়ে কৃষ্ণনগর ঘোষপাড়া থেকে শ্রীমতী সুসমাসুন্দরী দাসী লিখলেন : "বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা কোনকালেই ছিল না, এ কারণ বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা কেবল পিঞ্জরবন্দিনী বিহঙ্গিনী স্বরূপা হইয়া আছেন। ইহাদের মনের উৎসাহও নাই, কোন ক্ষমতাও নাই। সৎশিক্ষা পাইলে যে কিরূপ উপকার দর্শে। এই বিহঙ্গিনীরা সে আস্বাদ কিছুই গ্রহণ করেন নাই। এখনকার নব্যা ব্যক্তিগণ বরং এক আধটুকু পড়িতে শিক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের প্রাচীন গৃহিণীদের লেখাপড়ার সঙ্গে আলাপ নাই। নব্যা স্ত্রীলোকদের হস্তে পুস্তক দেখিলে তাঁহারা জ্বলিয়া যান। সুতরাং প্রাচীন স্ত্রীলোকদের ভয়ে নব্যা ব্যক্তিগণও পুস্তকাদি হাতে ধরিতে ভয়ার্ত্ত হয়েন।. . . . . মহাশয়েরা অগ্রে স্থানে স্থানে স্ত্রীলোক শিক্ষয়িত্রী রাখিবার ব্যবস্থা করুন, পরে এমন একটি প্রথা আবিষ্কার করুন, যে বঙ্গদেশের স্ত্রীলোকদের শিক্ষার জন্য গভর্নমেন্ট ইচ্ছানুযায়ী স্থানে স্থানে এইরূপ শিক্ষয়িত্রী নিযুক্তা করেন। বঙ্গদেশীয় অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকেরা প্রতিদিন অবকাশমত এই শিক্ষয়িত্রীর নিকট শিক্ষা পাইবেন। গভর্নমেন্টের অনুমতি হউক এই আদেশ প্রতিপালন না হইলে বঙ্গদেশের পৃথক পৃথক ঘরে মাসে মাসে পাঁচ টাকা করিয়া জরিমানা দিতে হইবে। এইমত ব্যবস্থা করিলেই বঙ্গদেশের অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকদের লেখাপড়া শিক্ষার উপায় হইয়া যাবে। ইহা ব্যতীত বঙ্গরমণীর লেখাপড়া শিক্ষার উপায় কিছুই দেখি না।"[১২৬] কাজেই মেয়েরা শিক্ষালাভ বিষয়ে এতই আগ্রহী ছিলেন যে তারা অন্দরমহলের বিরোধিতা অতিক্রম করার জন্য সরকারী হস্তক্ষেপ দাবী করছেন। এই লেখাটি একাধারে অভিনব ও সাহসী। কারণ, যখন পুরুষেরা বিতর্কে মেতেছিলেন সমাজ সংস্কারে বিদেশী সরকারের হস্তক্ষেপ যথার্থ ও বাঞ্ছনীয় কিনা এই বিচারে, যখন তাঁরা সংশয়াচ্ছন্ন মেয়েদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে পড়তে পাঠানো উচিত কিনা,

১২৬ বামাবোধিনী পত্রিকা, আষাঢ় ১২৯৬।

তখন সুসমাসুন্দরী অসীম সাহসিকতায় সেই বিদেশী সরকারের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন আর কোথাও নয় বাঙ্গালী অন্তঃপুরে।

মেয়েদের শিক্ষাবঞ্চনার পেছনে কাজ করছে পুরুষের ভয়। একথা বুঝতে পেরে মেয়েরাই পুরুষদের আশ্বাস দিয়েছিল যে স্ত্রীশিক্ষা মেয়েদের উচ্ছৃঙ্খল তো করবেই না বরঞ্চ শিক্ষা স্ত্রীজাতির অধীনতা সুনিশ্চিত করবে। স্ত্রীসুলভ গুণাবলী যথা কোমলতা,পরার্থপরতা, নম্রতা ইত্যাদি বৃদ্ধি করবে, ফলে শিক্ষিতা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে মিলে রচিত হবে সুখী গৃহকোণ। পূর্বে মহিলা রচনায় দেখা গিয়েছিল যে মেয়েরা মনে করছেন যে মেয়েদের অধীনতা তথা হীনাবস্থার জন্য দায়ী শিক্ষার অভাব। শিক্ষা তাদের স্বাধীন ও উন্নত করবে, কিন্তু যখন আবার সেই মহিলারাই বলছেন যে শিক্ষা তাদের মধ্যে অধীনতা সুনিশ্চিত করবে এবং স্ত্রীসুলভ গুণাবলী বজায় রাখবে তখন এর মধ্যে পরস্পর বিরোধিতার আভাস দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু মেয়েদের রচনার মধ্য দিয়ে তারা যে যুক্তিজাল বিস্তার করেছে তা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে মেয়েরা শিক্ষালাভ করলে সাংসারিক কর্তব্য অবহেলা করে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়বে পুরুষের এই ভয় নিরসন করার জন্যই মেয়েরা ভরসা দিয়েছে যে শিক্ষিতা মেয়েরা কখনোই স্বাধীনতার অপব্যবহার করবে না বা গৃহকে অবহেলা করবে না। এই মতকে প্রতিপন্ন করতে গিয়ে ভাটপাড়া নিবাসিনী শ্রীমতী প্রসন্নতারা গুপ্তা লিখলেন : "ঈশ্বর এই পৃথিবীতে স্ত্রী-পুরুষ উভয় জাতিকে স্বাধীন প্রকৃতি করিয়া সৃজন করিয়াছেন। ইহার একের স্বাধীনতার উপর অন্যের কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরের নিয়ম বিরুদ্ধ তাহা হইলে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আমাদের দেশে এই ভয়ঙ্কর নিয়ম প্রায় সকল স্থানেই প্রচলিত। আমাদের দেশে পুরুষদের যেমন স্বাধীনতা, স্ত্রীলোকদের তেমন অধীনতা। সত্য যে বটে এক পরিবারে থাকিতে হইলে সকলকেই সকলের অধীন হইয়া থাকিতে হয়, কারণ এক পরিবারে যদি প্রত্যেকে স্বাধীন হইতে যায় তাহা হইলে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা হইয়া পড়ে, এজন্য এস্থলে অধীনতা স্বীকার না করা অন্যায়। কিন্তু তাহা বলিয়া সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে গিয়া অধীনতার বিঘ্ন সহ্য করা কঠিন, বড় কষ্টকর। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের কি ভাল কি মন্দ কোন বিষয়েই স্বাধীনতা নাই, স্বাধীনতা কাহাকে বলে, স্বাধীনতার কি সুখ ইহা একেবারেই তাহারা অজ্ঞাত, নাই বিদ্যার বল, নাই ধর্মবল, কেবল অন্ধের ন্যায় এই সংসারে ভ্রমণ করিয়া আপনাদের জীবন কাটাইতেছে।"[১২৭] প্রসন্নতারার লেখা থেকে এই মর্মার্থ প্রকাশিত হয় যে "অধীনতা" বলতে তিনি স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার বোঝাতে চেয়েছেন, যা শৃঙ্খলাপরায়ণতার নামান্তর, শৃঙ্খলানিষ্ঠতা কিয়ৎপরিমাণ অধীনতা দাবী করে, একথা অনস্বীকার্য, কিন্তু তা অর্থবহ, তা হৃদয়ের সংযমের পরিচায়ক, যে সংযম একমাত্র শিক্ষার দ্বারা পাওয়া যেতে পারে। তাই কুমারী লাহিড়ী লিখলেন : "স্ত্রীলোক যে পরিমাণে বিদ্যা প্রভৃতি উপার্জ্জন করুন না কেন, গৃহকার্য্যে সুনিপুণা না হইলে প্রকৃত নারী হওয়া যায় না। নারীজাতি নারীজাতের কার্য্য করিবেন অর্থাৎ সন্তান পালন, পরোপকার, ধর্ম্মদান প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন ইহাই তাহাদের শিক্ষণীয় ও

১২৭ বামাবোধিনী পত্রিকা, শ্রাবণ ১২৭৯।

ইহাই তাহাদের প্রকৃত সৌন্দর্য্য।..... পরোপকার নারীর ভূষণ এবং ধর্মই নারীর জীবন। এই দুই বাক্যকে হৃদয়ে নিহিত করিয়া নারী শিক্ষিত হউন, কখনই সুফল ভিন্ন মন্দ ফল উৎপন্ন হইবে না।"[১২৮] কিন্তু তার জন্য নারী আর কোন বিষয় শিক্ষা করবে না তা নয়, বরঞ্চ সে শিক্ষা তার অন্তরস্থিত গুণাবলীকে আরো বিকশিত করবে। কুমারী লাহিড়ী এই বিশ্বাসে লিখলেন : "নারীজাতি গৃহকার্য্যে সুনিপুণ হইবেন বলাতে ইহা বলা হইতেছে না যে তাহারা আর কোন বিষয়ে শিক্ষা করিবেন না। বিদ্যাশিক্ষা পুরুষের ন্যায় নারীরও অতীব প্রয়োজনীয়। নারী জাতি সম্পূর্ণ শিক্ষিত হইয়া আপনার কোমল ভাবকে আরও বর্ধিত করিয়া সমাজের মঙ্গলসাধন করেন ইহাই অভিপ্রেত। সুশিক্ষিতমাতা সংসারের যত উপকার করিতে পারেন এমন আর কাহারও সাধ্য নাই। পুণ্যবতী সুশিক্ষিতা নারী অপেক্ষা জগতে আর সুন্দর পদার্থ কি আছে?"[১২৯] তাই বরিশাল থেকে শ্রীকামিনীকুমারী গুপ্ত তাঁর প্রবন্ধে এই আশা ব্যক্ত করলেন : "সেইদিন কি আর হইবে যেদিন স্ত্রী-পুরুষ উভয় সুশিক্ষিত হইয়া কুসংস্কারের দাসত্ব পরিত্যাগ করিবে। যেদিন স্ত্রী-পুরুষ উভয় নির্ম্মল ভালবাসায় জড়িত হইয়া গৃহকার্য্যের সুশৃঙ্খলতা বৃদ্ধি করিবে।"[১৩০] লক্ষ্যণীয় এই যে যখন পুরুষরা মেয়েদের শিক্ষা দিলে অভ্যস্ত জীবনে নানাভাবে ছন্দপতন ঘটবে এই আশঙ্কায় অধীর তখন মেয়েরা এমন এক সুখী সংসারের ছবি তাদের মানসপটে রচনা করেছে যেখানে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই সমান, উভয়েই সমান শিক্ষিত, সমান অধিকার প্রাপ্ত। তাই, অনামী এক লেখিকা এই আশ্বাস দিলেন : "যথার্থ জ্ঞান লাভে স্ত্রীভাব বিলুপ্ত বা তাঁহাদের অবশ্য প্রতিপাল্য পরম পবিত্র গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালনে অনাস্থা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।"[১৩১] কিভাবে শিক্ষিতা নারীর মধ্যে পুরুষের আকাঙ্ক্ষিত নারীসুলভ গুণাবলী বজায় রাখা যায় সে সম্বন্ধেও মহিলারা যে ভাবনাচিন্তা করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। শিক্ষা যদি সঠিকপথে চালিত না হয় তা বিপরীত ফল দর্শাবে একথা উপলব্ধি করে কানপুর থেকে শ্রী নিস্তারিণী দেবী লিখলেন : "অধুনা পুনরায় দেশহিতৈষী মহোদয়গণ স্ত্রীশিক্ষার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের যত্ন ও পরিশ্রম সমুচিত ফল প্রদান করে নাই। এখনকার শিক্ষার ফল কেবল নানাবিধ উপন্যাস পাঠ মাত্র। বিদ্যা শিক্ষা করিলে যে সকল সদ্‌গুণ লাভ করা যাইতে পারে, তাহার সম্পূর্ণ অভাব রহিয়াছে। প্রাচীনগণের ন্যায় মানসিক উন্নতি, চিন্তাশীলতা, আয় ব্যয়, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম যথোচিতরূপে পালন করিতে নিপুণা কয়জন? কিম্বা সীতা সাবিত্রীর মত স্নেহবৃত্তি, ধর্ম্মবৃত্তি, কার্য্যক্ষমতা অস্মাদাদির মধ্যে কয়জনের আছে? মিথিলাধিপতি তনয়া জানকী বিজন বনে রাক্ষসীগণের তাড়নায় ও লঙ্কাপতি রাবণের অতুল ঐশ্বর্য্যে প্রলোভিত হয়েন নাই, তাঁহার ধর্ম্মবৃত্তির প্রবলতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। দময়ন্তীকে নলরাজা একাকী ভয়াবহ অরণ্যমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া যান, পরে তিনি স্বামীকে না দেখিয়া নিজ অবস্থার প্রতি চিন্তা না করিয়া স্বামীর জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন, ইহা পতিপরায়ণতার স্পষ্ট

১২৮ বামাবোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১২৮২।

১২৯ তদেব।

১৩০ বামাবোধিনী পত্রিকা, পৌষ ১২৮৯।

১৩১ বামাবোধিনী পত্রিকা, মাঘ ১২৯১।

নিদর্শনস্বরূপ। এবংবিধ উৎকট পরীক্ষাতে তাঁহারা উত্তীর্ণ হইয়াছেন কেবল বুদ্ধিমত্তার গুণে। এরূপ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও সদসৎ জ্ঞান তাঁহাদের শিক্ষার ফল। অধুনা প্রায় অধিকাংশেরই শিক্ষা অল্পশিক্ষা অর্থাৎ অক্ষর পরিচয় হইয়া কোনমতে পত্র লিখিতে পারিলে অথবা ইংরাজী প্রথমভাগ পর্য্যন্ত পড়িতে পারিলেই যথেষ্ট শিক্ষা হইল মনে করা হয়। যদিও কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী বঙ্গরমণীর শীর্ষ স্থানীয়া হইয়াছেন, তথাপি তাঁহারা প্রাচীন আর্যনারীগণের সমকক্ষ নহেন। আমাদিগের শিক্ষার সহিত পুরাকালীন স্ত্রীগণের শিক্ষার প্রভেদ এই যে আমরা তাঁহাদের ন্যায় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ, সদসৎ জ্ঞান, নানাপ্রকার নিগূঢ় তত্ত্ব নিরূপণ, কার্য্যক্ষমতা, গৃহধর্ম্ম পরিপালনে পটুতা প্রভৃতি বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ।"[১৩২] তাই বিদ্যাশিক্ষা যাতে এই সমস্ত গুণ সৃষ্টি করে এবং তা বজায় রেখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে সাহায্য করে সেজন্য বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মশিক্ষাও আবশ্যক বললেন শ্রীমতী অনুজানন্দিনী রায় : "কিন্তু বিদ্যা শিক্ষা করিলেই যে প্রকৃত জ্ঞান ও সকল প্রকার উন্নতি করিতে পারা যায় এমন নহে। বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের আলোক নিপতিত না হইলে, দিব্যজ্ঞানের আবির্ভাব দৃষ্টিগোচর হয় না বরং তাহাতে কখনও কখনও বিষময়ফলও উৎপাদন করে। তাহা বড় ভয়ানক। বিদ্যার্চ্চার সহিত ধর্ম্মের অঙ্কুর রোপিত হইলে তাহাতে বিবিধ সুফল প্রদান করে। বিদ্যাদ্বারা হিতাহিত জ্ঞান আবির্ভূত হয়, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অনুভব করিতে পারা যায় এবং তাহার সহিত ধর্ম্মের যোগ হইলে, প্রত্যেক মনোবৃত্তি নিজের কর্ত্তব্যকার্য্য সুনিয়মে ও সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন করিয়া সৎ ইচ্ছায় পরিণত হয় এবং তদ্দ্বারা দয়া, প্রেম, সৌজন্য, উদারতা, নম্রতা, বিনয়, পরোপকার পবিত্রতা ইত্যাদি সকল সদ্ভাব উৎপন্ন হয়।[১৩৩]

স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের সূচনায় যে আশঙ্কা সমাজের একটি বড়ো অংশে বিদ্যমান ছিল, এই সমস্ত লেখায় দেখা যাচ্ছে যে মেয়েরা নিজেরাও সেই আশঙ্কার অংশীদার। শিক্ষা মেয়েদের গৃহবিমুখ যেন না করে এটা যে তাদেরও কাম্য এটা বুঝিয়ে দিতে তারা পুরুষদের নিশ্চিন্ত করতে চেয়েছিল যে শিক্ষা লাভ করেও তারা তাদের সংসার পালয়িত্রীর ভূমিকা পরিত্যাগ করবে না। বরঞ্চ শিক্ষা তাদের এই ভূমিকাকে আরো উজ্জ্বল ও সার্থক করে তুলবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, মেয়েদের শিক্ষণীয় বিষয় নিয়ে যে মতভেদের সূচনা হয়েছিল মেয়েদের লেখায় তার প্রতিফলনও যথেষ্ট নজরে পড়ে। ১৮৪৯ সালে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় থেকে মেয়েদের এই গৃহোপযোগী ভূমিকার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছিল। স্কুল প্রতিষ্ঠার সময়ে তার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বেথুন বলেছিলেন যে পড়াশোনার সাথে সাথে মেয়েদের সূচীশিল্প, শৌখিন কাজ, অঙ্কন ইত্যাদি শেখানো হবে যাতে তারা গৃহসজ্জার উপকরণ নিজেরাই প্রস্তুত করতে পারে আবার প্রয়োজন হলে নির্দোষ ও সম্মানজনক পেশাও অর্জন করতে পারে। ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হল রামতনু গুপ্ত রচিত স্ত্রীশিক্ষা প্রথম ভাগ। এই বইয়ে সহজ ভাষায় গল্পচ্ছলে নারীসুলভ নীতিকথা শেখানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। ১৮৬৬ সালে মেরী কার্পেন্টার ভারতভ্রমণে

১৩২ বামাবোধিনী পত্রিকা, শ্রাবণ ১২৯১।

১৩৩ বামাবোধিনী পত্রিকা, কার্তিক ১২৯০।

এসে এই মত প্রকাশ করলেন যে মেয়েদের শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত তাদের উপযুক্ত সহায়িকা হিসাবে গড়ে তোলা। এভাবে ১৮৭০-এর দশক থেকে সৃষ্টি হল স্ত্রীজনোচিত শিক্ষার ধারণা। ১৮৭১ সালে বিলাত থেকে ফিরে এসে কেশবচন্দ্র স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। এই সময় বামাবোধনী সভায় বক্তৃতাদান কালে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন যে মেয়েদের শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে ভাল স্ত্রী, মা, কন্যা এবং ভগ্নী হওয়া। এর জন্য তাদের বিদুষী হবার দরকার নেই। এভাবে তাদের ভূমিকা হবে গৃহলক্ষ্মীর ভূমিকা, যিনি ভারতীয় ঐতিহ্য ও পরিবার প্রথাকে বিদেশী সংস্কৃতির আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাবেন। এই কর্তব্য নির্ধারণের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীজাতির সামাজিক উন্নতির সীমাও অলক্ষ্যে নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক পুরুষেরাই "লক্ষ্মণের মতো গণ্ডি দিয়ে এঁকে দিয়েছিলেন মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিচরণের সীমা।"[১৩৪]

১৮৭০-এর দশক থেকে শিক্ষার সীমা ও পাঠ্যবিষয় নিয়ে যে বিতর্ক শুরু হয়েছিল মেয়েরা প্রত্যক্ষভাবে তার সামিল হয়েছিল। ১৮৭৬ সালে দেশীয় খ্রীষ্টান ভুবনমোহন বসুর কন্যা চন্দ্রমুখী বসু এনট্রান্স পরীক্ষা দেবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কিছুটা দ্বিধাগ্রস্তভাবে হলেও তাঁকে অনুমতি দিল তবে আগে পরীক্ষা করে দেখা হল যে চন্দ্রমুখী ছেলেদের জন্য তৈরী প্রশ্নপত্রের উত্তর দিতে পারেন কিনা। চন্দ্রমুখী কৃতকার্য হলেন কিন্তু অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হওয়ায় তাঁর নাম উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের তালিকায় যোগ হল না। ১৮৭৮ সালে কাদম্বিনী বসু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির তত্ত্বাবধানে এন্ট্রান্স পরীক্ষাদানের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকলেন। পূর্বে একটি প্রারম্ভিক যোগ্যতানির্ণায়ক পরীক্ষা দিয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিশেষ কয়েকটি নিয়ম সাপেক্ষে পরীক্ষাদানের অনুমতি পেলেন। ১৮৭৮ সালে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পাশ করলেন। ১৮৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কাদম্বিনীর জন্যই বেথুন স্কুলে কলেজ ক্লাসের সূচনা হল। ১৮৮০ সালে এখান থেকেই কাদম্বিনী ও চন্দ্রমুখী এফ্.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হলেন। ১৮৮২ সালে এই দুজনেই বি.এ. পরীক্ষায় সফল হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রথম মহিলা স্নাতক হবার গৌরব অর্জন করলেন। ১৮৮৪ সালে চন্দ্রমুখী বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। কাদম্বিনী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলেন। যদিও তিনি ডিগ্রিলাভ করতে পারলেন না কারণ জনৈক নারীশিক্ষাবিরোধী অধ্যাপক তাঁকে প্র্যাকটিক্যাল বিষয়ে প্রয়োজনীয় নম্বর দেননি। যাহোক, অধ্যক্ষ তাঁকে চিকিৎসা করার লাইসেন্স দিয়ে ইডেন হাসপাতালে চিকিৎসক নিযুক্ত করেছিলেন। ইতিমধ্যে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় এবং দ্বারকানাথ তাঁকে বিলাত পাঠান। এডিনবরা ও গ্লাসগো থেকে তিনি কয়েকটি ডিপ্লোমা লাভ করে কৃতবিদ্য হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন।[১৩৫]

এইভাবে মহিলাদের উচ্চশিক্ষার সূচনা হল বাংলাদেশে। যেখানে স্ত্রীশিক্ষার সূচনাই সৃষ্টি করেছিল প্রবল আলোড়ন সেখানে তাদের উচ্চশিক্ষা যে বিতর্ক সৃষ্টি করবে তা বলা বাহুল্য।

---

১৩৪ *অন্দরে অন্তরে*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৭৩।

১৩৫ সংকোচের বিহ্বলতা, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৯।

মহিলাদের উচ্চশিক্ষা লাভের ঘটনা ভয় পাইয়ে দিয়েছিল উচ্চশিক্ষার সঙ্গে জড়িত উচ্চপদস্থ ভদ্রলোকদেরও। ১৮৮৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দিতে গিয়ে স্বয়ং চ্যান্সেলার বললেন যে উচ্চশিক্ষালাভ করতে গিয়ে ভারতীয় মহিলারা তাঁদের দেশাচার লঙ্ঘন করবেন বা চারিত্র বৈশিষ্ট্য হারাবেন তা অভিপ্রেত নয়। মহিলাদের উচ্চশিক্ষার প্রশ্ন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বিভেদ তীব্রতর করল। ১৮৮৩ সালে কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত *Native Ladies Institution* এবং *Metropolitan Female School* একত্রিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হল ভিক্টোরিয়া কলেজ, যার ঘোষিত উদ্দেশ্য হল মহিলাদের কোমলতর গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো। এই কলেজের পুরস্কার বিতরণী সভায় কলিকাতার বিশপ বললেন যে একজন দুজন মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বসতে পারেন কিন্তু বেশির ভাগ মেয়ের উচিত এই প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত নারীসুলভ প্রশিক্ষণে সন্তুষ্ট থাকা।[১৩৬] অপরপক্ষে শিবনাথ শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অন্নদাচরণ খাস্তগীর, শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশ্বাস করতেন যে মহিলাদের সকল বিষয় পড়ার ও সর্বোচ্চ বিষয় জ্ঞানলাভ করার অধিকার আছে। দেশের প্রগতিশীল অংশ যেখানে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার প্রশ্ন নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত সেখানে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ যে এর বিরোধী হবে তা বলা বাহুল্য। এই সময় শিক্ষিতা মহিলাদের ব্যঙ্গ করে অসংখ্য প্রহসন লেখা হল। ১৮৮৬ সালে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত যোগেন্দ্র চন্দ্র বসুর "মডেল ভগিনী", ১৮৯৮ সালে বরিশাল থেকে প্রকাশিত দুর্গাদাস দে-র "মিস্‌বিনো বিবি বি.এ.", ১৮৮৮ সালে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত রাধাগোবিন্দ হালদারের "পাশকরা মাগ", ১৮৮৯ সালে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত সিদ্ধেশ্বর রায়ের "বৌবাবু" এরকম কয়েকটি প্রহসনের উদাহরণ।

মহিলাদের উচ্চশিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশের সমাজ যখন এইরকম উত্তাল, তখন মহিলারাও এর বাইরে থাকতে পারেননি। বিভিন্ন রচনায় তাঁদের যে প্রতিক্রিয়া ধরা পড়েছে তা-ও পুরুষদের মনোভাবের মতোই বিচিত্র। "বঙ্গমহিলা" পত্রিকা লিখল :. . . "সম্প্রতি স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে গবর্ণমেন্টের শুভদৃষ্টি হইয়াছে দেখিয়া আমরা যারপরনাই আহ্লাদিত হইয়াছি। বালকদিগের ন্যায় বালিকাগণের পরীক্ষাগ্রহণ এহং তাহাদিগকে উপযুক্ত পারিতোষিক ও ছাত্রীবৃত্তি প্রদান কহিয়া স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধন ও উৎসাহবর্দ্ধন করিতে গবর্ণমেণ্ট কৃতসংকল্প হইয়াছেন। বালকদিগের নিমিত্ত যেরূপ নিম্নশ্রেণী, মধ্যশ্রেণী ও উচ্চশ্রেণীর তিন প্রকার পরীক্ষা ও বৃত্তির নিয়ম আছে বালিকাদিগের পরীক্ষা ও বৃত্তিতেও সেইরূপ তিনটিবিভাগ থাকিবে প্রস্তাব হইয়াছে। পরীক্ষার অন্যান্য বিষয় সকল বালকদিগের সহিত সমান থাকিবে। কেবল বালকদিগের জন্য উচ্চগণিত ও বিজ্ঞান স্থানে বালিকাদিগের সূচীকার্য্য পরীক্ষা হইবে। কিন্তু ইহার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট স্বতন্ত্র সাহায্য দান না করিয়া ছাত্রবৃত্তির হিসাবে যে টাকা প্রতি বৎসর ব্যয়িত হয়, তাহার অনধিক চতুর্থাংশ ছাত্রীদিগের জন্য ব্যয় করিবেন স্থির করিয়াছেন।"[১৩৭] উচ্চশ্রেণীর পরীক্ষা

---

১৩৬ *The Changing Role of Women in Bengal,* পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ৯৮-৯৯।

১৩৭ বঙ্গমহিলা, "স্ত্রীশিক্ষা ও ছাত্রবৃত্তি", জ্যৈষ্ঠ ১২৮৩ বঙ্গাব্দ।

দেবার ব্যবস্থা করাতেই তা আনন্দ সঞ্চার করেছিল মহিলাদের সমাজে। কিন্তু তখন সাধারণভাবে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে মেয়েরা বিজ্ঞান ও অঙ্ক শিক্ষা করার মতো যথেষ্ট যোগ্য নয়, তারা প্রাথমিক অঙ্ক শেখার পর গৃহকর্মমূলক কোন কিছু শিখলেই ভাল। কিন্তু এ বৈষম্য তখনকার মতো অগ্রাহ্য করে ছাত্রীবৃত্তি দেওয়ার পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়ে "বঙ্গমহিলা" লিখল : "বালিকাদিগের জন্য ছাত্রীবৃত্তি ব্যবস্থা করিলে যে তাহাদের বিদ্যাভ্যাসে অধিক প্রবৃত্তি জন্মিবে তাহতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।" কিন্তু তখনও বাল্যবিবাহের অভিশাপ দূরীভূত হয়নি, তাই বালিকারা মধ্যবিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করেই বিবাহিতা হয়ে "অন্তঃপুরে নিবদ্ধা" হয়। তাই "বঙ্গমহিলা" প্রস্তাব করল যে গভর্নমেন্ট যদি অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার পরীক্ষা করেন এবং "উপযুক্ত পারিতোষিক দিয়া মহিলাগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন, তাহা হইলে স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইতে পারে।"[১৩৮] তখনও পর্যন্ত স্ত্রীশিক্ষার পথে যে সমস্ত প্রতিবন্ধক ছিল তার সমস্তই বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু তবুও স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতিতে আনন্দ প্রকাশ করা হয়েছে। ১৮৭৬ সালে মহিলাদের এনট্রান্স পরীক্ষায় বসার অনুমতি পাওয়া গেল। "বঙ্গমহিলা" সানন্দে লিখল : "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যগণ তাঁহাদিগের গত অধিবেশনে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞানোন্নতি সম্বন্ধে একটি উপায় বিধান করিয়াছেন। তাঁহারা নিয়ম করিয়াছেন যে এদেশীয় স্ত্রীলোকগণ পুরুষদিগের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স ও ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষা দিতে পারিবে। ইহা সামান্য আহ্লাদের বিষয় নহে যে শিক্ষা বিষয়ে পুরুষদিগের সহিত স্ত্রীলোকদিগের যে সমান অধিকার তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যগণ স্বীকার করিয়াছেন এবং যাহাতে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়মের ফল যুবকদিগের সহিত সমানভাবে ভোগ করিতে পারে, তাহার উপায় করিয়াছেন। ... এই পরীক্ষা প্রণালী স্ত্রীগণের প্রতি বিস্তার করিয়া সভ্যগণ যে কেবল মহিলাগণের মান ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন এমত নহে। ইহা দ্বারা তাঁহারা আমাদের সমাজের ভাবী কল্যাণের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। এক্ষণে যাহাতে এই বিধানটি কার্য্যকর হয়, মহিলাগণ উৎসাহপূর্ণ মনে এবং একাগ্রচিত্তে তাহাতে সচেষ্ট হউন, এই আমাদিগের প্রার্থনা।"[১৩৯] বাঙালী মহিলাদের তরফে "বঙ্গমহিলা" এই বিশ্বাস অকুণ্ঠভাবে জ্ঞাপন করেছিল যে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা প্রাপ্তির মধ্যে সমাজের কল্যাণ নিহিত আছে। মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দেওয়া উচিত কিনা এ নিয়ে যখন সমাজ উত্তাল, তখন কিন্তু মহিলারা স্থির বিশ্বাসে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য স্থির হলেও সেখানে পৌঁছবার উপযুক্ত পথ ছিল না। এ সম্পর্কে মহিলারা সচেতন ছিলেন। কারণ, সে সময় মহিলাদের উচ্চশিক্ষা বলতে বোঝাত বাংলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা, সেখানে যে যৎসামান্য ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া হত তা প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার উপযুক্ত নয়। তাছাড়া, বয়ঃস্থা মহিলাদের জন্য যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাতে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে, আর খ্রীষ্টান মিশনারীরা যে বিদ্যালয় তৈরী করেছে সেখানকার ছাত্রীরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বসার মতো ইংরাজী শিক্ষা লাভ করে থাকে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই ছাত্রীসংখ্যা খুবই অল্প। তাই "বঙ্গমহিলা"র অনুরোধ : "এক্ষণে হিন্দু মহিলাগণ যাহাতে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া

১৩৮ তদেব।

১৩৯ বঙ্গমহিলা, "বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকদিগের পরীক্ষা", চৈত্র ১২৮৩ বঙ্গাব্দ।

প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার উপযুক্ত হইতে পারে সে বিষয়ে দেশ-হিতৈষী কৃতবিদ্যগণের বিশেষ মনোযোগী ও উৎসাহের সহিত যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।"[১৪০] মহিলাদের পাঠ্যবিষয় পুরুষদের মতো হবে কিনা এ নিয়ে সে সময় মতভেদের অন্ত ছিল না। এই বিতর্কে "বঙ্গ মহিলা" তার নিজস্ব মতামত জানাল এইভাবে : "স্ত্রীলোকের শিক্ষাপ্রণালী ও পরীক্ষার নিয়ম পুরুষগণের সহিত সমান হওয়া উচিত কিনা, সে বিষয়ে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। মানসিক বৃত্তি ও হৃদয়ের ভাবনিচয়ের প্রকার ও পরিমাণ সম্বন্ধে নরনারীর প্রকৃতিতে যে বিশেষ তারতম্য আছে, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই ভিন্নতা থাকাতেই অনেকে বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার নিমিত্ত নর ও নারীর পাঠ্য ভিন্ন প্রকার হওয়া আবশ্যক। তাহাদের মতে গণিত, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি কঠোর চর্চ্চাতে মহিলাগণের কোমলভাব লুপ্ত হইয়া হৃদয়কে প্রস্তরবৎ কঠিন করিয়া ফেলিবে। যাহাতে নারী হৃদয়ে প্রকৃতিগত সৌন্দর্য ও কোমল স্বভাব সুন্দররূপে বিকশিত হয়, তাহারা সেইরূপ শিক্ষাই নারীজাতির উপযোগী বলিয়া বোধ করেন। কিন্তু বিজ্ঞান যে কঠোর এবং উহার আলোচনা করিলে কবিতা পাঠের ন্যায় মনে যে সুখের উদয় হয় না, তাহা আমরা বিশ্বাস করিনা এবং তাহা যে স্ত্রীজাতির পাঠের অনুপযুক্ত তাহা বলিতে পারি না। তবে আপাততঃ সাধারণ বালিকাগণের উৎসাহের নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ সহজ পাঠ্য নির্দ্ধারিত করিয়া পরীক্ষার প্রণালী কিছু স্বতন্ত্র প্রকার করিলে মন্দ হয় না। তবে যে সকল বালিকা প্রতিযোগিতায় পুরুষদিগের সহিত সমকক্ষতা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করিবে, তাহারা করিতে পারিবে।[১৪১] উচ্চশিক্ষার উষালগ্নেও মহিলাদের আত্মবিশ্বাস ছিল যে তাঁরা পুরুষদের মতো সকল বিষয় আয়ত্ত করতে আগ্রহী এবং সক্ষম। উন্নত জ্ঞান সুখের মূল, আর এই উন্নত জ্ঞান অর্জন করার জন্য পুরুষরা কঠোর সাধনায় নিরত। কেউ পৃথিবী পর্যটন করছেন, কেউ অসভ্য জাতিদের সম্বন্ধে জানার জন্য তাদের মধ্যে প্রাণ হাতে করে থাকছেন, কেউবা মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করছেন, আবার কেউ বা উদ্ভিদতত্ত্ব বা জীবতত্ত্ব জানার জন্য ব্যস্ত। "বামাবোধিনী" পত্রিকা প্রশ্ন তুলল : "অবশ্য এ সকল বিষয়ে পুরুষজাতির ঐ অধিকার সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া কি স্ত্রীজাতি একেবারে চিরদিনের জন্য এ অধিকারের বাইরে থাকিবে? তাই বলিয়া কি স্ত্রীজাতির উচ্চ জ্ঞানবিজ্ঞানপূর্ণ পুস্তক পাঠেরও বিরোধী হওয়া ন্যায্য?.... কেবলমাত্র সন্তান পালন, সংসারের সুশৃঙ্খলা সাধন, মনোহর শিল্পাদিতে নিপুণতা লাভ করিতে পারিলেই (যদিও এ সকলে হৃদয় নীচ হয় না বরং উন্নতই হইয়া থাকে) জীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। ... অধিকাংশ বঙ্গনারীর এখনও এমন অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে, সেখানে এখনও তাঁহারা উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এখনও তাঁহাদের শিক্ষোপযোগী অসংখ্য বিষয় সম্মুখে বিস্তারিত রহিয়াছে। প্রকৃতির জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার অনন্ত বিদ্যালয়ের যে শ্রেণীতে ভারতবাসীগণ অধ্যয়ন করিতেছেন, ভারতবাসিনীগণ তদপেক্ষা অধিকতর নিম্ন শ্রেণীতে পাঠ্যাভাস করিতেছেন, এখনি তাঁহাদের

১৪০ তদেব।
১৪১ তদেব।

শিক্ষার সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দিবার সময় উপস্থিত হয় নাই বোধ হয়। যথার্থ জ্ঞান শিক্ষায় কখনও স্ত্রীভাব বিলুপ্ত বা বিকৃত হইবার সম্ভাবনা নাই। যে জ্ঞান প্রকৃতির বিকৃতি ঘটায়, তাহা 'জ্ঞান' শব্দের বাচ্য নহে। বর্ত্তমানকালের উন্নত শিক্ষা যদি ধর্ম্মভাববিরহিত হয়, যদি অপরাবিদ্যার সহিত পরাবিদ্যার সুখময় সম্মিলন না হইয়া থাকে, তাহা কখনও জ্ঞানের অপরাধ নহে।"[১৪২] নামবিহীন এই বামারচনা প্রমাণ করে যে মহিলারা শিক্ষা এবং জ্ঞানের পথে বহুদূর অগ্রসর হতে প্রস্তুত ছিলেন। আরো লক্ষ্যণীয় এই যে যেসময়ে নারীর গার্হস্থ্য ভূমিকাকে বারংবার গুরুত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হচ্ছে সে সময় খিদিরপুরের এই লেখিকা সাহসভরে বলতে দ্বিধা করেননি যে সংসার পালন করেও উন্নত জ্ঞানের পথ অনুসরণে বাধা থাকে না। ষাটের এবং সত্তরের দশকে ধারণা ছিল যে ধর্মবিরহিত শিক্ষা প্রকৃত উপকার সাধন করবে না। আশির দশকে এসে আমরা সে ধারণার বদলে এই যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত লাভ করি যে জ্ঞান স্বয়ংক্রিয়ভাবে কখনো বিকৃত হয় না। তাই জ্ঞান বিকৃতি দান করতে পারে না, জ্ঞানব্যবহারকারীই তাকে বিকৃত করে স্বার্থসিদ্ধি করতে পারে তার বিকৃত প্রয়োগ ঘটিয়ে।

তবে সর্বদাই যে মহিলারা এরকম সাহসী হতে পারতেন তা নয়। অনেক মহিলাই উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন বুঝতেন। বুঝতেন উচ্চশিক্ষার প্রসারে বাধা কোথায় কিন্তু তা-ও হিন্দুয়ানী বজায় রেখে উচ্চশিক্ষা মেয়েদের মধ্যে প্রসারিত হোক তা-ও ইচ্ছা করতেন। এ ইচ্ছা পুরুষের অনুসারী। ঠনঠনিয়া থেকে শ্রীমতী নলিনী সুন্দরী মিত্র লিখলেন : "উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন সম্পূর্ণ আছে সন্দেহ নাই। বিদ্যানুশীলনে অসীম আনন্দ লাভ করা যায় এবং শরীর সেইরূপ স্ফূর্ত্তিমান এবং মন ও আত্মা উৎসাহিত হয়। বলা বাহুল্য যে এতদ্বারা বল ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে বা অর্থ উপার্জ্জন করিতে না পারিলে কি স্ত্রী-জীবন সার্থক হয় না? যাহাতে হিন্দুমহিলা হিন্দু থাকিয়া উচ্চশিক্ষা করিতে পারেন এবং তৎসঙ্গে সামান্য সামান্য মত প্রকাশ করিয়া পৃথিবীর অবস্থা বুঝিতে পারেন, সেই চেষ্টা করা হিন্দুর কর্তব্য।[১৪৩] পুরুষের অনুসারী বক্তব্যের আরো উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে, যা স্বীকার করে নিয়েছিলো যে মেয়েদের জন্য এমন শিক্ষা দরকার যা সংসারযাত্রা আরো উন্নত করবে। বলা বাহুল্য এই সংসার যাত্রায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলেন স্বামী, মেয়েদের শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যা বিপথগামী স্বামীকে সুপথে ফিরিয়ে আনবে। নগেন্দ্রবালা মুস্তোফীর সুপারিশ ছিল যে মেয়েদের সংগীতশিক্ষাদান আবশ্যক। কারণ, "আমাদের দেশে অধিকাংশ ব্যক্তি কুলরমণীগণের সংগীতবাদ্য শিক্ষায় বিদ্বেষী। তাঁহারা জানেন না যে এই দুটি রমণীকুলের কত উপকারক। ... স্বামী বিষম বিষাদে মগ্ন হইলেও গীতবাদ্য দ্বারা স্ত্রী স্বামীকে সদানন্দে রাখিতে পারেন। আমাদের কুল মহিলাদিগের জন্য যদি সংগীতবাদ্য প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে প্রতিদিন এত পুরুষ কুপথগামী হইয়া সর্বস্বান্ত হইত না ও স্ত্রীহৃদয়ে দুর্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেন না। ... সংগীতবাদ্য পিতা, মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, ভাশুর ইত্যাদি সকলের কাছে

১৪২ বামাবোধিনী পত্রিকা, 'নারীগণের অল্পশিক্ষা", ফাল্গুন ১২৭১।
১৪৩ শ্রীমতী নলিনীসুন্দরী মিত্র, বামাবোধিনী পত্রিকা, "স্ত্রীশিক্ষা ", কার্তিক ১২৯৫।

করা যাইতে পারে। তবে কতগুলো অশ্লীল গান কণ্ঠস্থ করিয়া সেইগুলা গাওয়া অন্যায় ও ঘৃণাকর। ভগিনীগণ তোমরা গুরুজনের সম্মুখে বীণা বাজাইয়া ঈশ্বরের গুণগান কর, তাহাতে কেহ নিন্দা করিবে না এবং সংসার সুখের হইবে।"[১৪৪] ১৮৮২ সালে বিলাতে গিয়াছিলেন শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাসী।[১৪৫] দীর্ঘ আট বছর বিলাতে থেকে তিনি সেখানকার জীবনযাত্রা সম্পর্কে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। স্বভাবতঃই সেখানকার মহিলাদের জীবনযাত্রা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন : "স্ত্রীলোকেরা সংসারের ভিত্তিস্বরূপ, অতএব সর্ব্বসাধারণ ইংরাজ মহিলারা অলস হইলে ইংরাজসংসার কখন চলিত না বা ইংলন্ডের এত উন্নতি হইত না। আমার মতে ইহারা বরং পুরুষদের যথার্থ অর্দ্ধাঙ্গ। এখানে স্ত্রীলোকে সচরাচর যেরূপ পুরুষের সহায়তা করে ও অনেক সময়ে পুরুষের কাজ করিয়া থাকে, এরূপ আমাদের দেশে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। ... নারীর উচিত কাজ ব্যতীত ইংরাজ স্ত্রীলোকেরা দোকান চালায়, কেরানীগিরি করে, স্কুলে শিক্ষা দেয়, পুস্তক ও সংবাদপত্র লেখে, সভা করিয়া বক্তৃতা দেয় ইত্যাদি অনেক পুরুষের কর্ম অতি সুন্দররূপে নির্বাহ করে। ... ইংরাজ স্ত্রীলোকেরা কেবল সংসারকর্ম্মে ব্যাপৃত না থাকিয়া অনেক বিষয়ে পুরুষের সহযোগী হওয়াতে কত বড় বড় কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে এবং দেশের কত শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।"[১৪৬] ইংরাজ মেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থা তিনি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তাঁর এই ধারণা হয়েছিল যে স্ত্রীলোকেরা সব দিক দিয়েই পুরুষের সমকক্ষ হবার দাবী রাখে। "ইংলন্ডে স্ত্রীলোকদের শিক্ষার জন্য বিলক্ষণ সুবিধা আছে। কোন নগরে বালিকাদের ভাল ভাল স্কুল ও কলেজের অভাব নাই, লন্ডনে প্রায় প্রতি পাড়াতেই দুই তিনটা করিয়া ছোট ছোট বালিকা বিদ্যালয় দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল লন্ডন, অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সমান শিক্ষা পাইয়া থাকে। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সহিত সমানে এক কলেজে এক অধ্যাপকের নিকট পাঠ করিয়া এক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং সমান উপাধি লাভ করে। এখানকার পরীক্ষা সকল আমাদের দেশের বি.এ., এম্.এ. ইত্যাদি পরীক্ষা হইতে অনেক কঠিন হইলেও বহুসংখ্যক ইংরাজ স্ত্রীলোক পুরুষদের সহিত সমানে আড়াআড়ি করিয়া ঐ সকল কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, এবং কখন কখন পুরুষদের উপরে উঠে। লন্ডনে উপাধিধারী পুরুষের ন্যায় উপাধিধারী স্ত্রীলোকেরও অপ্রতুল নাই, কুমারী স্মিথ বি.এ., শ্রীমতী জোন্স এম্.এ., এরূপ নাম প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। আজকাল যে সকল সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা অতি অল্প পুরুষই দিয়া থাকে, সেগুলিতে পর্য্যন্তও স্ত্রীলোকেরা অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত হয় না এবং তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। ইহাতেই বুঝা যায় যে, স্ত্রীলোকদের বুদ্ধির প্রখরতায় পুরুষদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে, বরং অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও জ্ঞান ও বিদ্যায় পুরুষদের সহিত সমকক্ষতা করা স্ত্রীলোকদের

---

১৪৪ নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী, *বামাবোধিনী পত্রিকা*, "সংগীতবাদ্য স্ত্রীলোকের পক্ষে আবশ্যক", ভাদ্র ১৩০১।

১৪৫ কলিকাতার প্রখ্যাত ধনী শ্রীনাথ দাসের পুত্র দেবেন্দ্র নাথ দাসের সহধর্মিণী, তাঁর বিলাতবাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি "*ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা*" নামক পুস্তক রচনা করেন।

১৪৬ কৃষ্ণভাবিনী দাস, "*ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা*" সম্পাদনা, সীমন্তী সেন, স্ত্রী, কলিকাতা ৭০০ ০২৬, ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃ: ৭৪।

শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দেয়। শুনিয়াছি, উত্তর আমেরিকার স্ত্রীলোকেরা জজ, ব্যারিষ্টার ইত্যাদি হইয়া পুরুষের মত উচ্চাসনে বসিয়া বিচারাদি করে এবং সেখানকার সকল ভদ্র স্ত্রীলোকেরা অতিশয় সুশিক্ষিতা। ইংলন্ডের স্ত্রীলোকেরা এখন অধ্যাপনা ও চিকিৎসা অপেক্ষা অধিক উন্নত কৰ্ম্ম করে না, কিন্তু এখানে স্ত্রীশিক্ষার যেরূপ উন্নতি হইতেছে তাহাতে বোধ হয়, ইংরাজ মহিলারা অনতিবিলম্বে আমেরিকার স্ত্রীলোকদিগকে অতিক্রম করিয়া উঠিবে।"[১৪৭] স্পষ্টতঃ ইংলন্ডে মেয়েদের অবাধ উচ্চশিক্ষা গ্রহণ কৃষ্ণভাবিনীকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি আরো আশান্বিত হয়েছিলেন এই কথা বুঝে যে মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়, সুযোগ পেলে তারা মেধা ও যোগ্যতায় পুরুষদের সমকক্ষ হতেই পারে এমনকি তারা পুরুষদের ছাপিযে যেতে পারে। ১৮৯০ সালে কৃষ্ণভাবিনী দেশে ফিরে আসেন এবং পরের বছর সাহিত্য পত্রিকায "শিক্ষিতা নারী" এই শিরোনামে তাঁর একটি রচনা প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটিতে কৃষ্ণভাবিনী স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে যাবতীয় যুক্তি খণ্ডন করেন। যেমন, প্রবন্ধের সূচনাতেই তিনি বলেন : "... বড়ো বড়ো ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, সভ্যজাতির মধ্যে, পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের মস্তিষ্ক ৫ আউন্স কম, আর এই সূত্র ধরিয়া অনেকে ক্রমাগত তর্ক করেন যে, স্ত্রীলোক যতই কেন শিক্ষিত হউক না, উহারা কখনো বিদ্যায় ও জ্ঞানে পুরষের সমান হইতে পারিবে না। কিন্তু আশ্চর্য ও দুঃখের বিষয় এই, তাঁহারা ভাবেন না যে, স্ত্রীলোকের ঐ অল্পমস্তিষ্কের কারণ — আদিম কাল হইতে প্রায় বরাবরই উপযুক্ত শিক্ষার অভাব। মানবজাতির সৃষ্টি হইতে বর্ত্তমান কাল পর্যন্ত, স্ত্রীলোকেরা যদি সমানভাবে পুরুষের মতো শিক্ষা পাইয়া আসিত, তাহা হইলে, উহাদের মস্তিস্কও যে পুরুষজাতির সমান বৃদ্ধি পাইত, তাহার কোনো সন্দেহ নাই।[১৪৮]

একই সঙ্গে কৃষ্ণভাবিনী চ্যালেঞ্জ জানালেন মেয়েদের পরিবর্তে পুরুষরা সাংসারিক কাজেই কেবল ব্যস্ত থাকুন এবং তারপর পরিণতি লক্ষ করুন। "আর এখন হইতে যদি পুরুষরা সমস্ত জ্ঞানচর্চ্চার ভার স্ত্রীজাতির উপর অর্পণ করিয়া নিজেরা কেবল সংসারের কাজে দিন কাটান, তাহা হইলে ইহাও সম্ভব যে তিনহাজার বৎসর পরে, স্ত্রীলোকের মস্তিষ্ক ও তাহার সঙ্গে জ্ঞানশক্তিও, পুরুষজাতির অপেক্ষা ৫ আউন্স বাড়িয়া যাইবে।"[১৪৯] সমকালীন সংস্কারপন্থী পুরুষরা মেয়েদের হীনাবস্থার জন্য যে সব যুক্তির অবতারণা করতেন কৃষ্ণভাবিনী তাঁর দেশভ্রমণ সূত্রে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তার ভিত্তিতে একই ধরনের যুক্তির অবতারণা করেছিলেন। শুধু যুক্তি দিয়েই ক্ষান্ত হননি কৃষ্ণভাবিনী। তিনি রীতিমতো তথ্য ও পরিসংখ্যানের সাহায্যে তাঁর যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মস্তিষ্ক নিয়ে অযথা তর্কের ভেতর না গিয়ে তিনি আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের মহিলাদের উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে বিগত ৪০/৫০ বছরের মধ্যে ঐ অল্পমস্তিষ্কবিশিষ্ট নারীরা পুরুষের কত কাছাকাছি পৌঁছেছে। আমেরিকার মেয়েরা আইন ব্যবসায়ে পুরুষদের থেকে অনেক বেশী কৃতকার্য ও যোগ্য। এখন সেখানে ৫৫ জন স্ত্রীলোক এটর্নি ও ৬ জন স্ত্রীলোক বক্তার কাজ করছেন। ফিলাডেলফিয়ার ৮ জন স্ত্রী ডাক্তার বছরে মাথাপিছু

১৪৭ তদেব, পৃ:পৃ: ৭৪-৭৫।

১৪৮ কৃষ্ণভাবিনী দাস, সাহিত্য, "শিক্ষিতা নারী" আশ্বিন ১২৯৮।

১৪৯ তদেব।

২০,০০০ ডলার, ১২ জন স্ত্রী ডাক্তার প্রত্যেকে বছরে ১০,০০০ ডলার ও ২২ জন স্ত্রী ডাক্তারের মধ্যে সকলেই বছরে ৫,০০০ ডলার করে উপার্জন করেন। এছাড়া বহুসংখ্যক মহিলা ঔষধ সম্বন্ধীয় রসায়ন বিদ্যার কাজে নিযুক্ত আছেন। তাছাড়া, সেখানকার মেয়েরা বই লিখেও প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। ইংল্যান্ডের মতো একটি ছোট দ্বীপে ১২ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রায় ২৫,০০০ মেয়ে শিক্ষা লাভ করে। তারা অধিকাংশই সংসারের কাজ শিক্ষা করে, তাছাড়া জীবিকা অর্জনের জন্য তারা বিশেষ প্রশিক্ষণ পায়। এইভাবে প্রায় ১,০০০ মেয়েদের উচ্চশ্রেণীর স্কুল মেয়েদের শিক্ষা দেয়, তারপরেও যদি কেউ উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে চায় তাঁরা তখন কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে সংযুক্ত মহিলা কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করে। কলেজ থেকে বি.এ. ডিগ্রি গ্রহণ করে তারা শিক্ষয়িত্রী এমনকি প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদ পর্যন্ত অলঙ্কৃত করতে পারে। তিনি জর্জ এলিয়ট বা মেরী ক্রস, মিস্ ব্রন্ট, মিসেস্ ক্রেক্, মিস্ অষ্টিন্ প্রমুখ ইংরাজ লেখিকাদের নাম উল্লেখ করে জানালেন যে এঁরা বছরে অন্তত দুটো উপন্যাস লেখেন, আর এক একটি উপন্যাস লিখে বছরে অন্ততঃ ১০,০০০ টাকা পেয়ে থাকেন, অর্থাৎ "শুধু কলম চালাইয়া, গড়ে তাঁহাদের অন্তত ১,৫০০ টাকা মাসিক আয় হয়।" এরপরে কৃষ্ণভাবিনী মন্তব্য করেন : "নারীরা অর্থ উপার্জ্জন করে না বলিয়া, যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষায় বাধা দিতে চাহেন, তাঁহারা পূর্ব্বোল্লিখিত আমেরিক স্ত্রী-ডাক্তার ও স্ত্রী-এটর্নিদের এবং ইংরেজ গ্রন্থকর্ত্রীদের আয়ের কথা পড়িয়া, আশা করি, তর্কের পূর্বে মনে মনে একটু বিবেচনা করিবেন।"[১৫০] এরপর কৃষ্ণভাবিনী স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে আপত্তি খণ্ডন করেন এভাবে যে শিক্ষার প্রভাবে মেয়েরা তাদের স্ত্রীজনোচিত গুণাবলি হারায় এবং সকল বিষয়ে পুরুষের সঙ্গে আড়াআড়ি করে সাংসারিক কাজকর্মে অমনোযোগী হয়ে পড়ে এরকম ধারণা সাধারণ্যে প্রচলিত। আমেরিকা ও ইংলন্ডের মেয়েদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি বললেন : "আমেরিকায় স্ত্রীশিক্ষার অত উন্নতি হইলেও, সেখানকার রমণীরা, সংসারের কাজে অমনোযোগিনী বা সন্তানপালনে অজ্ঞ নয়। বরং তাহারা অধিকতর নিয়মপূর্ব্বক ও সুশৃঙ্খলে গৃহকর্ম্ম ও শিশুপালন করিয়া সংসারের সুখ বাড়ায় ও দেশের উন্নতি করে।" এরপর ইংল্যান্ডের মহিলাদের কথা জানিয়েছেন কৃষ্ণভাবিনী : "ইংলন্ডের উচ্চশিক্ষিতা নারীমণ্ডলীর মধ্যে আসিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা বলে, নারীসুলভ সমস্ত কোমল গুণ না হারাইয়া, বরং তাহারা স্ত্রী-জীবনের সমস্ত কাজ অধিকতর বুদ্ধি, চতুরতা ও শৃঙ্খলার সহিত করিতে পারে। ... ইংরেজ সংসারে যেমন নিয়ম, পারিপাট্য ও নৈপুণ্যের চিহ্ন দেখা যায়। আমাদের অল্পশিক্ষিতা বা অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকদের মধ্যে, সেরূপ সুব্যবস্থা কখনো দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঈশ্বর যে অভিপ্রায়ে জগতে স্ত্রীজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন, হাজার লেখাপড়া শিখিলেও, তাহারা, কখনো পরমেশ্বরের সে উদ্দেশ্যের বিপরীত দিকে যাইতে চাহে না।"[১৫১] সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যে শিক্ষা সম্পর্কে তৎকালীন বাঙ্গালী পুরুষের স্ত্রীজনোচিত শিক্ষার ধারণা তিনি মোটেও মেনে নেননি। তিনি কখনোই মনে করতেন না যে গণিত, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় পুরুষালি, এতে নারীর কোন

১৫০ তদেব।

১৫১ তদেব।

অধিকার নেই। বরঞ্চ, ইংলন্ডে উপাধিধারী নারীর সংখ্যা দেখে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে মেয়েরা যে পুরুষের সমকক্ষ হয়েছে তা তাদের উৎকৃষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। এরপর তিনি পুরুষপ্রধান সমাজকে আশ্বস্ত করেছেন এই বলে যে শিক্ষিতা নারীর কল্যাণে সন্তান পালন, গৃহের শৃঙ্খলা, দাম্পত্য জীবন ইত্যাদি নিয়ে গঠিত যে সার্বিক গৃহধর্ম তাতে আসবে নতুন বোধের স্পর্শ। কৃষ্ণভাবিনীর এই দৃষ্টিভঙ্গী স্বভাবত: বিতর্কের সূত্রপাত করেছিল। আমেরিকা ও ইংলন্ডের শিক্ষিতা ও প্রগতিশীল মেয়েদের সপ্রশংস উল্লেখ তাঁকে সমালোচনার সম্মুখীন করে। এই সমালোচক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কেউ নন। কারণ যে "সাধনা" পত্রিকায় "শিক্ষিতা নারী" শীর্ষক প্রবন্ধটির সমালোচনা বেরিয়েছিল, তার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যদিও এই সমালোচনাটি অস্বাক্ষরিত, তবুও লেখার ঢঙে রবীন্দ্রনাথের কলমের আভাস পাওয়া যায়।[১৫২] অপর এক গবেষকও বিনা আপত্তিতে মেনে নিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথ "শিক্ষিতা নারী" প্রবন্ধের সমালোচনা করেছিলেন।[১৫৩] সমালোচক স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী নন। বরঞ্চ তিনি মনে করেন যে আধুনিক সমাজে সন্তানপালনের জন্য স্ত্রীশিক্ষা আবশ্যক। কিন্তু তিনি এ-ও মনে করেন যে প্রকৃতি নারীকে সৃষ্টি করেছে সেবাপরায়ণতা, মাতৃত্ব ইত্যাদি সুকোমল বৃত্তি দিয়ে। বাইরের কর্মক্ষেত্রে নিরন্তর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, স্বার্থপরতা, পুরুষের উৎপীড়ন, দেনাপাওনা, কেনাবেচা ইত্যাদি নিষ্ঠুর কাজ নারীর এইসব প্রকৃতিদত্ত গুণ বিকশিত করে না : "যিনি প্রকৃতির নির্দ্দেশানুসারে সংসারে মা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন তিনি যে শিক্ষা লাভ করিবেন তাহা বিক্রয় করিবার জন্য নহে, বিতরণ করিবার জন্য। অতএব আমেরিকায় যে দোকানদারি আরম্ভ হইয়াছে সে কথা না উত্থাপন করাই ভাল, তাহার ফলাফল এখনও পরীক্ষা হয় নাই।"[১৫৪] এই সমালোচনার প্রতিবাদ করে কৃষ্ণভাবিনী লিখলেন : "কিন্তু নারীদিগকে উচ্চশিক্ষা দিলেই, তাহারা সকলে যে কানে কলম গুঁজিয়া আফিসে আফিসে কাজের উমেদারি করিয়া বেড়াইবে ও দু-চার টাকা পারিশ্রমিকের জন্য দু-এক ঘণ্টা খাটিবে — ইহা কি কেহ বিশ্বাস করিতে পারেন? তবে যাহাদের ভরণপোষণ করিবার কেহ নাই ও সহায় সম্পত্তিরও অভাব, তাহারা যদি আত্মীয়দের কাছে ভিক্ষার পরিবর্ত্তে নিজে, উপার্জ্জন করিয়া, পরিবার পালন করিতে পারে, তাহা হইলে উহা নারীদিগকে অপমানের পরিবর্তে আত্মমর্যাদা ও মহত্ত্বই শিক্ষা দিয়া থাকে।"[১৫৫] কৃষ্ণভাবিনী আরো বলেছেন যে তিনি যে মেয়েদের অর্থ উপার্জনের দৃষ্টান্তগুলি দেখিয়েছেন তা "নারীজাতিকে অর্থলোলুপ করিবার শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে নহে — কেবল ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের চোখ খুলিবার জন্য ...।" স্ত্রীদের উচ্চশিক্ষার কথা উঠলেই সকলে সমস্বরে বলতে থাকে যে তাদের পক্ষে এটা শেখা অনুচিত ওটা অনুপযোগী, কৃষ্ণভাবিনী

১৫২ সীমন্তী সেন, *ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা*, পূর্বোক্ত গ্রন্থের ভূমিকা, পৃ: ২৫।

১৫৩ "সাধনা", অগ্রহায়ণ ১২৯৮ বঙ্গাব্দ। এই সংখ্যায় *"সাময়িক সাহিত্য সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ"* শিক্ষিতা নারী'র সমালোচনা করেন, সুতপা ভট্টাচার্য সংকলিত ও সম্পাদিত, বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য উনিশ শতক, পৃ: ১৬৪, পাদটীকা।

১৫৪ "সাধনা", ১২৯৮ বঙ্গাব্দ।

১৫৫ "সাহিত্য", শিক্ষিতা নারী'র প্রতিবাদের উত্তর, কৃষ্ণভাবিনী দাস, মাঘ ১২৯৮।

তাঁদের উত্তর দিয়েছিলেন : "অন্যান্য গুরুতর কর্ম্মের ন্যায়, গৃহপালন ও সংসারশাসনেও শৃঙ্খলা, নির্ভুলতা, পরিশ্রম, মিতব্যয়িতা, নৈপুণ্য ও বিবেচনা শক্তি চাই — নতুবা কোনো স্ত্রী গৃহের পরিচর্য্যায় সফল হইতে ও পরিবারে সুখশান্তি বিধান করিতে পারিবেন না। কাজকর্ম্মের অভ্যাসের ন্যায়, শৃঙ্খলাও নারীর আর একটি প্রধান শিক্ষণীয় গুণ, উহা দ্বারা সংসারের কাজ সময়ে সারিয়া উঠিতে পারা যায়, উহার প্রভাবে বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পায় না, ও এলোমেলোর নামও শুনা যায় না, উহার জন্য সময়ের অপব্যবহারও কমিয়া আসে।"

"কোনো লোকের চরিত্র সেই ব্যক্তির গৃহের, বিশেষত জননীর, উদাহরণ দ্বারাই গঠিত হইয়া থাকে, তখন স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা ও সুশিক্ষাই যে জাতির উন্নতি ও নীতিজ্ঞানের প্রধান মূল, তাহা কে অস্বীকার করিবে? আর মানুষের কেবল নৈতিক শিক্ষা নয়, মানসিক শক্তিও স্ত্রীলোকের জ্ঞানচর্চ্চা হইতে অনেক পরিমাণে কর্ষিত ও সবল হয়।"[১৫৬] কৃষ্ণভাবিনীর মত এরকম প্রত্যয়ী অভিমত ঊনবিংশ শতাব্দীর মহিলাদের মুখে প্রায় শোনাই যায়নি। তিনি একই সঙ্গে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে পুরুষদের আপত্তির অযৌক্তিকতা প্রমাণ করেছেন, আবার উচ্চশিক্ষা পেলেও মেয়েরা তাদের স্বাভাবিক নারীসুলভ গুণাবলি হারাবে না একথা বলে তাদের আশ্বস্ত করেছিলেন। বিলেতবাসের অভিজ্ঞতা তাঁকে ভূয়োদর্শী করেছিল, তাই তাঁর যুক্তিতে আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল না। তাঁর রচনা থেকে বোঝা যায় যে মেয়েরা যে কোন মূল্যে শিক্ষা লাভ করে তাদের অসহনীয় জীবনযাপন প্রণালীতে উন্নতি আনতে চেয়েছিলো। কৃষ্ণভাবিনীর আরেকটি যে ব্যতিক্রমী দিক আমাদের নজরে পড়ে তা হল অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার ওপর গুরুত্ব আরোপ। তখন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনেক মেয়েই অবহিত ছিল, কিন্তু তা তাদের গার্হস্থ্য কর্তব্যকে আরো সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য। বরঞ্চ, তারা বই লিখে বা সেলাই বোনার মতো শিল্পকর্ম করে প্রয়োজনে অর্থ উপার্জন করতে পারে, সেজন্য তাদের পাঠ্যসূচী বিশেষভাবে রচিত হওয়া উচিত সমাজে এ ধরনের চিন্তাই প্রাধান্য পাচ্ছিল। মেয়েরা প্রশিক্ষণ লাভ করে শিক্ষিকার ভূমিকাও পালন করতে পারবে, এই ধরনের ভাবনাও তখন প্রচলিত ছিল, কিন্তু তা যতটা অবরোধ প্রথা বজায় রেখে মেয়েদের শিক্ষিতা করে তোলার জন্য ততটা তাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার জন্য নয়। এইরকম পরিস্থিতিতেও কৃষ্ণভাবিনী মেয়েদের স্বনির্ভর হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন ও দেখিয়েছিলেন, শুধু তাই নয়, বাস্তবে স্বনির্ভরতা কি তা তথ্য ও প্রমাণ সাপেক্ষে উপস্থাপিত করেছিলেন।

তবে, কৃষ্ণভাবিনীর মতো চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা না থাকলেও ইংলন্ড ও আমেরিকার মেয়েদের উদাহরণ দেখিয়ে মেয়েদের স্বনির্ভরতার কথা বলা হয়েছিল, কৃষ্ণভাবিনীর অনেক আগে। মহালনবিশজা স্বাক্ষরিত এই রচনাটি "বামাবোধিনী" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭০-এর দশকে।[১৫৭] এই লেখিকার অভিমত যেমন যুক্তিময় তেমনি সাহসী। ঐ সময়েও তিনি বলতে দ্বিধা করেননি শুধু হিসাব রাখা ও চিঠি লেখা শেখানো যদি স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য হয় তবে

১৫৬ তদেব।

১৫৭ বামাবোধিনী পত্রিকা, "স্ত্রীশিক্ষা", মহালনবিশজা, আশ্বিন ১২৮৩।

সে বিষয়ে কোনরকম উন্নতি আশা করাই বাহুল্য, স্ত্রীশিক্ষা উদ্দেশ্যহীন হয়ে লাভ কি? যদি না তার শেষে কোন সোনালী আশা না থাকে? তাই লিখলেন মহলানবিশজা : "আমার নিকট এক্ষণকার স্ত্রীশিক্ষা উদ্দেশ্যশূন্য বলিয়া বোধ হয়। আমরা অর্থাৎ যাহারা লেখাপড়া করিতেছি তাহাদের সম্মুখে কোন বিশেষ লক্ষ্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। আমরা কি নিমিত্ত লেখাপড়া করি, করিয়াই বা কি করিব তৎসম্বন্ধে যেন আমাদিগের কোন ধারণাই নাই। আবার যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা দিতেছেন, তাঁহাদিগেরও সকলেরই মনে কোন লক্ষ্য আছে এরূপও বোধ হয় না, তাঁহাদেরও অধিকাংশই যেন উদ্দেশ্যশূন্য হইয়া কার্য করিতেছেন। তাঁহাদিগের যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে সেও অত্যন্ত সামান্য। যদি তাহাই না হইবে তবে স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে কোন ব্যক্তির মুখেও কেন শুনিতে পাওয়া যায় যে "যাহা হইতেছে তাহাই যথেষ্ট। স্ত্রীলোক লেখাপড়া শিখিয়া তো আর চাকরি করিতে যাইবে না।" ফলেতে দেখা যায় যে অনেকেই স্ত্রীলোকদিগের বাড়ির বাজার খরচ লিখিবার ও সামান্যমত দুই একখান পত্র লিখিবার উপযুক্তা হইলেই যথেষ্ট মনে করেন। এত পত্রিকা ও এত পুস্তক লিখিত হইয়া এবং স্থানে স্থানে স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্ত স্কুল সংস্থাপিত হইয়াও যে যথোচিত উন্নতি হইতেছে না এই উদ্দেশ্যশূন্য শিক্ষাই তাহার কারণ বলিয়া বোধ হয়।

"................ স্ত্রীলোকের অর্থোপার্জ্জন ও চাকরি করার কথা উল্লেখ করিয়া অনেকে কেন উপহাস করেন বুঝিতে পারি না। আবশ্যকস্থলে ও উপযুক্তা হইলে স্ত্রীলোকেরা চাকরিই বা না করিবে কেন? স্ত্রীলোকের চাকরি করা কি অসম্ভব না অস্বাভাবিক? আমেরিকা ও ইউরোপের স্ত্রীলোকেরা কিনা করিতেছেন? যথোচিতরূপে শিক্ষা পাইলে এবং বিশেষ লক্ষ্য করিয়া শিক্ষা করিলে এদেশের স্ত্রীলোকেরা কি সেইরূপ হইবার উপযুক্তা হইতে পারে না? আমাদিগের মুখে এখন এত উচ্চ কথা শোভা পায় না বটে, কিন্তু সময়ে ইহা যে সম্ভব হইবে তাহাতে সন্দেহ হইতেছে না।"[১৫৮] এই রচনাটি প্রমাণ করে যে মেয়েদের স্বনির্ভরতার ভাবনা সে সময় মেয়েদেরই মনেই এসেছিল, তাই কৃষ্ণভাবিনী যে বিদেশে গিয়ে মেয়েদের স্বনির্ভরতা এত খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে পেরেছিলেন তা এই কারণেই।

বিংশ শতাব্দীর সূচনার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার অর্থকরী উপযোগিতার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারলেন মেয়েরা নিজেই। প্রিয়ম্বদা দেবী লিখলেন : "স্ত্রীজাতির অধিষ্ঠানভূমি গৃহ সেখানেই তাঁহাদের বুদ্ধির বিকাশ, তাঁহাদের চিত্তবৃত্তির সার্থকতা, তাঁহাদের কর্ত্তব্যের পরিণতি। গৃহ তাঁহাদিগের অধিষ্ঠানভূমি বলায় কেহ যেন মনে না করেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ অথবা সীমাবদ্ধ। যে পুরুষগণ কর্মক্ষেত্রে, সংগ্রামে, সমাজে, সাহিত্য এবং সংস্কারে অগ্রণী তাঁহারাও প্রত্যেকেই আশৈশব স্ত্রীজাতির শিক্ষা স্নেহ এবং সাহচর্য্যের মুখাপেক্ষী, কাজেই গৃহমন্দিরে যাঁহাদিগের শ্রী বহির্জগতে তাঁহাদিগেরই বিশ্বব্যাপিনী শক্তির আবশ্যকতা।"[১৫৯] লেখিকা বলতে চেয়েছেন যে কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত ও সফল পুরুষদের মধ্যে দিয়েই গৃহরুদ্ধ নারীর শক্তি বাইরে

১৫৮ তদেব।

১৫৯ শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী, *অন্তঃপুর পত্রিকা*', "স্ত্রীশিক্ষা" জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮।

প্রকাশ পাচ্ছে। এই শক্তির যাতে সম্যক চর্চা হয় তা দেখা দরকার। এইভাবে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি পর্যালোচনা করতে গিয়ে শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেখেছেন যে "বর্তমান সময়ে মহিলাগণ প্রাতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত পর্যায়ক্রমে ইংরাজী, ফরাসী, সংস্কৃত, বঙ্গভাষা, ভূগোল, ইতিহাস, জ্যামিতি, পরিমিতি, পাটীগণিত, বীজগণিত, মনোবিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অনুশীলন করে। তৎপর গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রান্তি দূরীকরণার্থ ক্ষণিক বিশ্রামের পরই সন্ধ্যা সমাগত হয় সুতরাং পর দিনের পাঠ্যাভ্যাসে নিযুক্ত হইতে হয়। ইহার মধ্যে গার্হস্থ্যশিক্ষা এবং ললিতকলা চর্চার উপযোগী অবসর কোথায়?"[১৬০] সুতরাং এই শিক্ষা গার্হস্থ্যধর্মে দক্ষ করে তোলার উপযোগী নয়। এতে তারা বিদুষী হলেও সুগৃহিণী নয়। আবার সুগৃহিণী যদি বা হয় তবে ললিত কলা চর্চার সময় না পেয়ে স্বামীর সচিব হতে পারার যোগ্যতা অর্জন করছে না। তাই শ্রীমতী প্রিয়ম্বদার সুপারিশ : "তবে এ সকলই হইতে পারে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিযোগিতা ত্যাগ করিয়া, সাহিত্য, ইতিহাস, পরিমিতি, অঙ্ক, বিজ্ঞান অনুশীলন, সূচিকার্য্য শিল্প এবং সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্ত যতগুলি বিদ্যালয় বর্ত্তমান সবগুলিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরুষোপযোগী পুরষশিক্ষা প্রণালী অনুসৃত হয়।" আলাদা আলাদা করে গৃহে প্রতিটি বিষয়ের জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য সাধারণ লোকের পক্ষে তা সম্ভবপর নয় তাই নূতন ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। তবে শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা এ-ও মেনে নিয়েছেন যে আজকাল অনেক মেয়েকে বাধ্য হয়ে অর্থোপার্জনের পথ দেখতে হয়, "এই তো গেল যাঁহারা গৃহিণীর কর্ত্তব্য গ্রহণ করিবেন, আবার দুর্ভাগ্যবশত: আজকালকার দুঃসময়ে অনেক নারীকে বাধ্য হইয়া এবং অনেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জীবন সংগ্রামে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছেন। ইহাদিগের জন্য এক শিক্ষা বিভাগের দ্বার উন্মুক্ত। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালী এমনি অসম্পূর্ণ এবং শিক্ষাদান কার্য্য এমনি বিক্ষিপ্তরূপে সম্পন্ন হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও,পরে অধ্যাপনার নিমিত্ত অপরিমিত শ্রম করিতে হয়। অনেক সময় একজনকেই সাহিত্য, গণিত, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ বিষয় শিক্ষা দিতে হয়। ইহা সাধারণত একজনের পক্ষে বড় দুরূহ ব্যাপার, এই নিমিত্তই একজনের দ্বারা সম্যকরূপে নির্ব্বাহিত হওয়া আশা করা যায় না। ইংলন্ড, জার্ম্মানি প্রভৃতি দেশে যে নিয়ম প্রচলিত আছে তাহারই অনুকরণ করা উচিত বলিয়া বোধ হয় সে দেশে যাঁহারা অধ্যাপনা কার্য্য জীবনের কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে সাধারণ শিক্ষার পর বিশেষ করিয়া এই কার্য্যের জন্য শিক্ষিত হইতে হয় পরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে এই কর্তব্যে সক্ষম বলিয়া বিবেচিত হয়েন এবং শিক্ষাবিভাগে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী রূপে প্রবেশ করিবার অধিকার জন্মে।"[১৬১] প্রিয়ম্বদা দেবী মেয়েদের গৃহিণীর ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, যদিও বা মেয়েরা অর্থোপার্জ্জনে বাধ্য হয়, তবে তার একমাত্র পথ শিক্ষাদান একথা তিনি মনে করেছিলেন, এদেশের শত শত দরিদ্র মেয়ে নানারকম দৈহিক শ্রমের দ্বারা

১৬০ তদেব।
১৬১ তদেব।

জীবিকা নির্বাহ করে। একথা তিনি তাঁর রচনাতে অনুল্লেখিত রেখেছিলেন, এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বলা যায় যে তিনি শুধু মেয়েদের স্বনির্ভরতার কথা বলেননি। মেয়েরা যাতে যথার্থ যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তার জন্য সম্ভব হলে শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিবর্তনের কথা তিনি বলেছেন। তাঁর লেখা প্রমাণ করে যে মেয়েরা তাদের শিক্ষার নিছক প্রয়োজন আছে এই মত ছেড়ে বহুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন ও কিভাবে শিক্ষা দিলে মেয়েরা যোগ্য হয়ে উঠে তাদের জন্য তথাকথিত নির্দিষ্ট জীবিকা অর্জন করতে পারে তা নিয়েও ভাবনা চিন্তা শুরু করেছিলেন।

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবীর ভাবনা যেখানে পৌঁছতে পারেনি, সেখানে নিজ ভাবনা ও মতামতের স্বাক্ষর রেখেছিলেন শ্রীমতী কুমুদিনী সিংহ। প্রিয়ম্বদা দেবী হাতের কাজের কথা বলেছিলেন তা গৃহের সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য কিন্তু প্রয়োজনে তাকে জীবিকা নির্বাহের কাজে লাগানোর জন্য জোরালোভাবে সুপারিশ করলেন শ্রীমতী কুমুদিনী। শ্রীহট্ট মহিলা সমিতিতে পঠিত একটি প্রবন্ধে তিনি বললেন : "ভারতের নানা স্থানে স্ত্রীলোকের উপযোগী নানাবিধ শিল্প প্রচলিত আছে, কিন্তু উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে কোনটাই সম্যকরূপ উন্নতি লাভে সমর্থ হইতেছে না। বস্ত্রবয়ন, সূচিকার্য, উলের কার্য, জরী ও রেশমের কার্য প্রভৃতি প্রচলিত শিল্পের মধ্যে বস্ত্রবয়ন ও সূচিকার্যই সর্বপ্রধান এবং সমধিক প্রয়োজনীয়। আসামী এবং মণিপুরী রমণীগণ তাহাদিগের প্রস্তুত খেশ, গামছা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া স্বীয় জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। আমাদের দেশীয় রমণীগণের এই অত্যুৎকৃষ্ট শিল্প শিক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য কিন্তু অনেকেই ইহার উপকারিতা বুঝিতে চেষ্টা করেন না।"[১৬২] কুমুদিনী এই উপকারিতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে এই শিল্পকাজ জানা থাকলে নিজেদের পোশাক ঘরে তৈরি করে যেমন ব্যয়সংক্ষেপ করে পয়সার সাশ্রয় করা যায় তেমনি প্রয়োজন হলে নিজের জীবিকা নিজে অর্জন করে স্বাবলম্বী হওয়া যায়। তখন উদরান্নের জন্য অপরের গলগ্রহ হবার গ্লানি থেকে মুক্ত হওয়া যায়। অবশ্য এ যুক্তিতে নতুনত্ব কিছু নেই। কারণ স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহী অনেক পুরুষ অর্থকরী শিল্পশিক্ষার কথা বলেছিলেন। কিন্তু কুমুদিনীর দৃষ্টি অনেক প্রসারিত ছিল। তিনি বিশেষ করে কোন একটি শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের কথা না ভেবে সমগ্র দেশের কথা ভেবে বলেছেন : "আমাদের দেশীয়া স্ত্রীলোকদের মধ্যে চিত্র অঙ্কন, নরুণের দ্বারা কাগজ কাটা, ছাঁচ খোদা প্রভৃতি সূক্ষ্মশিল্প প্রচলিত আছে কিন্তু এসকল কার্য্যে লোকের শৈথিল্যবশত ইহা ক্রমশই লোপ পাইতে আরম্ভ হইয়াছে। এসকল অত্যুৎকৃষ্ট সূক্ষ্মশিল্পের পুনরুদ্ধার বাঞ্ছনীয়। শিল্পবিদ্যা একটি উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী বিদ্যা। অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় শিল্পবিদ্যা শিক্ষা না করিলে শিক্ষা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় না। ইহার উন্নতির অভাবেই আমাদের ভারতমাতা ঘোরতর দারিদ্র্যে নিমগ্ন। শিল্পের যথার্থ উন্নতি ব্যতীত এ দারিদ্র্য ঘুচিবার নহে।"[১৬৩] কুমুদিনীর চিন্তা চমকপ্রদ কারণ তিনি উপলব্ধি করেছেন যে দেশের দারিদ্র্যের মূল হল শিল্পক্ষেত্রে অবনতি। সুতরাং শিল্পের উন্নতি না হলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির কোন সম্ভাবনা নেই। এর পরেই কুমুদিনী আনন্দিত হয়েছেন এই দেখে

---

১৬২ শ্রীকুমুদিনী সিংহ, *অন্তঃপুর পত্রিকা*, "এতদ্দেশীয়া মহিলাদের শিল্পশিক্ষা", চৈত্র ১৩১০ বঙ্গাব্দ।
১৬৩ তদেব।

যে ভারতীয়রা শিল্পোন্নতির প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরে বিভিন্ন জায়গায় শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। এতে দেশীয় শিল্পদ্রব্য ব্যাপক পরিচিতি লাভ করছে। দেশীয় রাজা মহারাজারা শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করছেন। কিন্তু কুমুদিনী এত কিছু যথেষ্ট বলে মনে না করে দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছেন : "…. কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে, দেশের প্রকৃত মঙ্গল কামনা করিলে রমণীগণকেও এক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের চেষ্টা ব্যতীত কোন জাতি যথার্থ উন্নতি লাভে সমর্থ হয় না। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে স্ত্রীলোকের শিল্পশিক্ষার কোন আয়োজন দৃষ্ট হয় না, বালিকা বিদ্যালয়সমূহে যে সমস্ত শিল্পশিক্ষা দেওয়া হয় তাহা অতি সামান্য মাত্র। কয়েক বৎসর যাবৎ কলিকাতায় কয়েকজন ব্রাহ্ম মহিলা একত্রিত হইয়া একটি শিল্পশিক্ষা শ্রেণী খুলিয়াছেন, তাহাতে একজন ইউরোপীয় শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে। এখানে প্রথমে কেবল দরজীর কার্য্য শিক্ষা করা হইবে এবং তৎপর টাইপরাইটিং, ঘড়ি মেরামত প্রভৃতি কার্য্য শিক্ষা করা হইবে। যদি স্থানে স্থানে মহিলাগণ কর্তৃক এরূপ শিল্পশিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা যায় তাহা হইলে শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক সুবিধা হইতে পারে। স্থানে স্থানে শিল্প প্রদর্শনী খুলিয়া তাহাতে এ দেশীয়া মহিলাদের প্রস্তুত নানাবিধ শিল্প প্রদর্শিত হইলে, নানা স্থানে বিভিন্ন প্রকারের শিল্প সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করা যাইতে পারে এবং যাহাদিগের কার্য্য সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হইবে তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিলে মহিলাদের ও বিষয়ে উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে পারে।"[১৬৪]সংসারের সাশ্রয় করা এবং নিরাপদ শিক্ষকতা এই দুই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ক্ষেত্র ছাড়া যখন মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার কথা চিন্তা করা যাচ্ছিল না, তখন কুমুদিনী শিল্প দ্বারা জীবিকা নির্বাহের মতো শ্রম ও ঝুঁকিসাধ্য জীবিকার কথা মেয়েদের জন্য চিন্তা করতে পেরেছিলেন। মাত্র অর্ধ শতাব্দী আগেও যেখানে পুরুষরা মেয়েদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে পাঠানো উচিত হবে কিনা এই প্রশ্ন নিয়ে দীর্ণ হচ্ছিলেন, সেখানে নতুন শতাব্দীর সূচনায় একজন মহিলার চিন্তায় সমগ্র দেশে মহিলাদের ভূমিকার সম্ভপরতা স্থান পেয়েছিল।

অবশ্য এ ধরনের চিন্তায় কুমুদিনীর শরিক হয়েছিলেন শ্রী লীলাবতী মিত্র।[১৬৫] তিনি লক্ষ্য করেছেন যে বর্তমান সময়ে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে জীবন সংগ্রাম কঠিন হয়ে উঠেছে। তিনি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষের নাম করে বলেছেন যে উক্ত ঘোষ মহাশয় অর্থকরী শিল্পশিক্ষার আন্দোলন গড়ে তুলে দেশের প্রকৃত শক্তি জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লীলাবতী আক্ষেপের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন যে অন্তঃপুরে মেয়েরা যে কি দুর্দশার সঙ্গে দিন কাটাচ্ছেন সেদিকে পুরুষ সমাজের প্রতিনিধি শ্রী ঘোষ দৃকপাত করেননি। স্বামী হারিয়ে তরুণী মেয়েরা শিশু সন্তানদের নিয়ে অনাহারে অকালে প্রাণ বিসর্জন দিতে বাধ্য হচ্ছে। "ভদ্র গৃহস্থ অপেক্ষা বরং নিম্নশ্রেনীর নারীরা আপনাদের জীবিকা সংস্থান করিতে পারে কেন না

১৬৪ তদেব।
১৬৫ শ্রী লীলাবতী মিত্র, *অন্তঃপুর*, "স্ত্রীলোকদিগের অর্থকরী শিল্পশিক্ষা", আষাঢ় ১৩১১।

দাসীবৃত্তি, রাঁধুনীবৃত্তি ও ভিক্ষাবৃত্তি করিতে তাহাদের লজ্জা নাই। কিন্তু ভদ্র মধ্যবিত্ত গৃহের অনাথিনী কিম্বা দরিদ্র গৃহস্থ স্ত্রীলোকেরা দারিদ্র্যের পেষণে নানাভাবে পেষিত হইয়া কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করিয়া অকালমৃত্যুর হস্তে প্রাণমন প্রিয়জনদের ডালি দিতেছেন। এমন সময় আসিয়াছে যখন জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি গঠন করিতে পুরুষ ও নারীর শক্তি সম্মেলনের প্রয়োজন হইয়াছে। বিধাতা নারীর অন্তরেও পুরুষদের মত ইচ্ছাশক্তি দিয়াছেন। কিন্তু দারিদ্র্যের দুর্দশা দূর করিতে কিম্বা অর্থকষ্টের সাহায্য করিতে দেশাচার অন্তরায় হইয়াছে। সমাজ তাহা আজও বুঝিতে পারিল না। এদেশের এক অঙ্গ বিকল হইয়া রহিয়াছে যুনানী, মার্কিন ও জাপানী রমণীদের কার্যকলাপ মনে মনে পর্যালোচনা করিয়া তাহা বেশ অনুভব করিতে পারা যায়। "বর্ত্তমান কালে স্ত্রীলোকদের অর্থকরী শিল্পশিক্ষা না হইলে দারিদ্র্যপীড়িতা ভদ্র অসহায় গৃহস্থ রমণীদের জীবিকার ব্যবস্থা হইতেছে না। সেকালের ভদ্র গৃহস্থ রমণীরা অবসর সময় একটা না একটা অর্থকরী শিল্পদ্বারা কিছু উপার্জন করিতেন। সময়ও বেশ কাটাইতেন, যে কালের সধবা ও বিধবা সকলেই চরকায় সূতা কাটা, পৈতা তৈয়ারী করা, ছাঁচ কাটা, সিকা বুনন, কড়ির ঝাঁপি, কড়ির আলনা, কাঁথা সেলাই, নারিকেলের ফুল কাটা, চুলের দড়ি ইত্যাদি শিল্প দ্বারা গৃহে বসিয়া সংসারের আর্থিক ক্লেশ কতক নিবারণ করিতে পারিতেন, শুনিয়াছি, কোন কোন বিধবা উক্ত শিল্পের আয় দ্বারা আপনার ব্যয় চালাইয়াও গরীবদের কিছু দান করিতে পারিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সেকালের শিল্প লোক পছন্দও করিবে না। প্রয়োজনেও তেমন আসিবে না। সেকালের বঙ্গনারীদের সামান্য অর্থকরী শিল্প দ্বারা সংসারের সাহায্য কিছু হইত এবং নারীকে একটু আত্মনির্ভরের উপর দাঁড়াইতে শিক্ষা দিত। ইউরোপীয় ও জাপানী রমণীদের অর্থকরী শিল্পচর্চাতে মনে সাহস ও আত্মনির্ভরের বল এমন জাগ্রতরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে যে জগৎ তাঁহাদের বীরমাতা জানিয়া সম্ভ্রমে অভিবাদন করিতেছে।"

"বর্তমান সময়ে মহিলাদের অর্থকরী শিল্পের উপায় করিয়া দেওয়া সমাজের কর্তব্য। গৃহে গৃহে স্ত্রীলোকেরা অর্থকরী শিল্প দ্বারা কিছু কিছু উপার্জন করিতে পারেন, সে বিষয় অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদেরও আগ্রহ থাকা উচিত। যাঁহারা শিক্ষিতা হইয়াছেন, তাঁহারা শিক্ষয়িত্রী, ধাত্রী, ডাক্তার হইতে পারেন। কিন্তু প্রত্যেক অন্তঃপুরের শিক্ষিতা ও অশিক্ষিতা রমণী গৃহে বসিয়া যাহাতে দু পয়সা উপার্জন করিতে পারেন সে বিষয়ে সকলেরই চেষ্টা, যত্ন থাকা জাতীয় অবসন্নতার দিনে অতীব প্রয়োজনীয়।"[১৬৬] লীলাবতী ও কুমুদিনীর মতামত প্রায় অভিন্ন। উভয়েই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য ভিনদেশী মহিলাদের উদাহরণ দিয়ে মহিলাদের আত্মনির্ভরতার কথা বলেই শুধু ক্ষান্ত হননি। তাঁরা নির্দ্বিধায় বলেছেন যে জাতীয় জাগরণের জন্য সমগ্র নারীসমাজের জাগরণ প্রয়োজন, আর এই জাগরণ তখনই সম্ভব যখন সমস্ত নারী আত্মনির্ভরশীল হচ্ছে। ১৮৭০-এর দশক থেকেই জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটতে শুরু করেছিল। বিংশ শতকের প্রথম দশকে আলোচনাকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী জোয়ার আরো প্রবল আকার ধারণ করেছিল। সেই সময় আত্মশক্তি

১৬৬ তদেব।

অর্জন করার যে প্রয়াস সমাজে দেখা যাচ্ছিল মেয়েরা নিজেদের তার থেকে বিচ্ছিন্ন রাখেনি। তারাও তখন পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে পা মিলিয়ে দেশের কাজে বিশেষ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির কাজে আত্মনিয়োগ করতে এগিয়ে এসেছিল।

কিন্তু যে শিক্ষা মেয়েদের মধ্যে এই উদ্বোধন ঘটিয়েছিল সেই শিক্ষাক্ষেত্রে কিন্তু আবার রক্ষণশীলতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। কাদম্বিনী বিলাতে গিয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিপ্লোমা লাভ করলেন, চন্দ্রমুখী এম.এ. পাশ করলেন, কৃষ্ণভাবিনী বিলাতবাসের অভিজ্ঞতায় স্বচ্ছল আত্মনির্ভরশীল মেয়েদের দেখে মুগ্ধ হলেন। কুমুদিনী লীলাবতী অবরোধের বেড়া ভেঙে মেয়েদের অর্থকরী শিল্পকার্যে নিযুক্ত হতে বললেন। কিন্তু এসব কিছু ছাপিয়ে জাতীয়তাবাদী আবেগ পাশ্চাত্যশিক্ষার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। হিন্দুরমণীদের ঐতিহ্যিক রূপকল্প আবার প্রাধান্য পেতে শুরু করল। স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে আবার এই ভাবনার পুনরাগমন ঘটতে শুরু করল যে প্রাথমিক শিক্ষার পর মহিলাদের কেবল গৃহকর্মবিষয়ক শিক্ষা দেওয়া হবে। তারা সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, গার্গী, দুর্গাবতী প্রমুখ প্রাচীন সাধ্বী মহিলার জীবনী পাঠ করবে যাতে তারা হিন্দুধর্মের উচ্চ আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মাতাজী মহারাণী তপস্বিনী ১৮৯৩ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন আদি মহাকালী পাঠশালা। এই বিদ্যালয়টি পরিচিত হয়েছিল এইভাবে যে এই প্রতিষ্ঠানটি নারীশিক্ষার বিকাশে খাঁটি ভারতীয় প্রচেষ্টার ধারা নিয়ে এসেছে। এই বিদ্যালয়ে বিদেশীর কাছ থেকে কোন অর্থনৈতিক সাহায্য নেওয়া হত না এবং এখানে কোন বিদেশী শিক্ষিকাও নিয়োগ করা হত না। এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ছিল মেয়েদের কঠোরভাবে জাতীয়তাবাদী ধারায় শিক্ষিত করে তোলা এই প্রত্যাশা নিয়ে যে তারা হিন্দুসমাজের পুনর্জাগরণ ঘটাবে। তবে, এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যাঁরা মেয়েদের শিক্ষিত করতে চাইতেন তাঁরাও বিশ্বাস করতেন যে স্ত্রীশিক্ষা ও অগ্রগতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে এবং তাঁরা সেই ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েছিলেন, যেখানে ভারতীয় নারীরা দেশের কাজে বৃহত্তর ভূমিকা পালন করবে।[১৬৭] এই বিদ্যালয়টিতে প্রধানত উচ্চবর্ণের হিন্দু মেয়েরা পড়ত। তারা ঢাকা গাড়ীতে চড়ে বিদ্যালয়ে আসত। এই বিদ্যালয়ে যে পাঠ্যসূচী অনুসরণ করা হত তা হল বাংলা, অঙ্ক, নীতিশিক্ষা, কাব্য, পুরাণাশ্রয়ী সাহিত্য, ইতিহাস পাঠ, সূচীশিল্প, রন্ধনবিদ্যা, হিসাবরক্ষণ এবং আলপনা আঁকা। এছাড়া এখানে গুরুত্ব সহকারে শেখানো হত বিভিন্ন উপচারের পূজা এবং তৎসংশ্লিষ্ট রন্ধনবিদ্যা। এই ধরনের শিক্ষাসূচীর উদ্দেশ্য ছিল গার্হস্থ্য জীবনে শাস্ত্রীয় অনুশাসনের প্রয়োগ, পাতিব্রত্যের বিকাশ ঘটানো, হিন্দুনারীর যথার্থ ভূমিকা পালন ইত্যাদি।[১৬৮] মহাকালী পাঠশালার মধ্য দিয়ে এইভাবে গার্হস্থ্য কর্তব্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছিল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি এক ধরনের বিরোধিতা সৃষ্টি হয়েছিল, মহিলারাও তার সামিল হয়েছিলেন। শ্রী কুলবালা দেবী লিখলেন : "জাতীয় প্রকৃতি ও ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ

১৬৭ Geraldine Forbes, *Women in Modern India*, পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ৪৯-৫০।
১৬৮ The Changing Role of Women in Bengal, পূর্বোক্ত, পৃ: ১০০।

করিয়া বিজাতীয় ধর্ম্মানুরূপে শিক্ষিতাদিগের দ্বারা দরিদ্র বাঙালী যে অধিক পরিমাণে দরিদ্র দশায় নিপতিত হইতেছে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণে স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষা আপামর সাধারণ সকলের নিকটেই কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং সেই কর্তব্য পালনের জন্য সকলেই আপনাপন কন্যাবর্গকে স্কুলে পাঠাইয়া দিয়া কৃতকৃতার্থ হন। ...কিন্তু স্কুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে তাঁহাদের দায়িত্বটুকু ঘুচিয়া যায়, ইহাই দুঃখের বিষয়। অধিকাংশ স্থলেই তৃতীয় ভাগ কি বোধাদয়েই বিদ্যার পরিসমাপ্তি হয়, তবে অবস্থানুসারে শহরের কোন কোন ছাত্রী ছাত্রবৃত্তি, এন্ট্রান্স, এফ.এ., বি.এ. পর্য্যন্ত পড়েন।"

"উপরিউক্ত প্রণালীর শিক্ষিতা স্ত্রীলোকগণ লজ্জাহীনা, চঞ্চলা, আলস্যপরায়ণা ও মুখরা হন, অর্থাৎ মূর্খা স্ত্রীলোকদিগের সহিত ইহাদিগের বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। অধিকন্তু ইঁহারা নাটক, নভেল প্রভৃতি পুস্তক পাঠ ও কুরুচিপূর্ণ ২/১ খানা পুস্তক লিখিয়াই বিদ্যাশিক্ষার চরমোৎকর্ষ সাধন করেন। ইঁহারা অশিক্ষিতা বটেন, কিন্তু রমণীসমাজে বিদুষী বলিয়া পরিচয় দিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হন না। "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্কর" ইহাদিগের চরিত্রে জাজ্বল্যমান প্রকাশ। এইরূপ শিক্ষিতাগণের দ্বারা সাংসারিক কার্যে কোন উপকার পাওয়া যায় না, বরং মূর্খা স্ত্রীলোকেরা ইহা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।"[১৬৯] মহাকালী পাঠশালা প্রতিষ্ঠার এক বছর আগে অর্থাৎ ১৮৯২ সালে প্রকাশিত এই প্রবন্ধটিতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট বিরাগ প্রদর্শন করা হয়েছে। এমনকি একথাও বলা হয়েছে যে বিজাতীয় অল্পবিদ্যা লাভ করে ভয়ংকরী হবার চেয়ে মূর্খ থাকাও শ্রেয়। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে শ্রী সুবাসিনী সেহানবীশ লিখেছেন : "পাশ্চাত্য প্রথানুযায়ী স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার এদেশে কদাচ বাঞ্ছনীয় নহে। প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর দ্বারা মহিলা সমাজের উপকার না হইয়া, বরং সমধিক অপকারই সংসাধিত হইতেছে।... পাশ্চাত্য শিক্ষানীতির প্রভাবে আমরা স্কুল কলেজে যাইয়া মেম সাজিয়া ক্রমশঃ অপরিমিত বিলাসিতার আত্মনিগ্রহের পরিবর্ত্তে ভোগ লালসা পরিতৃপ্তির জন্য লালায়িত। সীতা, সাবিত্রীর দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া, ইহাপেক্ষা শিক্ষার অপকর্ষতা আর কি হইতে পারে? কোন পাঠিকা ভগিনী ইহাতে যেন আমাকে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী বলিয়া মনে না করেন। প্রকৃত -পক্ষে যে শিক্ষা দ্বারা আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সংসাধিত, হৃদয় উন্নত, উদার এবং জ্ঞান পরিমার্জ্জিত হয়, যে শিক্ষার ফলে আমরা আত্মসুখবাসনাকে সংযত করিয়া, মৈত্রেয়ী, শাণ্ডিলী, অরুন্ধতী, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি আদর্শ নারীকুলশিরোমণি আর্য্য মহিলা রত্নদের পবিত্র চরণরেণু মস্তকে ধারণপূর্ব্বক মহান্ কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে পারি, সেই শিক্ষারই আমরা একান্ত পক্ষপাতী। অর্থকরী বিদ্যায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই।"[১৭০] এখানে লক্ষ্যণীয় যে শ্রীমতী সুবাসিনী একবারও মহাকালী পাঠশালার নাম উল্লেখ করেননি কিন্তু তাঁর বক্তব্য এবং মহাকালী পাঠশালার উদ্দেশ্য ও পাঠ্যসূচী প্রায় অভিন্ন। এই সময় থেকে যে

১৬৯ শ্রী কুলবালা দেবী, *বামাবোধিনী পত্রিকা*, "হিন্দুরমণীর বিদ্যাশিক্ষা ও পরাধীনতা", বৈশাখ ১২৯৯।
১৭০ অন্তঃপুর পত্রিকা, "আমাদের জাতীয় জীবনে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব" শ্রী সুবাসিনী সেহানবীশ, পৌষ ১৩১০ বঙ্গাব্দ।

একটি পাশ্চাত্যবিরোধী হাওয়া মহিলাদের আবার অন্তঃপুরের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল তা বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভে লেখা একটি প্রবন্ধ[১৭১] থেকে বোঝা যায়। এই প্রবন্ধটি উল্লেখ্য এই কারণে যে এটি একটি পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা। লেখিকা ঊষাপ্রভা দেবী মেয়েদের শিক্ষণীয় বিষয়ের একটি তালিকা এই রচনায় পেশ করেছেন। তিনি বিবেচনা করেছেন : "এক্ষণে সাধারণত ১২/১৩ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বালিকাগণের বিবাহ হয় না। ৬/৭ বৎসর বয়সে শিক্ষা আরম্ভ হইলেও বিবাহের পূর্ব্বে ৬/৭ বৎসর শিক্ষার সময় থাকে। এই সময়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সাধারণভাবে শিক্ষা দেওয়া বোধ হয় নিতান্ত দুঃসাধ্য নহে।

১। সাহিত্য (গদ্য, পদ্য, ব্যাকরণ)

২। বিজ্ঞান (নির্দিষ্ট সরল ও মূলসূত্রগুলি)

৩। ইতিহাস (ভারতবর্ষের কিংবা বঙ্গদেশের)

৪। ভূগোল

৫। গণিত (পাটীগণিত ও শুভঙ্করী)

৬। স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিশুপালন প্রণালী (শিশুপালন প্রণালী অবশ্য বয়ঃস্থা বালিকাদিগের জন্য)

৭। ইংরাজী (এই সময়ের মধ্যে যেটুকু সম্ভব)

৮। শিল্পকার্য (সেলাই, রন্ধন প্রভৃতি)

৯। রেখাঙ্কন

১০। পাকপ্রণালী

এই কয়টি বিষয় ৬/৭ বৎসর ধরিয়া শিক্ষা পাইলে, সে শিক্ষা বোধ হয় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর হইবে না। সাধারণত গৃহস্থালী করিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হইতে পারে।"[১৭২]

ঊষাপ্রভাদেবীর পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা প্রমাণ করে যে ১৯১১-১২ সালেও (এই নিবন্ধের আলোচনাকাল ১৯০৫ সাল পর্যন্ত) গৃহধর্মই স্ত্রীশিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এ ধারণাই সমাজে প্রাধান্য পেয়ে আসছিল। স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহী পুরুষরা অধিকাংশই চেয়েছিলেন যে মেয়েরা শিক্ষিত হোক, কিন্তু তাদের শিক্ষা হবে এমন যাতে তাদের গার্হস্থ্যকর্মে নৈপুণ্য বৃদ্ধি পায়। একই সঙ্গে তারা ঔপনিবেশিক পরিকাঠমোয় পুরুষের সাহায্যকারিণীর ভূমিকা পালন করতে পারে। পুরুষদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে মহিলারাও ১৮৫০/৬০ এর দশক তো বটেই ১৮৭০/১৮৮০-র দশক পর্যন্ত বলেছিল যে স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীজনোচিত গুণাবলীর উৎকর্ষ

---

১৭১ বামাবোধিনী পত্রিকা, "বর্তমান সমাজের উপযোগী স্ত্রীশিক্ষার বিষয়সমূহ", শ্রীমতী ঊষাপ্রভা দেবী, মাঘ ১৩১৯, (১৯১১ সালের জন্য পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা)।

১৭২ তদেব।

সাধন করে সংসারকে শ্রীমণ্ডিত করে তুলবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুটে হলেও মেয়েদের স্বনির্ভরতার কথা শোনা যাচ্ছিল। এই গুঞ্জন স্পষ্টতর হল ১৮৮০-র দশকে মেয়েদের সামনে উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হবার পবে। কিন্তু কখনোই তা বজ্রনির্ঘোষ হয়নি। কৃষ্ণভাবিনী, লীলাবতী বা কুমুদিনী মেয়েদের স্বনির্ভরতার কথা বলেছেন রক্ষণাত্মক ভঙ্গীতে অর্থাৎ মেয়েরা অর্থোপার্জন করতে পারবে প্রয়োজন হলে। কিন্তু মেয়েদের নিজেদের জীবন পরিপূর্ণ হবে, তারা পায়ের তলায় একটুকরো শক্ত মাটি পাবে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার মাধ্যমে একথা তারা তখনো ভাবতে শেখেনি, বড়জোর এটুকু তারা ভেবেছিল যে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা তাদেব অকাল-বৈধব্যের মতো আকস্মিক দুরবস্থায় মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে সাহায্য করবে। অবশ্য আলোচ্য সময়ে এটুকু ভাবা এবং তা লেখনীতে প্রকাশ করা কম কথা নয়। স্ত্রীশিক্ষার সূচনাকালে মেয়েরা তাদের শিক্ষার জন্য সরব হয়েছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে শিক্ষা তাদের অন্তর্নিহিত শক্তি জাগ্রত করে যে হীনাবস্থায় তারা রয়েছে তার নিরসন করবে। বারংবার পাশ্চাত্য জগৎ থেকে উদাহরণ নিয়ে তারা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে যে শিক্ষা মেয়েদের গৃহকর্মবিমুখ করবে না, বরং কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূর করে শিক্ষিতা নারী তার বিচক্ষণতা ও বুদ্ধি দিযে সুখী সংসার গড়বে। তাদের বিচারবুদ্ধিব বিকাশ ঘটবে ও তারা ভালমন্দ বিচার করার ক্ষমতা লাভ করবে। এইভাবে নারীসুলভ কমনীয়তার সঙ্গে যুক্ত হবে পুরুষোচিত দৃঢ়তা। যার ফলে পুরুষ একদিকে লাভ করবে রমণীয় গৃহ, অন্যদিকে যদি প্রয়োজন হয় কর্মক্ষেত্রে সে নারীর সহায়তা লাভ করবে। তাহলে কি স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ঘটেছিল পুরুষের প্রয়োজনে? এর উত্তর হল এই যে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ঘটেছিল পুরুষের উদ্যোগে। কাজেই প্রথমাবস্থায় অনুসরণ করে, তাদের আশঙ্কাকে প্রশমিত করে, মেয়েরা শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল, যাতে তারা নিজেদের আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নববিধানে নারী

নতুন দাম্পত্য বোধ : নব চেতনায় বঙ্গরমণীর উদ্বোধন

পাশ্চাত্য শিক্ষার সাথে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা বাঙ্গালী পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গীতে যে পরিবর্তন এনেছিল তার প্রতিফলন ঘটেছিল স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনে এবং প্রয়াসে। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ঘটেছিল যেসব কারণে তার মধ্যে অন্যতম ছিল এক ভিন্নতর দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা। কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত পুরুষরা অনুভব করেছিলেন যে সমসাময়িক সামাজিক ও পারিবারিক পরিকাঠামোতে যে দাম্পত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত তা তাদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সমসাময়িক ব্রিটিশ দৃষ্টিভঙ্গীতে দাম্পত্যের সঠিক প্রকৃতি হল তাই যেখানে স্ত্রী তার স্বামীর দৈনন্দিন জীবনে বুদ্ধিমতী সঙ্গিনী, যে স্বামীকে দেবে সহানুভূতি এবং উৎসাহ, পরামর্শ, সান্ত্বনা এবং আরাম। ইংরাজী শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা এই আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আর ঔপনিবেশিক সরকারের অধীনে তাঁরা যে কর্মজীবন যাপন করছিলেন তা এমন এক স্ত্রীর চাহিদা সৃষ্টি করেছিল, যে এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু সমস্যা হল যে ঐতিহ্যিক হিন্দু পরিবারে কেবলমাত্র স্বামীর উপযুক্ত সঙ্গিনী হওয়াই যথেষ্ট ছিল না, একজন স্ত্রীকে, যাকে কথ্য বাংলায় বৌ বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, তাকে শুধু স্বামী নয়, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গেও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হত। প্রকৃতপক্ষে ভালো বৌ বলে তাকেই স্বীকৃতি দেওয়া হত যে তার শ্বশুরগৃহের পারিবারিক কাঠামো অক্ষুন্ন রাখতে পারত। এই অবস্থায় ইংরাজী শিক্ষিত তরুণ স্বামীরা এক অদ্ভুত দোটানায় পড়েছিলেন। কারণ, তাঁদের দাম্পত্য চাহিদা, তাঁদের পারিবারিক অস্তিত্বের সঙ্গে ঠিক খাপ খাচ্ছিল না। অথচ তাঁরা যে সর্বদা তাঁদের পৈতৃক গৃহের থেকে বেরিয়ে আসতে পারতেন তা নয়, আর তা কাম্য ছিল না। ১৮৮০-র দশকে প্রকাশিত হয়েছিল গিরিজা প্রসন্ন রায়চৌধুরী রচিত “গৃহলক্ষ্মী”। এই বইয়ের উদ্দেশ্য ছিল যাতে মেয়েরা যথার্থই তাদের গৃহের লক্ষ্মী হয়ে উঠতে পারে, সে বিষয়ে তাদের শিক্ষিত করে তোলা। এই বইয়ের লেখক দাম্পত্য সম্পর্কে যে মত পোষণ করতেন তা চলতি হাওয়ার পরিপন্থী ছিল। কারণ “গৃহলক্ষ্মী” গ্রন্থে স্বামীস্ত্রীর যে সম্পর্ক আদর্শায়িত হয়েছিল তাতে স্বামী এবং স্ত্রী কারোরই কেবলমাত্র নিজেদের সুখ এবং প্রেমের জন্য বাঁচবার অবকাশ ছিল না। যদিও বলা হয়েছিল স্ত্রী শিক্ষিতা হবেন কারণ তা হলে স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক নতুনতর মাত্রা লাভ করবে, অথচ স্বামী এবং স্ত্রী শুধুমাত্র নিজেদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবেন না, একথাও বলা হয়েছিল। বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য হল সামাজিক এবং পারিবারিক দায়বদ্ধতা সম্পাদন করা। আর এই কর্তব্য পালনে স্ত্রীর উচিত স্বামীকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা। এই প্রক্রিয়ায় স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক প্রেমের বিকাশে কোন প্রয়োজন বা অবকাশ নেই। তাই স্বামী যদি কর্ম বা শিক্ষার তাগিদে পরিবারের বাইরে থাকতে বাধ্য হন, তবে স্ত্রীর উচিত নয় তাঁর সঙ্গে গিয়ে পারিবারিক ভারসাম্য নষ্ট করা।স্ত্রী যে কেবল নিজেই

পারিবারিক দায়বদ্ধতা পালন করবেন তা নয়, স্বামীকেও তিনি এই ব্যাপারে সহায়তা করবেন। তবুও "গৃহলক্ষ্মী" গ্রন্থের লেখক স্বীকার না করে পারেননি যে স্ত্রী স্বামীর সমস্ত ভাবনাচিন্তার শরিক হবে, অর্থাৎ এই স্ত্রী হবে শিক্ষিতা কিন্তু একই সঙ্গে সে ঐতিহ্যিক পরিবারের যাবতীয় কর্তব্যপালনকারিণী বৌ-ও হবে।[১] "গৃহলক্ষ্মী" গ্রন্থের লেখকের যে দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায় তাতে বোঝা যায় যে সে সময়, আরো বিশেষভাবে বলতে গেলে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাঙালী দাম্পত্য জীবনে এক ধরনের পরিবর্তন এসেছিল, যা বাঙ্গালী অভিজ্ঞতায় খুব সাধারণ লক্ষ্মণবিশিষ্ট ছিল না। নগেন্দ্রবালা মুস্তোফীর 'সখা' নামক কবিতায় এই নতুন দাম্পত্য সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে।

১

যে আমারে ভালবাসে
আমি যারে ভালবাসি;
যে আমার সুখে হাসে
আমি যার সুখে হাসি।

২

আমার দুখেতে যার
কাঁদে সদা প্রাণ মন,
যা'র দুখে নিশি' আমি
করি অশ্রু বরিষণ,

৩

প্রাণের গোপন কথা
যে আমারে খু'লে বলে;
আমিও আনন্দ পাই,
যারে সব কথা বলে।

৪

বিপদে পড়িলে আমি
আমার উদ্ধার তরে,
করিয়া পরাণ পণ
যে বেশী যতন করে;

১ **Judith Walsh, "The Virtuous Wife and the Well-Ordered Home : The reconceptualization of Bengali Women and their Words", in Rajat Kanta Ray, *Mind, Body and Society : Life and Mentality in Colonial Bengal*, OUP 1995, P. 356.**

৫

আমিও বিপদে যা'র;
বেদনা পাইয়া মনে,
উদ্ধারের তরে তার
করি যত্ন প্রাণপণে;

৬

একাকী প্রবাসে যবে,
প্রাণ পুড়ে হয় ছাই,
সেই কালে আমি যা'র
মুখ দেখি সুখ পাই;—

৭

সংসারের সার ধন
"সখা" যে তাহার নাম,
মানবের শান্তি গেহ
সখার হৃদয় ধাম।[২]

উপরের কবিতাটিতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আদান-প্রদানের ভাবটি খুব সুন্দর প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের আদান-প্রদান যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে খুব সুলভ ছিল না, তা স্পষ্ট হয় কেশবচন্দ্র সেনের মা সারদাসুন্দরী দেবীর আত্মকথা থেকে। সারদাসুন্দরী দেবী জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮১৯ সালে। ৯ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৮২৮ সালে তাঁর বিবাহ হয়। তখনকার নিয়মমত তিনি একবছর পিত্রালয়ে অতিবাহিত করে ১০ বছর বয়সে শ্বশুরবাড়ি এসেছিলেন। সারদাসুন্দরী বলেছেন : "শ্বশুরবাড়ী আসিবার পূর্ব্বে আমার বড় ভয় হইত, মনে হইত, কোথায় যাইব। ভাবিতাম যেন আমায় কয়েদ করিবে, কিম্বা ফাঁসি দিবে। এই ভাবিয়া এক মাস পর্য্যন্ত কাঁদিয়াছিলাম। শেষে আমার বাবা জোর করিয়া যখন শ্বশুরবাড়ী রাখিয়া গেলেন তখন মনে হইল যেন আমায় জলে ফেলিয়া দিলেন। যদিও বহুদিন হইতে মনে করিতাম, আমাদের এইসব হিন্দু নিয়ম খুব ভাল; কিন্তু এখন দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, বেশ বড় হইয়া বিবাহ হইলেই বেশ ভাল; কেন না, তাহা হইলে আর এই সব কষ্ট সহ্য করিতে হয় না। প্রথম শ্বশুরবাড়ী আসিয়া যখন এক এক জনের মুখপানে চাইতাম, আমার এক এক পোয়া করিয়া রক্ত শুকাইয়া যাইত। ভয় হইত, কে কি বলিবেন। আমি তিন সন্তানের মা হইলাম, তখন পর্যন্ত আমার ভয় ছিল। শাশুড়ীর মুখপানে তাকাইতে ভয় হইত। কে কি বলিবেন। আমার শাশুড়ী কত ভাল ছিলেন, কিন্তু একটু রাগ বেশি ছিল। আমার দুর্ভাগ্যবশত

২ শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী, "মর্ম্মগাথা" পৃঃ ৫০-৫১, আখ্যাপত্র পাওয়া যায়নি।

তিনি প্রথমে আমায় ভাল চোখে দেখেন নাই, বোধ হয় সে আমার দোষ। তাঁর একপ্রকার বিশ্বাস ছিল, তখন আমার দশ বৎসর হইতে অনেক বেশী বয়স। আমার একটু দোষ দেখিলেই তিনি আমার শ্বশুরকে বলিয়া দিতেন, এবং আমায় বকুনি খাওয়াইতেন। যদি আমরা দু-চারজন সমবয়সী একত্র বসিয়া খেলা করিতেছি দেখিতেন, তাঁহার রাগ হইত। আমরা একটু এঘর ওঘর করিলে তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। আমরা ভয়ে কাঁপিতাম।"[৩] ভয়পীড়িতা এক বালিকাবধূ যে স্বামীর কাছে গিয়ে আশ্রয় পাবেন সে উপায় ছিল না, "...স্বামীর সেবা এবং শ্বশুরের সেবা করিতে পারিতাম না। কারণ, সেই সময়ে এইসব কাজ মহৎ হইলেও করিতে দেখিলে লোকের নিকট নিন্দনীয় হইতে হইত।"[৪] এই যেখানে প্রচলিত রীতি সেখানে দাম্পত্য-প্রণয় গড়ে ওঠা অসম্ভবের নামান্তর ছিল। কিন্তু তবুও সারদাসুন্দরী ও তাঁর স্বামীর মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল। সারদাসুন্দরী স্বামীর ভালবাসা অর্জন করেছিলেন। অকালে মৃত তাঁর স্বামী মৃত্যুসময়ে তাঁকে বলেছিলেন : "তুমি আমার কাছ থেকে যেও না। তোমাকে আমি বড় ভালবাসিতাম্, এখন তুমিই বা কোথায় রইলে, আর আমিই বা কোথায় চলিলাম।"[৫] কেশবচন্দ্রের পিতা প্যারীমোহন সেন প্রথম জীবনে মুৎসুদ্দীর কাজ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। প্রণয়োপহার স্বরূপ তখন সারদাসুন্দরীর হাতে থলে থলে নতুন পয়সা, সিকি, দুয়ানি ইত্যাদি দিয়ে লোকজনকে বিলিয়ে দিতে বলতেন, "এখন বিলাইতেছ না বটে, শেষে পাবে না, কেউ এমন করিয়া তোমায় দেবে না।"[৬] তখনকার মেয়েদের লেখাপড়ার চল বড় না থাকলেও প্যারীমোহন স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে উদার মত পোষণ করতেন। তাই "তিনি একান্ত ইচ্ছা করিতেন যে, আমি লেখাপড়া করি। অন্যত্র শিখিবার কোনও সুবিধা ছিল না বলিয়া তিনি নিজেই আমায় রাত্রিতে পড়াইতেন।"[৭] এছাড়াও "তিনি সবসময় আমায় উপদেশ দিতেন। বলিতেন, 'যাতে ভাল হও, তার জন্যে সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে। কখনও খুব চেঁচিয়ে হাসিও না, কাহারও সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা কহিও না ইত্যাদি। তিনি কখনও বেআব্রু ভালবাসিতেন না, এবং যাহাতে সর্বদা আব্রুতে থাকি সেইজন্য চেষ্টা করিতে উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন, 'যখন কোথাও যাই, তাহারা যখন তোমার সুখ্যাৎ করে শুনে বড় আহ্লাদ হয়।"[৮] সারদাসুন্দরীর জীবনী থেকে বোঝা যায় স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক প্রণয় গড়ে ওঠা কত কঠিন ছিল। কারণ, প্রায়শঃই বালিকাবধূ প্রণয়ের গভীরতা উপলব্ধি করার মতো পরিণতিবোধের অধিকারী হতেন না, আবার স্বামী যদিও বা বুঝতেন, পারিবারিক কাঠামো ও রীতিনীতি অক্ষুণ্ণ ও অপরিবর্তিত রাখার তাগিদকে তিনি তাঁর প্রণয়োপলব্ধির চেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতেন। তবে, সারদাসুন্দরী পরিণত বয়সে পৌঁছে

৩ কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা, ব্রাহ্মট্রাষ্ট সোসাইটি, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ, সম্পাদনা, যোগেন্দ্রনাথ খাস্তগীর, পৃ:পৃ: ২-৩।

৪ তদেব, পৃ: ৪।

৫ তদেব, পৃ: ২০।

৬ তদেব, পৃ: ১২।

৭ তদেব, পৃ: ১৩।

৮ তদেব, পৃ:পৃ: ১২-১৩।

এই অভাব উপলব্ধি করেছিলেন, এই উপলব্ধি তীক্ষ্ণতর হয়েছিল তাঁর অকালবৈধব্য, সন্তানশোক এবং শ্বশুরবাড়ীর লোকদের দুর্ব্যবহারে। তাই, তাঁর পৌত্র, শ্রী কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রী করুণা চন্দ্র সেন যখন নিজের চেয়ে বড় মোহিনী দেবীকে বিবাহ করতে চাইলেন তখন সারদাসুন্দরী তা সমর্থন করে অনুমতি দিলেন। "মোহিনী কেশবকে সাক্ষাৎ দেবতার মতন দেখিতেন, সেইজন্য তাহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, কেশবের পরিবারের সঙ্গে এক হয়, তাহার যে সম্বন্ধ এসেছিল,[৯] সেখানে বিবাহ করিলে সে রাজসুখে থাকিতে পারিত; কিন্তু মোহিনী তাহা তুচ্ছ করিয়া কেশবের সঙ্গে এক হইল। এই বিবাহে মোহিনীর বাবা, প্রতাপ প্রভৃতি সকলের অমত ছিল। কিন্তু মোহিনীর কেশবের প্রতি ভক্তি ও মোহিনীকে করুণার একান্ত বিবাহ করিবার ইচ্ছা দেখিয়া আমি, কেশব ও মহারাণী এই বিবাহ দিই।"[১০] এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে সারদাসুন্দরীর জবানবন্দী অনুযায়ী মোহিনী ও করুণাচন্দ্র যদিও পরস্পরকে মনোনীত করে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন তবুও মোহিনীর কাছে আসল উদ্দেশ্য ছিল তাঁর ভক্তিভাজন কেশবচন্দ্র সেনের পরিবারভুক্ত হওয়া। স্পষ্টতঃ, স্বামীর অপেক্ষা এখানে স্বামীর পরিবার বেশী গুরুত্ব পেয়েছে।

১৮৫০-এর দশক থেকে দাম্পত্য ও বিবাহিত জীবনের ক্ষেত্রে একটু একটু করে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আনন্দমোহন বর্ধন মহাশয় একজন সাধারণ লোক ছিলেন। তিনি "যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায় বঞ্চিত হইয়াছিলেন কিন্তু নবযুগের নব আদর্শ অনুসারে তিনি তাঁহার জীবন ও পরিবার গঠন করিয়াছিলেন। ...... আনন্দমোহনের স্বলিখিত জীবন-চরিতে তদানীন্তন সমাজের যে একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা উপেক্ষণীয় বিষয় নহে।"[১১] ১২৬৩ বঙ্গাব্দে ইংরাজী ১৮৫৬ সালে তিনি বিবাহিত হন, তখন তাঁর সপুত্রক জ্যাঠতুতো দিদি, মা ও ছোট ভাইদের নিয়ে বিরাট যৌথ পরিবার ছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে তা নানা অজুহাতে ভাঙ্গতে থাকে। ১২৮৫ বঙ্গাব্দে (১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে) আনন্দমোহনের জ্যাঠতুতো দিদির ছেলে, তার নিজস্ব পরিবার বৃদ্ধি হয়েছে এই কারণ দেখিয়ে পৃথগন্ন হল। ১২৯৩ বঙ্গাব্দে (১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে) আনন্দমোহনের ভাই মোহিনীমোহনও আলাদা হয়ে যান।[১২] এই ঘটনা দুটি উল্লেখের কারণ হল তখন থেকেই যৌথ পরিবার ভাঙতে শুরু করেছিল। এর তাৎপর্য কোনভাবেই খাটো করা যায় না, কারণ এই যৌথ পরিবার ভাঙা একক পরিবারগুলিতে স্বামী-স্ত্রী বেশী করে পরস্পরকে চিনবার সুযোগ পেয়েছিলেন, সেখানে তাঁরা পরস্পর ভাব বিনিময় করার অবকাশ পেতেন এবং স্ত্রী হবেন স্বামীর যোগ্য সঙ্গিনী এই ধারণা যে তখন গড়ে উঠছিল তা এই একক পরিবারগুলিতেই বাস্তবায়িত হবার অবকাশ পেয়েছিল।

৯ লাহোরের প্রসিদ্ধ সরদার দয়াল সিংহ, তদেব, পৃঃ ৯৫।

১০ তদেব, পৃঃ ৯৫-৯৬।

১১ স্বর্গীয় আনন্দমোহন বর্ধন মহাশয়ের জীবনের কতিপয় স্মৃতি, ত্রিপুরা ১৯২৭, পৃঃ ৯।

১২ তদেব, যত্রতত্র।

১২৬৩ বঙ্গাব্দ (১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে) ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের একটি পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চৌধুরী। তিনি নিজের জেদের বশে বিদ্যাশিক্ষা করেছিলেন কাকা মহেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থের কাছে। ১২ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বিক্রমপুরেরই একটি পল্লীগ্রামে যুবক শ্রী শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ডাক্তারির ছাত্র এই যুবকটির সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বিয়ের পর তিনি মেডিক্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সরকারী চাকরি গ্রহণ করেন। এই সময় ঢাকায় কর্মস্থলে তিনি তাঁর পত্নীকে নিয়ে আসেন। এইভাবে অন্নপূর্ণা ও শ্রীমন্ত পৃথক পরিবার স্থাপন করেন। পরে বগুড়া এসে স্বামীর উৎসাহে তিনি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই সময় শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় তাঁর বাড়ীতে "জাতীয়-সাহিত্য-সমিতি" প্রতিষ্ঠা করলে অন্নপূর্ণা সমসাময়িক পত্রপত্রিকা পাঠ করার সুযোগ পান ও এইভাবে নিজেকে আরো উন্নত করে তোলেন। স্বামীর সাহচর্যে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রেও ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। বিশেষ করে ধাত্রীবিদ্যায় তিনি পারদর্শী হয়েছিলেন। শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় পত্নীর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন যে রোগ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁর এতই জ্ঞান জন্মেছিল যে ডাক্তাররা তাঁর সঙ্গে আলাপ করে সুখ পেতেন।[১৩] নিজেকে উন্নত করার এই প্রয়াসের মধ্যেও অন্নপূর্ণা সাংসারিক কাজে কখনো অবহেলা করেননি। গৃহকাজ, রান্না, সন্তান পালন সবই তিনি একক পরিবারে একা হাতে সম্পন্ন করতেন। যে স্বামী তাঁর শিক্ষার জন্য এত যত্নবান ছিলেন, তাঁর প্রতি তাঁর ভক্তি ও আস্থার অন্ত ছিল না। শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় তাঁর উপর স্ত্রীর প্রভাবের কথা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে গেছেন। একবার তিনি পত্নীর কাছে "আপনার একটি দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কোন বুদ্ধিহীনা অভিমানিনী স্ত্রী হইলে হয়ত স্বামীর সেই দুর্ব্বল তার কথা শুনিয়া মুখভার ও মন খারাপ করিয়া বসিতেন।" কিন্তু অন্নপূর্ণা তা না করে বললেন যে তাঁর স্বামীকে যে ধর্ম্মহীন লঘুচিত্তের লোকেদের সঙ্গে মিশতে হয়, তার জন্য তাঁর অন্তর মলিন হয়ে তিনি হীনকার্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, "আমি অনুরোধ করি, ঐ সকল হীনচরিত্র মানুষের সঙ্গে আর মিশিও না। দুর্ব্বলতার মুহূর্তে ব্যাকুল চিত্তে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিও, তাহা হইলেই তুমি এই শত্রুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে।" শ্রীমন্তবাবু স্বয়ং এই বিষয়ে লিখেছেন : "অন্নপূর্ণার বাক্য আমাকে মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রত করিল। ..... এই সময় হইতে অন্নপূর্ণার জীবন আমার জীবনের উপরে গুরুভাবে কর্ত্তৃত্ব করিতে আরম্ভ করিল। কোন সময়ে কোন একটু অন্যায় কার্য্য করিলে তজ্জন্য তাঁহার মিষ্ট ভর্ৎসনার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিতাম না। .... অন্নপূর্ণার মধুর প্রকৃতির জন্য আমার গৃহ আনন্দের নিকেতন ছিল। বহু দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া গৃহে আসিয়াও তাঁহার অত্যল্প কালের ব্যবহারে সকল জ্বালা ভুলিয়া গিয়াছি।"[১৪] তাঁর জীবনীকার পরিশেষে মন্তব্য করেছেন : "ইহাকেই ত প্রকৃত ধর্মশীল পত্নীর কার্য্য বলা যাইতে পারে; নচেৎ যে স্ত্রীলোক স্বামীর কাছে গহনাখানি, ভাল জিনিসটি ও ভালবাসাটুকু পাইয়াই সুখী হন, কিন্তু স্বামীর সংগ্রামের সময়ে সাহায্য করিতে পারেন না,

১৩ অমৃতলাল গুপ্ত, পুণ্যবতী নারী, কলিকাতা ১৮৯৮, যত্রতত্র।

১৪ তদেব, পৃ: পৃ: ৮৩-৮৫।

বিপদের মুহূর্ত্তে বল দিতে পারেন না, দুর্ব্বলতার সময়ে শুধুই মান অভিমান ও অশ্রুসিক্ত নয়নের দ্বারা স্বামীর জীবন তিক্ত করিয়া তোলেন, সেরূপ পত্নীকে জীবনের সঙ্গিনী বলা যায় কি না সন্দেহ।"

১৮৫৬ সালের মে-জুন মাসে চব্বিশ পরগণা জেলার মাইহাটী পরগণাভুক্ত শ্রীপুর গ্রামে অঘোর কামিনী বসুর জন্ম হয়েছিল। ১৮৪৭ সালের জুলাই মাসে বহরমপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শ্রী প্রকাশচন্দ্র রায়। ১৮৬৪ সালে হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার পর ১৮৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মার্চ মাসে প্রকাশচন্দ্র দশমবর্ষীয়া অঘোর কামিনীকে বিবাহ করেন। নিজের জীবনকাহিনীতে প্রকাশচন্দ্র বলেছেন : "বিবাহের কথা বলিতে ভাল লাগে। কেননা বিবাহের সময় হইতেই আমার জীবনের স্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আমার বেশ স্মরণ আছে বিবাহের রাত্রে যখন তোমার হাতে আমার হাতে এক করিয়া দেওয়া হইল, তখন আমার মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে নিজের স্বভাব সংশোধন করিব এবং এই রমণীর উপযুক্ত হইব।"[১৫] ১৮৬৭ সালে প্রকাশচন্দ্রের সেজদাদা তাঁদের সমগ্র পরিবার নিয়ে কলিকাতার ভবানীপুরে এসে বাসা নিলেন, তখন প্রকাশচন্দ্র ও অঘোর কামিনীও সেখানে বাস করতে এলেন। সে সময়কার দাম্পত্য জীবনের ছবি এঁকেছেন প্রকাশচন্দ্র : "এই সময় তোমার নামে বাটীর সকলে অনেক নিন্দা করিত। বধূ শ্বশুরালয়ে আসিয়া প্রথম প্রথম যেরূপ নিন্দিত হন সেইরূপ নিন্দা। আমার কষ্ট হইত, আর ভাবিতাম, তোমার যা যা দোষ আছে মিষ্ট কথায় হয়তো সে সব ভাল করা যায়। এ সময়ে দিনের বেলা তোমার সঙ্গে দেখা হইত না। নিদ্রার কিঞ্চিৎ পূর্বে দেখা হইত। এরূপ অবস্থায় ভালবাসা জন্মিতে যে কতদিন লাগে তাহা বুঝিতেই পারিতেছ। তুমি একজন আর আমি একজন যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জীব হইয়া অবস্থিতি করিতাম।"[১৬] তখন প্রকাশচন্দ্রের মনে ধর্ম সম্বন্ধে দ্বিধাদ্বন্দ্ব চলছিল। এমতাবস্থায় তিনি এমন কোন মানুষ খুঁজছিলেন যার সঙ্গে তাঁর অস্থির মনের অবস্থা ভাগ করে নেওয়া চলতে পারত। কিন্তু একান্নবর্তী পরিবারে সেরকম কোন সুযোগ পাওয়া স্বপ্নাতীত ছিল। তাই প্রকাশচন্দ্র লিখেছেন : "ধর্ম্মবিষয়ে আমার মনে এইরূপ আন্দোলন চলিতেছিল। তোমার সঙ্গে তখনও এমন সম্বন্ধ হয় নাই যে তোমাকে আমার এ সকল সংগ্রামের অংশ দি। অপর দিকে তুমি তখনও নতুন বধূ; তোমার সম্বন্ধে তখনও আমার বিশেষ কোন অধিকার ছিল না। একান্নবর্তী পরিবারে যদি প্রেমের রাজত্ব না থাকে তাহা হইলে যে দশা হয়, আমাদের বাড়ীর দশাও তাহাই ছিল।"[১৭] প্রকাশচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার পর তাঁদের পক্ষে পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়েছিল। ইতিমধ্যে তাঁদের প্রথম কন্যা সন্তান সুসারবাসিনী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। "আমারও বয়স বাড়িয়া চলিয়াছে, পরিবারের মধ্যে অনুপার্জ্জক ভাইয়ের স্ত্রী বলিয়া ও ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ বলিয়া তোমার অবস্থাও প্রীতিকর নয়। এই সকল চিন্তা

---

১৫ শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র রায়, অঘোর প্রকাশ, মাঘোৎসব, ১১ই মাঘ, ১৩৬৪, কলিকাতা পৃ: পৃ: ৩-৪।

১৬ তদেব, পৃ: ৯-১০।

১৭ তদেব, পৃ: ১১।

মনকে আন্দোলিত করিতে লাগিল। তোমাকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে, লেখাপড়া শিখাইতে, আমার মন ব্যাকুল হইত, তাহার কোন উপায় দেখিতেছিলাম না।"[১৮] এই বিবরণ পড়লে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে নতুন ধরনের শিক্ষা ও চেতনা, তখনকার যুবকদের মনোরাজ্যে যে পরিবর্তন এনেছিল, তা তাঁরা পরিবারের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চাইতেন, তাঁরা চাইতেন তাদের এই নতুন মনোসম্পদ তাদের ঘনিষ্ঠ জনেরাও ভাগ করে নিক। এই চাওয়া থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল শূন্যতাবোধ, তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে তখনকার ঐতিহ্যিক একান্নবর্তী পারিবারিক পরিস্থিতিতে তাঁরা এমন কোন দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবেন না, যা তাঁদের যোগ্য জীবনসঙ্গিনীর অভাব পূর্ণ করতে পারে। এইভাবে তাঁরা নিজেদের পৃথক সংসার গড়ে তুলতে উৎসাহী হয়েছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে অনেকেই গোঁড়া হিন্দু পিতামাতার বিরাগভাজন হতেন। আবার ইংরাজী শিক্ষা লাভ করে অনেকেই পরিবারের থেকে দূরে গিয়ে চাকরি গ্রহণ করতেন। এভাবে শুরু হয়েছিল একক পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর অবাধ পরিচয় ও বোঝাপড়ার সুযোগ। আত্মীয়পরিজনহীন একক পরিবারে স্ত্রীই হতেন একমাত্র সহায়। সুতরাং, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এক নতুন সম্পর্কের সূত্রপাত হল, যা পারস্পরিক আদান-প্রদানের উপর ভিত্তি করে রচিত ছিল। অনেকক্ষেত্রেই বালিকাবধূকে স্বামী লেখাপড়া শিখিয়ে শিক্ষিতা করে তুলতেন স্ত্রীও এর প্রতিদানে যোগ্য সহধর্মিণী হয়ে ওঠার চেষ্টা করতেন। কারণ শ্বশুরগৃহের পরিবেশ প্রায়শঃই কোন বালিকাবধূর কাছে সুখকর হত না। প্রকাশচন্দ্রের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় : "১৮৭৩ সালের পূজার সময় বাটী গেলাম। বাটীতে গিয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হইলাম। দেখিলাম, আমি যে তখনও বাড়ীর খরচের কিছুই সাহায্য করিতে পারিতেছি না, ইহাতে সকলে অসন্তুষ্ট, কিন্তু কথা শুনিবার বেলা তোমাকেই শুনিতে হয়।... সকলেই বলিতে লাগিলেন এক ভাইয়ের উপার্জনে আর কত হইবে? একদিন আমার সম্মুখে এমন কিছু কথা বলা হইল, যাহাতে আমার বড় অপমান বোধ হইল, মনে বড় ব্যথা পাইলাম।" তাই স্বাভাবিকভাবে অঘোর কামিনীর ইচ্ছা হয়েছিল স্বাধীনভাবে নিজের সংসার করার। হরিনাভিতে প্রকাশচন্দ্র যখন দ্বিতীয় শিক্ষকের চাকরি পেলেন তখন তাঁর সে আশা পূর্ণ হল। সে সময় ঐ বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। এঁর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার দরুন প্রকাশচন্দ্র ও অঘোর কামিনী অত্যন্ত সুখী হলেন। এই সময় থেকেই তাঁদের যৌথ সংসারযাত্রা শুরু হল।

প্রকাশচন্দ্র রায়ের জবানবন্দীতে লেখা তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি বারংবার তাঁর স্ত্রীর অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু "স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্তের জীবনকথা" গ্রন্থে শ্রীমতী হরসুন্দরী নিজমুখে ব্যক্ত করেছেন কিভাবে তিনি সুখে-দুঃখে তাঁর স্বামীর পাশে থাকতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর স্বামী তাঁর কাছে যে ধরনের দাম্পত্য সাহচর্য আশা করেছিলেন তা হরসুন্দরীর কাছে লেখা একটি পত্রে তিনি ব্যক্ত করেছিলেন : "তোমার ভালবাসা ও তোমার সংযম দ্বারা আমার সুমতি জন্মাইও এবং নানা প্রলোভন হইতে আমাকে রক্ষা করিও, তবেই আমাদের পূর্ণ মিলন সুখের হইবে। দেখ, আমি একটি বিষয় মনস্থ করিয়াছি, তুমি আমি একপ্রাণ হইয়া

১৮ তদেব, পৃঃ ২২।

সৎকাজে ও সৎবিষয়ে ব্যাপৃত থাকিব, দুই জনে মিলিয়া লেখাপড়া করিব তখন, তোমার অন্তরে আর আমার অন্তরে কোন ব্যবধান থাকিবে না।"[১৯] হরসুন্দরী দত্ত তাঁর স্বামীর প্রত্যাশা পূরণ করেছিলেন "লোকে যেমন জলে ডুবিবার সময় হাতখানা তুলিয়া দিয়া বলে, আমাকে রক্ষা কর, তেমনি আমার স্বামীও ঋণে ডুবিয়া, আমার দিকে তাঁহার হাতখানা তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। বাস্তবিকই তাঁহা হইতে আমার মনের বল ও শক্তি বেশি ছিল, তাই আমি সাহস করিয়া, তাঁহার হাতখানা ধরিয়া, সংসারের নানা কষ্ট ও অভাবের ভিতর দিয়া, তাঁহাকে ঋণমুক্ত করিয়া, সন্তানদের মানুষ করিয়া ও তদুপায় এই বাড়ীখানা করিয়া আমি তাঁহার প্রত্যেকটী আশা পূরণ করিয়াছি। চিঠিগুলি বেশ করিয়া পড়িয়া দেখিলাম, তাঁহার কোন আশা অপূরণ রাখি নাই। তিনি আমার নিকট যাহা আশা করিয়াছিলেন, তাহার সবই পাইয়াছেন দেখিয়া, আমি সান্ত্বনা লাভ করিয়াছি। চিঠিগুলো পড়িয়া যদি দেখিতাম, তাঁহার একটি আশাও অপূরণ রহিয়াছে, তবে সান্ত্বনার বদলে আজ কি অনুতাপই হইত।"[২০] ১৮৫১ সালে শ্রীনাথ দত্তের জন্ম হয়েছিল, তাঁর পত্নী শ্রীমতী হরসুন্দরী দত্ত তাঁর থেকে সাত বছরের ছোট। হরসুন্দরীর সাত বছর বয়সে ও শ্রীনাথ দত্তের ১৪ বছর বয়সে তাঁদের বিবাহ হয়েছিল। ১৮৭১ সালে ২০ বছর বয়সে শ্রীনাথ বিলাত যাত্রা করেন, সেই সময় পরিবারের অমতে তিনি হরসুন্দরীকে বাড়ী থেকে বার করে নিয়ে এসে দুর্গামোহন দাসের বাড়ীতে তুলেছিলেন তারপর চার বছর হরসুন্দরী সেখানে থেকে উচ্চশিক্ষার্থী বিলাতবাসী স্বামীর উপযুক্ত হবার জন্য লেখাপড়া শিখতে থাকেন। এইভাবে মূল পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে তিনি ১৮৭৭ সাল থেকে স্বামীর কর্মোপলক্ষ্যে কখনো তেজপুর, কখনো কলিকাতা, কখনো ময়ূরভঞ্জ, কখনো কলিকাতা, কখনো কণিকা ইত্যাদি স্থান থেকে স্থানান্তরে বাস করেছিলেন। এই ভ্রাম্যমান জীবনে তাঁর আটটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল, দু-একটি সন্তান অকালমৃত হয়েছিল এবং শ্রীনাথ দত্তের বারংবার কর্ম পরিবর্তনজনিত কারণে অসীম দারিদ্র্যের মধ্যে সংসার চালিয়েছিলেন। এরপর যখন তাঁরা স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখেছিলেন, তখন বন্ধুরা বিস্মিত হয়েছিলেন। হরসুন্দরী লিখেছেন : "কিন্তু আমাদের কিভাবে সংগ্রাম করিয়া দরিদ্রতা দূর করিয়া মাথা তুলিতে হইয়াছিল, তাহা তিনি জানিতেন না এবং বন্ধুদের মধ্যেও কেহ তাহা জানেন না। ... বাস্তবিকই আমি আমার সন্তানদের সুখ-সুবিধা আগে দেখিতাম, তাহার পর স্বামীর, তাহার পর আমার। ... সন্তানেরা যে যা ভালবাসিত, তাহাকে তাহাই রান্না করিয়া দিতাম, স্বামী যাহা খাইতে ভালবাসিতেন তাঁহাকে তাহা দিতাম। এজন্য স্বামী অনেক সময় বলিতেন, 'দশ রকম রান্না করিয়া কষ্ট বাড়াও কেন?' আমার কিন্তু মনে হইত, এই রকমই যদি করিতে না পারিলাম তবে মা ও স্ত্রী হইয়া লাভ কি?"[২১]

দাম্পত্যের নতুন ধারণা অনুযায়ী স্বামী ও স্ত্রী যাবতীয় পার্থিব সুখ-দুঃখের সম অংশীদার এই আদর্শ শ্রীনাথ দত্ত ও হরসুন্দরীর দাম্পত্য জীবনে অনুসৃত হয়েছিল। সারদাসুন্দরী বা

১৯ হরসুন্দরী দত্ত, স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্তের জীবনকথা, কলিকাতা ১৯২২, পৃ: ২।

২০ তদেব, পৃ: ২-৩।

২১ তদেব, পৃ: ৫৪।

অঘোর কামিনী বা অন্নপূর্ণা তাঁরা সর্বতোভাবে স্বামী অনুগামিনী ছিলেন, সেই অর্থে তাঁরা যে কোন নতুন আদর্শ স্থাপন করেছিলেন তা নয়। হিন্দুধর্ম অনুসারে স্ত্রীকে সহধর্মিণী, সহকর্মিনী বলে অভিহিত করা হয়, কিন্তু হিন্দু সামাজিক জীবনে স্ত্রীর এই ভূমিকা দাম্পত্য সম্পর্কের গণ্ডী ছাড়িয়ে সমস্ত পরিবারে ব্যাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যখন নব্যশিক্ষিত যুব সম্প্রদায় নিজেদের ঐতিহ্যিক পারিবারিক সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না, তখন তাঁরা নিজস্ব পারিবারিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এই সময় তাঁদের বালিকাবধূদের শিক্ষিতা করে তুলে তাঁদের নিজেদের মতের অনুসারিণী করে তুলতে চেয়েছিলেন। শ্বশুরগৃহে নির্যাতিতা বধূরা অনেক সময়েই স্বামীর সঙ্গে বেরিয়ে এসে নতুন করে সংসার গঠন করতেন। কিন্তু কোন কোন সময়ে এই বালিকাবধূরা ঐতিহ্যিক পরিমণ্ডল ছেড়ে বেরিয়ে আসতে গিয়ে সংশয়াচ্ছন্ন হতেন, যেমন হয়েছিলেন স্বনামখ্যাতা কবি কামিনী রায়ের মা বামাসুন্দরী দেবী। ১৮৪৭ সালে বাখরগঞ্জ জেলার বাসণ্ডা গ্রামে তাঁর জন্ম হয়েছিল। সাত বছর বয়সে দশ বৎসর বয়স্ক একই গ্রামের বালক চণ্ডীচরণ সেনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। কামিনীর জন্মের কিছুদিন পূর্বে চণ্ডীচরণ তাঁর স্ত্রীকে এক পত্রে সন্তানের প্রতি মাতার কর্তব্য, মাতৃত্বের দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। তখন এই স্বাভাবিক কাজটিও কত গর্হিত বলে বিবেচিত হত তা বোঝা যায় এই ঘটনাটি থেকে। ঐ চিঠিটি গ্রামের ডাকঘর থেকে প্রাপকের বাড়ী না এসে গ্রামের কোন বিশিষ্ট লোকের হাতে পড়ল। "সে বাড়ীর লোকেরা উহা খুলিয়া পড়িয়া আমার পিতামহ দেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পুত্র বধূকে পত্র লিখিয়াছে দেখিয়া তিনি ম্রিয়মান হইলেন এবং পত্রখানি লইয়া তাঁহার বৈবাহিক, আমার মাতামহদেবের নিকট গেলেন। তিনিও জামাতার এই নির্লজ্জতার পরিচয় পাইয়া অপ্রতিভ হইলেন। চিঠিখানা পাইয়া বাড়ীতে একটা হুলুস্থুল ব্যাপার। যাঁহার নিকট আসিয়াছিল তাঁহাকে সেখানি দিবার আবশ্যকতা কেহ দেখিলেন না। বহুদিন পরে তিনি গোপনে চিঠিখানি খুঁজিয়া লইয়া পড়িয়া আবার পূর্ব্বস্থানে রাখিয়া দিয়াছিলেন।"[২২] শুধু যে মেয়েদের শ্বশুর গৃহে নানা ধরনের শারীরিক নির্যাতন সহ্য করতে হত তাই নয়। তাদের দাম্পত্য সম্পর্কেও এভাবে হস্তক্ষেপ চলত। চণ্ডীচরণ কলিকাতায় পড়তে গিয়েছিলেন এবং তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে পিতার পারলৌকিক কাজ করার অধিকার হারিয়েছিলেন। বামাসুন্দরী তাঁর শ্বশুরের ইচ্ছানুসারে তাঁর পারলৌকিক কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। ১৮৭১ সালে চণ্ডীচরণ সেন তাঁর স্ত্রীকে আনতে বাসণ্ডা গেলে গ্রামের লোকেরা বিধর্মীর নৌকা ঘাটে লাগাতে দিতে চাইল না। তখন চণ্ডীচরণ বলেছিলেন যে তাঁর স্ত্রী নিজমুখে তাঁকে ফিরে যেতে বলুন, তিনি ফিরে যাবেন। তখন, "দূর-সম্পর্কিত এক ভাগিনেয় ও একটি দেবরকে সঙ্গে লইয়া অবগুণ্ঠনাবৃতা মাতা ঠাকুরাণী নৌকার কাছে গেলেন। কিছুক্ষণ পতিপত্নীতে কথা হইল। তখন উপদেশ বা যুক্তিতর্কের সময় নয়। পতি বলিলেন—

২২ কামিনী রায়, স্বর্গীয় বামাসুন্দরী দেবী, বিচিত্রা, ভাদ্র, ১৩৩৭ অভিজিৎ সেন ও অভিজিৎ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ও সংকলিত, সেকেলে কথা : শতকের সূচনায় মেয়েদের স্মৃতিকথা, নয়া উদ্যোগ, কলিকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৭, পৃ: ৮৯।

'আমি একলা বড়ই কষ্টে আছি, তুমি এস।' পত্নীর হৃদয় গলিয়া গেল। তবু বলিলেন—'যদি আমার ধর্ম্মের উপর হাত না দেও আমি যাইতে পারি।' উত্তর পাইলেন, 'তোমার ধর্ম্মের উপর হাত দিব না, তুমি তোমার ধর্ম্মবিশ্বাস মত চলিবে।' এই বলিয়া পিতৃদেব মাতৃদেবীকে নৌকায় তুলিয়া লইলেন, সমবেত লোকদিগকে বলিলেন, 'আমার স্ত্রী আমার সহিত আসিতে প্রস্তুত; কন্যাদুটিকে পাঠাইয়া দিন।'[২৩] এই বামাসুন্দরী সকন্যা বরিশালে একক সংসারে বাস করতে এলেন। কিন্তু তিনি আগের মতই ধর্মাচরণ করতে লাগলেন, সন্ধ্যাহ্নিক, মাটির শিব গড়িয়ে পূজা করা, ব্রতনিয়ম সবই আগের মতো বজায় রইল। চণ্ডীচরণ স্ত্রীর ধর্মাচরণে বাধা না দিয়ে হাসতেন, অবশ্য ১৮৭২/৭৩ সনে তিনি পৌত্তলিকতার সকল সংস্রব একেবারে ত্যাগ করেন। বামাসুন্দরী তাঁর ধর্মবিশ্বাসে ঐতিহ্যানুসারী থেকেছিলেন কিন্তু স্বামীর সাহচর্য ত্যাগ করেননি। ঊনবিংশ শতকের সত্তরের দশকে তাঁর এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে দ্বারকানাথ ঠাকুরের পত্নী দিগম্বরী স্বামীর ধর্মত্যাগের কারণে তাঁর স্বামীর সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক ছেদ করেছিলেন। কৈলাসবাসিনী স্বামীর প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও ইংরাজদের সঙ্গে মেলামেশায় রাজী হননি কারণ হিন্দু পরিবারে স্বামীই তো সব নয়, আত্মীয়স্বজন পাড়াপ্রতিবেশী সকলকে নিয়ে থাকতে হবে। তাঁর যুক্তি ছিল এই যে তাঁর স্বামীর মতো কৃতবিদ্য ও ধনবান চার-পাঁচটি ছেলে থাকলে সমাজ তাঁদের ত্যাগ করতে ভয় পাবে, কিন্তু একমাত্র মেয়ে কুমুদিনীর বিয়ে দিতে গেলে সমাজ বাধা সৃষ্টি করতে পারে তাই তিনি হিন্দুয়ানি ত্যাগ করতে পারবেন না।[২৪] কিন্তু বামাসুন্দরীর কালে সময় অনেক এগিয়ে গিয়েছিল ঠিকই, তা সত্ত্বেও যেখানে স্বামীর চিঠি পড়তে দেওয়া হয় না, স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর সাক্ষাৎ করতে দিতে চায় না প্রতিবেশীরা, সেখানে ২১ বছরের একটি তরুণী মেয়ের পক্ষে পারিপার্শ্বিকতা ও জন্মস্থান ত্যাগ করে চলে আসা অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল। তবু স্বামীর আহ্বান উপেক্ষা করেননি বামাসুন্দরী, কিন্তু নিজস্বতা বজায় রেখেছিলেন।

ক্রমশঃ পৈতৃক পরিবার থেকে বেরিয়ে আসা আধুনিক দম্পতিরা পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পাচ্ছিলেন। এঁরা ক্রমশ সাহসী হয়ে উঠে সস্ত্রীক বহির্জগতে নিঃসঙ্কোচে চলাফেরা করতে পারছিলেন। ১৮৮১ সালে চট্টগ্রামের উকিল সাতকড়ি হালদার বিবাহ করেছিলেন প্রমোদিনীকে। তাঁদের জীবনধারা বেশ আধুনিক ছিল। ১৮৯১ সালে এঁরা কাঁথিতে বাস করতেন এবং স্বামীর হাত ধরে প্রমোদিনী সমুদ্রস্নান উপভোগ করতেন।[২৫] বেশ বোঝা যায় যে প্রমোদিনী পর্দার অন্তরালে থেকে আধুনিক স্বামীর সাহচর্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত না করার মানসিকতা অর্জন করেছিলেন। আধুনিক দাম্পত্য জীবনে কি এইভাবে পর্দাপ্রথার অবসান ঘটছিল? পরে যখন প্রমোদিনী সন্তানদের নিয়ে কলিকাতা থাকতেন তখন কর্মস্থলে থাকা স্বামীকে যে পত্র

২৩ তদেব, পৃঃ ৯২।

২৪ চিত্রাদেব, অন্তঃপুরের আত্মকথা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, সপ্তদশ মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪০০, পৃঃ পৃঃ ২৭-২৮।

২৫ শ্রী সাতকড়ি হালদার, পূর্বস্মৃতি, কলিকাতা, ১৮৯৯, পৃঃ ১০।

তিনি লিখতেন তাতেও আধুনিকতার ছোঁয়া পাওয়া যায়। যেমন, চিঠিতে তিনি সরাসরি স্বামীকে নাম ধরে "প্রিয় সাতকড়ি" এই বলে সম্বোধন করতেন ও নিজে নীচে স্বাক্ষর করতেন "তোমারই প্রমোদিনী" বলে। এই বিশেষত্বহীন পত্রগুলির ছত্রে ছত্রে তাঁদের দাম্পত্য নৈকট্যের পরিচয় পাওয়া যায় যা দূরে থেকেও ম্লান হয়নি। মনে পড়ে ১৮৭০-এর দশকে বামাসুন্দরী স্বামীর লেখা পত্র হাতে পাননি, অনেক পরে, তিনি লুকিয়ে সেই চিঠি পড়েছিলেন ও যে জায়গায় চিঠি পেয়েছিলেন সেই জায়গাতেই রেখে দিয়েছিলেন। তখন ঐ চিঠির আর কোন প্রাসঙ্গিকতা ছিল না। মাত্র দুই দশকের মধ্যে বাঙ্গালী দম্পতিরা নিয়মিত পত্রালাপ করতেন। এর থেকে আরো বোঝা যায় যে মেয়েরা প্রয়োজন বোধে সন্তানসহ একলা দিনযাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রমোদিনীর পত্রাবলি থেকে জানা যায় যে তিনি কলিকাতায় ছেলেদের নিয়ে বাস করতেন যখন তাঁর স্বামী কর্মস্থলে থাকতেন। আবার, ছেলেদের লেখাপড়া হচ্ছে না দেখে তিনি অনায়াসে স্বামীর কাছে তাদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর তিনি নিয়মিত ছেলেদের কাছেও চিঠি লিখতেন। প্রমোদিনী দূরে থেকেও পরিবারেব সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখার মতো কুশলতা আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন।

১৮৮১ সালে রাজনারায়ণ বসুর কন্যা লীলাবতীর বিবাহ হয় কৃষ্ণকুমার মিত্রের সঙ্গে। বিবাহের অব্যবহিত পরেই তিনি বিবাহ প্রতিজ্ঞা সাধন ব্রত অবলম্বন করেন। এই ব্রতের উদ্দেশ্য ছিল স্বামীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভালবাসার পাত্রী হওয়া, আত্মত্যাগী হয়ে শ্বশুরকুলের সর্বপ্রকার কল্যাণ করা এবং ঈশ্বরপরায়ণ সন্তানের জননী হওয়া। লীলাবতী প্রতি বৎসর বিবাহের সাম্বৎসরিক দিনে উদ্বাহ প্রতিজ্ঞা কতদূর সাধন করা হয়েছে গভীরভাবে তার আলোচনা করতেন এবং অসম্পূর্ণ কর্তব্য যাতে সমাপন করতে পারেন তার জন্য ঈশ্বরের কাছে শক্তি ভিক্ষা করতেন।[২৬] লীলাবতীর বিবাহের মধ্যে দিয়ে আবার সেই পুরানো দিনের সুর শোনা যাচ্ছিল, যখন শুধু স্বামী নয় বিবাহিতা মেয়েদের জীবনে সমধিক গুরুত্ব পেত শ্বশুরগৃহের পরিজনেরা। এর কারণ কি এই যে ৮০-র দশক থেকে ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের ব্যাপক প্রসার হতে শুরু করেছিল, ভারত আবার তার প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে গৌরব আহরণ করছিল এবং পারিবারিক জীবনেও তার প্রভাব পড়েছিল? রাজনারায়ণ বসুর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল রক্ষণশীল, কন্যার শ্বশুরগৃহে যাত্রার প্রাক্কালে তিনি বলেছিলেন,

"আমাদের আশীর্ব্বাদ নিয়ে তুই যারে
এক পরিবার হতে অন্য পরিবারে।
সুখ শান্তি নিয়ে যাস তোর পাছে পাছে
দুঃখ জ্বালা রেখে যাস আমাদের কাছে।"[২৭]

২৬ লীলাবতী মিত্র, আখ্যাপত্র বিনষ্ট পৃঃ পৃ· ১১-১৪।
২৭ তদেব, পৃঃ ১৩।

এখানে লীলাবতীকে স্বামীর কাছে পাঠানো হচ্ছে না। পিতার পরিবার থেকে তিনি শ্বশুরের পরিবারে প্রেরিত হচ্ছেন। যে বইটির প্রসঙ্গ দিয়ে এই আলোচনা শুরু হয়েছিল সেই "গৃহলক্ষ্মী" এই সময় প্রকাশিত হয়েছিল। এর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল কিভাবে মেয়েরা শ্বশুরগৃহে উন্নতি আনবে। এখানে রাজনারায়ণও মেয়েকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন লীলাবতী যেন সুখ ও শান্তির বাহক হন।

১৮৮৯ সালে কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা পনের বছরের কিশোরী সুচারুর বিবাহের প্রাথমিক প্রস্তাব অনুষ্ঠান সংঘটিত হয়। পাত্র উড়িষ্যার শ্রেষ্ঠ দেশীয় রাজ্য ময়ূরভঞ্জের মহারাজা শ্রী রামচন্দ্র, বয়স তখন ১৮ বছর। কিন্তু মহারাজার রক্ষণশীল আত্মীয়স্বজনরা আপত্তি জানালেন এই মর্মে যে কন্যা স্বজাতীয়া নয়, তার ওপর ভিন্নধর্মীয়া এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। তরুণ মহারাজা এই বাধা অতিক্রম করতে অপরাগ হলেন। তাঁকে উচ্চশিক্ষার অজুহাতে একরকম জোর করে বিলাত পাঠিয়ে দেওয়া হল। বিলাত থেকে ফিরে আসার সাত বছর বাদে সুচারু দেবীকে বাতিল করে আত্মীয়দের অনুরোধে তাঁকে তাঁদের নির্বাচিত উড়িষ্যার এক কন্যাকে বিবাহ করতে হল। কিন্তু সুচারু তাও মহারাজের প্রতি তাঁর অনুরাগ বজায় রাখলেন। বিবাহের সাত বছর পরে মহারাজের প্রথমা পত্নীর জীবনাবসান হল, মহারাজা পুনরায় সুচারুর পাণিপ্রার্থী হলেন, ১৯০৩ সালে তিনি বিবাহ প্রস্তাব জানালেন। ১৯০৪ সালের ২০শে মে সুচারুর বিবাহ প্রস্তাব সম্পন্ন হল। মহারাজের প্রথম পক্ষের দুই পুত্র পূর্ণচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্রকে সুচারু মাতৃস্নেহে মানুষ করেছিলেন, ১৯০৮ সালে তাঁর পুত্র ধ্রুবেন্দ্র ও ১৯১০ সালে কন্যা জয়তীর জন্ম হয়েছিল। কিন্তু মহারাজ তাঁর জীবদ্দশায় কোনদিন সুচারুকে ময়ূরভঞ্জে নিয়ে যাননি আত্মীয় বিরোধের আশঙ্কায়। মহারাজার মৃত্যুর বহু পরে পুত্র ধ্রুবেন্দ্র তাঁর মাকে নিয়ে ময়ূরভঞ্জে যান।[২৮] 'মহারাণী' এই অভিধা লাভ করার জন্য সুচারুকে অনেকখানি নত হতে হয়েছিল যা তাঁর আত্মমর্যাদার প্রতি সুবিচার করেনি। তাঁর জীবনীকার এই আত্মমর্যাদার হননকে ভারতবর্ষের প্রাচীনকালের আদর্শ রমণীদের উদাহরণ দিয়ে আবৃত করতে চেয়েছেন। মহারাজ অন্যত্র বিবাহ করছেন "এই সংবাদ প্রাপ্তির পরও মহারাজার প্রতি অনুরাগিণী হয়ে থাকা, সুদীর্ঘকাল নির্বাসিতার মত জীবন যাপন, সুদৃঢ় নিষ্ঠা ও পুণ্যের মধ্য দিয়ে কাল কাটানো এ শুধু ব্রহ্মানন্দ কন্যা এবং সীতা-সাবিত্রী-অরুন্ধতীর আদর্শে প্রতিপালিতা ভারত রমণীর পক্ষেই সম্ভব।"[২৯] কিন্তু এই আদর্শ দিয়ে এই তথ্য নাকচ করা যায় না যে সুচারু যখন বিবাহ না করে মহারাজার জন্য প্রতীক্ষা করেছেন তখন মহারাজা বিবাহ করে দুটি সন্তানের জনক হয়েছেন। এই বালক দুটির উপস্থিতি তাঁর বিবাহিত জীবনকে বিড়ম্বিত করতে পারে — এ আশঙ্কা সুচারুর মনে ছিল, তা বোঝা যায় তাঁকে লেখা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ হেমলতা ঠাকুরের চিঠি থেকে। হেমলতা তাঁর প্রাণের বন্ধু সুচারুকে লিখলেন : "ছেলেরা তোমারই, তুমিই তাদের মা, তোমার মত তাদের আর কে ভালবাসবে? তোমার মত ভালবাসার আর কে আছে? তুমি রাজরাণী, ময়ূরভঞ্জে

২৮ প্রভাত বসু, মহারাণী সুচারু দেবীর জীবন কাহিনী, কলিকাতা ১৯৬২, যত্রতত্র।

২৯ তদেব, পৃ: ৭০।

গিয়ে ছেলের বৌ কোলে করে তুলে নেবে, বারাণসী শাড়ী পরে ছেলে-বৌ একসঙ্গে কোলে নিয়ে বসবে — তোমার জীবনে দয়াময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হবে, তোমার জীবনের পার্থিব লীলা শেষ হবে। পরে আধ্যাত্মিক জীবনের লীলা প্রকাশ হবে।"[৩০] এই সান্ত্বনা সুচারুর দাম্পত্য জীবনের ব্যর্থতাকে রোধ করতে পারেনি। মহারাজের জীবদ্দশায় তিনি কোন দিন ময়ূরভঞ্জ যেতে পারতেন না। সুচারুর ছোট বোন সুজাতার চিঠির সঙ্গে অনেক সময় তাঁর চিঠি থাকত। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে বিবাহের পর অনেক সময়ই স্ত্রীকে ছেড়ে স্বামী বাইরে থাকছেন সাধারণতঃ দু'ধরনের পরিস্থিতিতে। স্বামী তখনো ছাত্র। তিনি শিক্ষার্থে বাইরে আছেন তখন স্ত্রী থাকতেন শ্বশুরগৃহে, হয়তো সেখানে তিনি থাকতেন অনাদৃতা, অত্যাচারিতা, কিন্তু তাঁর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে কোন প্রশ্ন থাকত না। বরঞ্চ শ্বশুরবাড়ীর অভিভাবকরা বধূকে পিত্রালয়ে পাঠাতে যথেষ্ট আপত্তি জানাতেন। দাম্পত্য ক্ষেত্রে নতুন হাওয়া বইতে শুরু করলেও অনেক সময় এমনকি একক পরিবার গঠনের পরেও স্বামীকে কর্মোপলক্ষ্যে বাইরে যেতে ও থাকতে হত। সেখানে স্ত্রী একা থাকতেন পুত্রকন্যাদের নিয়ে। যেমন হরসুন্দরী দত্ত আসামের চা বাগানের গভীর জঙ্গলের মধ্যে ছেলেমেয়ে নিয়ে বিপদের মধ্যে কাঁচা ঘরে বসবাস করতেন। প্রমোদিনী হালদারও ছেলেদের নিয়ে কলিকাতায় বাস করতেন একা, আবার ছেলেদের পড়াশোনার খাতিরে তাদের বাবার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রমোদিনী বা হরসুন্দরীর ক্ষেত্রে যা ছিল তাঁদের পারিবারিক কর্তব্য পালন, সুচারুর ক্ষেত্রে তা হয়ে উঠেছিল অপমান। কারণ, তাঁর শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়স্বজন তাঁকে কোনদিনই স্বীকৃতি দেননি, তাঁর স্বামী তাঁর ভালোবাসাকে স্বীকার করেছিলেন কিন্তু আত্মসমর্পণ করেছিলেন আত্মীয়স্বজনের চাপের কাছে। সুতরাং বিংশ শতকের গোড়ার দিকে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মাঝে অনেক ফাঁক রয়ে গিয়েছিল, প্রবল প্রতাপান্বিত আত্মীয়রা ইচ্ছা করলে তখনও অনায়াসে দাম্পত্য সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করতেন। বিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদী জোয়ারে ভারতের প্রাচীনা আদর্শ নারীদের নাম বারবার উঠে আসছিল। এঁদের উদাহরণ দেখিয়ে ও এঁদের সাথে তুলনা করে মেয়েদের বঞ্চনাকে আত্মত্যাগের আভরণ দেওয়া হচ্ছিল। সমসাময়িক এক কবির লেখা থেকে তা স্পষ্টতর হবে :

"সতীর মতন পতির যশেরে
জেনো প্রাণ হতে প্রিয়,
উমার মত কামনা দহিয়া
তপে তারে বরে নিও।
সুরধুনী সম বীর তনয়েরে
আদরে বক্ষে ধরো,
ভদ্রার মত জীবন সমরে
সারথীর কাজ করো।

৩০ তদেব পৃ:পৃ: ৭৩-৭৪ পাদটীকা।

দুঃখ বিপদে জানকী সমান,
সম্পদে হয়ো রমা,
চিরদিন ভার বয়ো সবাকার,
ধৈর্য্যে বসুধা সমা।
অরুন্ধতী সম হও সেবাব্রতে,
মৈত্রেয়ী সম জ্ঞানে.
উর্ম্মিলা সম আপনার হ'তে
প্রিয় স্বামী ধন দানে।
চিন্তার মত জীবন তরণী
পরশে মুক্তি পাক,
সাবিত্রী সম তেজেতে জ্বলিয়া
মরণ পুড়িয়া যাক।
মায়ের মত পালিও সমাজে,
ভগিনী সমান পরে,
কন্যার মত গুরুজন পদে
বিকায়ো দুইটি করে।
আলস্য লালসা সতীর ঘৃণ্য।
চরণের তলে রোক
নারীর সরম, রতন পরম,
শিরের ভূষণ হোক্
ত্যাগে তব ভোগবিলাস তোমার
আপনার বলিদানে,
এই উপদেশ চিরদিন যেন জেগে থাকে তব মনে।[৩১]

সুচারুর জীবন প্রত্যক্ষ করে যেন এই কবিতাটি লেখা হয়েছিল। জাতীয়তাবাদী আবেগ তখন আবার বাঙ্গালি জীবনকে রক্ষণশীলতার দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল। ১৮৭৮ সালে সুনীতির বিয়ের পর থেকেই কেশব গোষ্ঠী রক্ষণশীল হয়ে উঠেছিল, সুচারুর বিয়ের সময় কেশবচন্দ্র বা তাঁর পত্নী জগন্মোহিনী কেউই বেঁচে ছিলেন না। তাই হয়তো সুচারু সাহসী হয়ে উঠতে

৩১ শ্রী অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ, উপহার, সিটি বুক সোসাইটি, কলিকাতা ১৩১৮, পৃ:পৃ: ৩৮-৩৯।

পারেননি, অথচ তাঁর আগে তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট মেয়েরা নিষেধের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে সাহসী হয়ে উঠতে পেরেছিল। তবে, এ কথাও অনস্বীকার্য যে সাহসী মেয়েরা স্বামীর সমর্থন ও সহায়তা পেয়েছিলেন। কিন্তু সুচারু সেই সৌভাগ্যে বঞ্চিতা ছিলেন।

সুচারুর জীবন একদিক দিয়ে দেখতে গেলে ব্যতিক্রমী। কারণ তথাকথিত আধুনিক বা পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং পারিপার্শ্বিকতা কোনটার অভাবই তাঁর বা স্বামীর ক্ষেত্রে ছিল না। কিন্তু তবুও রক্ষণশীলতাকে কাটিয়ে ওঠা এতই কঠিন ছিল যে সুচারু দাম্পত্য জীবনে পরিপূর্ণভাবে সার্থক হতে পারেননি, অথচ এ কথাও বলা যাবে না যে তাঁর জীবনে স্বামী-সন্তান লাভ ঘটেনি। কাজেই অনুমান করা আদৌ কঠিন নয় যে যেসমস্ত বাল্যবিধবারা নামমাত্র বিবাহিত হয়ে দাম্পত্য সুখের কোন আস্বাদন পেতেন না অথচ ইহজীবনে আর পুনরায় তা লাভ করাও সম্ভব ছিল না, তাঁরা কি দুঃসহ জীবন যাপন করতেন। এঁদের দাম্পত্যের অধিকার ফিরিয়ে দেবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন বিদ্যাসাগর।

দাম্পত্যছিন্ন রমণীর কথা

প্রধানত বিদ্যাসাগরের একক প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই বিধবা পুনর্বিবাহ আইন পাশ হল। এই আন্দোলনকে সার্থক করে তুলতে বিদ্যাসাগর কিভাবে তাঁর অর্থ, খ্যাতি এমনকি জীবনসুদ্ধ বন্ধক রেখেছিলেন তা বোঝা যাবে ১৮৭০ সালের ১১ই আগষ্ট তাঁর পুত্র নারায়ণচন্দ্রের ভবসুন্দরী নামে এক ব্রাহ্মণ বিধবাকে বিবাহ করার ঘটনা থেকে। বিদ্যাসাগরের ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় এই বিয়েতে আপত্তি জানিয়ে তাঁকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তিনি তার উত্তরে জানালেন—"আমি বিধবা বিবাহের প্রবর্ত্তক। ... নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে ... এ বিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি। সে বিবেচনায় কুটুম্ববিচ্ছেদ অতি সামান্য কথা। ... সমাজের ভয়ে বা অন্য কোন কারণে নারায়ণের সহিত আহার ব্যবহার করিতে যাঁহাদের সাহস বা প্রবৃত্তি না হইবেক, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে তাহা রহিত করিবেন, সেজন্য নারায়ণ কিছু মাত্র দুঃখিত হইবেক, এরূপ বোধ হয় না এবং আমিও তজ্জন্য বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইব না।"[৩২] এই কাজের জন্য বিদ্যাসাগর নারীকুলের মুক্তিদাতা বলে গণ্য হলেন।

বিধবাদের অবস্থার অপরিবর্তন

বিধবাদের পুনর্বিবাহ আইন পাশ হবার এক দশকেরও বেশী সময় পরে স্বয়ং বিদ্যাসাগরের পুত্রকে বিধবাবিবাহ করার জন্য আত্মীয়বিরোধ ও সামাজিক নির্বাসনের ঝুঁকি নিতে হচ্ছে—এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে বিধবাদের পুনর্বিবাহ সমাজে বহুল প্রচার লাভ করেনি।

প্যারীচাঁদ মিত্র বিদ্যাসাগরের প্রয়াসের সমালোচনা করে বলেছিলেন যে আইনের পথে বিধবাদের অবস্থার উন্নতি সম্ভব নয়। বালবিধবাদের আর সংসারে কোন প্রয়োজনীয়তা থাকত না, তাদের সামাজিকভাবে মৃত্যু ঘটত। এই ভয়ানক নারী অবমাননা সমাজের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করে দিত। এই অবস্থার নিরসনে প্রয়োজন ছিল স্বাভাবিক সংস্কার, যা শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে সমাজের মধ্য থেকে জন্ম নেবে।[৩৩]

কিন্তু ১৮৭১ সালে এই প্যারীচাঁদ মিত্র যখন টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে "অভেদী" উপন্যাস[৩৪] লিখলেন তাতে তিনিও কিন্তু বিধবাবিবাহ সমর্থন করলেন না। ঐ উপন্যাসে বাবুসাহেব সরলা বলে এক বিধবাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন। শ্যামা নাপিতিনীকে এই বিষয়ে ঘটকালি করতে অনুরোধ করলে সে জিভ কেটে বলেছিল যে সরলা অতি নিষ্ঠাবতী বিধবা। সে জপ আহ্নিক, পূজাপাঠ করে একমুঠো আহার গ্রহণ করে। তবে আরো অন্য বিধবা আছে যারা

৩২ বিহারীলাল সরদার, *বিদ্যাসাগর,* সম্পাদনা, প্রহ্লাদ কুমার প্রামাণিক, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা-৭৩, ১৯৯১ পৃ: ২৯৫-২৯৭।

৩৩ Chittabrata Palit—*New Viewpoints on Nineteenth Century Bengal,* Progressive Publishers, Kolkata 700 073, September 1980, পৃ: ১২০-১২৪।

৩৪ শ্রী টেকচাঁদ ঠাকুর, *অভেদী,* ১৮৭১ প্রথম সংস্করণ।

বাড়ী বাড়ী হাসি তামাশা খেলা করে বেড়ায়, তাদের বললেই তারা বিয়ে করবে।[৩৫]

স্পষ্টত প্যারীচাঁদ বাঙালী বিধবা রমণীদের দুইভাগে ভাগ করেছেন। তাঁর মতে নিষ্ঠাবতী বিধবাদের বিয়ের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ক্রীড়াপ্রিয় কৌতুকময়ী বিধবাদের বিবাহ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

যেখানে প্যারীচাঁদের মত কট্টর ইয়ং বেঙ্গলও বিধবাবিবাহ নিঃশর্তে সমর্থন করতে পারছেন না, সেখানে বিধবাদের যে কি দুর্দশা ও অবমাননায় পড়তে হত তার একটি মর্মস্পর্শী ছবি পাওয়া যায় নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের লীলা উপন্যাসে।[৩৬] ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত এই উপন্যাসটিতে যে লীলাবতীর বর্ণনা পাওয়া যায় সে ছিল সুন্দরী ও শ্বশুরগৃহে পরম আদৃতা বধূ। কিন্তু সেই লীলাই যখন চৌদ্দবছর বয়সে বিধবা হল তখন শাশুড়ী তাকে "ডাইনী, পোড়াকপালী, সর্ব্বনাশী" ইত্যাদি শিরোপা দিল। লীলা আগে ছিল ঘরের লক্ষ্মী, এখন সকলেই তাকে হতশ্রদ্ধা করে, খোঁটা দেয়, প্রায় দূর ছাই করে।[৩৭]

১৮৪৯ সালে রাজসাহী জেলার পুঠিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শরৎসুন্দরী দেবী। পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় জমিদার যোগেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে। বার বৎসর সাত মাস বয়সে তাঁর বৈধব্য ঘটে। শরৎসুন্দরী ছিলেন মৃদুস্বভাবা ও স্বল্পভাষিণী। এজন্যে ধনবতী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বৈধব্য জীবন হয়ে উঠেছিল অতি করুণ। অল্পবয়স্কা ও অভিভাবকহীন বিধবার প্রতি পাছে কেউ কুদৃষ্টিপাত করে তাই তাঁর স্বামীর প্রাচীন কর্মচারীরা তাঁকে পিত্রালয়ে অসুস্থ মাতার কাছে যেতে পর্যন্ত দিতে চাননি। কারণ তাঁর পিত্রালয়ের ভগ্ন প্রাচীরের মধ্য দিয়ে অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণ দেখা যায়। তাই "অদ্য এই সামান্য বিষয়ে আপনার স্বেচ্ছাচার দমন করিতে না পারিলে ভবিষ্যতেব জন্যে আপনার হৃদয়ের এক আবরণ ধ্বংস হইবে। সুতরাং তদ্দ্বারা আপনার ভবিষ্যজীবনের গুরুতর অনিষ্ট হইতে পারে।"[৩৮]

শরৎসুন্দরীর কর্মচারীদের আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না বামাসুন্দরীর জীবন[৩৯] থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৩৬ সালে বামাসুন্দরীর জন্ম হয়েছিল। ১৮৪৪ সালে বিবাহ হয়ে ১৮৪৮ সালে অর্থাৎ মাত্র বার বছর বয়সে তিনি বিধবা হন। "অকস্মাৎ তাঁহার জীবনকে বৈধব্য ও যৌবন যুগপৎ আক্রমণ করিল। অবলা কুলবালার পক্ষে এই পরাক্রান্ত দুই অরাতির কোন একের আক্রমণে আত্মরক্ষাই দুঃসাধ্য, তাহাতে একেবারে দুই প্রবল রিপুর প্রতিকূলে তাঁহাকে দণ্ডায়মান হইতে হইল।[৪০]

৩৫ *অভেদী*, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৯-৬১।
৩৬ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, *লীলা*, প্রকাশিত ভারতী পত্রিকা, সম্পাঃ স্বর্ণকুমারী দেবী, বৈশাখ ১৮৮৪।
৩৭ তদেব, পৃঃ ৪৭-৪৯।
৩৮ *মহারানী শরৎসুন্দরীর জীবন চরিত* — শ্রী গিরীশ চন্দ্র লাহিড়ী কর্তৃক সংকলিত, পৃঃ ৮১-৮২।
৩৯ শ্রদ্ধেয়া বামাসুন্দরী দেবীর জীবনকথা, *বামাচরিত*, ঢাকা, শ্রাবণ, ১৩১০ বঙ্গাব্দ, যত্রতত্র।
৪০ তদেব।

বামাসুন্দরীর অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে বাল্যবিধবাদের জীবন কতখানি নিরাপত্তাহীন ছিল। অতি পরিচিত কবিরাজ অসুস্থ বামাসুন্দরীর একাকীত্বের সুযোগ নিয়ে তাঁর শ্লীলতাহানি করতে উদ্যত হয়েছিলেন। আরেকদিন রাত্রির অন্ধকারে তাঁর নিজের ঘরে গ্রামের এক যুবক তাঁকে আক্রমণ করেছিল।[৪১] দুবারই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও তেজস্বিতা তাঁকে রক্ষা করেছিল।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের এইসব তথ্য বামাসুন্দরীর জীবনকথায় বিধৃত হয়ে ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।[৪২] এই গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে বিধবাদের যে ছবি পাওয়া যায় তাতে বোঝা যায় যে শতাব্দীর শেষভাগেও বিধবাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। উৎসর্গ-পত্রটি এবকম—

"পিতা পতি সুত তিন নারীর আশ্রয়
এ তিন বিহনে নারী দীনা নিরাশ্রয়
অবলার গতি পতি যৌবনে জীবন
হেন পতি অভাবেতে জীবন মরণ।
বঙ্গীয় বাল্যবিধবা দীপ্ত হুতাশন
দরশনে দর্শকের দহে প্রাণমন।"[৪৩]

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকেও অবস্থা অপরিবর্তিত ছিল। ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল *Milly Cattle*-এর হিন্দুনারীদের জীবন নিয়ে রচিত গ্রন্থ।[৪৪] এই গ্রন্থে লেখিকা সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে হিন্দুবিধবাদের কাছে মৃত্যু পরম কাম্য ছিল। অথচ আক্ষেপ এই যে তাঁদের কাছে মৃত্যু সহজে ধরা দেয় না।[৪৫]

বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসেও অবলাবান্ধব গ্রন্থ[৪৬] পতিপুত্রবতী সৌভাগ্যশালিনী সধবা রমণীদের উপদেশ দিচ্ছে যেন পতিপুত্রহীনা সর্বস্বহারানো বিধবাদের প্রতি সর্বদা সদ্ব্যবহার করা হয়। আবার একই সঙ্গে একথাও বলা হচ্ছে যে বিধবাদের ব্রহ্মচর্য পালনে যত সুখ এত আর কিছুতে নেই।

দেখা যাচ্ছে যে বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বিধবা রমণীদের সামাজিক অবস্থা ও অবস্থানের কিছুমাত্র মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। এক্ষেত্রে ধনী শরৎসুন্দরী, সম্পন্ন মধ্যবিত্ত বামাসুন্দরী ও দরিদ্র লীলাবতীর অবস্থার মধ্যে খুব কিছু পার্থক্য ছিল না।

---

৪১ তদেব।

৪২ তদেব।

৪৩ তদেব, উৎসর্গ পত্র।

৪৪ Milly Cattle, ***Behind the Purdah***, The Lives and Legends of Our Hindu Sisters — Thacker, Spinks and Company, Kolkata and Simla, 1916.

৪৫ তদেব পৃ: ৮১।

৪৬ *অবলাবান্ধব* — প্রকাশকাল ১৯৪৯।

ব্রাহ্মসমাজের আলোর হাতছানি

ব্রহ্মসমাজের যুবকরা বৈধব্যাবস্থায় পতিত মহিলাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁরা বিধবাদের অবস্থার উন্নতির জন্য অনেক সময়েই সক্রিয় হতেন। এখানে বামাসুন্দরীর[৪৭] উদাহরণ দেওয়া চলতে পারে। আগেই বলা হয়েছে যে তিনি তাঁর নিকটস্থ লোকের দ্বারাই আক্রান্ত হয়েছিলেন। এ ধরনের ঘটনা নিশ্চয়ই তাঁর মনে এমন হতাশার জন্ম দিয়েছিল যে তিনি কোন-না-কোন ভাবে মুক্তির উপায় খুঁজছিলেন। এই সময় তাঁর ভ্রাতা ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এভাবে বামাসুন্দরীও ব্রাহ্মধর্মের সংস্পর্শে এলেন। ব্রাহ্ম-পুস্তক পড়বার জন্য তিনি লেখাপড়া শিখলেন শুধু তাই নয়, তিনি নিয়মিত ব্রহ্মোপাসনায় যোগ দিতে লাগলেন আর কলিকাতায় এসে ব্রাহ্ম উৎসবে অংশগ্রহণ শুরু করলেন।

কিন্তু বামাসুন্দরী কখনো হিন্দু বিধবাদের আচার-নিষ্ঠা ত্যাগ করেননি। এর দুটি উদাহরণ দেওয়া যায়। একবার মাঘোৎসবের সময় একাদশীর ব্রত পড়েছিল। কেশবচন্দ্রের স্ত্রী নিজ হাতে তাঁকে রান্না করে খাইয়ে একাদশীর উপবাসভঙ্গ করিয়েছিলেন। চট্টগ্রাম থেকে কলিকাতায় আসার পথে জাহাজে তিনি কখনো জলগ্রহণ করতেন না।[৪৮]

বামাসুন্দরীর জীবনে হিন্দুধর্মের কুসংস্কার ও ব্রাহ্মধর্মের আদর্শের টানাপোড়েন ছিল। হিন্দুবিধবার আচরণবিধি পালন করার ফলে তিনি তাঁর হিন্দু আত্মীয়স্বজনের কাছে তাঁর গ্রহণ-যোগ্যতা হারাননি। অন্যদিকে ব্রাহ্মধর্মের সংস্পর্শ তাঁকে উদার ও পরোপকারব্রতী করে তুলেছিল। তাই আত্মীয়স্বজনের বিপদে-আপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে তিনি তাঁদের বিপন্মুক্তি পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠা ভগিনী লিখেছিলেন—'তাঁহাকে হারাইয়া আমরা যেন উপযুক্ত ভ্রাতা ও অভিভাবক হারাইয়াছি।'[৪৯]

ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী শ্রীনাথ চন্দ্রের (জন্ম ১৮৫১) কনিষ্ঠা ভগ্নী সারদা ৫/৬ বৎসর বয়সে বিধবা হয়েছিলেন।[৫০] এই ঘটনায় তিনি যে ব্যথা পেয়েছিলেন তা তিনি জীবনেও ভুলতে পারেননি। সম্ভবত এই ঘটনা তাঁকে বিধবাদের প্রতি সহানুভূতি-সিক্ত করে তুলেছিল। তিনি বাল্যকাল থেকে বিধবাদের সাহায্য করতে অগ্রণী ছিলেন।

পরবর্তীকালে পড়াশোনার জন্য তিনি জ্ঞাতিভ্রাতা হরচন্দ্র চন্দের ময়মনসিংহের বাসায় থাকতেন। হরচন্দ্রের বড়দিদি ছিলেন ধর্মপ্রাণা। তাঁর কাছে পাড়ার অন্যান্য বিধবা ঠাকুরাণীরা আসতেন। শ্রীনাথ তাদের ধর্মগ্রন্থ সুর করে পড়ে শোনাতেন। তা দেখে হরচন্দ্রের বড়দিদি নিজে রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি পাঠ করতে আগ্রহী হলেন ও শ্রীনাথ তাঁকে লেখাপড়া শিখতে সাহায্য করেছিলেন।[৫১]

---

৪৭ *বামাচরিত*, পূর্বে উল্লিখিত।

৪৮ *বামাচরিত*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৫-৪৬।

৪৯ তদেব।

৫০ শ্রীনাথ চন্দ, *ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর*, প্রকাশকাল ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ, পৃ: ৭।

৫১ তদেব, পৃ: ১০।

১৮৭২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে কলিকাতায় ঢাকা সঙ্গতের উৎসাহী সভ্য শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেনের সঙ্গে শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের বালবিধবা ভগিনী হেমাঙ্গিনী দেবীর বিয়ে সম্পন্ন হয়। ভুবনমোহনের নবপরিণীতা বধূর সঙ্গে শ্রীনাথের বেশ সখ্য ছিল। চাকরী পেয়ে শ্রীনাথ ভগ্নী সারদাকে ভুবনমোহনের বাসায় এনে তুললেন।[৫২] হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে প্রকাশ্য ব্রাহ্মসভায় যোগ দিয়ে সারদা বেশ সাড়া তুলেছিলেন।[৫৩] ১৯ বৎসর বয়সে চন্দনগরের বাবু গোপাল চন্দ্র ঘোষের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হল। ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান ও পুনর্বিবাহ সারদার জীবনকে বৈধব্যের অন্ধকার থেকে মুক্ত করেছিল।

শ্রীমতী সরস্বতী সেন[৫৪] কখনো সরাসরি ব্রহ্মধর্ম গ্রহণ করেননি। কিন্তু তাঁর জীবনকে অর্থবহ করে তুলেছিল ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব ও শিক্ষা। ১৮৪৮ সালে তিনি গোবরডাঙ্গার খাটুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নয় বৎসর বয়সে বিবাহ ও এগার বৎসর বয়সে বৈধব্য ঘটে। ১৫ বৎসর বয়স থেকে তিনি লেখাপড়া শিখতে শুরু করেন। ১৮৬৮ ও ১৮৬৯ সালে দু'বার তিনি অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার অন্তর্গত পরীক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার পান। তিনি প্রতিবেশী হিন্দু মহিলাদের লেখাপড়া শেখাতেন। খাটুরার বালিকা বিদ্যালয়েও তিনি শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে কাজ চালিয়ে দিতেন। ১৮৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ভালভাবে শিক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে বেথুন স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৮০ সালের ১লা এপ্রিল তিনি বেথুন স্কুলে শিক্ষিকা হিসাবে যোগ দেন এবং প্রায় নয় বছর ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। দেখা যাচ্ছে সরস্বতী সেন শুধুমাত্র শিক্ষিকা হয়ে ওঠেননি, তিনি স্বনির্ভর হতে পেরেছিলেন। তিনি ৮২ বছর বয়স অবধি বেঁচে ছিলেন। তাঁর এই দীর্ঘ জীবনের ব্যয় নির্বাহ হত তাঁর স্বোপার্জিত অর্থের অংশে। তিনি তাঁর সঞ্চিত অর্থ থেকে ৮০০০ টাকা দান করেছিলেন খাঁটুরার ব্রাহ্মমন্দিরের উন্নতিকল্পে।[৫৪]

ব্রাহ্ম শ্রীনাথ চন্দ যদিও নিজ ভগ্নীসহ ২/১টি বিধবা বিবাহের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তবুও সাধারণভাবে ব্রাহ্মরা বিধবা নারীদের ধর্মভাবাপন্ন জীবন যতটা চাইতেন ততটা বোধহয় তাদের পুনর্বিবাহ চাইতেন না, ঊনবিংশ শতকে প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখা ও বিংশ শতকে "অবলাবান্ধব-এ" যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তাতে একথা বলা বোধহয় ভুল হবে না। বামাসুন্দরীর জীবনচরিতের[৫৫] ভূমিকায় বলা হচ্ছে যে এই জীবনী রচনা করার উদ্দেশ্য হল বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিলাস বাসনা নয় বিধবারা তাঁদের জীবন অতিবাহিত করবেন সৎভাবে, ধর্মে মতি রেখে এবং পরার্থে জীবন উৎসর্গ করে। বিবাহ নয় তাঁদের দুর্ভাগ্যকে জয় করার মূলমন্ত্র হবে পরের সেবা। ব্রাহ্মরাও এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিধবাদের উন্নতিকল্পে অগ্রসর হয়েছিলেন। মহিলারা সকলেই যে এরকমভাবে ভাবতেন তা

৫২ ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর, পূর্বোক্ত, পৃ: ১১০।

৫৩ তদেব।

৫৪ শ্রীমতী সরস্বতী সেনের সংক্ষিপ্ত জীবনী, রচনা ও পত্র, শ্রী মুরলধর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৩০।

৫৫ বামাচরিত্, পূর্বোক্ত।

নয়। সমাজে যেসমস্ত কুপ্রথা প্রচলিত ছিল তা সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন মহিলারা, শুধু তাই নয় এর পরিণতিতে মহিলাদের জীবন কিভাবে দুর্বিষহ হয়ে উঠছে সে সম্বন্ধেও তাঁরা যথেষ্ট চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। কেমন করে ঐ সব কুপ্রথা দূর করা যায় তা নিয়ে পরামর্শ দিতেও পিছ্‌পা ছিলেন না তাঁরা। আর এ ক্ষেত্রে তাঁদের চিন্তার সিংহভাগ জুড়ে ছিলো বৈধব্য জীবনের দুঃখ। কারণ, কুলীন পত্নীরা দাম্পত্য ছিন্ন হলেও জীবনের আহার-বিহারের ক্ষেত্রে অনেকটাই ছাড় পেতেন। কিন্তু বিধবাদের জীবনে ছিল শুধুই নিষেধ ও আচার-সর্বস্বতার অমানিশা। তাই, ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ সংস্কার আন্দোলন বা তৎসংক্রান্ত উত্তপ্ত বিতর্ক কোনটা থেকেই মহিলারা বিচ্ছিন্না ছিলেন না।

সমাজ সংস্কারে নারীর দোলাচল

অনেকের ধারণা ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সমাজসংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার বেশির ভাগ বিষয় ছিলেন মহিলারা। কিন্তু পুরুষ পরিচালিত এই সংস্কার আন্দোলনের কর্মস্রোতে মহিলারা ছিলেন নিষ্ক্রিয়। সম্ভবত তাদের নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্ক সম্বন্ধে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ অনবহিত। সমাজসংস্কারকরাও মহিলাদের সঙ্গে তাঁদের নিজেদের বিষয়ে আলোচনা করার কোন প্রয়োজন বোধ করেন নি কারণ তাদের ধারণা ছিল যে মহিলাদের অবস্থার উন্নতি করার প্রচেষ্টা তাঁরা মেনে নেবেন। তবুও সীমিতভাবে হলেও সমসাময়িক সংস্কার আন্দোলনের প্রতি মহিলারা তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন। এই প্রতিক্রিয়া পুরুষদের প্রতিক্রিয়া থেকে ভিন্ন প্রকৃতির ছিল, কারণ পুরুষদের কাছে মহিলাদের অবস্থায় উন্নতি তাদের কর্ম-জীবনের একটি অংশ ছিল, কিন্তু মহিলাদের কাছে তা ছিল সমগ্র অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রতি মহিলাদের মনোভাব থেকে আধুনিকতার প্রতি মহিলাদের মনোভাব কি ছিল তা কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে।

ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশক থেকেই কৌলীন্য প্রথার বীভৎসতা ও তা দূর হওয়ার সম্ভাবনায় আনন্দ প্রকাশ করে মহিলারা লেখনী ধারণ করেছিলেন। বাসস্থান ও নাম গোপন করে শ্রীমতী অমুকী দেবী এই নাম স্বাক্ষর করে এক মহিলা "সম্বাদ কৌমুদীকে"তে[৫৬] চিঠি লিখেছিলেন : "এদেশে শুনিতে পাই যে কলিকাতা নগরের অনেকেরই সংপ্রতি এই ইচ্ছা হইয়াছে যে কুলীনদের মর্য্যাদার হানি না হয় অথচ অধিক বিবাহ করিতে সক্ষম না হন ইহাতে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম ...।" তারপরে কুলীন প্রথার বীভৎসতার পরিচয় দিয়ে শ্রীমতী অমুকী দেবী লিখেছেন যে তাঁর পিতা "... বাল্যকালাবধি প্রায় চল্লিশ সংসার করিয়া থাকিবেন, তাঁহার নিজের বাসগৃহ থাকে নাই মাতামহ গৃহে জন্ম হইয়াছিল পরে শ্বশুরের ভবনে ও পথপর্যটনে কাল গত হইয়াছে, কোন শ্বশুরগৃহে চারিপাঁচ বছর পরে দুই-তিন দিনের নিমিত্ত যাইতেন, কোন স্থানে বা দশ বৎসরের মধ্যে একবার গমনেও মহাত্যক্ত হইতেন ..." শ্রীমতী অমুকীর মাতামহ তাঁর পাঁচকন্যাকে ঐ ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন, এঁদের মধ্যে শ্রীমতী অমুকীর মাতা ও দুই মাসীর একটি একটি করে মেয়ে হয়েছিল। এই মেয়েদের বাবা বা বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা কখনো এদের কোনরকম খোঁজখবর করতেন না, কিন্তু যখনই ঐ পুরুষদের মনে হল যে ঐ মহিলারা স্বাধীনমতো তাঁদের কন্যাদের বিবাহ দেবেন তখন "... পাঁচ-ছয়জন ষণ্ডামার্ক বিমাতা পুত্র অন্যপক্ষের দুই মাতুল এবং পিতা জ্যেষ্ঠতাতের তুল্যবয়স্ক একপাত্রের সহিত একেবারে একরাত্রে বিবাহ দিলেন সেই অবধি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম হইল পতির সহিত দর্শন নাই বর্তমান আছেন কিনা তাহাও জ্ঞাত নহি কেবল মাতুলের ভবনে কখনো পাচিকা কখন বা দাসীরূপে কালযাপন করিতেছি ..."[৫৭]

৫৬ পত্র, শ্রীমতী অমুকী দেবী, সম্বাদ কৌমুদী, ১৬ ফাল্গুন, ১২৩৭ বঙ্গাব্দ।
৫৭ তদেব।

কৌলীন্যপ্রথা ও পুরুষের ব্যভিচারেব বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিযে শান্তিপুর নিবাসী এক মহিলা একটি অস্বাক্ষরিত চিঠি পাঠালেন "সমাচার দর্পণ"[৫৮] পত্রিকাতে : "... কেবল আমাদিগের এই বাঙ্গলা দেশের বাঙ্গালির মধ্যে যে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের কন্যা বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ হয় না। যদ্যপি ঐ স্ত্রীলোকেরা উপপতি আশ্রয় করে তবে যে কুলোদ্ভবা সে কুল নষ্ট হয়। কিন্তু ঐ বিশিষ্ট কুলোদ্ভব মহাশয়েরা অনায়াসে বেশ্যালয়ে গমনপূর্ব্বক উপস্ত্রী লইয়া সম্ভোগ করেন তাহাতে কুল নষ্ট হয় না। ... বাঙ্গলা শাস্ত্রমতে এমত আছে যে অপ্রৌঢ়া বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ হইতে পারে। তাহার প্রমাণ আছে যাহারা সুরাসুর প্রধান ২ পুরাতন রাজা তাঁহারদিগের পত্নী পতি অভাবে পুনঃ স্বয়ম্বরা হইয়াছেন এবং স্বামী সত্ত্বে অনায়াসে উপপতি লইয়া সম্ভোগ করিয়াছেন তাহাতে ধর্ম্মবিরুদ্ধ হয় নাই। অদ্যাপিও তাঁহারদিগের নাম উচ্চারণে এবং স্মরণে পাপ ধ্বংস হয়। তৎসময়ে কুলীনাকুলীন ছিল না কিমাশ্চর্য। সুরাসুর রাজাদিগের ঐ সকল কর্ম্মে ধর্ম্মবিরুদ্ধে হয় নাই। কেবল স্ত্রীলোকের সুখ সম্ভোগ নিষেধার্থে কি ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণতন্ত্র সৃজন হইযাছিলেন।"[৫৯] শান্তিপুর নিবাসিনী পত্রলেখিকা এখানে শুধু কৌলীন্যের দোষ তুলে ধরেননি, উপরন্তু বিধবারা যাতে বিবাহ করতে পারেন এমন বিধির দাবী করেছেন, এ সম্বন্ধে শাস্ত্রের অনুশাসন যে বিধবাদের অনুকূল সে বিষয়েও তিনি অবগত। তাই তিনি দেশের সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছেন ঃ "যাহা হইক অবলার অবলা মনোব্যথা শমতাকরণের কর্ত্তা পতি অভাবে ভূপতি। অতএব নিবেদন এইক্ষণে ধার্ম্মিক রাজা ইঙ্গরেজ বাহাদুর নানাবিধ ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতেছেন। আমাদিগের ধর্ম্মাস্ত্রে এই যাতনা নিবারণ উপায় আছে তাহা প্রধান ২ পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বারা অবগত হইয়া শুদ্ধ সদ্বিচার করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বকআইন অনুসারে প্রকাশ করেন। কিংবা বিশিষ্ট কুলোদ্ভব মহাশয়ের দিগের উপস্ত্রী সহিত সম্ভোগ রহিত করেন। ... কেননা স্ত্রীলোক ব্যভিচারী কেবল পুরুষের দ্বারা যদ্যপি পুরুষ সকল উপস্ত্রী বর্জ্জিত হন তবে স্ত্রীলোক কুলটা হইতে পারে না।"[৬০]

শান্তিপুরবাসিনীর দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে চুঁচুড়া থেকে কয়েকজন মহিলাও "সমাচার দর্পণে"[৬১] পত্র লিখলেন। শান্তিপুরের লেখিকা যেমন স্পষ্টতঃই বিধবা বিবাহ প্রচলন করার দাবী জানিয়েছিলেন, পুরুষের ব্যভিচারের প্রতি আঙুল তুলে দেখিয়েছিলেন যে ব্যভিচারের জন্য মেয়েরা নয় পুরুষরাই দায়ী এবং এই সিদ্ধান্তে আসতে দ্বিধা করেননি যে পুরুষরা চরিত্রবান হলেই মেয়েদের পদস্খলন ঘটাবে না, চুঁচুড়ানিবাসিনীরা মেয়েদের সামগ্রিক দুরবস্থার কথা জানিয়ে তেমন তা মোচন করার দাবী জানিয়েছিলেন। এই পত্রটি থেকে বোঝা যায় যে মেয়েরা তাদের দুরবস্থা সম্বন্ধে কতখানি সচেতন ছিল আর তা নিরসনের জন্য যে তখন ব্যাপক ভাবনা ও প্রচেষ্টা চলছিল সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল। চুঁচুড়া নিবাসিনীরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন যে সভ্য দেশের স্ত্রীলোকেরা যেমন বিদ্যালাভ করতে পারেন সেরকম

৫৮ পত্র শান্তিপুর নিবাসিনী, "সমাচার দর্পণ" ২ চৈত্র ১২৪১।

৫৯ তদেব।

৬০ তদেব।

৬১ *"সমাচার দর্পণ"* ৯ চৈত্র ১২৪১।

তাঁরা করতে পারেন না কারণ পুরুষরা ভয় পান এই ভেবে যে মেয়েরা শিক্ষা লাভ করলেই "সাংসারিক নীতি ও ধর্ম্ম প্রতিপালন হইতে পারে না।" অন্যান্য দেশের স্ত্রীলোকেরা যেমন স্বচ্ছন্দে সকল লোকের সঙ্গে আলাপ করতে পারে তেমন কেন এদেশের স্ত্রীলোকেরা পারে না? তা কি দেশাচার না স্ত্রীলোকের মন্দ স্বভাব? কৌলীন্য ও বাল্যবিবাহ প্রথা দুটিকে একযোগে আক্রমণ করে পত্রলেখিকারা অভিযোগ করেছেন যে জেনেবুঝে পুরুষরা মেয়েদের এই দুটি কুপ্রথার বলি করেছেন : "বলদ ও অচেতন দ্রব্যাদির ন্যায় আমারদিগকে কি নিমিত্ত হস্তান্তর করিয়া আপনারা নির্দ্দয়াচরণ করিতেছেন আমরা কি আপনারাই বিবেচনাপূর্ব্বক স্বামী মনোনীত করিতে পারি না। আপনারা কহেন যে আমাদের কুলধর্ম্ম ও সম্ভ্রম বজায় রাখিতে হইবে এই নিমিত্ত কোন বিবেচনা করিয়া যাহাদের সঙ্গে কখনও কিছু জানাশুনা নাই এবং বিদ্যা কি রূপ কি ধনাদি কিছু নাই এমত পোড়া কপালিয়ারদের সঙ্গে কেবল ছাইর কুলের নিমিত্ত আমাদের বিবাহ দিতেছেন এবং যখন অতি বালিকা অর্থাৎ ৪/৫/১০/১২ বর্ষ বয়স্কা এমত অজ্ঞানাবস্থায় আমারদিগকে দান করিতেছেন সংসারের মধ্যে প্রবেশের কি এই উচিত সময়। ইহাতে কি কুফল হইতেছে তাহাও আপনারা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন",[৬২] বহু বিবাহের নিন্দা করে এবং বিধবা বিবাহের দাবী জানিয়ে তাঁরা চিঠিটা শেষ করেছেন এইভাবে : "যাঁহারদের অনেক ভার্য্যা তাঁহারদের সঙ্গে কেন আমাদের বিবাহ দিতেছেন, যাঁহার অনেক ভার্য্যা তিনি প্রত্যেক ভার্য্যা লইয়া সাংসারিক যেমন রীতি ও কর্ত্তব্য তাহা কিরূপে করিতে পারেন।"

"ভার্য্যার মৃত্যুর পরে স্বামী পুনর্বিবাহ করিতে পারে তবে কেন স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পরে বিবাহ করিতে না পারে। পুরুষের যেমন বিবাহ করিতে অনুরাগ তেমন কি স্ত্রীর নাই, এই স্বাভাবিক বিরুদ্ধ নিয়মেতে কি দুষ্টতার দমন হয়। হে প্রিয় পিতঃ ও ভ্রাতৃগণ এই সকল বিষয়ে মনোমধ্যে যথার্থ বিচার করিয়া কহুন দেখি যে আমারদিগকে আপনারা কিরূপ দুঃখিনী ও গোলামের ন্যায় অপমানিতা দেখিতেছেন"।[৬৩]

বিধবাবিবাহ প্রচলন করার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কিভাবে চেষ্টা করেছিলেন কোন শাস্ত্র থেকে তিনি অনুমোদন আবিষ্কার করেছেন তাঁর বিরুদ্ধে রক্ষণশীলরা কেমন কোমর বেঁধে লেগেছিলেন এবং সর্বোপরি বিধবাবিবাহ প্রচলিত না হলে সমাজে কি প্রকার অনাচার স্থায়ী হবে এ সমস্ত সম্বন্ধে স্পষ্ট অভিমত জানিয়েছিলেন মেদিনীপুরের কয়েকজন বিধবা। এখানে লক্ষণীয় যে এই মহিলারা বিধবাবিবাহ প্রচলন করার জন্যে যে কারণ দর্শিয়েছিলেন তা পুরুষদের মতের অনুরূপ। বিধবাবিবাহ সমর্থকরা এই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন যত না মহিলাদের অবস্থার উন্নতি করার তাগিদে তত সমাজকে ব্যভিচারের হাত থেকে রক্ষা করতে। মেদিনীপুর নিবাসিনী বিধবা মহিলারা সমাজে ভ্রূণহত্যারূপ ব্যভিচার বন্ধ করার জন্যই রাধাকান্ত দেবের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু তাতেও মহিলাদের সচেতনতা বুঝতে অসুবিধা হয় না। একথা অনস্বীকার্য যে এদেশের পুরুষরাই সমাজ সংস্কারের মধ্যে দিয়ে স্ত্রীজাতির

৬২ তদেব।
৬৩ তদেব।

উন্নতিকল্পে প্রয়াসী হয়েছিলেন, কাজেই মহিলারাও তাঁদের মত জ্ঞাপন করতে গিয়ে অন্ততঃ প্রথমাবস্থায় পুরুষদের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করবেন এতে অস্বাভাবিকত্ব কিছু নেই। বিধবাবিবাহ আইনসিদ্ধ হবার অব্যবহিত আগে লেখা এই চিঠিটা তৎকালীন নারী সচেতনতা প্রতিপন্ন করতে সম্পূর্ণ সক্ষম হয়েছে। "সংবাদ প্রভাকর"[৬৪] পত্রিকার সম্পাদক জানাচ্ছেন : "আমারদিগের মেদিনীপুর প্রবাসী কোন বন্ধু দ্বারা তদঞ্চলস্থ ভদ্রগ্রাম নিবাসিনী বিপ্রকুলোদ্ভবা বিধবা কামিনীগণের রচিত যে এক পত্র আমরা প্রাপ্ত হইলাম তাহা অবিকল নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।

"অশেষ গুণালঙ্কৃত শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর দীর্ঘজীবেষু।

আমরা জিলা মেদিনীপুরের অন্তঃপাতি কতিপয় ভদ্র গ্রাম নিবাসিনী বিপ্রকুলোদ্ভবা বিধবা কুলীন কন্যাগণের নিবেদন এই যে আমরা অতি শৈশবাবস্থায় পতিরত্ন বিহীন হইয়া এপর্যন্ত অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণায় কাল যাপন করিতেছি, কিন্তু অদ্যাবধি আমারদিগের ক্লেশ নিবারণের কোন সদুপায় প্রচলিত না হওয়াতে অস্মদগণ পক্ষে বিবিধ অনিষ্ট ঘটনা হইতেছে। অধুনা শ্রুত হইলাম দেশহিতৈষী গুণরাশি বিপুল যশস্বী অদ্বিতীয় পণ্ডিতবর গুণসাগর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহুায়াসে বিবিধ শাস্ত্রান্বেষণকরতঃ পরিশেষে বর্ত্তমান কলিযুগের প্রচলিত শাস্ত্র অর্থাৎ পরাশর সংহিতা হইতে বিধবাবিবাহ হওনের যে শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন, তৎপাঠে বিদিত হইল যে বিধবা দিগের পুনঃ পরিণয় কিছু অশাস্ত্রিক নহে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে আমারদিগের দেশীয় পণ্ডিত মহোদয়েরা শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগরের উৎকট পরিশ্রমে বাধিত না হইয়া তাহাতে নানা প্রকার ফন্দি তুলিতেছেন, এবং স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া এই যুক্তি সিদ্ধ শাস্ত্রীয় প্রথা যাহাতে প্রচলিত না হয় তাহারই চেষ্টায় যত্নশীল হইয়াছেন; কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রকাশিত ভগবান পরাশরের বচন অদ্যাবধি কেহই খণ্ডন করিতে পারগ হয়েন নাই। কেবল তন্তুবায়দিগের ন্যায় নিরর্থক কোলাহল ও কলহ করিয়া এক একখানি পুস্তক রচনা করিয়া আপনাপন পারগতা দর্শাইতেছেন, কিন্তু তাঁহারদিগের বাটীর বিধবারা অসহ্য ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম প্রতিপালনে যে অপরাগ হইয়া স্বেচ্ছাচারিণী হইতেছে তাঁহারা কি একবারও নেত্রোন্মীলন করিয়া দেখেন না? কি আক্ষেপের বিষয়। কিয়দ্দিবস গত হইল এই মেদিনীপুরে কোন ভদ্রাভিমানী স্বীয় বাটীতে উল্লেখিত বিধবাবিবাহঘটিত এক সভা স্থাপন করিয়া বিধবা সাপক্ষ পক্ষে যে রূপ অভদ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা অত্র পত্রে প্রকাশ করিলে অধম হাড়ি বেহারাদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে, অতএব তাহা প্রকাশে বিরত হইলাম। সে যাহা হউক, এইক্ষণে আমারদিগের এই বঙ্গদেশের মধ্যে আপনকার তুল্য সুপণ্ডিত ও বিজ্ঞ আর কাহাকেও দেখিতে পাই না, অতএব আপনি ইহাতে হস্তার্পণ না করিলে ঘৃণিত ব্যভিচার দোষে এই সনাতন হিন্দুধর্ম্মের গর্ব্ব এৈকৈকশঃ খর্ব্ব হইয়া যায়। অতএব যথোচিত সম্বোধন পুরঃসর

৬৪ *"সংবাদ প্রভাকর"* ১১ই জৈষ্ঠ্য ১২৬২।

আমরা প্রার্থনা করিতেছি যে আমাদের এই বর্ত্তমান লুকাচুরি খেলা হইতে নিবৃত্তি করাইয়া ভগবান পরাশর বাক্য প্রচলিত করিতে যত্নশীল হউন, নচেৎ মহাশয়কে ভবিষ্যতে শত শত ভ্রূণহত্যা পাপে জড়িত হইতে হইবে, নিবেদনমিতি।"[৬৫]

বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম মুদ্রিত প্রবন্ধ পুস্তিকা "কী কী কুসংস্কার তিরোহিত হইলে শীঘ্র এই দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে", রচয়িত্রী বামাসুন্দরী দেবী। তাঁর রচনায় লেখিকা এদেশের শ্রীবৃদ্ধির বিভিন্ন উপায় নির্দেশ করেছেন। মহিলাদের সচেতনতা ও প্রতিক্রিয়া পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি স্থানীয় এ লেখাটিতে বামাসুন্দরী বুঝেছিলেন যে কৌলীন্য প্রথা, বহুবিবাহ (অধিবেদন), বাল্যবিবাহ ও বার্ধক্যবিবাহ সমাজের বহু ক্ষতি করছে এবং সমাজের মঙ্গলের জন্য স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ও বালবিধবা বিবাহ প্রবর্তন একান্তই প্রয়োজন।[৬৬] বামাসুন্দরী লিখলেনঃ "কৌলীন্য প্রথা এদেশ হইতে অন্তর্হিত হইলে এদেশের অশেষ মঙ্গল সংসাধন হইতে পারে। কুলীন ব্রাহ্মণরা যত ইচ্ছা ততই বিবাহ করিতে পারেন। অশীতিপর বৃদ্ধ হইলেও তাঁহাদের বিবাহের ব্যাঘাত হয় না।...পঞ্চম বর্ষীয়া বালাকে ৬০ বৎসরের পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিতেছেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে কত কত কুলীন ব্রাহ্মণেরা না কি ৪০/৫০/৬০/৭০/৮০ এবং একশত বছর বয়স পর্যন্ত বিবাহ করিয়া থাকেন। আহা! বহু বিবাহকারী একটি পুরুষের মৃত্যু হইলে কত কত স্ত্রী বৈধব্যদশায় পতিতা হইয়াই কী এক অসহ্য যাতনা সহ্য করিতে থাকেন। অতএব এই বিবাহই সকল অনিষ্ট এবং সকল প্রকার অধর্মের প্রধান ভাণ্ডার হইয়াছে। ইহাকেই ভ্রূণহত্যা এবং ব্যভিচার দোষের আকর বলিয়া সহজেই স্বীকার করিতে হইবেক।"[৬৭] এছাড়াও আরও একধরনের অনিষ্টের কথা বলেছেন বামাসুন্দরী। কৌলীন্য বিবাহ প্রথা বার্ধক্য বিবাহের নামান্তর। এর ফলে কি ক্ষতি হত তা স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ করেছেন বামাসুন্দরী : "বাল্যবিবাহের ন্যায় বার্ধক্য বিবাহও মহাপাপ। শরীরের পূর্ণাবস্থা সন্তান উৎপাদন করিলেও তদ্রূপ হয়। যেমন অতি পুরাতন জীর্ণ বীজ বপন করিলে মূলেই অঙ্কুরিত হয় না, যদি অঙ্কুরিত হয়, সেও কদাপি বহু শস্যোৎপাদক সতেজ বৃক্ষ হয় না, তদ্রূপ বৃদ্ধকালে বিবাহ করিলে নিঃসন্তান হইতে হয়, যদি সন্তান জন্মে সেও ক্ষীণজীবী সুতরাং চিররুগ্ণ হইয়া চিরজীবন দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকে। হয়তো অল্পদিন মধ্যে কালের কবলে পতিত হইয়া অপরাধী পিতামাতাকে শোকাকুল করিয়া যায়।"[৬৮] বিধবাবিবাহের সুপারিশ করে বামাসুন্দরী লিখলেন : "বালা বিধবাগণের পুনরুদ্বাহ প্রথা প্রচলিত হইলে মঙ্গলোন্নতি হইতে পারে। আহা! ঐ সকল পতিহীনী দীনা ক্ষীণা, অবলা, বালা কী এক অনির্ব্বচনীয় অসহনীয় জ্বালা সহ্য করিতেছে, অনবরতই হৃদয়ব্যথায় ব্যথিত হইয়া মনে মনে রোদন করিতেছে, কেহই দয়া করিয়া তাহাদের এই ব্যথা নিবারণের ঔষধ প্রদান করে না, তাহারা ঔষধ থাকিতেও ঔষধ পায় না।... বালা বিধবাগণের মনের অবস্থা এবং দুঃখ বর্ণনা

৬৫ তদেব।

৬৬ বসন্ত কুমার সামন্ত, সম্পাদিত, বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম দুটি মুদ্রিত গ্রন্থ। পূর্বোক্ত, পৃ: ৯০।

৬৭ প্রথম প্রকাশ: সোমপ্রকাশ, ১৫ ফাল্গুন ১২৬৭, বসন্তকুমার সামন্ত, সম্পাদিত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৬৭, পৃ: ১৬৯-তে পুনর্মুদ্রিত।

৬৮ তদেব।

করিতে হইলে পাষাণ পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া যায়। যাহারা গুরুতর অপরাধ জন্য রাজদণ্ড ভোগ করত যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ থাকে তাহাদিগের যাতনা কতই যাতনা, তাহারা স্ব স্ব পাপের ভোগ নিমিত্ত মনকে প্রবোধ দিয়া সান্ত্বনা করিতে পারে, ইহারা কি বলিয়া ধৈর্য্য হইবে?"[৬৯] এর পর বাল্যবিবাহের কথা বলেছেন বামাসুন্দরী : "বাল্যবিবাহ প্রথা দূরীভূত হইলে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে। হা ঈশ্বর! অস্মদ্দেশীয় এই দোষাকর দেশাচারের ক্ষমতা কি উত্তর উত্তর বৃদ্ধিই হইবে? ইহার কি আর হ্রাস হইবে না? ... যাঁহারা বাল্যবিবাহ রূপ মহাপাপে পতিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সংসার ভরণ পোষণার্থ দিবা-নিশি কেবল অন্ন চিন্তায় যাপন হইতেছে। লোকালয়ে বিবিধ কারণবশতঃ অপমানিত হইতেছে, ক্ষুধার্ত সন্তানগণের চিত্তভেদী রবসকল প্রতিক্ষণে কর্ণগোচর করিয়া আপনাকে শত শত ধিক্কার দিতেছেন, ভার্য্যার ম্লান বদন দণ্ডে দণ্ডে অবলোকন করিয়া অন্তঃকরণকে প্রজ্বলিত অনল-শিখায় নিক্ষেপ করিতেছেন।"[৭০]

১৮৫৬ সালে বিধবাবিবাহ আইনসিদ্ধ হবার পর থেকে বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে মহিলাদের লেখার সংখ্যাধিক্য ঘটে। বস্তুত আলোচ্য সময়ে সমাজসংস্কারমূলক মহিলা রচনাবলীর সিংহভাগ জুড়ে ছিল বিধবা প্রসঙ্গ। ১৮৭৬ সালে "বামাবোধিনী পত্রিকায়" শ্রীমতী সাবদার রচনা প্রকাশিত হল "বঙ্গদেশীয় লোকদিগের কী কী বিষয়ে কুসংস্কার আছে?" এই শিরোনামে।[৭১] এই রচনায় শ্রীমতী সারদা বিধবাবিবাহ সমর্থন করছেন এই যুক্তিতে যে ঈশ্বর সমদৃষ্টিবান, তিনি যদি বিধবাদের বিবাহ নিবারণ করতে চাইতেন তাহলে পুরুষদের ক্ষেত্রেও ঐ একই নিয়ম যোজনা করতেন : "বিধবাদিগের পুনঃ সংস্কার নিবাবণ করা একটি গুরুতর পাপ এবং মহৎ কুসংস্কার বলিয়া গণনা করিতে হইবে। যখন ঈশ্বরের সৃষ্টি রাজ্যের নিয়ম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে তিনি তাঁহার রাজ্য বৃদ্ধি করিবার জন্যে স্ত্রী ও পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছেন তখন ইহা নিবারণ করা যে কত মহাপাপের কর্ম্ম তাহা সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকলেই অনুভব করিতে পারিবেন।"

"যখন পুরুষের এক স্ত্রীর মৃত্যু হইলে অন্য স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহাদের পাপগ্রস্ত হইতে হয় না, তখন পতিহীনা অবলা কামিনীরা পুনরায় বিবাহ করিলে তাহারা তাহাতে কেন দূষিত হয়েন? অতএব বিধবাদিগের পুনঃসংস্কার নিবারণ করা পরম কারণিক পরমেশ্বরের অভিপ্রেত কখনোই হইতে পারে না। তাঁহার স্নেহ স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতির প্রতি সমান। যদি মনুষ্যের সৃষ্টি করা জগদীশ্বরের রাজ্য বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে এই বিধবা বিবাহ নিবারণ যে কত মহাপাপ তাহা সহজেই সকলে অনুভব করিতে পারেন। জগদীশ্বরের নিযম অতিক্রম করিতে গেলেই পাপগ্রস্ত হইতে হয়। পরম পিতা

৬৯ তদেব।

৭০ তদেব।

৭১ বামাবোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ১২৭৩ বঙ্গাব্দ।

পরমেশ্বরের এমন অভিপ্রেত নহে। সে অভিপ্রায় হইলে পত্নিহীন পুরুষের প্রতিও ঐ প্রকার বিধি হইত তাহার আর সন্দেহ নাই।"[৭২]

বিদ্যাসাগর যখন আইন করে বহুবিবাহ বন্ধ করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন তখন ঃ মহলের একাংশ তাঁর এই প্রচেষ্টাকে সমালোচনা করেছিলেন, এঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ভুক্তভোগী মহিলারা বিদ্যাসাগরকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিল। এরকম একজন মহিলা লক্ষ্মীমণি দেবী লিখলেন, "হালিশহর পত্রিকাতে কোন সুবিজ্ঞ কুলীন মহাত্মা লিখিয়াছেন যে যাঁহাদের সর্বনাশ হইতেছে যাঁহাদের মানসম্ভ্রম বংশমর্যাদার মূলে নিদারুণ কুঠারাঘাত করিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় উদ্যত হইয়াছেন যাহাদিগকে চিরকালের জন্য দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিতে যাইতেছেন তাঁহাদিগকে একবারও এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা কি উচিত নহে? কিন্তু আমাদের বিবেচনায় হতভাগিনী কুলীন কন্যাগণের প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয় দয়া প্রকাশ করিয়া বহুবিবাহ নিষেধ জন্য যে পুস্তক প্রকটন করিয়াছেন তাহা তাঁহার পদোপযোগীই হইয়াছে। এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে বোধহয়, তিনি কেবল অবলা কুলীন কন্যাগণের হিতসাধন উদ্দেশ্যে ঐ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। অধুনা হালিশহর পত্রিকাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দোষ উল্লেখ করিয়া কেবল দ্বেষভাব প্রকাশ করা হইয়াছে। দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধনের জন্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কুরীতি সংস্করণ বিষয়ে সমুৎসুক হইয়াছেন, ইহা কোন্ ব্যক্তি হৃদয়ঙ্গম না করিবে? কেবল খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভাশয়ে ও কুলীনদিগকে খর্ব্ব করিবার মানসে এতদ্ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কেবল স্ত্রীজাতির মঙ্গল সাধনে ও দেশের কুরীতি দূর করিবার মানসে তাঁহার সরলান্তঃকরণে জগদীশ্বর এতাধিক দয়াপ্রদান করিয়াছেন।"[৭৩]

এ পর্যন্ত মহিলাদের রচনা থেকে দেখা গেল যে তাঁহারা সমাজের প্রায় সমস্ত কুপ্রথা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছিলেন। কাজেই মহিলারা তাঁদের সম্পর্কিত সংস্কার প্রয়াসের নিষ্ক্রিয় বিষয় ছিলেন বা তাঁদের এ বিষয়ে কোন সচেতনতা ছিল না এ সিদ্ধান্তে আসা সঠিক নয়। তবে একথা সত্যি যে তাঁদের ভাবনাচিন্তার বেশির ভাগ জুড়েই ছিল বিধবাদের দুঃখময় জীবন তাঁদের লেখা থেকে বিধবাদের যে জীবনছবি ফুটে ওঠে তা যথার্থই মর্মবিদারক। আর বিধবারা ছিলেন জীবনের সমস্ত মাধুর্য থেকে বঞ্চিত এক সহানুভূতিহীন অবস্থার বশবর্তী। আর এই বিষয়েই ধনী-দরিদ্রের খুব পার্থক্য দেখা যায়নি। কেশবচন্দ্রের মা সারদাসুন্দরী দেবী দেওয়ান রামকমল সেনের পুত্রবধূ ছিলেন। তাঁর আত্মকথায় তাঁর বৈধব্য জীবনের যে ছবি বিধৃত হয়েছে তা এ রকম : "স্বামীর মৃত্যুর দিন পনের পরেই আমার সেজদেবর প্রথম আমার উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। তেতলার ঘরে যে বড়খাটে আমার স্বামী শুইতেন, ঘরের কপাট ভাঙিয়া সে খাটখানি আমার সেজদেবর লইয়া গেলেন, আমি কাঁদিলাম। ... এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমার ক্রমে ক্রমে এক ভয় হইল। আমি সবসময় আমার ছেলেমেয়েদের লইয়া একঘরে

৭২ তদেব।

৭৩ বামাবোধিনী পত্রিকা, "কুলীন বহুবিধবা", লক্ষ্মীমণি দেবী, পৌষ ১২৭৮।

দরজা দিয়া পড়িয়া থাকিতাম। ভয়ে ভয়ে ভাবিতাম, যদি ইহারা আমাকে ছেলেমেয়েশুদ্ধ তাড়াইয়া দেন, তবে আমি কোথায় যাইব।"[৭৪] সারদাসুন্দরী দেবীর মত ধনী পরিবারের বধূদেরও বৈধব্য প্রাপ্ত হলে যে কি নিরাপত্তাহীন অবস্থায় পড়তে হতো, এই আত্মকথায় তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায়। এই নিরাপত্তাহীনতা কাটিয়ে ওঠার জন্য তাঁদের প্রায়ই আশ্রয়দাতা পরিজনের গৃহে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হত। "আমার মাতামহকুলে কেবলমাত্র মায়ের এক দাদী (দিদি) চতুর্দশ বর্ষের বালবিধবা—আমাদিগের মাসিমাতা দ্রবময়ী দেবী ছিলেন এবং এ বিদেশ বাসের তিনিই মাতার সঙ্গিনী এবং অভিভাবিকাস্বরূপ সঙ্গে আসিয়াছিলেন। মাতৃসমা চির ব্রহ্মচারিণী আজন্মকাল পরসেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া একাহারে পূজা-আহ্নিকে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। "আচরণ বিলম্বিত দীর্ঘ কেশরাশি" কাটিয়া মুণ্ডিত মস্তকে সেকালের ঠেঁটি ছোট মোটা ধুতি পরিয়া থাকিতেন ও অতি প্রত্যূষে শত সহস্র ঠাকুর দেবতার নাম করিতে করিতে শয্যা ত্যাগ করিয়া গৃহকার্যে রত হইতেন। রন্ধনে সিদ্ধহস্ত, এমন সুস্বাদ মিঠাই মণ্ডা ও অন্নব্যঞ্জন কেহ প্রস্তুত করিতে পারিতেন না এবং ধনীদরিদ্রকে সমানভাবে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইয়া কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন। পৈতাকাটা সুজনাই শিলাই বিবিধ নারিকেলের মিষ্টান্ন ফুল ফল "চিড়া-জিরা" প্রভৃতি এরূপ সুন্দর তৈয়ারি করিতে জানিতেন যে তিনি কোন কুটুম্বিতায়, বিবাহ, উপনয়ন, কিম্বা অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণে সর্ব্বাগ্রে আত্মীয়স্বজন তাঁহাকেই লইয়া যাইতেন। তাঁহার নিকট "বসুধৈব কুটুম্বকং" ছিল। দাসদাসী রোগশয্যার পার্শ্বেও বসিয়া অবিশ্রান্ত সেবায় কতদিন যে অনাহারে গিয়াছে তাহা গণনা করিতে পারিত না।"

"সোনার প্রতিমা গড়ে বিধবা নারীর
রাখিতাম স্থানে স্থানে ভারত ভূমির।
বিদেশের নরনারী এদেশে আসিত,
পতিব্রতা প্রতিমূর্ত্তি নয়নে হেরিত।
লিখিলাম নিম্নদেশে কি স্বদেশে কি বিদেশে
রমণী এমন আর ধরাতলে নাইরে।"

মাসীমাতার সম্বন্ধে ইহা প্রত্যেক বিষয়ে বলিতে পারা যায়।[৭৫] যদিও প্রসন্নময়ী তাঁর বিধবা মাসীমার কৃচ্ছ্রসাধনকে আদর্শায়িত করে রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন তবুও তাঁর রচনাতে অপর একজন বিধবা মহিলার কথা জানা যায়। যিনি আপন তেজস্বিতা ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা প্রতিকূল পরিস্থিতিকে জয় করেছিলেন। কৈলাসবাসিনী দেবী লিখেছেন : "আমার মধ্যম পিতৃস্বসা ˇভগবতী দেবী ছোট তরফের কৃষ্ণসুন্দরী ও নপিসীমাতা মৃন্ময়ী দেবী বেশ লিখিতে পড়িতে পারিতেন, তবে কাশীশ্বরী সর্ব্বাপেক্ষা পণ্ডিত, ছোট ছোট বালক বালিকাগণ তাঁহার

৭৪ কেশবজননী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা, পূর্বোক্ত, পৃঃ পৃঃ ২২-২৩।
৭৫ প্রসন্নময়ী দেবী, পূর্বকথা, "তারাবাস" ২রা জানুয়ারী ১৯১৭, পৃঃ ৬৮।

নিকট লেখাপড়া শিখিতে যাইত। অসহায় বালবিধবার রূপ বড় বিপদজনক, আত্মসম্মান রক্ষার্থে তাঁহাকে অনেক ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়। শ্যামাঙ্গিনী কাশীশ্বরী যৌবনে অতিশয় সুরূপা ছিলেন, সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ আয়তলোচন ও সুঠাম, দীর্ঘ, পূর্ণ যষ্টি, দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত, এজন্য তাঁহার একাকিনী পথেঘাটে চলাফেরা নিরাপদ না থাকায় তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া এক নিশীথ রাত্রে পুরাতন বৃদ্ধা পরিচারিকাসহ জেলা কোর্টের জজ্ সাহেবের নিকট আশ্রয়ভিক্ষার আবেদনপত্র-সহ যাইয়া উপস্থিত হন, তৎকালে তিন মাস পরে পরে দায়রার বিচারার্থ জজ্ মহোদয় পাবনা আসিতেন, ইহার মধ্যে অন্যসকল কাজকর্ম রাজশাহীতেই হইত, ব্রহ্মবাদিনী অরুন্ধতীর ন্যায় তেজস্বিনী ব্রাহ্মণকন্যাকে একাকী বিচারালয়ে দেখিয়া ও তাহার বিপন্নাবস্থার কাহিনী শ্রবণে দয়ালু জজ্ সাহেব এক "জরুরি পরোয়ানা" গ্রামে পাঠাইয়া আজ্ঞা প্রদান করিলেন যে, "এই বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার প্রতি কখন যদি কোনরূপ অত্যাচার শুনিতে পান, তাহা হইলে বিনা বিচারে দোষীদিগকে ছয় মাসের জন্য শ্রীঘরে পাঠাইবেন।" জজসাহেব সরকার হইতে দুঃখিনী বিধবাকে মাসিক ৫ টাকা বৃত্তি ধার্য্য করিয়া দিলেন।"[৭৬]

কাশীশ্বরী দেবীর মত মহিলা একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত, বিশেষত হিন্দু পরিবারে, যেখানে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, ভ্রম, পৌত্তলিকতা ইত্যাদি প্রচলিত রীতি। যদিও তাদের মধ্যে ধর্মে অনুরাগ, সৎকর্মে নিষ্ঠা, পরলোক বিশ্বাস দেখতে পাওয়া যায়। যদিও তারা ধৈর্য্যশীল, কষ্টসহ, সন্তুষ্টচিত্ত, সংযতেন্দ্রীয় তবুও সংস্কারের দোষে তাঁরা কষ্ট সহ্য করে থাকেন। কিন্তু এদের বড় আশ্রয় হতে পারে ব্রাহ্মসমাজ, এই মত প্রকাশ করলেন শ্রীমতী সরস্বতী সেন, যিনি ১৮৫৮ সালে মাত্র ১১ বছর ৩ মাস বয়সে বিধবা হয়েছিলেন।[৭৭] বালবিধবা শ্রীমতী সরস্বতী শিক্ষকতা করে গ্রাসাচ্ছাদন করতেন। তিনি বেথুন স্কুলে নয় বছর শিক্ষিকা থাকার সুবাদে বিদ্যালয়ের বোর্ডিং-এ থাকতেন আর প্রতি রবিবার মেয়েদের সঙ্গে করে ব্রাহ্ম মন্দিরে উপাসনা করতে যেতেন। "যে সকল বিধবা ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন, তাঁহাদের জীবন কি প্রকার হওয়া উচিত"[৭৮] এই শিরোনামে তিনি একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এখানে তিনি এই পরামর্শ দিয়েছিলেন : "প্রথমত তাঁহাদের সমান অবস্থাপন্ন ভগ্নীদের সহিত একত্র বাস করিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র স্থান চাই, জ্ঞান ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য তেমনি শিক্ষক ও উপদেষ্টা চাই। যাঁহারা তাহাদের সুখদুঃখের সহানুভূতি করিতে পারেন, এরূপ লোক দ্বারা তাঁহাদের মনের অবস্থা জানা কর্তব্য। অর্থাৎ যাঁহাদের সাংসারিক আসক্তি ও অনুরাগ প্রবল, এবং প্রলোভনে পড়িলে বিপদের আশঙ্কা আছে তাহাদের সহজ পথ গ্রহণ করিয়া সাংসারিক ধর্ম্ম পালন করা আবশ্যক। আর যাঁহারা ঈশ্বরে প্রকৃত অনুরাগী হইয়া দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া সুখসম্পদে ও দুঃখবিপদে সমানভাবে মন রাখিতে পারেন তাঁহাদের জীবন ব্রাহ্মসমাজের হিতকর কার্য্যে প্রদান করা উচিত"[৭৯] শ্রীমতী

৭৬ তদেব, পৃঃ ১৫৫।
৭৭ শ্রীমতী সরস্বতী সেনের সংক্ষিপ্ত জীবনী, রচনা ও পত্র, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২।
৭৮ তদেব, পৃঃ ৭৬।
৭৯ তদেব, পৃঃ ৭৮।

সরস্বতী সেন নিজের জীবনে দ্বিতীয় বিকল্পের প্রমাণ রেখেছিলেন। তাঁর জীবনের যাবতীয় সঞ্চয় তিনি খাঁটুরা ব্রাহ্মমন্দিরে ব্যয় নির্বাহের জন্য ১৯১৯ সালে ট্রাষ্টডিড্ করে দান করে গিয়েছিলেন।[৮০] কিন্তু ব্রাহ্মসমাজেব বিশিষ্ট সদস্য শ্রীনাথ চন্দের বালবিধবা ভগিনী ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করে আবাব জীবনের মূল স্রোতে ফিরে আসতে পেরেছিলেন।[৮১] শ্রীনাথ চন্দ লিখেছিলেন : "সারদা ইতিপূর্ব্বে বাবার নিকট শিবপূজা প্রভৃতি শিক্ষা করিয়াছিল ... এখন আমার ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা শুনিয়া এবং দুই একখানি সরল ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহার ধর্ম্মবিশ্বাস ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। দীক্ষিত হইয়া যখন আশ্বিন মাসে বাড়িতে গিয়াছিলাম, তখন দেখিলাম, সারদা আর শিবপূজা করে না, একাদশী করে না। লোকে এ জন্য নিন্দা গঞ্জনা করিত; তাহার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। ... একদিন মা বলিলেন, তুমি যখন একেবারে ব্রাহ্ম হইয়া গেলে, তখন সারদাকেও তোমাব কাছে নিয়া যাও। তাহারও মতিগতি তোমার মতোই দেখিতেছি, এখানে থাকিলে তাহার পক্ষে ভাল হইবে না। ... এখন কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াই সর্ব্বাগ্রে সারদার কথা মনে পড়িল; তাহাকে ব্রাহ্মসমাজে আনিতে প্রাণ ব্যাকুল হইল। জ্যৈষ্ঠের বন্ধ আসিল, আমরা বাড়িতে গেলাম।"[৮২] শ্রী কৃষ্ণ কুমার মিত্রের সহায়তায় শ্রীনাথ সারদাকে নিয়ে ময়মনসিংহে আসেন, সারদা সেখানে শ্রীনাথের বন্ধু ভুবনচন্দ্র সেনের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। ভুবনবাবুর স্ত্রী হেমাঙ্গিনী ও সারদা উভয়ে প্রকাশ্য স্থানে বসে উপাসনা করতেন। এইভাবে ময়মনসিংহের ব্রাহ্ম মন্দিরে চিরদিনের মতন অবরোধ প্রথার অবসান ঘটল। ঐ ব্রাহ্ম মন্দিরের ট্রাষ্ট ডিডে লেখা হল "অবরোধ প্রথার অনুরোধে ব্রাহ্মমন্দিরে পরদার ব্যবহার হইতে পারিবে না।"[৮৩] ভুবনবাবু ময়মনসিংহ পরিত্যাগ করলে "সারদাকে কোথায় রাখিব, এ চিন্তা মনে উদিত হইল। তখন সারদার বয়স ১৯ বৎসর, সৎপাত্রে পরিণীতা হইলেই তাহার জীবনের সুব্যবস্থা হইতে পারে। সারদার সঙ্গে কথা বলিয়া দেখিলাম, তার মনেও ঐরূপ চিন্তারই উদয় হইয়াছে।"[৮৪] এইভাবে, চন্দন নগর নিবাসী বাবু গোপাল চন্দ্র ঘোষের সঙ্গে সারদার বিবাহ স্থির হল। শ্রীমতী সরস্বতী যদিও আশা করেছিলেন যে ব্রাহ্মসমাজে যোগদানকারী বিধবা মহিলারা কেউ কেউ অন্তত ব্রাহ্মসমাজের হিত সাধনে জীবন উৎসর্গ করবেন কিন্তু বাস্তবে তা সহজসাধ্য ছিল না। এর প্রমাণস্বরূপ মহিলাদের রচনায় বারংবার বিধবাদের দুরবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে। বিংশ শতাব্দীর সূচনাতেও এ রকম রচনা প্রকাশিত হত। এরকম একটি রচনা প্রকাশ পেয়েছে যে "পরহিত ব্রত" গ্রহণ করা আর কোন উপায়ান্তর না থাকার নামান্তর, এতে অন্ততঃ তাদের স্বাভাবিক জীবনের চাহিদা মেটে না, কিন্তু সকলে তাদের পরার্থপর ত্যাগী বলে বাহবা দেয় :

---

৮০ তদেব, পৃ: ২১।
৮১ শ্রীনাথ চন্দ্র, ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর, পূর্বোক্ত।
৮২ তদেব, পৃ: পৃ: ১১১-১১৩।
৮৩ তদেব, পৃ: ১১৬।
৮৪ তদেব, পৃ: ১১৬।

"প্রবেশিল শূন্যাগারে বাঁধিয়া পরাণ,
প্রবল মমতোচ্ছ্বাস, মধুমাখা স্নেহভাষ,
করুণ সরল দৃষ্টি দূরিতে সবার রিষ্টি,
দেবীরূপে দেবভাব ফুটাতে নিয়ত,
নিলেন বিধবা বালা পরহিত ব্রত।
প্রবৃত্তি নিবৃত্ত করি, আশা তেয়াগিয়া,
বিকার স্ববশ করি নির্ব্বিকৃত চিত্ত ধরি,
তেয়াগি ইন্দ্রিয় জ্ঞান, ত্যাজি আত্ম অভিমান,
ছায়ার আকার কায়া করিয়া ধারণ,
ধরিলা জগৎ মাঝে আদর্শ জীবন।"[৮৫]

কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করার পর যখন সমাজ সংস্কার ব্রাহ্মদের অন্যতম প্রধান কর্মসূচী হয়ে দাঁড়াল, তখন তাঁরা নিজ উদ্যোগে বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। মহিলারাও এ বিষয়ে যে যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা জানা যায় শ্রীনাথ চন্দের জীবনী থেকে। শ্রীনাথের ভগ্নী সারদা স্বেচ্ছায় পুনর্বার বিবাহ করতে চেয়েছিলেন। দুর্গামোহন দাসের পত্নী ব্রহ্মময়ী নিজে উদ্যোগী হয়ে বিধবা বিবাহ দিয়েছিলেন। বিধবা মেয়েদের দুরবস্থার প্রতি তাঁর অত্যন্ত সমবেদনা ছিল। তাই বহু বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে দুটি কায়স্থ বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। এই বিবাহে গোলমালের আশঙ্কা ছিল বলে তিনি পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করতেও পিছপা হননি। শুধু বিধবা বিবাহ দেওয়া নয়, ব্রহ্মময়ীর সমাজসংস্কার কাজের পরিধি আরও ব্যাপক ছিল। ১২৭২ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন মাসে (১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে) লাখুটিয়ার জমিদাররা উপবীত ত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলে তাঁদের পরিবারের প্রতি তুমুল নির্যাতন শুরু হয়েছিল। তখন ব্রহ্মময়ী ঐ পরিবারের মেয়েদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। বরিশালে বা কলিকাতায় প্রকাশ্য উপাসনা স্থলে যোগ দিয়ে তিনি অবরোধ প্রথাকে লঙ্ঘন করেছিলেন। ব্রহ্মময়ী মেয়েদের স্বনির্ভরতার বড় সমর্থক ছিলেন। তিনি কলিকাতা থেকে নানাপ্রকার পশমি কার্য শিক্ষা করেছিলেন, বরিশালে ফিরে গিয়ে অনেক মহিলাকে নিজ ব্যয়ে ঐ শিল্প শিখিয়েছিলেন। নিজ ব্যয়ে পাল্কী করে তিনি হিন্দু পরিবারে গিয়ে ঐ শিল্পকাজটি শিখিয়ে আসতেন। ব্রহ্মময়ী বাল্যবিবাহের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর মত ছিল এই রকম যে ১৬ বছর বয়সে মেয়েদের বিবাহ হলে ক্ষতিবৃদ্ধি কিছু হয় না। বরঞ্চ বাল্যবিবাহ অকালে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য হরণ করে। তাই ব্রহ্মময়ী নিজের মেয়েদেরও তখনকার নিরিখে বেশি বয়সে বিবাহ দিয়েছিলেন। ১২৮৩ বঙ্গাব্দের ২১শে কার্তিক যখন তাঁর মৃত্যু হয় (১৮৭৬) তখন তাঁর অনূঢ়া কন্যার বয়স

৮৫ "অমল প্রসূন বা প্রভাবতী কবিতাবলী," প্রভাবতী দেবী কর্তৃক প্রণীত, শ্রী মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা সংগৃহীত ও প্রকাশিত, যশোহর হিন্দু পত্রিকা প্রেসে শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত, বঙ্গাব্দ ১৩০৭।

ছিল ১৫ বৎসর। কন্যারা উপযুক্ত বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া শিখে উপযুক্ত পাত্রে পরিণীতা হবে এ তাঁর ঐকান্তিক কামনা ছিল। এ বিষয়ে তাঁকে যখন কেউ কিছু বলত তিনি পরিহাস করে উত্তর দিতেন যে তাঁর ঘরে খাওয়াপরার অভাব নেই। সুতরাং তাঁর বিয়ে দেবারও প্রয়োজন নেই। কৌলীন্য ও বহুবিবাহ — এই দুটি কুপ্রথার বিরুদ্ধেও ব্রহ্মময়ী তাঁর সক্রিয়তাকে যথাসাধ্য কাজে লাগিয়েছিলেন। এক মূর্খ বহুভার্য কুলীনের কাছ থেকে বিধুমুখী নামে এক বালিকাকে তার মাতুলরা উদ্ধার করে আনে। বিধুমুখী ব্রহ্মময়ীর ঘরে সাদরে স্থান লাভ করেছিলেন। অনেক বালবিধবা ও কুমারী কুলীন ব্রহ্মময়ীকে তাদের দুরবস্থা জানিয়ে চিঠি দিত। যথাসাধ্য তাদের নিজ পরিবারে স্থান দিতেন ব্রহ্মময়ী। তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ কবতে সাহায্য করতেন তিনি।[৮৬] এর আগে সমাজসংস্কার নিয়ে মহিলাদের একাধিক রচনা উদ্ধৃত হয়েছে। এর পরেও হবে। সমাজ সংস্কার নিয়ে মহিলাদের লেখার পরিমাণ নেহাত তুচ্ছ নয়, কিন্তু ব্রহ্মময়ী দেবী যেমন সক্রিয় কর্মসূচী রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন তা অতি বিরলদৃষ্টান্ত।

একদিকে যেমন ব্রাহ্মসমাজ সংস্কারকরা বিধবা বিবাহ দিতে উৎসাহিত হয়েছিলেন অন্যদিকে তেমনি রক্ষণশীল হিন্দুরা বিধবাদের পালনীয় রীতিনীতি বজায় রাখার সপক্ষে ছিলেন। এজন্যে মনুর উক্তি উদ্ধৃত করে বলা হল "পতির মৃত্যু হইলে, পতিব্রতা স্ত্রীদিগের পরমধর্ম্ম — অভিলাষিণী সাধ্বী মরণ পর্য্যন্ত ক্ষমাগুণশালিনী নিয়মযুক্তা ও ব্রহ্মচারিণী হইয়া থাকিবেন এবং পবিত্র ফলমূলাদি অল্পাহার দ্বারা শরীর ক্ষয় করিবেন। ব্যভিচার বুদ্ধিতে পরপুরুষের নাম গ্রহণও করিবে না।"[৮৭] এই অনুজ্ঞা অনুযায়ী বাঙ্গালি পরিবারে বিধবাদের যে ভাবমূর্তি গড়ে তোলা হয়েছিল তা সেই তথাকথিত পরহিত ব্রতের আর এই ভাবমূর্তির দ্বারাই কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তাদের জীবনযাপনের স্বাভাবিক অধিকার। "সাংসারিক কার্যেও বিধবার যত্ন থাকা আবশ্যক। আলস্যের বশীভূত হওয়া বিধবার কর্ত্তব্য নহে। তিনি যে সংসারে থাকিবেন তাহার উন্নতিকল্পে সর্বদা বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। তিনি এমন সাবধান হইয়া চলিবেন যেন, তাঁহার দোষে গৃহের কোনরূপ অনিষ্ট ও অসুবিধা না ঘটে। বিধবা কাহারও মনোকষ্টের কারণ হইবেন না; সর্বদা পরিবারস্থ লোকের নিকট পবিত্রভাবে, সরল অন্তরে এবং ভক্তি স্নেহ ও দয়ার বশীভূত হইয়া চলিবেন। আপনার দোষই দেখিবেন, পরদোষের অনুসন্ধান করিবেন না। ভ্রাতৃবধূগণের প্রতি সর্ব্বদা সদয় ব্যবহার করিবেন। তাহাদিগকে পর মনে করা কর্তব্য নহে। ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতৃকন্যাকে অপত্য নির্ব্বিশেষে স্নেহ, যত্ন ও পালন করিবেন। বিদ্বেষবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া তাহাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করিবেন না। অনেক পতিহীনা নারী ভ্রাতৃবধূগণের সহিত বনিবনাও করিয়া থাকিতে পারেন না। সে দোষ উভয়েরই। এ সকল বিষয়ে বিধবা মাত্রেরই উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করা বিধেয়।"[৮৮] সুতরাং যতই আইন করা হোক না কেন বিধবাদের

৮৬ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় জীবনালেখ্য, যত্রতত্র।

৮৭ অবলাবান্ধব, প্রকাশকাল ১৯৪৯, পৃঃ ৯৫।

৮৮ তদেব, পৃঃ ৯৬-৯৭।

পক্ষে দ্বিতীয়বার পতি গ্রহণ না করে ব্রহ্মচর্য্য পালন করাই সমুচিত এ মনোভাব সমাজের গভীরে প্রোথিত ছিল। যাঁরা জীবনের সবরকম প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলার দায়িত্বও তাঁদেরই বিধবাদের কাছ থেকে এরকম আচরণ প্রত্যাশা করত সমাজ। সচেতন মহিলারা এই অবিচার সম্পর্কে যে পুরোপুরি অবহিত ছিলেন তা প্রকাশ করে শ্রীনগেন্দ্রবালা সরস্বতী লিখলেন : "পণ্ডিতাগ্রণী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ মস্তিষ্কবান ও হৃদয়বান ব্যক্তি বাঙ্গালির মধ্যে অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সেই মহাপুরুষ বিধবাবিবাহ অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইহা যদি দোষণীয় হইত, তবে কখনই সেই মহাত্মা আপনার সমস্ত শক্তি সে কার্যে নিয়োজিত করিতেন না। তবে তিনি যে তাঁহার উদেশ্য কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই, তাহার কারণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, হিন্দুর চিরন্তন কুসংস্কারই তাঁহার এই পবিত্র উদেশ্যের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল।"[৮৯] সংসারে বিধবারা যে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে অত্যাচারিত হয়ে থাকেন সে সম্বন্ধে লেখিকার কোন সন্দেহ ছিল না : "বালবিধবাদিগের শোকপূর্ণ করুণ ব্যঞ্জক বদন দৃষ্টে কোন হৃদয়বান ব্যক্তির হৃদয় বিদীর্ণ না হয়। তাহাদিগের সমস্ত সাধ ও আশার মস্তকে খড়্গাঘাত করিয়া তাহাদের হৃদয়ে অহরহ তুষানল প্রজ্বলিত করাইয়া সমাজ যে কতখানি ধর্মার্জন করেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। বিধাতা তাহাদিগকে এরূপ দলিত করিবার জন্য সৃষ্টি করেন নাই, যে উপাদানে আমাদের প্রাণ গঠিত সেই উপাদানে তাহাদেরও প্রাণ গঠিত হইয়াছে। ইহার প্রত্যবায়ে যে ধর্মদ্রোহী হইতে হয় না তাহা কে বলিবে।"[৯০] যারা কোনদিন বিবাহ কি অথবা পতি কি তা জানার আগেই সবকিছু থেকে বঞ্চিত হল তাদের ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে বলা অর্থহীন। "অনেকে বলেন — বিধবাকে বিবাহ দেওয়া অপেক্ষা তাহাদিগকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও ভগবদনুরক্তি শিক্ষা দেওয়াই কর্ত্তব্য। ... প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধা বিধবাকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা প্রদান করিলে বরং অমৃতময় ফল লাভ হইতে পারে; কিন্তু যাহারা বিবাহ কি জানে না, পতিকে চেনে না, তাহাদের জন্য এ কঠোর ব্যবস্থা কেন? আর তাহারা এ নিয়ম প্রতিপালন করিতেই সমর্থ কেন?[৯১]

কাজেই বিধবাবিবাহ সম্পাদন করা বিংশ শতকের প্রথম ভাগেও অত্যন্ত কঠিন ছিল। তাহলে এই দুর্ভাগিনীদের কি হবে? তাদের বিবাহ দেওয়া না গেলে ব্যভিচারেব হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে? এ সমস্যার সমাধান চিন্তা করে শ্রী বরদাবাসিনী বসু লিখলেন : "জ্বালাময় বৈধব্য জীবনের অশেষ জ্বালা যন্ত্রণা দুঃখ ক্লেশ নিরাকরণের একমাত্র উপায় ভগবৎ প্রেমে ডুবিয়া পরহিত ব্রতে জীবন মন সমর্পণ। কিন্তু বঙ্গ-পরিবারে সে শিক্ষা সে অনুষ্ঠান সে প্রবৃত্তি কোথায়? অশিক্ষিতা বিধবাগণ বিধবা হওয়ার পর হইতে আত্মীয়পরিজনবর্গের যেরূপ অনাদর উপেক্ষা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য এবং কঠোর ব্যবহার প্রাপ্ত হন তাহাতে হতভাগিনীদিগের জীবন ধারণ করা একরূপ বিষম বিড়ম্বনা হইয়া পড়ে।

৮৯ অন্তঃপুর পত্রিকা, "বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গ" শ্রী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী, আষাঢ় ১৩১১।
৯০ তদেব।
৯১ তদেব।

হিন্দু পরিবারের কত স্নেহশীলা জননী এবং কত দয়াময়ী শাশুড়ীকে তাঁহাদের অতি স্নেহের ধন বিধবা কন্যা বা পুত্রবধূর ত্বরায় মৃত্যু কামনা করিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে শুনিয়াছি। ... এক্ষণে যদি আমাদের মিলিত আন্তরিক চেষ্টা যত্নে একটি স্থায়ী বিধবাশ্রম স্থাপিত হয় তাহা হইলে বড়ই সুখের বিষয় হইবে। কোন স্থানে কিরূপ ভাবে আশ্রমটি স্থাপিত হইলে ভাল হয় ইহাতে বিধবাগণের কিরূপ শিক্ষা হইবে, উপস্থিত কত টাকা হইলে কার্যারম্ভ সম্ভব হইতে পারে, ইত্যাদি সকল বিষয় এই পত্রিকায় আলোচনা হওয়া দরকার। শুধু কাগজে লেখা থাকা আমারও ইচ্ছা নয়। সহৃদয়া পাঠিকাগণ। আপনাদের স্বভাবগত দয়া মায়া সহানুভূতি প্রদর্শন করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট সময় উপস্থিত হইয়াছে, অগ্রসর হউন, আর উদাসীনভাবে নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিবেন না।"[৯২] একই মত পোষণ করে শ্রী বসন্তকুমারী বসু লিখেছিলেন : "...বঙ্গ-বিধবাদিগের নিমিত্ত এরূপ কোনও আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক, যাহাতে বঙ্গবিধবাগণ জ্ঞানের উন্নতি সাধন করিতে ও অর্থকরী নানা বিদ্যায় পারদর্শিনী হতে পারেন। পণ্ডিতা রমাবাঈ প্রতিষ্ঠিত "সারদাসদনের অভ্যুদয় দুঃখিনী বিধবাগণের অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশে আশালোক সঞ্চার করিয়াছে। বঙ্গদেশে সর্ব্বশ্রেণীর সহানুভূতি সমন্বিত একটি "বিধবাশ্রমের প্রতিষ্ঠিত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।[৯৩]

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে সমাজ সংস্কারকরা যাই ভাবুন মেয়েরা তাদের নিজেদের সমস্যা নিয়ে শুধু চিন্তাই করেনি, তারা সাধ্যমত তার সমাধানের উপায় নির্ধারণ করার চেষ্টাও করেছিলেন। প্রসন্নময়ী দেবী বা সরস্বতী সেনের মতো রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্না নারী যেমন ছিলেন তেমন প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন নারীও ছিলেন। তাঁরা সাধ্যমতো সমস্যার উৎস ও প্রকৃতি বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। তাই সমাজ সংস্কার কর্মসূচীতে মেয়েদের কোন ভূমিকা ছিল না তাঁরা ছিলেন নিছক নিষ্ক্রিয় সংস্কারযোগ্য বিষয়, এ ধারণা তাঁরা নিজেরাই ভেঙে দিয়েছিলেন।

তবু ঊনবিংশ শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিতে সমাজসংস্কার কর্মসূচীতে মেয়েদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ পুরুষের কাছে অচিন্ত্যনীয় ও অপ্রত্যাশিত ছিল। তাঁরা মহিলাদের অবস্থার উন্নতিকল্পে সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন কিন্তু তার পশ্চাৎপটে ছিল তাঁদের নিজস্ব চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী। মহিলাদের বাস্তব অবস্থার পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক এই চিন্তা নিয়ে প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন রাজা রামমোহন রায়।

৯২ অন্তঃপুর পত্রিকা, "বঙ্গবিধবা" শ্রীবরদাবাসিনী বসু, অগ্রহায়ণ ১৩১১।
৯৩ অন্তঃপুর পত্রিকা, "বঙ্গবিধবা" শ্রীবসন্ত কুমারী বসু, মাঘ ১৩১১।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বঙ্গমহিলার মুক্তির প্রশ্নে প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্ব

নারীমুক্তির দুই দৃষ্টিকোণ

১৮১৫ সালে যখন রামমোহন কলিকাতায় এসে বাস করতে শুরু করলেন এবং আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা করলেন তখন থেকে নাবী, বিশেষভাবে বঙ্গনারীর অবস্থার উন্নতির বিষয়টি সামাজিকভাবে আলোচিত হতে শুরু হয়েছিল। একই সময়ে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের তরফ থেকে সামান্যভাবে হলেও নারী প্রশ্নের একটি রাষ্ট্রিক মীমাংসার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সম্ভবত এই কারণে অন্তত সতীদাহ প্রথা নিবারণ এবং বিধবাবিবাহ প্রচলনের বিষয়ে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করেছিল।[১] এই সংস্কার কাজের পেছনে ইউরোপ থেকে আগত চিন্তাধারার প্রভাব ছিল যথেষ্ট। একদিকে উপনিবেশবাদ অন্যদিকে উদারনীতি এই দুয়ের সাথে যুক্ত হয়ে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকদের খ্রীষ্টীয় সভ্যতা সম্প্রসারণের নীতি উনবিংশ শতকের প্রথম অর্ধে ভারতে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল যেখানে নারীজীবনের সংহারক কতকগুলি সামাজিক কুপ্রথা দূর করা একান্তভাবে আবশ্যক হয়ে পড়েছিল।[২] শুধু তাই নয়, এই দূর করার কাজটি রাজনৈতিক চাহিদায় পরিণত হয়েছিল। ফলে, ব্রিটিশ সরকার, তখন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সরকার, সতীদাহের মতো একটি বীভৎস প্রথা রদ করে বা বিধবাবিবাহ প্রচলন করে বালবিধবা নারীদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে এনে সেই সময়কার একটি প্রধান সামাজিক দাবী মিটিয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই সমাজসংস্কার আন্দোলনগুলিতে প্রথমে নারীর জৈবিক অস্তিত্ব রক্ষা করাই প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সতীদাহ প্রথা লোপ করার আন্দোলনে তাই রামমোহন প্রথমে চেষ্টা করেছিলেন অকাল-বৈধব্যের অপরাধে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া অসহায় নারীর প্রাণরক্ষা করতে। প্রাণে বেঁচে যাওয়া বালবিধবারা যে সামাজিক নিপীড়নের শিকার হল, তাতে যেমন নারীর অবস্থা হীন থেকে হীনতর হল, তেমন তাদের অচরিতার্থ অবদমিত কামনা-বাসনা সমাজে বইয়ে দিল ব্যভিচারের স্রোত। এই কলুষ থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্য ঐ সব বঞ্চিত বালবিধবাদের সুস্থ জীবনে স্থাপিত করতে হবে এই ভাবনা থেকে বিদ্যাসাগর শুরু করলেন বিধবাবিবাহ আন্দোলন। রামমোহন বা বিদ্যাসাগর উভয়েই নারীদের হীনাবস্থা দেখে বিচলিত হয়েছিলেন আর তাঁরা তাঁদের সাধ্যাতীত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নারীজাতির উন্নতি বিধানের জন্য চেষ্টা করে গেছেন।

প্রচলিত সমাজ ও পরিবার কাঠামোর মধ্যেই তাঁরা মেয়েদের জন্য আরো একটি সুপ্রশস্ত স্থান, আরো একটু মর্যাদা, আরো একটু সহমর্মিতার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। সতীদাহ প্রথা যদিও বা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল, বিধবাবিবাহ আদৌ ফলপ্রসূ হয়নি। এরপর কেশবচন্দ্র সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন। তিনি ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সমাজসংস্কার আন্দোলন শুরু করলেন। তাঁর পাশ্চাত্য মনীষা তাঁকে মেয়েদের

দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে দিল না। তিনি নিজ স্ত্রীকে ধর্মান্তরিত করে ও পরিবারের বাইরে এনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য আন্দোলন করে পাশ করালেন ভারতীয় বিবাহবিধি আইন বা তিন আইন। মেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা, বিস্তারিত শিক্ষাসূচী তৈরী করা, পত্রিকা প্রকাশ করা, নারী সংগঠন গড়ে তোলা ইত্যাদি বহুমুখী নারী কল্যাণমূলক কাজের কাণ্ডারী কেশবচন্দ্র শেষ পর্যন্ত কবুল করলেন যে গৃহই হল মেয়েদের আসল জায়গা। তাদের ধর্ম সুগৃহিণী, সুমাতা ও যোগ্যসহধর্মিনী হওয়া। গৃহকে শ্রীমণ্ডিত করে তাকে যথার্থভাবে ঈশ্বরের আগার করে তোলার প্রধান দায়িত্ব নারীর, আর এ জন্যই সে যতটুকু দরকার নিজেকে শিক্ষিত, পরিশীলিত ও জ্ঞানবতী করে তুলবে। এর বেশী শিক্ষা তার দরকার নেই। পুরুষের মতো কঠিন জ্ঞানার্জনের পথ মেয়েদের পক্ষে অনুপযুক্ত।

এই পরিস্থিতিতে ১৮৭০-এর দশকে বাংলাদেশে নতুন করে রাজনীতির উদ্ভব ঘটেছিল। "১৮৭৪ সালে একদিকে আনন্দমোহন বসু বিলাত হইতে ফিরিলেন; অপরদিকে সেই সময়েই বা কিঞ্চিৎ পরেই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ম হইতে অবসৃত হইয়া কলিকাতাতে আসিয়া বসিলেন। ইহারা উভয়েই ছাত্রদলের মধ্যে কার্য আরম্ভ করিলেন। হাজার হাজার যুবক ইহাদের কথা শুনিবার জন্য ছুটিতে লাগিল; এবং হাজার হাজার হৃদয়ে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা ও স্বদেশানুরাগ প্রবল হইয়া উঠিল; যুবকদল যেন ব্রাহ্ম সমাজের দিকে পিঠ ফিরাইল এবং রাজনীতি এবং জাতীয় উন্নতির দিকে মুখ ফিরাইল"[৩] শুধু যুবকদল নয়, এই সময় সমাজসংস্কার আন্দোলনের প্রধান ও অভিজ্ঞ নেতারাও আর তত্টা সক্রিয় ছিলেন না। ১৮৭১ সালে বিদ্যাসাগর 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' নামে বহুবিবাহ নিবারণার্থ প্রথম পুস্তিকাটি প্রকাশ করলেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হল এই বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তিকাটি। পুস্তিকা দুটিতে বিদ্যাসাগর কৌলীন্য প্রথার উৎপত্তি, বিকাশের ইতিহাস ও কুফলসমূহ বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছিলেন।[৪] বস্তুত বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ সালেই আইন দ্বারা বহুবিবাহ রদ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। ঐ বছর ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে বিদ্যাসাগর ভারত সরকারের কাছে যে আবেদনপত্র পাঠালেন তাতে লেখা হল : "বাংলাদেশে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন যাঁরা বিবাহের পবিত্র অধিকারকে লজ্জাজনক ব্যবসার স্তরে নামিয়ে এনেছেন। এই সকল ব্যক্তিগণ সামান্য অর্থলাভের জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরে বহুসংখ্যক কুমারী মেয়ের পানিগ্রহণ করে থাকেন, এদের মধ্যে অধিকাংশের আর কখনো বিবাহিত জীবনের আশীর্ব্বাদ ভোগ করার সুযোগ ঘটে না। ন্যায় ও মানবতার প্রতিস্পর্ধী এই প্রথাটি যে কতবড় দোষ তা বর্ণনা করা অপেক্ষা অনুমান করা সহজতর।"[৫]

---

৩ শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, সাক্ষরতা প্রকাশন, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, কলিকাতা ৯, ৫ই জুলাই, ১৯৭৯, পৃ: ৪৩০।

৪ গীতশ্রী বন্দনা সেনগুপ্ত, *স্পন্দিত অন্তর্লোক*: আত্মচরিতে নারী প্রগতির ধারা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলিকাতা-৭৩, জানুয়ারী ১৯৯৯, পৃ: ৫২।

৫ "There is a class of Brahmins in Bengal, called coolins, with whom the sacred rite of matrimony has been notoriously degraded to a system of shameful traffic.

এরপর সাময়িকভাবে এই সমস্যাটি ধামাচাপা পড়ে থাকল ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের জন্য। ১৮৬৩ সালে বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে আবার বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলন মাথাচাড়া দিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হয়ে উঠল রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে রক্ষণশীল হিন্দুরা। রাধাকান্তের উদ্যোগে তাঁরা সরকারের কাছে একটি আবেদন জানালেন এই মর্মে যে বহুবিবাহ নিবারণ করার জন্য আইন প্রণয়ন করার কোন দরকার নেই। কৃষ্ণনগরের মহারাজ সতীশচন্দ্রের সাহচর্যে বিদ্যাসাগর একটি পাল্টা আবেদনপত্র পেশ করলেন তাতে ধনী দরিদ্র শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষ স্বাক্ষর দিল। কিন্তু বাংলার প্রাদেশিক সরকারের অনুরোধ সত্ত্বেও ভারত সরকার এই বিষয়ে কোন বিল আনার অনুমতি দিল না। তখন প্রাদেশিক সরকার বহুবিবাহ সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করল, যার অন্যতম সদস্য ছিলেন বিদ্যাসাগর। এই কমিটি মত প্রকাশ করল যে গত কয়েক বছরে বহুবিবাহ সম্পর্কে হিন্দুদের মনোভাবের যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে, একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করাকে সমাজ এখন ভালো চোখে দেখে না, শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথা আপনা থেকেই লোপ পাবে, আইনের সাহায্যের প্রয়োজন হবে না। কিন্তু বিদ্যাসাগর তখনও এই বিশ্বাসে অটল ছিলেন যে আইনের সাহায্য ছাড়া বহুবিবাহ রোধ করা যাবে না। তিনি তাঁর মতভেদের কথা কমিটির অন্যান্য সদস্যদের স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন।[৬]

এর কয়েক বছরের মধ্যেই বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ে দুটি পুস্তিকা পরপর প্রকাশ করলেন একথা আগেই বলা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা' একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সনাতন হিন্দুধর্ম রক্ষার উদ্দেশ্যে এই সভাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১২৭৫ বঙ্গাব্দের ১১ই ফাল্গুন (১৮৬৮ সালে)। নাম থেকেই বোঝা যায় যে এই সভার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রক্ষণশীল হিন্দুরা। কিন্তু সামাজিক কোন কোন সমস্যা সম্পর্কে এই সভার কিছু কিছু সদস্যের দৃষ্টিভঙ্গী উদার ছিল। এরই বশবর্তী হয়ে 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা' কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। অনিষ্টকর এই প্রথা দূর করার জন্য রাজনীতির সহায়তা গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক—এই মত সভার অধিকাংশ সদস্য মেনে নিয়েছিলেন।[৭] এসব দেখেশুনে বিদ্যাসাগর আবার বহুবিবাহ নিবারণ আন্দোলনে ফিরে এলেন, কারণ সরকারী কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ হবার পর ও দীর্ঘকাল শারীরিক অসুস্থতা ভোগ করার জন্য তিনি তাঁর বহুবিবাহবিষয়ক পুস্তিকা রচনা ও মুদ্রণের কাজ সমাপ্ত করার

These men for the sordid gain of some paltry sum visit village, accepting the hands of scores of maidens the great majority of whom are destined never to enjoy the blessing of wedded life. It is easier to conceive than to describe the enormous evils, which must result from a system so revolting to justice and humanity — *The friend of India, Hindoo Polygamy and 'Orthodox' refomers*, নামক প্রবন্ধ, ৩০শে মার্চ ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ।

৬ স্বপন বসু, *সমকালে বিদ্যাসাগর*, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা ৭০০ ০০৯, জানুয়ারী ১৯৯৩, পৃ: ৫৯-৬৩।

৭ তদেব, পৃ: ৬৫।

কোন উৎসাহ পাননি। কিন্তু এখন 'সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা' তাঁকে আবার একাজে প্রবৃত্ত করল। কারণ, বিদ্যাসাগর দেখলেন ঐ সভার সদস্যরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে বহুবিবাহ নিবারিত হলে "শাস্ত্রের অবমাননা ও ধর্ম্মের ব্যতিক্রম ঘটিবে কিনা", এ বিষয়ে "তাঁহাদের কিছু আনুকূল্য হইতে পারিবেক এই ভাবিয়া, আমি পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম।"[৮]

দেখা যাচ্ছে যে সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা বাঙালী বুদ্ধিজীবী মহলে বেশ গুরুত্ব লাভ করেছিল, কারণ, স্বয়ং বিদ্যাসাগর ঐ সভাকে এতটাই প্রাধান্য দিয়েছিলেন যে বিরক্তি, হতাশা ও অসুস্থতা ঝেড়ে ফেলে তিনি আবার বহুবিবাহ নিবারণার্থে অর্ধসমাপ্ত পুস্তিকা সমাপ্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু, যাদের জন্য তিনি এই আয়াস করলেন, তারা কিন্তু বিদ্যাসাগরের বিরোধিতা করতে কুণ্ঠিত হল না।[৯] ১২৭৮ (১৮৭১ সাল) বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার বিশিষ্ট সদস্যরা যেমন, কৃষ্ণমোহন মল্লিক, খেলাতচন্দ্র ঘোষ, যদুলাল মল্লিক প্রমুখ বহুবিবাহ নিবারণের জন্য রাজবিধান চাওয়ার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেন।[১০]

শুধু, সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভাই নয়, সোমপ্রকাশ পত্রিকার সম্পাদক বিদ্যাসাগরের অন্তরঙ্গ বন্ধু দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রথমে বহুবিবাহ নিবারণের পক্ষে ছিলেন, কিন্তু তিনিও আইন পাশ করে সামাজিক কুপ্রথার উচ্ছেদের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি লিখলেন : "আমরা বিস্মিত হইলাম ... বিদ্যাসাগরও বহুবিবাহকে শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য বৃথা বহুল প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহাতে ইষ্ট লাভ কি? বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ এই কথা শুনিলেই কি এদেশের লোক ভীত হইয়া তাহা হইতে বিরত হইবেন? ইহারা মুখে বলেন শাস্ত্র অনুসারে চলেন কিন্তু ব্যবহার দেখিয়া বোধ হয় শাস্ত্র মানেন না।"[১১]

দ্বিতীয় যে জন প্রথমে বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করে আইনের সাহায্যে বহুবিবাহ প্রথা নিবারণের পক্ষপাতী ছিলেন অথচ পরে তাঁর মত পরিবর্তন করেছিলেন, তিনি হলেন সংস্কৃত কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক তারানাথ তর্কবাচস্পতি। তিনি লিখলেন : "... বিদ্যাচর্চার প্রভাবে বা যে কারণে হউক ঐ কুৎসিত বহুবিবাহ প্রণালী অনেক পরিমাণে ন্যূন হইয়াছে। আমার বোধহয় অল্পকালের মধ্যে উহা এককালে অন্তর্হিত হইবে। অতএব তজ্জন্য আর আইনের আবশ্যকতা নাই, সকল সময়ে সকল আইন আবশ্যক হয় না।"[১২]

বহুবিবাহ যে সমাজের অনিষ্টকারক, সকলের বর্জনীয় এবং স্বাভাবিক নীতিবিরুদ্ধ—এ রকম মত পোষণ করতেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বিদ্যাসাগর যে বহুবিবাহকে অশাস্ত্রীয় বলে

৮ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, *বিদ্যাসাগর রচনাবলী*, ১ম খণ্ড। রিফ্লেক্ট পাব্লিকেশন, কলিকাতা-৯ "বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব", পৃ: ৪৫৮।

৯ সমকালে বিদ্যাসাগর, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫২-৫৩।

১০ স্পন্দিত অন্তর্লোক, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫২-৫৩।

১১ সোমপ্রকাশ পত্রিকা, ৩০শে শ্রাবণ, ১২৭৮ বঙ্গাব্দ।

১২ সোমপ্রকাশ পত্রিকা, ১৩ই ভাদ্র, ১২৭৮ বঙ্গাব্দ।

প্রমাণ করতে চাইছিলেন তার বিরোধিতা করে বঙ্কিম লিখলেন : "জিজ্ঞাস্য এই, এ প্রথা কি প্রকারে নিবারিত হওয়া সম্ভব? বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক, বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করা তাহার একটি প্রধান। ... মনে করুন, দেশসুদ্ধ লোক সকলেই স্বীকার করিল যে, বহুবিবাহ প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র বিরুদ্ধ। তাহাতে কি বহুবিবাহ প্রথা নিবারিত হইবে? আমরা সে বিষয়ে বিশেষ বিশেষ সংশয়াবিষ্ট।"[১৩] সমস্ত প্রবন্ধ জুড়ে বঙ্কিম বিদ্যাসাগরকে সমালোচনা করেছেন এই কারণে যে বিদ্যাসাগর খামকা কেন বহুবিবাহ অশাস্ত্রীয় একথা প্রমাণ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। হিন্দুসমাজ লোকাচারের বশ। যদি শাস্ত্রসম্মত হয় অথচ লোকাচারবিরুদ্ধ তবে সেই কাজ সমাজে প্রচলিত করানো সম্ভব? এর আগে বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রচলন করার চেষ্টা করেছিলেন, তার আগে বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত সে কথা তিনি বহু যত্নে ও পরিশ্রমে প্রতিপন্ন করেছিলেন। আবার, রাজদ্বারে আবেদন ও সমাজে আন্দোলন উপস্থিত করে তিনি বিধবাবিবাহের সপক্ষে আইন পাশ করিয়েছিলেন, কিন্তু বঙ্কিমের যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন : "অনেকেই তাঁহার মতাবলম্বী; কিন্তু কয়জন স্বেচ্ছা পূর্ব্বক বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা বা অনুষ্ঠেয়তা অনুভূত করিয়া আপন পরিবারস্থ বিধবাদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ দিয়াছেন?"[১৪]

বহুবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করার অসারতা বা আইন করে তা বন্ধ করার অপ্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করতে গিয়ে বঙ্কিম যে অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করেছেন তা এইরকম : "আর একটি কথা এই যে, এ দেশে অর্দ্ধেক হিন্দু, অর্দ্ধেক মুসলমান। যদি বহুবিবাহ নিবারণ জন্য আইন হওয়া উচিত হয়, তবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্বন্ধেই সে আইন হওয়া উচিত। হিন্দুর পক্ষে বহুবিবাহ মন্দ, মুসলমানের পক্ষে ভাল, এমত নহে। কিন্তু বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া, মুসলমানের পক্ষেও তাহা কি প্রকারে দণ্ডবিধি দ্বারা নিষিদ্ধ হইবে? রাজব্যবস্থা বিধাতৃগণ কি প্রকারে বলিবেন যে, "বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রবিরুদ্ধ, অতএব যে মুসলমান বহুবিবাহ করিবে, তাহাকে সাত বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হইতে হইবে।" যদি তাহা না বলেন, তবে অবশ্য বলিতে হইবে যে, "আমরা বড় প্রজাহিতৈষী ব্যবস্থাপক বটে; প্রজার হিতার্থ আমরা বহুবিবাহ কুপ্রথা উঠাইব; কিন্তু আমরা অর্দ্ধেক প্রজাদিগের মাত্র হিত করিব। ..."[১৫] এই সমস্ত বিচার বিবেচনার পর বঙ্কিম বহুবিবাহ নিবারণ প্রসঙ্গে যে সিদ্ধান্তে এলেন তা হল "যে কয়েকটি কথা বলা আমাদিগের উদ্দেশ্য, তাহা সংক্ষেপে পুনরুক্ত করিতেছি।

১। বহুবিবাহ অতি কুপ্রথা; যিনি তাহার বিরোধী, তিনিই আমাদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন।

২। বহুবিবাহ এ দেশে স্বতঃই নিবারিত হইয়া আসিতেছে; অল্পদিনে একেবারে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা; তজ্জন্য বিশেষ আড়ম্বর আবশ্যক বোধ হয় না। সুশিক্ষার ফলে উহা অবশ্য লুপ্ত হইবে।

---

১৩ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিম রচনাবলী*, দ্বিতীয়খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা - ৯, "বিবিধ প্রবন্ধ — বহুবিবাহ", পৃ: ৩১৫।

১৪ তদেব, পৃ: ৩১৬।

১৫ তদেব, পৃ: ৩১৮।

৩। এ কথা যদিও সত্য বলিয়া স্বীকার না করা যায়, তবে ইহার অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়া কোন ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করা যাইতে পারে না।

৪। আমাদিগের বিবেচনায় বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি প্রজার হিতার্থ আইনের আবশ্যকতা আছে, ইহা স্থির হয়, তবে ধর্মশাস্ত্রের মুখ চাহিবার আবশ্যক নাই।"[১৬]

বিদ্যাসাগরের মতো নারী-দরদী পুরুষ বাংলাদেশে আর জন্মাননি একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। তাঁর পরবর্তী প্রজন্মে কেশবচন্দ্রও মেয়েদের জন্য যথেষ্ট ভাবনাচিন্তা করেছেন এবং তাঁর অনন্যসাধারণ সংগঠনী প্রতিভা দিয়ে মেয়েদের জন্য একাধিক সভা ও পত্রিকা প্রবর্তন করেছেন। কিন্তু সমস্যাটির সামধান সম্পর্কে তাঁদের প্রত্যেকের মূলগত ধারণাটি ছিল ভিন্ন। বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে তা ছিল শাস্ত্রের অনুমোদন আর কেশবচন্দ্রের ক্ষেত্রে তা ছিল ঈশ্বরভক্তি। এঁদের কেউই মুক্ত মনে মেয়েদের অবস্থার উন্নতির কাজে অগ্রণী হতে পারেননি। কিন্তু এই প্রথম দেখা গেল যে একটি কুপ্রথা শুধুমাত্র কুপ্রথা, তা অহিতকর, অবমাননাকর বলেই তা নিবারণযোগ্য এই মানসিকতা সমাজের মধ্যে ব্যাপ্ত হচ্ছে। প্রতিভাধর বঙ্কিম তাঁর অসাধারণ ও তীক্ষ্ণ যুক্তিবলে ও ভাষার শৌর্যে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ ও সম্ভ্রম আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু সমসাময়িক কালে তাঁর সমমনস্ক ব্যক্তির অপ্রতুলতা ছিল না। এদেরই একজন হলেন ঢাকা বিক্রমপুর অঞ্চলের রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা; যেমন — ফরিদপুর, ঢাকা, বিক্রমপুর ইত্যাদি স্থানে বহুবিবাহ আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করেছিল। এর অন্তত কিছুটা কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন "কুলীন সন্তান, প্রাচীন সম্প্রদায়ভুক্ত ও ইংরাজী অনভিজ্ঞ" রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। ব্রজসুন্দর মিত্র, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায়, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কুলীন বংশের ব্রাহ্মণ-কায়স্থরা এই আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় সমধিক খ্যাতিমান হয়েছিলেন তার প্রধান কারণ এই যে তিনি স্বয়ং বিদ্যাসাগরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁর স্বরচিত জীবনীর মধ্যে পূর্ববঙ্গের আন্দোলনের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছিলেন এবং বিদ্যাসাগর ঐ আত্মজীবনী ছাপাবার সমস্ত ব্যয় বহন করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের আনুকূল্য ব্যতীত ঐ গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হত না।[১৭]

আত্মজীবনীতে রাসবিহারী লিখেছেন : "পিতৃব্য শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই আমার অভিভাবক ছিলেন, দরিদ্রতাবশতঃ আমাকে অতি অল্পকাল মধ্যেই তিনি ৮টি বিবাহ করান। আমি বাল্যকাল হইতেই বহুবিবাহের প্রতি বিদ্বেষী ছিলাম, সুতরাং সম্বন্ধ নিয়া ঘটক আসিলেই নানা স্থানে পলাইয়া যাইতাম। বহুবিবাহে সম্মতি থাকিলে বোধ হয় আমাকে শতাধিক

১৬ তদেব, পৃ: ৩১৮-১৯।

১৭ বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ,* ওরিয়েন্ট লংম্যান, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৩, পৃ: ২৯২।

রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে হইত।"[১৮] রাসবিহারী পূর্ববাংলার বহুবিবাহ নিবারণ আন্দোলনে যে কি অপরিসীম প্রভাব ফেলেছিলেন সে সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করে অমৃতবাজার পত্রিকা লিখল : "সুতরাং এই আন্দোলনটি কোন হিন্দুধর্ম্মে অবিশ্বাসী ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ যুবকের দ্বারা উৎপত্তি হইলে যেমন হিন্দুসমাজে অগ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা হইত, তাহা আর হইবে না। বিশেষতঃ যখন আমরা দেখিতেছি যে ঢাকার হিন্দু হিতৈষিণী পত্র ইহার সপক্ষতা করিতেছে, তখন ইহা যে ঢাকার হিন্দুসমাজের অনুমোদিত তাহা বলা যাইতে পারে।"[১৯]

অবশ্য ব্রাহ্মরাও বহুবিবাহ নিবারণ আন্দোলনে পিছিয়ে ছিল না। ঢাকা বিক্রমপুর অঞ্চলে হিন্দু আন্দোলনকারীদের পাশাপাশি সারদাকান্ত ও বরদাকান্ত হালদার, নবকান্ত, নিশিকান্ত ও শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় এবং অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ যুবকদল বিপন্ন কুলীন কন্যাদের বহুবিবাহ থেকে উদ্ধার, সৎপাত্রে অর্পণ ইত্যাদি কাজে নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করে আত্মনিয়োগ করেন। বিধুমুখীহরণ মামলা এদের বহু অসমসাহসিক কাজের মধ্যে একটি। বিধুমুখী নামক এক কুলীন কন্যার বিবাহ স্থির হয় বহুবিবাহকারী এক অতি বৃদ্ধের সঙ্গে। এঁরা তখন বিধুমুখীকে উদ্ধার করে বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ উকিল দুর্গামোহন দাসের আশ্রয়ে রাখলেন। বিধুমুখীর পিতৃব্য হরণকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করেন। বিধুমুখী আদালতে স্বীকার করলেন যে তিনি স্বেচ্ছায় বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন। একই সঙ্গে তিনি এ আবেদনও রাখলেন যে আদালত যেন তাঁকে এই রকম বিবাহের হাত থেকে রক্ষা করেন। মামলাতে বিধুমুখীর জিত হয়।[২০]

১৮৭০ সালে কেশবচন্দ্র বিলাত থেকে ফিরে এলে পর কলিকাতায় ব্রাহ্মদের সমাজসংস্কার যেমন বৃদ্ধি পেল তেমনি ব্রাহ্ম আন্দোলনের মধ্যে আরো বিভেদ ও ভাঙনের সূত্রপাত ঘটল। নিঃসন্দেহে এই ঘটনা ব্রাহ্ম আন্দোলনকে দুর্বল করে জনমানসে তার প্রভাব হ্রাস করল। কিন্তু তার আগে ব্রাহ্মদের কার্যকলাপের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। কে শব ইংলন্ড থেকে ফিরে ভারত সংস্কার সভা নামে একটি সভা স্থাপন করলেন। তার পাঁচটি কাজের মধ্যে চতুর্থটি ছিল স্ত্রীশিক্ষা। "স্ত্রীশিক্ষা বিভাগে বয়স্থা মহিলাদিগের জন্য এক বিদ্যালয় খোলা হইল; তাহাতে আমাদের অনেক স্ত্রী ভগিনী প্রভৃতি বয়স্থা মহিলাগণ পাঠ করিতে লাগিলেন; এবং আমরা কয়েকজন তাহার শিক্ষক হইলাম।..."[২১] ভারত সংস্কার সভার পঞ্চম কাজ দাতব্য বিতরণ সূত্রে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পরিচয় পাওয়া গেল। শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ অদ্বৈত বংশের সন্তান এবং মেডিকেল কলেজের ছাত্র বিজয়কৃষ্ণ যৌবনের প্রারম্ভে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ঐ ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি নিজেকে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের কাজে অর্পণ করেন। "তিনি প্রত্যূষে উঠিয়াই স্নান ও ঈশ্বরোপাসনা সারিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগপূর্ব্বক, ঔষধ ও পথ্যাদি

১৮ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত (কলিকাতা ১৮৮১), বিনয় ঘোষের পূর্বোক্ত গ্রন্থের ২৯৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১৯ অমৃতবাজার পত্রিকা, ১২৮৩ সাল ২০ সংখ্যা।

২০ স্পন্দিত অন্তর্লোক, পূর্বোক্ত, পৃ: পৃ: ৫৫-৫৬।

২১ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪২৫।

লইয়া বেহালাতে গমন করিতেন;এবং সেখানে ১০/১১ টি পর্যন্ত রোগী দেখিয়া এবং ঔষধ বিতরণ করিয়া ১২টার সময় শহরে ফিরিতেন; ফিরিয়া আহার করিয়াই বয়স্থা বিদ্যালয়ে গিয়া পাঠদানকার্যে নিযুক্ত হইতেন। সে সময়ে তাঁহার যে পরিশ্রম দেখিয়াছি গভর্ণমেণ্টের কোনও উচ্চ বেতনভোগী কর্মচারীকে তত পরিশ্রম করিতে কখন দেখি নাই।"[২২]

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করলেন ভারত আশ্রম। এটি প্রকৃতপক্ষে ধর্মশিক্ষার আবাসগৃহ। এখানে পূর্ব থেকে ধর্ম ও নীতিশিক্ষার জন্য বিভিন্ন পরিবারের পুত্র কন্যা ও স্ত্রীদের পাঠানো হত। মেয়েদের পর্দাপ্রথা এখানে তুলে দেওয়া হয়েছিল। মেয়েদের জন্য 'দি নেটিভ লেডিস নর্মাল স্কুল' এই আশ্রমের ভেতরই বসত। 'বামাহিতৈষণী সভা'র অধিবেশনও এই আশ্রমগৃহে বসত। মেয়েদের একদিকে জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্যের শিক্ষা, অপরদিকে সুনীতি, সদাচার, ঘর সাজানো, বাড়ি পরিষ্কার রাখা, কলা শিক্ষা ইত্যাদি শিক্ষার মধ্য দিয়ে প্রতিটি নারীকে সুশিক্ষিত ও সুসংহতিসম্পন্ন করে তোলাই ছিল ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের লক্ষ্য।[২৩]

এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বে বাংলা দেশে স্ত্রী স্বাধীনতার আন্দোলন ও চর্চা উপস্থিত হয়। পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর প্রদেশ থেকে কলকাতায় আসেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন নির্ভীক নারীহিতৈষী, দৃঢ়চেতা ও একাগ্রচিত্ত। তাঁর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত একটি সাপ্তাহিক পত্র, নাম "অবলাবান্ধব"। কলকাতায় আসার সময় দ্বারকানাথ এই পত্রিকাটিকেও সঙ্গে নিয়ে আসেন। এতে নারীদের শিক্ষা ও উন্নতি সম্বন্ধে যে লেখা প্রকাশিত হত তাতে অত্যন্ত অগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যেত। এইখানেই ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে বিরোধের বীজ সুপ্তাবস্থায় ছিল।[২৪] "অবলাবান্ধব" পত্রিকা কলিকাতায় প্রকাশিত হতে শুরু করলে নতুন নতুন লেখকদের রচনা তাকে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এক প্রবল শক্তিতে রূপান্তরিত করল। দ্বাবকানাথ গাঙ্গুলী ও দুর্গামোহন দাসের নেতৃত্বে একদল যুবক পরিচিত হল প্রগতিশীল বলে, অন্যদিকে একদা প্রগতিশীল কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরা পরিচিত হলেন রক্ষণশীল বলে। প্রথম বিরোধের সূত্রপাত হল কী ধরনের লেখাপড়া মেয়েদের শেখানো হবে এবং মহিলাদের উচ্চশিক্ষা দেওয়া হবে কিনা এই বিষয় নিয়ে। কেশব ও তাঁর সমর্থকরা মনে করতেন যে মেয়েদের জ্যামিতি, দর্শন ইত্যাদি বিষয় পড়া অনাবশ্যক, কারণ এই বিষয়গুলি নিতান্তই পুরুষোচিত। আবার শিবনাথ শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অন্নদাচরণ খাস্তগীর, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ দাবি করলেন যে মেয়েদের সকল বিষয় পড়ার ও সর্বোচ্চ জ্ঞানলাভের অধিকার আছে।[২৫] একদিকে আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র

২২ তদেব।
২৩ ঝরা বসু, *কেশবচন্দ্র সেন ও সমকালীন ব্রাহ্মসমাজ,* প্রমা প্রকাশনী, কলিকাতা - ১৭, অগ্রহায়ণ ১৪০১, পৃ: পৃ: ১১৩-১১৪।
২৪ *রামতনু লাহিড়ী* ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪২৪।
২৫ সংকোচের বিহ্বলতা, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৭।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা লিখল : "আমরা স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষার বিরোধী নহি। ... কিন্তু যে সমস্ত পুস্তক পাঠ করিলে স্ত্রীজাতি উৎকৃষ্ট গৃহিণী ও মাতা হইতে পারে তাহাই তাহাদের বিশেষ পাঠ্য। বর্তমানকাল বিলাসপ্রধান কাল। অধিকাংশ স্ত্রীলোক গার্হস্থ্য কার্য্যে উদাসীন, কেবল বিলাস লইয়াই ব্যস্ত।...গৃহকার্য্য দূরে থাক গৃহিণীগণের পুত্রকন্যা প্রতিপালনও অন্যের হস্তে।"[২৬]

অন্যদিকে, ১৮৭৩ সালে আনেত অ্যাক্রয়েড প্রতিষ্ঠা করলেন হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় নামে একটি মহিলা আবাসিক স্কুল। এখানে প্রথমে যে পাঁচটি মেয়ে ভর্তি হল, তাঁরা হলেন রামতনু লাহিড়ীর মেয়ে ইন্দুমতী, দুর্গামোহন দাস ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যারা, শ্রীনাথ দত্তের পত্নী হরসুন্দরী দত্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে শ্রীনাথ দত্ত তখন পড়াশোনার জন্য বিলাত গিয়েছিলেন। অবশ্য অ্যাক্রয়েডের এই পরিকল্পনা খুব কার্যকর হয়নি। এদেশের সংস্কৃতি এবং বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। তার চেয়েও যা গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই যে এই ধারণা গড়ে তোলবার মত মানসিক স্থৈর্য, ধৈর্য ও নমনীয়তা তাঁর মধ্যে অনুপস্থিত ছিল। যাহোক, ১৮৭৫ সালের ৫ই এপ্রিল তিনি হেনরী বিভারিজ নামে এক আই. সি.-কে, যিনি আবার হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, বিবাহ করে বারাসাত চলে গেলেন। এরপর স্কুলটির দায়িত্বভার নিলেন দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি এবং আনন্দমোহন বসু। কিন্তু অচিরেই এই স্কুলটি বন্ধ হয়ে গেল এবং ১৮৭৬ সালে বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় নামে তা আবার চালু হল।[২৭] এই বিদ্যালয় মহিলাদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করতে অগ্রসর হল। এই বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় পরে বেথুন স্কুলের সাথে মিলিত হয়ে বেথুন কলেজ রূপে পরিণত হল।[২৮]

এভাবে যখন ব্রাহ্মসমাজ প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল গোষ্ঠীতে বিভক্ত হতে চলেছে তখন আবার সনাতন হিন্দুদের সঙ্গে ব্রাহ্মদের বিরোধ ঘনিয়ে উঠল। কেশবচন্দ্রের অশেষ যত্ন, পরিশ্রম ও উদ্যোগে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বিশেষ বিবাহ আইন ও তিন আইন পাশ করা হল। এই আইন অনুসারে বিবাহে কন্যার নিম্নতম বয়স চোদ্দ ও পাত্রের আঠারো বৎসর নির্ধারিত হয়। এই বিশেষ বিবাহবিধি অনুযায়ী শুধু বাল্যবিবাহ অবৈধ বলে ঘোষিত হল তা নয়, এর দ্বারা বহুবিবাহকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা হল। এই আইনে বিধবা বিবাহ এবং অসবর্ণ বিবাহ স্বীকৃতি লাভ করল এবং বিবাহঅনুষ্ঠান ধর্মীয় বিধিবিধান থেকে মুক্ত হল। এই আইনের শর্তগুলি পর্যবেক্ষণ করলে একে আধুনিক ও ধর্মনিরপেক্ষ বিবাহব্যবস্থা বলে স্বীকার করতে কারো কোন দ্বিধা থাকার কথা নয়।[২৯]

এই তিন আইন বা বিশেষ বিবাহবিধি বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলেও এই আইনটি সমাজের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশে প্রযোজ্য ছিল। কারণ, শুধুমাত্র প্রচলিত

২৬ 'স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতা', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৮৭৮, পৃ: ১৫৪-১৫৬।

২৭ *The Changing Role of Women in Bengal*, 1849-1905, P.P. 89-90.

২৮ *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৪৩।

২৯ *স্পন্দিত অন্তর্লোক*, পূর্বোক্ত, পৃ: পৃ: ৬২-৬৩।

প্রধান ধর্মসম্প্রদায়সমূহ বহির্ভূত মানুষ এই আইনের আওতাভুক্ত ছিলেন। বিবাহের প্রতিজ্ঞা বিধি অনুযায়ী বিবাহকারীকে ঘোষণা করতে হত যে তিনি প্রচলিত হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদি প্রভৃতি কোন ধর্মে বিশ্বাস করেন না এবং ঐসব ধর্মের নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করতে অনিচ্ছুক।[৩০]

এই আইনটি অসন্তুষ্ট করল আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রাজনারায়ণ বসুকে। তাঁরা মনে করতেন যে এই আইন অনুযায়ী বিবাহকারী ব্রাহ্মকে 'আমি হিন্দু নই' ঘোষণা করতে হবে। তাছাড়া বিবাহ হল একটি ধর্মানুষ্ঠান, ধর্মীয় ব্যাপার বলেই তার বৈধতা, এই বৈধতা সম্পাদনের জন্য সিভিল অনুষ্ঠান প্রবর্তনের অনুমতি দিয়ে সরকার বিবাহের মতো একটি পবিত্র প্রথা এবং প্রজাদের চিরাচরিত ধর্মীয় অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করেছে। রাজনারায়ণ বসু ঘোরতর আপত্তি জানিয়ে লিখলেন : "সিভিল বিবাহ আইনের প্রতি আমার প্রধান আপত্তি এই যে ব্রহ্মের সম্মুখে ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্যদ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মের সম্মুখে যে বিবাহক্রিয়া সম্পাদিত হইল সে বিবাহের সন্তান সুজাত বলিয়া গণ্য হইবে না, যে পর্যন্ত না এমন এক ব্যক্তি, যাহার সহিত ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই অর্থাৎ রেজিস্ট্রার বলেন ঐ বিবাহ বৈধ। ধার্মিক ব্যক্তিরা এই বিবাহ পদ্ধতির কি প্রকারে অনুমোদন করেন তাহা বুঝিতে পারি না।"[৩১]

"আমি হিন্দু নই" এই কথাটি যদিও প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মদের আপত্তির একটি কারণ, তবুও সিভিল বিবাহ আইনে ব্রহ্মকে অস্বীকার, অগ্রাহ্য ও অতিক্রম করা হয়েছে এটি তাঁদের ক্রোধকে প্রজ্বলিত করেছিল। কিন্তু এঁদের সঙ্গে কণ্ঠ মেলালেন সনাতনী হিন্দুরাও। "এই আন্দোলন চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের জাতীয় সভা এবং শোভাবাজারের রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর ও কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা প্রধান রূপে বিবাহ ক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। জাতীয়সভার উদ্যোগে "হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা" বিষয়ে এক বক্তৃতা দেওয়া হইল। আদি সমাজের সভাপতি ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয় সেই বক্তৃতা দিলেন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বক্তৃতাতে সভাপতির কার্য করিলেন। অচিরকালের মধ্যে ঐ বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা এদেশের সর্বত্র এবং অপরদেশেও ব্যাপ্ত হইয়া গেল। সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার সভ্যগণ এবং তাঁহাদের সভাপতি রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এই বক্তৃতার দ্বারা উৎসাহিত হইয়া, হিন্দুধর্মের ও হিন্দু আচারাদির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনপূর্বক সুপ্রসিদ্ধ মনোমোহন বসু প্রভৃতির দ্বারা বক্তৃতা দেওয়াইতে লাগিলেন।

"কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী খেলাতচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ভবনে সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার অধিবেশন হইত। এই সভা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রাচীন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা, শাস্ত্রীয় সাত্ত্বিক আচারের প্রতিষ্ঠা, হিন্দুভাবের পুনরুত্থান, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অভ্যর্থনা, প্রভৃতি কার্য লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছিল। কিন্তু এই সময়েই ইহা একটি প্রবল শক্তিরূপে দাঁড়াইল। ছি!

৩০ তদেব।

৩১ রাজনারায়ণ বসু, *আত্মচরিত*, কলিকাতা, ১৯৫২, পৃ: ২০৯।

ছি। ব্রাহ্মগণ আপনাদিগকে হিন্দু বলিতে চায় না, এই রব যেমন দেশে উঠিয়া গেল, তেমনি এই সভার উদ্যোগে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের প্রয়াস বাড়িতে লাগিল।"[৩২]

সুতরাং, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন এক বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হল। একদিকে ব্রাহ্মদের নিজেদের মধ্যে দলাদলি অন্যদিকে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান সমস্ত কিছু এলোমেলো করে দিল। হিন্দুধর্মের এই নতুন করে শক্তি সঞ্চয় যেমন ব্রাহ্মসমাজের দলাদলির জন্য সম্ভবপর হয়েছিল, তেমনি আদি ব্রাহ্মসমাজ ও সনাতনী হিন্দুধর্মের মধ্যে আর কোন পার্থক্য রইল না। আরো লক্ষণীয় এই যে, যতদিন পর্যন্ত সমাজসংস্কার কার্যের পুরোধা ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ততদিন কিন্তু সনাতনী হিন্দুরা এভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারেননি। প্রখর সূর্যকিরণে যেমন আকাশের আর সব গ্রহ নক্ষত্র ঢাকা পড়ে যায় বিদ্যাসাগরের প্রখর ব্যক্তিত্ব তেমনি সমস্ত বিভেদ ও অনৈক্যকে অবদমিত রেখেছিল। বহুবিবাহ আন্দোলনের ব্যর্থতা, ব্যক্তিগত জীবনের নানা ঘাতপ্রতিঘাত যখন তাঁকে সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্র থেকে অপসারিত করল, তখন প্রথম প্রথম কেশবচন্দ্রের সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব, কর্মচাঞ্চল্য ও সংগঠনী প্রতিভা সমাজসংস্কারের বিকাশকে চলমান রাখল ঠিকই, কিন্তু কেশবের ব্যক্তিত্ব কখনই বিদ্যাসাগরের মতো সূর্যসম ছিল না। ঈশ্বর ভক্তির প্রাবল্য বরাবরই তাঁর দৃপ্ত তেজকে পরিপূর্ণ পৌরুষ নিয়ে প্রতিভাত হতে দেয়নি। যোগ, ভক্তি, বৈরাগ্য প্রভৃতির প্রতি তাঁর অত্যধিক অনুরাগ তাঁকে সর্বদাই অগ্রসরতা ও পশ্চাদপদতার দোলাচলে আন্দোলিত করত।

এই ধরনের টানাপোড়েন ব্রাহ্মদের উপর এমনই স্নায়ুচাপের সৃষ্টি করেছিল যে সামান্য মতভেদও তখন বিরাট বিভেদ তৈরী করতে পারত। ১৮৬০-এর দশক থেকেই বাঙ্গালী মহিলারা বিদেশ যেতে শুরু করেছিলেন, ১৮৬৯ সালে খ্রীষ্টান গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত, বিখ্যাত তরু দত্ত ও অরু দত্তের পিতা, তাঁর স্ত্রী ও দুই কন্যাকে নিয়ে বিলাত গেলেন। ১৮৭১ সালে উৎসাহী সমাজ সংস্কারক হিসাবে খ্যাতিমান ব্রাহ্মযুবক শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সস্ত্রীক বিলাত গমন করলেন।[৩৩] তারও আগে কেশবচন্দ্র স্বয়ং সমস্ত পরিবারের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করেও স্ত্রী জগন্মোহিনীকে সঙ্গে নিয়ে কিভাবে গৃহত্যাগ করেছিলেন সে ঘটনা একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে। অথচ ব্রাহ্মদের উপাসনাস্থান যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দির সেখানে কেন মহিলাদের বসবার স্থান পর্দার বাইরে থাকবে না, অগ্রসর যুবকদলের এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মসমাজ প্রায় দ্বিতীয়বারের জন্য দ্বিখণ্ডিত হবার উপক্রম করল। "অবশেষে তাঁহারা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে আপনাদের অভিপ্রায় জানাইলেন। বলিলেন যে, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় পরিবারের মহিলাদিগের লইয়া পর্দ্দার বাহিরে প্রকাশ্যভাবে বসিতে ইচ্ছুক, এ বিষয়ে তাঁহাকে সম্মতি দিতে হইবে। আচার্য্য কেশবচন্দ্র মহা সমস্যার মধ্যে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার উপাসকমণ্ডলীর কতকগুলি

৩২ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২৯।
৩৩ সংকোচের বিহ্বলতা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৯।

লোক যেমন এই প্রার্থনা জানাইলেন, অপরদিকে প্রাচীনভাবাপন্ন অনেক সভ্য তদ্বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই চর্চ্চা যখন চলিতেছে এমন সময়ে একদিন অগ্রসর দলের কতিপয় ব্যক্তি স্বীয় স্বীয় পত্নী ও কন্যাগণকে লইয়া আসিয়া পর্দ্দার বাহিরে সাধারণ উপাসকগণের মধ্যে বসিলেন। প্রাচীন ও নবীন উপাসকগণের মধ্যে মহাবিরোধ ও আন্দোলন উপস্থিত হইল। স্বয়ং কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ও এতদূর যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি অগ্রসর দলকে এরূপ করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা সেরূপ নিষেধ ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। বলিলেন —"তাঁহারও উপাসকমণ্ডলীর সভ্য, মন্দির নির্মাণ বিষয়ে তাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন, মন্দিরের মধ্যে যেখানে ইচ্ছা তাঁহাদের বসিবার অধিকার আছে।" কিন্তু সে আপত্তি শোনা হইল না। বারান্তরে তাঁহারা মহিলাগণের সহিত উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে বসিতে নিষেধ করা হইল। তখন তাঁহারা বিরক্ত হইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরে আসা পরিত্যাগ করিলেন; এবং প্রসিদ্ধ ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগির মহাশয়ের ভবনে এবং তৎপরে অন্য স্থানে একটি স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন। এই সমাজের কার্য্য স্বতন্ত্রভাবে কিছুদিন চলিয়াছিল ; তৎপরে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ব্রাহ্মমন্দিরে পর্দ্দার বাহিরে মহিলাদিগের জন্য বসিবার আসন করিয়া দিলে, প্রতিবাদকারিগণ নিজেদের সমাজ তুলিয়া দিয়া আবার ব্রাহ্মমন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন। স্বতন্ত্র সমাজটি উঠিয়া গেল বটে, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ে প্রাচীন ও নবীন দুই দলের মধ্যে যে পার্থক্য ঘটিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল না।"[৩৪]

মহিলাদের অবরোধ মোচনের প্রশ্নে যেমন ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিশীল অংশটি ক্ষুব্ধ হল, তেমনি বিশেষ বিবাহ আইন বা তিন আইন রক্ষণশীল অংশকেও ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। ফলতঃ কেশবের অবস্থা তখন ন যযৌ ন তস্থৌ। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কেশবের অবস্থান তখন ঠিক কি রকম ছিল এবং দেশ ও সমাজের ওপর তা কি প্রভাব বিস্তার করেছিল তার যথার্থ পরিচয় দিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শী শিবনাথ শাস্ত্রী : 'চিন্তা করিয়া যতদূর অনুভব করিতে পারি এই সময় হইতেই দেশের লোকের মনের উপরে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি অল্পে অল্পে হ্রাস পাইতে লাগিল। আমরা অনুভব করিতে লাগিলাম। কেশবচন্দ্র সেন আর পূর্ব্বের ন্যায় নব্যবঙ্গের অবিসম্বাদিত নেতা রহিলেন না;এবং যুবকদলের তাঁহার দিকে আর সে প্রবল আকর্ষণ থাকিল না। ওদিকে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই তাঁহার বিরোধীদল দেখা দিল;তাঁহার বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় যুবকদলের নেতৃত্ব একপ্রকার পরিত্যাগ করিয়া যোগ, ভক্তি, বৈরাগ্য প্রভৃতি সাধনার্থ কলিকাতার সন্নিকটে এক উদ্যান ক্রয় করিয়া, কতিপয় অনুগত শিষ্যসহ একান্তবাসী হইলেন;স্বপাকে আহার করিতে লাগিলেন; গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করিতে লাগিলেন;এবং বৈরাগ্য প্রচারে রত হইলেন। 'সমদর্শী দল এই সকলের প্রতিবাদ করিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন যে, যুবকদলের উপর হইতে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি চলিয়া গেল।"[৩৫]

৩৪ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪২৭।

৩৫ তদেব, পৃঃ ৪৩০

ব্রাহ্মসমাজের ভাগ হতে তখনো যেটুকু বাকী ছিল কুচবিহার বিবাহ ঘটনা সেটুকুও সম্পন্ন করল। কুচবিহার বিবাহের এবং তদ্ভূত আন্দোলনের খুব নিরাসক্ত ও নিবপেক্ষ বিবরণ পাওয়া যায় বিপিন চন্দ্রপালের আত্মকথায়।[৩৬]

"সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৭৮ সালে। এই ধর্মীয় আন্দোলন ও সামাজিক বিদ্রোহের সঙ্গে আমার সংযোগ উত্তরোত্তর ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। যদিও কেশবচন্দ্র সেনের ভারতের ব্রাহ্ম-সমাজের রবিবাসরীয় উপাসনা সভায় আমি নিয়মিত যেতাম। 'মন্দিরের দ্বারে একজন ভক্ত' ছাড়া আর কিছুই ছিলাম না। আচার্যের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আমি কখনোই আসিনি।...

"১৮৭৮ সালের মার্চ মাসে কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যাব সঙ্গে কুচবিহারের নাবালক মহারাজার বিবাহকে কেন্দ্র করে যখন ভারতের ব্রাহ্মসমাজেব ওপর প্রতিবাদের ঝড় ওঠে আমাকে তখন প্রতিবাদ আন্দোলনের সামিল হতে হয়েছিল। বব ও বধূ কারোরই তখনো পর্যন্ত ১৮৭২ সালের আইন অনুসারে বিবাহের ন্যূনতম বয়স হয়নি। ... কেশবের কন্যার বয়স চোদ্দ পূর্ণ হয়নি এবং কুচবিহারের মহারাজের বয়সও কম ছিল। তিনি সাবালকত্বে পৌঁছাননি। এই বিবাহে প্রথম মৌলিক আপত্তিকে কেশব নাকচ করে দেন সম্ভবত. এই ভেবে যে হিন্দুপ্রধান এলাকায় ব্রাহ্মসমাজকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম করার আন্দোলনের সপক্ষে হয়ত খানিকটা সাহায্য করবে এই বিবাহ। তবে এ কথা মনে করা হয়ত অযৌক্তিক হবে না যে এই বিবাহের সম্মতিদানকে কেশব মৌখিক বাক্‌দান হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। কুচবিহারের মহারাজা তখন ইংলন্ড যাচ্ছিলেন শিক্ষা সমাপনের জন্য। স্বভাবতই তাঁর অভিভাবকেরা চেয়েছিলেন ভবিষ্যৎ জটিলতা এড়ানোর জন্য ইংলন্ড যাত্রার পূর্বেই তার বিবাহ সম্পন্ন হোক। কেশব ভেবেছিলেন যে ইংলন্ড যাওয়ার প্রাক্কালে বাগদান অনুষ্ঠানটিই শুধু থাকুক পরে বর এবং বধূর দুজনেরই বয়স হলে প্রকৃত বিবাহ উৎসব হবে। মহারাজার তরফের প্রস্তাব গ্রহণ করার পিছনে কেশবের এই উদ্দেশ্যই ছিল।"[৩৭]

এভাবে, বিবাহ না বাগদান এই নিয়ে এক ভুল বোঝাবুঝির কুয়াশা প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল করে রেখেছিল। এই কুয়াশা হয়ত পরে কিছুটা কেটে গিয়েছিল কিন্তু ততদিনে ব্রাহ্মসমাজ দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। কেশবচন্দ্র আরো রক্ষণশীল ও ঐতিহ্যপরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন, অপেক্ষাকৃত তরুণ ব্রাহ্মরা মেয়েদের অবস্থার উন্নয়নের ধারা এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব রয়েই গেল। এই দ্বন্দ্ব সাকার হয়ে উঠেছিল দুই যুগন্ধর পুরুষের কর্মধারায় — একজন হলেন বিদ্যাসাগর ও অপর জন কেশবচন্দ্র। এই দুই ব্যক্তিত্বের কর্মপদ্ধতির বিশ্লেষণ নীচে আলোচিত হল।

৩৬ বিপিনচন্দ্র পাল, আমার জীবন ও সমকাল (প্রথম পর্ব), ভাষান্তর শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা - ১৩, সেপ্টেম্বর ১৯৮৫।

৩৭ তদেব, পৃ: ১৮৩ ১৮৪।

নবজাগরণের প্রথম পর্ব ও সীমাবদ্ধতায় নারীবাদী সমাজসংস্কার

১৮২৮ সালে আট বছরের বালক বিদ্যাসাগর পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও পাঠশালার গুরুমশাই কালীকান্ত সিংহের সঙ্গে বীরসিংহ গ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে একটার পর একটা মাইলপ্রস্তর গুনতে গুনতে এসে পৌঁছালেন কলিকাতায়।[৩৮] সেই সময় বাংলাদেশে পুরোনো সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছে। ইংরাজরা ক্ষমতা দখল করেছে বটে কিন্তু তখনোও তাদের সংস্কৃতি দেশে পুরোপুরি কায়েম হয়নি। ক্ষমতা দখলের সময়ে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ও তার কর্মচারীদের লুণ্ঠন বাংলার সাধারণ লোকের অবস্থা শোচনীয় করে তুলেছে, এদের মধ্যে আবার কৃষকদের বর্ণনা অবর্ণনীয়। ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে।[৩৯] ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য ইংরাজ শাসক এমন কয়েকটি নীতি গ্রহণ করল যা নতুন অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তিকে অর্গলমুক্ত করল এবং বাংলার সমাজ ও সাধারণের ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করল। ব্রিটিশরা যে ভূমি বন্দোবস্ত চালু করল তার ফলে বহু ঐতিহ্যময় জমিদার পরিবার ধ্বংস হয়ে গেল। নিলামের উচ্চতম দর দিয়ে যে সব ব্যক্তি খাজনা আদায়ের অধিকার লাভ করল তারা জমির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল না। এর পরেই লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের ভূমির উপর স্থায়ী মালিকানা দান করল। এর ফলে ভূমি জমিদারদের সম্পত্তিতে পরিণত হল কিন্তু দখলীস্বত্ব আর রইল না। বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশ অর্থনীতির আধুনিকীকরণ সম্পন্ন করল বটে কিন্তু বাজার অর্থনীতির উপর নির্ভরতা বাড়ল।[৪০]

এই পটভূমিকায় বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে তাঁর দীর্ঘ বার বছরের ছাত্রজীবন অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন নবযুগের ব্যক্তিসত্তার বিচিত্র প্রকাশ। বিশেষ করে ইয়ংবেঙ্গল দলের মধ্যে এই আত্মচেতনা ও স্বাতন্ত্র্যবোধের যে নির্বিচার প্রকাশ হয়েছিল খুব কাছাকাছি থেকে বিদ্যাসাগর তা দেখবার ও বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন।[৪১]

কিন্তু একদিকে যেমন ব্রিটিশ অর্থনীতি বাংলার শ্বাসরোধ করেছিল তেমনি অপরদিকে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন বাংলার বদ্ধ সমাজে এনেছিল অল্প হলেও মুক্তির হাওয়া। রামমোহন রায় ছিলেন প্রথম বাঙ্গালীদের মধ্যে অন্যতম যাঁরা "ইংরেজদের সাহচর্যে ও ইংরেজিবিদ্যার মাধ্যমে আহৃত পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা" সম্পূর্ণ প্রবুদ্ধ হয়েছিলেন। সেই নতুন যুগধর্মের প্রেরণায় ধর্ম ও সমাজসংস্কারের প্রচেষ্টায় তিনি আত্মনিয়োগে দৃঢ়সংকল্প" হয়েছিলেন। ভারতীয়

৩৮ বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ*, পূর্বোক্ত, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৩ পৃ: ৩৭৪।

৩৯ অমল কুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, *The Bengali Intellectual Tradition*, From Rammohan Roy to Dhirendranath Sen, K.P. Bagchi, Calcutta -12, 1979 গ্রন্থে সত্যব্রত দত্তের লেখা প্রবন্ধ *Iswarchandra Vidyasagar.* A victim of social and class Constrains, পৃ: ৬১।

৪০ তদেব।

৪১ বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৭৪।

সমাজের জীবনের সর্ববিভাগে আপনার প্রবল ব্যক্তিত্ব, বিষয়বুদ্ধি ও অক্লান্ত উদ্যোগের বলে নেতৃত্ব গ্রহণের অভিলাষ চরিতার্থ করেছিলেন।[৪২] বিদ্যাসাগরের পক্ষে রামমোহনের বৈচিত্র্যপূর্ণ কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব ছিল না। ১৮১৫ সালে যখন রামমোহন আত্মীয়সভা প্রতিষ্ঠা করলেন তার পাঁচ বছর পরে মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। ১৮২১ সালে যখন রামমোহন 'সম্বাদ কৌমুদি' পত্রিকা প্রকাশ করেন তখন বিদ্যাসাগর এক বছরের শিশু। ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক যখন সতীদাহ প্রথা আইনবিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন তার মাত্র একবছর আগে বিদ্যাসাগর কলিকাতায় পদার্পণ করেছেন। ১৮৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর ব্রিষ্টলে যখন রামমোহনের জীবনাবসান ঘটে তখন বিদ্যাসাগর তের বছরের কিশোর।

তবুও বার বার রামমোহনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের তুলনা হয়েছে, বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে যে কোন আলোচনায় রামমোহন অনিবার্যভাবে তাঁর এই অদেখা অথচ যোগ্যতম উত্তরসূরীর কাছে ফিরে এসেছেন। এর কাবণ হল যে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মধ্যে লক্ষণীয় চারিত্রিক সাদৃশ্য। উভয়েরই ছিল অনন্য স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব। বিদ্যাসাগরের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "প্রকৃত কবির কবিত্ব যেমন অলংকারশাস্ত্রের অতীত, অথচ অলিখিত অলংকার শাস্ত্রের কোন নিয়মের সহিত তাহার স্বভাবত কোন বিরোধ হয় না, তেমনি যাঁহারা যথার্থ মনুষ্য তাঁহাদের শাস্ত্র তাঁহাদের অন্তরের মধ্যে, অথচ বিশ্বব্যাপী মনুষ্যত্বের সমস্ত নিত্যবিধানগুলির সঙ্গে সে শাস্ত্র আপনি মিলিয়া যায়। অতএব, অন্যান্য প্রতিভায় যেমন 'ওরিজিনালিটি' অর্থাৎ অনন্যতন্ত্রতা প্রকাশ পায়, মহচ্চরিত্র বিকাশেও অনন্যতন্ত্র প্রতিভা ছিল না বলিয়া আভাস দিয়া থাকেন ; তাঁহারা জানেন অনন্যতন্ত্র কেবল সাহিত্যে এবং শিল্পে, বিজ্ঞানে এবং দর্শনেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিদ্যাসাগর এই অকৃতকীর্তি অকিঞ্চিৎকর বঙ্গ সমাজের মধ্যে নিজের চরিত্রকে মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে প্রস্ফুট করিয়া যে এক অসামান্য অনন্যতন্ত্রত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাংলার ইতিহাসে অতিশয় বিরল। এত বিরল যে, এক শতাব্দীর মধ্যে কেবল আর দুই এক জনের নাম মনে পড়ে এবং তাঁহাদের মধ্যে রামমোহন রায় সর্বশ্রেষ্ঠ।"[৪৩] "সেইজন্য বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। ...বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্যে আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধিসহকালে বঙ্গসমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশই শব্দহীন সুদূর নির্জনে উত্থান করিয়াছিলেন। ..."[৪৪]

৪২ গোপাল হালদার, "রামমোহন পর্ব ও রামমোহন রায়" প্রবন্ধটি পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, রামমোহন সংখ্যা, ১৪০৩-এ সন্নিবিষ্ট হয়েছে, পৃ: ৮৫।

৪৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "*চারিত্রপূজা*", রবীন্দ্র রচনাবলী, সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা - ১৭, অগ্রহায়ণ ১৩৯৩, পৃ: ৭৬৮-৬৯।

৪৪ তদেব, পৃ: ৭৮২।

অনুরূপভাবে, রামমোহনের জীবনীকার ও তাঁর চরিত্রস্থ সাহস, প্রতিভা ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়ে লিখলেন, "বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ নিশ্চেষ্টতায় ক্রমশই অধঃপাতে যাইতেছিল। দিন দিন তাহার অবনতি হইতেছিল। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ এখন এইরূপ নিশ্চেষ্ট স্থিরভাবে অবস্থিত ছিল। ভিতরে ভিতরে তাহার অবনতিসাধন হইতেছিল। তাহার গতি অধোদিকেই অভিমুখী ছিল। রামমোহন রায় এই সমাজের গতি ফিরাইয়া দিলেন। সামাজিক তরঙ্গে বিপরীত বল বিক্ষেপ করিলেন। সমাজে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। যে বল রামমোহন রায়ের হৃদয়ে, সেই বল, সেই সাহস, সেই অধ্যবসায়, সেই বিদ্যাবুদ্ধি, সেই প্রতিভা, সেই মহান আভ্যন্তরিক বলে রামমোহন রায় এই সামাজিক তুফানে দণ্ডায়মান হইলেন। বলিতে গেলে একাকীই দণ্ডায়মান হইলেন। যে বলে, যে সাহসে তিনি আত্মীস্বজন, ভাইবন্ধু, জনকজননীকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী দেশে দেশে ফিরিয়াছিলেন, সেই বল রামমোহন রায়কে আবার স্বদেশীয় জনসমাজের প্রতিকূলমুখে সংরক্ষা করিল। সমুদয় সমাজ তাঁহার বিপক্ষে। রামমোহন রায় একাকী বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান আছেন। সুদ্ধ দাঁড়াইয়া নয়, মহাসমরে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যে যেরূপ অস্ত্রবিক্ষেপ করিতেছে, রামমোহন রায় তাহা সেইরূপ বলে কাটাইতেছেন। ইহাই বীরত্ব, ইহাই সাহস। এই সাহসে রামমোহন রায় সামাজিক গতি উন্নতির দিকে বিক্ষেপ করিয়াছেন।"[৪৫]

রামমোহন ও বিদ্যাসাগর উভয়েই একাকী সামাজিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন নিজেদের অসামান্য প্রতিভার বলে। এই প্রতিভা তাঁদের জন্মগত ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু উভয়ের জীবনেই এই প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল একই রকমভাবে — তা হল ভারতের রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মধ্যে পার্থক্যও লক্ষ করা যায়। এই পার্থক্য ছিল উভয়ের পারিবারিক শিক্ষা সংস্কৃতির ধারার মধ্যে। নবাবী আমলের পদস্থ রাজকর্মচারীদের অভিজাত পরিবারে জন্মেছিলেন রামমোহন। ইস্‌লামীয় সংস্কৃতির প্রভাবে তাঁর পারিবারক শিক্ষা সংস্কৃতির প্রসার হয়েছিল সেখানে কৌলিক আচারের গতানুগতিকতা তত প্রবল ছিল না।[৪৬] পক্ষান্তরে, বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন কৌলিক সংকীর্ণতার গভীর অন্ধকারের মধ্যে। তাঁর বাল্য পরিবেশের কোথাও আলোর ক্ষীণ রশ্মিও ছিল না। যজন-যাজন, গুরুতা-অধ্যাপনার সনাতন কুলবৃত্তির শোচনীয় অর্থনৈতিক ও মর্মান্তিক সামাজিক পরিণতি তিনি তাঁর পারিবারিক জীবনেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বাংলার রেনেসাঁর এই দুই শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কের জন্মগত পরিবেশে যতই পার্থক্য থাক, মিল ছিল এক জায়গায়। তা হল তাঁরা কেউই পাশ্চাত্য শিক্ষা বা ইংরাজী শিক্ষার পরিবেশে মানুষ হননি। তাঁদের দুজনেরই জ্ঞানবিদ্যার ভিত রচিত হয়েছিল দেশীয় এবং প্রচলিত বিদ্যাচর্চার ধারায়। ইংরাজী শিক্ষার অনেক আগে রামমোহন সংস্কৃত, আরবী ও ফার্সী ভাষায় শিক্ষা অর্জন করেছিলেন। বিদ্যাসাগরও সংস্কৃত কলেজে দীর্ঘকাল শিক্ষালাভ করেছিলেন। এর ফল হয়েছিল এই যে রামমোহন বা বিদ্যাসাগর কেউই পাশ্চাত্য বিদ্যাদর্শের প্রভাবে তাদের উদার সমদৃষ্টি হারাননি। তাঁরা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্মৃতসম্ভার পুনরানুসন্ধান ও

৪৫ পূর্ণচন্দ্র বসু, "*মহাত্মা রামমোহন রায়*" শীর্ষক প্রবন্ধ, পশ্চিমবঙ্গ, রামমোহন সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ৪২ ৪৩।
৪৬ বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৯১।

পুনরাবিষ্কার করে লোকসমাজে তা প্রকাশ ও প্রচার করেছিলেন। শুধু তাই নয়, এই সত্তার থেকে তাঁরা নবযুগের প্রগতিশীল জীবনাদর্শের প্রেরণা খুঁজে পেয়েছিলেন। এদেশে বেকন, লক, হিউম, টম পেইন, ভলতেয়ার, রুশো, কোঁতের যে রচনা আলোড়ন তুলেছিল, তা কখনোই স্থায়ী হত না, যদি না রামমোহন ও বিদ্যাসাগর ভারতীয় নিজস্ব সংস্কৃতির ভাণ্ডার থেকে পাশ্চাত্য দর্শনসমূহের পরিপোষক নীতি ও আদর্শগুলি খুঁজে নিয়ে আসতেন। এই কাজ তাঁরা যে কঠোর অনুশীলন ও অধ্যবসায় সহকারে করেছিলেন তার বলে তাঁদের কর্ম ও চিন্তাধারা নবজাগরণের আন্দোলনকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিল।[৪৭]

১৮১৫ থেকে ১৮৩১ পর্যন্ত কালের মধ্যে কলিকাতায় এমন কোন বড় অনুষ্ঠান বা বড় আন্দোলন হয়নি রামমোহন যার সঙ্গে সম্পর্কিত নন। হয় তিনি উদ্যোক্তা, নয় তিনি প্রধান সমর্থক, না হয় প্রধান প্রতিপক্ষ — একভাবে না একভাবে তিনি প্রত্যেকটি প্রধান আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।[৪৮] ১৮১৫ সালে রামমোহন যে আত্মীয়সভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেখানেই বাংলার সংস্কার আন্দোলনের একটি খসড়া রচিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের যুগ পর্যন্ত অন্তত এমন কোন সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়নি যা এই সভাতে আলোচিত হয়নি। ১৮১৯ সালের ১৮ই মে তারিখের "*Calcutta Journal*" পত্রিকায় আত্মীয়সভার ৯ই মে তারিখের অধিবেশনের যে বিবরণী প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যায় : আলোচ্য সভায়, বলা হয়েছে, যে কয়েকটি জাতের পারস্পরিক মেলামেশা সম্পর্কে যে নিয়ম প্রচলিত আছে, তার অসম্ভবতা, খাদ্যভ্যাস সম্বন্ধে বাধানিষেধ প্রভৃতি অবাধে আলোচিত হয়েছে এবং সাধারণভাবে গ্রাহ্য হয়েছে — একজন শিশু-বিধবার ব্রহ্মচর্য পালনের প্রয়োজনীয়তা, বহুবিবাহের রীতি, এবং সহমরণ প্রথা এবং পৌত্তলিকদের মধ্যে প্রচলিত সমস্ত কুসংস্কারকে ধিক্কার জানানো হয়েছে।[৪৯]

ডিরোজিও যে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেখানে যে কেবল দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান বা রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হত তা নয়, দেশাচার, সামাজিক দুর্নীতি, ব্যভিচার, কুসংস্কার ইত্যাদি নিয়েও বিতর্ক হত। লালবিহারী দে লিখেছেন : এই বাগানের কুঞ্জমধ্যে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে ঐ সময়কার সামাজিক, নৈতিক বা ধর্মীয় বিষয়ে তরুণ কলিকাতার নির্বাচিত মত প্রকাশ পেত। আলোচনার মূল সুর ছিল তৎকালীন প্রতিষ্ঠানগুলির

৪৭ বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ, পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ৩৯৬-৯৭।

৪৮ গোপাল হালদার, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ: ৮৫।

৪৯ "At the meeting in question, it is said, the absurdity of the prevailing rules respecting the intercourse of several cases with each other, and of the restrictions on diet etc. was freely discussed, and generally admitted — the necessity of an infant widow passing her life in a state of celibacy — the practice of polygamy and of suffering widows to burn with the corpse of their husbands, were condemned as well as all the superstitious ceremonies in use amongst idolaters." বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪২৫।

বিরুদ্ধে সুচিন্তিত বিদ্রোহ ... ঐ প্রতিষ্ঠানের তরুণ সিংহেরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে গর্জন করত।[৫০]

এভাবে, রামমোহনের প্রারব্ধ কাজ ইয়ং বেঙ্গল দল প্রকাশ্য আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে আরো অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গেল। যে বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনকে বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম বলে মনে করতেন তাঁর কর্মজীবনের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল, প্রস্তুত করেছিলেন ইয়ং বেঙ্গল দল বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা ও রচনার মধ্য দিয়ে। ১৮৪২ সালে এপ্রিল মাসে ইয়ং বেঙ্গলের দ্বিভাষিক মুখপত্র *The Bengal Spectator* পত্রিকায় একটি পত্র প্রকাশিত হল এই রকম—

"যে সকল বিষয় সাধারণে সর্ব্বদা আন্দোলন হয় তন্মধ্যে হিন্দুজাতীয় বিধবার পুনর্বিবাহেরও বাদানুবাদ হইয়া থাকে — বোধ হয় যে উক্ত বিবাহের যে সকল শাস্ত্র আছে তাহা অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ; কারণ পুরুষ যদি স্ত্রীর মরণান্তর পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারে তবে স্ত্রী কেন স্বীয় স্বামীর পরলোক হইলে বিবাহকরণে সক্ষম না হয় ... এতদ্বিষয়ে প্রস্তাব বহুবৎসরবিধি হইতেছে ... কিন্তু যে পর্য্যন্ত উক্ত প্রতিবন্ধকে সম্পূর্ণরূপে অনাস্থা হইয়া নতুন রীতির সংস্থাপন না হয়, তদবধি আমরা তদাবশ্যকতার নিমিত্তে বারম্বার অনুশীলন করিতে নিবৃত্ত হইব না।"[৫১]

ঐ বৎসরের জুলাই মাসে বিধবাবিবাহ সমস্যার সমাধান পাওয়া গিয়েছে বলে *The Bengal Spectator* পত্রিকার সম্পাদকীয়তে এইরকমভাবে লেখা হল—

"এক্ষণে হিন্দুজাতীয় বিধবার বিবাহ পুনঃস্থাপনের অন্য কোন শাস্ত্রীয় প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হইতেছে না...আমরাও সম্প্রতি হৃষ্টচিত্তে দেখিতেছি যে উক্ত নিষেধ স্মৃতিশাস্ত্রের বিপরীত। ... এক্ষণে কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন যে উক্ত বিষয় কি প্রকারে সিদ্ধ হইবেক? তাহাতে আমরা এইমাত্র কহিতে পারি যে অস্মদেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা ও যুবাদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্মে সাহসাবলম্বনের উপদেশ ব্যতিরেকে এতদ্বিষয় ক্রমশ সিদ্ধ হইবার আর সদুপায় নাই আর আমাদিগের বোধ হয় যে কতিপয় হিন্দু ব্যক্তিরা যদ্যপি পুনর্ভূবিবাহ করিয়া পথ দেখান তবে ইহার প্রতি লোকের যে দ্বেষ আছে তাহাও ক্রমে হ্রাস হইয়া পরে সর্ব্বসম্মতরূপে প্রচলিত হইতে পারিবে।"[৫২]

বাইশ বছরের তরুণ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলাবিভাগের নবনিযুক্ত পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের হৃদয়ে এই সম্পাদকীয় আহ্বানবাণীর মতো পৌঁছাল। বিধবাবিবাহ প্রচলন করার জন্য স্ত্রীশিক্ষার দরকার, দরকার কয়েকজন হিন্দুযুবকের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে বিধবাবিবাহ

---

৫০ "In this grove of the Academus...did the choice spirits of young Calcutta hold forth, week after week, on the social, moral and religious question of the day. The general tone of the discussions was a decided revolt against existing ... institutions ... The young lions of the Academy roared out, week after week." তদেব।

৫১ তদেব, পৃ: ৪২৬।

৫২ তদেব।

করবার আর সর্বোপরি স্মৃতিশাস্ত্রে বিধবাবিবাহের সপক্ষে নির্দেশ আছে।[৫৩] সব মিলিয়ে পরিস্থিতি যেন শুধু বিদ্যাসাগরের মতো একজন কর্মবীরের প্রতীক্ষা করছিল।

আবার, ফিরে আসা যাক সতীদাহ প্রথা বিলোপের কথায়। রামমোহনের প্রবল প্রচেষ্টায় ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর গভর্ণর জেনারেল বেন্টিঙ্কের কাউন্সিলের সতীপ্রথা 'বেআইনী এবং ফৌজদাবী আদালতের দ্বারা শাস্তিযোগ্য'[৫৪] বলে বিবেচিত হল। সতীদাহ প্রথার নিষিদ্ধকরণ বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে অনিবার্য করে তুলেছিল। সতীদাহের মতো কু-প্রথা রোধ করে নারীকে জ্বলন্ত চিতার অগ্নিকুণ্ড থেকে উদ্ধার করে সমাজে বেঁচে থাকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন রামমোহন রায়। কিন্তু স্বামীর জ্বলন্ত চিতা থেকে যে মেয়েটিকে উদ্ধার করা হল সেই বিধবাটি অতঃপর কি করবে? রামমোহন ভেবেছিলেন যে বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্যই বিধেয়। কিন্তু এই ব্রহ্মচর্য 'তৈলমাংস মৈথুনাদি' বর্জনের আচারগত স্থূলত্ব নয়। ব্রহ্মচর্যের নামে নিছক ব্যবহারিক আচারনিষ্ঠা সম্পর্কে তাঁর কোন শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁর মতে ব্রহ্মচর্যের প্রকৃত অর্থ ছিল 'নিষ্কাম জ্ঞানাভ্যাস' এবং এই অর্থেই তিনি ব্রহ্মচর্যকে বিধবার পালনীয় বলে মনে করেছিলেন। সর্বোচ্চস্তরে যে নারীর অধিকার আছে তা তিনি প্রমাণ করেছিলেন 'সুব্রহ্মণ্য স্বামীর সহিত বিচারে' ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর উদাহরণ দিয়ে।[৫৫]

যে বিধবাদের জন্য রামমোহন নিষ্কাম জ্ঞানাভ্যাস কামনা করেছিলেন বাস্তব সংসারে তাদের অবস্থার অসংখ্য বর্ণনা পাওয়া যায় শ্রীমতী কল্যাণী দত্তের রচনায়।[৫৬] শ্রীমতী দত্তের পিসিমা শিবমোহিনী দেবী ছিলেন বালবিধবা। বিদ্যাসাগর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ দিয়েছিলেন। প্রথম বিবাহের, তখন তিনি দশ বছরের বালিকা, দুই বছরের মধ্যেই বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে এসেছিলেন। পিতৃগৃহে বিমাতার শাসনে তাঁকে শেমিজ ছাড়া এক কাপড়ে থাকতে হত, সিঁড়ির তলায় খালি মেঝেতে শুতে হত, নির্জলা উপবাসে একাদশী করতে হত — এ সব কারণে তাঁর জীবন বিষময় হয়ে উঠেছিল। এই স্মৃতি তিনি শেষজীবন পর্যন্ত বহন করেছিলেন — "আজ আমি যেমনই থাকি, সেইসব দিনের কথা কি ভুলেছি? তখন কেবল ঘর মুছতুম বাসন মাজতুম আর ঝগড়া করতুম।"[৫৭] বিধবা হলে স্বামী মারা যায় বটে কিন্তু শরীরের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কামনা বাসনা আর সমস্তই বজায় থাকে। তাই এক বালবিধবা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন, "সিঁদুর নোয়া যেদিন যায় সেদিন থেকে শরীরের যদি রক্ত বন্ধ হতো

---

৫৩ তদেব, পৃ: ৪২৭।

৫৪ 'illegal and punishable by the criminal Court' স্বপন বসু, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস*, ২য় সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, ডিসেম্বর ১৯৮৫, পৃ: ১২৯।

৫৫ মালিনী ভট্টাচার্য, 'রামমোহন রায়, দেবী চৌধুরানী ও নারীশিক্ষা' নামক প্রবন্ধ, বেথুন বিদ্যালয় সার্ধশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ ১৮৪৯-১৯৯৯, বেথুন বিদ্যালয় সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি, কলিকাতা - ৭০০ ০০৬, ১৯৯৯, পৃ: ১১৬।

৫৬ কল্যাণী দত্ত, পিঞ্জরে *বসিয়া, স্ত্রী, জানুয়ারী*, ১৯৯৬।

৫৭ তদেব, পৃ: ২।

তবে বুঝতুম। কাঁদতে কাঁদতে বললুম, "ঠাকুর, লোকের মালা, চন্দন, গয়না, কাপড় নিয়ে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে থাকো শুধু, কাঠিটি নাড়তে পার না। আমার খিদে তেষ্টা আর এই রক্তভাঙা রোগ — এই তোমায় দিলুম।"[৫৮] রামমোহন বিধবাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মেনে নিয়েছেন নিষ্কাম ধর্ম ও ব্রহ্মচর্য, কামনাকে গণ্য করেছেন পাপ বলে, এমনকি স্বর্গকামনাও তাঁর কাছে পাপ বলে বিবেচিত হয়েছে, সেই বঙ্গ বিধবারা ব্রহ্মচর্য মেনেও সংসারের মধ্যে নিজেদের জন্য এতটুকু মর্যাদার স্থান খুঁজে পাননি।

এখান থেকেই বিধবাবিবাহের আন্দোলন সূচিত হয়েছিল। সহমরণ নৃশংস বলে সহজেই মানুষ ও সাধারণ জনতাকে বোঝানো সম্ভব হয়েছিল যে নারীকে পোড়ানো একটি অতি অমানবিক ঘটনা। তাই, "রামমোহন চেয়েছেন শুধু বিধবার প্রাণটুকু, আর বেশি কিছু নয়; কিন্তু বিদ্যাসাগরের কাছে ওই প্রাণটুকু যথেষ্ট নয়, নারীর জন্যে তাঁর দরকার জীবন, যা শুধু নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নয়, উপভোগের। বিধবা বেঁচে আছে, চিতার আগুনে ছাই হয়ে যায়নি, সে পেয়েছে ব্রহ্মচর্য পালনের অধিকার, এ-ই যথেষ্ট রামমোহনের জন্যে;... কিন্তু বিদ্যাসাগরের কাছে বিধবার ব্রহ্মচর্য এক ধরনের চিতাগ্নিতে দগ্ধ হওয়াই, তা জীবন নয়, তা বাঁচা নয়।[৫৯]

বিদ্যাসাগরের নারী রক্তমাংসের সজীব মানুষ। বিদ্যাসাগর যখন বিধবার বিয়ের কথা বলেন, তখন বিধবার শরীরটিকে বাস্তব ও সত্য করে তোলেন। তাঁর বিধবাবিবাহ বিষয়ক বই দুটিতে 'বৈধব্যযন্ত্রণা, 'ব্যভিচার দোষ' ও 'ভ্রূণহত্যাপাপ' এই তিনটি শব্দ বারংবার উচ্চারিত হয়েছে। "কতশত বিধবারা, ব্রহ্মচর্য্য নির্ব্বাহে অসমর্থ হইয়া, ব্যভিচার দোষে দূষিত ও ভ্রূণহত্যাপাপে লিপ্ত হইতেছে; এবং পিতৃকুল ও মাতৃকুল কলঙ্কিত করিতেছে। বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে, অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা, ব্যভিচার দোষ ও ভ্রূণহত্যাপাপের নিবারণ ও তিনকুলের কলঙ্ক নিরাকরণ হইতে পারে। যাবৎ এই শুভকরী প্রথা প্রচলিত না হইবেক, তাবৎ ব্যভিচারদোষেব ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত, কলঙ্কের প্রবাহ ও বৈধব্যযন্ত্রণার অনল উত্তরোত্তর প্রবল হইতেই থাকিবেক।"[৬০] এই বর্ণনা পড়ার সময় উনিশ শতকের সমস্ত হিন্দু বালবিধবার অচরিতার্থ কাম দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। এতে প্রকাশ পেয়েছে বিদ্যাসাগরের অকপট আধুনিকতা।[৬১]

কিন্তু যে সমাজে বিদ্যাসাগর বাস করতেন তা "প্রাণহীন কুলগত আচারের বন্ধনে "ক্রমেই" নিষ্ক্রিয় ও নিস্পন্দ হয়ে গেছে। কৌলিন্য প্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি আচারের মধ্য দিয়ে সমাজ হয়ে উঠেছে ব্যভিচারী ও দুর্নীতিগ্রস্ত। সমাজের সমস্ত ক্লেদ ও মালিন্য প্রকট হয়ে

৫৮ তদেব, পৃ: ১৭।

৫৯ হুমায়ুন আজাদ, *নারী*, নদী কর্তৃক ঢাকা থেকে প্রকাশিত, পরিবেশক জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, মার্চ ১৯৯২, পৃ: ২৩৪।

৬০ বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব" *বিদ্যাসাগর রচনা সমগ্র*, ১ম খণ্ড, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলিকাতা - ৯, এপ্রিল ১৯৮৭, পৃ: ৩২৩।

৬১ হুমায়ুন আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৩৫।

উঠেছে। নবাবী আমল ও ব্রিটিশ আমলের সন্ধিক্ষণের রাষ্ট্রিক বিশৃঙ্খলতায় এই সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা স্বভাবতঃই চরমে পৌঁছেছে। "এই দুর্যোগের মধ্যে, সন্ধিক্ষণের প্রথম প্রহরে জন্মেছেন রামমোহন, মধ্য প্রহরে বিদ্যাসাগর।"[৬২]

বাংলাদেশ প্রথম পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব অনুভব করেছিল এবং এখানেই ব্রিটিশ অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশের ফল সবচেয়ে প্রকট হয়েছিল। ফলে এখানে এক আলোকপ্রাপ্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান সম্ভবপর হয়েছিল। যদিও বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে সুনির্বাচিত এক বশংবদ ভারতীয় গোষ্ঠী তৈরী করা যাদের দ্বারা ভারতে ব্রিটিশ নীতি বাস্তবায়িত করা সহজ হবে। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের স্বাভাবিক ফল বিদেশী শাসককুল এড়িয়ে যেতে পারেনি। শাসকবর্গের সুচিন্তিত উদ্দেশ্য এড়িয়ে গিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা ইংরাজ গণতান্ত্রিক অনুপ্রেরণা ও আন্দোলনের যে ধারার সঙ্গে বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীদের পরিচয় ঘটালো, তা চিন্তা ও কর্মের জগতে এক সার্বজনীন জাগরণ ঘটালো এবং এর ফলে বাংলাদেশে সামাজিক, ধর্মীয়, সাহিত্যিক এবং রাজনৈতিক কর্মবাহুল্য ঘটল।"[৬৩]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী উদ্দেশ্য দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং জড়ত্বপ্রাপ্ত স্বীয় স্বজাতিকে জাগ্রত করা তাঁর জীবনের ব্রত হয়ে উঠেছিল।[৬৪] তবে, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষীগণ দেশীয় সংস্কৃতির ভাণ্ডারে নতুন পথের জন্য সচেতনভাবে অনুসন্ধান করেছিলেন।[৬৫] আবার বিদ্যাসাগর হলেন সেই কতিপয় ভারতীয়দের মধ্যে অন্যতম যিনি ঊনবিংশ শতকে যে সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ তাঁর দেশকে ব্যাপ্ত করেছিল, তার থেকে পরিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন।[৬৬]

পাশ্চাত্য চিন্তা এবং মূল্যবোধের আবিষ্কার একটি চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা ঠিকই কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার পুনর্জাগরণের মতো তার গভীরতা নেই। শিক্ষিত ভারতীয়রা যেমন একটি বিদেশী সভ্যতার চ্যালেঞ্জ প্রত্যক্ষ করল বহির্জগতে, অন্তর্জগতেও তারা চ্যালেঞ্জবিহীন রইল না, সে চ্যালেঞ্জ ছিল বিশাল ভারতীয় সভ্যতার ঐতিহ্যের। রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর এই উভয় চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করেছিলেন সঠিকভাবে। আসলে, তাঁদের নির্বাচন করার প্রজ্ঞা ছিল, তা দিয়ে পাশ্চাত্য থেকে তাঁরা ঠিক ততটাই গ্রহণ করেছিলেন যতটা ভারতীয়দের পক্ষে প্রাসঙ্গিক। দেশীয় ঐতিহ্যসমূহকে বারংবার পরীক্ষা করে তাঁরা আবার তা দেশের পরিবর্তিত প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পরাঙ্মুখ হননি। পাশ্চাত্য আধুনিকতা ও দেশীয় ঐতিহ্যের সংমিশ্রণে

---

৬২ বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৯১।

৬৩ Susobhan Sarkar, *Bengal Renaissance and other Essays*, New Delhi, 1970, পৃ: ৩।

৬৪ সত্যব্রত দত্ত, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ: ৬৩।

৬৫ Amales Tripathi, *Vidyasagar*, The Traditional Moderniser, পুনশ্চ, কলিকাতা - ৯, জানুয়ারী ১৯৯৮, পৃ: ৬।

৬৬ তদেব, পৃ: ৯।

তাঁরা এমন এক সংহত চরিত্র নির্মাণ করেছিলেন যা আধুনিকতার ভার বহনের পক্ষে যথেষ্ট দৃঢ় অথচ নমনীয়।[৬৭]

আসলে, আধুনিক সমাজের মধ্যে যেমন ঐতিহ্যিক বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব, তেমনি ঐতিহ্যের মধ্যেও আধুনিকতার সম্ভাবনা থাকা সম্ভব। বাইরের বৈপ্লবিক শক্তির ফলেই যে কেবল সমাজ পরিবর্তিত হয় তা নয়, প্রতিষ্ঠিত কাঠামোর মধ্যে নিহিত বিকল্প সম্ভাবনাও সমাজে পরিবর্তন আনতে পারে।[৬৮]

ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে বিদ্যাসাগর সেই সৃষ্টিমূলক সম্ভাবনা খুঁজে পেয়েছিলেন, তিনি কেবল প্রগতিশীল পাশ্চাত্য মূল্যবোধকে ব্যবহার করেছিলেন উৎকর্ষ প্রযুক্ত করার কাজে।[৬৯]

বিদ্যাসাগর যেভাবে দক্ষতার সঙ্গে সমাজসংস্কারের কাজে ঐতিহ্যকে ব্যবহার করেছিলেন তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হল বিধবাবিবাহ। আশ্চর্য এই যে ডিরোজিয়ানরা প্রথম পরাশর সংহিতার সেই বিখ্যাত শ্লোক[৭০] আবিষ্কার করেছিল। বিদ্যাসাগর যার উপর ভিত্তি করে বিধবাবিবাহ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু ডিরোজিয়ানরা তাঁদের পাঠগৃহের থেকে বেরিয়ে এসে এই অনুশাসনকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে চায়নি। তারা গণ আন্দোলন গড়ে তুলে সরকারকে কোন ঘোষণামূলক আইন জারী করতে বাধ্য করতে পারেনি। অপরপক্ষে গোঁড়া পণ্ডিতরা ঐতিহাসিক মূল্য বা বর্তমান প্রাসঙ্গিকতাকে তোয়াক্কা না করে বিধবাবিবাহের বিপক্ষে নির্বিচারে শাস্ত্রোক্তিকে ব্যবহার করেছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা মূল গ্রন্থ থেকে অনুশাসনটি উদ্ধার করেছিলেন আর এর অভ্রান্ততা সম্পর্কে সুনিশ্চত হয়ে তিনি, যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ঐতিহ্য থেকে আদর্শ ও তত্ত্ব সংগ্রহ করে বাস্তবায়নের জন্য বিজ্ঞাপন ও গণ আবেদনের আধুনিক পদ্ধতির সাহায্য নিতে বিদ্যাসাগর দ্বিধা করেননি। এভাবে, আধুনিক প্রকরণের সঙ্গে তিনি হিন্দু ঐতিহাসিক সংযোগ স্থাপন করেছিলেন। আবার, একই সঙ্গে রক্ষণশীল বুদ্ধিজীবীদের প্রতিরোধ এবং এক নিরপেক্ষ সরকারের ঔদাসীন্য জয় করেছিলেন।[৭১]

কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয়ের এই ধারণা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে প্রয়োগ করা যায় কি না? কারণ, অতীতে যে সমস্ত বিদেশী শক্তি ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, তারা সময়ের প্রক্রিয়ার সাথে সাথে বিজিতদের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিপরীতভাবে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে এই ধারাবাহিক সংমিশ্রণ

৬৭ তদেব।

৬৮ তদেব পৃ: ১০।

৬৯ তদেব।

৭০ নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসুনারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে — *বিদ্যাসাগর রচনা সমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩১৬।

৭১ অমলেশ ত্রিপাঠী, পূর্বোক্ত, পৃ: ১১-১২।

ব্যবহৃত হয়েছিল ভাষার ভিন্নতায়, সাধারণভাবে ইংরাজ জাতির স্বাভাবিক সামাজিকতায়এবং বিশেষভাবে শাসকশ্রেণীর দুর্ভেদ্যতায়। উপরন্তু শাসকরা তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যাদি নিজেদের দেশ থেকে আনে, তাই উৎপাদক ও হস্তশিল্পীরা আজ নিরন্ন। সমস্ত বাণিজ্য ব্রিটিশদের দ্বারা অধিগত তাই দেশীয়রা তাদের অভ্যস্ত জীবিকা হারিয়েছে। ব্রিটিশরা জমিদারদের দিয়েছে অপ্রতিহত ক্ষমতা,[৭২] এর ফলে কৃষিকার্য হয়ে পড়েছিল অচল, উপস্বত্বভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল, জমির মালিকানা ও প্রকৃত কৃষিকাজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ঘটেছিল, কারখানাভিত্তিক যে সব শিল্পে সীমিতভাবে ব্রিটিশ পুঁজির বিনিয়োগ হত তার বাজার বা লাভ কখনোই ভারতীয় অর্থনীতির সঙ্গে একীভূত হয়নি।

এমত পরিস্থিতিতে, বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী কখনোই পুরোপুরিভাবে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর সমর্থক বা বিরোধী কোনটাই হয়ে উঠতে পারেনি। অন্যভাবে বলতে গেলে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহযোগী অথবা প্রতিবাদী—এই স্পষ্ট বিভাজন কখনোই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায়নি। বিদ্যাসাগর এই সামাজিক অস্পষ্টতার ফসল।[৭৩]

উপরন্তু ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বিভিন্ন পেশায নিযুক্ত হল; যেমন — আইন জীবিকা, শিক্ষকতা, সরকারী চাকরী ও অন্যান্য সংযুক্ত কাজ। আবারও উপস্বত্ব বৃদ্ধি পাওয়াতে কৃষিক্ষেত্রে যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল তারা প্রত্যক্ষ ভাবে কৃষিকার্যের সঙ্গে যুক্ত না থেকেও প্রজা উচ্ছেদ বা কৃষিকর বাড়াতে পারত। এভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণী কোন উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল না, তাদের জীবিকার্জনের জন্য তারা ব্রিটিশ সরকারের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। এই ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার প্রচেষ্টা নিতান্তই ব্যক্তিগত প্রয়াসে সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছিল। তাঁর অসীম সংগ্রামী শক্তি, মানবিকতা, যুক্তিবোধ, সদর্থক সামাজিক কাজে অক্লান্ত প্রয়াস — এই সমস্ত কিছুই পাশ্চাত্য মনীষার প্রতি তাঁর সদর্থক অথচ ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া এবং তা এতটাই ব্যক্তিগত যে তা বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতির উপর ঔপনিবেশিক প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করতে পারেনি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বাংলাদেশে যে জটিলতা সৃষ্টি করেছিল, বিদ্যাসাগর ব্যক্তিগতভাবে বা একজন সামাজিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে সে সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।[৭৪] তাই, বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার আন্দোলনের উদ্দেশ্য এবং বাস্তব সামাজিক অবস্থার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়ে গিয়েছিল। যেহেতু একটি বিকল্প সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার উপযুক্ত

৭২ Gholam Hossein Khan, *Seir Mutaqherin (View of Modern Times)*, Voll. III, R Cambray and Co., Calcutta, Madras 1926, P. 189-205, Asok Sen, Iswar Chandra Vidyasagar and His Elusive *Milestones*, Riddhi India, Calcutta - 9, 1977 পৃ: ১৫১- তে উল্লিখিত।

৭৩ অশোক সেন, পূর্বোক্ত, ভূমিকা, পৃ: xiii।

৭৪ অশোক সেন, পূর্বোক্ত, ভূমিকা, পৃ: xiv।

কোন উৎপাদনভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে ওঠেনি সেহেতু প্রতিবাদের শক্তিকে ধারণ করার মতো কোন সামাজিক বাস্তব গড়ে ওঠা সম্ভবপর হয়নি। তাই বিদ্যাসাগর রয়ে গিয়েছিলেন একজন ব্যক্তি প্রতিবাদী, কোন কার্যকরী সমাজ-নেতা নয়, যিনি এক কার্যকরী সামাজিক বিকল্পের সন্ধান দিতে পারবেন। আর সেজন্য সামগ্রিকভাবে সমাজ এবং বিশেষভাবে যে গোষ্ঠীর বা শ্রেণীর জন্য তাঁর সংস্কার প্রচেষ্টা, অধিকাংশের কাছ থেকেই তাঁর প্রয়াসের প্রতি কোন সদর্থক প্রতিক্রিয়া মেলেনি।[৭৫]

কাজেকাজেই বিদ্যাসাগরের যুক্তিবাদী মন বা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মানবতা কোনটাই তাঁর সমাজসংস্কার আন্দোলন, বিশেষভাবে বলতে গেলে তাঁর বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে[৭৬] স্থায়ী তাৎপর্য দান করতে পারেনি। তাঁর মানবতা ও যুক্তিবাদের সফল প্রয়োগ হবার মতো বাস্তব অবস্থা তখন বাংলাদেশের সমাজে ছিল না। অনুৎপাদনশীল কয়েকজনের যুক্তিবাদ মিশে গিয়েছিল বিশাল জনসংখ্যার যুক্তিহীনতার সঙ্গে। যে সমাজে দরিদ্র পিতারা তাঁদের অনূঢ়া কন্যার বিবাহ দিয়ে উঠতে পারতেন না, সেখানে যে বিধবাবিবাহ সমাজের বৃহত্তর অংশে খুব সাড়া পাবে না তা বলা বাহুল্য। এদেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার যাবতীয় কারণ ঔপনিবেশিক অর্থনীতি। আবার, যে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা ও নীতি জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে হোক যে যুক্তিবাদ, মানবতাবোধ ও হিতবাদী জনকল্যাণেচ্ছা জাগ্রত করেছিল তা ছিল পরস্পর-বিরোধী। এই পরস্পরবিরোধী অবস্থার স্বরূপ বিদ্যাসাগর সম্যক উপলব্ধি করতে পারেননি। তিনি একে যুক্তিসঙ্গত অবস্থা ভেবে ভুল করেছিলেন।

তাই, "যে বিধবা ছিলো সামান্য নিঃশ্বাস, মাত্র আটত্রিশ বছরের মধ্যে বিদ্যাসাগর দাবি করেন যে তার রয়েছে একটি শরীর, তার রয়েছে কামনা বাসনা আর ওই শরীরে রিপুরা অন্যান্য শরীরের মতোই সক্রিয়।"[৭৭] সেই বিধবাবিবাহ আজো সমাজে স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা পায়নি। রিধবাদের বৈধব্যযন্ত্রণা ছাড়াও ছিল আর্থিক নিরাপত্তাহীনতার সমস্যা কিন্তু বিদ্যাসাগর সে সব প্রসঙ্গ তোলেননি।[৭৮] তাঁর ধারণা ছিল যে শিক্ষিত হিন্দু যুবকরা যদি সাহস করে কেউ কেউ দু'চারটি বিধবাবিবাহ করেন তাহলে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখে লোকের কুসংস্কারজনিত ভীতি ধীরে ধীরে কেটে যাবে। ক্রমে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হবে। কিন্তু তাঁর এই প্রত্যাশা যে পরিপূর্ণতার ধারকাছ দিয়েও যায়নি তা বিদ্যাসাগর মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন—সেকথা জীবন সায়াহ্নে

৭৫ সত্যব্রত দত্ত, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ: ৭৬ এবং অশোক সেন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ৫।

৭৬ "বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এ জন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোন সৎকর্ম্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনাই নাই।" —১২৭২ সালের ২৭ শ্রাবণ পুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করলে ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রকে এই পত্র বিদ্যাসাগর লেখেন।

৭৭ হুমায়ুন আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৪২।

৭৮ তদেব।

ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রকে এক পত্রে লেখেন ..."আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্ব্বে জানিলে, আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না। তৎকালে সকলে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতেই আমি সাহস করিয়া এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম নতুবা বিবাহ ও আইন প্রচার পর্য্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত থাকিতাম। দেশহিতৈষী সৎকর্ম্মোৎসাহী মহাশয়দিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ধনেপ্রাণে মারা পড়িলাম। অর্থ দিয়া সাহায্য করা দূরে থাকুক কেহ ভুলিয়াও এ বিষয়ে সংবাদ লয়েন না।"[৭৯] এভাবে কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি শিখেছিলেন যে মধ্যবিত্তের দেশহিতৈষণা ও সৎকর্মোৎসাহ আত্মস্বার্থ ও সুবিধাবাদের চোরাবালির উপর প্রতিষ্ঠিত। সামাজিক প্রতিষ্ঠান রূপে হিন্দুবিবাহ রীতির যেসমস্ত ত্রুটি রয়েছে তা সংশোধিত ও অপসারিত না হলে যে বিধবাবিবাহ সার্থক হবে না তা তিনি তলিয়ে দেখেননি। তাই, যেখানে বহুবিবাহ আইনসংগত ও শাস্ত্রসম্মত যেখানে স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও দাম্পত্য বন্ধনের মধ্যে কোন বাধ্যবাধকতা নেই আর থাকলেও সবরকমের বাধ্যতা কেবল বিবাহিতা স্ত্রীর সেখানে বিধবাবিবাহ আইনসংগত হয়েই বা লাভ কি? কারণ, পুরুষের দিক থেকে বিধবাবিবাহ যদি দায়িত্বজ্ঞানহীন বহুবিবাহের অঙ্গ হয় তাহলে নারীর বৈধব্যযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব কি?[৮০]

বাঙ্গালি হিন্দুঘরের মেয়েদের দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বলে তাঁর প্রতিটি সংস্কার আন্দোলনের পেছনেই ছিল বাঙ্গালী নারীর দুঃখ মোচনের প্রয়াস। এ জন্য তিনি তাঁর সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল তাঁকে, অজস্র অর্থব্যয়ের বিনিময়ে পেয়েছিলেন অপবাদ ও গঞ্জনা, আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল তিক্ততার সম্পর্ক, তবুও মেয়েদের কল্যাণকামনা থেকে তাঁকে কেউ নিবৃত্ত করতে পারেনি। তাই, জীবদ্দশাতেই তিনি পরিচিত হয়েছিলেন অবলাবান্ধব, বঙ্গীয় স্ত্রীজাতির পিতৃস্থানীয়, নারীর মুক্তিদাতা ইত্যাদি অভিধায়।[৮১] কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রয়াস ছিল একক প্রয়াস। তিনি একজন ব্যক্তি প্রতিবাদী ছিলেন, কোন কার্যকরী সামাজিক বিকল্পের সন্ধান তিনি দিতে পারেননি। তিনি বুঝতে পারেননি যে, যে সমাজে বাস করে তিনি স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য সংস্কার আন্দোলন করছেন, তা সফল করার জন্য ন্যূনতম প্রাথমিক শর্ত ঐ সমাজে গড়ে তোলা কঠিন। ফলে, বিদ্যাসাগরের একক সংগ্রাম অনিবার্যভাবে নিজস্ব সীমায় বাঁধা পড়েছিল।[৮২]

৭৯ বিদ্যাসাগর ঋণভারে বিপন্ন হয়ে, দেশবরেণ্য নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই চিঠি লিখেন।

৮০ বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৩৯।

৮১ স্বপন বসু, *সমকালে বিদ্যাসাগর,* পুস্তক বিপণি, কলিকাতা - ৯, জানুয়ারী ১৯৯৩, পৃ: ১৬০-১৬১।

৮২ অশোক সেন, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫, ১৫৬।

একক মানুষ ও উদ্বোধিত চৈতন্যে নারী

উনিশ শতকে বাংলায় যে নবযুগের সূচনা হয়েছিল তার অন্যতম ঐতিহাসিক লক্ষণ ছিল মানবকেন্দ্রিক চিন্তা ও ধ্যানধারণার ব্যাপক স্ফূর্তি। অপার্থিব, অসত্য, অদৃশ্য ও অলৌকিক জগৎ থেকে পার্থিব, মর্ত্য, পরিদৃশ্যমান লৌকিক জগতের প্রতি মানুষের সকল চিন্তাধারাকে পরিচালিত ও কেন্দ্রীভূত করার প্রয়াসই হল মানবতাবাদী আদর্শ। এই আদর্শের ব্যাপক প্রেরণায় দুঃসাহসিক সমাজ কল্যাণ ব্রতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। এই ব্রতের আরাধ্যা দেবী ছিলেন বাংলার নারীসমাজ। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে মানবীয় কারুণ্যবোধ থেকেই এদেশের নারীসমাজের চূড়ান্ত দুর্গতির দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল। আর এই মানবিকতার সঞ্চার তাঁর মধ্যে হয়েছিল শৈশব থেকেই। বিদ্যাসাগরের পিতৃদেব শ্রীঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কি ভাবে অতি সাধারণ মুড়ি-মুড়কি বিক্রেতা এক রমণীর কাছ থেকে ক্ষুধার সময় খাদ্যলাভ করেছিলেন সে ঘটনা বাংলায় সুবিদিত।[৮৩] "পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়বিদারক উপাখ্যান শুনিয়া, আমার অন্তঃকরণে যেমন দুঃসহ দুঃখানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, স্ত্রীজাতির উপর তেমনই প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। এই দোকানের মালিক, পুরুষ হইলে, ঠাকুরদাসের উপর কখনই, এরূপ দয়াপ্রকাশ ও বাৎসল্য প্রদর্শন করিতেন না।"[৮৪] সুতরাং, নারীদের প্রতি শ্রদ্ধার অভ্যুদয় অতি শৈশবেই তাঁর মধ্যে ঘটেছিল। মাতৃভক্তি, যা তাঁর জীবদ্দশাতেই উপকথায় পরিণত হয়েছিল, তা তাঁর এই প্রায় সহজাত প্রেরণার বহিঃপ্রকাশ।

"১২৩৫ সালের কার্তিক মাসে আমি কলিকাতায় আনীত হইলাম"[৮৫] সেখানে বড়বাজার নিবাসী শ্রীজগদ্দুর্লভ সিংহ মশায়ের বাড়িতে তিনি আশ্রয়লাভ করেছিলেন। সিংহ মহাশয়ের

৮৩ "একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে, ক্ষুধায় অস্থির হইয়া, ঠাকুরদাস বাসা হইতে বহির্গত হইলেন, এবং অন্যমনস্ক হইয়া, ক্ষুধার যাতনা ভুলিবার অভিপ্রায়ে, পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ... কিঞ্চিৎ পরেই, তিনি এক দোকানের সামনে উপস্থিত ও দণ্ডায়মান হইলেন; দেখিলেন এক মধ্যবয়স্কা বৃদ্ধা নারী ঐ দোকানে বসিয়া মুড়ি মুড়কি বেচিতেছেন। ... ঠাকুরদাস তৃষ্ণার উল্লেখ করিয়া, পানার্থে জল প্রার্থনা করিলেন। ... ব্রাহ্মণের ছেলেকে শুধু জল দেওয়া অবিধেয়, এই বিবেচনা করিয়া, কিছু মুড়কি ও জল দিলেন, ঠাকুরদাস, যেরূপ ব্যগ্র হইয়া, মুড়কিগুলি খাইলেন তাহা একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া, ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয় নাই? তিনি বলিলেন না, মা, আজ আমি এখন পর্যন্ত কিছুই খাই নাই। তখন, সেই স্ত্রীলোক ঠাকুরদাসকে বলিলেন, বাপাঠাকুর জল খাইও না, একটু অপেক্ষা কর। এই বলিয়া, নিকটবর্তী গোয়ালার দোকান হইতে, সত্বর, দই কিনিয়া আনিলেন, এবং আরও মুড়কি দিয়া, ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়া ফলার করাইলেন। পরে, তাঁহার মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, জিদ করিয়া বলিয়া দিলেন, যে দিন তোমার এরূপ ঘটিবেক, এখানে আসিয়া ফলার করিয়া যাইবে।" বিদ্যাসাগর চরিত, প্রথম পরিচ্ছেদ, বিদ্যাসাগর রচনা সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলিকাতা ৭০০ ০০৯, প্রথম প্রকাশ, ১৫ এপ্রিল ১৯৮৭, পৃঃ ৫৭৭।

৮৪ তদেব।

৮৫ *বিদ্যাসাগর রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৮৫।

কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণির পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ বিদ্যাসাগরের সমবয়সী ছিলেন। "স্নেহ ও যত্ন বিষয়ে আমায় ও গোপালে রাইমণির অনুমাত্র ভিন্ন ভাব ছিল না। ফলকথা এই, স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিষয়ে, রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্য্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই।"[৮৬] রাইমণির স্নেহ ভালোবাসা বিদ্যাসাগর কখনো বিস্মৃত হননি। পরিণত বয়সে এই অকৃত্রিম স্নেহস্মৃতি তাঁর অশ্রুপাত না ঘটিয়ে ছাড়ত না। "আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া, অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয় সে নির্দ্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে, তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।"[৮৭] পিতামহী ও মাতার স্নেহক্রোড় থেকে বিচ্ছিন্ন বালক রাইমণির কাছে এসে বিচ্ছেদবেদনা ভুলতে পেরেছিলেন, কিন্তু ভুলতে পারেননি স্ত্রীজাতির অতুলনীয় হৃদয়সম্পদের কথা। তাই এহেন স্ত্রীজাতির চূড়ান্ত দুর্গতির দিকে তাঁর নজর পড়েছিল। এই দুর্গতির হাত থেকে নারীদের রক্ষা করা তাঁর জীবনের ব্রত হয়ে উঠেছিল।

মাতৃসমা এক নারী যখন তাঁর হৃদয়ে এরকম আলোড়ন তুলতে পারেন তখন মাতা ভগবতী দেবী যে পুত্রের জীবনে অসীম প্রভাব বিস্তার করবেন তা সহজবোধ্য। তদুপরি, ভগবতী দেবী নানা গুণে ভূষিতা ছিলেন। "ভগবতী দেবী উদারহৃদয় নারী ছিলেন। যে মাতুল পরিবারে তিনি আশৈশব মানুষ হয়েছিলেন, শিক্ষাদীক্ষায় ও বিদ্যাচর্চায় তাঁদের সমতুল্য পরিবার খুব অল্পই ছিল। সাধারণ অশিক্ষিত গ্রাম্য নারীর মতো সংস্কার বা সামাজিক সংকীর্ণতা তাঁর না থাকা আশ্চর্য নয়।"[৮৮] সম্ভবত এই কারণেই, ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তার পারিবারিক পরিবেশের চেয়ে অনেক উঁচুতে আরোহণ করে বিদ্যাসাগর হতে পেরেছিলেন। কারণ, সাধারণ স্বল্পবিত্ত একান্নবর্তী পরিবারের যত রকমের মালিন্য থাকা সম্ভব, ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃ-মাতৃকুলের অধিকাংশ পরিবারেই তা পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল।"[৮৯] এ কারণে, মাতৃআজ্ঞা তাঁর কাছে অলঙ্ঘনীয় ছিল। মায়ের অনুরোধে, তৃতীয় ভ্রাতার বিবাহে যোগ দিতে গিয়ে কিভাবে ভরা বর্ষার দুরন্ত দামোদর সাঁতরে পার হয়েছিলেন, এখানে সে ঘটনার উল্লেখ পুনরুক্তির দোষ ঘটাবে মাত্র।[৯০] মাতার

৮৬ তদেব।

৮৭ তদেব।

৮৮ *বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫৭।

৮৯ তদেব, পৃ: ১৪।

৯০ বিহারীলাল সরকার, বিদ্যাসাগর, সম্পাদনা, শ্রী প্রহ্লাদ কুমার প্রামাণিক, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, দ্বিতীয় সংস্করণ : নভেম্বর, ১৯৯১ (বিহারীলাল সরকারের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণ অনুযায়ী পুর্নমুদ্রিত) পৃ: পৃ: ৯৪-৯৫।

সেবাপরায়ণতা ও পরোপচীকির্ষা বিদ্যাসাগর পুরোমাত্রায় লাভ করেছিলেন। তাঁর জীবনীকার ভগবতী দেবীর এই চারিত্রবৈশিষ্ট্য সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন।[৯১] প্রসঙ্গক্রমে জননীর কথা উপস্থিত হলেই মাতৃভক্ত সন্তান বলতেন : "আমি যদি আমার মায়ের গুণরাশির শতাংশের একাংশ মাত্রও পাইতাম, তাহা হইলে কৃতার্থ হইতাম। আমি এমন মায়ের সন্তান, ইহা (*Glory*) গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করি।"[৯২]

বলা বাহুল্য, এ রকম মায়ের সমস্ত ইচ্ছা বিদ্যাসাগর সাধ্যমত মেটাতে চেষ্টা করতেন। দয়াময়ী ভগবতী পুত্রের পাঠান ছয়টি লেপ বিপন্ন শীতার্ত গ্রামবাসীকে দিয়ে দিয়েছেন, তাই নিজেদের ব্যবহারের জন্য আবার লেপ পাঠাতে পুত্রকে লিখলে পুত্র উত্তরে লিখলেন : "ঐরূপ ভাবাপন্ন লোকদিগকে ও বাড়ির লোকদিগকে দিয়া তোমার নিজের জন্য একখানি লেপ রাখিতে হইলে, সর্বসমেত কয়খানি লেপ পাঠাইব লিখিবে। তোমার পত্র পাইলে আবশ্যকমতো লেপ পাঠাব।"[৯৩]

মাতৃনাম উচ্চারণ বিদ্যাসাগরের আবেগ উদ্বেলিত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। বহু ভিক্ষুক এভাবে "আমার মা নাই" একথা বলে তাঁর কাছ থেকে ভিক্ষা নিয়ে গেছে। 'মা নাই' এই কথা বলে অনেকেই অনেক সময় ফাঁকি দিয়ে তাঁর কাছ থেকে অর্থ নিয়ে যেত।[৯৪] বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গানবাজনায় বড় শখ ছিল না। ... একজন অন্ধ মুসলমান ভিক্ষুক বেহালা বাজাইয়া শ্যামাসঙ্গীত গাহিত। সে সঙ্গীতে 'মা'-'মা' ধ্বনি থাকিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে ডাকাইয়া লইয়া তাঁহার গান শুনিতেন। গান শুনিতে শুনিতে তিনি অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিতেন না। ... একবার ইহার ঘর পুড়িয়া গিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাকে গৃহনির্মাণের সমস্ত ব্যয় দিয়াছিলেন।"[৯৫] বিদ্যাসাগরের জীবনের এই সব ঘটনা প্রমাণ করে যে মাতার প্রভাব তাঁর উপরে কতখানি গভীর ছিল। মায়ের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা শুধু মাতৃসমা নারীদের প্রতি নয়, সমগ্র নারীসমাজের সঙ্গে তাঁর বন্ধন অচ্ছেদ্য করে তুলেছিল।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে স্ত্রীর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্বন্ধ কি রকম ছিল। কারণ, যে কোন পুরুষের জীবনে যে দুই নারী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তাঁদের একজন হলেন মা, অপর জন স্ত্রী। যে বিদ্যাসাগর পরবর্তীকালে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধাচার করবেন তাঁর পক্ষে চৌদ্দ বৎসর বয়সে বিবাহ করা ইতিহাসের কৌতুক ব্যতীত আর কি। বিদ্যাসাগরের বিবাহের ঘটনাটি এই রকম :

৯১ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, কলেজ স্ট্রীট পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম কলেজ স্ট্রীট সংস্করণ, রথযাত্রা ১৩৯৪, পৃ: পৃ: ৩৪০-৩৪১।

৯২ তদেব, পৃ: ৩৪০।

৯৩ তদেব, পৃ: ৩৪১।

৯৪ বিহারীলাল সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৬৩

৯৫ তদেব।

"...ক্ষীরপাই গ্রাম নিবাসী পণ্ডিত বংশের শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য একদিন বীরসিংহ গ্রামে ঠাকুরদাসের গৃহে এসে বললেন 'ঈশ্বর শুনছি নাকি বিদ্বান হয়েছে, কলকাতার কলেজে লেখাপড়া শিখছে। তাই ভাবছি সৎপাত্রে কন্যাদান করব।' ভট্টাচার্য মহাশয় কোষ্ঠী গণনা করে দেখেছেন, তাঁর কন্যাটি খুবই সুলক্ষণা। বিবাহের কোন অন্তরায় নেই।" "ক্ষীরপাই গ্রামের শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের কন্যা দিনময়ী দেবীর সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাহ হল।"[৯৬]

ইতিপূর্বে আমরা ঈশ্বরচন্দ্রের পারিবারিক অবস্থার কথা জেনেছি। দরিদ্র ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে ধনী পরিবারের কন্যা দিনময়ীর বিবাহ হওয়া একটু আশ্চর্য বটে, বিশেষত ঈশ্বরচন্দ্র তখন নিতান্ত বালক মাত্র, বিদ্যাসাগর বা দয়ার সাগর কোনটাই হয়ে ওঠেননি। কিন্তু ইতিমধ্যেই ব্যাকরণ ও সাহিত্যে বিশিষ্টরূপে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন, তাই শুধু নয়, তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি মেদিনীপুর, বর্ধমান ও হুগলী জেলার নানা স্থানে এই কথা প্রচারিত হওয়ায় নানা স্থান থেকে ঈশ্বরচন্দ্রকে কন্যাদান করবার প্রস্তাব নিয়ে লোক আসতে লাগল।[৯৭]

"অনেক স্থান হইতে প্রস্তাব আসিল বটে, কিন্তু শেষে ক্ষীরপাই নিবাসী শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহের স্থির হয়"[৯৮] ক্ষীরপাই গণ্ডগ্রাম হলেও বড় বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। ঐ অঞ্চলের বস্ত্রব্যবসায়ীরা ক্ষীরপাই এসে কাপড় বিক্রী করত, পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দুস্থানী মহাজনরাও ক্ষীরপাই এসে বস্ত্র ক্রয় করত। অন্য নানা স্থানের নানা দ্রব্য ক্ষীরপাইয়ের গঞ্জে সর্বদা বিক্রয়ের জন্য মজুত থাকত। এই রকম সম্পন্ন গ্রামের মধ্যে শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য মহাশয় ধনেমানে অনেকের অগ্রণী ছিলেন।[৯৯] এহেন ভট্টাচার্য মহাশয় যে তার রূপগুণসম্পন্না অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাকে চতুর্দশবর্ষীয় বালক ঈশ্বরচন্দ্রের হাতে সমর্পণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তার কারণ হল এই : "ভট্টাচার্য মহাশয় ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, 'বন্দ্যোপাধ্যায়, তোমার ধন নাই, তোমার পুত্র বিদ্বান হইয়াছেন। কেবল এই কারণে আমার প্রাণসমা তনয়া দীনময়ীকে তোমার পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিলাম।"[১০০] শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য অতি তেজস্বী, ক্রোধী ও বলবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তৎকালে তাঁর গ্রামে তাঁর বলবত্তার তুলনা ছিল না। পরন্তু তিনি সহজতা, সহৃদয়তা ও উদার গুণে সর্বজনের ভক্তি ও প্রীতি আকর্ষণ করতেন। দিনময়ী এই তেজস্বী সরল সাহসী পুরুষের কন্যা। "ভগবতী দিনময়ী পুত্রকন্যা রাখিয়া স্বামীর পূর্বে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া নিজ সৌভাগ্যশালিতার এবং শুভগ্রহ সম্পন্নতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে বহুবর্ষব্যাপক কৃচ্ছ্রসাধ্য সাবিত্রী ব্রতের

৯৬ বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ: ১০৮।
৯৭ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ: পৃ: ৩৯-৪০।
৯৮ তদেব, পৃ: ৪০।
৯৯ তদেব।
১০০ তদেব।

উদযাপন করিয়াছিলেন।"[১০১] এই বর্ণনা থেকে মনে হয় যে দিনময়ী দেবী এক যুগন্ধর পুরুষের সহধর্মিণী হিসেবে নিজেকে সৌভাগ্যশালিনী বলে মনে করতেন। কিন্তু প্রকৃত চিত্র কি তাই ছিল? স্বামীগৃহে এসে দিনময়ী দেবী কি সত্য সুখী ছিলেন? এ প্রসঙ্গে, বিদ্যাসাগর নিজে কি মনে করতেন? শ্বশুরগৃহে গিয়ে বধূর আচরণীয় ধর্ম কি সে সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর যে মত পোষণ করতেন, শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার সময় মহর্ষি কণ্বর মুখ দিয়ে বিদ্যাসাগর তা বলিয়েছেন। "তুমি পতিগৃহে গিয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে ; সপত্নীদিগের সহিত প্রিয়সখী ব্যবহার করিবে, পরিচারিণীদিগের প্রতি সম্পূর্ণ দয়াদাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিবে; সৌভাগ্যগর্বে গর্বিত হইবে না; স্বামী কার্কশ্য প্রদর্শন করিলেও রোষবশা ও প্রতিকূলচারিণী হইবে না ; মহিলারা এরূপ ব্যবহারিণী হইলেই গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিতা হয় ;..."[১০২] দিনময়ী দেবীর আচরণ যে সর্বদা তাঁর স্বামীর মনোগত আদর্শ মেনে চলত না তার কিঞ্চিৎ প্রমাণ মেলে, বিদ্যাসাগরের লেখা পত্র থেকে। বিদ্যাসাগর সংসার সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তিনি ইহজীবনে আর বীরসিংহ গ্রামে প্রত্যাবর্তন করবেন না। ১৮৬৯ সাল নাগাদ এই ঘটনা ঘটে কারণ, নিজ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বিদ্যাসাগর ১২ই অগ্রহায়ণ ১২৭৬ বঙ্গাব্দ এই তারিখ দিয়ে একাধিক ব্যক্তিকে পৃথক পৃথক চিঠি লেখেন। এই সমস্ত পত্রগুচ্ছের মধ্যে একটি তাঁর স্ত্রীকে লেখা। এই চিঠির শেষ অংশে বিদ্যাসাগর লিখেছেন : "সকল বিষয়ে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া চলিবে, নতুবা স্বয়ং যথেষ্ট ক্লেশ পাইবে এবং অন্যেরও বিলক্ষণ ক্লেশদায়িনী হইবে।"[১০৩]

বোঝা যাচ্ছে যে সাংসারিক বিষয়ে স্ত্রীর ধৈর্য্যের অভাব বিদ্যাসাগরকে মধ্যে মধ্যে বিব্রত করত। কিন্তু কেন এই অসহিষ্ণুতা, সে কি দিনময়ীর চরিত্রগত না পরিস্থিতি জাত? যে মহিলা কৃচ্ছ্রসাধ্য সাবিত্রীব্রত পালন ও উদ্‌যাপন করতে পারেন, তিনি যে স্বভাবগত ভাবে অসহিষ্ণু তা মনে করা সঙ্গত নয়। তাঁর জীবনীকার লিখছেন : "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিবাহিত জীবনের দীর্ঘকালের মধ্যে প্রথম চৌদ্দ বৎসর নিরতিশয় অশান্তির মধ্যে কাটিয়াছিল। ইহার কারণ এই যে বাইশ বৎসর বয়স পর্যন্ত নবীনা বধূর সন্তানাদি না হওয়াতে পরিবারের সকলেই অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে কালাতিপাত করিয়াছিলেন এবং যে কোনো লোক যখনই কোনো ঔষধাদির কথা বলিয়াছে, প্রবীণারা তাহাই বধূমাতাকে খাওয়াইয়াছেন।"[১০৪] সন্তান না হওয়ার দায়ভাগ ও তজ্জনিত পারিবারিক নিগ্রহ সকলই দিনময়ী দেবীকে সহ্য করতে হয়েছিল, যতক্ষণ না ১৮৪৯

১০১ বিহারী লাল সরকার, *বিদ্যাসাগর*, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: পৃ: ৪৭, ৫০।

১০২ *বিদ্যাসাগর রচনাসমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত "শকুন্তলা", পৃ: ৩২৮, ডঃ রঞ্জিত সেন, ভাবিত পুরুষ ও অ-ভাবিত নারী : নারী প্রশ্নের সেকাল একাল গ্রন্থে উদ্ধৃত।

১০৩ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৫৯।

১০৪ তদেব, পৃ: ৩৩৪।

খ্রীষ্টাব্দের কার্তিক মাসের শেষদিকে বিদ্যাসাগরের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র বিদ্যারত্ন জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

"বিদ্যাসাগর মহাশয় অত্যন্ত পিতৃমাতৃবৎসল ছিলেন। ...জনক জননীকে সুখী করা তাঁহার জীবনের এক প্রধান লক্ষ্য ছিল। ... এই জন্য অনেক সময়ে তাঁহার পারিবারিক সুখ ভোগের ব্যাঘাত জন্মিয়াছিল।"[১০৫] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বারংবার অনুরোধ করে পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিষয়কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করাইয়াছিলেন এবং তদবধি ঠাকুরদাস ছিলেন বীরসিংহ গ্রামের গৃহকর্তা আর ভগবতী দেবী ছিলেন গৃহিণী। বিদ্যাসাগর এই বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতেন। যদিও বিদ্যাসাগর জননী, পত্নী ও পুত্রকন্যাসহ কখনো কখনো কলকাতাবাস করতেন তবুও বেশির ভাগ সময় তিনি একাই শহরে থাকতেন, স্ত্রী পুত্রকন্যাদের নিয়ে গ্রামের যৌথ পরিবারে থাকতেন।[১০৬] "একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারে সর্বদা যেসকল অসুবিধা সংঘটনের সম্ভাবনা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতৃগৃহে সেরূপ অসুবিধার অভাব ছিল না;..." সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে শ্বশুরগৃহের বিবিধ অসুবিধার কারণে দিনময়ীর জীবনযাপন যে খুব সুখপ্রদ ছিল তা নয়। পরন্তু, তাঁর স্বামীর অতিরিক্ত পিতৃমাতৃভক্তির দরুন তিনি যে কখনো কর্ত্রীপদ পাবেন এরকম কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাছাড়া, বিদ্যাসাগর তাঁর রচনায় যদিও আদর্শ বধূর আচরণবিধি নির্দেশ করে গিয়েছিলেন,[১০৭] তবুও দিনময়ী দেবী তা পালন করে গৃহকর্ত্রী হবার চেষ্টায় যে খুব যত্নবতী হয়েছিলেন তা নয়। এর প্রথম কারণ হল তাঁর নিরক্ষরতা, যে জন্য স্বামীর রচনা পাঠ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয় কারণ হল যে সংসারে সব সদস্যের সঙ্গে তাঁর বনিবনা হত না। ভ্রাতৃজায়ার সঙ্গে মনোমালিন্যের কথা বিদ্যাসাগরকে ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের লেখা একটি পত্র থেকে জানা যায়। বিদ্যাসাগর যখন চিরদিনের জন্য বীরসিংহ গ্রাম পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে কলকাতা চলে গিয়েছিলেন তখন, ১২৭৬ সালের ২০শে কার্তিক (১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে) তারিখে লেখা একটি চিঠিতে শম্ভুচন্দ্র আক্ষেপ করে লিখেছিলেন "... যে দাদা আমার মানের জন্য স্ত্রীর সহিত মনান্তর করিয়াছেন ..."[১০৮] এখানেও দিনময়ী দেবীর ধৈর্যচ্যুতি ও অসন্তোষের কারণ রয়েছে দেখা যাচ্ছে। অবশ্য ভ্রাতৃজায়া ও দেবরের মধ্যে মনোমালিন্যে কার দোষ ছিল তা জানার কোন উপায় নেই।

তবুও, পারিবারিক অশান্তিতে বিদ্যাসাগর নাজেহাল হয়েছিলেন এবং শেষপর্যন্ত তিনি তাঁর যৌথপরিবার ভেঙ্গে দিতে বাধ্য হন। "বহুপরিবার একত্র বাস নিতান্ত অপ্রীতিকর ও

১০৫ তদেব।

১০৬ তদেব।

১০৭ *"শকুন্তলা"* পূর্বোক্ত, পৃ: ৩২৮।

১০৮ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৬৩।

অশান্তিজনক বিবেচনা করিয়া তিনি সহোদরদের সকলের পৃথক পৃথক গৃহ নির্মাণের বন্দোবস্ত করেন। সকলে একত্র মারামারি কাটাকাটি না করিয়া পৃথক পৃথক বাস করিয়া পরস্পরের প্রতি আত্মীয়তা ও সমবেদনা রক্ষা করিয়া চলা অশেষ গুণে মঙ্গলকর মনে করিতেন, তাই অশান্তির স্থানে শান্তি স্থাপনের অভিলাষী হইয়া সকলের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।"[১০৯] কিন্তু এত করেও বিদ্যাসাগর শান্তিরক্ষা করতে পারেননি। কারণ, শম্ভুচন্দ্রের যে পত্রে ভ্রাতৃজায়ার সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্যের উল্লেখ আছে সেই একই পত্রে[১১০] শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন ... "যে দাদা আমার কষ্ট হইবে ভাবিয়া স্বতন্ত্র বাটী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন..."[১১১] আসলে, "বিদ্যাসাগর মহাশয় সহোদরদিগকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং সর্ব্বদা তাঁহাদের এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গের সুখ চিন্তা করিতেন। তাঁহার জীবদ্দশায় সহোদরদিগের কাহাকেও পরিজনসহ কোনো দিন ক্লেশ পাইতে হয় নাই, কিন্তু সহোদরেরা যে তাঁহার প্রতি সর্ব্বদা সমুচিত ভ্রাতৃভাবাপন্ন ছিলেন এরূপ বোধ হয় না, ..."[১১২] এই উপলব্ধি যে লেখকের কপোলকল্পিত তা নয়। কারণ লেখক স্বয়ং বিদ্যাসাগরের সঙ্গলাভে ধন্য, "তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহবান ছিলেন, এবং শত শত ঘটনায় তাহার পরিচয় দিয়াছেন।" "তাঁহার শেষ জীবনের দীর্ঘকাল তাঁহার পবিত্র সহবাসে সুখে আমি নানা প্রকারে উপকৃত।"[১১৩] আর, তাঁর মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন একবার বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মামলা করেছিলেন, যাতে সালিশী হয়েছিলেন মাননীয় জজ দ্বারকানাথ মিত্র ও শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাস।[১১৪]

মনে হয়, সাংসারিক অশান্তি ও তজ্জনিত ভাঙনের জন্য তিনি পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে স্ত্রীকে সমানভাবে দায়ী করেছিলেন এবং যে চরম তিক্ততা, হতাশা ও ঔদাসীন্য নিয়ে চিরদিনের মতো বীরসিংহ ত্যাগ করেছিলেন, তার অংশ অন্য সকলের সাথে দিনময়ী দেবীও সমানভাবে ভোগ করেছিলেন। এতে বিদ্যাসাগরের দৃঢ়তা, তেজস্বিতা প্রকাশ পেয়েছিল কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার অবসান হয়নি। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দিনময়ীর মানসিক দূরত্ব যে কতখানি ছিল তা প্রকাশ পেয়েছে নারায়ণচন্দ্রের বিধবাবিবাহের ঘটনায়। এঁদের একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন যখন বিধবা বিবাহ করলেন তখন বিদ্যাসাগর যারপরনাই খুশী হলেন। ১২৭৭ সালের

১০৯ তদেব, পৃ: ৩৪৮।

১১০ বিদ্যাসাগরকে লেখা শম্ভুচন্দ্রের পত্র, ২০শে কার্তিক, ১২৭৬ সাল।

১১১ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৬৩।

১১২ তদেব, পৃ: ৩৪৯।

১১৩ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমিকা, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: পৃ:

১১৪ তদেব, পৃ: ৩৪৯।

২৭শে শ্রাবণ বা ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার নারায়ণবাবু খানাকুল কৃষ্ণনগর নিবাসী শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা শ্রীমতী ভবসুন্দরী দেবীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন।[১১৫] এ বিবাহ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন : "অগ্রজ মহাশয়, বিধবাবিবাহের প্রবর্ত্তক; এতাবৎকাল উদ্‌যোগ করিয়া, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, অন্যান্য লোকের বিধবাবিবাহ দিয়া আসিতেছিলেন;আমাদের বংশে অদ্যাপি বিবাহের কারণ ঘটে নাই। এইজন্যে সকল স্থানের লোকেই বলিত, বিদ্যাসাগর মহাশয় পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গেন, নিজের বেলায় ঠিক আছেন। এক্ষণে তাঁহার পুত্র নারায়ণের বিবাহ হওয়ায়, অগ্রজ মহাশয়কে আর কাহারও নিকট নিন্দার ভাজন হইতে হইল না।"[১১৬] "কিন্তু জ্যেষ্ঠা বধূদেবী প্রভৃতি এ বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করায়, উভয় পক্ষের মন্তব্য পত্রসহ ঐ পাত্রী ও উহার মাতাকে কলিকাতায় অগ্রজের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।"[১১৭]

বিদ্যাসাগর কিন্তু পত্নীর অসম্মতি সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি। হয়ত পুত্রের বিধবাবিবাহের সিদ্ধান্ত তাঁকে এতই খুশী করেছিল যে সমস্ত বাধা তিনি তুচ্ছ বলে গণ্য করতে চেয়েছিলেন নয়ত স্ত্রীর আপত্তিকে তিনি গুরুত্ব দিতে চাননি। "ভ্রাতা বিদ্যারত্ন মহাশয় এই বিবাহে আপত্তি করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলেন।"[১১৮] বিদ্যারত্ন মহাশয় অর্থাৎ শম্ভুচন্দ্র যে সব কারণে এই বিবাহে আপত্তি করেছিলেন তা হল এই যে "কন্যার মাতা বিধবা কন্যাটিকে লইয়া প্রথম বীরসিংহ গ্রামে উপস্থিত হন। তথায় তিনি বিদ্যারত্ন মহাশয়কে কন্যার পুনর্বিবাহ দিবার প্রস্তাব করেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পত্র লেখেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় একটি পাত্র ঠিক করিয়া কন্যাকে কলিকাতায় আনিবার জন্য বিদ্যারত্ন মহাশয়কে পত্র লিখিয়া পাঠান। ইতিমধ্যে কিন্তু নারায়ণবাবু কন্যাটির বিবাহার্থী হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সে সংবাদ পাইলেন। বাড়ির অন্যান্য অনেকের অমত ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্পূর্ণ অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁহারই আদেশক্রমে পাত্র ও পাত্রী কলিকাতায় আনীত হয়। মৃজাপুর নিবাসী ডিঃ কলেক্টর কালীচরণ ঘোষের বাড়িতে পরিণয় কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল।"[১১৯] শম্ভুচন্দ্র তাই আপত্তি করেছিলেন যে, "ঐ কন্যার সম্বন্ধ অগ্রজ মহাশয় অন্য এক পাত্রের সহিত স্থির

১১৫ বিহারী লাল সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৯৫।

১১৬ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ, বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা - ৬, ১৯৬২, পৃ: ১৯৯।

১১৭ তদেব, পৃ: ২০০।

১১৮ বিহারী লাল সরকার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ২৯৬।

১১৯ তদেব, পৃ: পৃ: ২৯৫-২৯৬।

করিয়াছিলেন, সে ব্যক্তি অতি ভদ্রলোক, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সম্ভ্রমের সহিত কর্ম করিতেন। তিনি ঐ কন্যার সহিত বিবাহকার্য সম্পাদনার্থ অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করাইতেছিলেন। তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়া নারায়ণের সহিত বিবাহ দিলে সে ব্যক্তি কি মনে করিবেক।"[১২০] এছাড়াও "পুণ্যপাদ জ্যেষ্ঠা বধূদেবী অত বড় মেয়ের সহিত বিবাহ দিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন..."[১২১] কারণ, "বিবাহের সময় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যার বয়স তৎকালে প্রায় ষোড়শ বর্ষ।"[১২২] কিন্তু, বিদ্যাসাগর যেমন কোন আত্মীয়স্বজনের কথা ধর্তব্যের মধ্যে আনেননি, তেমনি স্ত্রীর মতামতকেও তিনি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছিলেন। উপরন্তু, "এ বিবাহে তাঁহার মত নাই ভাবিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে সংবাদ দিতে দেন নাই।"[১২৩] নারায়ণবাবু যখন পিতাকে বলেছিলেন "ঠাকুরমা চিরদিন বিধবাবিবাহে সপক্ষতা করিয়া আসিতেছেন, তিনি এবং মা আসিবেন না কি?" বিদ্যাসাগর উত্তরে বলেছিলেন "পুত্রের উপর পিতার অপেক্ষা মাতার অধিক অধিকার, তোমার গর্ভধারিণী যদি তোমার এ বিবাহে অমত করেন, তাহা হইলে আমি থাকিতে পারিব না।"[১২৪] প্রত্যুত্তরে নারায়ণবাবু মনের ইচ্ছা অবদমন করে নীরব হয়ে রইলেন। কিন্তু মায়ের অনুপস্থিতি তাঁকে বড়ই ব্যথিত করেছিল। বিশেষতঃ তিনি বুঝেছিলেন যে তাঁর ইচ্ছায় তাঁর মাতা দ্বিমত পোষণ করবেন না। "ইহাতে যে মায়ের মত ছিল, বিবাহান্তে মা তাহা স্পষ্টই বলিয়াছিলেন।"[১২৫] "নারায়ণবাবুর বিবাহের পর সংবাদ পাইয়া তদীয় জননী কলিকাতায় আসিয়া পুত্রবধূকে ক্রোড়ে লইয়া বহু অশ্রুপাত করিয়া বলিয়াছিলেন। 'এত সুখে আমাকে বঞ্চিত করিয়া তোদের কি লাভ হইল? বউ নিয়ে আমাকেই ঘর করিতে হইবে।' বলা বাহুল্য তিনি দীর্ঘ জীবনে বধূর প্রতি কখনও স্নেহের অভাব প্রদর্শন করেন নাই।"[১২৬] বিধবাবিবাহের প্রতি দিনময়ীর এই মনের ভাবের সঙ্গে বিদ্যাসাগর অপরিচিত ছিলেন। তাই সমাজসংস্কারের কাজে বিদ্যাসাগর যে একজন সহকারী পেতে পারতেন, তা আর হয়ে ওঠেনি। তাই, দিনময়ীকে যেমন তিনি সাংসারিক সুখলাভে বঞ্চিত করেছিলেন নিজেও সেই সুখলাভে বঞ্চিত হয়েছিলেন। শাশুড়ী-পুত্রবধূর কল্পিত বিবাদের আশঙ্কায় বিচলিত হয়ে বিদ্যাসাগর পুত্রকে আলাদা বাসা করে দিয়েছিলেন।

১২০ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৭০।

১২১ তদেব, পৃ: ২৭১।

১২২ তদেব, পৃ: ২৬৯।

১২৩ বিহারী লাল সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৯৭।

১২৪ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৫৩।

১২৫ বিহারী লাল সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৯৭।

১২৬ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৫৩।

কিন্তু দিনময়ীর পুত্রস্নেহ এতই প্রবল ছিল যে এরপরও "...শ্বশ্রূ, পুত্র ও বধূ, সকলেই বহুদিন একত্র কালযাপন করিয়াছিলেন। নিরক্ষরা বিদ্যাসাগর পত্নী স্বধর্মে সম্পূর্ণ প্রবৃত্তিময়ী হইয়াও পতি-পুত্রের স্নেহবন্ধনবশতঃ পুত্রেব সংস্রব পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।"[১২৭] কিন্তু পরবর্তী কালে বিদ্যাসাগর ও নারায়ণচন্দ্রেব মধ্যে মতবিরোধ হলে বিদ্যাসাগর তাঁর পুত্রকে ত্যাজ্য করেছিলেন। তখন বাধ্য হয়ে দিনময়ীকেও স্বামীর মতানুসারিণী হতে হয়েছিল। শম্ভুচন্দ্র তাঁর গ্রন্থে[১২৮] বিদ্যাসাগরের উইলের যে প্রতিলিপি সন্নিবিষ্ট করেছিলেন তার পঞ্চবিংশতি ধারায় বলা হযেছে যে "আমার পুত্র বলিয়া পরিচিত শ্রীযুক্ত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যারপরনাই যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী এজন্য ও অন্য অন্য গুরুতর কারণবশত আমি তাহার সংস্রব ও সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছি..."[১২৯] "পুত্র নারায়ণের বিসর্জনে মাতা দারুণ মনস্তাপ পাইয়াছিলেন। সে কুসুমাদপি কোমল প্রাণ দাবানলে দগ্ধীভূত হইয়াছিল। মাতার সুখস্বচ্ছন্দতা ছিল না। ইহার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বনিতার প্রসন্নতাফল ভোগে কতক বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল।"[১৩০] "১২৯৫ সালের ৩০শে শ্রাবণ বা ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পত্নী রক্তামাশয় পীড়ায় লোকান্তরিত হন। মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্বে ইনি কপালে করাঘাত করিতে আরম্ভ করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা পিতাকে ডাকিয়া বলেন, — "বাবা, মা কি বলিতেছেন শুনুন।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, — 'বুঝিয়াছি, তাই হইবে; তাহার জন্য আর ভাবিতে হইবে না।' কপালে করাঘাত, পুত্রের জন্য করুণা ভিক্ষা। আশ্বাস পাইয়া সতী সুখে প্রাণ বিসর্জন করেন।"[১৩১] বোঝা যায় যে শেষজীবন পর্যন্ত দিনময়ী দেবী ছেলের জন্য নিদারুণ মনোবেদনা ভোগ করেছিলেন। অথচ তিনি ছিলেন তেজস্বী রমণী। স্বাভাবিক অবস্থায় তিনি পুত্রের জন্য করুণা ভিক্ষা করেননি। "বর্জিত পুত্র,নারায়ণের জন্য পতির সহিত তাঁহার অনেক সময় বাদবিসংবাদ ঘটিত। এই বাদবিসংবাদই সদ্ভাবত্রুটির মূল কারণ হইয়াছিল। অনেক সময় তিনি গোপনে পুত্রকে অর্থসাহায্য করিতেন। এমনকি নিজের অলঙ্কার পর্যন্ত বন্ধক দিতেন। এজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে টাকাকড়ি দেওয়া বন্ধ করিতেন। পিতা শত্রুঘ্ন যেমন তেজস্বী ছিলেন, কন্যা দিনময়ীও তেমনি তেজস্বিনী ছিলেন। স্বামীর নিকট একবার কোন জিনিস চাহিয়া না পাইলে, তিনি দুর্জয় অভিমানে অভিভূত হইতেন। তেজস্বী বিদ্যাসাগর তাহার জন্য

১২৭ বিহারী লাল সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৯৭।

১২৮ *বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাস*, পূর্বোক্ত।

১২৯ তদেব, পৃ: ৩২৩।

১৩০ বিহারী লাল সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩১১।

১৩১ তদেব, পৃ: ৩৫৯।

বিচলিত হইতেন না। এইরূপে মনোবাদ ঘটিত।"[১৩২] এখানে অবলাবান্ধব বিদ্যাসাগরের যে রূপ প্রতিফলন ঘটেছে, তা এক রুদ্রপ্রতাপ পুরুষের, যিনি নারীর প্রতিবাদ ক্ষমতাকে অবদমন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দিনময়ী দেবী তেজস্বী ছিলেন বলে হয়ত তিনি ততটা অসহায় হননি, কিন্তু সচরাচর তা হত না। বক্তব্য সুপরিস্ফুট করার জন্য এখানে পিতার হাতে পুত্রের দণ্ডলাভের আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে, দণ্ডপ্রাপ্ত পুত্র শিবনাথ শাস্ত্রী আর দণ্ডদাতা তাঁর পিতা। মায়ের সামনে পিতা শিবনাথকে নির্মমভাবে প্রহার করেছিলেন। ফলে শিবনাথ অচৈতন্য হয়ে পড়েন। অসহায় মা "...আমাকে অচেতন হইয়া পড়িয়া যাইতে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীর নিকটস্থ জঙ্গলে গিয়া পড়িয়া আছেন।"[১৩৩] বিদ্যাসাগর ছিলেন বাঙ্গালী পুরুষের পৌরুষের প্রতীক। তাঁর পুরুষকার দিয়ে তিনি সামাজিক সম্মান ও মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন। তাঁর এই প্রবাদপ্রতিম পুরুষকার ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই ভাবে — "যে অখণ্ড মানবতা ও অজেয় পৌরুষ বিদ্যাসাগরের স্বভাবধর্ম, সেই অখণ্ড মানবতা ও অজেয় পৌরুষই তাঁর ললাটে লিখে দেয় এই বিধিলিপি — সংসারে তিনি একক, তিনি নিঃসঙ্গ। ... দশ টাকার কেরানি ঠাকুরদাসের পুত্র অর্থের সহায়তায় বা আভিজাত্যের টীকা ললাটে নিয়ে এসে রামমোহনের মতো কলকাতার সমাজে উদিত হননি। তিনি সে সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন বিদ্যায়, পাণ্ডিত্যে, চরিত্রবলে — এককথায় আপন দুর্জয় ব্যক্তিত্বের বলে, আপন পৌরুষে, আর শেষে মানবতায়।"[১৩৪] বিদ্যাসাগরের এই দুর্জয় ব্যক্তিত্ব তাঁকে বাঙালী সমাজের শীর্ষে স্থাপন করলেও পরিবারের সঙ্গে কোন মানসিক সেতু গড়ে তুলতে দেয়নি। সেজন্য জীবনের শেষভাগে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে জীবদ্দশায় আর কখনো বীরসিংহ গ্রামে ফিরবেন না। অবশ্য স্বভাবগুণে তিনি পারিবারিক শান্তি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন।[১৩৫] কিন্তু ব্যর্থ হয়ে হতাশা ও আক্ষেপে ভরা যে পত্র তিনি পত্নী দিনময়ীকে লিখেছিলেন তা এইরকম —

১৩২ তদেব, পৃ: ৩৬০।

১৩৩ শিবনাথ শাস্ত্রী, *আত্মচরিত*, সম্পাদনা, গৌতম নিয়োগী, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ শতবার্ষিক সংস্করণ, ১৯৮২, পৃ: ৬১।

১৩৪ শ্রী গোপাল হালদার লিখিত ভূমিকা, *বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ*, ৩য় খণ্ড, সাহিত্য বিবিধ, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি, কার্তিক ১৩৭৯ (অক্টোবর ১৯৭২), পৃ: ৩০।

১৩৫ বিদ্যাসাগরের চিঠিপত্র, বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৫৫, এ উদ্ধৃত ১০নং চিঠি, পত্নী দিনময়ী দেবীকে লেখা।

"শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

গুণালঙ্কৃত শ্রীমতী দিনময়ী দেবী

কল্যাণনিলয়েষু

শুভাশীর্বাদপূর্বকমাবেদিনমিদম্

আমার সাংসারিক সুখভোগের বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, আর আমার সে বিষয়ে অণুমাত্র স্পৃহা নাই। বিশেষতঃ ইদানীং আমার মনের ও শরীরের যেরূপ অবস্থা ...। এক্ষণে তোমার নিকটে এ জন্মের মত বিদায় লইতেছি এবং বিনয় বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি যদি কখনো কোন দোষ বা অসন্তোষের কার্য করিয়া থাকি, দয়া করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবে।"[১৩৬]

বিদ্যাসাগরের যে দুর্জয় পৌরুষ সমাজে তাঁকে অনন্যতা দান করেছিল, তাঁকে এক নিঃসঙ্গ একাকীত্বের মহিমা দিয়েছিল, তা পরিবার জীবনে তাঁকে করেছে দাম্পত্যসুখ বঞ্চিত এক স্বামী। তাঁর মানবতা তাঁকে যতখানি মাতার প্রতি অনুগত করেছিল, ততখানি স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত করতে পারেনি। তাঁর করুণা, মানবতা তাঁকে সমাজ জীবনের পুরোভাগে স্থাপন করেছিল, পিতামাতার চির অনুগত সন্তান করেছিল, কিন্তু দারাপুত্র নিয়ে ভালবাসার নীড় বাঁধতে দেয়নি। তাঁর অতলস্পর্শী ভালবাসা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বঞ্চিত বাঙালি নারীসমাজের মরা গাঙে জোয়ার আনার প্রয়াস পেয়েছিলেন, কিন্তু একক যে নারীটি তাঁর ব্যক্তিজীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল সে রয়ে গিয়েছিল বঞ্চিত। স্ত্রীবিয়োগের পর বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনের এই নিঃসীম শূন্যতাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

"পত্নী বিয়োগের পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয়ে দাম্পত্য সুখাভাবের সুদারুণ স্মৃতি জাগরিত হইয়াছিল। সেই স্মৃতিতাড়নায় সহসা অনুতাপ-দাবানল প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই অন্তর্নিহিত দাবদাহের যন্ত্রণায় রোগও বাড়িয়া গিয়াছিল।"[১৩৭] এই অনুতাপ বিদ্যাসাগরের করুণাঘন পৌরুষের এক সার্থক প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

বাংলা রেনেশাঁয় বিদ্যাসাগরের মহত্তম অবদান হল তাঁর ব্যক্তিত্ব।[১৩৮] তাঁর এই ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের সমন্বয়ে, যা চমৎকার ফুটে উঠেছে তাঁর শিক্ষাবিষয়ক

১৩৬ বিহারী লাল সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৬০।

১৩৭ তদেব।

১৩৮ চিত্তব্রত পালিত, *New Viewpoints on Nineteenth Century Bengal*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলিকাতা - ৭৩, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ১৯৮০, পৃ: ১২০।

চিন্তার মধ্যে। সংস্কৃত কলেজের হাতে লেখা নথিপত্রের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা ২৬ অনুচ্ছেদ সংবলিত একটি সুদীর্ঘ রচনা পাওয়া গেছে, যার শিরোনাম *'Notes on the Sanskrit College'*।[১৩৯] এখানে বিদ্যাসাগর লিখেছেন,[১৪০]

১৩৯ বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্ট ১গ-তে সমগ্র রচনাটি উদ্ধৃত হয়েছে। রচনাটির উৎস হিসাবে শ্রী ঘোষ উল্লেখ করেছেন, Unpublished Manuscript Records, Sanskrit College, Calcutta, পৃ: পৃ: ৫১৬-৫২০।

১৪০ 1. The creation of an enlightend Bengali literature should be the first object of those who are entrusted with the superintendence of the Education of Bengal.

2. Such a Literature can not be formed by the exertions of those who are not competent to collect the materials from European sources and to dress them in elegant expressive idiomatic Bengali.

3. An elegant, expressive and idiomatic Bengali style cannot be at the command of those who are not good Sanskrit scholars. Hence the necessity of making Sanskrit scholars well versed in the English language and literature.

4. Experience proves that mere English scholars are altogether incapable of expressing their ideas in elegant and idiomatic Bengali. They are so much anglicised that it seems at present almost impossible for them, even if they make Sanskrit their after study, to express their ideas in an idiomatic and elegant Bengali style.

5. It is very clear then that if the students of the Sanskrit College be made familiar with English Literature, they will prove the best and ablest contributors to an enlightended Bengali Literature.

"১। বাংলাদেশে শিক্ষার তত্ত্বাবধানের ভার যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলা সাহিত্য জ্ঞানবিদ্যাব উপকরণ আহরণ করতে সক্ষম নন, এবং সেগুলিকে ভাবগম্ভীর প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম, তাঁরা এই সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন না।

২। যাঁরা ইয়োরোপীয় আকর থেকে জ্ঞানবিদ্যার উপকরণ আহরণ করতে সক্ষম নন, এবং সেগুলিকে ভাবগম্ভীর প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম, তাঁরা এই সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন না।

৩। যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী নন, তাঁরা সুসংবদ্ধ প্রাঞ্জল ভাষায় রচনা সৃষ্টি করতে পারবেন না। সেজন্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের ইংরেজি ভাষায় ও সাহিত্যে সুশিক্ষার প্রয়োজন।

৪। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, যাঁরা কেবল ইংরেজি বিদ্যায় পারদর্শী, তাঁরা সুন্দর পরিচ্ছন্ন বাংলা ভাষায় কিছু প্রকাশ করতে পারেন না। তাঁরা এত বেশি ইংরেজিভাবাপন্ন যে তাঁদের যদি অবসর সময়ে খানিকটা সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলেও তাঁরা শত চেষ্টা করেও পরিমার্জিত দেশীয় বাংলা ভাষায় কোনো ভাবই প্রকাশ করতে পারবেন না।

৫। তাহলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের যদি ইংরেজি সাহিত্য ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে তারাই একমাত্র সুসমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের সুদক্ষ ও শক্তিশালী রচয়িতা হতে পারবে।" সুতরাং, সংস্কৃতজ্ঞ বিদ্যাসাগর যেমন আরেকজন রাধাকান্ত হননি, ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে আবার তিনি দ্বিতীয় কৃষ্ণমোহনও হয়ে ওঠেননি। তাঁর সবিশেষ কৃতিত্ব এই যে তিনি তাঁর সমকাল ও সমকালীন জনগোষ্ঠীকে অতিক্রম করে চলেননি।[১৪১] এই সমন্বিত জ্ঞান তাঁর মধ্যে যে যুক্তিবোধ ও মানবতাবোধ সৃষ্টি করেছিল, বিদ্যাসাগর তাঁকে সমাজ সংস্কারের বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন।[১৪২] তিনি লক্ষ করেছিলেন চিরাচরিত জীর্ণ সংস্কার প্রাচীরের অন্তরালে নির্বাসিতা নারীসমাজ শিক্ষা-দীক্ষা, ও সামাজিক ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত, এভাবে তাদের অবস্থা পশুর চেয়েও হীন। কৌলীন্য প্রথার চূড়ান্ত বিকৃতিজনিত অভিশাপ নারীজীবনকে করে তুলেছিল দুর্বহ ও অমানবিক। এত দুর্গতিতেও মেয়েদের রেহাই ছিল না। বোঝার ওপর শাকের আঁটির মত ছিল বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ—যার পরিণতি ছিল অকালবৈধব্য। সমাজপতিরা শাস্ত্রাচার ও দেশাচার রক্ষার দোহাই দিয়ে সতীত্ব বজায় রাখতে চাইলেও সমাজে বয়ে চলেছিল ব্যভিচারের চোরা স্রোত। সামাজিক এ দুর্দিনে বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কারের কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে এলেন। কৌলীন্য প্রথা একদিকে নারীসমাজকে দুর্গতির পঙ্কে নিমজ্জিত করেছে, অন্যদিকে সৃষ্টি করেছে ব্যভিচারের চোরাবালি। এই অবস্থার নিরসন ঘটানোর জন্য তিনি বিধবাবিবাহ প্রচলনের যৌক্তিকতা নির্দেশ করলেন।[১৪৩]

---

১৪১ চিত্তব্রত পালিত, পূর্বোক্ত, পৃঃ১২০।

১৪২ আলী আনোয়ার "বিদ্যাসাগর ও ব্যক্তির সীমানা", শীর্ষক প্রবন্ধ, গোলাম মুরশিদ সম্পাদিত, *বিদ্যাসাগর* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা - ৯, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯, পৃ: ২১।

১৪৩ "বিদ্যাসাগর : সংস্কারক এবং শিল্পী শীর্ষক প্রবন্ধ, সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়" তদেব, পৃ:পৃ: ৪৯-৫০।

শুধুমাত্র যৌক্তিকতা দিয়ে নয়, বিদ্যাসাগর তাঁর হৃদয় দিয়ে বাল্যবিধবার দুঃখ উপলব্ধি করতেন।

"বাল্যবিধবার দুঃখে বিদ্যাসাগর মহাশয় বড় ব্যথিত হইতেন। তাই তিনি বাল্যকাল হইতে বিধবা বিবাহ প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন।"

"বিধবা বিবাহ প্রচলনের প্রবৃত্তি কেন হইল, তৎসম্বন্ধে স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার স্বগ্রামবাসী স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সিংহ মহাশয়কে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই এইখানে উদ্ধৃত হইল, —"

"বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি বাল্য-সহচরী ছিল। এই সহচরী তাঁহার কোন প্রতিবেশীর কন্যা। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে বড় ভালবাসিতেন, বালিকাটি বাল্যকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট সর্বদা থাকিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন কলিকাতায় পড়িতে আসেন তখন বালিকার বিবাহ হয়;কিন্তু বিবাহের কয়েকমাস পরে তাহার বৈধব্য ঘটে। বালিকাটি বিধবা হইবার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের ছুটিতে বাড়িতে গিয়াছিলেন। বাড়ি যাইলে তিনি প্রত্যেক প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, কে কি খাইল? ইহাই তাঁহার স্বভাব ছিল। এবার গিয়া জানিতে পারিলেন, তাঁহার বাল্য-সহচরী কিছু খায় নাই, সেদিন তাহার একাদশী ; বিধবাকে খাইতে নাই। এ কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া ফেলিলেন। সেইদিন হইতে তাঁহার সঙ্কল্প হইল, বিধবার দুঃখ মোচন করিব ; যদি বাঁচি, তবে যাহা হয়, একটা করিব। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বয়স ১৩/১৪ বৎসর মাত্র হইবে।"[১৪৪]

এছাড়াও, বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস ও মাতা ভগবতী দেবীও তাঁকে বিধবাবিবাহ প্রচলন করার কাজে উৎসাহিত করেছিলেন। এ বিষয়ে শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের সাক্ষ্য :

"এক দিবস, কোন আত্মীয়ের দ্বাদশবর্ষীয়া দুহিতা বিধবা হইলে, তদ্দর্শনে জননীদেবী শোকে অভিভূতা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অগ্রজ, জননীকে সান্ত্বনা করিলে পর, জননী ও পিতৃদেব বলিলেন যে, "বিধবাবালিকার পুনর্ব্বার বিবাহবিধি কি ধর্ম্মশাস্ত্রের কোনও স্থলে কিছু লেখা নাই? শাস্ত্রকারেরা কি এতই নির্দ্দয় ছিলেন?" জনক-জননীর মুখনিঃসৃত এই বাক্য তাঁহার হৃদয়ে প্রোথিত হইয়া রহিল।"[১৪৫]

কিন্তু বাল্যসঙ্গিনীর দুঃখময় জীবন, বা পিতামাতার অনুরোধই কি কেবলমাত্র বিদ্যাসাগরকে এরকম একটি বড় সমাজসংস্কারের কাজে প্রবুদ্ধ করেছিল? যদি তা করেও থাকে, তাহলেও অনস্বীকার্য যে "সমাজ শিক্ষা প্রভৃতি যে সব বিষয় নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় সংগ্রাম করেছিলেন, সংস্কারের যে সব সমস্যা তাঁর কাছে সবচেয়ে গুরুতর রূপে দেখা

১৪৪ বিহারী লাল সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ: পৃ: ১৭১-১৭২।
১৪৫ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পূর্বোক্ত, পৃ: ৮০।

দিয়েছিল তার সবগুলিই তাঁর ছাত্রজীবনের সামাজিক আন্দোলনের ধারার ভিতর থেকেই পেয়েছিলেন।"[১৪৬]

কলিকাতায় বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবনের ব্যাপ্তিকাল ১৮২৯-১৮৪১। এই দীর্ঘ বার বছরে তিনি প্রাচীন ও নবীনের সংঘাতপূর্ণ সামাজিক আন্দোলনের উত্থান-পতন দেখেছিলেন। যে সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগর পড়তেন তার সংলগ্ন গৃহে অবস্থিত হিন্দু কলেজ ছিল ঝটিকা কেন্দ্র। কাজেই তাঁর পক্ষে রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল দলের আন্দোলন প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়েছিল। একদিকে অন্ধ গোঁড়ামি আর একদিকে প্রগতির নামে অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতার তাণ্ডব দেখেছিলেন।[১৪৭] ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন ১৮২৯ সালের জুন মাসে। ১৮২৯ সালের ডিসেম্বরে বেন্টিক কর্তৃক সতীদাহ ও সহমরণ প্রথা অবৈধ বলে ঘোষিত হয়। বিদ্যাসাগর দেখেছিলেন যে তাঁর সংস্কৃত কলেজের শিক্ষকরা ধর্মসভার মাধ্যমে সতীদাহ প্রথা রহিত করার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন।[১৪৮] "অধ্যাপকদের কর্তব্য করেও, তাঁরা সামাজিক জীবনের কর্তব্য পালনে ত্রুটি করেননি। নিজেদের বিশাল ও স্বাধীন মতামত নিয়ে তাঁরা প্রকাশ্যে সেদিনকার সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সরকারীভাবে বেআইনী বলে যা ঘোষিত হয়েছে, তার বিরুদ্ধে তাঁরা নির্ভয়ে প্রতিবাদ করেছেন।"[১৪৯] বালক ঈশ্বরচন্দ্র বয়স বা বিদ্যা কোনদিক থেকেই সতীদাহ ও সহমরণ প্রথা রদ করার বিরুদ্ধে বা সপক্ষে আন্দোলন বুঝবার মতো উপযুক্ত হয়ে ওঠেননি। তবুও শিক্ষকদের কাছ থেকে এই চারিত্রিক নির্ভীকতা গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ হননি। শুধু তাই নয়, রক্ষণশীল গোষ্ঠীর এই নির্ভীকতাকে আত্মীকরণ করে, তিনি বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সময় এই নির্ভীকতা দিয়েই রক্ষণশীল গোষ্ঠীর বিরোধিতার মোকাবিলা করেছিলেন। ১৭৭৬ শতাব্দে ফাল্গুন মাসে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় 'বিধবাবিবাহ প্রচলন হওয়া উচিত কিনা' এই শিরোনামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ তিনি লেখেন। ১৮৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে এই নামে তাঁর প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হয়,[১৫০] সাথে সাথে "যশোরের হিন্দুধর্ম-রক্ষিণী সভা ও কলিকাতা ধর্মসভা হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃত বিধবা-বিবাহ প্রস্তাবের প্রবল প্রতিবাদ হইয়াছিল।"[১৫১] জীবনে সমাজ-আন্দোলন প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা এই সময় তাঁর কাজে লেগেছিল।

আগেই বলা হয়েছে যে বিদ্যাসাগরের পিতামাতা তাঁকে বিধবার বিয়ে হওয়া সম্ভব কিনা অনুসন্ধান করতে অনুরোধ করেছিলেন। "জনক-জননী ঐ সম্বন্ধে কথোপকথনগুলি হৃদয়ে জাগরূক থাকায়, অগ্রজ মহাশয়, সবিশেষ যত্ন সহকারে এ বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত

১৪৬ বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ: ১০৯।
১৪৭ তদেব, পৃ:পৃ: ৯৭-৯৮।
১৪৮ সমাচার দর্পণ, ১৭ এপ্রিল ১৮৩০।
১৪৯ বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ: ৯৯।
১৫০ তদেব, পৃ: ২৪৫।
১৫১ বিহারী লাল সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ: ১১০।

হইয়াছিলেন, এবং কয়েক মাস দিবারাত্র পরিশ্রম সহকারে সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র আদ্যোপান্ত অবলোকন করিয়া, যথাসাধ্য চেষ্টাকরতঃ সাধারণের গোচরার্থে খৃঃ ১৮৫৫ সালে বা সম্বৎ ১৯১২ সালের কার্ত্তিক মাসে বঙ্গ-ভাষায় অনুবাদসহ বিধবাবিবাহ ব্যবস্থার পুস্তক প্রচার করেন।"[১৫২] বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেও "বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব" নামক প্রথম পুস্তকে[১৫৩]—বলেছেন : "বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা, এ বিষয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, সর্বাগ্রে এই বিবেচনা করা আবশ্যক যে এদেশে বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত নাই, সুতরাং, বিধবাবিবাহ দিতে হইলে এক নতুন প্রথা প্রবর্তিত করিতে হইবেক। কিন্তু, বিধবাবিবাহ যদি কর্তব্য কর্ম না হয়, তাহা হইলে কোনওক্রমে প্রবর্তিত ও প্রচলিত হওয়া উচিত নহে। কারণ কোন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি অকর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন? অতএব, বিধবাবিবাহ কর্তব্য কর্ম কি না, অগ্রে ইহার মীমাংসা করা আবশ্যক। যদি যুক্তিমাত্র অবলম্বন করিয়া, ইঁহার কর্তব্য কর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে, এতদ্দেশীয় লোকে কখনই ইহা কর্তব্য কর্ম বলিয়া স্বীকার করিবে না। যদি শাস্ত্রে কর্তব্যকর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে, তবেই তাঁহারা কর্তব্য কর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদনুসারে চলিতে পারেন। এরূপ বিষয়ে এদেশে শাস্ত্রই সর্বপ্রধান প্রমাণ, এবং শাস্ত্রসম্মত কর্মই সর্বতোভাবে কর্তব্য কর্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। অতএব বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম, ইহার মীমাংসা করাই সর্বাগ্রে আবশ্যক।"[১৫৪]

এরপর বিদ্যাসাগর যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা থেকে নিরূপণ করলেন যে ধর্মশাস্ত্র কাকে বলে? কারা ধর্মশাস্ত্রর নেতা? শ্লোকটি এইরকম :

"মন্বাত্রিবিষ্ণু হারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনোহঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসংবর্ত্তাঃ কাত্যায়ন বৃহস্পতী।। ১/৪।।
পরাশর ব্যাসশঙ্খ লিখিতা দক্ষ গোতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজকাঃ"।। ১/৫।।[১৫৫]

এভাবে বিদ্যাসাগর প্রতিপন্ন করলেন যে যাঁদের প্রণীত শাস্ত্র ধর্মশাস্ত্র বলে অভিহিত হতে পারে তাঁদের মধ্যে পরাশর অন্যতম। আর "বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম, এ বিষয়ে মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে, অগ্রে ইহা নিরূপণ করা আবশ্যক যে, যে শাস্ত্রের সম্মত হইলে অকর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্থির হইবেক, সে শাস্ত্র কি। ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র এসব বিষয়ের শাস্ত্র নহে। ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ শাস্ত্র সকলই এরূপ বিষয়ে শাস্ত্র বলিয়া গ্রাহ্য হইয়া থাকে।"[১৫৬]

---

১৫২ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পূর্বোক্ত, পৃ: ১১০।
১৫৩ *বিদ্যাসাগর রচনা সমগ্র*, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ৩০৩।
১৫৪ তদেব, পৃ: ৩১২।
১৫৫ তদেব, পৃ:পৃ: ৩১২-৩১৩।
১৫৬ তদেব, পৃ: ৩১২।

এরপরেই বিদ্যাসাগরের পরাশর সংহিতার সেই বিখ্যাত শ্লোকটি উল্লেখ করেন :

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে।।
মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ।।
তিস্রঃ কোট্যোহর্দ্ধকোটি চ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি।।[১৫৭]

বিদ্যাসাগর এই শ্লোকের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করলেন : "পরাশর কলিযুগের বিধবাদিগের পক্ষে তিন বিধি দিতেছেন—বিবাহ, ব্রহ্মচর্য, সহগমন। তন্মধ্যে, রাজকীয় আদেশক্রমে সহগমনের প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে বিধবাদিগের দুই মাত্র পথ আছে বিবাহ ও ব্রহ্মচর্য—ইচ্ছা হয় বিবাহ করিবেক, ইচ্ছা হয় ব্রহ্মচর্য করিবেক। কলিযুগে, ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া, দেহযাত্রা নির্বাহ করা বিধবাদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এই নিমিত্তই, লোকহিতৈষী ভগবান্ পরাশর সর্বপ্রথম বিবাহেরই বিধি দিয়াছেন। সে যাহা হউক, স্বামীর অনুদ্দেশ প্রভৃতি পাঁচ প্রকার বৈগুণ্য ঘটিলে, স্ত্রীলোকের পক্ষে বিবাহের স্পষ্ট বিধি প্রদর্শিত হওয়াতে, কলিযুগে সেই সেই অবস্থায়, বিধবার পুনর্বার বিবাহ করা শাস্ত্রসম্মত কর্তব্য কর্ম বলিয়া অবধারিত হইতেছে।"[১৫৮]

বোঝা যাচ্ছে যে বিদ্যাসাগর কখনো কোন অবস্থাতেই শাস্ত্র লঙ্ঘন করতে চাননি। যেখানে মানবকল্যাণের প্রশ্ন সেখানেও শাস্ত্রের বিধিনিষেধই তাঁর কাছে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শাস্ত্রকে তিনি নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে ব্যবহার করেছিলেন ঠিকই কিন্তু এর জন্য তিনি শাস্ত্রকে কখনো অতিক্রম করেননি।[১৫৯] বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব" নামক প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্যারীচাঁদ মিত্র *Calcutta Review* পত্রিকায়[১৬০] এই পুস্তকের সমালোচনা করে লিখলেন, "কিন্তু একথা প্রথমেই আমাদের মনে হয় যে যদি এই দেশে সামাজিক দোষত্রুটি দূর করতে হয়, তবে ঐ বিশেষ বিষয় প্রতিপন্ন করার জন্য তা শাস্ত্রের দ্বারা অনুমোদিত কিনা এ প্রশ্নের বিচার কখনোই মূল কারণের প্রতি সুবিচার করতে পারে না।"[১৬১] কারণ, প্যারীচাঁদের মতে শাস্ত্রের ভিত্তি দুর্বল ও মিথ্যা। "যদিও

১৫৭ তদেব, পৃ: ৩১৬।

১৫৮ তদেব, পৃ: ৩৭।

১৫৯ স্বপন বসু, *সমকালে বিদ্যাসাগর,* পুস্তক বিপণি, কলিকাতা - ৭০০ ০০৯, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৯৩।

১৬০ Calcutta Review, Vol. 25, 1855.

১৬১ "But it strikes us that if the social evils of this country are to be removed the establishment of particular points as to whether they are allowed by the Shaster or not, cannot be productive of substantial service to the cause." তদেব।

বিভিন্ন সময়ে লেখা হয়েছে এবং যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিধৃত হয়েছে, তবুও শাস্ত্র কখনোই সর্বাংশে ন্যায় ও সুবিচারের চিরায়ত ও অকাট্য নীতির প্রকাশক নয়। শাস্ত্র লিখিত হয়েছে মানুষের দ্বারা আর শাস্ত্রের বিবেচনাই তাই বিশেষ শিক্ষা, পক্ষপাত, বস্তুনিচয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী এবং যে সমাজে তারা বাস করত, তার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক।"[১৬২]

প্যারীচাঁদ মিত্র এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে তরুণী বিধবাগণ যদি বলপূর্বক ব্রহ্মচর্য পালন করতে বাধ্য হন তাহলে তা পরিবার ও সমাজ উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর। এর ফলে বিধবা তরুণীরা সামাজিকভাবে মৃত বলে প্রতিপন্ন হন এবং সমাজের কোন কাজে লাগেন না। নারীর এই অবমাননা নৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। সুতরাং নারী ও পুরুষ উভয়কে শিক্ষিত করে তুলে তাদের মধ্যে স্বাভাবিক যুক্তিবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। একমাত্র তখনই পরিবর্তন করা সম্ভব।[১৬৩]

তবে, বিদ্যাসাগর যে শুধুমাত্র শাস্ত্রের ওপর নির্ভর করেছিলেন তা নয়। বিধবাবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকের উপসংহারে তিনি মানবিকতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি আবেদনপূর্বক বললেন :

"দুর্ভাগ্যক্রমে যাহারা অল্প বয়সে বিধবা হয়, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, এবং বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে, ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত যে উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে, ইহা বোধ করি চক্ষুকর্ণবিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। অতএব, হে পাঠকমহাশয়বর্গ আপনারা অন্ততঃ কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত, স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া বলুন, এমন স্থলে, দেশাচারের দাস হইয়া, শাস্ত্রের বিধিতে উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক, বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত না করিয়া, হতভাগা বিধবাদিগকে যাবজ্জীবন অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ কবা, এবং ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত উত্তরোত্তর প্রবল হইতে দেওয়া উচিত; অথবা দেশাচারের অনুগত না হইয়া, শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক, বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত করিয়া, হতভাগা বিধবাদিগের অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা নিরাকরণ এবং ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত নিবারণ করা উচিত।...

১৬২ "The Shaster, though written at different periods and embodying the results of considerable knowledge and experience, cannot be looked upon as the exponent of the eternal and immutable principle of right and justice in all its parts. It was written by human beings and its calculations must be with reference to their peculiar education predilections, peculiar views of things and the state of society in which they lived." তদেব।

১৬৩ চিত্তব্রত পালিত, পূর্বোক্ত, পৃ: ১২২।

... আপনারা ইতিপূর্ব্বে, কেবল শাস্ত্র দেখিয়াই, পূর্বপ্রচলিত আচারের পরিবর্তে, অবলম্বিত নূতন আচারে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে যখন শাস্ত্র পাইতেছেন এবং সেই শাস্ত্র অনুসারে চলিলে বিধবাদিগের পরিত্রাণ ও শত শত ঘোরতর অনিষ্ট নিবারণের পথ হয়, স্পষ্ট বুঝিতেছেন, তখন আর প্রস্তাবিত বিষয়ে অসম্মতি প্রর্দশন করা আপনাদের কোনও মতেই উচিত নহে।"[১৬৪]

আসলে বিদ্যাসাগর দেখেছিলেন যে তাঁর পূর্ববর্তী ইয়ং বেঙ্গলগণ দুই দশক ধরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সামাজিক ব্যভিচারের নিরসনকল্পে স্বাভাবিক যুক্তি প্রদর্শনের যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তা শিক্ষাপ্রাপ্ত মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া ব্যাপক জনমানসে কোনরকম প্রভাব বিস্তাব করতে ব্যর্থ হয়েছে।[১৬৫] এমনকি, প্রাথমিক পর্বে ইয়ং বেঙ্গলরাও বিধবাদের পুর্নবিবাহের জন্য শাস্ত্রের অনুমোদন অনুসন্ধান করেছেন। বেঙ্গল স্পেক্টেটর পত্রিকার একটি রচনায় মহানির্বাণ তন্ত্র ও অন্যান্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ থেকে উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে আশা করা যেতে পাবে যে বিধবাদের পুনর্বিবাহ যে আমাদের ধর্ম ও সমাজের পক্ষে অভিনব কিছু নয় তা দেশীয় লোক সমাজ অনুধাবন করবে।[১৬৬] বিদ্যাস্যাগর নিজেও সর্বশুভকরী পত্রিকায়[১৬৭] 'বাল্যবিবাহ দোষ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। সমাজসংস্কার বিষয়ক এটি তাঁর প্রথম রচনা। সহজ বুদ্ধি ও নিজস্ব যুক্তির সাহায্যে তিনি, কোন শাস্ত্রের দোহাই না দিয়েই, প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে বাল্যবিবাহ "অতিশয় নির্দ্দয় ও নৃশংসের কর্ম্ম।" কিন্তু এই লেখাটি সমকালে কোন আলোড়ন তুলতে পারেনি। এই জন্যই কি বিদ্যাসাগর পরবর্তীকালে বাল্যবিবাহ সম্পর্কে আর কোন লেখা লেখেননি? অথচ তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে উক্ত রচনাটি "কেবল উপক্রম মাত্র। এতদ্বিষয়ক হেতু, যুক্তি ও দৃষ্টান্ত আমাদিগের মনে মনে অনেক পরিশিষ্ট রহিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে তাহা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না।"[১৬৮] কাজেই, বিদ্যাসাগর শাস্ত্রের অভ্রান্ততার কথা বিশ্বাস করতেন না, তিনি বৃহত্তর জনসমাজের উপর প্রভাব বিস্তারের সহজতম পন্থা হিসাবে শাস্ত্রকে কাজে লাগিয়েছিলেন। 'বাল্যবিবাহের দোষ' রচনাটির ব্যর্থতা তাঁকে বুঝিয়েছিল যে যদিও বঙ্গীয়সমাজ একটি যুগসন্ধিক্ষণের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে, জাতি ও ধর্মের গুরুত্ব ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে, আণুবীক্ষণিক সংখ্যালঘিষ্ঠ একদল মানুষ শাস্ত্রের ন্যায্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করছে, এবং স্বাভাবিক যুক্তির উপর নির্ভর করছে, তবুও সংখ্যাগরিষ্ঠ অজ্ঞ ও অশিক্ষিত জনসাধারণের কাছে স্বাভাবিক যুক্তির মধ্যে

১৬৪ *বিদ্যাসাগর রচনা সমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ৪৫১-৪৫২।
১৬৫ চিত্তব্রত পালিত, পূর্বোক্ত, পৃ: ১২২।
১৬৬ Bengal Spectator, April, 1842.
১৬৭ সর্বশুভকরী পত্রিকা ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে।
১৬৮ তদেব।

নিহিত সূক্ষ্ম মানবিক আবেদন কোন কাজেই আসবে না।[১৬৯] বরঞ্চ শাস্ত্রানুমোদনের আবরণে কোন সংস্কার প্রচেষ্টা তারা স্বাগত জানাবে বেশি। বিদ্যাসাগর তাঁর সমসাময়িক কালের থেকে মানসিকতা ও চিন্তায় অনেক প্রাগ্রসর ছিলেন কিন্তু তিনি তাঁর যুগধর্মকে কখনো অতিক্রম করতে চাননি। তাই, তিনি শাস্ত্রের অনুমোদনের বিষয়টিতে এত গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

পরাশর সংহিতার ওপর নির্ভর করে বিধবাবিবাহের যে শাস্ত্রীয়তা বিদ্যাসাগর প্রমাণ করেছিলেন তা যে জনমানসে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল তা বোঝা যায় মহিলাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া থেকে। বিধবাবিবাহ আইন পাশ হবার আগেই বঙ্গমহিলারা নানাভাবে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানালেন। ১৮৫৫ সালের মে মাসে কলকাতার সম্ভ্রান্ত ঘরের ১৪/১৫ জন বিধবা ও বিবাহিতা মহিলা বিদ্যাসাগরের বই নিয়ে আলোচনায় বসলেন। এঁরা সকলেই ঘোষ, বোস, মিত্তির, দত্ত, চাটুজ্যে, বাঁড়ুজ্যে প্রভৃতি উচ্চকুলোদ্ভূতা ছিলেন। এঁরা বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সার্বজনীনভাবে সহমত পোষণ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে বিধবাবিবাহ সম্পূর্ণভাবে শাস্ত্রানুমোদিত।[১৭০] শুধু তাই নয়, কলকাতার বেশির ভাগ সম্ভ্রান্ত পরিবারভুক্ত মহিলা সাগ্রহে অপেক্ষা করেছেন কবে বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ হবে। এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য বিদ্যাসাগরকে তাঁরা প্রতিদিনই আশীর্বাদ করেছেন।[১৭১]

গ্রামের মেয়েরাও যে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রীয় কিনা—এই বিতর্ক সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন তার প্রমাণ হল যে মেদিনীপুরস্থ একটি গ্রামের জনৈকা বিধবা মহিলা একটি চিঠি লিখলেন এই রকম :

"অধুনা শ্রুত হইলাম দেশহিতৈষী গুণরাশি বিপুল যশস্বী অদ্বিতীয় পণ্ডিতবর গুণসাগর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহ্বায়াসে বিবিধ শাস্ত্রান্বেষণকরতঃ পরিশেষে যে শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন, তৎপাঠে বিদিত হইল যে বিধবাদিগের পুনঃপরিণয় কিছু অশাস্ত্রিক নহে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে আমারদিগের দেশীয় পণ্ডিত মহোদয়েরা শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগরের এই উৎকট পরিশ্রমে বাধিত না হইয়া তাহাতে নানাপ্রকার ফন্দি তুলিতেছেন এবং স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া এই যুক্তিসিদ্ধ শাস্ত্রীয় প্রথা যাহাতে প্রচলিত না হয় তাহারই চেষ্টায় যত্নশীল হইয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রকাশিত ভগবান পরাশরের বচন অদ্যাবধি কেহই খণ্ডন করিতে পারগ হয়েন নাই।"[১৭২]

১৬৯ চিত্তব্রত পালিত, পূর্বোক্ত, পৃ:১২৩।
১৭০ Meeting of the Hindoo Widow, The Morning Chronicle, 28.5.1855.
১৭১ The Morning Chronicle, 8.9.1855.
১৭২ সংবাদ প্রভাকর ২৪.৫.১৮৫৫।

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ বিষয়ক পুস্তকের কিছু কিছু অংশ পড়ে শোনানো হলে ১৫/১৬ বছরের একটি বিধবা বালিকা মন্তব্য করে যে ছেলেরা যদি একের বেশি বিবাহ করতে পারে তবে মেয়েরাই বা পারবে না কেন?[১৭৩] আবার আরেকজন বিধবা পরম নিশ্চিন্ত হলেন :

"বুঝিলাম এতদিনে কপাল ফলিল

করবো না আর একাদশী এবার ঘুচিল।।

দিনদিন তনুক্ষীণ, ভেবে দিন রেতে।

সকল ঘুচিল দুঃখ, ঈশ্বর কৃপাতে।।"[১৭৪]

কিন্তু তবু তাঁর বিবাহ সংস্কার আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সমাজ গ্রহণ করেনি। বাংলাদেশে ঊনবিংশ শতকের শেষভাগেও বিধবাবিবাহ উচ্চতর বর্ণগুলির মধ্যে এবং বেশির ভাগ মধ্যস্থিত বর্ণসমূহের মধ্যেও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। ১৮৯১ সালেও শুধু ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্যদের মধ্যেই নয়, সদ্‌গোপ, শুঁড়ি, মাহিষ্য, তেলি, ময়রা এবং নাপিতদের মধ্যেও বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ ছিল।[১৭৫]

হিন্দু পরিবারের শীর্ষে হলেন কর্তা, পরিবারের নিম্নতম অবস্থানে হলেন নারী, যাঁর একমাত্র কর্তব্য হল স্বামীর আদেশ মান্য করা। আদর্শ স্ত্রী স্বামীর সমস্ত আদেশ নিঃশর্তভাবে মেনে নেবেন। স্বামীর মৃত্যুর পরেও এই বশ্যতা বজায় থাকবে, কারণ, বিবাহ হল চিরবন্ধন। তাই বৈধব্যদশায় পতিতা হলেও তার পত্নীসুলভ কর্তব্যের লয় হয় না। কারণ, বিবাহ-বন্ধন মৃত্যুর পরেও অটুট থাকে।[১৭৬] বিবাহ সম্পর্কে এই চিরাচরিত ধারণাই বিধবাবিবাহের সবচেয়ে বড় অন্তরায় ছিল।

বিদ্যাসাগরের পরম বিশ্বাস ছিল যে শাস্ত্রের অনুমোদন আছে একথা প্রমাণ করতে পারলেই বিধবাবিবাহ সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু যে ঐতিহ্যগত পরম্পরা লোকমুখে বাহিত হয়েছে এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রচলিত আচরণীয় নীতি, যাদের উপর ভিত্তি করে হিন্দুসমাজের নৈতিক-আচরণ রীতি রচিত হয়েছে, বিদ্যাসাগর সেই ঐতিহ্য ও রীতির কথা কখনো ধর্তব্যের মধ্যে আনেননি। তিনি ভেবে নিয়েছিলেন যে সঠিক সামাজিক সচেতনতা এই অমানবিক প্রথার পরিবর্তন সাধন করবে। কিন্তু তিনি নিজে এই সচেতনতা গড়ে তুলতে পারেননি। তিনি বা

১৭৩ "Hindu Widow Remarriage", The Citizen, 24.3.1855.
১৭৪ বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা পত্রিকা, কার্ত্তিক ১২৬২।
১৭৫ Census of India, 1891, Vol. III, The Report, P. 276.
১৭৬ যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত, *হিন্দু নারীর কর্তব্য*, কলিকাতা, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১০৮ ।

তাঁর অনুগামীবৃন্দ কেউই কোন আমূল পরিবর্তনকামী আদর্শ তুলে ধরতে পারেননি। এমনকি যে ক্ষমতা সৌধ প্রাচীন রীতিনীতিকে আশ্রয় দিচ্ছে বিধবাবিবাহ সমর্থকরা তাকেও চ্যালেঞ্জ জানাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।[১৭৭]

পক্ষান্তরে, বিদ্যাসাগর পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় পুরুষের প্রাধান্য বজায় রাখতে চেয়েছেন। যেভাবে তিনি সংস্কার প্রস্তাব পেশ করেছেন তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে নারীর যৌনতা ও পরিবারের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তিনি পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার পক্ষপাতী।

"দুর্ভাগ্যক্রমে, বাল্যকালে যাহারা বিধবা হইয়া থাকে, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা যাঁহাদের কন্যা, ভগিনী, পুত্রবধূ প্রভৃতি অল্পবয়সে বিধবা হইয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন। কত শত বিধবারা, ব্রহ্মচর্য নির্বাহে অসমর্থ হইয়া, ব্যভিচারদোষে দূষিত ও ভ্রূণহত্যাপাপে লিপ্ত হইতেছে এবং পতিকুল, পিতৃকুল ও মাতৃকুল কলঙ্কিত করিতেছে। বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে, অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণার, ব্যভিচারদোষ ও ভ্রূণহত্যাপাপের নিবারণ ও তিন কুলের কলঙ্ক নিরাকরণ হইতে পারে। যাবৎ এই শুভকরী প্রথা প্রচলিত না হইবেক, তাবৎ ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত কলঙ্কের প্রবাহ ও বৈধব্য যন্ত্রণার অনল উত্তরোত্তর প্রবল হইতেই থাকিবেক।"[১৭৮] সুতরাং, ব্রহ্মচর্য পালন করতে না পেরে বিধবারা ব্যভিচারিণী হয়ে, স্বামী, পিতা ও মাতার কুল কলঙ্কিত করছেন, তাই, এদের অনিয়ন্ত্রিত ও বিপথগামী যৌনতাকে সমাজস্বীকৃত বৈধপথে চালিত করতে হবে—এই বৈধপথ হল বিবাহ। এজন্যে বিধবাবিবাহের পথে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে। অন্য ভাষায় বলতে গেলে, বিধবাবিবাহ সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য হল সমাজ শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য নারীর শরীর ও বাসনার উপর পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।[১৭৯]

তাই, বিদ্যাসাগর যে বিধবাবিবাহ প্রচলন করতে চেয়েছিলেন তা পুরুষের অন্তরের ভালবাসার তাগিদ থেকে আসেনি। সমাজের ব্যভিচার নিয়ন্ত্রণে পুরুষের হাল ধরার প্রয়োজন এসেছিল। তাই বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করেও বিদ্যাসাগর সমাজে নারীর মর্যাদা সরাসরি প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ একথা প্রমাণ করার পরেও তাঁকে সমাজের অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল—যে অনুমোদন তিনি কখনোই পাননি।

১৭৭ শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, Caste, Widow remarriage and the Reform of Popular Culture", প্রবন্ধটি সন্নিবিষ্ট হয়েছে *From the Seams of History*, সম্পাদনা, ভারতী রায়, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৫, পৃ:পৃ: ২০-২১।

১৭৮ বিদ্যাসাগর রচনাবলী, পূর্বোক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃ: ৩২৩।

১৭৯ শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৯।

কিন্তু পরাজয় স্বীকার করার মতো মানসিকতা তাঁর ছিল না। বিধবা বিবাহের ব্যর্থতা চোখের সামনে দেখেও তিনি হাল ছেড়ে দেননি। তাই, ১৮৮৪ সালে বিধবা বিবাহের উন্নতি সাধনের জন্য তিনি একটি কার্য্যালয় স্থাপন করেছিলেন।

"পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহের উন্নতি সাধনার্থ পুনরুদ্যুক্ত হইয়াছেন এবং একটি কার্যালয় স্থাপন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা যারপরনাই আহ্লাদিত হইলাম।"[১৮০]

জীবনের অন্তিম লগ্নে পৌঁছেও বিদ্যাসাগরের এ বিশ্বাস অটুট ছিল যে বিবাহই বিধবাদের দুঃখ মোচনের একমাত্র পথ। বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় তো বটেই, পরবর্তীকালেও এই পথ ছিল কণ্টকময়। আজ যে সীমিতভাবে হলেও বিধবাবিবাহ সমাজে বৈধতা লাভ করেছে তার জন্য দায়ী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ আন্দোলন।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শ বাঙ্গালি পুরুষের মনে এই সচেতনতা এনে দিয়েছিল যে মহিলাদের অবস্থা কোনভাবেই আশাব্যঞ্জক নয়, তাঁদের অবস্থার উন্নতি অবশ্য কর্তব্য। এই ভাবনায় চালিত হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর, তাঁর ছাত্রাবস্থার অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে তাঁর মানসিকতা গঠনে সহায়ক হলেও, সচেতন যুবক বিদ্যাসাগর তাঁর পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, আর এই অবধানের রূপকার ছিল তাঁর স্বাভাবিক দরদী মন। এই দরদী মন বাঙ্গালি মেয়েদের বিশেষ করে বালবিধবাদের দুঃখে ব্যাকুল হয়েছিল, যে ব্যাকুলতা মূর্ত হয়েছিল তাঁর উপকথাসম মাতৃভক্তিতে। কিন্তু, পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তিরা যেমন সহমর্মিনীর অভাব বোধ করতে শিখেছিলেন, বিদ্যাসাগর তাঁর দাম্পত্য জীবনে তেমন কোন অভাব বোধ করতেন বলে মনে করা যায় না। স্ত্রীকে তিনি স্বাভাবিক দাম্পত্যের ব্যবহারিক অভ্যস্ততায় গ্রহণ করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর মানসলোকের বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে ছিল বাঙ্গালি নারীসমাজ, তাঁর ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখকে তিনি তাঁর গগনস্পর্শী উদারতায় বিসর্জন দিতে দ্বিধা করেননি।

কেশবচন্দ্র ছিলেন বিদ্যাসাগরের অনুজ সমসাময়িক। কেশবচন্দ্রও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন, তাঁর জীবনেও মায়ের প্রভাব ছিল সমধিক। কিন্তু ভগবতী দেবী যেমন সূর্যের মতো দূর থেকে বিদ্যাসাগরকে প্রভাবিত করেছিলেন, পুত্রের কর্মজগতে তাঁর কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল না, কেশবচন্দ্রের ক্ষেত্রে তা হয়নি। সারদাসুন্দরী সুখে-দুঃখে তাঁর পুত্রকে কখনো তাঁর সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দেননি। তাই, জীবনের প্রান্তে বিদ্যাসাগর যখন একাকী বিষণ্ন, জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে বিক্ষত কেশবচন্দ্র তখন বিষণ্ন হলেও একাকী নন, মাতৃসান্নিধ্য তাঁকে এক নিরাপদ আশ্রয় দান করেছিল, তাই যে কেশবচন্দ্র একদা দেবেন্দ্রনাথের রক্ষণশীলতার প্রতিবাদে পৃথক ব্রাহ্মসমাজ গঠন করেছিলেন, মায়ের আশ্রয়ধন্য কেশবও কি তাই শেষপর্যন্ত রক্ষণশীলতার গণ্ডিতে আবদ্ধ থেকেছিলেন? এই প্রশ্নের মীমাংসায় নীচে আলোচিত হল তার প্রাসঙ্গিক বিষয়।

১৮০ বামাবোধিনী পত্রিকা, শ্রাবণ, ১২৯১।

মাতৃ সান্নিধ্যে সচেতন পুরুষ ও তাঁর ভাবনায় নারী

উনিশ শতকের চতুর্থ দশকের মধ্যে পাশ্চাত্য মনীষার স্পর্শে প্রজন্মের পর প্রজন্ম লালিত গোঁড়ামি কেটে যেতে শুরু করেছিল, এবং হিন্দু কলেজের পরবর্তী স্নাতকরা সম্পূর্ণভাবে পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস পরিত্যাগ করেছিল—এভাবে তাদের সুস্থ হিন্দুবুদ্ধির উপর এসে পড়েছিল পশ্চিম থেকে আগত আবছা একফালি আলো, যা পথনির্দেশ করার পক্ষে বড় বেশি মৃদু, ঐ তরুণরা তাদের শতাব্দীপ্রাচীন সামাজিক রীতিনীতির নিরাপদ নোঙর থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে প্রতি বৎসর চরমপন্থী সন্দেহ এবং নৈতিক অনিয়মের দিকে ধাবিত হয়ে চলছিল।[১৮১] এই সামাজিক পরিবেশে ১৮৩৮ সালের ১৯শে নভেম্বর কলুটোলার বিখ্যাত সেন পরিবারে কেশবচন্দ্র সেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

পাশ্চাত্য ভাবনার সঙ্গে পরিচিতি সেন পরিবারের ঐতিহ্য হলেও দেশজ ভাবধারা কখনোই সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয়নি। কেশবের পিতামহ সুখ্যাত রামকমল সেন একদিকে বিশ্বাস করতেন যে ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতা হল সাফল্যের চাবিকাঠি, অন্যদিকে তিনি সমর্থন করতেন ব্রিটিশ প্রাচ্যবাদীদের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের নীতি।[১৮২] কেশবের পিতা প্যারীমোহন নব্যবঙ্গ আন্দোলন থেকে দূরে ছিলেন। তিনি ছিলেন দানশীল ও করুণাঘন গোঁড়া বৈষ্ণব। ১৮৪৮ সালে যখন তিনি মারা যান তখন কেশবের বয়স মাত্র দশ। স্বাভাবিকভাবেই, কেশব তাঁর শাক্তধর্মাবলম্বিনী মাতা সারদাদেবীর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন বেশি।[১৮৩]

কেশবের ওপর মাতার প্রভাব কিরকম ছিল তা আলোচনার আগে কেশবের শিক্ষা ও মানসিক জগতের পরিচয় নেওয়া দরকার। ১৮৪৫ সালে কেশব হিন্দু স্কুলে প্রবিষ্ট হন, সেখান থেকে তিনি ১৮৫৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। একই বছরে তিনি মেট্রোপলিটান কলেজে প্রবেশ করেন। কিন্তু ১৮৫৪ সালে তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন ও ১৮৫৬ সালে

১৮১ "The very touch of European Knowledge affected their ancestral orthodoxy and succeeding batches of graduates came out of the Hindu College with their idolatrous faith completely bleached out of them ... And thus with their healthy Hindu intelligence sicklied over with a pale cast of Western light, too faint to guide them in their path, those anchorage of social customs with the authority of centuries of time honoured tradition at their bottom. They drifted away yearly in great numbers to every species of radical doubt and moral irregularity, ..." P.C. Mazoomdar, "Keshab Chunder Sen and is Times, আখ্যাপত্র বিনষ্ট, পৃ: ২।

১৮২ Meredith Borthwick, "*Keshab Chandra Sen : A Search For Cultural Synthesis,* Minerva Associates, Culcutta 1977, পৃ: ৪।

১৮৩ P. K. Sen, *Biography of New Faith,* 2 Volumes, Calcutta 1950-54, Vol-I পৃ: ২২৫।

সেখান থেকে স্নাতক হন। ১৮৫৬ থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি হিন্দু কলেজের দর্শনের অধ্যাপক মিঃ জোন্‌সের কাছে দর্শন শিক্ষা করেন।[১৮৪]

কলেজ জীবনে তিনি রীড (*Reid*), হ্যামিলটন (*Hamilton*), মরেল (*Morell*), থিওডোর পার্কার (*Theodore Parker*), ইমার্সন (*Emerson*), এবং মিল্টনের (*Milton*) রচনার সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ভিক্টর কাজিন (*Victor Cousin*, এডওয়ার্ড ইয়ং (*Edward Young*), শেক্‌স্‌পীয়ারের হ্যামলেট (*Hamlet*), ব্লেয়ার (*Blair*) , এবং ক্যালমারস্ (*Chalmers*)-এর খ্রীষ্টীয় বাণী, নিউম্যান (*Newman*) এবং মিস ফ্রান্সেস কোব (*Miss Frances Cobbe*)-এর ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি পুস্তকের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এছাড়া ভারতীয় দর্শন ও ইতিহাসের সঙ্গে খুব ভালভাবে পরিচিত ছিলেন তিনি। বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্য, শ্রীমদ্ভাগবত গীতা ইত্যাদি গ্রন্থের তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ পাঠক। যে পুস্তকের দ্বারা তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তা হল রাজনারায়ণ বসুর লেখা 'ব্রাহ্মধর্ম'।[১৮৫] কেশবের পাঠ্যসূচী দেখলে বোঝা যায় যে পাঠক হিসাবে তিনি ছিলেন বহুভোজী ও বহুমুখী। আধ্যাত্মিক গ্রন্থ পাঠের দিকে তাঁর স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। এই আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা ও বুদ্ধিমত্তা কেশবের মায়ের উত্তরাধিকার।[১৮৬]

কেশব যেমন তাঁর মায়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তেমন কেশব-জননীও পুত্রের দ্বারা কম প্রভাবিত হননি। "কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, ভাল মা না হইলে ভাল ছেলে হয় না—তাহা সত্যই কেশব জীবনে প্রমাণিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। সত্যই এমন ভাল মা বলিয়াই তিনি এমন ভাল ছেলে হইয়াছিলেন, আবার কেশবের ন্যায় ছেলের মাও যে অসামান্য মা ছিলেন, আমরা তাহা কি অস্বীকার করিতে পারি?"[১৮৭]

"আমার মা বড্ড ভাল রে বড্ড ভাল।"[১৮৮] তাঁর পরম মা সম্পর্কে কেশব এই উক্তি করলেও তাঁর গর্ভধারিণী মা সারদাদেবী সম্বন্ধেও এই উক্তি প্রয়োগ করলে অতিরঞ্জিত করা হয় না। বলা যেতে পারে যে কেশবের স্বর্গস্থ "বড্ড ভাল মা"-র প্রতিমাস্বরূপ ছিলেন মাটির পৃথিবীর এই মা সারদা।

"শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যে বর্ত্তমান যুগের অসাধারণ মানুষ, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। তিনি অবশ্যই জীবন্ত ব্রহ্ম প্রেরিত এবং তাঁহার যাহা কিছু মহত্ত্ব ও দেবত্ব তাহা সকলই সেই পরম

১৮৪ Chittabrata Palit, *New View Points on 19th Century Bengal*, Progressive Publishers, Calcutta 1980, পৃ: ১৭৪।

১৮৫ তদেব।

১৮৬ তদেব, পৃ: ১৭৩।

১৮৭ কেশব জননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা, পৃ: ১০ অনুলেখক শ্রী প্রিয়নাথ মল্লিক লিখিত নিবেদন।

১৮৮ তদেব, পৃ: ৯, শ্রী যোগেন্দ্র লাল খাস্তগীর লিখিত ভূমিকা।

মাতাব প্রদত্ত। কিন্তু তাঁহার এই মহৎ ও দেব-ভাব অন্তত মানবীয় দিকেও যে তাঁহার গর্ভধারিণী মাতা সারদা দেবী হইতে সঞ্চালিত ইহা যাঁহারা তাঁহাদের উভয়কে দেখিয়াছেন তাঁহারা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। শ্রী কেশবের ধর্ম্মপ্রাণতা হৃদয়ের প্রসারতা যেমন, তেমনই কেশবের অঙ্গসৌষ্ঠব, হাত পায়ের গঠন, অঙ্গুলি এবং নখটী পর্যন্ত যে মা সারদার মতই ছিল। স্বয়ং আচার্য ব্রহ্মানন্দও একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার "যাহা কিছু সকলই" তাঁহার এই মায়ের গুণে।"[১৮৯]

প্রকৃতপক্ষে, সারদাসুন্দরী কেশবের কোন কাজে আপত্তি থাকলেও শেষপর্যন্ত বাধা দিতেন না। কেশবের ছাত্রাবস্থায় রাজনারায়ণ বসুর লেখা "ব্রাহ্মধর্ম" তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করেছিল।[১৯০] পরবর্তীকালে তখনকার ব্রাহ্মসমাজের অবিসংবাদিত নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। দেবেন্দ্রনাথের মধ্যমপুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন হিন্দু কলেজে কেশবের সহপাঠী ও বন্ধু। ১৮৫৭ সালে দুই বন্ধু মিলে প্রতিষ্ঠা করলেন গুডউইল ফ্রেটারনিটি। গুডউইল ফ্রেটারনিটির এইরকম একটি সভায় সত্যেন্দ্রনাথ পিতাকে নিয়ে এলেন সভাপতিত্ব করার জন্য। এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুসারে[১৯১] "তিনি ছিলেন দীর্ঘদেহ, রাজোচিত, স্বাস্থ্য ও পৌরুষের গরিমায় পূর্ণ বিকশিত, তাঁর সঙ্গে ছিল উর্দীপরা ভৃত্যদল. তাঁকে ঘিরে ছিল প্রধান ও দিকপাল ব্রাহ্মগণ, যারা ধারণ করেছিলেন প্রলম্বিত স্বর্ণহার ও অভেদ্য গাম্ভীর্য। আমরা, তখন অতি অল্পবয়স্ক, ব্রাহ্মসমাজের রীতিনীতিতে আদৌ দীক্ষিত নই, এহেন উপস্থিতির দ্বারা এতই উদ্বেলিত ও উৎসাহিত হলাম যে প্রেরণাভরে আমরা ধর্মজীবন বরণ করে নিতে প্রবৃত্ত হলাম।"

কেশবচন্দ্র, তখন উনিশ বছরের যুবক, ১৮৫৭ সালের গুডউইল ফ্রেটারনিটির ঐ অধিবেশনে প্রথম দেবেন্দ্রনাথকে দেখলেন। "আবাল্য হিন্দু সংস্কারে লালিত ভক্ত বৈষ্ণব পরিবারের

১৮৯ তদেব পৃপৃ: ৯ "It was a purely religious institution, the object of which was both theological and devotional, Keshab's melancholy humour found a wholesome vent in reading and speaking before the youthful fraternity, ... Two of his readings we most distinctly remember; one was Dr. Chalmer's discourse on Enthusiasm and the other was Theodore Parker's sermon on Enthusiasm." Chittabrata Palit, পূর্বোক্ত।

১৯০ চিত্তব্রত পালিত, পূর্বোক্ত, পৃ:১৭৪।

১৯১ "He was tall, princely, in the full glory of his health and manhood, he came attended by liveried servants and surrounded by massive stalwart Brahmos, who wore long gold chains and impenetrable countenances. We, who were very youngmen and not initiated in the Brahmo Somaj secrets at all, were highly elated and encouraged by such company, and it was an inducement to us to follow with zeal our religious career, তদেব।

ছেলে" কেশবচন্দ্র তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করবেন।[১৯২] কিভাবে কেশব ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হলেন তার সাক্ষী স্বয়ং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। "তিনি কোন সূত্রে প্রথমে আমাদের এই দলে প্রবেশ করলেন তা আমার বেশ মনে পড়ে। তিনি প্রথমে আমার সঙ্গে এসে সাক্ষাৎ করেন—আমি তাঁকে আমার পিতার নিকট নিয়ে যাই। তিনি আপনাদের কুলাচার অনুসারে গুরুমন্ত্র গ্রহণ করবেন কিনা এই বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল। পিতার সহিত এই বিষয়ে তাঁর পরামর্শে স্থির হল যে, এই মন্ত্রে যখন তাঁর বিশ্বাস নাই তখন তাহা গ্রহণ করা যুক্তিসিদ্ধ নয়।"[১৯৩]

সেন পরিবারের মতো গোঁড়া বৈষ্ণব পরিবারের ছেলে ব্রাহ্ম হতে চাইছে, স্বভাবতই এই ঘটনা সেন পরিবারকে বিচলিত করে তুলল। বাড়ীর লোকেরা তাঁর উপর অত্যাচার শুরু করল।[১৯৪] শুধু তাই নয় চাপ সৃষ্টি হয়েছিল কেশবজননী সারদাসুন্দরী দেবীর উপরেও। বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়গণের পীড়নে সারদাসুন্দরী কেশবের দীক্ষার আয়োজন করতে বাধ্য হন। কিন্তু কেশব মাতৃ ইচ্ছা সম্পূর্ণ তুচ্ছ করে জোড়াসাঁকোতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গৃহে অতিবাহিত করলেন সারাদিন। সেদিন রাত্রি দশটায় তিনি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। সারদাসুন্দরী তাঁর আত্মজীবনীতে এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন : "ভাশুরপো মোহিন, যোগীন ও কেশবের একসঙ্গে দীক্ষা হইবে সব ঠিক. গুরু আসিয়াছেন মহা ঘটা কত লোক খাবে। ওমা সকালে উঠিয়া দেখি কেশব নাই, তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে পলাইয়া গিয়াছেন। কেশব সমস্ত দিন এলেন না। আমি মনে করিলাম বুঝি খ্রীষ্টান হইতে গিয়াছেন। আমি অন্নজল ত্যাগ করিয়া পড়িয়া রহিলাম।"[১৯৫]

যদিও ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরক্তি কেশবের সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করেছিল, তবুও মাতৃবৎসল পুত্র সচেতন ছিলেন যে তাঁর কার্য ও আচরণ তাঁর মাকে আহত করছে। তিনি যে কাজ করতে যাচ্ছেন তা অন্যায় নয়, তিনি যে ধর্ম গ্রহণ করতে চলেছেন তা সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, মায়ের মনে তিনি এ বিশ্বাস রোপণ করতে পেরেছিলেন। "রাত্রি দুপুরের সময় কেশব বাড়িতে ফিরে এলেন। একখানি বই ও কাগজ আমার কোলের উপর দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি পড়িতে লাগিলাম, প্রথমেই—

তুমি কার কে তোমার
তুমি কারে বলবে আপন
মিছে মায়ার নিদ্রাবশে
দেখেছ স্বপন।

১৯২ তদেব পৃ· ৬৮।
১৯৩ ঝরা বসু, কেশবচন্দ্র সেন ও তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজ, প্রমা, ১৪০১, পৃ: ২।
১৯৪ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যজীবন ও বোম্বাই প্রবাস, উদ্ধৃত তদেব, পৃ: ১৬।
১৯৫ সারদাসুন্দরী দেবীর আত্মকথা. পূর্বোক্ত, পৃ· ৬৯।

এই গানটি পড়িবার পর আমার মন একেবারে ভালো হইয়া গেল।"[১৯৬] শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মধর্মের প্রতি সারদাসুন্দরী দেবী এরপর থেকে আকৃষ্ট হতে শুরু করেন। কুচবিহার বিবাহ ঘটনার পর যখন ব্রাহ্মসমাজ দ্বিতীয়বারের জন্য দ্বিধাবিভক্ত হয়, তখন কেশব প্রবর্তিত নববিধান ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম ধারক ছিলেন এই কেশবজননী।

সারদাসুন্দরী উপলব্ধি করলেন যে তাঁর পুত্র কোন অন্যায় অধর্মের পথে পা বাড়াচ্ছেন না। কাজেই পুত্রের পাশে দাঁড়াতে তাঁর আর দ্বিধা রইল না। তবুও বিষয়টি ভাল করে বুঝবার জন্য তিনি তাঁর গুরুর শরণ নিলেন।

"আমি উঠিয়াই সেই বই ও কাগজ লইয়া গুরুর নিকট গেলাম। তিনি সেইসব পড়িয়া বলিলেন, "তোমার ছেলে যদি এই ধর্ম্ম নিতে পারে, সে একজন বড়লোক হবে, দেখবে তার কাছে কত লোক আসবে, তুমি এই জন্য কোনও দুঃখ করিও না।" গুরুর এই কথা শুনিয়া আমার মন একেবারে শান্ত হইয়া গেল।[১৯৭]

ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ কেশবকে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষদের কাছ থেকে পৃথক করে দিয়েছিল, কিন্তু তাঁর ভাইয়েরা কখনো তাঁকে পরিত্যাগ করেননি। — এখানেও কেশবের প্রতি তাঁর মায়ের অসীম স্নেহ কাজ করেছিল। পরিবার থেকে নির্বাসিত পুত্রকে তিনি মাতা হয়ে কখনোই পরিত্যাগ করেননি। ১৭৮৪ সনের ১লা বৈশাখ, ইংরাজী ১৮৬২ সনের ১৩ই এপ্রিল ব্রাহ্মসমাজের প্রধানাচার্য দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্যপদে বরণ করলেন।[১৯৮] এই কিছুদিন আগেই ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিতে সম্মানিত করলেন।[১৯৯] এই উপলক্ষ্যে মহর্ষির বাড়ীতে যে উৎসবের আয়োজন হয়েছিল, সেখানে সস্ত্রীক যোগদান করতে গিয়ে কেশব কলুটোলার বিখ্যাত সেন পরিবার থেকে বিতাড়িত হলেন। কেশবের জীবনীকার জানাচ্ছেন : "এতদুপলক্ষ্যে পত্নীকে হিন্দু পরিবারের সুদৃঢ় গণ্ডী হইতে মুক্ত করিয়া তথায় লইয়া যাইতে প্রস্তুত হন। চারিদিকে সকলের অমত ও বাধাদান, দৃঢ়সঙ্কল্প কেশব একাই দেশের জন্য পরমব্রহ্মে জীবন উৎসর্গ করিবেন, তবে আর পত্নী সহধর্ম্মিনী নামে অভিহিত হইলেন কিরূপে? তিনি টলিলেন না। লজ্জাশীলা বালিকা হিন্দুগৃহের কুলবধূ। লজ্জায় মৃয়মান। চারিদিকে গুরুজনগণ দণ্ডায়মান। বধূকে সকলেই বাধা দিতেছেন। তাঁহার পা চলে না, কেশবচন্দ্র পিছনে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যদি আমার অনুবর্ত্তিনী হইতে চাও এই বেলা;এই সময়। অন্যথা আমি বিদায় গ্রহণ করিতেছি" সত্যবান বিবেকী স্বামীর আজ্ঞা সৎপত্নী অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। সহধর্ম্মিনীরূপে

১৯৬ তদেব।
১৯৭ তদেব, পৃ:পৃ: ৬৯-৭০।
১৯৮ আশাচন্দ্র শ্রী ব্রহ্মানন্দ সেন, শ্রীমতী হরিপ্রভা তাকেদা, ঢাকা, ১৮৯৬, পৃ: ২১।
১৯৯ ঝরা বসু, পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ৬-৭।

পশ্চাৎগামিনী হইলেন। দ্বারবানের সাধ্য কি যে অর্গল বদ্ধ করিয়া রাখেন। ঐশ্বরিক শক্তিতে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। বাহিরে শিবিকা ছিল। পত্নীকে লইয়া তিনি মহোৎসবে যোগ দিলেন। কিন্তু তৎপরে তিনি অভিভাবকগণের পত্র পাইলেন। তাহাতে তাঁহাকে গৃহে ফিরিতে নিষেধ করা হইয়াছিল।"[২০০]

এই বাধাদানকারী আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সারদাদেবী ছিলেন না। তবে এও ঠিক যে তিনি পরিবারের পুরুষ সদস্যদের কেশব বিরোধিতা থেকে নিরস্ত করতে পারেননি। কারণ মাকে তাঁর সিদ্ধান্ত জানানো সত্ত্বেও কেশবের পক্ষে পরিস্থিতি অনুকূল হয়নি। "তিনি তাঁহার পত্নীকে যে লইয়া যাইবেন একথা অবশ্যই মাতা সারদা দেবীর নিকট পূর্বেই বলিয়াছিলেন। ইহা লইয়া সেন পরিবারে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। এমন উচ্চ হিন্দু পরিবারের কুলবধূ পিরালী ঠাকুরবাড়ীতে প্রকাশ্যভাবে যাইবেন ইহা সেন পরিবারের পক্ষে বড়ই অমর্যাদাসূচক এবং লজ্জাজনক ব্যাপার। যাহাতে ব্রহ্মানন্দ পত্নীকে লইয়া যাইতে না পারেন এ জন্য পরিবার কর্ত্তৃপক্ষগণ বিশেষ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।"[২০১]

পরিজনদের বিবোধিতা অতিক্রম কবতে না পাবলেও সারদাসুন্দরী নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে অবিচল ছিলেন আর এজন্য তিনি নিজে পবিবার ছেড়ে আসতে দ্বিধান্বিত হননি। এক নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে কেশব স্ত্রীকে নিয়ে মহর্ষির বাড়ী গেলেন এবং বাড়ীর দরজা তাঁর জন্য বন্ধ হয়ে গেল, তিনি মহর্ষির বাড়ীতে কিছুকাল অবস্থান করলেন। এ বিষয়ে কেশবকন্যা সুনীতি দেবী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—"আমার বাবা-মা কিছুকাল দূরে থাকেন, যখন আমার বাবার আনুষ্ঠানিক ধর্মান্তর ঘটেছিল। কিছু মাস পরে আমার পিতামহী ও জ্যেঠামহাশয় তাঁকে ফিরে আসার জন্য বারংবার মিনতি করেন এবং বড় বাড়ীর কাছে তাঁকে একটি ছোট বাড়ী দেন। সেখানে আমার পিতা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ততদিন পর্যন্ত তাঁরা সেই বাড়ীতেই ছিলেন। আমার জ্যেঠামহাশয় ঘোষণা করলেন যত অসুবিধাই থাক না কেন তাঁকে পুরানো বাড়ীতে ফিরতেই হবে। তিনি ফিরে এলেন এবং দীর্ঘকাল রোগভোগের পর সযত্ন সেবাব দ্বারা আবার নিরাময় হলেন। আমার প্রিয় বৃদ্ধা ঠাকুরমা এবং আমার সমস্ত পিসি ও জ্যেঠা-খুড়ামহাশয়েরা আমার মা-বাবাকে ফিরে পেয়ে খুব খুশি হলেন। এর কয়েকমাস পবে, আমার বড় ভাই জন্মগ্রহণ করল এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নাম দিলেন করুণা।[২০২]

২০০ শ্রীমতী হরিপ্রভা তাকেদা, পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ২১-২২।
২০১ ব্রহ্মনন্দিনী সতী জগন্মোহিনী দেবী, প্রিয়নাথ মল্লিক, হাওড়া ১৯১৪, পৃ: ৪২।
২০২ "My parents remained away, for some time during which my father's formal conversion took place. After some months my grandmother and uncle begged him to return, and gave him a small house near the big house. There my parents lived until my father fell seriously ill, and his eldest brother declared that, in spite of all difficulties, he must come back to the old home. He came back, and after long suffering and much

প্রতিকূলতার মধ্যেও সারদাসুন্দরী কিভাবে পুত্রের সহায়তা করেছিলেন সুনীতিদেবীর আত্মজীবনী পড়লে তা স্পষ্ট হয়। কেশবের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ যে তিনি মনেপ্রাণে সমর্থন করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। সারদাসুন্দরীই ছিলেন সেই মাতা যিনি পরিত্যক্ত পুত্রকে আবার বৃহত্তর পরিবারের মধ্যে ফিরিয়ে এনেছিলেন। তবে, কেশব ও জগন্মোহিনীকে আত্মীয়স্বজনেরা ভালভাবে মেনে নেননি। কলুটোলার যৌথ পরিবারে থেকে তাঁরা কোনদিন আর যৌথ পরিবারের কর্মকাণ্ডের মধ্যে গৃহীত হননি। স্বভাবতই কলুটোলার সেনবাড়ি কেশবচন্দ্রের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। তাছাড়াও, ১৮৬৬ সালে কেশবচন্দ্র ও অনুগামীরা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচালিত ব্রাহ্মসংগঠন ত্যাগ করে একটি নতুন ব্রাহ্মসংগঠন গড়ে তুললেন। নাম হল ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ।[২০৩] কেশব ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এক প্রগতিশীল শক্তির সঞ্চার করলেন যা ঐ সংগঠনে এর আগে ছিল না। তাঁর ছিল আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন নিরলস কর্মী। উচ্চস্তরের ধর্মনিষ্ঠা ও কর্মনিষ্ঠা ছিল তাঁর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। সর্বোপরি, তিনি ছিলেন আশ্চর্য বাগ্মিতার অধিকারী। ব্রাহ্মধর্মকে তিনি সমগ্র বাংলাদেশে প্রকৃত শক্তির অধিকারী করে তুলেছিলেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের এক সর্বভারতীয় সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন।[২০৪]

এমতাবস্থায়, "ক্রমে শ্রীকেশবের নিত্য নবোন্নতি-বিকাশিনী প্রাণ আর যেন কলুটোলার হিন্দু সংস্রবে আবদ্ধ থাকিতে এবং আপন পরিবারকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না। তাই তিনি ইং ১৮৭৭ সালে কলুটোলার বাটীর নিজ অংশ কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমৎ কৃষ্ণবিহারী সেনকে বিক্রয় করিয়া ৭২ নং (এখন ৭৮ নং) আপার সার্কুলার রোডে মিস্ পিগটের স্কুলবাড়ি ক্রয় করিলেন, এবং তাহাকে সংস্কারপূর্ব্বক ১২ই নভেম্বর আপন ধর্মমতানুসারে প্রতিষ্ঠা করিয়া

---

careful nursing grew well again. My dear old grandmother and all my aunts and uncles were very glad to have my father and mother back among them. A few months later my eldest brother was born, and the Maharshi Debendranath Tagore gave him the name Karuna." Autobiography of an Indian Princess : Memories of Maharani Sunity Devi of Cooch Behar, Ed. by Biswanath Das, Vikas Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, 1995, পৃ: ১০৩।

২০৩ "He and his followers now seceded from the old party led by Devendranath and formed a new organization, called, "The Brahma Samaj of India", towards the end of 1886." — R.C. Majumder. পূর্বোক্ত, পৃ: ১০৩।

২০৪ "Keshab brought to the Brahma Samaj a dynamic force which it never possessed before. He had a striking personality, showed ceaseless activity, was marked by a high degree of piety and sincerity and, above all, possessed wonderful oratorial abilities. He made Brahmoism a real force all over Bengal and was the first to inaugurate an all India movement of religious and social reforms." তদেব।

কমল কুটীর নামে অভিহিত করিলেন। এইখানেই তখন হইতে সপরিবারে আপন বাসাশ্রম স্থাপন করিলেন।"[২০৫] এই "কমল কুটীর" বা "লিলি কটেজে" চলে আসার পরও যে মায়ের সঙ্গে কেশবের সম্পর্ক অটুট ছিল তা বলে গেছেন সারদাসুন্দরী নিজে :

"তিনি যখন 'লিলি কটেজ' করেন এবং এখান থেকে চলিয়া যান তখন তাঁর ভাইবোনদের প্রতি কিম্বা আমার প্রতি একটুও মায়ামমতা কমে নাই।"[২০৬] শুধু তাই নয়, এ পর্যন্ত যেমন পারিবারিক বিরোধিতা অগ্রাহ্য করেও সারদাসুন্দরী দেবী পুত্রকে সাধ্যমত আশ্রয় দিয়েছেন, তেমন পৃথক সংসার গঠন করার পরেও তিনি সর্বদা পুত্রের প্রতি স্নেহসতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন। এজন্য পুত্রকে কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করতে তাঁর ভুল হত না আর কেশবও পৈতৃক বাসস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও মাতার অনুরোধ অমান্য করতেন না। সারদাসুন্দরীর জবানীতেই মাতা-পুত্রের এই সুন্দর পারস্পরিক বোঝাপড়ার উদাহরণ পাওয়া যায় :

"লিলি কটেজ" যজ্ঞির (নিমন্ত্রণ) সময় অনেকবার বাবুরা বোধ হয় ভুলক্রমে কৃষ্ণবিহারীকে বাদ দিতেন, শেষে কেশব তাহা জানিতে পারিলে কাহাকেও কিছুই বলিতেন না বটে, কিন্তু মনে মনে বড় কষ্ট পাইতেন। একদিন আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "তোমার ছোট ভাই তোমার এখানে আসিলে তাহাকে তুমি ভাল করিয়া খাওয়াইবে।" সেই অবধি কৃষ্ণবিহারী তাঁহার কাছে যখনই যাইতেন, তিনি নিজের খাবার হইতে কৃষ্ণবিহারীকে অর্দ্ধেক তুলিয়া খাওয়াইতেন।"[২০৭]

কেশবচন্দ্র ১৮৭৭ সালে কমল কুটীরে গিয়ে বসবাস শুরু করার পরের বছর ১৮৭৮ সালে কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের সঙ্গে কেশবের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতির বিবাহ উপলক্ষ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। কেশবচন্দ্র এই বিবাহ প্রস্তাবে সম্মত হওয়ার জন্য তাঁর অনুগামীদের দ্বারা প্রবলভাবে সমালোচিত হচ্ছিলেন। এই সঙ্কটকালেও সারদাসুন্দরী কেশবের পাশে সর্বদা উপস্থিত ছিলেন। বিপরীতপক্ষে, কেশবও মাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতে ভোলেননি। "বিবাহের ঠিক হইলে জুড়ুনি এল। কলুটোলার বাড়িতেই জুড়ুনি এল। ... কেশব বলিয়াছিলেন, "জুড়ুনি আমার মার নিকট হইবে।"[২০৮]

কুচবিহার বিবাহের গোলযোগ সম্পর্কে সারদাসুন্দরী সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে হিন্দুরাজ্য কুচবিহারের হিন্দু মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের অবিসংবাদিত নেতা কেশবচন্দ্রের মেয়ের বিয়ে কি প্রক্রিয়ায় হবে গোলযোগের এটি একটি মূল কারণ। ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র স্বাভাবিকভাবেই বিবাহ অনুষ্ঠানে কোন পৌত্তলিক ধর্মাচরণ

২০৫ ব্রহ্মনন্দিনী সতী জগন্মোহিনী দেবী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৫।
২০৬ কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭০।
২০৭ তদেব পৃঃপৃঃ ৭০-৭১।
২০৮ ঝরা বসু, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮০।

মানতে রাজী ছিলেন না। তাঁর শর্ত ছিল বিবাহ ব্রাহ্মমতানুসারে হবে।[২০৯] বিয়ের আনুষ্ঠানিক বিষয় সম্পর্কে স্থির হল যে "(ক) বিয়ের আগে কিংবা পরে কোনো পৌত্তলিক অনুষ্ঠান হবে না। (খ) বিয়ের মণ্ডপে কোনো ঘটপট থাকবে না। (গ) কাগজে ছাপানো নির্বাচিত মন্ত্র উচ্চারিত হবে।"[২১০]

এমতাবস্থায়, কেশবের নিজ ধর্মবিশ্বাস, ধর্ম সংগঠন এবং নিজ উদ্যোগে পাশ হওয়া সংস্কারমূলক আইনের[২১১] প্রতি কেশবের নিজের সততা সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়েছিল তখন কেশব-জননী নিজে বিবাহস্থলে উপস্থিত হলেন পুত্রের ধর্মবিশ্বাস যাতে যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয় ও তা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তা দেখার জন্য। ১৮৭৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী যে বিবাহ দলটি (*Marriage Party*) রওনা হল কোচবিহারের উদ্দেশ্যে তাব অন্যতমা সদস্যা ছিলেন সারাদসুন্দরী। কুচবিহার পৌঁছে তিনি পৌত্রী সুনীতিকে সর্বদা সঙ্গ দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তার বিবাহ বা বাগদান অনুষ্ঠানে যাতে কোন রকমেই কোন পৌত্তলিকতা বা হিন্দু ধর্মাচারণ স্থান না পায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন এবং সাধ্যমত তাতে সক্রিয়ভাবে বাধাদান করেছিলেন। তাঁর উপস্থিতি ঐ রকম একটি সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে অত্যন্ত কার্যকরী হয়েছিল। বালিকা সুনীতি পর্যন্ত তা উপলব্ধি করেছিলেন আর তাই তিনি কোনভাবেই তাঁর পিতামহীকে কাছ ছাড়া করতে চাইছিলেন না। এ বিষয়ে, সারদাসুন্দরী ও সুনীতি দেবী দুজনেই তাঁদের নিজ নিজ আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। "আমারা কোচবিহারে পৌঁছিলে আমাদের থাকিবার জন্য দুইটী বাড়ী হইল, একটিতে মেয়েরা এবং অপরটীতে পুরুষেরা থাকিতেন।"[২১২] ৫ই মার্চ[২১৩] সুনীতি ও তাঁর বোন বিনো একটি পাল্কী করে রওনা দিলেন ও তাঁদের ঠাকুরমা আরেকটি পাল্কী চড়ে অনুসরণ করলেন। (*My sister Bino and I went in one Palki and my*

---

২০৯ তদেব, পৃ: ৮০।

২১০ প্রথমে যা ছিল ব্রাহ্মবিবাহ আইন, ১৮৭২ সালের ৯ই মার্চ তা "Native Marriage Act III of 1872 রূপে বিধিবদ্ধ হয়েছিল। এই আইনের দ্বারা স্থির হল বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্রের ন্যূনতম বয়স হবে ১৮ আর পাত্রীর ন্যূনতম বয়স হবে ১৪। এইভাবে যেমন বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ রদ করা হল তেমন জাত, ধর্ম ও প্রদেশ নির্বিশেষে বিবাহ হতে বাধা নেই তা স্থির হল। এই আইন পাশ করাতে কেশবচন্দ্রকে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই আইনের বিরোধিতা করেছিলেন একদিকে যেমন হিন্দুপণ্ডিতরা অন্যদিকে তেমনি আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবর্গ। বিয়ের বয়ঃসীমা নিয়ে যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল তা নিরসনের জন্য কেশব ভারতের প্রধান প্রধান ডাক্তারদের মতামত আহ্বান করেছিলেন। কলকাতার ডাক্তারদের মতে কন্যার বয়স ১৬ ও পাত্রের বয়স ১৮ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ নিয়ে অনেক আলোচনার পর কলকাতার মেডিকেল কলেজের প্রফেসর ডঃ চার্লস নির্দেশ দিলেন যে কন্যার বয়ঃসন্ধির পর বিবাহ স্বাস্থ্যসম্মত। তাই শেষপর্যন্ত স্থির হল যে পাত্রীর বয়স কমপক্ষে ১৪ হতে হবে। Keshab Chandra Sen, Life and Teachings of Keshab Chandra Sen, ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস, কলকাতা ১৮৮৭, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৬।

২১১ সারদাসুন্দরীর আত্মকথা, পূর্বোক্ত, পৃ: ৯০।

২১২ সারদাসুন্দরীর আত্মকথা, পূর্বোক্ত, পৃ: ৯০।

২১৩ ঝরা বসু, পূর্বোক্ত, পৃ: ৮২।

grandmother followed in another)[২১৪] কোচবিহার রাজপ্রাসাদের দালানে এসে পৌঁছলে পাল্কী থামল। তারপর এক ভদ্রমহিলা আলো ও ফুল হাতে সামনে এগিয়ে এলেন। ইনি মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের মা কনেকে বরণ করার জন্য এসেছেন।[২১৫] বরণ হয়ে যাবার পর কনেসহ কনের বাড়ির লোকজনদের একটি আলাদা বাড়িতে রাখা হল। এরপরে সারদাসুন্দরীর বর্ণনা থেকে জানতে পারি যে তিনি কিভাবে ঐ বিতর্কিত বিবাহের বিশৃঙ্খলার মধ্যেও পুত্রের ধর্মবিশ্বাস বজায় রাখার ও তদনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করেছিলেন। "বিয়ের জন্য একটি আলাদা বাড়ি ছিল। সেইদিন রাত্রে সেইখানে রহিলাম। তারপর দিন বিয়ে। মহারাজার নান্দীমুখের যোগাড় হইল, সারি সারি সিন্দুর মাখান মাছ সেখানে রাখা হইয়াছে দেখিলাম। মহারাণী বরাবর আমার সঙ্গে ছিলেন। নান্দীমুখ মহারাজা করিয়াছিলেন কিনা আমি জানি না। কিন্তু সুনীতি করে নাই, সে আমার আঁচল ধরিয়া সমস্তক্ষণ বসিয়া ছিল, আমাকে স্নান করিতে পর্যন্ত দেয় নাই। সে ভয়েতে জড়সড় হইয়া বলিতে লাগিল, "ঠাকুরমা, তুমি আমার কাছে থাক, এরা নিশ্চয় আমাকে কি করিবে।" আমি রহিলাম। নান্দীমুখের কাছে তাঁহাকে লইয়া গেল। রাজার ঠাকুর-মা এলেন, এসে পুরোহিতকে ডাকিলেন। তিনি একটি মোহর দেখাইয়া বলিলেন, "এই মোহরটি আর ঐ জল, তুলসী ইত্যাদি কতকগুলি জিনিস পুরোহিতের হাতে কনেকে দিতে হইবে।" এই বলে তিনি সে সব রাণীর হাতে তুলে দিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ সে সমস্ত রাণীর হাত হইতে লইয়া ফেলিয়া দিলাম। আমি বলিলাম, "তোমাদের ওকি নিয়ম? এ সব কুলক্ষণ করিতে নাই, ইহাতে তোমাদেরও অমঙ্গল আমাদেরও অমঙ্গল।" আমি এইসব বলাতে তিনি বুঝিলেন এবং বলিলেন, "আচ্ছা থাক্।" কিন্তু রাণীকে বলিলেন, "তুমি মোহরটি পুরোহিতকে দাও, আমি মোহর দিতে দিলাম না", বলিলাম আপনিই দিন। কিন্তু তিনি শুনিলেন না, নিজেই মোহরটি সুনীতির হাতে ছোঁয়াইয়া পুরোহিতকে দিলেন। তারপর আর কিছু হয় নাই, আমি বাড়ি গেলাম। খেয়েদেয়ে বিকেলে এলাম। রাত্রে বিয়েতে বড় গোল, সেসব কথা অনেকে বলিয়াছেন আর বলিবার দরকার নাই।[২১৬]

এই ঘটনাটি সুনীতিদেবীর আত্মকথায় একটু ভিন্নরূপে প্রকাশ পেলেও দুজনে যে একই ঘটনার উল্লেখ করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই, আর দুজনের বর্ণনায় কোন পরস্পর-বিরোধিতাও নেই। সুনীতি দেবী লিখেছিলেন : "পরের দিন আমরা সকাল সকাল উঠলাম। এটি ছিল আমাদের বিয়ের দিন, এবং প্রকৃত অনুষ্ঠানের আগে আমাকে একগাদা নিরর্থক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যেতে হল। আমার স্নানের পরে আমার ঠাকুরমাকে বলা হল যে পুরোহিত প্রচলিত প্রার্থনা করার জন্য আসছেন। যখন আমরা বারান্দায় বেরিয়ে এলাম, তখন দেখলাম যে ব্রাহ্মণ মহারাজার আত্মীয়দের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে অপেক্ষা করছেন। কেউ একজন

২১৪ সুনীতিদেবী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৭।
২১৫ তদেব, পৃ: ৬৮।
২১৬ সারদাসুন্দরীর আত্মকথা, পূর্বোক্ত, পৃ: ৯০।

একটি স্বর্ণমুদ্রা আমার হাতে দিল। আমাকে অনুরোধ করা হল যে ঐটি রাজপরিবারের পুরোহিতের হাতে দিতে হবে।

আমার ঠাকুরমা বাধা দিলেন। "না, না" তিনি বললেন, "আমাদের মেয়েরা এটা করে না।"

"কি আপদ।" মহারাজের ঠাকুরমা উত্তর দিলেন।

"কেন। এ কিছুই না।"

কিন্তু আমরা দৃঢ় ছিলাম, এবং আমি মুদ্রাটি মেঝের ওপর রেখে দিলাম। সমস্ত দিন ধরে ছোট-খাট বিরক্তিকর ঘটনা সব ঘটল, এটি হল তারই একটি।"[২১৭]

কুচবিহার বিবাহ নিয়ে কলকাতায় প্রচণ্ড আলোড়ন শুরু হল, যার পরিণতি হল ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় ভাঙন। স্বয়ং শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন এই আলোড়নের অংশীদার। এই ঘটনার উল্লেখ তাই অনিবার্যভাবে তাঁর আত্মজীবনীতে এসেছে।

"১৮৭৮ সালের জানুয়ারীর প্রারম্ভে কুচবিহারের ম্যাজিস্ট্রেট, আমার প্রাচীন পরিচিত যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়, নাবালক রাজার বিবাহের বিষয়ে সমুদয় কথা স্থির করিবার জন্য ভারপ্রাপ্ত হইয়া কলিকাতাতে আসিলেন। ... আমি তাঁহার মুখে শুনিলাম যে, কেশববাবু কন্যার বিবাহোপযুক্ত বয়সের পূর্ব্বে তাহাকে বিবাহ দিতে রাজি হইয়াছেন, কি কি নিয়মে বিবাহ হইবে, সেই সকল কথাবার্তা চলিতেছে। ... "এই সংবাদে কলিকাতার ব্রাহ্মদলের মধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। আমরা স্থির করিলাম, যে, এই সঙ্কটে ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত সত্যসকলকে জোর করিয়া ধরা আমাদের কর্তব্য। যে কেশববাবু মহা আন্দোলনের পর ১৮৭২ সালের ৩ আইনে বর-কন্যার বিবাহের বয়স নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, তিনিই তাহা ভাঙ্গিতে যাইতেছেন, ইহা কেমন কথা? সুতরাং এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত কার্য্যপ্রণালী রক্ষা করিবার জন্য জোরে দাঁড়ানো কর্ত্তব্য, কিন্তু তৎপূর্ব্বে বন্ধুভাবে একবার কেশববাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমুদয় কথা তাঁহার প্রমুখাৎ শুনিবার চেষ্টা করা উচিত। ... তিনি (কেশববাবু) কোনক্রমেই কিছু বলিলেন না। অবশেষে আমি বলিলাম, আমাদের শেষ বক্তব্য এই যে, আপনারা "খাস্তগির মহাশয়ের কন্যার বিবাহে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ রক্ষা হয় নাই বলিয়া

---

২১৭ সুনীতি দেবী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৮ "The next morning we were up early. It was my wedding day, and I had to go through a host of trivialities before the actual ceremony. After my bath, my grandmother was told that a Hindu priest wished recite the usual prayers. When we came out on the verandah, we saw the Brahmin waiting surrounded by the relations of the Maharajah. Someone put a gold coin into my hand which I was requested to give to the priest of the Raj family. My grandmother interpossed, "No, no, "She said, "Our girls don't do this." "What nonsense!" replied the Maharajah's grandmother, "Why! it means nothing. "But we were firm, and I placed the coin on the floor. This was only one of the petty annoyances which occured during the day".

তাঁহাকে কিরূপ চাপিয়া ধরিয়াছিলেন তাহা মনে আছে। তাঁহার ঘাড়ের মাস ছিঁড়িয়া খাইয়াছিলেন, আপনার কন্যার বিবাহে ব্রাহ্মদের অবলম্বিত কোনও নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে ব্রাহ্মেরা ছাড়িবে না।" যেই এই কথা বলা, অমনি কেশববাবু বিরক্ত হইয়া চেয়ার ছাড়িয়া টেবিলের উপর উঠিয়া বসিলেন, কাঁধে একখানা গামছা ছিল, তাহা মাথায় বাঁধিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, "আমারও ঘাড়ের মাস ছিঁড়ে খাবে, তার আর কি? আমি পূর্বে কখনও তাঁহাকে এত উত্তেজিত দেখি নাই। দেখিয়া মনে হইল, আর তাঁহাকে বিরক্ত করা উচিত নয়। আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম, বলিলাম, "আপনি বিরক্ত হইতেছেন, তবে এ কথা থাক।" এই বলিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম।[২১৮]

"১৮ই মার্চ কেশববাবু কন্যার বিবাহ দিয়া ফিরিয়া আসিলেন। সহরে ব্রাহ্মদলে তুমুল আন্দোলন চলিতে লাগিল।

... ওদিকে[২১৯] কেশববাবু পুলিশবেষ্টিত হইয়া আসিয়া বেদী অধিকার করিলেন। অমনি প্রতিবাদীর দল, প্রায় ৭০/৮০ জন মন্দির ত্যাগ করিয়া আসিলেন। ... প্রতিবাদীর দল মন্দির হইতে তাড়িত হইয়া ডাক্তার বসুর[২২০] বাড়িতে আসিলেন। তাঁহাদিগকে লইয়া আমি ব্রহ্মোপাসনা করিলাম।

"এই আমাদের স্বতন্ত্র উপাসনা আরম্ভ হইল।[২২১]

"ওদিকে ব্রাহ্মসমাজ কমিটি সমুদয় বিবরণ দিয়া কলিকাতার ও মফঃস্বলের ব্রাহ্মগণের অভিপ্রায় জানিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অধিকাংশই স্বতন্ত্র সমাজস্থাপনের পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে পরবর্তী ২রা জ্যৈষ্ঠ (১৫ই মে) দিবসে টাউন হলে ব্রাহ্মদিগের সভা ডাকিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল।"[২২২]

কেশব ও তাঁর অনুগামীদের পক্ষে এ এক মহা সঙ্কটকাল। ১৮৭৮ সালের শেষে মফঃস্বল ব্রাহ্মসমাজের অনেকগুলি শাখাই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করল। ঢাকাতে বঙ্গ চন্দ্র রায়কে পদচ্যুত করা হল একমাত্র এই অপরাধে যে তিনি প্রতিবাদী আন্দোলনে যোগদান করেননি।[২২৩] যদিও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আকার তখন খুবই ছোট, মাত্র ২০০/৩০০ জন সদস্য, তবুও তাঁরা তাঁদের আদর্শের বাস্তবায়নে সযত্ন ছিলেন। তাঁদের হাতে সমর্থক কর্মসূচীও

---

২১৮ আত্মচরিত, শিবনাথ শাস্ত্রী, সম্পাদক, গৌতম নিয়োগী, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা - ৬, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ শতবার্ষিক সংস্করণ, ১৯২৮, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯১। পৃ:পৃ: ২০৬-২০৮।

২১৯ ২৪শে মার্চ, তদেব, পৃ: ২১৬।

২২০ "আমি তখন মন্দিরের পার্শ্বে আমার পরিচিত এক বন্ধু ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ বসুর বাড়িতে কি হয় জানিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। লজ্জা ও সংকোচবশত প্রতিবাদকারীদের সঙ্গে মন্দিরের মধ্যে যাই নাই" — তদেব, পৃ: ২১৭।

২২১ তদেব, পৃ: ৩৮।

২২২ তদেব, পৃ: ২১৮।

২২৩ *Indian Mirror, Sunday Edition, 31 March, 1878.*

ছিল। অন্যদিকে, কেশবের অনুগামীরা আর তাঁর উপরে আস্থা রাখতে পারছিলেন না। তখন এই বিশ্বাস ব্যাপকাকারে প্রচলিত ছিল যে অর্থ ও মর্যাদার লালসায় তিনি কুচবিহার বিবাহ সম্বন্ধে রাজী হয়েছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের সুযোগ নিতে চেষ্টা করেছিলেন যদিও তা পুরোপুরি সফল হয়নি। এছাড়া কেশব হিন্দু ঐতিহ্যের দিকে ঝুঁকে পড়ছিলেন। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব ও বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরিয়ে আনা তাঁর পক্ষে অবশ্যকর্তব্য হয়ে দাঁড়াল। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতেই নববিধান ধর্মমতের জন্ম হল।[২২৪]

এখানে, আবারও সারদাসুন্দরীর ভূমিকা প্রমাণ করে যে তিনি তাঁর মাতৃত্বের পূর্ণশক্তি নিয়ে কেশবের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীর সম্পাদকের নিবেদন থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে জননীর সহায়তা ও সমর্থন ব্যতীত কেশবের নববিধান ধর্মমত তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারত না।

"সারদাসুন্দরী যদি মাতারূপে কেশবের ধর্ম্মকে পূর্ণ জাতীয়ভাবে বরণ করিয়া না লইতেন, তাহা হইলে এই চিরসত্য নবধর্ম্মকে আমরা হয়ত অন্য সাজে সজ্জিত দেখিতাম। কালপ্রসূত কুসংস্কার ও আবর্জ্জনার ভয়ে ভীত ব্রাহ্মসমাজ ও কেশবকে অগ্রণী করিয়া পূর্ণবেগে পশ্চিমাভিমুখে ধাবিত হইবার চেষ্টায় ছিলেন। এই ঘোর পরিবর্ত্তনের দিনে, নূতন জাতীয়তার উষাকালে, নূতন জাতীয়তার প্রতিনিধিরূপে মা যেন অগ্রসর হইয়া কেশবকে বলিলেন, "বাবা কেশব, এইবার একবার নিজের গৃহের দিকে দেখ, পরম ব্রহ্ম শ্রীহরির কৃপায় ও ভারতব্যাপী মহাব্রহ্ম ধ্বনিতে এখন আর সেই দেশ ও সেই গৃহ নাই; — ফিরে এস।" মাতার ভাবে ভগবানের ইঙ্গিত দেখিয়া কেশব ফিরিলেন। মা বরণ করিয়া নবধর্ম্মসহ কেশবকে গৃহে লইলেন।"[২২৫]

এখানে লক্ষণীয় যে, কেশবচন্দ্র যখন একদিন পারিবারিক ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করে গৃহত্যাগ করেছিলেন, সেদিন সারদাসুন্দরী নীরবে তাঁকে সমর্থন করেছিলেন এবং বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন যে পরমব্রহ্মের আশায় পুত্র আজ গৃহত্যাগ করছে, তাঁর সঙ্গে গৃহদেবতা কৃষ্ণের কোন ভেদ নেই। এই উপলব্ধি থেকে শক্তি সঞ্চয় করে মা তখন পুত্রবিচ্ছেদ সহ্য করেছিলেন, আবার বহির্জগতে পুত্র যখন আক্রান্ত, আহত ও বিপন্ন তখন ঐ একই উপলব্ধি থেকে তিনি পুত্রের নবধর্ম্ম প্রবর্তনে শক্তিই কেবল যোগান দেননি, অতি সুকৌশলে পুত্রকে আবার পারিবারিক ধর্মাচরণের মধ্যে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

"নবসংহিতা জাতীয়ভাবে সজ্জিত হইলেন। তাই বিবাহে, জাতকর্ম্মে, শ্রাদ্ধাদি নিত্যকর্ম্মে, সংস্কৃত দেশীয় আচরণ দেখিতে পাই। তাই বিবাহ — "আশীর্ব্বাদ", "পত্র", "গাত্রহরিদ্রা", "অধিবাস", "বরণডালা", "ফুলশয্যা", মৃতে অশৌচ, "উত্তরীয় ধারণ" ইত্যাদি পরিবারে

২২৪ Meredith Borthwick, *Keshab Chandra Sen, A Search for Cultural Synthesis*, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৮।

২২৫ সারদাসুন্দরীর আত্মকথা, নিবেদন, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ খাস্তগীর লিখিত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১/৯।

পরিবারে ব্রতনিয়মাদির এমন কি আঁতুড়ে — "আটকৌড়ে" পর্য্যন্ত বর্জ্জিত না হইয়া সংস্কৃতভাবে গৃহে গৃহে গৃহীত হইয়াছে...."[২২৬]

"... এইরূপে মাতার সাহায্যে নবসমাজকে জাতীয়ভাবে কেশব নূতন জাতীয়তার সম্মুখে ধরিলেন। জাতীয় একটি অনুষ্ঠানও বাদ দিলেন না। যেখানে যে সংস্কারটুকু দরকার, শুধু তাই করিয়া লইলেন।"[২২৭]

এই বহির্গত পুত্রকে পারিবারিক ঐতিহ্যের মধ্যে ফিরিয়া আনা সম্ভব হয়েছিল সারদাসুন্দরীর অসীম ঔদার্যের দ্বারা। যে ঔদার্য না থাকলে তিনি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়েও ব্রাহ্ম উপাসনায় যোগ দিতে পারতেন না।

"বৈষ্ণব পরিবারের কন্যা গৃহিণী বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইয়া আযৌবন মূর্ত্তিপূজায় অভ্যস্ত থাকিলেও সুযোগমতো আমাদের সঙ্গে — আপন পুত্র কেশবচন্দ্রের সঙ্গে উপাসনায় যোগ দিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিতেন। প্রথম প্রথম বলিতেন, "কেশব, তোমার ধ্যানটি আমাকে শিখিয়ে দাও।" অবকাশমত আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেন। বলিতেন, "বাবা ছেলেবেলার অভ্যাসমতো নিত্যপূজা করিলেও তোমাদের ধ্যানটি না করলে এখন আর আমার পূজা সম্পূর্ণ হয় না।" ... প্রায়ই ব্রাহ্মমন্দিরে যাইতেন, এবং অবকাশমত যখন "কমলকুটিরে" আসিতেন দেবালয়ের নিত্য উপাসনায় যোগ দিয়া বিশেষ আনন্দ সম্ভোগ করিতেন।"[২২৮]

কেশবের এক একটি সঙ্কটকালে যেভাবে তিনি পুত্রকে সঙ্গ, সহায়তা ও সাহস দান করেছেন তা বঙ্গনারীর পক্ষে বিরল। তাই শ্রীদীননাথ মজুমদার লিখেছেন, "হিন্দুনারী স্বভাবত ভীরু, সামান্য সাংসারিক বিপাকে কি করিবে বুঝিতে পারে না। মাতা সারদাসুন্দরী সেরূপ পরীক্ষার মধ্যে বীরপ্রসূতির পরিচয় দিয়া অকুতোসাহসের সহিত উপস্থিত বিপত্তিকে অতিক্রম করিতে পারিতেন। সে সময় যেন একটি সাহসী পুরুষের মত বিক্রম দেখাইতেন।"[২২৯]

পুত্রের প্রতিভা সম্যক পরিমাপ করে তাঁকে স্বাভাবিকভাবে ঈপ্সিত কর্ম্মপথে অগ্রসর হতে সাহায্য করা, ঐ পথের বিপদসংকুলতায় পুত্রের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে বিপদ অতিক্রম করিয়ে দিচ্ছেন মাতা — ঊনবিংশ শতাব্দীতে এটি অতি বিরল নজীর। প্রতিভাবান পুত্র যে তাঁর কত প্রিয় ছিলেন সারদাসুন্দরী শুধু কথায় নয়, কাজেও তার প্রমাণ রেখে গেছেন।

"কেশবচন্দ্রকে যে স্নেহ করিতেন তাহা নয়, দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিতেন। তাঁহার শ্বশুরকুল বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী, তিনি সুপ্রসিদ্ধ রামকমল সেন মহাশয়ের পুত্রবধূ, প্যারীমোহন সেন

২২৬ তদেব।
২২৭ তদেব, পৃ: ১।
২২৮ তদেব, সারদাসুন্দরী সম্পর্কে শ্রীদীননাথ মজুমদারের লেখা, পৃ: ১১৯।
২২৯ তদেব, পৃ:পৃ: ১১৯-১২০।

মহাশয়ের ধর্মপত্নী ছিলেন। দেবী হিন্দুসমাজভুক্ত থাকিয়াও ব্রাহ্মসমাজের উৎসবাদিতে রীতিপূর্বক যোগ দিয়াছেন, আর্যনারী সমাজের উৎসবে এবং নবদেবালয়ের উপাসনাতে যোগদান করিয়া প্রার্থনাদি করিয়াছেন, উপাসনা, প্রার্থনা ও সঙ্গীতাদিতে অত্যন্ত আনন্দ ও আগ্রহ সহকারে যোগদান করিতেন।"[২৩০]

তাই প্রতিভাবান পুত্রের প্রতিভাময়ী মা নিজগুণে পুত্রদের জীবনে অপরিহার্য স্থান করে নিয়েছিলেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই, "মা না হইলে ছেলেদের কোন গৃহকর্ম ও অনুষ্ঠানই সম্পন্ন হইত না। সে সম্বন্ধে চিরকালই ছেলেরা যে সারদাসুন্দরীর আঁচলধরা, সেন পরিবারের সংসর্গে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারাই ইহা সহস্রবার স্বীকার করিবেন।"[২৩১]

অসাধারণ এই মায়ের অসামান্য অবদান কেশবচন্দ্র মৃত্যুশয্যায়ও স্বীকার করে গেছেন। সারদাসুন্দরীর নিজের জবানিতে : "একদিন তিনি রোগযন্ত্রণায় খুব অস্থির হইয়াছিলেন, আমি দুঃখ করিয়া বলিলাম, " কেশব আমি কি পাপ করিয়াছি জানি না, তাহাতেই বুঝি তুমি এত কষ্ট পাইতেছ।" এই কথা শুনিয়া সেই কষ্টের মধ্যেও তিনি বলিলেন, "না মা তুমি আমার বড় ভাল মা, এ রকম মা কে পায়, আমার যা কিছু ভাল সব তোমার কাছ থেকে পাইয়াছি।" এই বলিয়া আমার পায়ের ধূলা মাথায় নিলেন।

ইংরাজী শিক্ষার সংস্পর্শে এসে বাঙালি পুরুষের মনে মাতৃত্ব সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্তন এসেছিল, মায়ের দায়িত্ব সুসন্তান গড়ে তোলা, যিনি ভবিষ্যতে সমাজ ও দেশকে উন্নতির দিশা দেখাবেন। পরিবর্তিত এই মাতৃত্বের ধারণার অভ্যাস প্রাচীনা সারদাসুন্দরীর মধ্যে লক্ষিত হয়েছিল। সচেতনভাবে না হলেও নিজের স্বাভাবিক গুণাবলি তিনি জন্মদাত্রীরূপে পুত্রের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন। সঙ্কটকালে পুত্রের পার্শ্ববর্তিনী থেকে তিনি তাঁর সাহসিকতা, ঔদার্য ও সংস্কারহীনতার যে স্বাক্ষর রেখেছিলেন, তৎকালীন সময়ে তা বিরল ছিল।

---

২৩০ তদেব, পৃ: ১০৬, সারদাসুন্দরী সম্পর্কে শ্রীগিরীশচন্দ্র সেনের মতামত।
২৩১ তদেব, পৃ: ১, শ্রীযোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর লিখিত নিবেদন।

ভদ্রলোকের বোধোদয় ও নারীর পরিশীলনের পরিচর্যা

রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব ও বিদ্যাসাগরের মতোই কেশবচন্দ্র সেন প্রথম থেকেই নারীদের উন্নতি, কল্যাণ ও জাগরণের কাজে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ভারতে নারী প্রগতির মন্ত্রটি প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল কেশবচন্দ্রের কণ্ঠে, কীর্তনানন্দে নগর পরিক্রমাকালে তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল—"নরনারী সাধারণের সমান অধিকার/যার আছে ভক্তি সে পাবে মুক্তি/নাহি জাত বিচার।"[২৩২] শুধু উচ্চারণ করেই নয়, কেশব তাঁর কাজের মধ্য দিয়েও নারীর কল্যাণ সাধন করতে চেয়েছিলেন। বক্তৃতার শেষে তিনি বলেছিলেন যে, "যে তিন ঘণ্টা আমি আপনাদের কাছে বক্তৃতা করে ব্যয় করলাম, তা স্ত্রীশিক্ষা বা অন্য কোন সংস্কার কার্যের পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে আরো ভালোভাবে ব্যয় করা যেত।"[২৩৩]

কেশবের জীবনের মুখ্য চিন্তা ছিল নারীজাতির অবস্থার উন্নতিসাধন। বিদ্যাসাগরের নারীদরদের উৎস ছিল গভীর ব্যক্তিগত অনুভূতি। কিন্তু কেশবের ক্ষেত্রে তা ছিল না। তাঁর কাছে নারীজাতির অবস্থার উন্নয়ন কোন স্বতন্ত্র কর্মসূচী ছিল না। তা ছিল তাঁর সমন্বয়ের আদর্শের এক অবিচ্ছেদ্য ও প্রয়োজনীয় অংশ—এই সমন্বয় ছিল জাত, লিঙ্গ এবং ধর্মের সমন্বয় — যার অর্থ হল যে মেয়েদেরও শিক্ষার মধ্য দিয়ে পুরুষদের সমান অধিকার দান করতে হবে। যাতে তারা আলোকপ্রাপ্তা ব্রাহ্মিকায় পরিণত হতে পারে। কেশব মনে করতেন যে হিন্দুসমাজে মেয়েরা হল ঐতিহ্যের ধারকস্বরূপ, কাজেই মেয়েদের জীবনে পরিবর্তন না এনে কখনো সমাজে পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। তবে তিনি কখনো মেয়েদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন না। আর মুখেও তা কখনো বলতেন না। একমাত্র ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি নারী ও পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার করতেন এই যুক্তিতে যে প্রত্যেকেরই ঈশ্বরকে জানার অধিকার আছে।[২৩৪]

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বিশেষভাবে নারীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে যে প্রতিষ্ঠানগুলির পত্তন ও নববিধি প্রবর্তন করেন কালক্রম অনুসারে তালিকা এইভাবে দেওয়া যেতে পারে—

বামাবোধিনী সভা	—	১৮৬২
বামাবোধিনী পত্রিকা	—	১৮৬৪

২৩২ ঝরা বসু, কেশবচন্দ্র সেন ও তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজ, প্রমা প্রকাশনী, কলিকাতা - ১৭, অগ্রহায়ণ ১৪০১, পৃ: ভূমিকা।

২৩৩ "The three hours I have spent in addressing you might have been more *profitably* spent had we devised some means for female education or some other works of reform."–Keshab Chandra Sen, Lectures in India, London 1904, পৃ: ২০৮।

২৩৪ Meredith Borthwick, Keshab Chandra Sen : A Search for Cultural Systhesis, Minerva Associates, Calcutta, 1977, পৃ:পৃ: ৪৭-৪৮।

ব্রাহ্মিকা সমাজ	—	১৮৬৫
বয়স্থা নারীগণের জন্য বিদ্যালয়	—	১৮৭০
বামহিতৈষণী সভা	—	১৪ই এপ্রিল, ১৮৭১
বিবাহ-বিধি সম্পর্কে আন্দোলন	—	১৮৭১
'ব্রাহ্মিকাবাস' স্থাপন	—	১৮৭১
Ladies Normal and Adult School	—	১লা ফেব্রুয়ারী, ১৮৭১
ভারতাশ্রম	—	৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭২
১৮৭২ সালের ৩ নং বিবাহ-বিধি	—	১৯শে মার্চ, ১৮৭২
পতিতা নারীগণের উদ্ধার	—	১৮৭২
বালিকা বিদ্যালয় ও ব্রাহ্মিকা বিদ্যালয় স্থাপন	—	১৮৭৩
'পরিচারিকা' মাসিকপত্র	—	মে, ১৮৭৮
মেট্রোপলিটান ফিমেল স্কুল	—	১৮৭৯
আর্যনারী সমাজ		৯ই মে, ১৮৭৯

অবশ্য বামাবোধিনী সভা প্রতিষ্ঠার তারিখ ও প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে মতভেদ আছে। মেয়েদের উন্নতির জন্য কেশবের যে আগ্রহ ছিল তাঁর অনুগামীরাও এর অংশীদার ছিলেন। শুধু তাই নয়, মেয়েদের কল্যাণসাধনের কাজে কখনো কখনো তাঁরা কেশবকেও উৎসাহ ও সক্রিয়তায় পেছনে ফেলে দিতেন। ১৮৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত বামাবোধিনী সভা ছিল এমনই একটি সভা যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মেয়েদের জন্য পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশের জন্য, সহজ প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য এবং তাদের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য। এই সভাটি কিন্তু কেশব প্রতিষ্ঠা করেননি। যদিও তা কেশবের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এই সভার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কেশবের তিন অনুগামী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, উমেশচন্দ্র দত্ত এবং বসন্ত কুমার ঘোষ।[২৩৬] বামাবোধিনী সভা থেকেই প্রকাশিত হত বামাবোধিনী পত্রিকা, উমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায়। এই পত্রিকাটি, ছোটখাট বিরতি বাদ দিলে, ১৯২০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ সময়কার যে কোন মহিলা পত্রিকার থেকে 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র পাঠিকা সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। আর শুধু যে ব্রাহ্মমহিলারাই এই পত্রিকা পড়তেন তা নয়, ব্রাহ্মসমাজের বাইরেও এই পত্রিকার জনপ্রিয়তা ছিল।[২৩৭]

---

২৩৫ প্রভাত বসু, মহারাণী সুচারু দেবীর জীবন-কাহিনী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৮।

২৩৬ Nemai Sadhan Bose, The Indian Awakening and Bengal, Calcutta 1969, পৃ: ২২৬।

২৩৭ Meredith Borthwick, The Changing Role of Women in Bengal, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫০।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হল ব্রাহ্মিকা সমাজ বা মহিলা প্রার্থনা সভা। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মমহিলাদের ধর্মীয় শিক্ষা ও ভুক্তিমূলক সক্রিয়তার প্রসার ঘটানো। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে "ভারত প্রেমী এবং বিখ্যাত সমাজ সেবিকা" কুমারী মেরী কার্পেন্টার[২৩৮] ভারতে এসেছিলেন। ভারতে তাঁর প্রথম আগমন উপলক্ষ্যে কার্পেন্টার একটি চায়ের আসরের আয়োজন করেছিলেন। তাঁর পক্ষে এই অনুষ্ঠান সংগঠিত করার ভার নিয়েছিলেন স্বয়ং কেশবচন্দ্র সেন। প্রায় ১৬ জন ব্রাহ্মিকা তাঁদের স্বামীসহ ঐ চায়ের আসরে যোগদান করেছিলেন। চা এবং কফি দিয়ে তাঁদের আপ্যায়ন করেছিলেন কার্পেন্টার। যদিও দুজন ইংরাজ মহিলা দোভাষী ছিলেন তবুও কথোপকথনে ভাব বিনিময়ে যথেষ্ট অসুবিধা হয়েছিল।[২৩৯]

তখন মহিলারা শিক্ষালাভ করতে শুরু করেছেন, সুতরাং স্ত্রীশিক্ষার অবধারিত পরিণতি হিসাবে মেয়েদের পক্ষে আর আগের মতো পর্দা বজায় রাখা সম্ভবপর ছিল না। যে কেশব একদা সমগ্র পরিবারের অসন্তোষ ও অনুমোদন অগ্রাহ্য করে স্ত্রীকে নিয়ে গৃহত্যাগ করে দেবেন্দ্রনাথের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং সেখানে বেশ কিছুকাল স্থিতি করেছিলেন সেই কেশবই বাঙালী সমাজের পর্দা মোচনের যোগ্যতম ব্যক্তি।[২৪০] বয়োবৃদ্ধ প্রজন্ম হয়ত কেশবের এই কাজে অতিরিক্ত পাশ্চাত্য প্রভাব দেখতে পেয়েছিলেন। কারণ, সমাজ সংস্কারের ভিক্টোরীয় আদর্শের দ্বারা কেশব অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই প্রভাব তাঁর কাছে পরিবাহিত হয়েছিল তিনটি উপায়ে; যথা —ইংরাজ ইউনিট্যারিয়ানদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ, ইংরাজ প্রশাসকদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং তাঁর ইংল্যাণ্ড ভ্রমণ।

কিন্তু, উল্লিখিত চায়ের আসরের একটি প্রায় বিপরীত বর্ণনা পাওয়া যায় এক প্রত্যক্ষদর্শীর রচনায়।[২৪১]

"এই বৎসরের অর্থাৎ ১৮৬৬ সালের শেষভাগে নভেম্বর মাসে জনহিতৈষিণী ইংরাজ রমণী মিস্ মেরী কার্পেন্টার এদেশীয় স্ত্রীজাতির উন্নতিসাধনার্থ ভারতে পদার্পণ করেন।... কেশবচন্দ্র তাঁহার একমাত্র বন্ধু ও সহায় হইলেন।...একদিন ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্তীর বাটীতে

২৩৮ "Women such as S. D. Collet, Mary Crapenter and Frances Power cobbe were highly intelligent unitarians who attemped to exert some influence on their society through the channels that were available to them, principally philanthropic activity. They managed to forge an independent roles. Lacking sufficient outlets for the exercise of their influence on their own society they took up the religious and social reform of India as a worthy "Cause". As women, they believed that they felt a particular "sisterly" empatty for the women of India, and worked to "improve" their condition", তদেব পৃ: ৫৮।

২৩৯ তদেব পৃ: ২৫৯।

২৪০ Keshab Chander Sen : A search for Cultural Synthesis, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৭।

২৪১ গৌরগোবিন্দ রায়, আচার্য্য কেশবচন্দ্র, মধ্যবিবরণ (প্রথম অংশ) কলিকাতা, ১৮১৪ শক।

এরূপ স্থির হইয়াছিল যে, বিশেষ দুই-চারি জন পুরুষ ব্যতীত অন্য পুরুষ এখানে থাকিবেন না। কেশবচন্দ্র তাঁহার ব্রাহ্মবন্ধু ও ব্রাহ্মিকা ভগিনীদিগকে লইয়া এই সভায় উপস্থিত থাকেন। পরস্পরের সহিত যেরূপ সদালাপ ও সদ্ভাবের বিনিময় হইল, ডাক্তার গুডিব চক্রবর্তী ও তাঁহার গুণবতী কন্যা যেরূপ সকলকে আপ্যায়িত করিলেন, তাহাতে উপস্থিত সকলেই প্রীত হইলেন। এ দেশীয় অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদিগের ইংরাজী ইভিনিং পার্টিতে (সায়ং সমিতিতে) গমন করার এই প্রথম দৃষ্টান্ত।"[২৪২]

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মিস্ কার্পেন্টার প্রদত্ত চায়ের আসর মহিলাদের উপস্থিতিতে অন্য গৃহের বাইরে অনুষ্ঠিত প্রথম আসর নয়। ঐ আসরের গৃহকর্তা ছিলেন খ্রীষ্টান বাঙালী চিকিৎসক গুডিভ চক্রবর্তী এবং তাঁর কন্যা আপ্যায়নকারিণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। নিশ্চয়ই ডাক্তার চক্রবর্তীর এই ধরনের আসরের আয়োজন করার দক্ষতা ছিল, সেখানে কেশবচন্দ্র হয়ত বন্ধু হিসাবে সহায়তা করে থাকবেন, কিন্তু তাঁর প্রধান উদ্যোগকারী হবার কোন সুযোগ ছিল না। "খ্রীষ্টের জন্মদিন উপলক্ষে মিস্ কার্পেন্টারের ইচ্ছামত একটি সভা হয়। এই সভায় অনেকগুলি ব্রাহ্মিকা ও ব্রাহ্ম উপস্থিত হন।"[২৪৩] এই সভাটি হল সেই চায়ের আসর যার আয়োজিকা ও আপ্যায়নকারিণী ছিলেন মেরী কার্পেন্টার স্বয়ং এবং "তাঁহার একমাত্র বন্ধু ও সহায়" কেশবচন্দ্র সুনিশ্চিতভাবে এই আসরের প্রকৃত ব্যবস্থাপক ছিলেন। "মিস্ কার্পেন্টার বাইবেল হইতে কিছু পাঠ করেন। পরে চা প্রভৃতি আহার হয়। সভা ভঙ্গ হইলে মিস্ কার্পেন্টার এবং কেশবচন্দ্র সপরিবারে চলিয়া গেলে অনেকগুলি ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা এখানে অনেকক্ষণ অবস্থিতি করেন। ইংরাজ ইভিনিং পার্টিতে গমন করিয়া এবং ইংরাজদিগের নরনারীর পরস্পরের প্রতি ব্যবহার দেখিয়া তাহা অনুকরণ করিবার ইচ্ছা সরলচিত্ত ব্রাহ্মদিগের পক্ষে অতি স্বাভাবিক ছিল। তাঁহারা ইচ্ছা করিলেন যে, ইংরাজ নারীগণ যেমন পুরুষদিগের সহিতস্বাধীনভাবে সম্মিলিত হন, তাঁহাদেরও স্ত্রী ও ভগিনীগণ সেইরূপ পুরুষদিগের সহিত একত্রিত হইবেন। এই মনে করিয়া ব্রাহ্মগণ আপন আপন বন্ধুদিগকে লইয়া নিজ নিজ পত্নী ও ভগিনীদিগের নিকট উপস্থিত করিয়া পরিচিত করিয়া দিলেন এবং কথা কহিতে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এই দলে যে সমস্ত মহিলা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অন্তঃপুরবাসিনী। অন্য পুরুষের সহিত কথাবার্ত্তা কহা তাঁহাদের তত অভ্যাস ছিল না। সুতরাং স্বামী অথবা ভ্রাতার নিতান্ত অনুরোধে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কুলবধূর ন্যায় মৃদুস্বরে অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে দুই একটি কথা কহিলেন। দৃশ্যটি অত্যন্ত কৌতূহলজনক হইয়া উঠিল। সরলমতি ব্রাহ্মযুবকগণ মনে করিলেন যে আজ একটি বিশেষ সদনুষ্ঠান হইল, স্ত্রীজাতির বন্ধনমুক্তির দ্বার উন্মুক্ত হইল। সভাভঙ্গ হইলে পর কয়েকজন যুবা অত্যন্ত আহ্লাদ ও উৎসাহের সহিত কেশবচন্দ্রকে এই সংবাদ দিয়া মনে করিলেন যে, তিনি খুব সুখ্যাতি করিবেন। কেশবচন্দ্রের পত্নী তথায় উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।"

---

২৪২ তদেব, পৃ: ১০৭।
২৪৩ তদেব।

"কেশবচন্দ্র হঠাৎ কাহারও মনে আঘাত বা কষ্ট দিবার লোক ছিলেন না। তিনি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন যে, এরূপ কার্য্যে তাঁহার সহানুভূতি নাই। স্ত্রীলোকদিগকে বলপূর্ব্বক বা অনুরোধ করিয়া স্বাধীন করা তিনি অত্যন্ত অনিষ্টকর কার্য্য মনে করেন। তিনি বলিলেন যে, আজ যিনি দিবানিশি অবরুদ্ধ থাকেন, সূর্য্যও যাঁহার মুখ দেখিতে পায় না, তিনদিনের মধ্যে তিনি তাঁহাকে মেম সাজাইয়া মেমের পোষাক পরাইয়া লাটসাহেবের সহিত শেকহ্যাণ্ড করাইতে পারেন এবং খোলা গাড়ীতে প্রতিদিন গড়ের মাঠে হাওয়া খাওয়াইয়া আনিতে পাবেন। তিনি আরও বলিলেন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, এরূপ করিলে স্ত্রী স্বাধীন হয়েন না, স্ত্রীলোকদিগকে আরও দাসত্বে বদ্ধ করা হয়। ভিতরে পরিবর্ত্তন হইল না, অথচ অনুকরণ করিতে শিক্ষা দিলে এদেশীয় রমণীদিগকে স্বাধীনতা শিক্ষা দেওয়া হইবে না। যাহারা স্থূলদর্শী, তাহারা বাহিরের বিষয় দেখিয়া সন্তুষ্ট থাকে থাকুক, আমার কিন্তু তাহাতে সন্তোষ হয় না। আমি আত্মার স্বাধীনতা মনের স্বাধীনতাকে প্রকৃত স্বাধীনতা জ্ঞান করি। আমাদিগের মহিলাগণ পুণ্যের পথে ও ধর্ম্মের পথে গিয়া আত্মাকে স্বাধীন করেন, ইহাই আমার সর্ব্বাগ্রে ইচ্ছা। মন স্বাধীন হইলে তাঁহাদের শরীর আপনা আপনি স্বাধীন হইবে, এই আমি জানি। আমি অনুরোধ দ্বারা কোন মহিলাকে কোন প্রকার ব্যবহার অবলম্বন করাইতে প্রস্তুত নহি। কেশবচন্দ্রের এই সমস্ত কথা শুনিয়া তাঁহার বন্ধুগণ অপ্রতিভ হইলেন এবং বিশেষ শিক্ষালাভ করিলেন।"[২৪৪]

যদিও কেশবচন্দ্র কার্পেন্টারের সম্মানে আয়োজিত চায়ের আসরে দলবলসহ উপস্থিত হয়েছিলেন ডাঃ গুডিভ চক্রবর্তীর বাড়ীতে, মাত্র কয়েকমাসের মধ্যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর এমন পরিবর্তন অভাবনীয়। কারণ, এই আসরে "সেখানে অনেক ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মিকা ও কয়েকজন সাহেব মেমও ছিলেন। ডাক্তারের একটি কন্যা সেদিন পিয়ানো বাজাইয়া গান করিয়াছিল। উপস্থিত ব্যক্তিগণ পরস্পর আলাপ করিয়া সদ্ভাব স্থাপন করিয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় ১২টার সময় সকলে বাড়ীতে ফিরিলেন।"[২৪৫] যে কেশব প্রথমবার মহিলাদের মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত বাড়ীর বাইরে কাটানো অনুমোদন করলেন, সেই কেশব দ্বিতীয়বার কেন মহিলাদের এমনকি পুরুষদের উপস্থিতিতে কোন আসরে নিয়ে যাওয়া, তাঁদের সঙ্গে আলাপচারিতা এমনকি পরিচিতা হওয়া পর্যন্ত অনুমোদন করলেন না? এই কেশবচন্দ্রই তো স্বামীত্বের অধিকার প্রয়োগ করে স্ত্রীকে নিয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন। বাড়ীর বয়োজ্যেষ্ঠরা তাঁর নির্দোষ স্ত্রীর প্রতি কটূক্তি করলেও কেশবকে নিরস্ত করা যায়নি। বরঞ্চ তিনি প্রায় চূড়ান্ত শর্ত আরোপ করে স্ত্রীকে তাঁর অনুগমন করতে বাধ্য করেছিলেন। "ব্রহ্মানন্দ পত্নীসহ অন্তঃপুর অতিক্রম করিয়া একটি গোলসিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিলেন। দেবী তখন ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্কা মাত্র। সেই বৃহৎ গৃহের বহির্ভাগে

২৪৪ গৌরগোবিন্দ রায়, আচার্য্য কেশবচন্দ্র, মধ্যবিবরণ (প্রথম অংশ), পূর্বোক্ত, কলিকাতা ১৮১৪, পৃ:পৃ: ১০৭-১০৮।

২৪৫ নববিধান প্রচারক শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পত্নী ছিলেন কেশব পত্নী জগন্মোহিনীর যৌবন বন্ধু। শ্রীমতী বসুর এই বর্ণনাটি প্রিয়নাথ মল্লিকের লেখা "ব্রহ্মনন্দিনী সতী জগন্মোহিনী দেবী" গ্রন্থের ১০৬ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হয়েছে।

কখনও পদক্ষেপ করেন নাই। বাহিরে যাইতে কেমন যেন ভয়ে লজ্জায় কিছুক্ষণ পা সরিল না। স্বামী ডাকিলেন, আবার কয় পদ নামিলেন, আবার থামিলেন, এইরূপ ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া ব্রহ্মানন্দ সেই বালিকা পত্নীকে পুনরায় এইভাবে বলিলেন, "দেখ, তোমার কি ইচ্ছা আমার সঙ্গে এস? একদিকে তোমার এই বৃহৎ গৃহ, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য, আর একদিকে কেবল 'আমি'; যদি আমাকে ছাড়, পৃথিবীর আর সমস্তই পাইবে, কেবল আমাকে পাবে না। আমার সঙ্গে কি আসিবে?" এই কথা শুনিয়া সতীর হৃদয়ে পতি-প্রেমবল প্রবল বেগে ছুটিল, মুখে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি প্রকাশ পাইল, "যাব" এই কথা সবলে বলিয়া পতির পশ্চাদ্‌গামিনী হইলেন।"[২৪৬] কেশব এইভাবে স্ত্রীকে নিয়ে জোর করে বাড়ীর বাইরে চলে যাবার পর বেচারী জগন্মোহিনীকেই সমস্ত তিরস্কার সহ্য করতে হয়েছিল। কেশবের জ্যেষ্ঠতাত দেওয়ান হরিমোহন সেন আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "আমি নিজে পছন্দ করে যার বিবাহ দিয়ে আনলাম, সেই মেয়ে এমন করে আমাদের মুখে কালী দিয়ে চলে গেল?"[২৪৭]

মিস্ কার্পেন্টারের চায়ের আসরে মহিলাদের নিয়ে যাওয়া, তাঁদের পুরুষদের সঙ্গে আলাপচারিতা করানো নিয়ে কেশব যে আপত্তি করেছিলেন তার সঙ্গে তুলনীয় এই ঘটনাটি। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন কেশবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি বিলাত থেকে আই. সি. এস. পরীক্ষায় পাশ করে বোম্বাইতে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সহধর্মিনী জ্ঞানদানন্দিনীর স্মৃতিচারণা থেকে জানতে পারি, "ওঁর অল্প বয়সে অনেকদিন ধরে পায়ে বাতের ব্যথায় ভুগেছিলেন। তাই আমরা মাঝে মাঝে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য যেতুম ও লম্বা ছুটিতেও যেতুম। ...একবার এমনি যখন কলকাতায় এসেছি, উনি আমাকে লাটসাহেবের বাড়ীর দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। নিজে অসুস্থ বলে যেতে পারেননি। আমাকে এক মেমের সঙ্গে পাঠালেন—বোধহয় *Lady Phear*। বড় ঠাকুরঝি আমাকে মাথায় সিঁথি প্রভৃতি দিয়ে খুব সাজিয়ে দিলেন, উনি শুয়েছিলেন, তাঁকে আবার নিয়ে গিয়ে দেখালেন। সেখানে ঠাকুরগুষ্টির যাঁরা ছিলেন তাঁরা ঠাকুরবাড়ীর একজন বউ গিয়েছে শুনে লজ্জায় চলে গেলেন—পরে শুনলাম। ...তারপরে অনেকবার অনেক জায়গায় লাটসাহেবের বাড়ী গেছি অবশ্য, তবে শেষ পর্যন্ত হাঁটু নুইয়ে *Courtsey* করাটা ভাল অভ্যাস হয়নি।"[২৪৮] আশ্চর্য এই যে কেশবের প্রতিক্রিয়া ও রক্ষণশীল "ঠাকুর গোষ্ঠীর যাঁরা"-র প্রতিক্রিয়া মধ্যে পার্থক্য প্রায় নেই। তফাত শুধু বহিঃপ্রকাশের। কেশব ও সত্যেন্দ্র ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, বহুদিন তাঁরা একত্রে বসবাস করেছিলেন, কলুটোলার সেনবাড়ীর একতলার ঘরে যে সঙ্গত সভার অধিবেশন বসত, তাতে দুই বন্ধু আরো অনেকের সঙ্গে যে সমাজ সংস্কারের কথা ভাবতেন ও আলোচনা করতেন, সেখানে "স্ত্রী জাতির" উন্নতির কথা একটি বড় অংশ জুড়ে থাকত। কেশব বিলাত গিয়েছিলেন ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক হিসাবে আর সত্যেন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন আই. সি. এস. পড়তে। উভয়েই নিজ নিজ পত্নীকে অজস্র চিঠি

২৪৬ প্রিয়নাথ মল্লিক, ব্রহ্মনন্দিনী সতী জগন্মোহিনী দেবী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৪।
২৪৭ তদেব, পৃ: ৪৫।
২৪৮ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, পুরাতনী, পৃঃ ৩২-৩৩।

লিখেছিলেন। তাতে দুজনেরই যে স্ত্রীর প্রতি অসীম ভালবাসা ছিল তা বোঝা একটু কঠিন হয় না। কিন্তু এর মধ্যে থেকেও উভয়ের নারী ভাবনার পার্থক্য ধরা পড়ে।

সত্যেন্দ্র ও কেশব উভয়েরই বাল্যবিবাহ হয়েছিল, কিন্তু দুজনের বিবাহিত জীবন শুরু হয়েছিল দুভাবে। সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই তাঁর স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত স্নেহময় ছিলেন। একটি ঘটনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। জ্ঞানদানন্দিনীর জবানিতে এই ঘটনা শোনা যাক : "বিয়ের দুতিন বৎসর পরে বাবামশায় মাকে সুদ্ধ নিয়ে এসে কলকাতায় বাড়ী ভাড়া করে রইলেন। মা আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবার জন্য পালকি পাঠালেন। কিন্তু শাশুড়ি ঠাকরুণ বললেন ভাড়াবাড়িতে বউ পাঠাবেন না। আমি তাঁর উপর তো কখন কিছু বলিনি, এই কথা শুনে লুকিয়ে ছাতের এক কোণে বসে কাঁদতে লাগলুম। দাসীদের ভয় করতুম, কেননা তারা মায়ের কাছে লাগিয়ে দিয়ে বকুনি খাওয়াত। এমন সময় উনি মায়ের কাছে কি একটা কথা বলতে এলেন। বড়ঠাকুরঝিকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন—সে কোথা? বড়ঠাকুরঝি বল্লেন—তার মা তাকে আনতে পালকি পাঠিয়েছেন কিন্তু ভাড়াবাড়িতে মা পাঠাবেন না বলেছেন, তাই সে ছাতে বসে কাঁদছে। উনি এই কথা শুনে তখনি বাবামশায়ের কাছে চলে গেলেন। তিনি বাপের কাছে যত স্পষ্ট কথা বলতেন, এমন আর কোন ছেলে সাহস করত না। বাবামশায় যখন শুনলেন মা এই কারণে আমাকে যেতে দিচ্ছেন না তখন নিজেই বাড়ীর ভিতর চলে এলেন। এসে মাকে বল্লেন—সত্যেন্দ্রর বউয়ের মা তাঁকে নিতে পালকি পাঠিয়েছেন, তুমি নাকি ভাড়াবাড়ি বলে' তাকে যেতে দাওনি? ভাড়াবাড়ি কেন, মা গাছতলায় থাকলেও মায়ের কাছে যাবে, এখনি পাঠিয়ে দাও।—একথা শুনে আমার আহ্লাদ হল।"[২৪৯]

এই ঘটনার বিপরীতে, কেশবজায়া জগন্মোহিনী শ্বশুরগৃহে পরিজনের কাছ থেকে যে কি দুর্ব্যবহার পেয়েছিলেন তার প্রচুর উদাহরণ তাঁর জীবনীতে রয়েছে। এমনকি শ্বশুরবাড়ীর দাসীও স্বামীর অবহেলা ও অনাদরের সুযোগ নিয়ে তাঁর প্রতি চরম অবমাননা প্রদর্শন করত। "প্রকাণ্ড বাড়ী, আর সকলেরই দাসদাসী ব্রাহ্মণ ছিল, কিন্তু ভয়েই হউক আর যে কারণেই হউক, ব্রাহ্মণ না আসিলে কেহ অন্নব্যঞ্জনাদি দিয়াও প্রায় সাহায্য করিত না। একদা এক আত্মীয়ার দাসী দেবীর পানীয় জলের ঘটী পর্য্যন্ত পা দিয়া ঠেলিয়া নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিয়াছিল।"[২৫০] কেশব যে স্ত্রীর প্রতি এই নির্যাতনের কথা জানতেন না তা নয়। কিন্তু যতদিন তিনি এতদ্দেশে ছিলেন, ততদিন কিন্তু কেশব স্ত্রীর এই দুর্ভোগের প্রতি অন্ততঃ মৌখিকভাবেও সমবেদনা জানাননি। জগন্মোহিনী যদিও বা কেশবকে তাঁর এই কষ্টের কথা জানাতেন, তখন কেশবের প্রতিক্রিয়া ছিল এইরকম— "তিনি কখনও বা শুনিতেন, হুঁ, হাঁ করিতেন, কখনও বা শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িতেন, "ভগবান যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাহাতেই তুষ্ট হইয়া সহ্য করিতে হইবে" ইহাই উপদেশ দিতেন। অধিকাংশ দিনই ব্রহ্মানন্দ বহির্বাটিতে বন্ধুবর্গের সহিত এত অধিক রাত পর্য্যন্ত কাটাইতেন যে সতীর সহিত দেখা সাক্ষাৎই হইত না এবং তাঁহার মনের

২৪৯ পুরাতনী, পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ২১-২২।
২৫০ সতী জগন্মোহিনী দেবীর জীবনী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৯৮।

কথা মনেই থাকিয়ে যাইত। কাজেই পরিজনবর্গের নির্য্যাতনে যে স্বামীর নিকট সহানুভূতি পাইবেন তাহারও বড় একটা উপায় ছিল না।"[২৫১]

সত্যেন্দ্র ও কেশব উভয়েই বিলাত গিয়েছিলেন। ১৮৬২ সালে সত্যেন্দ্রনাথ বিলাতে গমন করেন আই. সি. এস. পড়তে। সেখানকার সমাজে মহিলাদের তুলনামূলক উচ্চ মর্যাদা লক্ষ্য করে তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাছাড়া, সমকালীন ইংলন্ডে যে নারীমুক্তি আন্দোলন চলছিল, তিনি সে সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি ইংল্যান্ড থেকে তাঁর বালিকা বধূকে একাধিক চিঠি লিখেছিলেন। সেই সব চিঠি থেকে বোঝা যায় যে তিনি তাঁর স্ত্রীকে শিক্ষা ও স্বাধীনতা দান করার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি আন্তরিকভাবেই চাইতেন যে, তাঁর স্ত্রীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিকশিত হোক। তাঁর স্ত্রী যেন সত্যেন্দ্রনাথের যোগ্য সহধর্মিণী হয়ে উঠতে পারেন। উপরন্তু তিনি চেয়েছিলেন যে, স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যেন সমানাধিকার ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।[২৫২] সংসারে উন্নতির পিছনে আছে নারীর অবদান, সত্যেন্দ্রনাথ একথা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করতেন, তাঁর নিজের দেশে যে নারীর এই অবদান গ্রাহ্য হয় না, এ তাঁর অতি মনোবেদনার কারণ ছিল। "এ দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের যত বিষয়েই ভিন্নতা থাকুক এখানকার জনসমাজের যাহা কিছু সৌভাগ্য, যাহা কিছু উন্নতি, যাহা কিছু সাধু সুন্দর প্রশংসনীয় স্ত্রীলোকদের সৌভাগ্যই তাহার মূল। আমাদের দেশে এরূপ সৌভাগ্য কবে হইবে? যেখানে স্ত্রীলোকদের কোন বিষয়েই কর্ত্তৃত্ব নাই, যেখানে দেশাচার, ভর্ত্তার আদেশ ও পরের বাক্যই তাহাদের জীবনের নিয়ম, সেখান হইতে শ্রী সৌভাগ্য এখনো অনেক দূর। স্ত্রীলোক জীবন উদ্যানের পুষ্প—তাহাদের বায়ু ও আলোক হইতে লইয়া কেবল ঘরের মধ্যে শীর্ণ বিশীর্ণ করিয়া রাখিলে কি মঙ্গলের সম্ভাবনা। এদেশে সর্ব্বদাই আমার এই প্রকার মনে হয়। আমার ইচ্ছা তুমি আমাদের স্ত্রীলোকের দৃষ্টান্তস্বরূপ হইবে, কিন্তু তোমার আপনার উপরেই তাঁহার অনেক নির্ভর।[২৫৩]

বাল্যবিবাহের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের ঘোরতর আপত্তি ছিল। পিতার ইচ্ছানুসারে মাত্র ১৭ বছরে তিনি সাত বছরের জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে বিবাহ করেছিলেন। তখন হয়ত মনে মনে আপত্তি থাকলেও তিনি মুখে তা প্রকাশ করতে পারেননি কিন্তু এ বিবাহ কখনো উচিত নয় — এই রকম একটি ভাব বরাবর তাঁর মনের মধ্যে জাগ্রত ছিল। তাই লণ্ডন থেকে তিনি স্ত্রীকে বুঝিয়ে লিখলেন ঃ "...আমাদের যখন বিবাহ হইয়াছিল তখন তোমার বিবাহের বয়স হয় নাই—আমরা স্বাধীনপূর্বক বিবাহ করিতে পারি নাই, আমাদের পিতামাতারা বিবাহ দিয়া দিয়াছিলেন। ইহা ভাই সত্য কি না? যদিও আমি তোমাকে এ বিষয়ে কিছু মুখে বলি নাই, কিন্তু তুমি জান আমার ভাব কি। যে পর্য্যন্ত তুমি বয়স্ক শিক্ষিত ও সকল বিষয়ে উন্নত না হইবে, সে

২৫১ তদেব, পৃ: ৯৫।

২৫২ সংকোচের বিহ্বলতা, পূর্বোক্ত, পৃ: ৬১।

২৫৩ জ্ঞানদানন্দিনীকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের পত্র, পত্রসংখ্যা ২, ১৬ই নভেম্বর ১৮৬৩, লণ্ডন, পুরাতনী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৬।

পর্যন্ত আমরা স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধে প্রবেশ করিব না। ইহা কি তোমার মনের ভাবের সঙ্গে মেলে না?"[২৫৪]

ছোটভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যখন বিবাহ স্থির হয় এবং ভাবি কনে নিতান্তই ৮ বছরের বালিকা, তখনও সত্যেন্দ্রনাথ পিতা দেবেন্দ্রনাথের কাছে আপত্তি জানানোর কথা স্ত্রীকে লিখেছিলেন : "নতুন এখন কি করিতেছেন—তাহার বিবাহের কি সকল প্রস্তুত হইতেছে? আমি বাবামশাইকে লিখিব জ্যোতির বিবাহ দিতে যত ব্যয় হইবে—সেই ব্যয়ে যদি শিক্ষার জন্য তাঁহাকে ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়, তাহা হইলে জ্যোতির যথার্থ উপকার করা হয়। একবার বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইলে আর যে তাহার নড়িবার পথ থাকিবে এমন বোধ হয় না।"[২৫৫] সত্যেন্দ্রনাথের অনুরোধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবাহ বন্ধ হল না তখন আক্ষেপভরে তিনি স্ত্রীকে লিখলেন : "তবে নতুনের বিবাহের আর বিলম্ব নাই—শ্যাম গাঙ্গুলীর ৮ বৎসরের মেয়ে—আমি যদি নতুন হইতাম, তবে কখনই এই বিয়েতে সম্মত হইতাম না। কোন হিসাবে এ কন্যা নতুনের উপযুক্ত হইয়াছে জানি না। এই বিবাহের পর বোধ করি নতুনের আর বিলাত যাইবার ইচ্ছা থাকিবে না—একবার সংসারী হইয়া বসিলে আর কি নড়িতে ইচ্ছা করে?"[২৫৬]

বাল্যবিবাহ রীতি যে সত্যেন্দ্রনাথের ঘোর অপছন্দ ছিল তাই নয়, এই বিবাহ প্রথা তাঁর অন্তরে গভীর ক্রোধ, হতাশা, লজ্জার উদ্রেক করত। বালিকা পত্নীকে এ বিষয়ে তিনি সচেতন করতে চেয়েছিলেন : "আমাদের দেশে আচারের বল অত্যন্ত বেশী—প্রত্যেকের নিজের শক্তি খুব অল্প। ইহাই আমার সকল দুর্দ্দশার মূল। রোজ একমুষ্টি আহারে উদরপূরণ করা—তারপর ঘটা করিয়া বিবাহ করা—তারপর ছেলেপিলে হলো তো আর কে গোলযোগ করে। বালিকা ভার্য্যা গৃহিণী হলেন—আর তাহার কি করিবার অবশিষ্ট আছে? এইরূপেই ঘরকন্যা লইয়া একরকম করিয়া দিনটা চলে গেলেই হল।...আমাদের স্ত্রীলোকেরা ১৩/১৪ বৎসরের মাতার স্নেহভার ও কর্ত্তব্য লইয়া আক্রান্ত হয় — আর অন্য কিছু করিবার চিন্তা ও আবশ্যক থাকে না।"[২৫৭]

বালিকা বধূটিকে সর্বাংশে নিজের মনোমত করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। এ বিষয়ে তাঁর চিন্তা ও চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। ইংল্যাণ্ডে মেয়েদের স্বাধীন সাবলীল জীবন দেখে তিনিও চেয়েছিলেন যে তাঁর স্ত্রী এইরকম সুন্দর ও সুস্থ জীবনের আস্বাদন লাভ করুক। অন্তঃপুরের বদ্ধ পিঞ্জর থেকে মুক্তির খোলা হাওয়ায় জ্ঞানাদানন্দিনী শ্বাসগ্রহণ করুক। তাই তিনি স্ত্রীকে ইংল্যান্ডে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি তাঁর ইচ্ছা পিতা দেবেন্দ্রনাথকে জানাতে দ্বিধা করেননি। "আমি বাবামশায়কে এক পত্র লিখিয়াছি, আমার ইচ্ছা যে তিনি তোমাকে ইংল্যান্ডে প্রেরণ করেন। তুমি তাহাতে চিন্তিত হইবে না।...আমি বাবামশাইকে লিখিয়াছি যে যেমন উৎকৃষ্ট

২৫৪ জ্ঞানদানন্দিনীকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের পত্র, পত্রসংখ্যা ১৪, পুরাতনী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৭।
২৫৫ জ্ঞানদানন্দিনীকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের পত্র, পত্রসংখ্যা ২০, পুরাতনী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৭৩-৭৪।
২৫৬ তদেব।
২৫৭ জ্ঞানদানন্দিনীকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের পত্র, পত্রসংখ্যা ২, ১১ জানুয়ারী, ১৮৬৪, পুরাতনী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৭।

বীজ, উপযুক্ত সরস জমিকে প্রতীক্ষা করে, আমি তোমার জন্য সেইরূপ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব। তোমার হৃদয় মন এখন অন্তঃপুরের প্রাচীরমধ্যে শুষ্কপ্রায় হইয়া রহিয়াছে, তুমি ইংল্যাণ্ডেআসিয়া এক নতুন ক্ষেত্র দেখিতে পাইবে। তোমাকে আলিঙ্গন দেবার জন্য কত কত স্ত্রীলোক এখানে হস্ত প্রসারণ করিয়া আছে।. . তুমি উন্নত হও, তুমি ইংল্যাণ্ডের সমাজের মধ্যে থাকিয়া তোমার স্ত্রীহৃদয়কে সহস্রগুণে বলবান কর, তুমি আপনাকে যত উন্নত করিবে, তোমার দেশের ভগিনীগণের তোমার দৃষ্টান্তে ততই উপকার করিতে পারিবে।"[২৫৮]

ইংল্যাণ্ডে এলে জ্ঞানদানন্দিনীর যে কোন অসুবিধা হবে না, তার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে মিস্ মেরী কার্পেন্টারের কথা লিখেছিলেন। এই মিস্ কার্পেন্টার সম্পর্কে জ্ঞানদানন্দিনী বলেছিলেন : *"Miss Mary Carpenter*-কে উনি বিলেতে চিনতেন। তিনি বুড়োবয়সে সখ করে এদেশ দেখতে এসেছিলেন ও আমাদের সঙ্গে কিছুদিন ছিলেন। তখন আমি খুব কমই ইংরেজি বলতে পারতুম, কোনরকম করে তাঁর কথা বুঝতুম। তিনি খুব গোঁড়া একেশ্বরবাদী *(Unitarian)* খ্রীষ্টান ছিলেন ও নিজের দেশে জেলে গিয়ে কয়েদি দেখা প্রভৃতি নানা হিতকর কাজ করতেন। রামমোহন রায়কেও বোধ হয় বিলেতে চিনতেন। তিনি এদেশে মন্দির দেখতে চাইতেন না—পৌত্তলিকতা বলে। আমাদের বেচরদাস নামে এক ধনী ব্যক্তি তাঁর জন্য একটা নিমন্ত্রণ সভা করে একে একে তাঁর তিন স্ত্রীকে আলাপ করিয়ে দিলেন। *First Mrs. Becherdas,* তারপরে *Second Mrs. Becherdas* পর্যন্ত *Miss Carpenter* কোনরকম করে সইলেন; তারপর যখন *Third Mrs. Becherdas* এল তখন তাঁর মূর্ছা হয়ে পড়বার উপক্রম, একেবারে চৌকির উপর হাত-পা ছেড়ে দিয়ে পড়লেন। একজনের যে তিন স্ত্রী থাকতে পারে, এরকম অধর্মের কাণ্ড তাঁর পক্ষে এতই অভাবনীয় যে, একটা কথা বলতে পারলেন না।"[২৫৯]

এই মিস্ কার্পেন্টারের সাথে স্ত্রীর হয়ে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর বিলাতে প্রবাস কালে। বিস্তারিতভাবে স্ত্রীর কাছে তিনি জ্ঞানদার এই "স্ত্রীবন্ধুর" কথা লিখলেন : "তোমাকে লেফাফার মধ্যে একটি পুষ্পময় পাতা প্রেরণ করিতেছি। তাহা তোমার প্রতি তাঁহার বন্ধুতার চিহ্নস্বরূপ। তোমার এই স্ত্রীবন্ধুর নাম *Miss Carpenter,* আমার মনে নাই রামারঞ্জিকায় তুমি তাঁহার নাম পাইয়াছ কি না? কিন্তু তিনি একজন অতি উদারস্বভাব পরোপকারব্রতী উৎকৃষ্ট স্ত্রীলোক। তিনি অবিবাহিত কিন্তু কত কন্যার তিনি যথার্থ মাতা—তাহাদের নিজের পিতামাতা কেবল তাহাদের জন্মদাতা তুল্য। তুমি *Miss Carpenter*-এর বন্ধুতার চিহ্ন স্বীকার করিয়া আমার নিকট তাঁহাকে এক পত্র লিখো।"[২৬০]

---

২৫৮ জ্ঞানদানন্দিনীকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের পত্র, পত্রসংখ্যা ৩, ১১ জানুয়ারী, ১৮৬৪, পুরাতনী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৮-৫০।

২৫৯ পুরাতনী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৪।

২৬০ জ্ঞানদানন্দিনীকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের পত্র, পত্রসংখ্যা ৩, ১১ই জানুয়ারী ১৮৬৪, লণ্ডন, পুরাতনী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৯।

.. সত্যেন্দ্রনাথ ইংল্যান্ড থাকাকালীন তাঁর স্ত্রী তাঁকে সেখানে গিয়ে সঙ্গ দেবেন, সেখানে জ্ঞানদানন্দিনী উন্নতমনা, স্বাধীন স্ত্রীলোকদের সংস্পর্শে এসে নিজেকে বিকশিত করবেন, তারপর তাঁর উদাহরণ অনুসরণ করে এদেশে মহিলাদের মধ্যেও ঘটবে অনুরূপ জাগরণ, প্রথম চেষ্টায় সত্যেন্দ্রনাথের এই ইচ্ছা পূরণ হয়নি। তাই নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে তিনি জ্ঞানদাননন্দিনীকে লিখলেন : "আমি একবার ভাবিয়াছিলাম তুমি যদি কোনরকম করিয়া ইংল্যান্ডে আসিয়া এখানকার উন্নত সমাজের মধ্যে বাস করিতে পার তবে আমার এখানে যাহা কিছু শিক্ষা ও উন্নতি লাভ হইয়াছে তুমিও তাহার ভাগী হইতে পার। এই অভিপ্রায়ে তোমাকে ইংল্যান্ডে পাঠাইবার কোন উপায় করিয়া দেন বাবামশায়কে লিখিলাম। কিন্তু আমার সমুদয় যত্নই ব্যর্থ হইল। বাবামশায় চান আমি যেন অন্তঃপুরের মান-মর্য্যাদার উপর হস্তক্ষেপ না করি, অর্থাৎ তোমাকে চিরজীবনের মত চারি প্রাচীরের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখি। আমি ত ভাই বুঝতে পারি না বাবামশাইয়ের এই ইচ্ছা কেমন করিয়া রক্ষা করি। তোমাকে আমি কারারুদ্ধ রাখিয়া সুখী থাকিতে পারিব না, এবং তাহা হইলে তোমারও শরীর ও মন কখনই স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারিবে না। লোকেদের মনে এরূপ কেন হয় যে স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা ও স্বাধীনতা দেওয়া মহান অনর্থের মূল? আমার বিশ্বাস এই যে স্ত্রীলোকদিগকে অজ্ঞান ও পরাধীন করিয়া রাখাই অশেষ অনর্থের মূল।"[২৬১]

সত্যেন্দ্রনাথ বরাবরই স্ত্রীজাতির অবরোধ মোচনের পক্ষপাতী ছিলেন। "আমি ছেলেবেলা থেকেই স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী। মা আমাকে অনেক সময় ধমকাইতেন, "তুই মেয়েদের নিয়ে মেমের মত গড়ের মাঠে ব্যাড়াতে যাবি নাকি?" আমাদের অন্তঃপুরে যে কয়েদখানার মত নবাবী বন্দোবস্ত ছিল তা আমার আদবে ভাল লাগত না। আমার মনে হ'ত, এই পর্দাপ্রথা আমাদের জাতির নিজস্ব নয়, মুসলমান রীতির অনুকরণ।...এই অবরোধ প্রথা আমার অনিষ্টকর কুপ্রথা বলে মনে হত।"[২৬২] বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নারীমুক্তি সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা আরো প্রবল হতে থাকে। যখন আই. সি. এস. পড়বার জন্য তিনি ইংল্যান্ডে যান, তখন নিজের পড়াশোনা ও ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি আঁকাতেই তিনি যে নিমগ্ন হয়েছিলেন তা নয়। তিনি বুঝেছিলেন যে, তিনি যে নারীস্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেন বাস্তবে তার রূপ দিতে গেলে তাঁর স্বাধীন বৃত্তি গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। তাই তিনি লক্ষ্য করতে ভোলেননি, ইংল্যান্ডের স্ত্রী-পুরুষের স্বাধীন যৌথজীবন, তারা স্বাধীনভাবে একত্রে সামাজিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করেন, এভাবে ভেতরে বাইরে আলোকিতা মহিলারা পারিবারিক জীবনে কি চমৎকার প্রভাব বিস্তার করেন। এমনকি, সেখানকার মেয়েরা ইচ্ছা করলে অবিবাহিত থাকতে পারেন এবং তাঁদের সমগ্র সময় ও শক্তি সমাজের কল্যাণ কাজে ব্যয় করতে পারেন। তিনি আরও লক্ষ্য করেন যে ইংরাজ মহিলাদের তুলনায় বাঙ্গালী মহিলাদের জীবন কত খর্বিত। এই খর্বতা থেকে জ্ঞানদানন্দিনীকে মুক্ত করার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ সবরকম কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন।

২৬১ জ্ঞানদানন্দিনীকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের পত্র, পত্রসংখ্যা ৮, ২রা জুলাই ১৮৬৪, পুরাতনী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫৯।
২৬২ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যকাল, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা : বৈতৌনিক, ১৯৬৭, পৃ: ৫।

তাই স্পষ্ট ভাষায় স্ত্রীকে লিখলেন সত্যেন্দ্রনাথ : "জ্ঞানদা, তোমার জন্য আমি যে বাবামশায়কে লিখিয়াছি, তাহাতে কি তুমি দুঃখিত হইবে? আমার তাহাতে কিছু স্বার্থপরতা নাই, আমি কেবল তোমার হিতের জন্যই লিখিয়াছি।...আমি এখন কেবল বাবামহাশয়ের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি যাহাতে তোমার শিক্ষার জন্য তোমাকে ইংল্যাণ্ডে প্রেরণ করেন। আমি আরও দুই-এক বৎসরের জন্য তোমার চক্ষুর অন্তরে থাকিব, এ বেদনা সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি। তুমি উন্নত হও, শিক্ষিত হও, তুমি ইংল্যাণ্ডের সমাজের মধ্যে থাকিয়া তোমার স্ত্রীহৃদয়কে সহস্রগুণে বলবান কর, এ অপেক্ষা আমি আর অধিক কি দেখিতে চাই।"[২৬৩]

নিজের ঐহিক উন্নতির প্রচেষ্টায় নিরত হয়েও সত্যেন্দ্রনাথ কখনও তাঁর স্ত্রীর বাহ্যিক ও আত্মিক উন্নতির প্রচেষ্টা থেকে বিরত হননি। বিলাত যাবার আগে স্ত্রীর জড়তা কাটাবার জন্য তাঁর প্রয়াস জ্ঞানদানন্দিনী বৃদ্ধা বয়সে এসেও স্মরণ করেছেন : "ওঁর এক বন্ধু ছিলেন মনোমোহন ঘোষ। ওঁর ইচ্ছে যে তিনি আমাকে দেখেন—কিন্তু আমার তো বাইরে যাবার জো নেই। তাই ওঁরা দুজনে পরামর্শ করে একদিন বেশি রাত্রে সমানতালে পা ফেলে বাড়ীর ভেতরে এলেন। তারপরে উনি মনোমোহনকে মশারীর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজে শুয়ে পড়লেন। আমরা দুজনে মশারির মধ্যে জড়সড় হয়ে বসে রইলুম; আমি ঘোমটা দিয়ে বিছানার একপাশে আর তিনি ভোম্বল দাসের মত আর একপাশে। লজ্জায় কারোর মুখে কথা নেই—। আবার কিছুক্ষণ পরে তেমনি সমান তালে পা ফেলে উনি তাঁকে বাইরে পার করে দিয়ে এলেন।"[২৬৪] বস্তুতঃ জ্ঞানদানন্দিনীর তখন এতই লজ্জা ছিল যে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে পর্যন্ত কথা বলতেন না। সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে কথা বলানোর জন্য কবুল করেছিলেন যে কথা বললে তিনি অর্থাৎ জ্ঞানদা যা চাইবেন তাই পাবেন। জ্ঞানদানন্দিনী স্মৃতিকথায় বলেছেন : "আমি প্রথম প্রথম লজ্জায় ওঁর সঙ্গে কথা বলতুম না। লজ্জা আমার অসাধারণ রকমের ছিল। তখন উনি একবার বলেছিলেন যে—তুমি যদি কথা বল ত যা চাও তাই দেব। তাতে আমি একটা ঘড়ি চেয়েছিলুম, উনিও দিয়েছিলেন। ওঁর বিলেত যাবার সময় অবশ্য সে অবস্থা কাটিয়ে উঠেছিলুম।"[২৬৫] লজ্জাশীলতা কাটিয়ে উঠতে না পাবলে জ্ঞানদা সে রকম হয়ে উঠতে পারবে না, যে রকম চাইছেন সত্যেন্দ্রনাথ। তাই বিলাত থেকেও তিনি জানতে চাইলেন : "আমার মনে আছে তুমি কেমন লজ্জাশীলা ছিলে—তোমাকে কত বলিয়া একটু নতুন কাপড় কি জুতো কি মোজা পড়িতে দিলে তুমি পড়িতে চাহিতে না। আমার সামনে এতটুকু খেতেও লজ্জা করিতে। আমাদের স্ত্রীলোকের যা কিছু আচার, যত লজ্জা, যত ভীরুতা, তুমি যেন তার মূর্ত্তিমতী ছিলে। এখনও কি তোমার সবই সেইরূপ ভাব আছে?"[২৬৬]

২৬৩ জ্ঞানদানন্দিনীকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের পত্র, পত্রসংখ্যা ৩, পুরাতনী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৯-৫০।
২৬৪ পুরাতনী, পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ২৪-২৫।
২৬৫ তদেব, পৃ: ২৫।
২৬৬ জ্ঞানদানন্দিনীকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের পত্র, পত্রসংখ্যা ৪, ১৮ই জানুয়ারী ১৮৬৪, পুরাতনী, পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ৫০-৫১।

জ্ঞানদানন্দিনীকে ইংল্যান্ডে এনে তাকে সর্বতোভাবে সুশিক্ষিতা করে তোলার স্বপ্ন দেখতেন সত্যেন্দ্রনাথ। সেজন্য বাঙালী পরিবারে প্রচলিত খাদ্যাভ্যাস ও বস্ত্র যথেষ্ট নয় সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণভাবে অবহিত ছিলেন। তাই স্ত্রীকে অভয়দান করে তিনি লিখলেন : "কিছুতেই চিন্তিত হইও না। যদি তুমি আসিবার মতো ভালো সঙ্গী পাও, তবে তাহাদের সঙ্গে ভাল করিয়া আলাপ করিবার ত্রুটি করিও না। স্টীমারে আসিতে তোমার কিছুই ভয় নাই। বাবামশায় যদি তোমার আসিবার বিষয় সম্মত হন, তবে এমন সময় বুঝিয়া অবশ্য প্রেরণ করিবেন যখন সমুদ্রে কিছুমাত্র ভয় নাই।"[২৬৭]

তখন বাঙ্গালী মেয়েদেব পোশাক ভদ্রসমাজে যাবার উপযুক্ত নয়, একথা জানতেন সত্যেন্দ্রনাথ। তাই ঐ অনুপযুক্ত পোশাকে অন্দরমহল থেকে বাইরে এসে খোলা জাহাজে করে কিভাবে এক মাসের পথ পাড়ি দেবেন জ্ঞানদানন্দিনী, এই চিন্তায় ব্যগ্র হয়ে স্ত্রীকে লিখলেন তিনি : "তোমার যদি কাপড় পরিবর্ত্তন করিতে হয় তাহাতে অসম্মত হইও না। সত্য সত্য বলিতে কি, আমাদের স্ত্রীলোকেরা যেরূপ কাপড় পরে, তাহা না পরিলেও হয়। তাহা পরিয়া কোন ভদ্রসমাজে যাওয়া যাইতে পারে না।"[২৬৮] এযাত্রা সত্যেন্দ্রনাথ জ্ঞানদানন্দিনীকে বিলাত নিয়ে যেতে সফল হননি বটে, তবে আই. সি. এস. পাশ করার পর যখন তিনি বোম্বাই-এর কাছে আহমেদাবাদে সহকারী জজ হিসাবে কাজ পেলেন তখন স্ত্রীকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন আবার বাঙ্গালী মেয়েদের পোশাকের অপ্রতুলতা তাঁকে বিব্রত করেছিল। জ্ঞানদানন্দিনী বলেছেন : "তবে সে সময়ে আমাদের খালি এক শাড়ি পরা ছিল, তা পরে' তো বাইরে যাওয়া যায় না। তাই উনি কোনো ফরাসী দোকানে ফরমাশ দিয়ে একটা কি পোশাক আমার জন্য করালেন,—বোধহয় তাদের মতে *Oriental* যাকে বলে। সেটা পরা এত হাঙ্গাম ছিল যে ওঁর পরিয়ে দিতে হত, আমি পারতুম না। দুচারখানা শাড়িও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম।"[২৬৯] আহমেদাবাদে চাকরি নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ যখন জ্ঞানদানন্দিনীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলেন, তখন আপত্তি সত্ত্বেও দেবেন্দ্রনাথ মত দিলেন, সম্ভবত এই কারণে যে পুত্র তখন স্বাবলম্বী। জ্ঞানদানন্দিনীকে ঐ ফরাসী *Oriental* পোশাক পরিয়ে ঘেরাটোপ দেওয়া পালকি করে জাহাজে তুলে দেওয়া হল। বোম্বে গিয়ে তাঁরা প্রথমে মানেকজী করসেদজী নামে এক ভদ্রলোকের পরিবারে গিয়ে উঠলেন। সেখানে তাঁরা কয়েক মাস ছিলেন। ক্রমে জ্ঞানদানন্দিনী ঐ পার্শী পরিবারের মেয়েদের মত কাপড় পরতে লাগলেন। "আমার সেই অদ্ভুত পোশাক ছেড়ে ক্রমে ওঁদের মত কাপড় পরতে লাগলুম। ওরা ডান কাঁধের উপর দিয়ে শাড়ি পরে, পরে আমি সেটা বদলে আমাদের মত বাঁ কাঁধে পরতুম, সায়া পরতুম।"[২৭০]

২৬৭ জ্ঞানদানন্দিনীকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের পত্র, পত্রসংখ্যা ৪, ১৮ই জানুয়ারী ১৮৬৪, পুরাতনী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫১।
২৬৮ তদেব।
২৬৯ পুরাতনী, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৯।
২৭০ তদেব, পৃ: ৩০।

আবার ফিরে আসা যাক সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রীকে নিয়ে বিলাত যাবার স্বপ্নে। বাড়ীতে মেয়েরা যে খাদ্য খেতেন তা যেমন পরিমাণে সামান্য তেমনি গুণমানে অকিঞ্চিৎকর। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মেয়েরাও ভাল কিছু খেতেন না। জ্ঞানদানন্দিনী যখন বালিকা বৌ তখন শ্বশুরবাড়ীতে তাঁর খাওয়াদাওয়া ছিল এইরকম "স্নানের পর সবাই মিলে গল্প করতে করতে একসঙ্গে খেতুম। রান্নাঘরের রান্না বড় ভাল লাগত না, তাই চচ্চড়ি বা ঝোলের মাছ নিয়ে টক কি কিছু দিয়ে খেয়ে নিতুম। পাতে যা থাকত তা দাসদাসীরা খেত, ...উনি বিলেত যাবার পর ওঁর মাসহারা আট টাকা আমাকে দেওয়া হল;তাতে নিজেকে খুব বড়লোক মনে করলুম। তার থেকে মাঝে মাঝে কোন খাবার আনাতুম, দাসীদেরও খাওয়াতে ভালবাসতুম।"[২৭১] ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে সত্যেন্দ্রনাথ বাড়ীর মেয়েদের খাওয়াদাওয়ার এইরকম শোচনীয় অবস্থার কথা জানতেন। তাই স্ত্রীকে তাঁর উপস্থিতিতে যখন বিলাতে নিয়ে যেতে চাইলেন, তখন তাঁর মনে হল স্ত্রীর বাইরের খাওয়াদাওয়াতে অসুবিধা হবে, তাই তিনি জ্ঞানদানন্দিনীকে লিখলেন ঃ "স্টীমারে আসিতে গেলে তোমর আহারেরও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন আবশ্যক। তাহা করিতেও অরুচি প্রকাশ করিও না। কেননা আমি জানি তোমাদের যে আহার, তাহার পরিবর্ত্তে বাতাস খাইয়াও জীবন ধারণ করা যায়। সমুদ্রের উপর ক্ষুধার আধিক্য হইবে, সুতরাং পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করা বিধেয়। সকালে চা রুটি মাখন ও আর যাহা খাইতে চাও তাহা তোমাকে ঘরেই আনিয়া দিবে। ভোজনের সময় একটু মাংসের ঝোল কি কারি ভাতও খাইতে অসম্মত হইও না। কেশববাবু একবার আমাদের সঙ্গে সিলোনে আসিয়া পথে কেবল আলুভাতে ভাত খাইয়া থাকিতেন—একটু মাংসের ঝোল তাঁহাকে খাওয়ানো দুষ্কর হইত। তুমি তাঁহার মতো করিয়া শুকাইয়া থাকিও না।"[২৭২]

জ্ঞানদানন্দিনীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন শিক্ষা এ সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন। "বিয়ের পর আমার সেজ দেওর হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইচ্ছে করে আমাদের পড়াতেন। তাঁর শেখাবার দিকে খুব ঝোঁক ছিল। নিজের মেয়েদের ও সব লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। আমরা মাথায় কাপড় দিয়ে তাঁর কাছে বসতুম আর এক একবার ধমক দিলে চমকে উঠতুম।...উনি বিলেত থেকে ঠাকুরপোকে লিখে পাঠিয়েছিলেন আমাকে ইংরাজী শেখাতে কিন্তু সেটা অক্ষর পরিচয়ের বড় বেশী এগোয়নি।"[২৭৩] সত্যেন্দ্রনাথ জ্ঞানদাকে লিখলেন : "তুমি একবার ইংরাজী আরম্ভ করিয়াছিলে, এতদিন যদি তাহা অভ্যাস করিতে তবে কেমন ভাল হইত। যাহা হউক আমার বোধ হয় তুমি দুই এক মাসের মধ্যে ইংরাজি অল্প বলিবার ও বুঝিবার মত শিখিয়া লইতে পারিবে।"[২৭৪] বিলাত যাওয়া না হলেও স্ত্রীর ইংরাজী শিক্ষায় বাধা পড়ুক সত্যেন্দ্রনাথ তা চাননি। তাই, ইংল্যান্ড থেকে ফিরে তিনি আহমেদাবাদে কাজে যোগদান করে জ্ঞানদানন্দিনীকে লিখলেন : "তুমি বিবির কাছে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছ

২৭১ তদেব, পৃ: ২৭।
২৭২ জ্ঞানদানন্দিনীকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের পত্র, পত্র সংখ্যা ৪, ১৮ই জানুয়ারী, পুরাতনী, পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ৫১-৫২।
২৭৩ পুরাতনী, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৭।
২৭৪ জ্ঞানদানন্দিনীকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের পত্র, পত্রসংখ্যা ৪, পুরাতনী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫১।

শুনিয়া খুশী হইলাম—৩০ টাকা দিবার জন্য চিন্তিত হইবে না। আমি তোমাকে টাকা পাঠাইয়া দিব। বেশ ত, তুমি কেন আমাকে ইংরাজিতে চিঠি লিখতে আরম্ভ কর না? আমিই তাহা হইলে তোমাকে ইংরাজিতে লিখি।—কি বল? তাহা হইলে তোমার ইংরাজি লেখা খুব অভ্যাস হইবে।"[২৭৫] যখন সত্যেন্দ্রনাথ দেখলেন যে স্ত্রীর বিদ্যাশিক্ষা তাঁর চাহিদামতো এগোয়নি তখন তিনি যে রকম ক্রুদ্ধ ও হতাশ হয়েছিলেন তা জানা যায় জ্ঞানদানন্দিনীর স্মৃতিচারণ থেকে, একথা আগেই জানা গেছে যে বোম্বে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনী মানেকজী করসেদজী নামক পার্শী ভদ্রলোকের বাড়িতে মাসকতক ছিলেন। "ওঁরা বেশ সম্ভ্রান্ত পরিবার ছিলেন, ইংরেজ বড়লোকের সঙ্গে যাতায়াত ছিল।...একদিন বম্বের লাটসাহেব *Sir Bartle Frere* ওঁদের এখানে এসেছেন আর প্রথম দেশী সিবিলিয়ানের স্ত্রী বলে ওঁরা আমাকে তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি ভদ্রতা করে আমার সঙ্গে অনেক কথা বললেন, কিন্তু আমার তখন যা ইংরাজী বিদ্যার দৌড়, তাঁর এক কথাও বুঝতে পারলুম না। পরে তিনি চলে গেলে উনি আমাকে খুব বকলেন যে, লাটসাহেব তোমার সঙ্গে অত কথা বললেন আর তুমি একটিও উত্তর দিলে না? আমি তাঁকে আর কি বলব। তিনি ভেবেছিলেন হেমেন্দ্র বুঝি আমাকে তৈরী করে রেখেছেন। কিন্তু আমি যে কেবল দুতিন অক্ষর বানান করে পড়তে পারি তা তো জানেন না। বকুনি খেযে আমি ঘরে গিয়ে কাঁদতে লাগলুম, তখন সিরীনবাই এসে আমাকে সান্ত্বনা দিলেন।"[২৭৬]

সত্যেন্দ্রনাথ জ্ঞানদানন্দিনীকে ইংল্যান্ড থেকে, বা আহমেদাবাদ বা বোম্বে থেকে যে পত্রাবলি লিখেছিলেন তা বঙ্গীয় নারী জাগরণের ইতিহাসে এভাবে এক প্রামাণ্য দলিল হয়ে আছে। সত্যেন্দ্রনাথের মতো উদারমনস্ক পুরুষ ব্যতীত যে জ্ঞানদানন্দিনীর পক্ষে বঙ্গীয় মহিলার আধুনিকায়নের পথিকৃৎ হওয়া সম্ভব হত না তা অনস্বীকার্য। সত্যেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী বহির্জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আলোকময়ী হোন, এভাবে তিনি বিকশিত ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী হোন তাঁর মুক্তি আসুক তাঁর অন্তর থেকে, বহিরাবরণ হিসাবে নয়। ইংল্যান্ডে গিয়ে তিনি স্বাধীন নারীকুল প্রত্যক্ষ করেছিলেন। নারীস্বাধীনতার একটি উল্লেখযোগ্য মুখপত্র, এটিও একজন পুরুষের লেখা, জন স্টুয়ার্ট মিলের *The Subjection of Women* গ্রন্থটি তিনি পড়েছিলেন এবং অনুবাদ করেছিলেন। অবশ্য এ অনুবাদ আদৌ প্রকাশিত হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।[২৭৭] এসব থেকে নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর গভীর বিশ্বাস জন্মেছিল। এই বিশ্বাসকে তিনি মনে-প্রাণে গ্রহণ করে নিজ স্ত্রীকে স্বাধীন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন। স্ত্রীর শিক্ষা, তাঁকে বিলাত পাঠানোর সুপারিশ এসব বিষয়ে তিনি যেভাবে তাঁর পিতা বা কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে (হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর) পত্র লিখেছিলেন তা উনবিংশ শতকের পুরুষদের মধ্যে বিরল।

২৭৫ জ্ঞানদানন্দিনীকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের পত্র, পত্রসংখ্যা ৪৭, ১২ই জুলাই ১৮৬৮, পুরাতনী, পূর্বোক্ত, পৃ: ১০৬।
২৭৬ পুরাতনী, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৯-৩০।
২৭৭ সঙ্কোচের বিহ্বলতা, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৮১।

তাঁর কথায় ও কাজে যে বিশ্বাস তা তিনি নিজ স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে এতটুকু দ্বিধা করেন নি। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার, বিশেষত তাঁর স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের প্রয়াস তাঁর পরিবারে প্রযুক্ত হয়নি। তাঁর সমসাময়িক সমাজসংস্কারক ও ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু কেশবচন্দ্র সেন বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করার জন্য ১৮৭২ সালে বিশেষ বিবাহবিধি বা তিন আইন[২৭৮] প্রচলন করতে ব্রিটিশ সরকারকে বাধ্য করেছিলেন কিন্তু সেই আইন অগ্রাহ্য করে স্বয়ং কেশব তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতিকে বিবাহ দিলেন কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের সঙ্গে, যখন পাত্র ও পাত্রী উভয়েরই ১৮৭২ সালের আইন অনুসারে বিয়ের বয়স হয়নি।[২৭৯] এ নিয়ে কেশবচন্দ্রকে কম দুর্ভোগ পোহাতে হয়নি। এর পরিণতিতে ব্রাহ্মসমাজ দ্বিতীয়বারের জন্য বিভক্ত হয়ে গেল। কেশব বা বিদ্যাসাগরের মত নিবেদিতপ্রাণ সমাজসংস্কারক তাঁদের সংস্কার প্রচেষ্টাকে ব্যক্তিজীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। সত্যেন্দ্রনাথ কোন সমাজসংস্কারক ছিলেন না কিন্তু প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় নারীদের দুর্দশা দেখে ঐ দুরবস্থার নিরসন করার একটি ইচ্ছা তাঁর মধ্যে জেগেছিল আর তিনি এই ইচ্ছাকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য বেছে নিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীকে। তিনি স্ত্রী স্বাধীনতার জন্য কোন আন্দোলনের পথ বেছে নেননি। তাঁর ভাবনাকে তিনি তাঁর পরিবারের পরিসীমার মধ্যে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর নিজের বাল্যবিবাহ তাঁকে পীড়া দিত। কনিষ্ঠভ্রাতা হেমেন্দ্রনাথের বিবাহ তার বিলাত যাবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এই ঘটনা তাঁকে ব্যথিত করেছিল। জ্ঞানদানন্দিনীর শিক্ষার জন্য যে ভ্রাতার উপর তিনি নির্ভর করেছিলেন, সেই ভ্রাতা জ্ঞানদানন্দিনীর প্রস্তাবিত বিলাতযাত্রার সঙ্গী হোন—সত্যেন্দ্রনাথের এই ইচ্ছা যখন পূর্ণ হল না তখন আক্ষেপভরে স্ত্রীকে লিখলেন, "হেমেন্দ্র তোমার সঙ্গে আসিতে পারিলে ভাল হইত, কিন্তু আমি যথার্থই দেখিতেছি হেমেন্দ্র তাহার স্ত্রীকে এখন ফেলিয়া রাখিয়া আসিতে পারেন না। তিনি যদি এখন বিবাহ করিলেন, তবে বিবাহের যে সকল কর্ত্তব্য তাহাও তাঁহার সাধন করিতে হইবে।"[২৮০] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাল্যবিবাহেও তিনি ব্যক্তিগতভাবে আপত্তি জানিয়ে পিতা দেবেন্দ্রনাথকে চিঠি দিয়েছিলেন, তার উল্লেখ আমরা জ্ঞানদানন্দিনীকে লেখা চিঠিতে পাই। কিন্তু বিবাহ একবার করলে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্যে যেন কোন ত্রুটি না হয় সে সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ যে সচেতনতা দেখিয়েছেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী পুরুষদের মধ্যে তা একান্তভাবে অনুপস্থিত ছিল। এদিক থেকে বিচার করলেও সত্যেন্দ্রনাথ একজন ব্যতিক্রমী পুরুষ ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একজন প্রবল প্রতাপান্বিত পুরুষ। পরিবারের অভ্যন্তরে তাঁর প্রভাব যেমন ছিল অপরিসীম, পরিবারের বাইরেও তেমন তাঁর পরিচিতি ছিল আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবশালী ও অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে। তিনি মেয়েদের উন্নতির ব্যাপারে যে নিতান্ত

২৭৮ এই আইন অনুসারে বিবাহে কন্যাব নিম্নতম বয়স চোদ্দ ও পাত্রের বয়স আঠারো নির্দিষ্ট হয়।
২৭৯ বিয়ের সময় মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ-এর বয়স ছিল ষোল, আর সুনীতির বয়স ছিল তের।
২৮০ জ্ঞানদানন্দিনীকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের পত্র, পত্রসংখ্যা ৪, পূর্বোক্ত, পুরাতনী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫২।

উদাসীন ছিলেন না, তার প্রমাণ পাওয়া যায় নিজ কন্যাদের স্কুলে পাঠিয়ে লেখাপড়া শেখানোর ঘটনায়। কিন্তু তবুও পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সনাতন পন্থী, সেজন্য তাঁর সামাজিক মনোভাব ছিল রক্ষণশীল একথা বললে খুব ভুল বলা হয় না। এ হেন পিতাকে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে বা স্ত্রীকে বিলাত পাঠানোর অনুমতি প্রার্থনা করে চিঠি লেখা যে কোন বাঙালীর পক্ষে উনবিংশ শতকের পরিপ্রেক্ষিতে অসাধারণ বিষয় বলে গণ্য করা হত। সত্যেন্দ্রনাথ নিঃসঙ্কোচে ও সাহসিকতার সঙ্গে এ কাজ করেছিলেন। তখন তিনি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে উঠতে পারেননি বলে তাঁর ইচ্ছা পূরণ হয়নি। কিন্তু পশ্চিম ভারতের বোম্বাই বা আহমেদাবাদে চাকুরী নিয়ে এসে তিনি আবার প্রচলিত রীতি ও ধারার ব্যত্যয় ঘটিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে কর্মস্থলে স্বাধীনভাবে বসবাস করতে শুরু করেছিলেন। এরপর ছুটি কাটাতে বা চিকিৎসার প্রয়োজনে যখন কলকাতা আসার সুযোগ ঘটত তখনও সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর পরিবারসহ স্বতন্ত্র বাড়ীতে থাকতেন। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে তাঁর সামাজিক অবস্থান ছিল খুব উঁচুতে, তিনি যথেষ্ট আয়ের অধিকারী ছিলেন, তাই বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসা বা সমাজের সমালোচনার তোয়াক্কা না করা—এসব তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য ছিল। কিন্তু এ ধরনের সুযোগ-সুবিধা উনবিংশ শতকের আরো বহু পুরুষেরই ছিল, সত্যেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ট বন্ধু কেশবও যথেষ্ট ধনবান, অভিজাত ও শিক্ষিত ছিলেন। কেশবচন্দ্রও তাঁর রক্ষণশীল পরিবারের বিরোধিতা করেন নি তা নয়, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের মতো অনাবিল ঔদার্য এঁদের কারো মধ্যে দেখা যায়নি। বিদ্যাসাগরের নারীভাবনার বড় উৎস ছিল তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি। কেশবচন্দ্র স্ত্রীজাতির উন্নতির কথা ভেবেছিলেন তাঁর বৃহত্তর ধর্মচিন্তার অঙ্গ হিসাবে। যে ধর্ম অনুসারে ঈশ্বরের কাছে নরনারীর সমানাধিকার, সুতরাং নারীজাতির অবস্থার উন্নতি সাধন কবে তাদের পুরুষের নিকটবর্তী করা প্রয়োজন, যাতে প্রয়োজনীয় ধর্মসংস্কার স্থাপন সম্ভব হয়। কিন্তু অবলাবান্ধব হিসাবে এদের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের কয়েকটি ক্ষেত্রে মৌলিক পার্থক্য ছিল। বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্দ্র উভয়েই পাশ্চাত্য ধারার শিক্ষালাভ করেছিলেন, কিন্তু একই সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহাসিক শিক্ষাও তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন, তাই, স্ত্রীজাতির অবস্থার সংস্কার সাধনে তাঁরা সর্বদা শাস্ত্রের অনুশাসন বা লোকাচারকে অগ্রাহ্য করতে পারেনি। বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রচলন করার জন্য কি পরিশ্রমসাধ্য অনুসন্ধানের পর পরাশর সংহিতা থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদনসূচক শ্লোকটি আবিষ্কার করেছিলেন, সে সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আমরা এও জানি যে কেশবচন্দ্রের সক্রিয় উদ্যোগে বাল্যবিবাহ নিবারক আইন পাশ হয়েছিল। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র *Social Reform Association* নামে এক সভা স্থাপন করেন। এই সভার সভাপতি হিসাবে কেশবচন্দ্র বিবাহের বয়স নির্ধারণ করার জন্য বিভিন্ন চিকিৎসকদের মতামত জানবার উদ্দেশ্যে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল একটি মুদ্রিত সার্কুলার তাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। এই সার্কুলারের উত্তরে, বিভিন্ন চিকিৎসক বিবাহের জন্য মেয়েদের যে সর্বনিম্ন

বয়স ধার্য করে দিয়েছিলেন, তাতে দেখা গেল যে কেউ বলেছেন মেয়েদের ১৪ বছরে, কেউবা মনে করেছেন ১৬ বছরে, আবার কেউ মত দিয়েছেন মেয়েদের ২০ বছরের সপক্ষে।[২৮১] যদিও বেশির ভাগ চিকিৎসক ১৬ বছরটিকেই মেয়েদের বিয়ের পক্ষে সর্বনিম্ন বয়স বলে মনে করেছিলেন, তবুও তখনও জনমত প্রবলভাবে বাল্যবিবাহের অনুকূলে ছিল। তাই লোকবাধা যাতে বেশী না হয় সেজন্য, চিকিৎসকদের প্রদত্ত বয়স থেকে সর্বনিম্ন বয়সটিকে অর্থাৎ ১৪ বছর বয়সই মেয়েদের বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স বলে গণ্য করা হয়। এরপর কেশবচন্দ্র যে আইন প্রবর্তনের জন্য উদ্যোগী হলেন তাতে মেয়েদের বিবাহের নিম্নতম বয়স ধার্য হল চোদ্দ এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে আঠারো বছর। এই বয়ঃসীমা রক্ষা করেই ১৮৭২ সালের তিন আইন বা বিশেষ বিবাহ আইন পাশ করা হয়েছিল। তাই দেখা যাচ্ছে যে কেশবচন্দ্রও লোকাচার পুরোপুরি অগ্রাহ্য করার সাহস পাননি, যদিও তিনি পাশ্চাত্য তথা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুযায়ী বিবাহের বয়স ধার্য করার চেষ্টা করেছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথও তাঁর রক্ষণশীল পিতার তাগিদে ও তত্ত্বাবধানে নিশ্চয়ই ঐতিহ্যিক শিক্ষালাভ করেছিলেন, কিন্তু যখন ইংল্যান্ডে গিয়ে মুক্ত আবহাওয়ায় মেয়েদের সুস্থ সুন্দর জীবনের ছবি প্রত্যক্ষ করলেন, তখন দেশাচার লোকভয় ইত্যাদির কোন তোয়াক্কা না করে নিজের স্ত্রীকে এই মুক্ত জীবনের অধিকারিণী করার জন্য যত্নবান হয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ যখন তাঁকে পারিবারিক রীতি লঙ্ঘন করতে চাওয়ার জন্য তিরস্কার করেছিলেন, তখন সত্যেন্দ্রনাথ স্পষ্টই বিক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন আর তাঁর ক্ষোভ, বিরক্তি, হতাশা গোপন করার কোন চেষ্টা করেননি। সোজাসুজি তিনি তা স্ত্রীর কাছে ব্যক্ত করেছিলেন, তখনো অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন না থাকার জন্য তিনি পিতার নিষেধ মানতে বাধ্য হলেন কিন্তু যেইমাত্র তিনি স্বনির্ভর হলেন সেইমাত্র তিনি সমস্ত পারিবারিক বাধা লঙ্ঘন করে স্ত্রীকে কর্মস্থলে নিয়ে গেলেন। শুধু তাই

২৮১ চিকিৎসক	সর্বনিম্ন বয়স	উপযুক্ত বয়স
ডাঃ চন্দ্রকুমার দে	১৪	—
ডাঃ ডি ই. চার্লস	১৪	—
বাবু নবীনকৃষ্ণ বসু	১৫	১৮
ডাঃ এ. ভি. হোয়াইট	১৫-১৬	—
ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার	১৬	১৮
ডাঃ তমিজ খান বাহাদুর	১৬	—
ডাঃ নর্মান চেভার্স	১৬	—
ডাঃ ডি. বি. স্মিথ	১৬	১৮-১৯
ডাঃ জে এওয়ার্ট	১৬	১৮-১৯
ডাঃ জে. ফেয়ার	১৬	১৮-২০
ডাঃ সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী	১৬	২১
ডাঃ আত্মারাম পাণ্ডুরং	২০	—

সূত্র : Shivnath Sastri, History of Brahmo Samaj, Vol. I, Calcutta 1991, P.-249, গীতশ্রী বন্দনা সেনগুপ্ত, স্পন্দিত অন্তর্লোক, পৃ: ৬২-তে উল্লিখিত।

নয়, স্ত্রীকে অবাধে তিনি লাটসাহেবের পার্টিতে নিজের প্রতিনিধি করে প্রেরণ করতে কুণ্ঠিত হননি। আবার বিলেতে দেশটা জ্ঞানদানন্দিনীর দেখা দরকার বলে তাঁকে একলা তিন ছেলেমেয়েসহ ইংল্যান্ডে পাঠাতে সাহসী হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্দ্রের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে তাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রভাবিত হয়ে স্ত্রীজাতির অবস্থার সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন, কিন্তু এই সংস্কারকার্য বাস্তবায়িত করার জন্য তাঁরা দেশাচার, শাস্ত্রীয় অনুমোদন ও জনমতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। হয়তো এই দুজনের স্ত্রীজাতির অবস্থার উন্নতির প্রচেষ্টা সমাজসংস্কার আন্দোলনের অংশ রূপে প্রতিভাত হয়েছিল বলেই তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত মতামতকে সমাজের বৃহত্তর অংশের মতামতের সঙ্গে অভিন্ন বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ যেহেতু কোন বড় ধরনের সমাজ সংস্কার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেননি বা এরকম কোন আন্দোলন গড়ে তোলার অভিপ্রায় তাঁর ছিল না, সেহেতু সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিগত মত, ইচ্ছা, অনিচ্ছা ও ভাবনাকে এত দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকতে পেরেছিলেন। তিনি যেমন পাশ্চাত্য শিক্ষায় আলোকিত ছিলেন, ইংল্যান্ড বাসের সুযোগ তাঁকে পাশ্চাত্য জগতের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে নিয়ে এনেছিল তেমন তাঁর চেতনা দিয়ে যখন তিনি বঙ্গরমণীর সমস্যা বুঝতে চেয়েছিলেন তখন অবিমিশ্রভাবে তিনি তাঁর পাশ্চাত্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন, সেখানে তিনি তাঁর বিশ্বাস বা কাজের অনুমোদন খুঁজতে শাস্ত্র, ঐতিহ্য, লোকাচার বা জনমতের দ্বারস্থ হননি। সত্যেন্দ্রনাথ যা বিশ্বাস করতেন কারো অনুমোদন বা সমর্থন ব্যতিরেকেই তিনি তা কাজে পরিণত করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। কোন কিছুর ভয় বা দ্বিধা তাঁকে নিরস্ত করতে পারেনি। কেশবচন্দ্র বা বিদ্যাসাগর যেমন তাঁদের অর্জিত জ্ঞান ও বাস্তব সামাজিক পরিস্থিতির পার্থক্য ও দ্বন্দ্বে নিরন্তর দীর্ণ হয়েছিলেন, যার জন্য উত্তরপুরুষের কাছে তাঁরা স্ববিরোধী বলে প্রতীয়মান হয়েছেন, সেরকম কোন স্ববিরোধিতা সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে দেখা যায়নি। সত্যেন্দ্রনাথের পৈতৃক পরিবারটি ছিল তৎকালীন সমাজে ধনে, মানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, ঐতিহ্যে ও সংস্কৃতিতে সর্বাগ্রগণ্য ও নেতৃস্থানীয়। সুতরাং, তাঁর মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস থাকা অসম্ভব নয় যে তিনি যদি তাঁর পরিবারের মধ্যে মুক্তির বাতাবরণ তৈরী করতে পারেন তবে তা একদিন সারা দেশ অনুসরণ করবে। কাজেই সত্যেন্দ্রনাথ যতখানি দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন বীরসিংহগ্রামের দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে আসা বিদ্যাসাগরের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। কলুটোলার সেন পরিবার অবশ্য ধনেমানে যথেষ্ট সামাজিক মর্যাদার অধিকারী ছিল, কিন্তু জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার যেমন অবিসংবাদিতভাবে সমাজের চালিকাশক্তি রূপে বৃত হয়েছিল তেমনটি সেন পরিবার ছিল না। এছাড়াও, সত্যেন্দ্রনাথ যেমন ধনী পরিবারের সন্তান তেমনই তিনি নিজেও ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারী আমলা। জীবিকা সূত্রেও তাঁর জীবনে অন্য দুজন অপেক্ষা পাশ্চাত্য প্রভাব আরও অনেক বেশী থাকা স্বাভাবিক ছিল। বিদ্যাসাগর যদিও সরকারী চাকরি গ্রহণ করেছিলেন, তিনি বই লিখে বা প্রকাশনা ব্যবসা করে জীবিকা অর্জন করতেন। এছাড়াও, তাঁর সামাজিক ও পারিবারিক দায়দায়িত্ব ছিল খুব বেশী। ফলে নিজের খেয়ালখুশিতে অর্থব্যয় করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া, পুনরাবৃত্তি

ঘটলেও এখানে আবার বলা দরকার যে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত ভাবনা ও সমাজসংস্কার ভাবনা এক ও অভিন্ন ছিল। অন্যদিকে, কেশব খুব কমদিন চাকরি করেছিলেন। বাল্যে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে তিনি ন্যায্যমতে পারিবারিক সম্পত্তির অংশ পাননি। এর ওপর মিতব্যয়ী না হবার জন্য তাঁর সঙ্গতি ও ব্যয়ের মধ্যে কখনোই সমতা ছিল না। সুতরাং, সামাজিক অবস্থানে ও আর্থিক সঙ্গতিতে সত্যেন্দ্রনাথ অপর দুজনের থেকে অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় ছিলেন। এছাড়া বিশাল যৌথ পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য এবং ঠাকুর পরিবারের রীতি অনুযায়ী অভিভাবকের নজরদারি কোনদিনই সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়নি। ব্যক্তিগত স্বভাবগুণেও সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে সৎসাহস ও স্পষ্টভাষিতা ছিল। সর্বোপরি, বিশাল পরিবারের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন অনেক অনুগামী, যাঁরা তাঁর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে মেয়েদের সম্পর্কে অন্যরকমভাবে ভাবতে শুরু করেছিলেন। কাজেই, সত্যেন্দ্রনাথের নারীভাবনায় যে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য ও সাহসিকতা থাকবে, তাতে আশ্চর্য হবাব কিছু নেই, তবে, সত্যেন্দ্রনাথ শুধু ভাবনাতেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, তাঁর ভাবনাকে তিনি যতদূর সম্ভব কাজে পরিণত করেছিলেন। তাঁর কৃতিত্ব এইখানে যে এই ভাবনা ও কাজে কোথাও কোন অমিল বা বিরোধিতা ছিল না। যথার্থই, ঊনবিংশ শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি একজন ব্যতিক্রমী পুরুষ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জায়া জননী গৃহিণী

পর্দার অন্তরালের রোজনামচা

মুসলমান শাসনের আমল থেকেই হিন্দুদের মধ্যে পর্দাপ্রথা স্থায়ী আসন লাভ করেছিল। উচ্চতর হিন্দুরা কঠোরতার সঙ্গে পর্দাপ্রথা মানতে শুরু করলেন।[১] তাই হিন্দুগৃহের নির্মাণশৈলী এমনই ছিল যাতে পর্দাপ্রথার কোন শৈথিল্য না ঘটে। সাধারণতঃ সদর দরজা থাকত বাড়ীর দক্ষিণদিকে আর উত্তরদিকে অন্দরমহল। ধনীগৃহে সদর থেকে অন্দরে যাবার জন্যে থাকত একটি পর্দাঘেরা যোগাযোগ পথ।[২]

বাড়ীর ঘর এবং বারান্দা আয়তাকারে একটি খোলা উঠানের চারধারে থাকত। বারান্দার উপর থাকতো সমতল ছাদ। বারান্দায় সন্ধ্যেবেলায় হত গল্পসল্প আর গ্রীষ্মের রাত্রিতে ছাদে ঘুমানো চলত। তবে এই বারান্দা যদি বাইরে থেকে দৃশ্যমান হত তবে তা অনেক সময়ই ঘিরে দেওয়া হত।[৩]

মার্গারেট অ্যার্কুহার্টের বর্ণনা অনুযায়ী শহুরে ভদ্রলোকদের বাড়ীতে থাকত দুইটি উঠোন, একটি বাইরের উঠোন ও একটি ভিতরের উঠোন। সামনের বা বাইরের উঠোনটি থাকত বৃহত্তর। গৃহস্বামীর ক্ষমতা অনুযায়ী তা ইট, সিমেন্ট বা মার্বেল দ্বারা নির্মিত হত।[৪]

বাহিরের উঠোনের বিপরীত ছিল ভেতরের উঠান, যা ছিল মেয়েদের জগৎ। সেখানে ছিল আলো-হাওয়ার অভাব, নীচের ঘরে বেশির ভাগ গৃহকর্ম;যেমন—রান্না, ধোয়ামোছা, বাসনমাজা ইত্যাদি সম্পন্ন হত। এই জায়গাটি ছিল বদ্ধ ও অস্বাস্থ্যকর। এই জায়গার অবস্থা ছবির মতো ধরা পড়েছে রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায়—"...অন্দরটা যেন পশমের কাজের উল্টোপিঠ, সেদিকে কোন লজ্জা নেই, শ্রী নেই, সজ্জা নেই। সেদিকে আলো মিটমিট করে জ্বলে, হাওয়া চোরের মতো প্রবেশ করে; উঠানের আবর্জনা নড়তে চায় না, দেয়ালের এবং মেজের সমস্ত কলঙ্ক অক্ষয় হয়ে বিরাজ করে।"[৫]

কলকাতার বাড়ীগুলি হত সাধারণত একতলা। দোতলা হলে সামনের দিকে একতলা ও পেছনের দিকে দোতলা হত। দোতলার খোলামেলা ঘরগুলি শোবার জন্য নির্দিষ্ট থাকত। ছাদ

১ Milly Cattle, *Behind the Purdah :* The Lives and Legends of our Hindu Sisters, Calcutta and Simla, ১৯১৬, পৃ: ২।

২ তদেব, পৃ: ৮।

৩ তদেব।

৪ Margaret Urquhart, *Women of Bengal :* A Study of Hindu Pardanasins of Calcutta, Calcutta, 1925, পৃ: ১৬।

৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্ত্রীর পত্র, রবীন্দ্র রচনাবলী,* সুলভ সংস্করণ, নবম খণ্ড, পৃ: ৩৩১।

যদি ঢাকা থাকত তবে সেখানে মেয়েরা গল্পগুজব করতে পারত, সেখানকার রোদ ও হাওয়ায় ভিজা চুল ও অন্যান্য জিনিসপত্র শুকানো চলত। তবে ছাদ খোলা থাকলে তা মেয়েদের পক্ষে নিষিদ্ধ হত।

পাঁচিলঘেরা ছাদের কথা রবীন্দ্রনাথও বলেছেন। "বাড়ির ভেতরে পাঁচিলঘেরা ছাদ। মা বসেছেন সন্ধ্যেবেলায় মাদুর পেতে, তাঁর সঙ্গিনীরা চারদিকে ঘিরে বসে গল্প করছে।"[৬] তিনি লক্ষ করেছিলেন যে "বাড়ীর ভিতরের এই ছাদটা ছিল আগাগোড়া মেয়েদের দখলে। ভাঁড়ারের সঙ্গে ছিল তার বোঝাপড়া। ওখানে রোদ পড়ত পুরোপুরি, জারক নেবুকে দিত জারিয়ে। ঐখানে মেয়েরা বসত পিতলের গামলা-ভরা কলাইবাটা নিয়ে। টিপেটিপে টপ্‌টপ্ করে বড়ি দিত চুল শুকোতে শুকোতে, দাসীরা বাসিকাপড় কেচে মেলে দিয়ে যেত রোদ্দুরে।"[৭]

গ্রামের আয়তাকৃতি উঠানের চারদিকে বাড়ীগুলি পরস্পর সংলগ্ন অবস্থায় তৈরী হত। উঠানে বাড়ীর মেয়েরা ও বাচ্চারা খেলাধূলা, আমোদ-আহ্লাদ, গল্পগুজব করত।[৮]

বাঁশ ও মাটি দিয়ে তৈরী গ্রামীণ বাড়ীগুলি ছিল আরামদায়ক ও পরিচ্ছন্ন। ঘেরা উঠোনের চারধারে ঘর তৈরী হত—তার মেঝে ছিল মাটির আর জানালা হত বাঁশের কঞ্চি দিয়ে। উঠোন ছিল আলো-হাওয়ার যাতায়াত পথ। পূর্বদিকে থাকত মাটির উঁচু জায়গা, ঘরের ছাদ বাড়িয়ে বাঁশের খুঁটির উপর তা স্থাপন করা হত। ঐ বাড়তি অংশ ঢাকা দিয়ে তৈরী হত বৈঠকখানা। এর ফলে ঘরের ভেতরটা ঠাণ্ডা থাকত। গ্রীষ্মের দিনে প্রখর দিবালোক ঘরে ঢুকতে পারত না। পশ্চিমদিকে থাকতো শোবার ঘর।[৯] অর্থাৎ এখানেও সদর ও অন্দরের পার্থক্য সুস্পষ্ট রাখা হত।

এই বর্ণনা মিলে যায় "গোবিন্দ সামন্তে"র গৃহের সাথে। বাড়ীতে ঢুকতে হয় পূর্বদিক মুখ করে। আমকাঠের ছোট সদর দরজার পরই উঠোন, যার অপরপ্রান্তে বড়ঘর, যা গোবিন্দ সামন্তের পিতা বদন সামন্তের শয়নকক্ষ। এই ঘরের সংলগ্ন বারান্দার চাল কয়েকটি তালের খুঁটির উপর দণ্ডায়মান, বারান্দাটি হচ্ছে বাটীর বৈঠকখানা। বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজন এখানে মাদুর পেতে বসে। উঠোনের দক্ষিণ কোণে একটি ছোট ঘর—বর্তমানে আঁতুরঘর। অন্যান্য সময়ে চাষের সাজ সরঞ্জাম এখানে থাকে। এই ঘরের বারান্দায় ঢেঁকি পাতা রয়েছে। এই ঘরের সমকোণে আরেকটি ভালো ঘর, যা বদন সামন্তের ছোটভাই গয়ারামের শোবারঘর। এই ঘরের বারান্দায় হয় রান্না। বাড়ীর উত্তরদিকে রয়েছে গোয়ালঘর। বাড়ীর পূর্বদিকে খিড়কি পুকুর, স্নান ও অন্যান্য কাজ এখানেই সম্পন্ন হয়। উঠোনের মাঝখানে গোয়ালঘরের কাছে আছে ধানের মরাই। খিড়কী পুকুরের কাছে আছে অগভীর ছাইকুণ্ড, যেখানে বাড়ীর জঞ্জাল জমা হয়ে কৃষিসার তৈরী করে।[১০]

---

৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছেলেবেলা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, পৃ: ৭২৪।

৭ তদেব।

৮ *Milly Cattle*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৮।

৯ *Margaret Urquhart* পূর্বোক্ত, পৃ: ১৩-১৪।

১০ লালবিহারী দে, *গোবিন্দ সামন্ত*, মনীষা সংস্করণ, আশ্বিন, ১৩৭৪ (১৯৬৭), পৃ: ২০-২২।

যদিও এই গৃহ মূলত একটি কৃষক পরিবারের তবুও গ্রামাঞ্চলে বাড়ী সাধারণত এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বানানো হত। শুধু তাই নয়, গ্রামে যদি ইটের বাড়ীও বানানো হত তাহলেও তার কাঠামো এই রকমই হত।[১১]

শহর ও গ্রাম উভয় স্থানেই বাঙ্গালীগৃহে আসবাবপত্রের বাহুল্য ছিল না বললেই চলে। পাতলা তোষক ও সাদা চাদর, হেলান দেবার জন্য বালিশ এই ছিল যথেষ্ট। মহিলাদের ঘর ছিল আরও নিরাভরণ। সেখানে গুটিয়ে রাখা মাদুর বিছিয়ে দেওয়া হত অভ্যাগতদের জন্য। মহিলারা নিজেরা বসতেন মাটির ওপরে। স্যাঁতসেতে মেঝে থাকলে বসার জন্য ব্যবহৃত হত পিঁড়ি এবং তক্তপোষ, শেষেরটিতে শয়নও চলত। দিনের বেলা বালিশ ও মাদুর গুটিয়ে একপাশে রেখে দেওয়া হত।[১২] এই পর্যবেক্ষণে যে ভুল বা অতিরঞ্জন নেই, তা বোঝা যাবে যখন দেখা যাবে যে বদন সামন্তর "ঘরে কোন খাট নেই, মেঝেয় মাদুর ও তোষক বিছিয়ে বদন অকাতরে নিদ্রাসুখ অনুভব করে।[১৩] শহরে মধ্যবিত্ত পরিবারের এক সমস্যার স্বীকৃতি— "আমাদের শোবার ঘরে না ছিল একটা খাট, না ছিল একটা আলমারি।"[১৪] গ্রামের অবস্থাপন্ন ঘরে মেয়েদের শোবার ব্যবস্থা ছিল এরকম — "অবিশ্যি বিছানা আর কি, ঘরজোড়া একখানা শতরঞ্চির উপর বড় বড় মোটা মোটা খানকয়েক কাঁথা পাতা, আর তারই মাথার দিকে দেয়ালজোড়া টানা লম্বা মাথার বালিশ।"[১৫]

সকালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে স্মরণ করে মহিলারা শয্যাত্যাগ করতেন। প্রসন্নময়ী দেবী সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে "প্রভাত হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত যাহাই করিনা কেন সকল কার্য্যেই ভগবানকে স্মরণ করিতে হইত। প্রভাতে জীবন আরম্ভ এবং নিশীথে কার্য্য শেষ তাঁহার নামেই করিবার নিয়ম ছিল।"[১৬] আরেক জনের জবানিতে শোনা যাচ্ছে যে "গিন্নিরা কি শীত কি গ্রীষ্ম, রাত চারটেয় উঠে চৌবাচ্চায় বাসি জলে স্নান করে চুলে ঝুঁটি বেঁধে, তুলসীগাছে জল দিয়ে ঠাকুরঘরে একটা পেন্নাম সেরে রান্নাঘরে আসতেন। তখন ভোর পাঁচটা বাজত, বেরোতেন আন্দাজ দুটো, তারপর ঠাকুরঘরের পালা সাঙ্গ করে বেলা আড়াইটে তিনটের আগে তাঁদের ভাত খাওয়া ঘটত না।[১৭] কল্যাণীকে সমর্থন করে প্রসন্নময়ীও বলেছেন "আড়াই প্রহর বেলা পর্যন্ত আমাদের কোন খোঁজ তল্লাস থাকিত না, তখন গৃহিণীরা ও বধূগণ দৈনিক গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন।"[১৮]

১১ *Margaret Urquhart*, পূর্বোক্ত, পৃ· ১৫ এখানে উল্লেখ্য, *Urquhart* নিজেও "গোবিন্দ সামন্ত" উল্লেখ করেছেন।

১২ *Margaret Urquhart*, পূর্বোক্ত, পৃ: ২০-২১।

১৩ *"গোবিন্দ সামন্ত"*, পূর্বোক্ত, পৃ: ২১।

১৪ *কল্যাণী দত্ত*, *থোর বড়ি খাড়া*, থীমা, কলিকাতা ২৬, ১৯৯২, পৃ: ২৭।

১৫ আশাপূর্ণা দেবী, *প্রথম প্রতিশ্রুতি*, মিত্র ঘোষ, কলিকাতা-৭৩, ১৯শ মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৩৮৭, পৃ: ১২৪।

১৬ প্রসন্নময়ী দেবী, পূর্বকথা, "তারাবাস" ২রা জানুয়ারী, ১৯১৭, পৃঃ ১৫৭।

১৭ *থোড় বড়ি খাড়া*, পূর্বোক্ত পৃ: ২১।

১৮ *পূর্বকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ: *১৮৯।*

গৃহদেবতার পূজা হিন্দুগৃহের দৈনিন্দন কাজে ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রতি বাড়ীতে দেওয়ালে গাঁথা কুলুঙ্গীতে থাকত পূজার বেদী, যেখানে পিতল অথবা পাথরের তৈরী গৃহদেবতা থাকতেন। অপেক্ষাকৃত ধনবানদের মধ্যে ঠাকুরঘর আলাদা থাকত।[১৯] শুধু ধনীগৃহেই নয় মধ্যবিত্ত পরিবারেও ঠাকুরঘর আলাদা করার চেষ্টা হত। ছাদের চিলেকোঠায়, দোতলায় ঘেরা দালানে, নইলে ভাঁড়ার ঘরেরই অনেক উঁচু তাকে কয়েকখানি ঠাকুরের পট রাখা হত।[২০]

পরিষ্কারভাবে চয়ন করা অনাঘ্রাত ফুল দিয়ে দেবতার পূজা করা হত। "আমরা রাত্রি প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়াই রাত্রিবাস ছোট ধুতি শাড়ী ছাড়িয়া পরিশুদ্ধ ধৌত বস্ত্র পরিয়া ঠাকুরপূজার ফুল দূর্বা আনিবার জন্যে সাজি হাতে বাগানে ভ্রমণ করিয়া তাহা আনিতাম।"[২১] অবশ্য কলকাতায় ফুল তোলার এত অবকাশ ও সুযোগ ছিল না। "মালি দিয়ে যেত রোজ দুপয়সার লাল সাদা ফুল। বেস্পতিবারে মোড়কের সঙ্গে 'বাড়তি আমের ডাল' আর মা লক্ষ্মীর জবা ফুলও দিত। গিন্নিরা এই ফুল বেলপাতা ঠাকুরকে নিজেরাই নিবেদন করে দিতেন।[২২] খুব বড় ঘটি করে গঙ্গাজল, লাল ও সাদা দুরকম চন্দন পিঁড়ি ও কাঠ থাকত। বোয়মে থাকত বাতাসা। বাসিকাপড়ে ঐ ঘরে ঢোকা চলত না। ছোট মেয়েরা চন্দন ঘষে ত্রিপত্র বেলপাতা ধুয়ে দূর্বার অঙ্কুর বেছে অর্ঘ্যের আলোচাল ভিজিয়ে রাখত। রান্না সেরে সাদা কাপড় বদলে মটকা পরে গিন্নিরা পুজো করতে আসতেন।[২৩]

সকালে স্নান সেরে ও গৃহদেবতাকে জল দিয়ে বাড়ীর মেয়েরা ও বৌরা তরিতরকারী কাটতে বসতেন। বিভিন্ন রকম ব্যঞ্জনের জন্য মাপ করে তরিতরকারী কাটা হত। চাল, ডাল, অন্যান্য মশলা মাপ করে বার করা হত। হিন্দু মহিলারা ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে অত্যন্ত মিতব্যয়ী হতেন।[২৪] কুটনো কোটার খুব আদর ছিল অন্দরমহলে। ধারাল বঁটিতে যে রকম সরু সরু করে আলুভাজা কাটা হত তা আজকালকার সব যন্ত্রকেও হার মানিয়ে দিত। থোড়, মোচা, ডুমুর, কাঁচাকলা. এঁচোড় — এসব হাতে দাগ না লাগিয়ে কাটাতেই ছিল বাহাদুরি। এক হাতে ধরে গোটা বাঁধাকপি তাঁরা জিরে জিরে করে চোখের পলকে কুচিয়ে ফেলতেন। এক আলুই কত রকমভাবে কাটা হত— ঝোলের, ডালনার, চচ্চড়ির, শুক্তনির, ভাজার—সব আলাদাভাবে কাটা হত।[২৫]

মেয়েরা যত্ন করে পরিবেশন করে আগে পুরুষদের খাওয়াতেন।[২৬] এই পরিবেশন করা মেয়েদের বিশেষভাবে শিখতে হত। প্রসন্নময়ী তাঁর স্মৃতিকথায় জানাচ্ছেন, "স্নানান্তে আমরা

১৯ Milly Cattle, পূর্বোক্ত পৃ: ১৪।
২০ *থোড় বড়ি খাড়া,* পূর্বোক্ত, পৃ: ২৭।
২১ *পূর্বকথা,* পূর্বোক্ত, পৃ: ১৪৮।
২২ *থোড় বড়ি খাড়া,* পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৪।
২৩ তদেব।
২৪ *Milly Cattle,* পূর্বোক্ত, পৃ: ২৮।
২৫ *থোড় বড়ি খাড়া,* পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৩।
২৬ *Milly Cattle,* পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৩।

মেয়েরা জলযোগের আযোজন করিতে চণ্ডীমণ্ডপে যাইতাম। কেহ ফল কাটিতাম, কেহ রেকাবী সাজাইতাম কেহ বা ভৃত্যগণকে চিঁড়াগুড় ভাগ করিয়া দিতাম।"[২৭] মধ্যাহ্নেও ছোট মেয়েদের পরিবেশন করতে হত। এ কাজে তাবা হাত পাকাত ভৃত্যদের পরিবেশন করে। ছোট ছোট থালায় অন্ন ব্যঞ্জন নিয়ে তাদের পরিবেশন করা হত। "কাজটি ছিল শ্রমসাধ্য ও বিবেচনাসাপেক্ষ" কারণ বেশী কম হলে "অনর্থ বাধিয়া যায়।"[২৮]

খেতে দেওয়ার পালা প্রায় সারাদিন ধরেই চলত। বেলা আটটা না বাজতে অফিসের বাবুদের ভাতের তাড়া লাগত। এরপরে ছিল ইস্কুল কলেজের পড়ুয়াদের পালা। তারপর বাড়ীর লোকরা—পর্যায়ক্রমে কুচোকাচা, রুগি, বুড়োরা—এদের মর্জিমাফিক খাইয়ে বেলা আড়াইটা আন্দাজ গিন্নিরা খেতে বসতেন।[২৯] তবে যে সব বাড়ীর কর্তারা আপিসে বা অন্য কাজে সকালে বেরোতেন না, তাঁরা দুপুরেই বাড়ীতে খেতেন, বড় ছেলেরা কর্তাদের সঙ্গে বসেই খেত আর একই সময়ে বাড়ীর ছোট ছেলে বা মেয়েদের আলাদা করে দিদি, পিসি বা মা খাইয়ে দিতেন।[৩০]

ধনীগৃহে রান্নার জন্য পুরুষ ব্রাহ্মণ রাখা হত। তাকে ঠাকুর বলে ডাকা হত। ঠাকুর কেবল রান্না করত, বাড়ীর মেয়েরা তাকে সমস্ত কিছু কেটে বেটে তৈরী করে দিত। রান্নাঘরে ঠাকুরকে সাহায্য করার জন্য থাকত একজন ঝি। সে ঠাকুরকে হাতে হাতে বাসনপত্র ও মশলা যোগাত।[৩১] তবে প্রসন্নময়ী দেবীর সাক্ষ্য এ প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি বলেছেন যে তাঁদের গ্রামে ভাঁড়ার থাকত বাইরে গোলায়। সেখান থেকে ভাণ্ডারী এসে সকালবেলা লোক গুনে সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করত। বাড়ীর মেয়েরা তরকারী কুটতেন আর "দাসীরা রন্ধনশালার কার্য্য করিত।" কিন্তু কর্তারা বেতনভোগী ব্রাহ্মণ পাচকের হাতে আহার করতেন না। যত বড় ধনী জমিদার গৃহিণী হোন না কেন তাঁকে স্বামী, পুত্র, আত্মীয় স্বজনের জন্য দুই বেলা রান্না করতে হত। ঠাকুরের ভোগ বিধবারা রাঁধতেন।[৩২]

খাওয়ার মেনু নিয়েও বিভিন্ন রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। কেউ বলেছেন যে সকালে খাওয়া হত ফল ও দুধ। দুপুরে মাছ, তরকারী, ভাত, বিকাল ৫টায় খাওয়া হত ফল বা ছোট ছোট খাবার। রাত্রে সাধারণত রুটি। আবার কলকাতায় জলখাবার হিসেবে ছিল শুকনো খাবারের জনপ্রিয়তা। অতিথি কুটুম ও জামাইদের জন্য নিমকি, সিঙ্গারা, রাধাবল্লভী, মটরশুঁটির ও

২৭ *পূর্বকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৫১।

২৮ তদেব, পৃ: ১৫২।

২৯ *থোড় বড়ি খাড়া*. পূর্বোক্ত, পৃ: ২১-২২।

৩০ *Milly Cattle*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৩।

৩১ তদেব, পৃ: ৩৫

৩২ *পূর্বকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৪৯-৫০।

হিঙের কচুরী, পরোটা, ডালপুরী, ছাতু পুরি, ছোলাচিঁড়ে এসব থাকলেও লুচির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এরা কেউই দাঁড়াতে পারত না। লুচি ছাড়া সকালের জলখাবার দুপুরের ভাত কি রাতের খাবার কোনটাই সম্পূর্ণ হত না।[৩৩]

অন্দরমহলের প্রধানা হতেন একজন গিন্নী। কখনো বুড়ী ঠাকুরমা, পিসিমা বা মাসীমা বা আরো কোন দূর সম্পর্কের আত্মীয়া গৃহকর্মের দেখাশোনা করতেন।[৩৪] প্রসন্নময়ী দেবী বলেছেন তাঁরা ছিলেন একান্নবর্তী পরিবার। "খুল্লতাত ও জ্যেষ্ঠতাতদিগের" ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁরা একসঙ্গে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। পিসিমা, জ্যেঠিমারাই গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন। তাঁদের বুদ্ধিবিবেচনা ছিল সমগ্র পরিবারের সুখ-দুঃখের উৎস। প্রসন্নময়ীর মা ও কাকিমারাও তাঁদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে পারিবারিক সব কাজে যোগ দিতেন, তবে পেছন থেকে গুরুজনের আজ্ঞা পালন করাই ছিল তাঁদের প্রধান কাজ।[৩৫] এই ভাষ্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে বাড়ীতে একাধিক গিন্নী থাকতেন। "প্রথম প্রতিশ্রুতি" উপন্যাসে দেখা যায় যে রামকালী চাটুয্যের অন্দরমহল থাকত একাধিক গিন্নীর তত্ত্বাবধানে। ব্যক্তিত্ব ও ক্ষমতা অনুযায়ী গিন্নীরা গুরুত্ব লাভ করতেন। তবে বৌদের শাসনে রাখতে সকলেই ছিলেন সমান।[৩৬]

গিন্নীদের উপর ভার থাকত প্রাচীন রীতিনীতি এবং কুসংস্কার বজায় রাখার। নতুন কিছু শুরু করার প্রতিবন্ধকতাও এঁরাই করতেন। প্রথম প্রতিশ্রুতির পাতায় পাতায় এধরনের উদাহরণ ও ঘটনা ছড়িয়ে আছে।[৩৭] তাঁরা বয়স্ক হওয়ার দরুন কাজ করতেন না ঠিকই কিন্তু বিবাহ ও জন্ম-মৃত্যুকালীন নিয়মকানুন বা অন্যান্য আচার নিয়মের এঁরা ছিলেন জীবন্ত বিশ্বকোষ। ছোট ছোট মেয়েদের মহাকাব্য ও পুরাণের কাহিনী শুনিয়ে কর্তব্য-অকর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন এঁরাই। রূপকথার গল্প বলে ছোটদের মনোরঞ্জন করা বা ভালর জয় ও মন্দের পরাজয় শেখানো এঁদের অন্যতম দায়িত্ব ছিল। প্রথম প্রতিশ্রুতির গিন্নীরা যদিও লেখাপড়া করার জন্য সত্যবতীকে প্রতি পদে পদে তিরস্কার ও তাঁর বাবা মাকে কটূক্তি করতেন,[৩৮] মিলি ক্যাট্‌লের বিবরণীতে গিন্নীরাই ভার নিতেন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার। মেয়েরা কেবলমাত্র লিখতে পড়তে শিখত। কারণ চিঠিপত্র লেখা, সামান্য হিসাবপত্র রাখাই মেয়েদের পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করা হত।[৩৯]

'থোড় বড়ি খাড়া'র মেয়েদের জন্য অবশ্য একজন বুড়ো মাষ্টারমশাই থাকতেন। তিনি একটু একটু করে পড়াতেন 'সীতার বনবাস' আর 'মেঘনাদবধ'। সকালবেলাতে এই পড়াশোনার

৩৩ *থোড় বড়ি খাড়া*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৪।
৩৪ *Milly Cattle*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৬-৩৭।
৩৫ পূর্বকথা, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৪৮।
৩৬ *প্রথম প্রতিশ্রুতি*, পূর্বোক্ত, *যত্রযত্র*।
৩৭ *তদেব*, যত্রতত্র।
৩৮ *তদেব*, যত্রযত্র।
৩৯ *Milly Cattle*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৬ ৩৭।

পালা হত। বিয়ের জন্য এই একটু আধটু পড়ানোর চলন ছিল। তাই বই শেষ হতে না হতে ঘটকি এসে মেয়ে পছন্দ করত। এই বিয়ের জন্যই একটু গান শেখানোর চলন ছিল। সন্ধ্যেবেলায় হারমোনিয়াম বাজিয়ে—'তোমারই গেহে পালিছ স্নেহে' বা এই গোছের কিছু। দু-একখানা রামপ্রসাদী গানও শিখে রাখত।[৪০]

দুপুরের খাওয়া দাওয়া সারা হলে বাড়ীর কর্তারা কাজে যেতেন অথবা দিবানিদ্রা যেতেন। মেয়েরা তখন তক্তপোষ বা সতরঞ্চিতে বসে সেলাই করত। মেয়েদের মধ্যে বিশেষভাবে সেলাই শিক্ষার প্রচলন ছিল না। মায়েদের কাছে তারা অল্পসল্প সেলাই-এর ফোঁড় শিখত।[৪১] মার্গারেট আর্কুহার্টও মনে করেন যে বাঙ্গালী মহিলারা কাঁথা সেলাই ছাড়া আর কোন সেলাই জানতেন না। ইউরোপীয় মহিলাদের কাছেই তাঁরা নানারকম সেলাই ও ক্রুশ বোনা শিখেছিলেন। কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত তাঁরা সেলাইকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেননি।[৪২] তবে এ কথা সমর্থন করা যায় না। কারণ বাঙ্গালী মহিলাদের কাঁথা সেলাই সুনিশ্চিতভাবে একটি শিল্প ছিল। প্রাচীনকালের কাঁথার নিদর্শন তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে।

এই বিশ্রামের সময় মেয়েদের হাত ও মুখ দুইই চলত। বয়স্কারা যেমন গল্পগাছা করতেন, তেমন রামায়ণ, মহাভারত, লক্ষ্মীপুরাণ বা ভগবদগীতা প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা হত।[৪৩] থোড় বড়ি খাড়ার গিন্নীরাও খাওয়া দাওয়ার পাট শেষ হলে বিশ্রামের জন্য অবেলায় একটু শুতেন, কারো হাতে একটা নভেল, কারো বা হাতে রামায়ণ, মহাভারত।[৪৪]

তবে কল্যাণী দত্ত যে মেয়েদের কথা লিখেছেন তারা কিন্তু নানারকম এমব্রয়ডারি সেলাই জানতেন। তাঁরা সলমা চুমকি জরির টিপ নিজেদের কাপড়ে বসাতেন। এছাড়া কুরুশের লেস্, খুঞ্চিপোষ, চটের ও কার্পেটের আসন, রবিবর্মার ছবি কাপড় পরানো, মিলের শাড়ির পাড় জুড়ে জুড়ে বাক্সের ঢাকা বানানো, কাঁথা সেলাই ইত্যাদি মেয়েরা ঐ দ্বিপ্রাহরিক আসরেই সম্পন্ন করতেন। রঙিন সুতো দিয়ে ফুলপাতার নকশা করে টেবিল-ঢাকা করারও রেওয়াজ ছিল। হাতের কাজ বলতে মেয়েরা আরো করত কাগজের ফুল মালা তৈরী, ঝিনুকের কাজ, পুঁতির কাজ, মাছের আঁশ দিয়ে ছবি আর সাজি তৈরী ইত্যাদি।[৪৫]

কোন বাড়ির মেয়ে বউরা বসত দুপুরে তাস নিয়ে, গ্রাবু, বিন্তি এইসব খেলা হত। কেউ বা বারো ঘুঁটির 'বাঘবন্দী' কিম্বা কড়ি দিয়ে 'গোলকধাম' খেলতেন।[৪৬] অবশ্য রাত্রিতে আহারাদি

৪০ *থোড় বড়ি খাড়া*, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৪।

৪১ ***Milly Cattle***, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪০।

৪২ ***Margaret Urquhart***, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৫।

৪৩ ***Milly Cattle***, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪০।

৪৪ *থোড় বড়ি খাড়া*, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৩-২৪।

৪৫ তদেব, পৃঃ ২৩-২৪।

৪৬ তদেব, পৃঃ ২৪।

সেরেও অনেক সময় মহিলারা তাস খেলতেন। তবে এইসব তাস খেলা ছিল নিছক আনন্দবর্ধন বা মনোরঞ্জনের জন্য। কিন্তু কখনো তাঁরা বাজি রেখে খেলতেন না। নির্দোষ শঠতা ও ঠকানো বেশির ভাগ সময়ই হাসির ব্যাপার ছিল। দৈবাৎ তা রাগারাগি বা কান্নাকাটির কারণ হত।[৪৭]

মেয়েদের অবসরের আরেকটি কাজ ছিল সুপারি কুচানো। পান সাজা হত সকাল বিকেল। কত রকমের দোক্তাজর্দার কৌটোই যে থাকত। আইবুড়ো মেয়েদের ওপর থাকত পান সাজার ভার। মায়েরা বলতেন, চুন খয়েরের আন্দাজ থেকেই রান্নার হাত খোলে।[৪৮]

এই তাস খেলা, পান সাজা, বই পড়া, সেলাই ফোঁড়াই ইত্যাদি নিয়েই চলত দুপুরে মেয়েদের মজলিশ। ন্যাড়া ছাদ, সিঁড়ি, ফালি বা ঝুল বারান্দা, পোড়ো গলি এখানে বসত ছোট মেয়েদের মজলিশ। মাসি পিসি দিদিমারা বসতেন দরদালানে। পাশের বাড়ির গিন্নিরা একে একে জড়ো হয়ে আসর সরগরম করে তুলতেন। পারস্পরিক ঘর গৃহস্থালীর খোঁজ ছাড়াও পাড়ার খবর, ছেলেমেয়ের খবর, কেচ্ছা কেলেঙ্কারী, নিন্দা কিছুই বাদ যেত না। এখানেই বৌ ঝিরা এসে নানা সাংসারিক কর্তব্য ও নিয়মকানুন সম্পর্কে জ্ঞান নিয়ে যেতেন।[৪৯]

গ্রীষ্মের দুপুর অবশ্য নিদ্রাবেশে কাটত। শীতের অপরাহ্ণেও ঝিমুনির আমেজ থাকত। এমনকি ঝি চাকররাও যাতায়াতপথে, বারান্দায় বা ছায়াঢাকা ঘরের কোণে ঘুমাত।[৫০] অপরাহ্ণের নিদ্রাশেষে ছেলে ও মেয়েদের চুল তেল দিয়ে আঁচড়ে বেঁধে দেওয়া হত। চিরুনী ব্যবহার না করে হাত দিয়ে আঁচড়ানোর কাজ করা হত। চুল বাঁধা হত অনেক বিনুনীতে, রঙীন দড়ি দিয়ে বিনুনী করা হত। কখনো কখনো রূপার ট্যাসেল দিয়ে বিনুনীর প্রান্ত বাঁধা হত। চুল বাঁধা নিয়ে মেয়েদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলত।[৫১] চুল বাঁধার কাজটি করতেন পিসি মাসিরা। ঘড়ির কাঁটায় তিনটে বাজলেই সরু মোটা চিরুণী আর বাক্স দড়ি নিয়ে মেয়েরা তাঁদের কাছে হাজির হতেন। মেয়েরা মাথায় মাখতেন আমলা ও নারকেল তেল। অপেক্ষাকৃত শৌখিন মেয়েরা ব্যবহার করতেন জবাকুসুম, কেশরঞ্জন, লক্ষ্মীবিলাস তেল। কচি মেয়েরা বাঁধত বেড়া বেনুনী, কিংবা খেজুর ছড়ি। বড়োরা বাঁধতেন তিন, চার, পাঁচ গুছির বিনুনী করে চ্যাটালো খোঁপা। কলা, মোচা, বৌদান, বৌকন্দী বাগান, পৈঁছে, ফাঁস, সতীন কাঁটা, চুয়াল্লি এরকম অনেক রকম খোঁপা প্রচলিত ছিল।[৫২] বিধবা মহিলারা কেশসজ্জা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তবে তাঁরা নিঃস্বার্থভাবে সধবা ও কুমারী মেয়েদের কেশচর্চায় সাহায্য করতেন। অথচ তাঁরা নিজের চুল কেটে ফেলতেন বা ন্যাড়া করতেন।[৫৩]

৪৭ *Milly Cattle*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৭৫।
৪৮ *থোড় বড়ি খাড়া*, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৪।
৪৯ তদেব, পৃ: ৯০।
৫০ *Milly Cattle*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪১।
৫১ তদেব, পৃঃ ৪।
৫২ *থোড় বড়ি খাড়া*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৯১।
৫৩ *Milly Cattle*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৩।

চুল বাঁধা সাঙ্গ করে গিন্নিরা উঠতেন চারটে নাগাদ। ঝিকে দিয়ে ছাদ থেকে বড়ি আচার আর আমসত্ত্ব নামানোর পর, সেগুলো গুছানো, রোগভোগাদের ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি সেরে গিন্নিরা এঁটো ভাত খাওয়া কাপড় কেচে গা ধুয়ে সন্ধে প্রণাম করে আবার ঢুকতেন রান্না ঘরে। রাত দশটা পর্যন্ত চলত সেখানকার পাট।[৫৪]

মেয়েদের পোশাক ছিল অতি সরল আর সাধারণ। সোনা রূপার জরির সুতা দিয়ে অলংকরণের কাজ থাকত। ঐ জরির সুতা খুলে রেখে আবার তা ব্যবহার করা চলত। ঐ সুতা গলিয়ে যে সোনা আর রূপা পাওযা যেত তা দিয়ে কোন কোন পরিবারে চামচ বানিয়ে রাখা হত।[৫৫]

পরবর্তীকালে জরির সুতার বদলে সুতার লেস পোশাকে ব্যবহৃত হত কারণ তা ধোয়া অনেক সহজ ছিল। ব্যবহারেও সুতীর লেস ছিল হাল্কা ও ঠাণ্ডা। কিন্তু বর্ষীয়সীরা তা পছন্দ করতেন না। কাবণ সুতীর লেস সহজে ছিঁড়ে যেত আর তা পুনরায় ব্যবহারের কোন সুযোগ ছিল না, ছেঁড়া লেস অন্য কোন কাজেও আসত না। তাই মনে করা হত যে সুতীর লেস ছিল ব্যয়সাপেক্ষ।[৫৬]

মেয়েদের পোশাকের মধ্য দিয়েও অবরোধ প্রথার কঠোরতা রক্ষিত হত। "সে কালে এখনকার মত চিকণ কাপড় ছিল না, মোটা মোটা কাপড় ছিল। আমি সেই কাপড় পরিয়া বুক পর্যন্ত ঘোমটা দিয়া ঐ সকল কাজ করিতাম।...সে কাপড়ের মধ্যে হইতে বাহিরে দৃষ্টি হইত না। যেন কলুর বলদের মত দুইটি চক্ষু ঢাকা থাকিত।"[৫৭] ১৮০৯ সালে জন্মগ্রহণ করা পূর্ববঙ্গ অধুনা বাংলাদেশের একটি গ্রামের বালিকা রাসসুন্দরীর বর্ণনায় মেয়েদের দৈনন্দিন জীবনের করুণ অবস্থা ছবির মতো ফুটে উঠেছে।

তবে, কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পোশাকের ধরন ও প্রকৃতি ছিল একদম আলাদা। মার্গারেট আর্কুহার্টের পর্যবেক্ষণ অনুসারে বাঙালী মহিলাদের পোশাক ছিল অত্যন্ত হাল্কা, এতই হাল্কা যে শীত নিবারণের পক্ষে তা অত্যন্ত অপ্রতুল ছিল। অথচ তাদের শীতের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য কোন বাড়তি বস্ত্র ছিল না। ভিজে চুল ও পাতলা সুতীর শাড়ীতে তাদের অবস্থা ছিল বড়ই করুণ।[৫৮]

এই ধরনের অপ্রতুল পোশাক যে কেবল মহিলাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটাত তা নয়, অনেক সময় মহিলাদের জীবনহানিও ঘটত এই অপর্যাপ্ত পোশাকে। রাত্রিবেলা শয়নের সময় পাতলা তুলোর লেপ ছাড়া মেয়েদের শীত নিবারণের জন্য আর কিছুই জুটত না। ফলে ঘরের দরজা

৫৪ থোড় বড়ি খাড়া, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৫।

৫৫ *Milly Cattle*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৯।

৫৬ তদেব, পৃ: ৪০।

৫৭ রাসসুন্দরী দেবী, *আমার জীবন*, কলকাতা ১৩৬৩, বঙ্গাব্দ, পৃ: ২৯।

৫৮ Margaret Urquhart, পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ৯-১০।

জানালা বন্ধ করে আগুন জ্বালিয়ে তারা ঘর গরম রাখত। হাওয়া চলাচলের জন্য কোন চিমনী না থাকার দরুন বদ্ধঘরে মশার উৎপাত হত। এর পরিণতি ছিল ম্যালেরিয়া, আমাশা ও কলেরার মত রোগ। আবার অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যাবার মতো ঘটনাও বিরল ছিল না।[৫৯]

আশ্চর্য এই যে পুরুষরা এ বিষয়ে আদৌ চিন্তিত ছিলেন না। মেয়েদের এহেন অবস্থা তাঁদের কাছে খুবই স্বাভাবিক ছিল। মার্গারেট আর্কুহার্টের কাছে এক বুদ্ধিমান তরুণ আফশোষ করেছিলেন এই বলে এখন বাঙ্গালী মহিলারা আগের চেয়ে অনেক বেশী বস্ত্র ব্যবহার করছে, তারা যদি আবার আগের মত সরল জীবন ও একবস্ত্রে ফিরে যেত।[৬০]

মহিলাদের পোশাকের অপ্রতুলতার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথও। "কোন মেয়ের গায়ে সেমিজ পায়ে জুতো দেখলে সেটাকে বলত মেমসাহেবি, তার মানে, লজ্জা শরমের মাথা খাওয়া।"[৬১] হুবহু একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেল প্রসন্নময়ী দেবীর রচনায়—"কাটা কাপড় পরা (সেমিজ, জ্যাকেট) লেখাপড়া জানা নববধূর আগমনবার্ত্তা গ্রামময় প্রচার হইবামাত্র আবালবৃদ্ধবনিতা সময় অসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। আমি একটা দর্শনীয় পদার্থ হইয়া উঠিলাম। প্রবাসে প্রবাসে থাকার জন্য উচিত প্রকার অবগুণ্ঠনে মুখাবৃত করিতে অসমর্থা কাজে কাজেই 'মেম বৌ' পল্লীমধ্যে প্রচারিত হইয়া আমার ত্রুটির নিমিত্ত পিতামাতার শিক্ষার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ হইতে লাগিল।"[৬২]

সমস্যা হত মেয়েরা যদি কখনো অন্তঃপুর থেকে বাইরে আসতে বাধ্য হতেন। তখন বাঙ্গালী মেয়েদের তদোপযুক্ত পোশাকপরা সম্ভবপর হত না। স্ত্রীকে বিলাত নিয়ে যাবার ইচ্ছা করে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই জ্ঞানদানন্দিনীকে লিখলেন, "তোমার যদি কাপড় পরিবর্তন করিতে হয় তাহাতে অসম্মত হইও না" কারণ "আমাদের স্ত্রীলোকেরা যেরূপ কাপড় পরে তাহা না পরিলে হয়।"[৬৩] সুতরাং আর্কুহার্টের পরিচিত "বুদ্ধিমান তরুণটির মত সকল" বাঙ্গালী পুরুষ ছিলেন না। তাঁদের চোখেও বাঙ্গালী মহিলার পোশাকের অশোভনতা ও অপ্রতুলতা ধরা পড়েছিল।

মেয়েদের যদি বাইরে যেতেই হতো, কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য কিংবা পার্বণী স্নান বা পূজার জন্য তখন চাদর বা ঘোমটা ঢাকা অবস্থায় বন্ধ গাড়ীর মধ্যে করেই তারা যেতে পারত।[৬৪] রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলায় "মেয়েদের বাইরে যাওয়া আসা ছিল দরজা বন্ধ পালকির হাঁপ ধরানো অন্ধকারে, গাড়ী চড়তে ছিল ভারী লজ্জা।"[৬৫] ঘরে যেমন তাদের দরজা

৫৯ তদেব।
৬০ তদেব, পৃ: ১১।
৬১ ছেলেবেলা, পূর্বোক্ত, ৭১৩।
৬২ পূর্বকথা, পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৫।
৬৩ পুরাতনী, পত্রসংখ্যা ৪, তারিখ ১৮.১.১৮৬৪, পৃ: ৫১।
৬৪ *Milly Cattle*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৭৬, ৮০।
৬৫ ছেলেবেলা, পূর্বোক্ত, পৃ: ৭১৩।

বন্ধ, তেমনি বাইরে বেরবার পালকিতেও, বড়মানুষের ঝিবউদের পালকির উপরে আরো একটা ঢাকা চাপা থাকত মোটা ঘেরাটোপের। দেখতে হত যেন চলতি গোরস্থান"।[৬৬] এভাবেই তারা যেত কুটুমবাড়ী। এভাবেই পার্বণের দিনে বন্ধ পালকিসুদ্ধ তাদের গঙ্গায় ডুবিয়ে আনা হত।[৬৭]

অন্দরমহল থেকে বহির্জগতে যাওয়া তখন যে কত কঠিন ছিল, তার প্রমাণ মেলে যখন সত্যেন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর অবরোধ ভেঙে জ্ঞানদানন্দিনীকে নিয়ে বোম্বাইতে কর্মস্থলে গেলেন।[৬৮] এই অসম দুঃসাহসিক কাজের সঙ্গে আরো একটি নতুন মাত্রা যোগ হল যখন সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে বাইরে নিয়ে এলেন কোন আড়াল আবডালের তোয়াক্কা না করে। রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করলেন—"বোম্বাইয়ে প্রথম তাঁর (সত্যেন্দ্রনাথের) কাজে যোগ দিতে যাবার সময় বাইরের লোকেদের অবাক করে দিয়ে তাদের চোখের সামনে দিয়ে বউঠাকরুণকে (জ্ঞানদানন্দিনী) সঙ্গে নিয়ে গেলেন। বাড়ীর বউকে পরিবারের মধ্যে না রেখে দূর বিদেশে নিয়ে যাওয়া এই তো ছিল যথেষ্ট, তার উপরে যাবার পথে ঢাকাঢাকি নেই—এ যে হল বিষম বেদস্তুর। আপন লোকেদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।"[৬৯]

স্বাভাবিকভাবে, মেয়েরা স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষের সংস্পর্শে আসতে পারত না। এমনকি সে পুরুষ যদি একান্ত কিশোর হয় তা-ও। "দুই মহলে বাড়ী তখন ভাগ করা। পুরুষরা থাকে বাইরে, মেয়েরা ভিতর কোঠায়। নবাবি কায়দা তখনো চলে আসছে। মনে আছে দিদি (বর্ণকুমারী দেবী) বেড়াচ্ছিলেন ছাদের উপর নতুন বউকে পাশে নিয়ে,...আমি কাছে যাবার চেষ্টা করতেই এক ধমক। এ পাড়া যে ছেলেদের দাগকাটা গণ্ডির বাইরের।"[৬৯]

কোন তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে বাঙ্গালী মেয়েরা তাদের স্বামীর সঙ্গে কথা বলত না। স্বামীর সঙ্গে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করা ছিল তাদের স্বপ্নেরও অগোচর। যদি স্বামীর মা কিংবা মাতৃস্থানীয় কোন গুরুজন উপস্থিত থাকতেন তবে স্বামীকে উদ্দেশ্য করে কথা বলা ছিল ঘোর অপরাধ। প্রথম প্রতিশ্রুতি উপন্যাসে এর সুন্দর উদারহণ পাওয়া যায়। কন্যা সত্যবতীর বিরুদ্ধে তার পিতা রামকালী চাটুয্যের কাছে নালিশ জানাচ্ছে তাঁর বৃদ্ধা পিসিমা, রামকালী তখন আহারে বসেছেন, স্ত্রী ভুবনেশ্বরী আড়ালে রয়েছেন কারণ পিস্‌শাশুড়ীদের সামনে তিনি স্বামীর খাওয়া দাওয়ার তদারকি করবেন না। এমনকি সামনে পর্যন্ত আসবেন না। কিন্তু তাঁর অদৃশ্য উপস্থিতিকে উদ্দেশ্য করে পিসিশাশুড়ী মোক্ষদা যখন বলেন, "তুমিও তো রামকালীকে একটু বুঝিয়ে বলতে পার বৌমা", তখন ভুবনেশ্বরী লজ্জায় মাথার ঘোমটা আরো একটু টেনে দেন, কারণ তিনি যে স্বামীর সঙ্গে কথা বলেন, এটা উল্লেখ করাটাও যারপরনাই লজ্জাজনক।[৭০]

---

৬৬ তদেব।

৬৭ তদেব।

৬৮ ছেলেবেলা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭২৮।

৬৯ তদেব, পৃঃ ৭২৭।

৭০ আশাপূর্ণা দেবী, *প্রথম প্রতিশ্রুতি*, যত্রতত্র।

যখন পর্দানশিন মহিলা বাইরের কোন পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে বাধ্য হতেন তখন একটি পর্দার আড়ালে তাঁরা থাকতেন। বাড়ীতে উৎসব হলে মহিলারা চিকের আড়ালে বসে তা দেখতেন। থিয়েটারের মতো প্রকাশ্য স্থানে মোটা মশারির জাল আড়াল দেওয়া হত। যদি অসুস্থ অবস্থায় পুরুষ ডাক্তার দেখতে আসতেন তবে তাকে পুরোপুরি ঢেকে দেওয়া হত চাদর দিয়ে, বাইরে থেকে যা দেখার ও বোঝার কাজ সেরে ডাক্তারকে রোগ নির্ণয় করতে হত।[৭১]

কিন্তু এত অবরোধেও মহিলাদের মর্যাদা রক্ষা করা সর্বদা সম্ভব হত না। অনুমান করা যায় যে এত কড়াকড়ি ছিল বলেই বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরোর এই তত্ত্বকে সত্যি প্রমাণ করে নানা ধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটত। এরকম একটি অভিজ্ঞতার কথা পাওয়া যায় ঢাকা নিবাসী বালবিধবা বামাসুন্দরীর জীবনীতে। বামাসুন্দরীর জ্বর হওয়াতে এক অতি পরিচিত কবিরাজ তাঁকে দেখতে এসেছিলেন। পরিচিত হওয়ার সুবাদে ঘরে থাকার প্রয়োজন কেউ বোধ করেননি। কবিরাজ এই সুযোগে বামাসুন্দরীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করলে বামাসুন্দরী দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে যান ও পরিজনদের সব কথা খুলে বলেন।[৭২]

পুরুষের লালসাসিক্ত দৃষ্টি থেকে আড়াল করার জন্যই মেয়েদের অবরুদ্ধ রাখা হত কিন্তু সেই অবরোধই কি তাদের সমান্যতম সুযোগেই সেই লালসার শিকার করে তুলত—এ নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন।

নিকটতম পুরুষ আত্মীয় এবং গৃহভৃত্য ছাড়া অপর কোন পুরুষই অন্দরমহলে প্রবেশ করতে পারত না। এ সম্বন্ধে নানা নিয়মকানুন ছিল। প্রসন্নময়ী দেবী লিখেছেন—"সেকালে বৈবাহিক, জামাতা ও শ্যালক প্রভৃতির সম্মুখে বধূগণের বাহির হইবার নিয়ম ছিল না...পরিহাসের সম্পর্ক হইলেও বধূগণ প্রত্যক্ষভাবে কথাবার্তা কহিতেন না। ছোট ছোট দেবর, ননদ, অন্য বালক বালিকা কিংবা বৃদ্ধা দাসীর দ্বারা ঠাট্টা তামাশার উপকরণ প্রেরণ করিতেন। দুইবার যখন কর্ত্তাদিগের সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপুরে তাঁহারা আহার করিতে আসিতেন, তখন ন্যাকড়ার ফুলুরি ও চাউলগুঁড়ির দুধ পাঠাইয়া দিতেন ও জামাতারা ঠকিয়া গেলে খুব একটা হাসি পড়িয়া যাইত। অজ্ঞাতকুলশীলেরা পুরমধ্যে যাইতে পারিতেন না।[৭৩]

অন্দরমহলে যেসব ভৃত্য নিযুক্ত হত তারা এক বিশেষ শ্রেণীভুক্ত ছিল। ঐসব ভৃত্যেরা ছোট থেকেই অন্দরমহলে বড় হয়ে উঠত, এরা অন্দরমহলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে অপরাপর বাড়ীর অন্দরমহলেও এদের প্রবেশাধিকার ছিল। এদের দিয়েই এক বাড়ীর মেয়েরা অন্য বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে পারস্পরিক আদানপ্রদান বজায় রাখত। ঐ ভৃত্য মারা গেলে তার ছেলে আবার ঐ কাজে বহাল হত। নতুবা একটি ছোট ছেলে এনে তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়া হত। বাইরে থেকে পূর্ণবয়স্ক কোন লোককে এনে অন্দরমহলে বহাল করা চলত না।[৭৪]

৭১ Margaret Urquhart, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৪।

৭২ *বামাচরিত* (শ্রদ্ধেয়া বামাসুন্দরীর জীবনচরিত), ঢাকা, শ্রাবণ, ১৩০২, পৃ:

৭৩ পূর্বকথা, পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৫।

৭৪ Milly Cattle, পূর্বোক্ত, পৃ: ৮০।

এই ধরনের গৃহভৃত্যরা সচরাচর একই গৃহে কয়েক পুরুষের অধিবাসী হত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এদেরই তত্ত্বাবধানে থাকত, আর ছেলেরা বাড়ীর বাইরে গেলে এইসব গৃহভৃত্যই এদের সঙ্গী হত।[৭৫]

যৌথ পরিবারের ঝি চাকরদের পরিবারের অঙ্গ হিসাবে দেখা হত। বাড়ীর ছোটদের শাসনের ও সহবৎ শেখানোর ভার অনেকটাই তারা নিজেদের হাতে তুলে নিত। আবার, ছোটদেরও শেখানো হত তাদের যথোচিত মর্যাদা দিতে। "আমরা বুড়া দাস, দাসী, আমলাবর্গকে দাদা, দিদি, কাকা, জ্যেঠা বলিয়া ডাকিতাম, নাম ধরিতাম না, ছোটদের মালের বেটা কিম্বা দাসের বেটা বলিতাম। তাহারা আমাদের আত্মীয়বৎ ছিল"—বলেছেন প্রসন্নময়ী দেবী।[৭৬] কল্যাণী দত্ত আবার এরকম একজন ভৃত্যকে সযত্নে তাঁর বইতে স্থান দিয়েছেন : "আমাদের পরিবারে চল্লিশ বছর ধরে ছিল এমনই একজন। সবাইকার সে "লক্ষ্মণদাদা"। আমাদের নিয়ে বেড়াতে বেরোলেই নিজের পয়সায় খেলনা, পুতুল, বাঁশি, খাবারদাবার কিনে দিত। ছুটিতে দেশে গেলে ফেরার সময় দেশ থেকে প্যাঁড়া, খাজা, ও আরো কত মেঠাই আনত। তাছাড়া বিচি ছাড়ানো তেঁতুল, গাছের ফল, বাড়ির তৈরি আমচুর এইসব কত কী আনত। একবার সে মধুপুরের লোহার খেলনা এত এনেছিল যে তারই দু-চারটে পঞ্চাশ বছর পরেও বাড়িতে থেকে গিয়েছিল।[৭৭] শ্রীমতী দত্ত চাকরানীর কথাও বলে গেছেন—"আমাদের পুরানো ঝি গিরিবালা এক গা গয়না পরে বাসন মাজত, বাটনা বাটত আর কথায় কথায় ছড়া কাটত। মেয়ে বউদের ডেকে কাজও শেখাত—কত কাজ যে সে শিখিয়ে গেছে।"[৭৮]

রান্নাবান্না, ঠাকুরপূজা, দাসী চাকর পরিবৃত অন্দরমহলে অন্তরীণ মেয়েরা কেমন থাকত? কেমন ছিল তাদের চিন্তাভাবনা মনোজগৎ?

বাঙ্গালী অন্দরমহল সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা বলেছিলেন, অন্দরমহলের প্রায়ান্ধকার কক্ষে ক্বচিৎ মেয়েদের চকিত সাক্ষাৎ যেন মঠের বিরল ফুল দেখার মত সৌভাগ্য। এই নৈঃশব্দ ও ছায়া হল প্রাচ্যের স্ত্রীজাতির জীবন ও আদর্শ।[৭৯] মার্গারেট আর্কুহার্ট নিবেদিতার এই পর্যবেক্ষণ তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করে মন্তব্য করেছেন যে নিবেদিতা সবকিছু দেখেছেন গোলাপী চশমার আড়াল থেকে।[৮০] বাঙ্গালী রমণীদের গুণাবলী নিশ্চয়ই ফুলের মত কিন্তু তাদের অসহনীয় অবস্থার আদর্শায়ন কোনভাবেই বাঞ্ছনীয় নয়। একজন উৎসাহী গণস্বাস্থ্য অধিকর্তার অভিমত বরং বাস্তবসম্মত—যদিও শহরে মৃত্যুহার কমেছে তবুও মহিলাদের মধ্যে তা এখনও চল্লিশ শতাংশের উর্ধ্বে। এই মৃত্যুহারের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দায়ী ছিল অন্দরমহলের অস্বাস্থ্যকর

---

৭৫ Margaret Urquhart, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৫।

৭৬ পূর্বকথা, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৫১।

৭৭ থোড় বড়ি খাড়া, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৫।

৭৮ তদেব।

৭৯ Margaret Urquhart, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৯।

৮০ তদেব।

পরিবেশ। মৃত্যুর কারণ হত যক্ষ্মা, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি রোগ যাদের উৎস অপর্যাপ্ত আলো বাতাস। এই তথ্য দিয়ে ঐ অফিসারটি মন্তব্য করেছেন যে জেনানা মহল ছিল বাঙ্গালী বাড়ীর সবচেয়ে অস্বাস্থ্যকর জায়গা। মেয়েদের মহলে মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পর্দারক্ষা করা, এর ফলে পর্যাপ্ত আলো আর হাওয়া প্রবেশের পথ রক্ষা করা হয়ে পড়ে গৌণ।[৮১]

এইরকম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থেকে মেয়েদের মধ্যে এরকম একটা ভোঁতা ভাব গড়ে উঠত যে কোন রকম পরিবর্তনের কথা তারা ভাবতে পারত না।[৮২] মেয়েরা নিজেরাও অবশ্য তাদের অবস্থার কথা এরকম ভাবেই ভাবত। কৈলাসবাসিনী দেবী লিখেছেন যে অন্তঃপুরচারিণী মেয়েদের অবস্থা পশুর চেয়ে কিছুমাত্র ভাল ছিল না। কেবলমাত্র পুরুষরাই নয়, তারাও নিজেদের এর থেকে ভাল কিছু ভাবতে পারত না। "বিশ্বশোভা" কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গপত্রে তিনি লিখেছেন—

"অবোধ পশুর সম ছিল মম রীতি।
অনেক যতনে সদা শিখাইছ নীতি।।
সে ধার আমি কি কভু শুধিবারে পারি।
সহজে অক্ষম হই হীনজাতি নারী।।[৮৩]

শুধু এই নয় কৈলাসবাসিনী কেবলই নিজেকে কুয়োর ব্যাঙের সঙ্গে তুলনা করেছেন—

"হইয়ে কূপমণ্ডুক
ইচ্ছা হতে ফণিভূক
কদাচ তাহার যোগ্য নয়।[৮৪]

কিম্বা "অজ্ঞানান্ধ কূপে ভেকের স্বরূপে যাবজ্জীবন যায় হে।"[৮৫]

পর্দাপ্রথা হিন্দু মহিলাদের সমস্ত শক্তির উৎসে পাথরচাপা দিয়ে রেখেছিল। তার কোন শিক্ষার প্রয়োজন ছিল না।[৮৬] কৈলাসবাসিনী সখেদে বলেছেন—"জন্মেছি মহিলাকুলে কিছু নাহি জ্ঞান... ... গো অপেক্ষা হীন হয়ে চাহি তব জ্ঞান।"[৮৭] মেয়েদের কর্তব্য ছিল মাত্র দুটি। এক পুরুষের প্রয়োজন ও চাহিদা মেটানো আর দুই সন্তানপালন।[৮৮] তাদের অসহায় আকৃতি শক্তিশালী শিকলের রূপ ধরে কঠিন বাঁধনে বন্দী থাকত। কিন্তু তবুও তাদের অন্তরের গুণাবলী

---

৮১ তদেব।

৮২ তদেব, পৃ: ২২।

৮৩ কৈলাসবাসিনী দেবী, বিশ্বশোভা, কলিকাতা, ১৮৬৯ সন, পৃ: উৎসর্গ পত্র।

৮৪ তদেব, পৃ: ১।

৮৫ তদেব, পৃ: ৪।

৮৬ Milly Cattle, পূর্বোক্ত, পৃ: ৭।

৮৭ বিশ্বশোভা, পূর্বোক্ত, পৃ: ১০।

৮৮ Milly Cattle, পূর্বোক্ত, পৃ: ৭।

চাপা থাকত না। তারা হত অত্যন্ত স্নেহশীল। বিকালে যখন কাজের ভার হাল্কা থাকত, তখন মেয়েরা নিজেদের মধ্যে হাসি, ঠাট্টা, গল্প ও রসিকতা করত। তখন বোঝা যেত যে তারা কি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, রসবোধ ও তাৎক্ষণিক বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন।[৮৯]

পর্দাপ্রথার কড়াকড়ি ছিল উচ্চবর্ণের মধ্যেই। নিম্নবর্ণের মধ্যে পর্দাপ্রথা প্রচলিত ছিল না। কারণ, মেয়েদের মধ্যে পারস্পরিক আদানপ্রদানের দায়িত্ব ছিল বাড়ীর কাজের মেয়েদের। কিন্তু আশ্চর্য এই যে যখন কোনও নিম্নবর্ণের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি ধনবান হয়ে উঠত, তখন সামাজিক মর্যাদা লাভ করার উদ্দেশ্যে তারাও পর্দা মানতে আরম্ভ করত।[৯০]

---

৮৯ Milly Cattle, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৩।

৯০ তদেব, পৃ: ৭৮।

বাঙালী গৃহিণীর উপাখ্যান

যে কোন বাঙ্গালী বাড়ীতে গৃহিণী হলেন অন্দরমহলের প্রধানা। চলিত কথায় গিন্নীমা তাঁর নিজের পরিবার তো বটেই এমনকি অনেক সময় গোটা পাড়ার মাতৃস্থানীয়া হয়ে ওঠেন। তখন তিনি কেবলমাত্র নিজের সন্তানদেরই নন, পুত্রবধূ, জামাতা এমনকি ভৃত্য ও পরিজনবর্গ সকলের মা। এতদিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন বড়দের আজ্ঞাবহ কিন্তু এখন তাকেই সকলে মান্য ও শ্রদ্ধা করে। এমনকি বাড়ীর পুরুষরাও।[৯১] বাঙ্গালী পরিবারে গিন্নীমা একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তাঁকে অনায়াসে একটি প্রতীক বলে গণ্য করা যেতে পারে। প্রতীকটি এইরকম — তার বয়স ৪৫ থেকে ৫৫ বছর বয়সের মধ্যে, পৃথুলা, লালপেড়ে সাদা শাড়ী পরা, তাঁর সিঁথিতে ও কপালে সিঁদুর, ঠোঁট তাম্বুলরসে রঞ্জিত। তাঁর আঁচলে রান্না, ভাঁড়ার ও খাবার ঘরের চাবি। যা তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পরিচয় বহন করছে।[৯২]

প্রসন্নময়ী দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় জেঠিমা কুলদাসুন্দরীর যে চিত্র এঁকেছেন তা এই রূপকল্পের সঙ্গে অনেকটাই মেলে। তিনি "গ্রামের ভিতর সর্ব্বাংশে পূর্ণমাত্রায় গৃহিণী ছিলেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতার গুণে গ্রামান্তর হইতে ভদ্রলোক আসিয়া বিবাহ ব্যাপারে ভোজ, ফলাহার সামাজিকতায় কত লোকের নিমন্ত্রণে কি কি দ্রব্যের প্রয়োজন এবং কি প্রকারে আয়োজন করিতে হইবে সব জানিয়া যাইত। তিনি রন্ধনে দ্রৌপদী, পাঁচ সাত শত নিমন্ত্রিত ব্যক্তির ভোজ অনায়াসে রন্ধন ও পরিবেশন করতে পারিতেন।"[৯৩] কুলদাসুন্দরী ব্রাহ্মণ ভোজন না করিয়ে জলগ্রহণ করতেন না ও সে দীর্ঘ উপবাসেও তিনি বিন্দুমাত্র কাতর হতেন না। সকলকে খাইয়ে ছিল তাঁর তৃপ্তি। তিনি নিয়মিত পূজা, আহ্নিক ইত্যাদি সম্পন্ন করতেন। তিনি ছিলেন দানশীলা, অনেক অনাথা বিধবাকে তিনি প্রতিপালন করতেন। মুখের ভাগ অপরকে খাইয়ে পরম তৃপ্তি পেতেন। গ্রামে নিরাশ্রয়ের রোগশয্যার পাশে বসে অক্লান্তভাবে সেবা করতেন।[৯৪]

তবে এই রূপকল্প সর্বদা দৃশ্যমান ছিল না। সমকালীন সাহিত্য বা স্মৃতিকথায় দেখা যায় যে অল্পবয়সী মেয়েরা সংসার পরিচালনা করছে। বিশেষত অকালবৈধব্যপ্রাপ্ত তরুণীরা অনেক সময়েই পিতৃগৃহে বা কোন আত্মীয় পরিচিতের বাড়ীতে গৃহিণীর ভূমিকা পালন করছে,[৯৫] তরুণী বা প্রৌঢ়া যা-ই হোক না কেন, গৃহিণী হলেন সংসার তরণীর কাণ্ডারী, যাঁর বিহনে সংসার দিকভ্রষ্ট ও ছন্নছাড়া। মহিলাদের অবরুদ্ধ থাকার সময়ে সংসার পরিচালনায় তাঁদের ভূমিকা অপরিহার্য ছিল। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে পিতৃহীন প্রবাসী রমেশ যখন পিতৃশ্রাদ্ধ করার জন্য গ্রামে এল তখন গৃহিণীহীন তার সংসারে সকলেই প্রধান হয়ে উঠে সীমাহীন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করল। রমেশের জ্যেঠিমা যখন এসে ভাঁড়ারের চাবি আঁচলে বেঁধে

৯১ Manisha Roy : *Bengali Women*, স্ত্রী, কলিকাতা-২৬, ১৯৯৩. পৃ: ১২৬।
৯২ তদেব।
৯৩ *পূর্বকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫৮।
৯৪ তদেব।
৯৫ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একাধিক উপন্যাসে এর উদাহরণ পাওয়া যায়।

নিলেন তখন সকলে নিরস্ত হল। মনীষা রায়ের বর্ণনা অনুযায়ী জেঠিমা কিন্তু সীমন্তিনী নন এবং শরৎচন্দ্রের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি পৃথুলা হওয়ার বদলে অতি চমৎকার দেহসৌষ্ঠবের অধিকারিণী। তবে, ভাঁড়ারের চাবির সাহায্যে তাঁকে কর্তৃত্ব তুলে নিতে হয়েছিল এ কথা ঠিক।[৯৬] একথাও সত্য যে অনেক পরিবারেই উপযুক্ত গৃহিণীর স্থান অধিকার করতেন আত্মীয়া বা অনাত্মীয়া বিধবা মহিলারা আবার অকাল বৈধব্য বা স্বামীর স্থানান্তর বাস অনেক সময়ই তরুণীদেরও গৃহিণী পদের উপযুক্ত করে তুলত।

গৃহিণীসুলভ গুণপনার কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠি ছিল মনে হয় না। কারণ দানশীলতা কুলদাসুন্দরীর ক্ষেত্রে গুণ বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল, তাঁর মর্যাদা সুযোগ্যতা দুই-ই প্রমাণিত হয়েছিল, কিন্তু আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতামহীর ক্ষেত্রে এই দানশীলতাই সংসারে তাঁর গুরুত্ব, ক্ষমতা ও মর্যাদা হ্রাস করেছিল।

শিবনাথের মাতামহী সঞ্চয়ী ছিলেন না। গোলাতে যে সম্বৎসরের চাল থাকত, তা থেকে তিনি অকাতরে ও গোপনে গরীব দুঃখীদের চাল বিতরণ করতেন। সংসার খরচের অর্থ তাই তাঁর কাছে দেওয়া হত না। তাঁর পুত্রবধূরা তাঁকে অনায়াসে তিরস্কার করার স্পর্ধা রাখত। একবার তিনি এক রবাহূত ব্যক্তিকে নিজের মধ্যাহ্নকালীন আহার দিয়ে দিয়েছিলেন বলে তাঁর পুত্রবধূরা তাঁকে যারপরনাই তিরস্কার করেছিলেন।[৯৭] বেশ বোঝা যাচ্ছে যে শিবনাথের মাতামহীর হাত থেকে সংসার কর্তৃত্বের সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ উপাদানটি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। তাঁর উপস্থিতি সত্ত্বেও তাঁর পুত্রবধূরা গৃহিণী ছিল। যদিও তখনও পর্যন্ত তাঁর স্বামী বর্তমান ছিলেন। তাই মনে হয় যে বয়স নয় ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি, শাসনক্ষমতা ও প্রভাবিত করার ক্ষমতা ছিল অন্দরমহলের গৃহিণীর মূল শক্তি। তবে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল আর্থিক ক্ষমতা। তখন মহিলারা সাধারণভাবে আর্থিক স্বাধীনতার অধিকারী ছিলেন না, তবে পরিবারের উপার্জনশীল পুরুষের সাথে সম্পর্ক কি রকম ছিল তার ওপর যে গৃহিণীর পদমর্যাদা নির্ভর করত তা ক্রমশ বোঝা যাবে। এখন এটুকুই বলা যেতে পারে যে গৃহিণী হিসাবে শিবনাথের মাতামহীর ব্যর্থতা ছিল এই যে অমিতব্যয়িতা তাঁর হাত থেকে আর্থিক ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল, এখানেই গৃহিণী হিসাবে তাঁর গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছিল সবচেয়ে বেশী। শরৎচন্দ্রের নিষ্কৃতি উপন্যাসে এই বক্তব্য আরো পরিষ্কার হয়েছে। আখ্যায়িকায় এমন একটি যৌথ পরিবারের কথা বলা হয়েছে, যেখানে বৃদ্ধা শাশুড়ি বেঁচে থাকতেও পরিবারের প্রধান রোজগেরে বড় ছেলে গিরীশের স্ত্রী সিদ্ধেশরী গৃহিণী। নিষ্কৃতি উপন্যাসে সবচেয়ে যা কৌতূহলোদ্দীপক তা হল সিদ্ধেশ্বরী স্বেচ্ছায় আয়ব্যয়ের হিসাব রাখার ভার খুড়তুতো ছোটজা শৈলবালার হাতে তুলে দিয়েছিলেন কারণ শৈলর শাসন ও পালনক্ষমতা অনেক বেশী। অথচ শৈলর স্বামী সংসারে পরগাছাবিশেষ। স্বীকার করতেই হয় যে এখানে অর্থের চেয়েও ব্যক্তিত্ব প্রাধান্য পেয়েছিল বেশী।[৯৮]

---

৯৬ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *পল্লীসমাজ, যত্রতত্র*।

৯৭ আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী, *আত্মচরিত, সম্পাদনা,* গৌতম নিয়োগী, পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ· ১০-১৩।

৯৮ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *নিষ্কৃতি, যত্রতত্র*।

সঙ্কট তীব্রতর হল যখন সিদ্ধেশ্বরীর মেজজা নয়নতারা এসে এই পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হল। অর্থ ও ব্যক্তিত্বের সংঘাত এখন তীব্রতম পর্যায়ে পৌঁছল। অসহায় শৈল তার ব্যক্তিত্ব ও শাসনক্ষমতার জোরে কার্যত সংসারে গৃহিণী এটা নয়নতারা কিছুতেই সহ্য করতে রাজী ছিল না। সে টাকা দিয়ে সিদ্ধেশ্বরীকে বশ করে শৈলকে বিতাড়িত করতে সচেষ্ট হল। শৈল শেষ পর্যন্ত স্বামীপুত্রকে নিয়ে গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হল ঠিকই কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস এই যে নয়নতারা এত করেও সিদ্ধেশ্বরীর কাছ থেকে ক্ষমতা হস্তগত করতে পারেনি, কারণ ততদিনে সিদ্ধেশ্বরী বুঝেছিলেন যে সংসারে সিন্দুকের চাবি হল সমস্ত ক্ষমতার উৎস।[৯৯]

নিষ্কৃতির কাহিনী প্রমাণ করে যে অন্দরের অন্তরে যে ক্ষমতার লড়াই চলত তা পুরুষদের বহির্জগতের প্রতিযোগিতা থেকে কম তীব্র ছিল না। এতে সামিল হবার জন্য মেয়েদের একইরকম ভাবে বুদ্ধি, চাতুর্য, কৌশল, নিপীড়ন, হিংসা, নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নিতে হত। সর্বোপরি, অর্থ অন্দরের জগৎকে সর্বদা প্রত্যক্ষভাবে না হলেও, পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করত।

অন্দরমহলে গৃহিণীর কর্তৃত্ব কতখানি ওজস্বী হবে তা নির্ভর করত বাড়ীর কর্তার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের প্রকৃতির ওপর। বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরা উপন্যাসের[১০০] আখ্যান আমাদের জানায় যে আশ্রয়হীনা ইন্দিরাকে বাড়ীর বৌ সুভাষিণী যে বাড়ীর মধ্যে রাঁধুনির কাজে বহাল করতে পারল তা একমাত্র তার স্বামীর পৃষ্ঠপোষকতায়। বাড়ীর বৃদ্ধকর্তা অবসরপ্রাপ্ত, প্রৌঢ়া গৃহিণী সংসার পালনে তেমন দক্ষ নন, ফলে বৃদ্ধবৃদ্ধার পারস্পরিক সম্পর্ক কিছুটা শিথিল। এর বিপরীত চিত্র সুভাষিণী ও তার স্বামী। তার স্বামী রোজগেরে, স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত, স্ত্রীও সুন্দরী, বুদ্ধিমতী ও সহৃদয়া, সর্বোপরি সে এক কন্যা ও পুত্রের জননী। এতগুণের অধিকারী হয়ে সুভাষিণী স্বভাবত বাড়ির কার্যনির্বাহী গৃহিণীর পদটি দখল করে নিতে পেরেছিল।

বঙ্কিম সৃষ্ট অপর উপন্যাস দেবী চৌধুরানীতে[১০১] আমরা দেখি যে রাশভারী অর্থবান হরবল্লভের বিরুদ্ধে ব্রজেশ্বরের মা কথা বলবার সাহস অর্জন করতে পারেননি বলে, প্রফুল্লকে পছন্দ হওয়া সত্ত্বেও নিজ বাড়ীতে আশ্রয় দিতে তাঁকে দশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। সুভাষিণী ও ব্রজেশ্বরের মাতা যেন দুই বিপরীত প্রান্তবাসিনী। একজন স্বামীর সঙ্গে সঠিক যোগাযোগ করতে পেরেছিলেন বলে গৃহিণীর ভূমিকায় সফল, অপর জন এই যোগাযোগ না থাকার জন্য সফল হতে পারেনি।

শুধু যে কর্তাই গৃহিণীকে প্রভাবিত করতেন তা নয়, কোমলে কঠোরে মেশা গৃহিণীর ব্যক্তিত্বে কর্তা প্রভাবিত হচ্ছেন এরকম ঘটনা মোটেও বিরল নয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে তাঁর মায়ের বিয়ে হয় পনের বছর বয়সে। পাটনা প্রবাসী

৯৯ *তদেব।*

১০০ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *ইন্দিরা, বঙ্কিম রচনাবলী.* সাক্ষরতা প্রকাশন, কলিকাতা-৯, তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারী, ১৯৮২, যত্রতত্র।

১০১ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *দেবী চৌধুরানী.* তদেব।

এই বালিকা এসে বাড়ীর আসবাবপত্রে বার্নিশ লাগিয়ে, বই বাঁধিয়ে, ঘরের তাকে কাঁচ বসিয়ে দেওয়াল আলমারী তৈরী করে, সুন্দর ছবি টাঙ্গিয়ে, বাড়ীর বাগান সংস্কাব করে এমন একটি সুন্দর শ্রীমণ্ডিত সংসার ছবি তৈরী করলেন যে তাঁর রাগী ও উদ্ধত স্বামী ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এক মহিমাময় গম্ভীর প্রকৃতি ধারণ করলেন।[১০২] গৃহিণীর কর্মকুশলতা শুধু পরিবারেই নয় সারা গ্রামে ছড়িয়ে দিল পরিবর্তনের আলো।

পুরুষদের ভূমিকা ও প্রভাব মহিলাদের গৃহিণীপনায় একটি বড় ভূমিকা পালন করত ঠিকই কিন্তু মহিলারা প্রয়োজন হলে পবিস্থিতির দাবীতে একলা চলতে ভয় পেতেন না। অনেক সময়েই বৈধব্যের অসহায়ত্ব তাঁদের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড় করিয়ে দিত। সেখান থেকেই তাঁরা অর্জন করতেন বুদ্ধিমত্তা, সাহস ও বিচক্ষণতা, যার বলে সন্তানদের মানুষ করে তুলতে পারতেন তাঁরা। প্রসন্নময়ীর শ্বশ্রূমাতা অল্পবয়সে বিধবা হয়ে তাঁর পুত্রকন্যাদের শুধু প্রতিপালন করতেন না, সম্পত্তি রক্ষাতে তিনি পিছপা ছিলেন না। তিনি নিজের হাতে ধান সেদ্ধ করে সম্বৎসরের চাল প্রস্তুত করতেন। তিনি দরিদ্র ছাত্রদের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়ে পড়াশোনার খরচ দিতেন। একবার মুসলমান জমিদার তাঁর লাখরাজ ব্রহ্মোত্তর জমিতে খাজনা বসাতে চেয়েছিলেন, তিনি জমিদারের গোমস্তাকে আদালতের দ্বারস্থ হতে বলে বিতাড়িত করেছিলেন। কিন্তু একবার ধান পাকলে ঐ জমিদার লেঠেল পাঠিয়ে ধান লুণ্ঠন করতে উদ্যত হলেন, তখন তিনি নিজে অল্প কয়েকজন কৃষককে সঙ্গে নিয়ে ঐ লুঠেরাদের তাড়িয়ে ফসল রক্ষা করেছিলেন।[১০৩]

প্রসন্নময়ীর শ্বশ্রূমাতা সঙ্গতিসম্পন্না ছিলেন কিন্তু ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের মাতা বৈধব্যের সঙ্গে সঙ্গে নিদারুণ দারিদ্রে পতিত হন। দুইটি শিশু সন্তানসহ কুড়িবছরের তরুণী মা যে ঘরে থাকতে লাগলেন তার বেড়াটুকু কোনক্রমে আছে, "একটু জোরে আঘাত করিলেই বুঝি পড়িয়া যায়, কোনও কোনও স্থানে আবার চট দিয়া ঢাকা"। তখনকার পাবনা শহর ছিল জঙ্গলে পরিপূর্ণ, রাত্রিতে আঙ্গিনায় বাঘ আসত। একদিন শেষ রাতে বাঘ এসে ভাঙ্গা বেড়ার পাশে বসে গর্জন করতে লাগল, মা মুখে বাচ্চাদের বললেন, "ভয় কি? কোনও ভয় নাই;" "মনে মনে বিপদভঞ্জন হরিকে ডাকিতে লাগিলেন।"[১০৪] এই নিদারুণ অবস্থায় ঈশ্বরের অটল বিশ্বাস, নির্ভীকতা, চরিত্রের অপূর্ব তেজস্বিতা ঐ বিধবার একমাত্র শক্তি ছিল। নিঃসন্দেহে তা সশ্রদ্ধ প্রশংসার দাবী রাখে।

আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর মা ছিলেন প্রোষিতভর্তৃকা। তাঁর পিতা কলিকাতায় পাঠরত, মাত্র ছমাসের শিশু শিবনাথকে নিয়ে শ্বশুরঘর করতে এলেন। বাড়ীতে উপার্জনশীল বলতে বৃদ্ধ

১০২ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *আমার কালের কথা,* কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৮, পৃ: ২৭।

১০৩ *পূর্বকথা,* পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ৮৬ ৮৭।

১০৪ ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য; *জীবন প্রসঙ্গ ও উপদেশাবলী,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৩৬, পৃ:পৃ: ২-৩।

দাদাশ্বশুর, সংসারের কর্ত্রী ননদ, যিনি স্বামী সন্তানসহ পিতৃগৃহে বাস করতেন। অনিবার্যভাবে শিবনাথের মাকে শ্বশুরালয়ে অধিকার ও মর্যাদা পাবার জন্য বড় ননদের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। কিন্তু বৃদ্ধ দাদাশ্বশুরের হস্তক্ষেপে বিবাদের নিষ্পত্তি হয়েছিল মায়ের অনুকূলে। ফলে বিধবা ননদ গৃহত্যাগ করলেন, অন্ধ দাদাশ্বশুর ও শিশুপুত্রকে নিয়ে মহিলাটি একাকিনী হয়ে পড়লেন। তাঁর একাকিত্বের সুযোগ নিয়ে চোর ঘরে সিঁদ দিতে থাকল। শিবনাথের পাঠশালার পণ্ডিত লিখতে পড়তে জানা এই তরুণীকে কুপ্রস্তাব লিখে পাঠালেন।[১০৫]

শিবনাথের মা যথেষ্ট সাহসিনী ও তেজস্বী ছিলেন, তাই তিনি এই সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পেরেছিলেন। তবে বলা বাহুল্য যে সর্বদাই তাঁরা নিরাপদে এই ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা পেতেন না।

রাজনারায়ণ বসু আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে লেখাপড়া শিখে মেয়েরা আর স্বহস্তে গৃহকর্ম করতে চাইছে না, তারা দাসদাসী পাচক পাচিকার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। আগে সামান্য সামান্য রোগে মহিলারা নিজেরাই শিশুদের চিকিৎসা করতেন কিন্তু নবীনরা তা পারে না। তাঁরা "পাককার্য্য" পরিত্যাগ করার ফলে পুরুষরা স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়ছেন। রাজনারায়ণ আরো জানিয়েছেন যে নবীনারা যাদের অনুকরণ করেন সেই "বিলাতের বিবিরা" ভ্রম সংশোধনের জন্য পাকক্রিয়ার উন্নতিকল্পে এক সভা সংস্থাপন করেছেন। শুধু তাই নয় বিলাতীয় একজন মহিলা ভারতের একটি পত্রিকায় অনুরোধ জানিয়েছেন যে ভারতীয় মহিলারা যেন পাককার্যে অমনোযোগী না হন।[১০৬]

রাজনারায়ণের অভিযোগের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে এই প্রত্যাশা লুকিয়ে আছে যে মহিলারা নিজের হাতেই সংসারের দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন করুক। অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইংরাজী শিক্ষিত পুরুষরা তাঁদের সহধর্মিনীদের কাছ থেকে কি ধরনের সহযোগিতা প্রত্যাশা করতেন তা প্রতিফলিত হয়েছে প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখা বামাতোষিণী রচনায়। ঐ গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে শিক্ষিতা হিন্দু মহিলারা কন্যা, স্ত্রী ও মাতা হিসাবে কিভাবে কর্তব্য সম্পাদন করবে সে সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে। প্যারীচাঁদ মিত্র এই ভূমিকা কিরকম হবে তা একাধিক উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন। গোপাল চন্দ্র দেব নামে এক ভদ্রলোক ঢাকা শহরের এক অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করতেন। সুবিবেচিকা স্ত্রীর পরামর্শে তিনি রমনা অঞ্চলের একটি স্বাস্থ্যকর স্থানে বাসাভাড়া করেন, ব্যয়সংকোচের জন্য তখন তাঁর স্ত্রী নানাবিধ উপায়ে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করলেন। স্বল্প মূল্যে স্বাস্থ্যকর আহার্য ও টেঁকসই বস্ত্রাদি তিনি ক্রয় করতেন। এমনকি ব্যয় সঙ্কোচের জন্য তিনি ভিজা কাঠ জ্বালিয়ে রান্না করতেন। ছেলেমেয়েদেরও তিনি ক্লেশ সহ্য করার শিক্ষা দিতেন।[১০৭] লক্ষণীয় এই যে রাজনারায়ণ ও

১০৫ শিবনাথ শাস্ত্রী, *আত্মচরিত*, পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ১৭-১৮।

১০৬ রাজনারায়ণ বসু, *একাল আর সেকাল*, ১৭৯৬ শক, যত্রতত্র।

১০৭ প্যারীচাঁদ মিত্র, *বামাতোষিণী*, কলিকাতা, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কর্তৃক বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে স্ট্যানহোপ যন্ত্রে, মুদ্রিত ও প্রকাশিত, সন ১২৮৮ বঙ্গাব্দ, ১৮৮১ সাল, পৃঃ পঃ ২-৩।

প্যারীচাঁদের প্রত্যাশার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ভিন্ন অপর কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। উভয়েরই মত এই যে, যে গৃহিণী শ্রমশীলা সে গৃহের সমৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। গোপালচন্দ্র দেব পরবর্তীকালে আইন অধ্যয়নের জন্য বিলাত গিয়ে মধ্যবিত্ত গৃহিণীদের জীবনযাপন প্রণালী লক্ষ্য করে স্ত্রীর কাছে সে বিষয়ে পত্র লেখেন। বিলাতে গৃহিণীরা কর্মবিমুখ তো ননই উপরন্তু তাঁরা সুশৃঙ্খলভাবে গৃহকর্ম সম্পাদন করেন। তাঁরা দুপুর একটার মধ্যে রান্না খাওয়া সম্পূর্ণ করেন ও তারপর নিজেরা সুসজ্জিত হন ও বাড়িঘর পরিষ্কার করেন। বিকাল পাঁচটায় সকলে আহার সম্পন্ন করে বেড়াতে বার হন। রবিবার সম্পূর্ণ বিশ্রাম। সেখানে গৃহিণীরা কাজকে এমনভাবে বিভাজিত করেন যে সবকাজ সুশৃঙ্খলভাবে হয় অথচ মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম হয় না। সোম ও বৃহস্পতিবার ময়লা কাপড় কাচার দিন, মঙ্গল ও শুক্র রুটী তৈরী করার দিন, বুধবার হিসাব রাখা ও শনিবার বাড়ী পরিষ্কার করার জন্য নিয়োজিত।[১০৮]

ইংরাজী শিক্ষিত পুরুষরা পরিশ্রমকে শৃঙ্খলা, বুদ্ধি ও সঠিক বিভাজন দ্বারা ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। আগে গৃহিণী গ নিঃস্বার্থভাবে পাড়া প্রতিবেশীর কাজেও পরিশ্রম করতে বিমুখ হতেন না। কিন্তু এখন মহিলাদের গার্হস্থ্য শ্রম যেন গৃহের মধ্যেই সীমিত থেকে গৃহের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে। সুন্দরভাবে গৃহসজ্জা করা আধুনিক জীবনযাত্রার অঙ্গ হয়ে উঠেছিল এবং পুরুষরা একাজে মহিলাদেরও সঙ্গী হবার আহ্বান জানাচ্ছিলেন। এখন প্রশ্ন এই যে মেয়েরা কি নিজেবা অন্যরকম কিছু ভেবেছিলেন না তাঁরা পুরুষদের এই প্রত্যাশা অক্ষরে অক্ষবে পালন করেছিলেন?

১০৮ তদেব, পৃ:পৃ: ৫২-৫৩।

চিরায়ত নারী : নতুন ধারণা : মাতৃত্ব সম্পর্কে পরিবর্তনশীল মনোভাব

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে তথা বাংলায় ইংরাজি শিক্ষার প্রসার বাঙ্গালি পুরুষের মধ্যে কতকগুলি নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করেছিল। যার ফলে মেয়েরা যে নিতান্ত জড় পদার্থ নয়, জীবন যাপন করতে হলে যে তাদের অপরিহার্য ভূমিকা রয়েছে, এ চিরন্তন সত্যটি স্বীকৃত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক কাঠামোতে পুরুষদের যে নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছিল তাতে তাদের নানা ধরনের অবদমন, মানসিক চাপ, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি সহ্য করতে হত, তা তাদের অভিজ্ঞতায় ছিল সম্পূর্ণ অজানা। কর্মক্ষেত্রের এই টানাপোড়েনের হাত থেকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য রক্ষা পেতে হলেও পরিবারের ভূমিকা থাকা গুরুত্বপূর্ণ। তাই, ব্রিটিশ শাসনাধীন বাংলাদেশে পরিবার নতুন করে গুরুত্ব পেতে থাকল। পরিবারের দুই প্রধান স্তম্ভ মা ও পত্নীর ভূমিকাও তাই নতুন করে স্বীকৃতি পেল। বিংশ শতকের সূচনায় যখন বঙ্গ বিভাগকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সক্রিয়তা বৃদ্ধি হল, তখন বাঙ্গালী জীবন কার্যতঃ দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। পুরুষরা যখন বহির্জগতে বিদেশী শক্তির মোকাবিলায় ব্যস্ত থাকবেন, তখন মেয়েরা অন্দরমহলে থেকে পরিবার পালন করবেন। এভাবে, বৃহত্তর অর্থে তাঁরা সমাজপালয়িত্রীর ভূমিকাও পালন করবেন অর্থাৎ পুরুষরা যখন রাজনৈতিক প্রয়োজনে দেশমাতৃকার সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করবেন তাঁরা গড়ে তুলবেন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, বর্তমানের প্রারব্ধ কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু এই ধারণার বিপরীত দিকও ছিল। ইংরাজি শিক্ষার মাধ্যমে ইউরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙ্গালীরা পরিচিত হয়ে দেখেছিল যে ইউরোপের প্রায় সকল সমাজে মহিলাদের জীবন বাঙ্গালী মহিলাদের তুলনায় অনেক উন্নত ও মুক্ত। মহিলাদের উন্নততর অবস্থাই ইউরোপীয় সভ্যতার অগ্রগতির কারণ, জেম্‌স্ মিলের এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালী পুরুষরা উপলব্ধি করেছিল যে তাদের স্বজাতীয় মহিলাদের উন্নতি না হলে তাদের প্রকৃত উন্নতি ঘটবে না। ইতিমধ্যে বাঙ্গালী পুরুষরা বিলাত গিয়ে সেখানকার সমাজজীবন প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। মহিলাদের সাহচর্য কিভাবে পুরুষদের জীবন আনন্দময় ও পরিপূর্ণ করে তোলে তা দেখে তারা নিজেদের অভিজ্ঞতায় অনুভব করতে শুরু করেছিলেন যে তাঁদের জীবনে একধরনের অপূর্ণতা রয়ে গিয়েছে। এঁরা তাই একধরনের নতুন দাম্পত্য চাহিদার সৃষ্টি করলেন যে পত্নী যদি পতির মানসিকতার অংশীদার না হন তাহলে দাম্পত্য রয়ে যাবে খণ্ডিত। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' এই ধারণাকে বাতিল করে "গৃহিণী-সখি-সচিব-ললিতকলাবিধৌ" এই ধারণা বলবান হয়ে উঠল। ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে কিভাবে উনবিংশ শতকের অগ্রসর চিন্তার অধিকারী পুরুষেরা তাদের বালিকা পত্নীদের লেখাপড়া শিখিয়ে তাঁদের যথার্থ সঙ্গিনী হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছিলেন। এঁদের পত্নীরাও এক নতুন দাম্পত্য বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সুখেদুঃখে স্বামীদের যথোপযুক্ত সাহচর্য দিয়ে এমন পরিবার গড়ে তুলেছিলেন যেখানে পুরুষ ও নারী দুজনের অংশীদারিত্ব সমান। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই ধরনের পরিবারগুলি ছিল মূল একান্নবর্তী পরিবার থেকে পৃথক হয়ে আসা একক পরিবার, যা গঠিত হয়েছিল পুরুষের কর্মক্ষেত্রে। এই একক পরিবারে এই তরুণী পত্নীরা মা হিসাবে কি ভূমিকা পালন করেছিলেন, মাতৃত্ব সম্পর্কে তাঁদের ধারণা কি ছিল এবং মাতৃত্বের প্রতি তাঁদের প্রতিক্রিয়া কি ছিল তা পৃথক আলোচনার দাবী রাখে।

মাতৃত্ব হল নারীর অস্তিত্বের কেন্দ্রস্থিত ঘটনা;কারণ এই অভিজ্ঞতা যা সবচেয়ে একান্তভাবে শারীরিক তা পুরুষের কাছে থেকে নারীকে পৃথক করে রাখে।[১০৯] মাতৃত্বের গুরুদায়িত্ব মেয়েরা আবহমান কাল ধরে পালন করে এসেছে। বিশেষ করে হিন্দুসমাজে সন্তানের জন্ম মায়ের গৌরব বৃদ্ধি করে থাকে। তবুও উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিভিন্ন রচনায় মেয়েদের মাতৃত্বের গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে দেওয়া হচ্ছিল। এর পেছনে এরকম কোন ধারণা থাকতে পারে যে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ফলে মেয়েরা আর চিরাচরিতভাবে সাংসারিক দায়িত্ব পালন করবে না। এমনকি মেয়েরা শিক্ষিতা হলে তারা হয়ত মা হতে চাইবে না।[১১০] কিন্তু ইতিপূর্বে শিক্ষা সম্বন্ধে মেয়েদের যে ভাবনাচিন্তা তাদের রচনায় প্রকাশ পেয়েছিল, তাতে বোঝা যায় যে শিক্ষাপ্রাপ্তা হয়ে মেয়েরা আরো ভালভাবে মাতৃত্বের দায়িত্বসহ তাঁদের সমূহ সাংসারিক কর্তব্য পালন করতে পারবে। আসলে, মাতৃত্ব সম্পর্কে এই সময় যে এত লেখা প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল তার কারণ এই যে উনবিংশ শতাব্দীর নতুন আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি অনিবার্যভাবে ঐতিহ্যিক একান্নবর্তী পরিবারগুলিতে ভাঙন ধরাচ্ছিল, নতুন ধর্ম গ্রহণ করে, বা স্থানান্তরে চাকুরী গ্রহণ করে বা একত্রে দুটি কারণের ফলেও একক পরিবারের সৃষ্টি হচ্ছিল। ঐ সব পরিবারের তরুণী স্ত্রীরা হয় মা হচ্ছিলেন মূল পরিবার থেকে দূরে, স্বামীর কর্মক্ষেত্রে, কিংবা খুব ছোট শিশু নিয়ে তাঁরা স্বামীর সঙ্গিনী হতেন। যে নতুন সামাজিক ও ধর্মীয় ভাবনা তাঁদের নতুন ধরনের জীবন যাপনে উৎসাহিত করেছিল, তা মাতৃত্বের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছিল। ইংরাজি শিক্ষা থেকে বা বিলাত ভ্রমণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে পাশ্চাত্য জীবন সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ করা গিয়েছিল তা মাতৃত্বের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছিল। তাহলে, প্রশ্ন উঠতে পারে যে এর আগে মায়েরা কি সন্তান পালনের দায়িত্ব পালন করতেন না? বিশেষ করে, যে কয়েকজন সমাজ সংস্কারকের কথা আলোচিত হয়েছে তাঁরা প্রায় সকলেই তাঁদের জীবনে মায়ের প্রভাব ও অবদানের কথা স্বীকার করে গেছেন। বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ তাঁদের মায়েদের কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে গেছেন। এছাড়াও উনবিংশ শতকে লেখা জীবনী ও আত্মজীবনীগুলিও ছেলেমেয়েদের জীবনে মায়ের অবদানের সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং সন্তান পালনের গুরুদায়িত্ব মায়েরা আগেও সুযোগ্যভাবে পালন করতেন। কিন্তু এঁরা যে ব্যতিক্রম মাত্র ছিলেন তা বোঝা যায় যখন স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হল যে সুশিক্ষিতা মাতাই সুসন্তান তৈরী করতে পারে। বামাবোধিনী পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল : "মানুষের সৰ্ব্ব প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান শিক্ষয়িত্রী মাতা। বিদ্যালয়লভ্য শিক্ষার সুফল যতই হউক না কেন, মাতৃক্রোড়ে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতেই মনুষ্যের চরিত্র প্রধানত গঠিত হয়।"[১১১]

---

১০৯ Maithreyi Krishnaraj, "Motherhood : Power and Powerlessnes," in Jasodhara Bagchi *ed.*, Indian Women : Myth and Reality, *পূর্বোক্ত, পৃ:* 34 (Motherhood is the central fact of female existence because it is the most authentically biological experience that differentiates woman from man".

১১০ সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, *অন্দরে অন্তরে*, পৃ: ১৮১।

১১১ বামাবোধিনী পত্রিকা, *"আমাদের অভাব"*। ভাদ্র, ১২৯২।

এই ধরনের সচেতনতা সৃষ্টি করার প্রয়াস পুরুষ লেখকদের রচনায়ও দেখা যায়। এ বিষয়ে ১৮৮০-র দশকে "বালক" পত্রিকায় একটি ধারাবাহিক রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে স্পষ্টই বলা হয়েছিল যে মায়ের গুণেই পুত্র গুণবান হয়ে থাকে : "অধিকাংশ বড় লোকের জীবনচরিত পাঠ করিলে দেখা যায়—তাঁহাদের মাতার চরিত্রে যে সকল মহত্ত্বের লক্ষণ ও সদ্‌গুণ বিদ্যমান ছিল তাহাই পুত্রেরা মাতৃদুগ্ধের সহিত আত্মসাৎ করিয়া মহত্ত্ব শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে।....কোন জাতিকে উন্নত করিতে হইলে প্রথমে সেই জাতির স্ত্রীলোকদিগকে উন্নত করা প্রয়োজন।....যে দেশের স্ত্রীলোক অজ্ঞান কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, দাসত্বব্রতে রত, সে জাতির মধ্যে বড় লোকের আবির্ভাব দুর্লভ। স্ত্রীলোকেরা নিজে বড় লোক বলিয়া প্রখ্যাত না হইতে পারেন, কিন্তু পুরুষদিগকে বড় লোক করিয়া তোলা তাঁহাদের কাজ। তাঁহাদের সন্তান সন্ততিব চরিত্রোৎকর্ষ সাধন করিতে পারিলে তাঁহাদের জীবনের সার্থকতা অনেক পরিমাণে সংসাধিত হয়। ওয়াশিংটনের মাতার জীবনচরিত পাঠ করিলে এই কথাটি বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইবে।"

"ওয়াশিংটনের মাতার স্বামীবিয়োগ হইলে পর, তাঁহার শিশুসন্তানের লালন-পালন ও শিক্ষার ভার সমস্ত তাঁহার স্কন্ধে পড়িল। এই সঙ্কটকালে তিনি তাহার পুত্রকে যে রূপে লালন পালন করিয়াছিলেন, যে প্রণালীতে শিক্ষা দিয়াছিলেন, যে সকল মহত্ত্বের বীজ তাহার কোমল মনে রোপণ করিয়াছিলেন তাহারই গুণে আমেরিকার স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাতা, আমেরিকার উদ্ধারকর্ত্তা মহাত্মা জর্জ ওয়াশিংটন তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনে এত যশ কীর্ত্তি খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"[১১২] ঐ একই পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় স্যার উইলিয়ম জোন্স, ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী গিজো, ইংরাজ লেখক কার্লাইল, ইতিহাসতত্ত্ববিদ পণ্ডিত কুবিয়ের প্রমুখের উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল যে উল্লিখিত ব্যক্তিদের প্রত্যেকেই যে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন তা কেবল মাতার গুণে।[১১৩] উনবিংশ শতকের সমাজ মার কাছে কি আশা করত "বালক" পত্রিকার লেখা দুটি থেকে তা প্রতীয়মান হয়। ঠিক এই যুক্তি দিয়ে বিপরীত দিক থেকে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন শ্রীনগেন্দ্রবালা দেবী : "...মাতা মূর্খা অনভিজ্ঞা সন্তান শিক্ষিত কাজেই জননীকে সন্তান উপেক্ষা করে, যে জাতি জননীর সম্মান করে না, সে জাতির উন্নতি কোথায়?"[১১৪] লেখিকা নিজের জীবনের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে ছেলেরা পড়া বুঝিয়ে দিতে বললে তিনি তা পারেন নি। সেই থেকে তারা বুঝতে পারল যে মা কিছুই পারেননা। এমনকি মা পড়তে বললেও তারা বলে : "পড়া হয়েছে, তুমি তো আর কিছু জান না, শুধু কেবল বল পড় পড়।"

"এমন করিয়া শিশুকাল হইতেই ছেলে মূর্খ মায়ের অবজ্ঞা করিতে থাকে। কাজে কাজেই তাহারা যদিও উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হয় তথাপি চরিত্রবান হইতে পারে না। মাতার অজ্ঞানতাই ইহার

১১২ বালক, "বীর জননী"। ভাদ্র, ১২৯২।

১১৩ 'বালক, "বড়লোকের মা" আশ্বিন, ১২৯২।

১১৪ শ্রী নগেন্দ্রবালা দেবী, অন্তঃপুর, স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে অর্ধ শিক্ষিতা হিন্দু মহিলাদিগের মতামত, ভাদ্র, ১৩০৮।

মূল।"[১১৫] কাজেই দেখা যাচ্ছে যে উনবিংশ শতাব্দীতে মায়ের ভূমিকা গৃহের পরিসীমা ছাড়িয়ে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল দেশ ও জাতির বৃহত্তর কর্মপরিধিতে। ব্রিটিশ শাসন যে নতুন পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল তার জন্য নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই হোক, বা বিংশ শতকের সূচনায় যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বাঁধছিল তার জন্য নিবেদিতপ্রাণ সন্তান গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই হোক, সন্তানের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য মার ভূমিকা অপরিহার্য এ বিষয়ে কি পুরুষ কি নারী কারো কোন সংশয় ছিল না।

১৮৬০-এর দশক থেকেই লক্ষ করা যাচ্ছে যে সন্তানের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য মায়েরা নিজেদের কিভাবে সমুন্নত করার প্রয়াস করেছেন। বগুড়া নিবাসী ডাঃ শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী স্বামীর কাছে শিক্ষালাভ করে চিকিৎসাবিদ্যায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। তিনি তাঁর প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণের সময়ে চিকিৎসাসম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি পাঠ করেছিলেন, যাতে তিনি শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা বিষয় অবগত হন এবং সন্তানের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন। ধাত্রীবিদ্যায় তিনি বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। শ্রীমন্তবাবু লিখেছেন : "কাহারো কোন রোগ উপস্থিত হইলে, কিরূপ সাবধান হইতে হয়, কিরূপে সুচিকিৎসা করতে হয়, তাহা তিনি সুন্দররূপে জানিতেন এজন্য তাঁহার ডাক্তার বন্ধুগণ তাঁহার বাড়ীতে কোন রোগী দেখিতে আসিলে, তাঁহার সহিত রোগীর অবস্থা ও ঔষধের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলাপ করিয়া সুখানুভব করিতেন।"[১১৬] ১৮৮৩ সালে বগুড়াতে যে আধ্যাত্মিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানকার ছাত্রী হয়ে অন্নপূর্ণা দেবী নানা দেশের সাধু ও সাধ্বীদের জীবনচরিত পাঠ করেছিলেন, চিত্রাঙ্কন ও শিল্পদ্রব্য নির্মাণেও তাঁর দক্ষতা ছিল, সাহিত্যে বিশেষ করে ধর্মভাবাপন্ন প্রবন্ধ রচনা করতে তিনি ভাল পারতেন। "একবার কলিকাতা হইতে সর্ব্বজনমান্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুলেখক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বগুড়ায় গমন করিয়াছিলেন। অন্নপূর্ণা দেবী এই দুই স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তির সঙ্গেই আগ্রহের সহিত নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন। মহিলাগণ সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, স্বাধীনতা লাভ করিলে ও তাঁহাদের অন্তরে ধর্ম্মভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিলে, সুরুচিসম্পন্ন পুরুষেরা ঐ সকল নারীর সহিত সাহিত্য ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া যে অন্তরে নির্ম্মল আনন্দলাভ করিতে পারেন, সে বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নাই।"[১১৭] এইভাবে নিজেকে বিকশিত করে অন্নপূর্ণা দেবী তাঁর ছেলেমেয়েদের প্রতি কর্ত্তব্য খুব সুন্দরভাবে পালন করতে পেরেছিলেন : "সন্তানদিগের প্রতি মাতার যে কি কর্ত্তব্য, অন্নপূর্ণা দেবী তাহা খুব ভালই বুঝিতেন এবং সে কর্ত্তব্য অতি উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার নিকট পুত্র ও কন্যার কোন প্রকার পার্থক্যই ছিল না। ছেলেদের ও মেয়েদের স্বাস্থ্য যাহাতে খুব ভাল থাকে, শিক্ষার যাহাতে উন্নতি হয়, তাহাদের সুকোমল মনোবৃত্তিগুলি যাহাতে সুন্দর রূপে বিকশিত হইয়া উঠে, সে বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ

---

১১৫ তদেব।

১১৬ অমৃতলাল গুপ্ত, *পুণ্যবতী নারী,* কলিকাতা, ১৮৯৮, পৃ:পৃ: ৮১-৮২।

১১৭ তদেব, পৃ:পৃ: ৮২-৮৩।

দৃষ্টি ছিল। ছেলেমেয়েরা তাঁহাকে খুব বিরক্ত করিলেও, তিনি ধৈর্য্য হারাইতেন না, উত্তেজিত হইয়া তাঁহাদিগকে অন্যায়রূপে শাসন করিতেন না;সর্ব্বদাই প্রসন্নমুখে ও মধুরভাবে শিক্ষাদান করিতেন। পুত্রকন্যাদিগের সুকুমার হৃদয়ে, ধর্ম্মের সরল ও মধুরভাব পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে তাঁহার বিশেষ চেষ্টা দেখা যাইত। সেজন্য তিনি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে লইয়া বাড়ীর একটি মনোরম উদ্যানে প্রবেশ করিতেন; সেখানে বালক বালিকাদিগের উপযোগী সঙ্গীত, প্রার্থনা, কবিতা পাঠ ও কথাবার্ত্তা হইত।"[১১৮]

সন্তানদের ভালভাবে লালনপালন করার জন্য সন্তানসংখ্যা সীমিত রাখার প্রয়োজনীয়তা সে সময় মায়েরা অনুভব করেছিলেন। অবশ্য পরিবার সীমিত রাখার আরো অনেক কারণ ছিল। যেমন, মহিলারা সন্তান ধারণের ব্যাপারটি নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করতে চাইতেন, কিংবা তাঁরা বারংবার গর্ভধারণের যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে চাইতেন না, সর্বোপরি, সে সময় শিশুমৃত্যুর হার ছিল অত্যধিক। যেমন, উপরে উল্লিখিত অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায় নিজে চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং তাঁর স্বামী ডাঃ শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় ছিলেন চিকিৎসক। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর দশটি সন্তানের মধ্যে দুটি ছিল মৃতজাতক ও একটি কয়েক সপ্তাহ পরে মারা গিয়েছিল। ব্রাহ্ম নেতা কালীনারায়ণ গুপ্তের পত্নী ষোলটি সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। তার মধ্যে ছটি-ই ছিল শৈশবে মৃত।[১১৯] এসব কারণে হতে পারে যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের মধ্যে পরিবার সীমায়িত করার ইচ্ছার উদ্রেক হয়েছিল। কিন্তু এ বিষয়ে মহিলাদের মনোভাবের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে সন্তান সংখ্যা সীমিত রাখলে তাদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা ও পালন করা যায় আরো সার্থক ও সুষ্ঠুভাবে, তৎকালীন পরিস্থিতিতে যখন বৃহৎ পরিবার সমৃদ্ধির পরিচায়ক বলে মনে করা হত তখন মহিলাদের মধ্যে এই ধরনের মানসিকতার সঞ্চার হওয়া যথেষ্ট আধুনিকমনস্কতার পরিচয় বলে গণ্য হতে পারে। শ্রীমতী হরসুন্দরী দত্ত তাঁর স্বামীর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে শ্রীনাথ দত্ত পাঁচ বছর ময়ূরভঞ্জে সেটেলমেন্টের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এই কাজ যখন শেষ হল "এই সময় আমার সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তখনো আমরা ঋণগ্রস্ত। সুতরাং আমাদের মনে হইল যে, আর যদি আমাদের সন্তান হয়, তবে সন্তানদের মানুষ করিতে পারিব না, বড় ছেলের স্কন্ধে তাহাদের মানুষ করিবার ভার পড়িবে। এজন্য আমরা উভয়েই প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, যত কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, তাহা করিয়াও আমাদের আটটি সন্তানকে মানুষের মত মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। আমাদের উভয়েরই এক উদ্দেশ্য হইল যে, প্রাণপণে সন্তানদের মানুষ করিয়া উপযুক্ত করিব। এজন্য যে ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের একটি বই দুইটি চাকর ছিল না। এমনকি, আমার স্বামীরও ভিন্ন চাকর ছিল না। আমি যাহা করিতে পারিতাম না, তাহা

১১৮ তদেব, পৃ: ৮৭।

১১৯ Meredith Borthwick, *The Changing Role of Women in Bengal*, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৬৫।

তিনি অম্লানবদনে নিজেই গুছাইয়া লইতেন। বেশী খরচের ভয়ে তাঁহাকে বেশী দামের কাপড়ও পরিতে দিতাম না এবং নিজেও ছিন্ন বস্ত্রখানি শতেকবার সেলাই করিয়া পরিতাম, তিনি ইহাতে মনে কোন দুঃখ বোধ করিতেন বলিয়া বোধ হইত না। পরে ছেলেরা সক্ষম হইয়া পিতার পোশাকের দিকে দৃষ্টি দিয়াছিল। তখনো বেশী দামের জুতা ও পোশাক পরিতে ভালবাসিতেন না, অপব্যয় মনে করিতেন।"[১২০]

"আমরা উভয়ে মিলিয়া মিশিয়া সংসার চালাইতাম এবং সকল রকম কষ্ট স্বীকার করিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলাম। এরূপ প্রাণান্ত যত্নে সন্তানদের যখন মানুষ করিয়া তুলিলাম, তখন তাহাদের দেখিয়া আমরা উভয়েই গর্ব্ব অনুভব করিতাম।"[১২০]

এক দশক আগে হরসুন্দরী সন্তানদের স্বার্থেই সন্তান সংখ্যা সীমিত রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। ১৮৮০ দশকে অঘোরকামিনী রায়ও সন্তানসংখ্যা পুনরায় বৃদ্ধি না করার কথা ভেবেছিলেন সম্পূর্ণ অন্য কারণে, যাকে আধ্যাত্মিক কারণ বলা যেতে পারে। অঘোর কামিনীর জীবনীকার তাঁর স্বামী প্রকাশচন্দ্র রায় লিখলেন : "১লা জুলাই ১৮৮২ তোমার তৃতীয় পুত্র বিধানচন্দ্রের জন্ম হয়। তখন তোমার বয়স ২৬ বৎসর। এই আমাদের শেষ সন্তান। অনেকগুলি সন্তান হইলে যে নারীর ধর্মসাধনের ব্যাঘাত হয় তাহা তুমি বুঝিয়াছিলে। সমাজে যাইতে হইলে সন্তানকে ঘুম পাড়াইয়া দাসীর নিকট রাখিয়া যাইতে হয়;কিন্তু অতি শিশুসন্তানকে তো রাখিয়া যাওয়া যায় না। তাছাড়া ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে গর্ভস্থ সন্তান সাধনের আরও ব্যাঘাত করে, একথা সদাই বলিতে। এইবার তাই আমরা দুজনে সন্তান ক্রোড়ে লইয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম যে আর সন্তান হইবে না। কিছুকাল পরে যখন এই সন্তানের নামকরণ উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধেয় প্রচারক ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল মহাশয় আসিলেন, তখন তাঁহার সম্মুখে আমরা দুজনে ছয় মাসের জন্য আত্মিক মিলন ব্রত গ্রহণ করিলাম;প্রতিজ্ঞা করিলাম যে এই ছ মাস শরীরের সম্পর্ক থাকিবে না। সন্তানের মাথায় হাত দিয়া এ প্রতিজ্ঞা শক্ত করা হইল।"[১২২] এরপরে অঘোরকামিনী ও প্রকাশচন্দ্র রায় কিভাবে সারা জীবন ধরে শরীরের সম্পর্ক থেকে বিরত থাকার জন্য যে কৃচ্ছ্রসাধন করেছিলেন তার দীর্ঘ বর্ণনা সমস্ত বই জুড়ে রয়েছে। এর ফলে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই অসহনীয় মানসিক চাপ সহ্য করতে হয়েছিল তা বোঝা যায় যখন প্রকাশচন্দ্র লিখলেন : "মধ্যে মধ্যে তুমি ম্লান হইতে। মলিন মুখ দেখিলেই আমার মনে হইত, বোধ হয় তোমার মনের উপর অধিক চাপ দেওয়া হইতেছে।"[১২২] এইভাবে প্রায় একদশক অতিক্রান্ত হবার পর তাঁরা ১৮৯২ সালের ২৪শে জানুয়ারী মস্তক মুণ্ডন করে আধ্যাত্মিক বিবাহ সম্পন্ন করলেন। ভাই ষষ্ঠীদাস নামে একজন প্রত্যক্ষদর্শী লিখলেন : "ভক্তিভাজন সাধক প্রকাশবাবু ও তাঁহার ভার্য্যা অঘোরকামিনী আধ্যাত্মিক বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। আহা, আজ কি মনোহর দেবদৃশ্য। বিধাতা আজ স্বয়ং পুরোহিত হইয়া এই উভয় সন্তানকে বিবাহসূত্রে বাঁধিয়া দিলেন।

১২০ হরসুন্দরী দত্ত, *স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্তের জীবনকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ৩৫-৩৬।
১২১ শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র রায়, *"অঘোর প্রকাশ"*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫০।
১২২ তদেব, পৃ: ৫৪।

এ বরকন্যার আর শরীরের সম্বন্ধ নাই। ইঁহারা বার বৎসর হইল সাধন আরম্ভ করিয়া আজ নয় বৎসর কাল ইন্দ্রিয়কে একেবারে দমন করিয়াছেন। তাঁহারা সাক্ষ্য দিলেন, এ নিগ্রহে তাঁহাদিগকে অনেক কাঁদিতে হইয়াছে, অনেক দুঃখ পাইতে হইয়াছে, কিন্তু পরে যে সুখশান্তি পাইয়াছেন, তাহার সঙ্গে তুলনায় সে কান্না সে দুঃখ কিছুই নহে।"[১২৩] যদিও অঘোর প্রকাশের জীবনে ধর্মভাবের প্রাবল্য ছিল, যার জোয়ারে ভেসে গিয়ে তাঁরা দাম্পত্য সম্পর্ককে অন্য এক মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছিলেন, তবুও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সেই সময় বাঙালী জীবনে যে পরিবর্তন ঘটছিল বিশেষ করে মেয়েরা আস্তে আস্তে অবরোধের ঘেরাটোপ ছেড়ে বাইরে আসছে, এই পরিস্থিতিতে পরিবারের আকার ও গঠনের প্রশ্নটি বিশেষভাবে গুরুত্ব পাচ্ছিল। মেয়েরা বুঝতে পারছিল যে পরিবার যদি বেশী বড় হয় তাহলে তার উপর শৃঙ্খলা আরোপ করা যাবে না, আর বিশৃঙ্খল পরিবারকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর নয়। তাই, পরিবার পরিকল্পনার[১২৪] অন্য কোন উপায়ের অভাবে কোন কোন দম্পতি এইরকম উপায়ে শারীরিক সম্বন্ধ রহিত হয়ে পরিবার সীমিত রাখার চেষ্টা করেছিলেন।

সন্তানের মঙ্গলসাধন যে সর্বতোভাবে মায়ের কর্তব্য এই বোধ ১৮৭০-এর দশক থেকেই মায়েদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। শ্রীনাথ চন্দ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় একজন ব্যক্তি, তাঁর মা কন্যার ভবিষ্যৎ জীবনের স্বার্থে ধর্মত্যাগেও সম্মতি দিয়েছিলেন।[১২৫] শ্রীনাথ চন্দের ছোট বোন সরলা ছিলেন বালবিধবা। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রভাবে সরলা ব্রাহ্মধর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়ে শিবপূজা, একাদশী পালন ইত্যাদি ত্যাগ করেছিলেন। তখন গ্রামে (যশোহর জেলার ফুলবাড়ী গ্রাম) নিন্দায় কান পাতা যেত না। শ্রীনাথের মা তখন কন্যাকে "যেন পক্ষাবরণ দ্বারা রক্ষা করিতেন।" গ্রামের বিরুদ্ধ পরিবেশ থেকে কলকাতায় নিয়ে যাবার জন্য তিনি পুত্রকে অনুরোধ করেছিলেন, যাতে কন্যার দুঃখময় জীবনের কোন সুরাহা হয়। সেই মতো শ্রীনাথ বাল্যবন্ধু স্বনামধন্য কৃষ্ণকুমার মিত্রের সহায়তায় ১৮৭২ সালে সারদাকে নৌকাযোগে ময়মনসিংহ নিয়ে এসেছিলেন। গ্রামের বৃদ্ধ লোকেরা, এদের মধ্যে শ্রীনাথের মাতুলরাও ছিলেন, দ্রুতগামী নৌকার সাহায্যে তাদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলে শ্রীনাথের মা শান্তভাবে জানিয়েছিলেন যে তিনিই তাঁদের যেতে অনুমতি দিয়েছিলেন।[১২৬] এভাবে, শ্রীনাথের মা মেয়ের দুঃখ মোচনের জন্য গ্রামের বিরুদ্ধে যেতে পিছপা হননি, মাতৃত্বের গুরুদায়িত্ব তাঁকে পরিস্থিতির বিপরীতে দাঁড়ানোর সাহস দিয়েছিল।

১২৩ তদেব, পৃ:পৃ: ১০১-১০৩।

১২৪ ঊনবিংশ শতকের বাংলায় এ বিষয়ে তথ্যে অপ্রতুলতা রয়েছে। তবুও এর মধ্যেই এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন Meredith Borthwick তাঁর *The changing Role of Women in Bengal* গ্রন্থে, পৃ:পৃ: ১৬৫-১৬৭।

১২৫ শ্রীনাথ চন্দ, *ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর,* পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ১১১-১১৩।

১২৬ তদেব।

সন্তানের লালন পালনের সাথে সাথে তার ইচ্ছা অনিচ্ছাকে মূল্য দেওয়ার অনুভূতি এ সময় মায়েদের মধ্যে জাগ্রত হচ্ছিল ১৮৮০-র দশকে এসেও তার উদাহরণ মেলে। অঘোরকামিনী তাঁর বাসস্থান বাঁকিপুরে (বিহার প্রদেশে) ভাল বিদ্যালয়ের অভাবে জ্যেষ্ঠা কন্যা সুসারবাসিনীব বিদ্যাশিক্ষার জন্য শ্রীমান বৃন্দাবনচন্দ্র শূরকে নিযুক্ত করেন। অঘোরকামিনী বালিকা বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না। সুসারবাসিনীর যখন সতের বৎসর বয়স তখন তাঁর মাতা বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, সুসারবাসিনী তাঁর মার কাছে বৃন্দাবনচন্দ্রের নাম লিখে জানালেন। প্রকাশচন্দ্র রায় লিখেছেন : "কন্যার মনের ভাব অবগত হইয়া বিধাতার ইঙ্গিত বুঝিয়া আমরাও এ বিবাহ অনুমোদন করিলাম। কন্যা আপনা হইতে বর মনোনীত করিলেন, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদ্ধতি আর কি হইতে পারে?"[১২৭]

এইভাবে যখন উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী জীবনে মায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্যের সীমারেখা ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছিল, তখন পরিস্থিতির চাপে পড়ে এই কর্তব্যভার থেকে অনিচ্ছাকৃত মুক্তিলাভ করেছিলেন কৃষ্ণভাবিনী দাস।[১২৮] পত্নী ও দুই সন্তান রেখে কৃষ্ণভাবিনীর স্বামী দেবেন্দ্রনাথ দাস বিলাতে ব্যারিষ্টারি পড়তে গিয়েছিলেন। স্বামী বিলাতে থাকতেই তাঁর প্রথম সন্তান অল্প রোগভোগের পর মারা যায়। কন্যা তিলাত্তমার পাঁচ বছর বয়সে দেবেন্দ্রনাথ বিলাত থেকে ফিরে এলেন কিন্তু বিলাত বাসের অপরাধে পিতা শ্রীনাথ দাস তাঁকে গৃহচ্যুত করলেন। কৃষ্ণভাবিনী স্বামীর অনুবর্তী হলেন কিন্তু শ্বশুর তাঁর কন্যাকে তাঁর সঙ্গে যেতে দিলেন না। পুরনো পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পেরে দেবেন্দ্রনাথ কিছুদিনের মধ্যেই বিলেতে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। এবার কৃষ্ণভাবিনীও সঙ্গে গেলেন কিন্তু কন্যা তিলোত্তমা তাঁর ঠাকুরদাদার আশ্রয়ে রয়ে গেল। এইভাবে কন্যা তিলোত্তমার সঙ্গে কৃষ্ণভাবিনীর চিরবিচ্ছেদের সূচনা হল, যার পরিসমাপ্তি হয়েছিল তিলোত্তমার অকালমৃত্যুতে। "এরপর মা মেয়ের জীবন কাটে ভিন্ন পথে, ভিন্ন মতাদর্শের আশ্রয়ে। বিলেতের অভিজ্ঞতা, স্বামীর কাছে শিক্ষানবিশী, নারীমুক্তির ভাবনা কৃষ্ণভাবিনীকে করে তুলেছিল সমকালীন আধুনিকতার প্রকল্পের অন্যতম অংশীদার। কিন্তু তিলোত্তমা বেড়ে উঠেছিলেন 'সনাতনী' ধারণার পরিবৃত্তে, সংস্কারমুখীর চিন্তাস্রোতের বাইরে। এই বিভিন্নতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তিলোত্তমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাপ্রবাহ যা কখনই তাঁকে বৌদ্ধিক বা জীবনচর্যার ক্ষেত্রে মায়ের অনুগামী হতে উদ্বুদ্ধ করেনি। হতাশা ও নৈরাশ্যের শিকার হয়ে তিলোত্তমা শান্তি খুঁজেছিলেন ধর্মজীবনের নিঃসঙ্গতায়, সামাজিক সদাচারে নয়।"[১২৯] মাতা কন্যার এই বিরহ দুজনেই প্রকাশ করেছিলেন কবিতার মাধ্যমে। কন্যাকে সঙ্গে নিতে না পেরে গভীর মনস্তাপের বশবর্তী হয়ে কৃষ্ণভাবিনী লিখলেন :

১২৭ *অঘোর প্রকাশ*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৬০।

১২৮ *সীমন্তী সেন সম্পাদিত, কৃষ্ণভাবিনী দাসের ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা*, পূর্বোক্ত, ভূমিকা, পৃ:পৃ: সাতাশ-উনত্রিশ।

১২৯ তদেব, পৃ: উনত্রিশ।

"যাই যদি সব ত্যজি স্বামীর সদনে,
তাহলে ছাড়িতে হবে আত্মীয় স্বজনে।
হায়রে নিষ্ঠুর নর এমন আচারে
কেমনে সৃজিলি তুই ভারত মাঝারে,
আজ যে প্রভাবে তোর ভাঙিছে আমার প্রাণ
কবে তোর তেজ হবে এ দেশেতে অবসান?"[১৩০]

কৃষ্ণভাবিনী যদিও মেয়ের বিচ্ছেদযাতনা সহ্য করেছিলেন, তবুও তাঁর সামনে ছিল বিলাতযাত্রার হাতছানি। কিন্তু তিলোত্তমার জীবনে মায়ের জন্য অবিমিশ্র শোক ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। মায়ের প্রতি তিলোত্তমার হৃদয়ে যে গভীর অভিমান সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় "আক্ষেপ" কাব্যগ্রন্থের "মার প্রতি" কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে :

"বিন্দুমাত্র চিন্তা, করিলে মা মনে,
কেহ কোথা নাই, ধূ-ধূ চারিদিকে।
মাতার অঞ্চল ধরিবারে যাই,
মা হয়ে গিয়াছ ফেলিয়া বিপাকে।"[১৩১]

একমাত্র কন্যার বিচ্ছেদ দুঃখ কৃষ্ণভাবিনীর হৃদয়ে অচরিতার্থ মাতৃত্বের বেদনা চিরজাগ্রত রেখেছিল। একটি শিশুর অভাব তাঁকে যে কত বিষণ্ণ করে তুলেছিল তা বোঝা যায় যখন তিনি লেখেন : "সকলেই জানেন, গৃহে ছেলে না থাকিলে সংসার কী বিমর্ষ বোধ হয়, বাড়ি কেমন ফাঁকা ফাঁকা দেখায়। ঘরে হাজার লোক থাকিলেও, একটি শিশুর অভাবে উহা যেন ঘোর নিস্তব্ধতায় পূর্ণ মনে হয়। সেজন্যই বোধ করি আমাদের দেশের লোকে 'আঁটকুড়া' গালাগালিতে অত্যন্ত মনঃপীড়া পাইয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক, ও রূপ তিরস্কারে সকল দেশের লোকেই সমান দুঃখ অনুভব করে। কি আশিয়িক মাতা, কি ইউরোপীয় জননী, কী আফরিক রমণী-প্রথম সন্তান বুকে ধরিতে সকলেরই একরূপ উল্লাসে প্রাণ ভরিয়া উঠে;...."[১৩২]

১৩০ "কৃষ্ণভাবিনী, "*জীবনের দৃশ্যমালা*", শ্রীসরোজকুমারী দেবীর ভারতীতে (অগ্রহায়ণ, ১৩২৯) প্রকাশিত '*কৃষ্ণভাবিনী দাস*' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত, তদেব, পাদটীকা, পৃ: বত্রিশ।
১৩১ তদেব, পরিশিষ্ট, পৃ: ১৭১।
১৩২ কৃষ্ণভাবিনী দাস, "*সংসারে শিশু*", সাহিত্য, আষাঢ় ১২৯৯।

১৮৯০-এর দশকে রচিত এই প্রবন্ধে শিশুর মহার্ঘতাকে তুলে ধরা হলেও, উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা শিশুর এই মহার্ঘতাকে বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রচনা এর এক দশক আগে থেকেই প্রকাশিত হচ্ছিল।

১৮৮০র দশকে শ্রীমতী সরস্বতী সেন লিখলেন : "যে সকল স্ত্রীলোকের উপর ঈশ্বর সন্তান প্রতিপালনের ভার দিয়াছেন তাঁহাদের কর্তব্য যাহাতে সন্তানদের মঙ্গল হইতে পারে এরূপ বিষয় সর্বদা চিন্তা করিয়া কার্য করা। "

...."সংসারে একটি ভাল সন্তান প্রস্তুত করিতে পারিলে, অনেক মহৎকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। সন্তানবতী স্ত্রীলোকদের সুমাতা হইবার জন্য চেষ্টা করা অতীব কর্তব্য। সুমাতা হইতে না পারিলে, তিনি সুসন্তান প্রস্তুত করিতে পারেন না। যে মাতা একটি সুসন্তান প্রস্তুত করিতে পারেন, তাঁহার বংশপরম্পরায় সুনাম ও সৎকীর্ত্তি চিরস্থায়ী হয়। অনেক সাধু ও জ্ঞানীলোকের জীবনচরিতে জানা যায় যে তাঁহারা অধিকাংশই মাতার সদ্গুণ ও উপদেশ এবং শিক্ষার গুণেই মহৎলোক হইয়াছিলেন।....

"মাতা যেমন সুপ্রণালীতে সন্তানের শিক্ষা দিতে পারেন এমন আর কেহ পারে না। মাতা জীবনের কার্য্য ও দৃষ্টান্ত এবং উপদেশ দ্বারা সন্তানকে ভাল করিতে পারে। মাতা স্তন পানের সহিত সন্তানকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। মাতার হস্তে সন্তানের লালন পালনের ভার। অতএব সন্তানের জ্ঞানোদয়ের সময় মাতা যাহাতে সন্তানের হৃদয়ে সুনীতির বীজ বপন করিয়া সেই বীজে সর্ব্বদা জল সেচন করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত করিতে পারেন সেজন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করা উচিত।"[১৩৩]

শ্রী সরস্বতী সেন সুমাতা হবার জন্য যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন শ্রীমতী লীলাবতী মিত্র। "সুসন্তানের মাতা হইবার অভিপ্রায়ে তিনি শ্রীমতী উইল্স নামে এক মহিলার নিকট ইংরেজী পড়িতে আরম্ভ করিলেন, গৃহে নানাপ্রকার সৎ সাহিত্য ও ম্যাট্সিনির জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিতে লাগিলেন, টাউন হল প্রভৃতি স্থানে যে সকল সভা হইত, তাহাতে গমন করিয়া মনকে বিশ্বব্যাপারে লিপ্ত করিলেন।"[১৩৪] তাঁর সন্তানদের মধ্যে ধর্মভাব জাগানোর জন্য লীলাবতীর চেষ্টার অন্ত ছিল না। "তিনি উপাসনার সময় শিশুসন্তানদিগকে কাছে রাখিতেন। তাহারা উপাসনা কি তাহা বুঝিত না কিন্তু উপাসনার সময় শরীর ও মনের যে পবিত্র অবস্থা হয় এবং শরীর ও মন হইতে যে এক অব্যক্ত শক্তি চারিদিকে বিস্তৃত হয় সেই শক্তির মধ্যে সন্তানদিগকে রাখিলে তাহাদের কল্যাণ হইবে, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন।"[১৩৫] শিশুর মানসিক উৎকর্ষ সাধন মাতার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ঊনবিংশ শতাব্দী

১৩৩ শ্রী মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম.এ. কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীমতী সরস্বতী-সেনের সংক্ষিপ্ত জীবনী, রচনা ও পত্র, বালিগঞ্জ, কলিকাতা-৩০, পৃ:পৃ: ৬৪-৬৫।

১৩৪ *লীলাবতী মিত্র*, লেখক, প্রকাশক ও প্রকাশ কাল নেই, পৃ: ১৫।

১৩৫ তদেব, পৃ: ১৭।

জুড়ে, এমনকি বিংশ শতকের সূচনায় তা বহু পরিমাণে আলোচিত ও স্বীকৃত বিষয় ছিল। এ সময় মহিলা পত্রিকাগুলিতে মাতার উচিত সন্তানের নৈতিক উন্নতি বিধান করা, কিভাবে সন্তানের নৈতিক উন্নতি সাধন করতে হবে, এ ধরনের লেখা প্রচুর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই রচনাগুলির মূল উপজীব্য একই ছিল যে মাতা যদি বিশুদ্ধ, সরলা, সত্যপরায়ণা না হন তবে সুসন্তান হওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য কোন কোন লেখায় মাতার সঙ্গে পিতাও সন্তানের সুশিক্ষার জন্য দায়ী একথা বলা হয়েছিল। "শিশু বিনয়ন" প্রবন্ধে লেখা হল "শিশুকে যথারূপে শিক্ষিত করিতে ইচ্ছা করিলে পিতামাতার চরিত্র ও স্বভাব সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হওয়া উচিত। কারণ শিশুগণের কোমল হৃদয় কিছুমাত্র ভালমন্দ বিবেচনা করিতে না পারিয়া যাহা দর্শন বা শ্রবণ করে তাহাই অনুকরণ করিয়া বসে। অধিকন্তু পিতামাতার শারীরিক অবস্থা কোনরূপে দূষণীয় হইলে সন্তানসন্ততির অমঙ্গলের আর ইয়ত্তা থাকে না। সাধু এবং অসাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা তাঁহারা আপনাদের পাপ ও পুণ্য উভয়ই সন্তানসন্ততি পরম্পরায় এক প্রকার অখণ্ডরূপে বিন্যস্ত করিতে পারেন।[১৩৬] শিশুদের সত্যনিষ্ঠা শিক্ষা দেওয়ার জন্য "বঙ্গমহিলা" পত্রিকাতে লেখা হল যে "...যাহার উপর শিশু বিনয়নের সমস্তভার অর্পিত হয় তাহার কতদূর সত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পদক্ষেপ করা উচিত। শিশুগণের নিকট কেবল সত্য কথা কহিলে চলিবে না। তাহাদের প্রতি ও তাহাদের সমক্ষে অপরের প্রতি যে আচার ব্যবহার করা যায়, তাহা সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ করিতে হইবে।...কোন প্রকার শঠতা ও প্রবঞ্চনা দ্বারা শিশুদিগকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করা অতিশয় গর্হিত কার্য্য। এরূপ অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, পিতামাতা অথবা ধাত্রী শিশুদিগের ক্রন্দন নিবারণার্থে নানা প্রকার ভান ও মিথ্যা উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। যে দ্রব্য পাওয়া কখনই সম্ভবপর নহে, কিম্বা যে দ্রব্য প্রদান করা সুকঠিন, সেই দ্রব্য দিব বলিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা করেন। কেহ কেহ শিশুদিগকে তিক্ত ঔষধ সেবনকালীন উহা মিষ্ট বলিয়া খাওয়াইতে সচেষ্টিত হন। এইরূপ নানা লোকে নানা প্রকার অসঙ্গত কার্য্য করিয়া থাকেন। অতএব এই সমস্ত অভিনিবেশপূর্ব্বক অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে ইহাতে কতদূর অনিষ্টোৎপাদন হইতে পারে।"[১৩৭]

এ পর্যন্ত সন্তান পালন সম্বন্ধে যা আলোচনা হয়েছে তাতে দেখা গেছে যে সন্তানকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা মাতার কর্তব্য ও দায়িত্ব, মহিলারাও এই ধারণার সমর্থনে কলম তুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে এসে সামান্য হলেও এর ব্যত্যয় দেখা গিয়েছিল। "উদ্ধত সন্তানকে কিরূপে শান্ত করিতে হয়" এই শিরোনামে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে শ্রীমতী রেবা রায় এই মত প্রকাশ করলেন যে শুধু মাতা নয় সন্তানের চরিত্র গঠনে পিতার ভূমিকাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীমতী রেবা রায় লিখলেন : "সন্তানের চরিত্র মাতার

১৩৬ বঙ্গমহিলা, "শিশু বিনয়ন" বৈশাখ ১২৮৩।

১৩৭ বঙ্গমহিলা, "শিশু বিনয়ন", (সত্য এবং সরলতা), শ্রাবণ ১২৮৩।

চরিত্রের উপরে অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। কারণ মাতার রক্তে সন্তানের শরীর গঠিত এবং বর্দ্ধিত। তৎপরে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতার ক্রোড় শিশুর আশ্রয়ভূমি হয় এবং মাতার স্তনপান করিয়া শিশুর জীবনরক্ষা হয়। ৫/৬ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুরা অধিকাংশ সময় মাতার সহবাসে কাটায়। মাতাই শিশুর সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম শিক্ষক। ইহার অর্থ এরূপ নহে যে সন্তানের সুশিক্ষার জন্য মাতা সম্পূর্ণরূপে দায়ী, পিতার সে সম্বন্ধে কোন কর্ত্তব্য নাই। যে প্রকার শিক্ষা করিলে সম্যকরূপে বুদ্ধি ও ধর্ম্মবৃত্তি সমুদায় পরিমার্জ্জিত ও পরিস্ফুট হইতে পারে, সন্তানদিগকে সেইরূপ শিক্ষা প্রদান করা পিতামাতা উভয়ের কর্ত্তব্য।"[১৩৮] মাতা ও পিতা উভয়কে আগাগোড়া দায়ী করে এই প্রবন্ধে সন্তানকে সুশিক্ষা দান করার কথা বলা হয়েছে, যার দ্বারা সন্তান কখনোই উদ্ধত প্রকৃতি ধারণ করবে না। "শিশুরা স্বভাবত চঞ্চল প্রকৃতি। তাহারা এক বিষয়ে মনকে অধিকক্ষণ সংযত রাখিতে পারে না। বিষয়টি সুন্দর এবং আমোদজনক হইলেই বালকের মত তৎপ্রতি সহজে ধাবিত হইবে। ছোট ছোট বালক বালিকাদিগকে, কোন বিষয় কঠিন হইলেও, তাহা যথাসাধ্য চেষ্টায় আমোদজনক করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা পাইলে তাহারা কঠিন বিষয়ও সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। ৭/৮ বৎসর পর্যন্ত শিশুসন্তানদিগকে কোন শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে তাড়না করিবেন না। তদ্দ্বারা তাহাদের ক্রোধাদিরিপু প্রবল হইয়া থাকে, সন্তানদিগকে সুশিক্ষা প্রদান করিবার ইচ্ছা থাকিলে তাহাদের সমক্ষে সর্ব্বদা সদাচরণ করিতে হইবে।.....

"...যে স্থানে বসিলে শিশুদিগের চিত্ত অন্যদিকে আকর্ষিত হইতে পারে, এরূপ স্থানে বসিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিবেন না। বালকদের পাঠগৃহ নির্জ্জন ও নির্দ্দোষ হওয়া আবশ্যক। সচ্চরিত্র, সুবোধ, বুদ্ধিমান বালকগণের সহিত প্রতিদিন রীতিমত ব্যায়াম অভ্যাস করিতে দিবে।"[১৩৯] কিন্তু এসব কিছুই সার্থক পরিণতি লাভ করবে না যদি না পিতামাতা উভয়েই সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষাদানে সফল হন। সমস্ত রচনায় লেখিকা এই মূল যুক্তি থেকে বিচ্যুত না হয়ে লিখেছেন : "যে গৃহে পিতামাতা প্রকৃত দম্পতি নামের উপযুক্ত হইয়াছেন ও যে গৃহে প্রতিনিয়ত সুখ ও সন্তোষ বিরাজ করিতেছে, সেই গৃহ শিশুদিগের ধর্ম্মশিক্ষা ও বিদ্যাশিক্ষার উচ্চতম বিদ্যালয়। শিশু অবস্থা হইতে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইলে সন্তানের উদ্ধত হওয়া অসম্ভব কারণ সরল ক্ষুদ্র শিশুদিগকে পিতামাতা যে পথ দেখাইবেন, তাহারা সেই পথ অবলম্বন করিবে।...."

"....যেখানে পিতার নীতিপ্রদ কঠোর শাসন, সৎশিক্ষা এবং স্নেহময়ী জননীর সুবুদ্ধিপ্রদ মধুর স্নেহবাক্য সন্তানকে আবদ্ধ রাখিয়াছে, সেখানে সন্তান উদ্ধত প্রকৃতি প্রাপ্ত হইতে পারে না,[১৪০] যখন সন্তান প্রতিপালনের জন্য মায়ের ভূমিকা ও দায়িত্বের ওপর বারংবার গুরুত্ব আরোপ করা

১৩৮ শ্রীমতী রেবা রায়, *"উদ্ধত সন্তানকে কিরূপে শান্ত করিতে হয়"*, অন্তঃপুর পত্রিকা, পৌষ ১৩০৭।

১৩৯ তদেব।

১৪০ তদেব।

হচ্ছে, যেখানে মেয়েরা নিজেরাও এই কর্তব্য সম্বন্ধে নিজেদের বারংবার সচেতন করে দিচ্ছেন, সেখানে রেবা রায়ের এই রচনাটি ব্যতিক্রমী এই কারণে যে তিনি মায়ের কর্তব্য স্বীকার করেও পুরুষের কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যেমন মাতাই কেবলমাত্র সন্তান উৎপাদন করতে পারে না, সেখানে পিতা অপরিহার্য তেমন সন্তানের লালন পালনের কাজেও মাতা একলাই কখনো দায়ী হতে পারে না, পিতার ভূমিকাও সেখানে অনস্বীকার্য। শ্রীমতী রেবা রায় দায়িত্ব স্বীকার করা ও অপরকে দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত করা এই দুটি কাজই সমানভাবে করেছেন।

বিংশ শতকের সূচনায় জাতীয়তাবাদী সক্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, পুরুষরা ক্রমশ রাজনীতির দিকে আকৃষ্ট হচ্ছিল, অবশ্য তখন রাজনীতি বলতে প্রধানত এই বোঝাত যে বিদেশী শাসন-পাশ থেকে স্বদেশকে মুক্ত করা ও দেশ গঠন করা, এই কাজের উপযুক্ত করে সন্তানকে গড়ে তোলার দায়িত্ব যে মায়ের সে সম্পর্কে সমকালীন মহিলারা অবহিত ছিলেন। শ্রীমতী সরলাবালা দেবী এরকম সচেতন মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন : "কোন্ পিতামাতার না এতাদৃশ ইচ্ছা জন্মে যে তাহাদের সন্তানগুলি এক একটি সুরভি পুষ্পের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া তাহাদিগকে এবং অপর সকলকে সেই সৌরভে মুগ্ধ ও তৃপ্ত করে। সন্তানলাভ অধিক বাঞ্ছনীয় নহে কিন্তু সুসন্তান লাভই অধিক বাঞ্ছনীয় ও বহু পুণ্যের ফল। সুসন্তান হইলে সুখের শেষ নাই, কুসন্তানে দুঃখের অবধি থাকে না।" "কিন্তু হায়, ঈশ্বর প্রদত্ত এমন গুরুতর দায়িত্ব কি আমরা সম্যক উপলব্ধি করিয়া থাকি? তবে কি দেশের জন্য, সমাজের জন্য পাঁচ জনে ভাবিতেছে আপন শক্তি সামর্থ্য ব্যয় করিতেছে দেখিয়াও আমরা আমাদের কিছু করিবার নাই ভাবিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে অনুভূত হইবে সমাজের উন্নতি দেশের উন্নতি আমাদের হাতে। আমরা নারীজাতি হইলেও দুর্ব্বলা হইলেও ঈশ্বর যখন আমাদিগকে গুরুতর ভার দিয়াছেন শক্তিও অবশ্য দিবেন। এই শিশুসন্তানদিগের উপরেই ত সমাজের ও দেশের যাবতীয় মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। ইহাদিগকে সুশিক্ষিত করিতে পারিলেই ত দেশের উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়। কত সুশিক্ষিত সন্তান সমাজমধ্যে রহিয়াছে, কিন্তু ইহা বড় সন্তাপের বিষয় যে হয়ত তাঁহাদের অনেকে জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক পিতামাতার আদর্শ গ্রহণ না করিয়া নীতি ও ধর্ম্ম বিগর্হিত পথে গিয়া পতিত হইতেছেন। সন্তানের শিক্ষা দেওয়া মুখের কথা নহে। কি পরিমাণ সতর্কতার সহিত শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তাই ভগ্নীগণ, আসুন আমরা সকলে মিলিয়া আমাদের যথাশক্তি এই মহাব্রত পালনে তৎপরা হই, দুর্ব্বল হই পরস্পরের সহায়তায় পরস্পর লাভবান করিব।"[১৪১]

শ্রীমতী রেবা রায়ের ব্যতিক্রমী বক্তব্যের পাশে শ্রীসরলাবালা দেবী সন্তানকে দেশের ও সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার যে কথা বলেছেন, ঠিক তাই সেই সময়কার মেয়েদের

১৪১ শ্রী সরলাবালা দেবী, *"সন্তান শি(া"*, অন্তঃপুর পত্রিকা, আশ্বিন, ১৩০৮।

কাছ থেকে প্রত্যাশা করা হচ্ছিল। এই বক্তব্যে কোন নূতনত্ব না থাকলেও দেশ ও সমাজেব কাজের জন্য সন্তানদের গড়ে তোলার কাজ যেভাবে তিনি সমস্ত মেয়েদের ঐক্যবদ্ধ হতে বলেছেন তাতে তাঁর দেশকাল সমাজ সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। মায়ের কর্তব্য শুধু গার্হস্থ্যে সীমাবদ্ধ করেননি তিনি, তাকে পবিব্যাপ্ত করেছেন দেশের ও সমাজের বৃহত্তর কর্মকাণ্ডের মধ্যে।

কিন্তু এর বিপরীত ছবি পাওয়া যায় স্বর্ণকুমারী দেবীর মধ্যে। সাহিত্য সেবিকা হিসাবে তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সুযোগ্য অগ্রজা। কিন্তু পত্রিকা সম্পাদনা, সাহিত্য রচনা ইত্যাদি কাজে তিনি নিজেকে এতই সমর্পিতপ্রাণা করে তুলেছিলেন যে মাতৃত্বের আবশ্যিক কর্তব্যগুলি তিনি পালন করতে পারেননি। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা সরলাদেবী চৌধুরাণী তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন : "বলেছি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই মায়ের সঙ্গে আমাদের আর সাক্ষাৎ সম্পর্ক থাকত না। তিনি আমাদের অগম্য রাণীর মত দূরে দূরে থাকতেন। দাসীর কোলই আমাদের মায়ের কোল হত। মায়ের আদর কি তা জানিনে, মা কখনো চুমু খাননি, গায়ে হাত বোলাননি। মাসিদের ধাতেও এসব ছিল না। শুনেছি কর্তা-দিদিমার কাছ থেকেই তাঁরা এই ঔদাসীন্য উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। বড়মানুষের মেয়েদের এই ছিল বনেদী পেট্রিশিয়ন চাল। গরীবের ঘর থেকে আসা ভাজেরা কিন্তু তাদের প্লিবিয়ানের হৃদয় সঙ্গে করে আনতেন—ছেলেমেয়ের সঙ্গে তাঁদেব ব্যবহার আর এক রকমের দেখতুম।"[১৪২] স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল বিলাত গেলে স্বর্ণকুমারী তাঁর তিন কন্যা ও এক পুত্র নিয়ে পিতৃগৃহ জোড়াসাঁকোতে বাস করতে এলেন। তখন সরলার ছোট বোন ঊর্মিলা তাঁর এক প্লিবিয়ান মামীমার স্নেহস্পর্শ পেয়েছিলেন। উনি ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী। তিনি মাতৃস্নেহচ্ছায়া বঞ্চিতা ভাগিনেয়িকে কন্যার মত লালনপালন করে নিজের সন্তানহীনতার দুঃখ ভুলে থাকতে চেয়েছিলেন। সরলাদেবী লিখেছেন : "মৃত্যুচ্ছায়ার একটা আভাস এল আমার জীবনে আমাদের সব ছোটবোন ঊর্মিলার হঠাৎ মৃত্যুতে। ঊর্মিলা ছিল নতুন মামীর আদুরে। তিনিই তাকে দেখতেন শুনতেন খাওয়াতেন পরাতেন। তাঁর সঙ্গে সে বাইরের তেতলাতেই থাকত—আমাদের তিনজনের সঙ্গে বাড়ির ভিতরে নয়। নিঃসন্তান নতুন মামীরই মেয়ে যে সে। শুধু আমরা যখন ইস্কুলে যেতে লাগলুম তাকেও আমাদের সঙ্গে ইস্কুলে পাঠান হল। এক পাল্কীতে চড়ে যাওয়ার সেই সময়ে মাত্র তার সঙ্গে আমাদের যোগ। ...ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার দুই এক মাস পরেই একদিন নতুন মামীর ছাদের বাঁকা সিঁড়ি দিয়ে গোলাবাড়ির দিকে আপনাআপনি নামতে গিয়ে নীচে পড়ে গিয়ে *brain concussion*-এ মৃত্যু হয় তার।"[১৪৩]

১৪২ সরলাদেবী চৌধুরানী, *জীবনের ঝরাপাতা*, রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩, পৃ: ৫।

১৪৩ তদেব, পৃ:পৃ: ২১-২২।

কৃষ্ণভাবিনী দাসও মেয়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্না হয়েছিলেন, কিন্তু তার জন্য দায়ী ছিল পারিবারিক চাপ। কৃষ্ণভাবিনী পাঁচ বছরের মেয়েকে ছেড়ে এসে আর কোনদিন তাকে কাছে পাননি, কিন্তু স্বর্ণকুমারী দেবী স্বেচ্ছায় তাঁর ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্না থাকতেন। এর কারণ ছিল একদিকে তাঁর পিত্রালয়ের ঐতিহ্য অন্যদিকে তাঁর স্বামী-প্রশ্রয়ে বেড়ে ওঠা সাহিত্য-প্রীতি। তবে স্কুলে ভর্তি হবার পর ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা তদারক করার সূত্রে স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে সন্তানদের যোগাযোগ আরম্ভ হল। তবে সরলাদেবী শিশু বয়সে মার স্নেহ থেকে যতখানি বঞ্চিত ছিলেন, হিরণ্ময়ী দেবী, ততটা ছিলেন না। তিনি বাড়ীর বড় মেয়ে বলে সংসারের দায়িত্ব কর্তব্য অনেকটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে মায়ের সাহায্য করতেন। নিজে যেমন মা-বাবার আদর পেয়েছেন বেশি, তেমনি তিনিও ভাইবোনদের ভালবাসতেন প্রাণভরে।[১৪৪] হিরণ্ময়ী দেবীর বিবাহের পর "দিদি যখন কলকাতার বাইরে নিজের ঘর-সংসার করতে গেলেন আমি তখন মার কাছে একা রইলুম। তখন থেকে মার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হল।"[১৪৫] স্বর্ণকুমারীর উৎসাহে সরলাদেবী "সখা" পত্রিকায় কবিতা প্রতিযোগিতাতে যোগদান করে প্রথম স্থান অধিকার করলেন।" "বালক" পত্রিকাতেও তাঁর লেখা বেরোতে লাগল স্বর্ণকুমারীর অনুপ্রেরণায়। এইভাবে, তাঁর বালিকা বয়সের একটি পুরানো অভিমান দূর হয়ে গিয়েছিল। কারণ বার বছর বয়সে তিনি রবীন্দ্রনাথের "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতাকে পিয়ানোতে প্রকাশ করে বা রবীন্দ্রনাথেরই রচিত একটি ব্রহ্মসঙ্গীত "সকাতরে ঐ কাঁদছে সকলে" কে পিয়ানোতে বা ব্যান্ডে বাজানোর মত করে তৈরী করে যে সাঙ্গীতিক প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন তা গ্রন্থাকারে ছেপে বার করার উৎসাহ তাঁর পিতামাতা দেখাননি। অভিমানিনী কন্যা তাই লিখেছেন : "কিশোর বয়স পর্যন্ত আমরা থাকি বড়দের হাতে সল্‌তের মত। ভিতরে ভিতরে জ্বলার ধর্ম থাকলেও তাঁরা উস্কে না দিলে সব সময় বাইরে জ্বলিনে। আর জ্বলাটা যদি অভ্যাসগত না হয়ে যায়— অভ্যাসটা যদি একবার পার হয়ে যাওয়া যায়, পরে আর নিজেকে নিজে বাইরে জ্বালানোর উদ্যম আসে না। আমার বিধাতা আমার পিতামাতাকে সঙ্গীত বা সাহিত্যে কোনদিকে আমার আত্ম-অভিব্যক্তিকে বাইরে উস্কানোর কাজে নিযুক্ত করেননি, তাদের মুদ্রাঙ্কনের বিষয়ে উৎসাহ ও উদ্যোগময় করেননি। তাই আজ পর্যন্ত আমার সব লেখাই প্রায় 'ভারতী'র পৃষ্ঠাতেই নিবদ্ধ এবং গানগুলি আমার খাতায় বা গায়কদের মুখে মুখে। আমার লেখা কুমারীরা মাসিকে সাপ্তাহিকে দৈনিকে ছাপাসুন্দরী হয়েছে কিন্তু গ্রন্থের ঘরণী হয়নি— ."[১৪৬] ১৮৯০ সালে

১৪৪ মীনা চট্টোপাধ্যায়, *স্বর্ণকুমারী দেবী,* অনুভব, কলিকাতা ৭০০০২৬, ২০০০, কলিকাতা বইমেলা, পৃ: ৫৯।

১৪৫ *জীবনের ঝরাপাতা,* পূর্বোক্ত, পৃ: ৯১।

১৪৬ তদেব, পৃ: ৩২।

বি.এ. পাশ করার পর দু-তিন বছর সরলাদেবী স্বর্ণকুমারীকে ভারতীর সম্পাদনার কাজে সাহায্য করেছিলেন। ১৮৯৫ থেকে ১৮৯৭ সাল পর্যন্ত সময়কালে তিনি দিদি হিরণ্ময়ীর সঙ্গে যুগ্মভাবে "ভারতী"র কাজ চালালেন। ১৮৯৯ থেকে দীর্ঘ নয় বৎসর অর্থাৎ ১৯০৭ সাল পর্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে একাই "ভারতী" সম্পাদনা করলেন সরলাদেবী।[১৪৭] ১৮৯৪ সালে তিনি মহীশূরে গেলেন স্কুলে শিক্ষকতা করতে। সেখানে গিয়ে তিনি ম্যালেরিয়া জ্বরে কাবু হয়ে পড়লেন। মা স্বর্ণকুমারী ছিলেন তখন সাতারায় তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। সাতারা থেকে তিনি গেলেন মেয়ের তত্ত্বাবধান করতে, সেখান থেকে তিনি ডাক্তারের পরামর্শক্রমে মেয়েকে নিয়ে এলেন সাতারাতে। তিন মাস পরে সুস্থ হয়ে সরলা আবার কর্মক্ষেত্রে ফিরে গেলেন।[১৪৮] সরলাদেবীর বিবাহ না করার সিদ্ধান্তে বাধা দেননি তাঁর মা। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন স্বর্ণকুমারীর স্বাস্থ্য ভেঙে গেল তখন সরলা বিয়ে করেন এমন একটা ইচ্ছা তাঁর হল। দিদি হিরণ্ময়ী দেবী তাঁর জন্য পাত্র স্থির করেছিলেন পাঞ্জাবের ব্রাহ্মণ বিপত্নীক রামভুজ দত্ত চৌধুরীকে। তিনি বোনকে অনুনয় করে লিখলেন : "তুই একবারটি আয়, দেখ, তারপরে শেষ যা বলবার বলিস, একেবারে গোড়াতেই বেঁকে বসিস নে, মার বুকে মৃত্যুশেল হানিস নে।" ১৯০৫ সালে রামভুজ দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে সরলাদেবীর বিবাহ হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে নতুন যুগের আবির্ভাবে, বাঙ্গালী জীবনের কোণে কোণে পরিবর্তনের যে সূচনা হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে সন্তানের প্রতি মায়ের দায়িত্ববোধেও এক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। মা সন্তানের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের দায়িত্ব নিয়ে তাকে বৃহত্তর জীবনের উপযুক্ত করে গড়ে তুলবেন এই ছিল মায়ের কাছে প্রত্যাশা। এই মাপকাঠিতে বিচার করলে স্বর্ণকুমারী মাতৃত্বের গোড়ার দিককার দায়িত্ব পালনে অনিচ্ছুক ছিলেন এবং তিনি তা করেননি। কিন্তু মেয়েরা বড় হতে তাদের ব্যক্তিত্ব যখন বিকশিত হতে থাকল তখন তা স্বর্ণকুমারীর কাছে উপযুক্ত সম্মান ও স্বাধীনতা পেয়েছিল। সরলাদেবীর দেশের কাজে জড়িয়ে পড়া, স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জন করা, বিবাহ না করার সিদ্ধান্তে বাধা না দেওয়া—ইত্যাদি স্বর্ণকুমারী দেবীর আধুনিক মনস্কতার সাক্ষ্য দেয়, তাঁর মাতৃত্বের সঙ্গে যার কোন বিরোধ ছিল না। কিন্তু শেষ বয়সে ভগ্ন-স্বাস্থ্যে কন্যাকে বিবাহিত জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করে তিনি আবার চিরাচরিত বাঙ্গালী মায়ের প্রতিনিধিত্ব করে গেছেন। তবুও এই সময় বাঙ্গালী মাতৃত্ব যে এক নতুন ভাবনায় উদ্বোধিত হয়েছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

১৪৭ *স্বর্ণকুমারী দেবী*, পূর্বোক্ত, পৃ.পৃ: ৯৬-৯৭।

১৪৮ *জীবনের ঝরাপাতা*, পূর্বোক্ত, পৃ.পৃ: ১০৭-১০৮।

নতুন নারীর গার্হস্থ্য

উনবিংশ শতকের সূচনায় মেয়েদের যে অবরোধের মধ্যে কাল কাটাতে হত, শতকের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছিল, কিন্তু তবুও মেয়েদের জীবন সাধারণভাবে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তারা দিন কাটাত বিভিন্ন সাংসারিক কাজের মধ্য দিয়ে। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে মেয়েদের সম্বন্ধে এরকম একটি ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে তাদের গৃহকর্মে দক্ষতা ও ইচ্ছা দুই-ই কমে যাচ্ছে। প্রায়ই তুলনায় আনা হত প্রাচীনকালের আদর্শ গৃহিণীর। যে কারণে, আধুনিকা মেয়েরা সমালোচিত হতেন তা হল এই যে তাঁরা গৃহভৃত্যের ওপর নির্ভরশীল। উনবিংশ শতকের সত্তরের দশকে রাজনারায়ণ বসু লিখলেন : "এক্ষণে একালের স্ত্রীলোকদিগের কথা কিছু বলিতে চাই। সেকালের স্ত্রীলোকেরা একালের স্ত্রীলোক অপেক্ষা অধিক শ্রমশীলা ছিলেন। এক্ষণে সম্পন্ন মানুষের বাটীতে স্ত্রীলোকেরা যেমন দাসদাসী ও পাচকপাচিকার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করেন, স্বহস্তে গৃহকার্য্য করিতে বিমুখ, সেকালের স্ত্রীলোকেরা সেরূপ ছিলেন না। সেকালের বড় বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত অনেক পরিমাণে গৃহকার্য নিজ হস্তে সম্পাদন করিতেন। বর্তমান সময়ে আমাদিগের দেশের শিক্ষিত স্ত্রীলোকেরা গৃহকার্য্য করিতে, শারীরিক পরিশ্রম করিতে অনিচ্ছুক। এ বিষয়ে বিলাতে শিক্ষিত স্ত্রীলোকদিগের নিকট উপদেশ গ্রহণ করা তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য। তাঁহারা এরূপ বাবু নহেন।"[১৪৯] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই বক্তব্যের প্রায় প্রতিধ্বনি করে লিখলেন : "প্রাচীনা অত্যন্ত শ্রমশালিনী এবং গৃহকর্ম্মে সুপটু ছিলেন; নবীনা ঘোরতর বাবু; জলের উপর পদ্মের মত স্থিরভাবে বসিয়া স্বচ্ছ দর্পণে আপনার রূপের ছায়া আপনি দেখিয়া দিন কাটান। গৃহকর্ম্মের ভার, প্রায় পরিচারিকার প্রতি সমর্পিত। ইহাতে অনেক অনিষ্ট জন্মিতেছে;—প্রথম, শারীরিক পরিশ্রমের অল্পতায় যুবতীগণের শরীর বলশূন্য এবং রোগের আগার হইয়া উঠিতেছে। প্রাচীনাদিগের, অর্থাৎ পূর্ব্বকালের যুবতীগণের শরীর স্বাস্থ্যজনিত এক অপূর্ব্ব লাবণ্যবিশিষ্ট ছিল, এক্ষণে তাহা কেবল নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের মধ্যে দেখা যায়। নবীনাদিগের প্রাত্যহিক রোগভোগে তাহাদিগের স্বামী পিতা পুত্র প্রভৃতি সর্ব্বদা জ্বালাতন এবং অসুখী;এবং সংসারও কাজেকাজেই বিশৃঙ্খলাযুক্ত এবং দুঃখময় থাকে;শিশুগণের প্রতি অযত্ন হয়;সুতরাং তাহাদিগের স্বাস্থ্যক্ষতি ও কুশিক্ষা হয়;এবং গৃহমধ্যে সর্ব্বত্র দুর্নীতি প্রচার হয়। যাহারা ভালবাসে, তাহারাও নিত্য রুগ্নের সেবার দুঃখ সহ্য করিতে পারে না; এবং সুতরাং দম্পতিপ্রীতিরও লাঘব হইতে থাকে। এবং মাতার অকালমৃত্যুতে শিশুগণের এমত অনিষ্ট ঘটে যে, তাহাদিগের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহারা উহার ফলভোগ করে। সত্য বটে ইংরেজ জাতীয় স্ত্রীগণকে আলস্যপরবশ দেখিতে পাই, কিন্তু তাহারা অশ্বারোহণ, বায়ুসেবন ইত্যাদি অনেকগুলি স্বাস্থ্যরক্ষক ক্রিয়া নিয়মিতরূপে সম্পাদন করে। আমাদিগের গৃহপিঞ্জরের বিহঙ্গিনীগণের সেসকল কিছুই হয় না।"[১৫০]

---

১৪৯ রাজনারায়ণ বসু, সেকাল আর একাল, ১৭৯৬ শক, পৃ: ৭৩।

১৫০ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *প্রাচীনা ও নবীনা,* বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড, কলিকাতা-৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৩৬৬, পৃ: ২৫২।

উপরোক্ত দুটি উদ্ধৃতিতে পার্থক্য প্রায় কিছুই নেই শুধু এইটুকু ছাড়া যে রাজনারায়ণ মনে করেছেন যে ইংরাজ রমণীরা শ্রমশীলা, বাঙালী মেয়েবা যখন তাদের অনুসরণ করে তখন এই শ্রমপরায়ণতার উদাহরণও তাদের মনে রাখা উচিত। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের মত হল এই যে ইংরাজ নারীরা আলস্যপরায়ণ ঠিকই, কিন্তু তারা তাদের শ্রমের অভাব পূর্ণ করে শরীরচালনা করে। কিন্তু বাঙ্গালি মেয়েরা সাধারণভাবে গৃহবন্দী। কাজেই তাদের দেহচালনা করতে হবে গার্হস্থ্য কর্মের মাধ্যমে। লক্ষণীয় যে, উভয়েই কিন্তু সদর্থকভাবেই হোক বা নঞর্থকভাবেই হোক ইংরাজ মেয়েদের তুলনা আনছেন।

একথা ঠিক যে মেয়েদের মধ্যে এইরকম অপ্রতুলতা ছিল না। বিংশ শতকের সূচনায়ও দেখা যাচ্ছে মেয়েরা নিজেরাই গার্হস্থ্য ধর্ম সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করতেন, তা বঙ্কিমচন্দ্র অথবা রাজনারায়ণের থেকে কিছুমাত্র পৃথক নয়। তাছাড়া, এর মধ্য থেকে তখনকার গার্হস্থ্য প্রণালীর একটি পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। এই সময়কার অন্তঃপুর পত্রিকায় লেখা হল : "সেকালে বধূদিগকে অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া থাকিতে হইত (পল্লীগ্রামে হিন্দুগৃহে এখনও এই নিয়ম প্রচলিত) শাশুড়ি, ননদিনী কিম্বা পরিবারবর্গ মধ্যস্থ মাননীয় ব্যক্তিরা তিরস্কার বা যন্ত্রণা প্রদান করিলেও, বধূদিগকে তাহা নির্ব্বাকভাবে সহিতে হইত, কথার প্রত্যুত্তর করিলেই সে বধূ মুখরা এবং দুরন্ত বলিয়া পরিচিতা হইতেন। বধূগণকে সকাল হইতে সন্ধ্যাতীত পর্যন্ত একভাবে খাটিতে হইত। তবে ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে তখনকার রমণীগণ আধুনিক রমণীগণ অপেক্ষা পরিশ্রমী ও কার্য্যকুশল ছিলেন; এবং তাহাদের স্বাস্থ্য অতি উত্তম ছিল, তাহারা কাজকর্মে কাতর হইতেন না। গৃহস্থালীর যাবতীয় কার্য্য বধূদিগকে নিজহস্তে সম্পাদন করিতে হইত। প্রায় প্রতি পরিবারে ৩০/৪০ জন লোক একতাবদ্ধ হইয়া বাস করিতেন, ইহাদের পাকাদি বধূদিগকেই সমাধা করিতে হইত। অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই নিদ্রা হইতে উঠিয়া, গৃহকার্য্য আরম্ভ করিতেন, প্রাতঃকালীন কার্য্য যে কত ছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রথমে গৃহকর্ম্ম—ঘর নিকানো, উঠান ঝাঁট, বাসন ধোয়া ইত্যাদি কত কাজ, তারপর পূজা আহ্নিকাদির জায়গা করা, বিল্বপত্র বাছা, ধোওয়া, চন্দন ঘষা, পূজার সাজসজ্জা প্রভৃতি ঠাকুরঘরের সমস্ত কাজ করিতে হইত, প্রতি বাড়ীতেই বিগ্রহসেবা হইত। গৃহিণীরা ফুল তুলিতেন ও নাতিনাতনিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও 'কর্ত্তাগিরি' করিতেন এবং সময়বিশেষে তাহারাও (অর্থাৎ দরকার পড়িলে) গৃহকাজে অপটু ছিলেন না। কোন কোন গৃহে ২/১ জন দাসী থাকিলে তাহারাই সন্তান পালনের ভারপ্রাপ্ত হইত।..."

"...মাধ্যহ্নিক পাকাদি সমাপ্তির পর, বাটিস্থ পরিজনবর্গের আহার সমাপনান্তে, বধূরা স্নান করিয়া শিবপূজা করিতে যাইতেন। তারপর যে বাড়িতে যে কয়টি সমবয়স্ক বধূ আছেন, একত্র আহারে বসিতেন, গুরুজনের উচ্ছিষ্ট পাত্রে এবং তাহাদেরই ভুক্তাবশিষ্ট পরম সাদরে খাইতেন। যদি কোনদিন তরকারি কি নুন না থাকিত, তবে চাহিবার উপায় ছিল না, কারণ চাহিয়া খাওয়া বধূদিগের পক্ষে লজ্জাজনক ও নিন্দার কার্য্য ছিল। এই জন্য তাঁহারা বাক্‌শক্তিবিহীনের মত থাকিতেন।...."

"....তাঁহারা আকণ্ঠপরিপূরিত গহনাবিলাসিনী ছিলেন না, ব্রত দানাদির জন্যই বেশী লালায়িত ছিলেন, বাড়ির কর্ত্তারাও অগণ্য অর্থোপার্জন করিতেন, কিন্তু শুধু স্ত্রীকে গহনা পরাইয়াই পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন না, পূজা পার্বণ ব্রাহ্মণ ভোজনে লোকের তৃপ্তিমত আহার দান, অতিথি সেবা, দরিদ্রে দয়া এই সৎবৃত্তিগুলি তাঁহাদের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম ছিল। অধুনাতন প্রায় রমণীগণই স্বামী অবস্থাপন্ন হইলে গৃহকাজে এমন অবহেলা করিয়া থাকেন যে, সংসারের একদিকে বিশৃঙ্খলায় ডুবিয়া যাইতেছে, তাহাতে হাত দেওয়াও বিরক্তিকর মনে করেন। গৃহকার্য নিজে প্রায়ই দেখেন না, এবং কাহাকেও এইসব জন্য কিছু গর্ব্বিতা ও অহঙ্কারী হইতে দেখা যায়। পূর্বে যিনি মাসে হাজার টাকা উপায় করিতেন এমন উপার্জ্জনক্ষম লোকের পত্নীও নিজে ঘর নিকান উঠান ঝাঁট দেওয়া প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য নিজ হাতে করিতেন, তৎকালীন অধিকাংশ রমণীগণই নিরহঙ্কারী ও সরলপ্রকৃতি বিশিষ্টা ছিলেন। তাঁহারা যেমন অধীনা ও অবরুদ্ধাবস্থায় থাকিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে সংসার করিতেন তাহা ভাবিলে বাস্তবিকই হৃদয়ে বড়ই আনন্দের উদয় হয়। কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করিয়া এমন নির্ব্বাকভাবে অত্যাচার নিপীড়িতা হইয়াও, অমন ক্ষমাময়ী, দয়াশীলা, পরদুঃখকাতরা, সরস মধুর কোমল প্রকৃতিবিশিষ্টা সেকালের বঙ্গবধূ ভিন্ন আর কে হইতে পারে? সেকালের রমণীগণ তখনকার নবীনাগণের ন্যায় সৌখিন ছিলেন না এবং সেরূপ হইবারও উপায় ছিল না। এইক্ষণ যেমন নিত্য নব নব বস্তু আবিষ্কৃত হইয়া স্ত্রীলোকের চূড়ান্ত সখ্ মিটাইবার পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছে সেকালে তো তদ্রূপ ছিল না। তখন বেশভূষা মোটামুটি ছিল, ১৮/১৯ টাকা দামের শাঁখা স্ত্রীলোকেরা হাতে পরিতেন, হাতের পাতার উপর হইতে কনুই পর্য্যন্ত শঙ্খখণ্ডে আচ্ছাদিত থাকিত, একবার হাতে পরিলে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কিম্বা বিধবা না হইলে খুলিবার উপায় নাই।..." "সেকালের গৃহিণীদিগের আর একটি কার্য্য ছিল গ্রাম্য বধূদিগের কাজকর্ম দেখা, কোন বাড়ি বেড়াইতে গেলে অগ্রে বধূদিগের শয়নগৃহ পাকগৃহ ও অন্যান্য স্থান পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন কিনা, কোন্ বধূর কেমন গুণপনা, কার ঘর কেমন সুসজ্জিত, কার কেমন শৃঙ্খলা এসব দেখিতেন। গৃহিণীরা বেড়াইতে আসিলেই বধূরা সসম্ভ্রমে গৃহবহির্গত হইয়া আদর অভ্যর্থনার নিমিত্ত দণ্ডায়মান হইতেন। বিধবা হইলে কুশাসন, সধবা হইলে কাষ্ঠাসন ও পান দিতে হইত। পূজনীয়া হইলে ধীর অচঞ্চলভাবে (হস্ত নড়ে কি না নড়ে) পদধূলি সাপটিয়া প্রণাম করিতেন অথবা মস্তকে দিতেন। গৃহিণীদের সহিত বধূদিগের কথা বলিবার নিয়ম পালনে যিনি শৈথিল্য করিতেন তিনিই প্রাচীনাদিগের সমালোচনা বাক্যে জর্জ্জরীভূত হইতেন। এইরূপ রীতিনীতি আর এক্ষণে পল্লিস্থ বঙ্গমহিলাগণের মধ্যেও দৃষ্টি হয় না তবে কদাচিৎ কোন গৃহে এক আধটু এখনও বর্ত্তমান আছে। আধুনিক মেয়েরা আর বিবাহান্তে শ্বশুরগৃহে যাইবার সময় প্রাচীনাগণের উপদেশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহেন। এখন তত অবরুদ্ধাবস্থাও নাই, শ্বশুরগৃহে জ্বালাযন্ত্রণাও নাই।"[১৫১]

এই অতি দীর্ঘ উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে যেমন ঊনবিংশ শতাব্দীর গার্হস্থ্য জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়, যা বিংশ শতকের প্রথমেও কিছুটা হলেও বজায় ছিল, তেমন এও বোঝা

১৫১ *"সেকালের রমণী"*, অন্তঃপুর পত্রিকা, বৈশাখ ১৩০৮।

যায় যে উনবিংশ শতকের সত্তরের দশক থেকে শুরু করে বিংশ শতকেব প্রথম কয়েক বছর পর্যন্ত মেয়েদের শ্রমবিমুখতা সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা প্রচলিত ছিল। এর জন্য দায়ী করা হয় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারকে যা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে শরৎকুমারী চৌধুরাণীর লেখায় : "আজকাল বঙ্গ -সমাজের একদল মানব একদলের মেয়ের উপর সাতিশয় অসন্তুষ্ট। তাঁহারা সেকালের মেয়েদের প্রভূত প্রশংসা ও একালের মেয়েদের যথোচিত নিন্দা করিয়া দিনরাত খুঁৎখুঁৎ করিতেছেন। তাঁহারা বলেন, একালের মেয়েরা অতিশয় বিলাসী হইয়া উঠিয়াছে, কোন কাজকর্ম্ম করে না, কেবল বিছানায় শুইয়া নভেল পড়ে, চেয়ারে বসিয়া কার্পেট বুনে। কেহ বলেন, বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া মেয়েরা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়াছে, বিনা পরিশ্রমে শরীর অসুস্থ হওয়াতে তাহারাও অনিয়ম ও অযত্নে রুগ্ন ও অসৎচরিত্র হয়। কেহ বলেন, শ্বশুর শাশুড়ি স্বামী প্রভৃতি গুরুজনকে একালের মেয়েরা ভক্তি করেন না, অতিথি অভ্যাগতদের যত্ন করেন না, ছেলেপিলেকে স্নেহ করেন না। তাঁহারা বলেন, এ সমস্তই লেখাপড়ার দোষ লেখাপড়া শিখিয়া মেয়েরা বিবি হইয়াছে, তাহাদের আর লেখাপড়া শেখানো উচিত নহে।"[১৫২]

এই পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ করা যেতে পারে সমসাময়িক একজন শিক্ষিতা মেয়ে শ্রীমতী সরস্বতী সেন এই বিষয়ে এই মত জ্ঞাপন করছেন : "এক্ষণে শিক্ষিতা মহিলারা সভ্যভব্য হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন বলিয়া সংসারকার্য্যে অপটু ও অনিচ্ছুক হইয়াছেন। প্রকৃত শিক্ষার অভাবে মহিলাদের বিলাসপ্রিয়তা, আলস্য, অমনোযোগ ইত্যাদি অনেক দোষ দেখা যায়। কিন্তু ও সকল শিক্ষার দোষ নয়, অভ্যাসের দোষ।"[১৫৩] অথচ শ্রীমতী সরস্বতী সেন নিজে আত্মীয়াকন্যা স্নেহলতাকে মানুষ করার দায়িত্ব নিয়ে বেথুন বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার চাকুরিতে ইস্তফা দিয়েছিলেন। ১৮৮০ সালে তিনি ঐ শিক্ষিকা পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং ১৮৮৯ সালে তিনি তা ত্যাগ করেন মাতৃহীন স্নেহলতাকে প্রতিপালন করার জন্য। এজন্য তিনি নিজ পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে আহিরীটোলায় মামারবাড়িতে এসে বসবাস করতে শুরু করলেন। শত অনুরোধেও তিনি বাঁকিপুরে অঘোরকামিনী বিদ্যালয়, বেথুন বিদ্যালয় বা ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করতে রাজী হননি।[১৫৪] নবীনা মেয়েদের প্রতি আরেকটি যে অভিযোগ অলঙ্কারপ্রিয়তা শ্রীমতী সরস্বতীর জীবন তার বিপরীত সাক্ষ্য বহন করে। তিনি ছিলেন বালবিধবা। ১৮৪৮ সালে জন্মগ্রহণ করা এই মহিলার বিয়ে হয় নয় বছর বয়সে, ১৮৫৮ সালে মাত্র এগার বছর তিন মাস বয়সে তিনি বিধবা হন। বৈধব্যের পর তিনি লেখাপড়া শিখে শিক্ষিকা পদ লাভ করে স্বনির্ভর হয়েছিলেন। কিন্তু "পিত্রালয় বা শ্বশুরালয় হইতে কোন ধনসম্পত্তি পান নাই। বিবাহে যাহা অলঙ্কার পাইয়াছিলেন তাহা বিক্রয় করিয়া ৪০০ টাকা পাইয়াছিলেন। তাছাড়া পশমের দ্রব্য — আসন, কুশন, মোজা ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা পাইয়াছিলেন। বেথুন

১৫২ শরৎকুমারী চৌধুরানী, *এ-কাল ও একালের মেয়ে, 'ভারতী ও বালক'* আশ্বিন-কার্তিক, মাঘ ১২৯৮, *শরৎকুমারী চৌধুরানীর রচনাবলী,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সম্পাদক শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী সজনীকান্ত দাস, শ্রাবণ ১৩৫৭, পৃ: ১২২।

১৫৩ শ্রীমতী সরস্বতী সেনের সংক্ষিপ্ত জীবনী, রচনা ও পত্র, পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৪।

১৫৪ তদেব, পৃ: ৬।

স্কুলে চাকুরী করিয়া কিছু আয় হইয়াছিল ও কর্ম্মত্যাগের সময় কিছু টাকা পাইয়াছিলেন। ঐসব আয় হইতে ৮০০০ টাকার কোম্পানির কাগজ খাঁটুরা ব্রাহ্মমন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ১৯১৯ সালে ট্রাস্টডিড্ করিয়া দান করিয়াছেন। অবশিষ্ট যাহা আছে তাহাতে নিজের ভরণপোষণ নির্বাহ করেন। তিনি ছাব্বিশ বৎসর বয়স হইতে বিরাশি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে নিজের ভরণপোষণ ও সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছেন।"[১৫৫] স্ত্রীশিক্ষা মেয়েদের যত দোষের উৎস এ মত যাঁদের সরস্বতী সেনের জীবন তাঁদের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত প্রতিবাদ। অলঙ্কারের লোভ ত্যাগ, ধর্মকর্ম্মের জন্য অর্থ ব্যয়, সংসার প্রতিপালন ইত্যাদি স্ত্রীজনোচিত সকল সাংসারিক কাজই শ্রীমতী সরস্বতী সেন তাঁর বিশ্বাস ও ক্ষমতা অনুযায়ী সাধন করেছিলেন।

অধুনা মেয়েরা দাসদাসীর উপর নির্ভরশীল এ অভিযোগ রক্ষণশীল ব্যক্তিগণ, নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই ব্যক্ত করেছেন। অঘোরকামিনীর জীবন এই অভিযোগ খণ্ডন করেছে এইভাবে : "৫ই এপ্রিল ১৮৭২ বর্দ্ধমান গিয়েছিলাম। সেখানকার মাসিক আয় ছিল ৩৭।।০ টাকা। বর্দ্ধমান আসিবার জন্য তুমিও ব্যস্ত হইয়াছিলে, আমি তোমাকে আনিতে ব্যস্ত হইয়াছিলাম। চলিবে কিরূপে। কিছু ভাবিলাম না, তোমাকে লইয়া আসিলাম। আনিয়া তোমার গুণের পরিচয় পাইতে লাগিলাম। ব্রাহ্মণী রাখিয়াছিলাম, তুমি আসিয়াই তাহাকে ছাড়াইয়া দিলে। প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় বস্তু প্রতিদিন বাজার হইতে আসিত। ডাকঘরের কাজে অনেকক্ষণ আফিসে থাকিতে হয়। রাত্রি ৮টার সময় আমি বাসায় ফিরিয়া আসিতাম। তুমি সন্ধ্যার সময় কাজ শেষ করিয়া প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া দিতে। যখন আমি বাড়ি ফিরিতাম তুমি প্রদীপ জ্বালিয়া আহার দিতে। এইরূপে সুব্যবস্থার দ্বারা ঐ সামান্য আয় হইতে তিন জনের খরচ বাদে তিন মাসে ৫০ টাকা বাঁচাইয়াছিলে।"[১৫৬] শুধু বর্দ্ধমানের একক পরিবারেই নয়, পিতৃগৃহে বা শ্বশুরালয়ের গ্রামীণ যৌথ পরিবারেও অঘোরকামিনী কোন কাজে পিছপা হতেন না : "বর্দ্ধমানের গৃহস্থালীর অবসানের পর তোমার অবস্থা পূর্ব্বে যেমন ছিল আবার তেমনি হইল। পরের অধীনে, পিত্রালয়ে কিম্বা আমাদের বাটীতে কন্যা দুইটিকে পালন করা ও আমার জন্য আত্মীয়দের গঞ্জনা সহ্য করা এই তোমার কাজ ছিল। দেশে ঝি চাকর পাওয়া যায় না। কুলবধূর সমুদয় কাজ, চিঁড়েকোটা, গরুর জাবকাটা, এ সকলই তোমাকে করিতে হইত। সকালে উঠিয়া বাসনমাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, গোবর দেওয়া, এ সকল নিত্যকর্ম্ম ছিল। এদিকে ছাপাখানাতে যাহা কিছু আয় হইত তাহা মূলধনেই রহিয়া যাইত। তোমাকে কিম্বা বাড়িতে কোন সাহায্য করিতে পারিতাম না। তোমার যদিও অনেক অভাব হইত, কিন্তু কখনও আমার কাছে টাকা চাহিতে না।"[১৫৭] অঘোরকামিনীর জীবন সম্পর্কে তাঁর স্বামীর সপ্রশংস উক্তি প্রমাণ করে যে তাঁকে কি পরিমাণ অর্থনৈতিক কৃচ্ছ্রতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। তার মধ্যে বিলাসিতার কোন স্থান ছিল না।

১৫৫ তদেব, পৃ: ২১।
১৫৬ *অঘোর প্রকাশ*, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৩।
১৫৭ তদেব, পৃ: ২৫।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শহরে গৃহস্থ ভদ্রলোকেরা এমন এক জীবনধারা গ্রহণ করেছিলেন যার একটি স্থায়ী মানদণ্ড ছিল, যা বজায় রাখতে গেলে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় আবশ্যিক ছিল, বিশেষ করে স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা এই দুটি বিষয়ে আধুনিক শহরবাসী পরিবারগুলিতে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু ভদ্রলোকদের জীবনে চাকুরী ও সেই কারণে অর্থাগমের ক্ষেত্রে যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল তাতে মহিলাদের পক্ষে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[১৫৮] শ্রীনাথ দত্ত ও হরসুন্দরীর জীবন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইংল্যান্ড থেকে কৃষি বিজ্ঞানে ডিগ্রীলাভ করে তিনি যখন দেশে ফিরে আসেন তখন অ্যালবার্ট কলেজে তিনি অঙ্কের অংশকালীন অধ্যাপনার কাজ পেলেন, মাত্র ১০০ টাকার বিনিময়ে। এর কিছুদিন পরে তিনি আসামের চা-বাগানে ম্যানেজারের কাজ পান ১৫০ টাকার বিনিময়ে। যা পরে বেড়ে দাঁড়ায় ৩০০ টাকায়, তা দিয়ে তিনি বিলাত বাসকালে যে ঋণ করেছিলেন তা শোধ করার জন্য তাঁর ক্রমবর্ধমান পরিবারের ব্যয়নির্ব্বাহ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। কলিকাতায় ফিরে এসে যখন তিনি ৮০ টাকায় নেওয়া ভাড়াবাড়িতে থাকতে লাগলেন তখন শিক্ষকতার বেতন ছাড়াও অতিরিক্ত আয়ের জন্য তাঁকে গরুর দুধ বিক্রয় করতে এবং স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিতে হল। এরপরে ২০০ টাকা বেতনে তিনি ময়ূরভঞ্জের রাজার অধীনে সেটেলমেন্ট অফিসারের কাজ গ্রহণ করেছিলেন। পাঁচ বছর পরে আটটি সন্তানের পরিবার চালানোর জন্য তাঁকে আবার ঋণগ্রস্ত হতে হল। আবার তিনি কণিকার রাজার অধিনে ১৫০ টাকার চাকরি নিলেন, ১৮৯১ সালে বর্ধমান জমিদারীর সহায়ক ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করলেন ৩০০ টাকা প্রারম্ভিক বেতনে যা পরে ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল।[১৫৯]

সুতরাং, এই অনিশ্চিত আয় নিয়ে হরসুন্দরী এমনভাবে জীবন যাপন করতে পারেননি যাতে তাঁর সম্বন্ধে আলস্য, বিলাসিতা, আরামপ্রিয়তার কোন অভিযোগ উত্থাপন করা চলে। বরঞ্চ হরসুন্দরীর সংসার নির্বাহের যে ছবি তাঁর রচনা থেকে পাওয়া যায় তাতে বোঝা যায় যে প্রচণ্ড অর্থকষ্টে তাঁকে কত চিন্তা করে সংসার চালাতে হয়েছিল। হরসুন্দরী লিখেছেন : "আমি কখনও সংসারের কোন সামগ্রী ধারে কিনিতাম না। কাপড় হইতে আরম্ভ করিয়া সকল জিনিসই নগদ দাম দিয়া আনিতাম।...কোন জিনিসই বেশী পরিমাণে একেবারে আনিতে পারিতাম না। কিন্তু একটা জিনিস একেবারে নিঃশেষ হইবার পূর্ব্বেই সেই জিনিস টানাটানি হইবার ভয়েতে আবার কিছু আনিয়া রাখিতাম।"

"আর আমি বাজারের হিসাবও রাখিতাম না। কারণ আমার সংসারে বেশী খরচ হইবার তো সম্ভাবনা ছিল না, বরং পূর্ব্ব মাস হইতে চলিত মাসের খরচ কমই হইত। তাহার কারণ আমার স্বামী আমাকে খরচের জন্য যাহা দিতেন, তাহা হইতে আমাকে অসময়ের জন্য কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হইত। ভাবিতাম, যদি কোন কারণে আগামী মাসে বেশী খরচের দরকার

১৫৮ *The Changing Role of Women in Bengal, 1849-1905*, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৮৭।

১৫৯ *হরসুন্দরী দত্ত : স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্তের জীবনকথা*, পূর্বোক্ত, যত্রতত্র।

হয়, তবে কোথা হইতে যোগাইব? হাতে কিছু না থাকিলে আমি সোয়াস্তি বোধ করিতাম না। "আমার স্বামী বেতন পাইয়া চারি পাঁচ অংশ করিয়া আমাকে যাহা দিতেন, তাহা হইতে আমি প্রাণপণ চেষ্টায় অসময়ের জন্য কিছু তুলিয়া রাখিতাম।...তিনি নিজে যে অংশ খরচের জন্য রাখিতেন, তাহা তিনি মাসকাবার হইবার পূর্ব্বেই শেষ করিয়া ফেলিতেন। অগত্যা যখন টাকার অভাব হইত, তখন আমার নিকট কিছু চাহিতেন। আমি প্রায়ই দিতাম, কিন্তু কখন কখন বাধ্য হইয়া আমাকে মিথ্যা কথা বলিতে হইত। বলিতাম নাই, আবার অভাবে পড়িয়া আমাদের ঋণে পড়িতে হয়, এই ভয়তেই অন্য উপায় না দেখিয়া আমাকে আমার স্বামীর নিকট এরূপ অসত্য বলিতে হইত। এই বাড়ির যখন জমি কেনা হইয়াছিল, তখন জমি নগদ মূল্য দিয়াই কিনিয়াছিলেন।"[১৬০] অর্থাভাব তখনকার ব্রাহ্ম ভদ্রলোকদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। এঁদের স্ত্রীরাও স্বামীদের এই অর্থাভাবের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পিছপা হতেন না। এ রকম একটি উদাহরণ পাওয়া যায় শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মজীবনীতে। একবার তাঁর টাকার টানাটানি যাচ্ছিল, এই সময় মাসের শেষে তাঁর স্ত্রী প্রসন্নময়ীর আয়না ভেঙে গেলে প্রসন্নময়ী স্বামীর অর্থাভাব বুঝে তা কেনার কথা বলেননি। ব্যারিষ্টার দুর্গামোহন দাস ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রীর বিশেষ বন্ধু, তাঁর স্ত্রী ব্রহ্মময়ী একদিন বিকালবেলা এসে দেখলেন : "...প্রসন্নময়ী জলের জালার নিকট দাঁড়াইয়া মুখ দেখিতেছেন ও চুল বাঁধিতেছেন। ব্রহ্মময়ী দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও হেমের মা, ওকি! জলের জালার কাছে কি করছ?" প্রসন্নময়ী হাসিয়া বলিলেন, "ওগো, আয়নাখানা ছেলেরা ভেঙে ফেলেছে। ওঁর বড় টাকার টানাটানি যাচ্ছে, তাই ওঁকে জানাইনি। মাস গেলে কিনব ভেবে জালার জলে মুখ দেখে চুল বাঁধছি।"[১৬১]

অসুস্থ অবস্থাতেও সাংসারিক কার্যে কোনরকম অবহেলা করেননি রাজনারায়ণ বসুর কন্যা ও কৃষ্ণকুমার মিত্রের স্ত্রী লীলাবতী মিত্র। তাঁর জীবনীতে বলা হয়েছে : "পূর্ব্বে লীলাবতীর শরীর বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছিল। কিন্তু ২২ বৎসর বয়সের সময় সূতিকা রোগ হওয়াতে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে জীবনের অবশিষ্টকাল আর স্বাস্থ্যসুখ সম্ভোগ করিতে পারেন নাই। শরীর দুর্ব্বল হইয়াছিল কিন্তু আত্মা চিরদিনই নবীন ছিল। তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছিল বটে কিন্তু সাংসারিক কার্য্যে বা সেবাশুশ্রূষায় কখনও তিনি ক্লান্তিবোধ করিতেন না।"

"প্রতিদিন রাত্রি ৪টার সময় নিদ্রা হইতে উঠিয়া উপাসনা করিতেন। তারপর সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দোয়াত কলম ও খাতা লইয়া কখনও ছাদে কখনও বা বারান্দায় যাইয়া মনে যাহা উদয় হইত, তাহা কখনও গদ্যে কখনও বা পদ্যে লিখিয়া রাখিতেন। কোন কোন দিন দেখা যাইত, রন্ধন করিতে করিতে দোয়াত কলম ও কাগজ লইয়া যাইতেন এবং তখন মনে যে ভাব উদয় হইত, তাহা অতি দ্রুত লিখিতেন। তাঁহার অনেক কবিতা ও প্রবন্ধ রন্ধনশালাতেই রচিত হইয়াছিল।" "তিনি বাড়িতে নানা জাতীয় ফুল, লতা, ভেষজ, গুল্ম সযতনে টবের মধ্যে রক্ষা

১৬০ তদেব, পৃ:পৃ: ১০২-১০৪।

১৬১ শিবনাথ শাস্ত্রী, *আত্মচরিত*, পূর্বোক্ত, পৃ: ১০০।

করিতেন। দৈনন্দিন লিপি লিখিবার পর প্রত্যেক গাছের নিকট যাইয়া নিজ হস্তে তাহাদের পাতার ধূলি ধুইয়া দিতেন, এবং ভৃত্য দ্বারা তাহাদের গোড়া খুঁড়িয়া জল দেওয়াইতেন। ইহার পর গৃহ পরিষ্কার ও গার্হস্থ্য কার্য্যে মন দিতেন। পাচক থাকিলেও পরিবারস্থ লোকদের জন্য কোন না কোন দ্রব্য নিজ হস্তে প্রস্তুত করিতেন। নানাবিধ সুখাদ্য প্রস্তুতের প্রণালী সংগ্রহ করিয়া তাহা দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়া রাখিতেন এবং তদনুসারে আহার্য দ্রব্য তৈয়ার করিয়া সকলকে খাওয়াইয়া অতিশয় তৃপ্তি বোধ করিতেন। প্রতিদিন ভৃত্যগণের আহারের পর বেলা ২/৩টার সময় স্বয়ং আহার করিয়া আপনাকে সুখী মনে করিতেন। আহারের পর প্রতিদিন অধ্যয়ন করিতেন। অধ্যয়ন তাঁহার নিত্যব্রত ছিল।"

"ভাল বস্ত্রাদি অন্যকে দান করিয়া নিজে অতি সামান্য বেশে দিন কাটাইতেন। তাঁহার বিছানায় তোষক ছিল না। তিনি কাঁথার উপর শয়ন করিতেন, কাঁথা গায়ে দিয়া শীত কাটাইতেন। শাল বা আলোয়ান অন্যকে ব্যবহার করিতে দিয়া সুখভোগ করিতেন।"

"তিনি সন্তানদের পালনের ভার কখনও চাকর বা চাকরাণীর হস্তে অর্পণ করিতেন না। প্রথম সন্তানকে এক বৎসরকাল কেবল স্তন্যদুগ্ধ দ্বারা পুষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি সন্তানদিগকে নিজ হস্তে দুগ্ধ খাওয়াইতেন, নিজে তাহাদের মূত্র পুরীষের বস্ত্র ধৌত করিতেন। সন্তান পালনের ইহাই তাঁহার রীতি করিতেন। এতদ্‌সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন, "প্রথম বয়সে আমার স্বাস্থ্য বরাবরই ভাল ছিল। সংসারের কাজকর্ম্মে ও সন্তান প্রতিপালনে আমি কখনও চাকর চাকরাণীর সাহায্য লইতাম না। বিশেষত, নব্যা মহিলারা বসিয়া থাকেন, ঘরসংসার দেখেন না, এইসব দুর্নাম শুনিয়া আমার তীব্র ঘৃণা হইত এবং আমি মনে মনে ভাবিতাম, আমি ওরূপ কখনই হইব না।"[১৬২]

শিক্ষিতা ও আধুনিক মেয়েরা সংসারের কাজে অবহেলা করবে এই ধারণা সমাজে এতই বদ্ধমূল ছিল যে মেয়েরা নিজেরাই এর অপনোদন চেয়েছিল। তারা চাইত নিজেদের চেষ্টায় এমনভাবে গৃহ চালনা করতে যাতে মনে না হতে পারে যে তারা গার্হস্থ্য কর্মে অমনোযোগী হয়ে পড়েছে। আধুনিক পুরুষরাও এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন তা বোঝা যায় যখন তাঁরা নিজেরাই গার্হস্থ্য কিভাবে নির্ব্বাহ হচ্ছে তার দিকে মনোযোগী হচ্ছেন কিংবা এ বিষয়ে মতামত জ্ঞাপন করছেন। প্রকাশচন্দ্র রায় যখন তাঁদের দাম্পত্য জীবনের বিবরণী দিলেন "অঘোর প্রকাশ" গ্রন্থে তখন তিনি তাঁর স্ত্রীর বিশেষ গুণ হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন তাঁর সাংসারিক কার্য্যক্ষতার। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন কিভাবে হাসিমুখে তাঁর স্ত্রী অর্থাভাবজনিত অসুবিধার মোকাবেলা করতেন। শ্রীনাথ দত্তের মতামত জানিয়ে হরসুন্দরী লিখলেন : "...মেয়েদের যে প্রণালীর উচ্চশিক্ষাতে সংসারে উচ্ছৃঙ্খলতা আনে, সেই প্রণালীর শিক্ষা তিনি পছন্দ করিতেন না।"[১৬৩] তাঁর বিশ্বাস ছিল এই যে "...স্ত্রীশিক্ষার সাথে যদি ধর্ম্মশিক্ষার ও

১৬২ লীলাবতী মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ২৮-৩০।
১৬৩ *স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্তের জীবনকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৭৪।

গৃহকর্ম্ম শিক্ষার বন্দোবস্ত থাকে, তবে হয়তো মেয়েরা সবগুণেই ভূষিত হইবার সুযোগ পায়। এই দুটার অভাবে মেয়েদের মন ভাল বিষয়ে না গিয়ে বিলাসিতার দিকে ও আলস্যের দিকে ধাবিত হয়।"[১৬৪] সেজন্য শ্রীনাথ দত্তের ধারণাতে উচ্চশিক্ষিতা সেই মেয়েকেই বলা হবে যে "...উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া স্থির, ধীর, মিতব্যয়ী, সুগৃহিণী, সুমাতা, ধার্ম্মিকা, দয়াবতী, লজ্জাশীলা, ধৈর্য্যশীলা হন,..."[১৬৫] রক্ষণশীল হোন বা প্রগতিশীল, মেয়েরা সংসার প্রতিপালনে সযত্ন ও মনোযোগী হবেন তা সকল পুরুষেব কাম্য ছিল। সুগৃহিণী হওয়াকে তাই তাঁরা "শিক্ষিতা" এই অভিধা প্রাপ্তির একটি প্রয়োজনীয় শর্ত বলে মনে করেছিলেন। মেয়েরা কিভাবে সুগৃহিণী হতে পারবে সে বিষয়ে নানা পরামর্শ ও উপদেশ সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে লাগল। এই রচনাগুলির দ্বারা নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছিল যে পরিশ্রম দ্বারা সাধাসিধাভাবে জীবনযাপন করার মধ্যেই সুগৃহিণী হবার রহস্য নিহিত রয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় কিভাবে গার্হস্থ্যের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন অতি ধীরে হলেও সাধিত হচ্ছিল। নব্যশিক্ষিত পরিবারগুলিতে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা লক্ষ্য করার মতো। ১৮৬০-এর দশক থেকেই বামাবোধিনী পত্রিকায় পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা ও কিভাবে পরিচ্ছন্ন থাকা যায় সে সম্বন্ধে রচনা প্রকাশিত হতে থাকল। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই বলা হল যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা হল সুস্থ থাকার গোড়ার কথা। কিভাবে পরিষ্কার থাকা যাবে সে বিষয়ে ঐ সংখ্যাতেই জানানো হল যে মেয়েরা যেন বাড়ী পরিষ্কার রাখার দিকে মনোযোগী হয়। পরিষ্কার বাড়ীতে আলোহাওয়া যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে হবে। যদি এই কাজের জন্য দাসদাসী পাওয়া না যায় তবে যেন মেয়েরা নিজেরাই এই পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য পরিশ্রমী হয়।[১৬৬] বামাবোধিনী পত্রিকার পঞ্চম সংখ্যায় স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় হিসাবে বলা হল যে জামা-কাপড় পরিষ্কার রাখলে মনের প্রফুল্লতা যেমন বাড়ে তেমন শরীরের স্বাস্থ্যও বজায় থাকে। ঐ একই লেখায় অপরিচ্ছন্নতা কেন ঘটে তার কারণ ব্যাখ্যা করে বলা হয় যে মেয়েদের কাপড় বেশী ময়লা হয় তারা রান্না বা ঘরের কাজে ব্যাপৃত থাকে বলে। এছাড়াও মেয়েদের কুঅভ্যাস হল তারা যেখানে সেখানে বসে। তাই "বামবোধিনী"র পরামর্শ যদি মেয়েরা পূজার সময় দামী কাপড় না কিনে ধোপার মাহিনা বাড়িয়ে দেয় তাহলে কাপড়চোপড় পরিষ্কার থাকে। যদি ধোপার খরচ সাশ্রয় করতে চায় তবে নিজেরাই বাড়িতে সাজিমাটি দিয়ে কাপড় পরিষ্কার করতে পারা যায়।[১৬৭] শুধু ঘরবাড়ি বা জামা-কাপড় নয়, নিজের শরীর পরিষ্কার রাখাও স্বাস্থ্য রক্ষার একটি আবশ্যিক শর্ত। কিভাবে তা করা যাবে "বামাবোধিনী" পত্রিকাতে তার উপায় নির্দেশ করা হল। খাওয়ার পরে ভালভাবে মুখ ধোওয়া এবং খড়কে কাঠির দ্বারা মুখের ভেতর থেকে খাবারের টুকরো বার করা দেহ পরিষ্কার রাখার উপায়। এর ফলে দাঁত খারাপ হবে না এবং মুখে দুর্গন্ধ হবে না। দাঁত মাজা ছাড়াও দাঁত পরিষ্কার রাখার জন্য কতকগুলি কুঅভ্যাস যেমন,

১৬৪ তদেব। পৃ: ১৭৫।

১৬৫ তদেব।

১৬৬ *"গৃহ পরিষ্কার", বামাবোধিনী পত্রিকা,* ১ম সংখ্যা ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১২৭০।

১৬৭ "স্বাস্থ্যরক্ষা", বামাবোধিনী পত্রিকা, ৫ম সংখ্যা পৌষ, বঙ্গাব্দ ১২৭০।

পান খাওয়া, দাঁতে মিশি দেওয়া ইত্যাদি বর্জনীয়। এইসঙ্গে এ-ও নিষেধ করা হল পায়ে আলতা দিতে এবং নখে মেহেন্দি লাগাতে। কারণ "অসভ্যলোকে সুন্দর দেখাইবার জন্য নানা রঙে শরীর চিত্র-বিচিত্র করে।"[১৬৮] এছাড়াও বামাবোধিনী পত্রিকার ঐ লেখাটিতে বলা হল মেয়েরা চুলে এত বেশী তেল দেয় ও "রাজ্যের দড়ী, নেকড়া জড়ায়, এতে চুল ময়লা ও দুর্গন্ধ হয়।"[১৬৯] এমনকি অলঙ্কার পরাও পরিচ্ছন্নতার বিরোধী, কারণ অলঙ্কারের ময়লা গায়ে জমে শরীরকে অপরিচ্ছন্ন করে তোলে।[১৭০] ছেলেমেয়েদের পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দিয়ে তৃপ্ত হরসুন্দরী লিখলেন "আমার সন্তানেরা আরো একটা গুণ পাইয়াছে, অর্থাৎ পরিষ্কার থাকা ও সমস্ত কাজই পরিচ্ছন্নভাবে করা। বাস্তবিকই তাহারা এ বিষয়ে এমন অভ্যস্ত যে তাহা দেখিয়া আহ্লাদ হয়।"[১৭১] লীলাবতী মিত্র কিভাবে বাড়ীঘর এমনকি গাছপালা পরিষ্কার করতেন তার বর্ণনা ইতিপূর্বেই দেওয়া হয়েছে। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে "আদর্শ গৃহিণী" নামে একটি পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনায় পার্বতী বসু নামে একজন মহিলা লিখলেন যে দ্বিপ্রাহরিক আহার শেষ হবার পরেও একজন "আদর্শ গৃহিণী" কখনো বিশ্রাম নেবেন না। বিকালের আহার্য রান্না করতে যাবার আগে যে সময় থাকবে তখন তারা ছেঁড়া জামা বা ছেঁড়া বোতাম মেরামত করবেন, বালিশের ঢাকা পরাবেন, ময়লা চাদর বদলাবেন, যা কিছু অপরিচ্ছন্ন তা পরিষ্কার করার উপযুক্ত সময় ঐটুকুই। এছাড়াও, আদর্শ গৃহিণী প্রতিদিন সকালে উঠবেন, সমস্ত কাজকর্ম এবং দুপুরের রান্না করবেন।[১৭২] "একালের মেয়েরা কতক পরিমাণে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হইয়াছেন। তাঁহারা পান সাজিতে বসিয়া কাপড়ময় চুন খয়েরের হাত মুছিতে রাজী নহেন, তাঁহারা ভাতের হাঁড়ির কালি ও ব্যঞ্জনের হলুদে হস্ত রঞ্জিত করিতে নারাজ। পূর্ব্ব প্রচলিত নিয়ম আছে যে, রন্ধনকারিণী হাত মুখ ধুইয়া, পরিধানবস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, পরিষ্কার বস্ত্র পরিয়া তবে পরিবেশনে যাইতেন। এ নিয়ম যত পালন হউক বা না হউক, সেকালের মহিলারা গামছার কার্য্য সমস্তই নিজ পরিধান বস্ত্রে সারিয়া লইতেন। এ-কালের মেয়েরা পরিচ্ছন্ন হওয়াতে যাহাতে হাত অপরিষ্কার না হয়, তাহার উপায় করেন, তাঁহারা হাত মুছিবার জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করেন।"[১৭৩]

আলস্যবশত মেয়েদের স্বাস্থ্যহানি হচ্ছে একথা অন্তত তথাকথিত নবীনা মহিলারা মানতে চাননি। এসময় দেখা গেল যে, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ধারণার কিছু বদল ঘটছে। "অন্তঃপুর" পত্রিকার একটি লেখায়, যা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, সেকালে মেয়েরা যদি বাড়িঘর পরিষ্কার না করে রাখত তবে তারা নিন্দিত হত। এখন বাড়ি পরিষ্কার রাখার সাথে সাথে নিজেদের শারীরিক পরিচ্ছন্নতার দিকেও নজর দিতে বলা হচ্ছে। কারণ, পরিচ্ছন্নতাই

---

১৬৮ "স্বাস্থ্য রক্ষা", "বামাবোধিনী পত্রিকা", ৭ম সংখ্যা ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১২৭০।

১৬৯ তদেব।

১৭০ তদেব।

১৭১ স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্তের জীবন কথা, পূর্বোক্ত, পৃ: ১০২।

১৭২ বামাবোধিনী পত্রিকায় এই রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১২৮৮ বঙ্গাব্দে (মার্চ ১৮৮১)। The Changing Role of Bengali Women, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৯৬-তে উল্লিখিত।

১৭৩ *শরৎকুমারী চৌধুরাণী রচনাবলী, এ-কাল এ-কালের মেয়ে,* পূর্বোক্ত পৃ: ১২৩।

স্বাস্থ্যরক্ষার প্রাথমিক শর্ত, এ ধারণা ক্রমশ গুরুত্ব পাচ্ছিল। পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন অনুভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সূতিকাগৃহের অবস্থা নিয়ে ভাবনার অবতারণা হল। কারণ, এই সূতিকাগৃহগুলি অপরিচ্ছন্নতার চরম উদাহরণ। ১৮৫০-এর দশকে এই রকম এক অপরিচ্ছন্ন সূতিকা গৃহের বিবরণ দিয়েছেন কৃষ্ণকুমার মিত্র : "আমার জন্মের পূর্বে বাটীর ভাল ঘরখানি সূতিকাগাররূপে ব্যবহৃত হইত। কোথা হইতে কুসংস্কারের এক ঢেউ আসিল, বাড়ির স্ত্রীলোকেরা সর্বাগ্রে মনে করিলেন যে-ঘরে সন্তানের জন্ম হয় সে ঘর অশুচি হইয়া যায়। তাই আমার যখন জন্ম হয়, অন্তঃপুরের একপার্শ্বে একখানি মধ্যমাকারের ছনের ঘর তৈয়ার হইয়াছিল। সে ঘরখানি মানুষের বাসের যোগ্য ছিল। ইহার পর কুসংস্কার ক্রমে গভীর হইয়া উঠিল। অন্তঃপুরের মধ্যে একখানি চালা প্রস্তুত হইত, তাহাতে একটিমাত্র দরজা থাকিত, তাহার মেঝে ও আঙ্গিনার মেঝে সমতল হইত। আমার তিনটি ভাইবোন এইরূপ ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। দিনরাত সে ঘরে আগুন জ্বালাইয়া রাখা হইত। ধোঁয়া বাহির হইবার কোন পথ ছিল না।"

"গ্রামের মাইঠাল ও মুসলমানেরা ধাত্রীর কার্য করিত। তাহারা ধাত্রীর কার্য কিছুই জানিত না, কিন্তু গ্রামস্থ লোকদের তাহাদের উপর খুব বিশ্বাস ছিল। তাহারা স্বভাবতই অপরিষ্কার, তাহাদের গায়ে ময়লা জমিয়া থাকিত। সূতিকাঘরে যাইবার সময় সর্বাপেক্ষা মলিন বস্ত্র পরিয়া ঘরে ঢুকিত। বাঁশের অপরিষ্কার চাঁচড় দিয়া নাড়ী কাটিত। বাড়ির যত ময়লা ছেঁড়া কাঁথা, বালিশ ও চাটাই প্রসূতির শয্যার জন্য রাখিয়া দেওয়া হইত।"[১৭৪]

সূতিকাগৃহের এই অবস্থা, যা কৃষ্ণকুমার ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে লক্ষ্য করেছিলেন, তা সমগ্র শতাব্দী তো বটেই বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও অপরিবর্তিত ছিল। ১৩০৯ বঙ্গাব্দের "অন্তঃপুর" পত্রিকায় এ বিষয়ে বিশদভাবে লেখা হয়েছিল : "এ দেশে সর্ব্বত্রই আঁতুড়ঘরের অবস্থা অতীব শোচনীয়। গৃহাভ্যন্তরে যে স্থান সর্ব্বাপেক্ষা অন্ধকারাচ্ছন্ন, সঙ্কীর্ণ ও স্যাঁতসেঁতে সেইখানেই সাধারণত আঁতুড়ঘর নির্ম্মিত হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে গৃহপ্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে সূতিকা গৃহরূপে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য ক্ষুদ্র একচালা ঘর নির্ম্মিত হয়। প্রসবের পরে মাতা ও শিশু একমাস বা ততোধিক কাল সেই গৃহে বাস করে, এবং অবশেষে স্নান ও পূজাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা শুদ্ধ হইয়া সূতিকাগার হইতে বহির্গত হয়। তৎপর সেই আঁতুড়ঘর ভাঙ্গিয়া বা পুড়াইয়া ফেলা হয়। সূতিকাগৃহে বাসকালে শয্যার নিমিত্ত খাট, চৌকি, তোষক বা অতিরিক্ত বস্ত্র প্রভৃতি ব্যবহার নিষিদ্ধ। কি শীত, কি বর্ষা, সকল ঋতুতেই এইরূপভাবে সূতিকাগৃহ নির্ম্মিত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শুষ্ক গোময় বা কাষ্ঠের ধোঁয়াতে অহর্নিশি বাস করিয়া মাতা ও শিশুকে কত ক্লেশই না সহ্য করতে হয়, কেবলমাত্র সন্তানের মুখ দেখিয়াই যে মাতা সমুদয় কষ্ট সহ্য করিয়া থাকে ইহাতে সন্দেহ নাই।"[১৭৫] বোম্বাই শহরে এর বিপরীত চিত্র দেখে এসে লেখিকা লিখলেন : "আমরা একবার বোম্বাই নগরস্থ

১৭৪ কৃষ্ণকুমার মিত্র, *আত্মচরিত*, বাসন্তী চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা ১৯৩৭।
১৭৫ *অন্তঃপুর পত্রিকা, "সূতিকা গৃহ"*, কার্তিক ১৩০৯ বঙ্গাব্দ।

সূতিকা আশ্রম দেখিতে গিয়াছিলাম। সেই সময় সেখানে কয়েকজন প্রসূতি বাস করিতেছিল, তাহাদিগের প্রতি তত্রস্থ মহিলা চিকিৎসক ও ধাত্রীদিগের যত্ন দেখিয়া আমরা বড়ই আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। সূতিকা গৃহের পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া ততোধিক আশ্চর্য্য বোধ হইল।"[১৭৬] এ দৃশ্যের অভিজ্ঞতা লেখিকার নিজ প্রদেশের আঁতুড়ঘরের দুরবস্থা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে : "দেশ-প্রচলিত আঁতুড়ঘরে প্রবেশ করিয়া তথায় কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করাই অসাধ্য। দুর্গন্ধ ধূমপূর্ণ অন্ধকার গৃহে মাটির উপরে একখানা পাটী বা মাদুর পাতা তাহার উপর প্রসূতি ছিন্ন অপবিষ্কার কাপড়ে শিশুটিকে লইয়া পড়িয়া আছেন, এদৃশ্য পাঠিকাগণ কল্পনা করিয়া লউন। এই সকল দুরবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিবার উপায় বিধানের জন্য আমাদিগকে বিশেষরূপে চেষ্টা করিতে হইবে। এ বিষয়ে আমাদের মনে হয় যে সর্ব্বাগ্রে সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণ ও সুনিপুণা ধাত্রী নিয়োগ, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি, প্রচলিত কুসংস্কার দূরীকরণ এবং পরিবারস্থ রমণীগণের শিশুপালন ও প্রসূতির সেবাশুশ্রূষা সম্বন্ধে শিক্ষা একান্ত প্রয়োজনীয়।"[১৭৭] সূতিকাগৃহে প্রসূতির দুরবস্থা ও সেইকারণে প্রসূতি ও শিশুর মৃত্যু হয়ে থাকে এ সম্বন্ধে "অন্তঃপুর" পত্রিকায় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন শ্রীননীবালা দাসী। তাঁর মতে সেকালের গৃহিণীরা নিজেরা প্রসূতিগৃহে যে কষ্ট সহ্য করেছিলেন, তাঁরা পরবর্তীকালে সেই কষ্ট দিয়ে একপ্রকার সুখানুভব করেন। সূতিকাগৃহে জননী না পায় শয্যা, না পায় পুষ্টিকর খাবার। সেখানে বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখা উচিত, জননীকে লঘুপাচ্য খাবার খেতে দেওয়া উচিত, বেশী ঠাণ্ডা বা বেশী গরম কোনটাই প্রসূতি বা শিশুর পক্ষে ভাল নয়। কিন্তু এ দেশের প্রসূতিগৃহে ঠিক এর বিপরীত কাজগুলো করে শিশু ও মাতা উভয়েরই অকালমৃত্যু ঘটানো হয়ে থাকে।[১৭৮] বাঙালী মেয়েদের কেন অকালে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, তার কারণ নির্দেশ করলেন জনৈক হিন্দু মহিলা "অন্তঃপুর" পত্রিকার পাতায়। তিনি যদিও বলেছেন যে আলস্য মেয়েদের স্বাস্থ্যহানির অন্যতম একটি কারণ। কিন্তু তিনি শুধু আলস্যকে দায়ী করেননি। "অল্প বয়স হইতে বহু সন্তানের মাতা হওয়া" মেয়েদের স্বাস্থ্যভঙ্গ করে, বলেছেন এই অজ্ঞাতনামা লেখিকা। তাঁর মত হল এই যে আগে বাল্যবিবাহ থাকলেও উপযুক্ত বয়স পর্য্যন্ত কন্যাকে শ্বশুরগৃহে পাঠান হত না। কিন্তু এখনকার যুবকরা দু-পয়সা উপার্জ্জন করতে শিখেই মাতাপিতার সঙ্গে পৃথক হয়ে স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা সংসার পাতে। ফলে বালিকা বধূ একই সঙ্গে ছোট শিশু ও গার্হস্থ্যভারে জর্জরিত হয়ে পড়ে। অবশ্য যৌথ পরিবারে থাকলেও প্রসূতি যে যত্ন পায় না, তা স্বীকার করেছেন লেখিকা। এছাড়াও তিনি বলেছেন আগে মেয়েরা সব গৃহকর্ম্ম নিজেরা সম্পন্ন করত, ফলে অজ্ঞাতসারে তাদের দৈহিক চালনা হয়ে যেত। কিন্তু এখন গৃহভৃত্যের উপর নির্ভরশীলতা মেয়েদের মধ্যে আলস্য বৃদ্ধি করছে।[১৭৯] কাজেই আলস্য বা গৃহকর্মে অবহেলা

১৭৬ তদেব।

১৭৭ তদেব।

১৭৮ শ্রী ননীবালা দেবী "সূতিকাগারে প্রসূতির শুশ্রূষা", অন্তঃপুর পত্রিকা, বৈশাখ ১৩১১ বঙ্গাব্দ।

১৭৯ "মহিলার স্বাস্থ্য" জনৈক হিন্দু মহিলা, অন্তঃপুর পত্রিকা, আষাঢ় ১৩১০ বঙ্গাব্দ।

নয়, মেয়েদের স্বাস্থ্যহানির কারণ তৎকালীন সমাজের কুপ্রথা একথা মেয়েরাই উপলব্ধি করেছিলেন সবচেয়ে বেশী।

কৃষ্ণকুমার মিত্র যদিও ধাত্রীদের অপরিচ্ছন্নতার উল্লেখ করেছেন তবুও আলোচ্য সময়ে বাংলাদেশে সন্তানের জন্ম হত ধাত্রীদের হাতে। যদিও কখনো কখনো ধাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ দক্ষ ছিলেন, তবু এদের মধ্যে অশিক্ষিতার সংখ্যাই ছিল বেশী। "দাসী" পত্রিকায় একজন শিক্ষিতা ধাত্রীর কথা লেখা হয়েছিল। ফুলমণি নামে এই মহিলা প্রথমে কলিকাতায় ব্যবসা শুরু করেছিলেন কিন্তু সেখানে সফল না হওয়াতে তিনি ঢাকা এসে ব্যবসা শুরু করেছিলেন। ঢাকা থেকে ১৫ মাইল দূরে নারায়ণগঞ্জে একজন প্রসূতিকে দেখার জন্য ঢাকার একজন অভিজ্ঞ অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন এই ফুলমণিকে নিয়ে এসেছিলেন। এর আগে সেখানে আরো একজন দেশীয় ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন। এই বাড়ীতে কিভাবে ফুলমণি নিরাপদে শিশুকে প্রসব করালো এবং আগুনের হাত থেকে প্রসূতি ও শিশুকে রক্ষা করেছিল "দাসী" পত্রিকায় তার বিবরণী দেওয়া হয়েছে।[১৮০] কিন্তু সকলেই ফুলমণির মতো দক্ষতা অর্জন করতে পারত না। এইরকম এক অশিক্ষিতা ধাত্রী সদ্যোজাত শিশুকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল, তার কান্নায় মায়ের ঘুম ভেঙে যাওয়াতে ঐ শিশু প্রাণে রক্ষা পেয়েছিল। এই ঘটনার উল্লেখ করে অন্তঃপুর পত্রিকায় বলা হল : "শিশু পালনের জন্য সচরাচর যেরূপ মূর্খা ধাত্রী নিযুক্ত করা হইয়া থাকে, তাহাদিগকে পূর্ব্ব হইতে প্রসূতির গৃহে রাখিয়া যথাসম্ভব সকল বিষয় শিক্ষা দান করা কর্ত্তব্য। প্রসূতির প্রথম অবস্থায় মাতা অপেক্ষা ধাত্রীর বা দাসীর উপরেই শিশুর ভার অধিক ন্যস্ত থাকে, সুতরাং ধাত্রীর বা দাসীর অমনোযোগিতা ও মূর্খতাপ্রযুক্ত অনেক বিপদ ঘটিয়া থাকে। এরূপ ঘটনা বিরল নহে।"[১৮১]

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে মহিলারা তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হচ্ছিলেন। মহিলাদের যে একান্ত নিজস্ব ক্ষেত্র, অর্থাৎ মাতৃত্ব এবং তজ্জনিত নানা সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করার মতো মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য তাঁরা অর্জন করেছিলেন। এছাড়াও সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে যে দৈনন্দিন জীবনে ছোটখাট রোগভোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় — এ সম্বন্ধে মহিলাদের ওয়াকিবহাল করে তোলার দায়িত্ব তাঁরা নিজেরাই নিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে গৃহে প্রাথমিক চিকিৎসার ভার নিতেও তাঁরা সাহসী হয়েছিলেন এবং তাঁরা এ বিষয়ে লেখনী ধারণ করে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও মতামত প্রকাশ করেছিলেন। "আমার সঙ্গে সর্ব্বদা হোমিওপ্যাথিক ঔষধের একটা বড় বাক্স ও একখানা ডাক্তার রাধাকান্ত ঘোষ মহাশয়ের বড় চিকিৎসা পুস্তক থাকিত, তাহা হইতে রোগের ঔষধ ঠিক করিয়া নিজের অসুখ কমাইতাম, কখনও সারিয়াও যাইত। আমরা জঙ্গলে জঙ্গলে থাকিতাম, তখন ডাক্তার মিলিত না। সন্তানদের এবং স্বামীর অসুখ হইলেও ঐভাবে ঔষধ দিয়া অসুখ কমাইতাম বা সারাইতাম।"[১৮২] হরসুন্দরী

১৮০ *"ফুলমণি", "দাসী" পত্রিকা,* অগ্রহায়ণ, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ।

১৮১ *"সূতিকা গৃহ", অন্তঃপুর পত্রিকা,* কার্ত্তিক ১৩০৯ বঙ্গাব্দ।

১৮২ *স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্তের জীবন কথা,* পূর্বোক্ত, পৃ: ১৭১।

হোমিওপ্যাথিক ওষুধ ব্যবহার করে রোগের চিকিৎসার ব্যয় সাশ্রয় করেছিলেন, কিংবা যেখানে ডাক্তার পাওয়া যায় না সেখানে চিকিৎসার উপায় করেছিলেন। কিন্তু ইন্দিরা দেবী আরো একটু অগ্রণী হয়ে জানিয়েছেন কোন্ অসুখে কি ঔষধ দিলে দ্রুত উপকার পাওয়া যাবে। যেমন, জ্বর হলে অ্যাকোনাইট ৬, তা না থাকলে আদা চাকা চাকা করে কেটে প্রদীপের শিখায় দগ্ধ করে মিছরি সহযোগে দিলে অ্যাকোনাইটের কাজ করবে, জ্বর ও কাশি হলে কালতুলসি পাতার রস মধু এবং পানের রসসহ খাওয়াতে হবে, হাঁপানি কাশিতে লোহার পলায় তেল গরম করে সৈন্ধব লবণ দিয়ে মালিশ করতে হবে, ছোট ছেলেদের ঘুংরিবালসা কাশিতে দীপ-তেল (জ্বলন্ত প্রদীপের সলতে বেয়ে যে তেল ফোঁটা ফোঁটা পড়ে) একটি পাত্রে ধরে তা মালিশ করলে নিরাময় হবে, এইরকম খুঁটিনাটি নানা ওষুধের কথা জানিয়েছেন ইন্দিরাদেবী।[১৮৩] বাড়িতে হঠাৎ কারো অসুখ করলে টোটকা ওষুধ ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে লীলাবতী মিত্র লিখলেন : "সেকালের রমণীগণ দেশীয় গাছগাছড়ার ঔষধাদি এমন জানিতেন যাহাতে বিজ্ঞ চিকিৎসকেরাও হার মানিতেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই টোটকা ঔষধ, গাছগাছড়া গৃহে রাখিতেন। বাড়িতে কাহারও অসুখ হইলে তাহা ব্যবহার করিতেন। কিন্তু ক্রমেই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমাদের অধোগতি হইয়া গিয়াছে। এখন গৃহস্বাস্থ্য সম্বন্ধে বঙ্গবাসী না ইংরাজী মতে চলেন, না বাঙ্গালা মতে চলেন, কিছুই নাই, ইংরাজী মতে বাড়িঘর পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন রাখা এবং বাড়ি মধ্যে ফেনাইল ছড়ানো ইত্যাদি এবং বাঙ্গালা মতে বাড়িতে গোবরজল ছড়ানো ধুনা গন্ধকের ধূম সকাল সন্ধ্যায় দেওয়া এ দুইয়ের একটাও হয় না। প্রাচীনারা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে পরীক্ষিত টোটকা ঔষধ জানেন নবীনাদের তাহা জানিয়া রাখা উচিত। কেননা যাহা তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা আমরা কেন লইব না?"[১৮৪] এরপর শ্রী লীলাবতী মিত্র জানিয়েছেন কিভাবে ম্যালেরিয়া বা প্লেগের মতো মারাত্মক রোগ প্রতিরোধ করা যেতে পারে। যেমন, ম্যালেরিয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে মাঝে মাঝে চিরতার জল খাওয়া, মশারির তলায় শোওয়া, জ্বর বাড়লে ওডিকোলন দিয়ে বাতাস করা ইত্যাদি পালনীয়। প্লেগ হলে বাড়ির সর্বত্র ফিনাইল ও কর্পূর ছড়ানো কর্তব্য, জুতাপায়ে হাঁটা উচিত ইঁদুর বাড়ির মধ্যে মারা যেতে না দেওয়া—এইসব বিধিনিষেধ মানলে প্লেগ ছড়াতে পারে না।[১৮৫] লীলাবতীর রচনা থেকে বুঝতে পারা যায় যে গৃহের স্বাস্থ্যরক্ষাই তাঁদের কাছে মুখ্য ছিল, এজন্য তাঁরা দেশী পদ্ধতি বর্জন করতে যেমন চাইতেন না, ইংরাজী পদ্ধতি গ্রহণ করতেও তেমন আপত্তি করতেন না।

এইভাবে গৃহে শৃঙ্খলা বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব দিতে শুরু করেছিলেন মেয়েরা। "পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে সুশৃঙ্খলরূপে গৃহের যাবতীয় কার্য্য সুসম্পন্ন করা সকল রমণীরই একটি বিশেষ কর্ত্তব্য কর্ম্ম"[১৮৬]—অন্তঃপুর পত্রিকার পাতায় লিখলেন শ্রীহেমন্তকুমারী গুপ্তা। এভাবে গৃহিণী

১৮৩ ইন্দিরা দেবী। *আমার খাতা*, আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস্। কলিকাতা ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, পৃ: ১৪২।
১৮৪ শ্রী লীলাবতী মিত্র, *"গৃহস্বাস্থ্যে রমণীর দৃষ্টি"*, *অন্তঃপুর পত্রিকা*, পৌষ, ১৩১১ বঙ্গাব্দ।
১৮৫ তদেব।
১৮৬ শ্রীহেমন্তকুমারী গুপ্তা, *"গৃহিণী ও গৃহশৃঙ্খলা"*, অন্তঃপুর পত্রিকা, ভাদ্র ১৩০৯।

কি করে সুগৃহিণী হবেন তা বলেছেন লেখিকা। তিনি নিজে যদি কার্যপটু ও বুদ্ধিমতী হন তবে দাসদাসী বধূ কন্যা সকলকে পরিচালনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে। গৃহিণীকে হতে হবে নিয়মনিষ্ঠ ও তীক্ষ্নদৃষ্টিসম্পন্ন তত্ত্ববধায়িকা, তবেই তাঁর গৃহ হবে সুসজ্জিত।[১৮৭] গৃহস্থালীর কথা শীর্ষক একটি লেখায় কিভাবে আলাদাভাবে শোবার ঘর, খাবার ঘর, রান্নার ঘর সাজানো উচিত তা বিস্তারিতভাবে শেখানো হয়েছিল। যেমন, শোবার ঘরে থাকবে শুধু বিছানা, আলনা, জলের কুঁজা এবং আলো। একতলা শোবার ঘরে পালঙ্ক বা তক্তপোষ পাতা উচিত, কি ধরনের বিছানা, গদী, বালিশ, পাশবালিশ ব্যবহার করা ভাল ঐ রচনাটিতে তা বলা হয়েছিল। অনুরূপভাবে শেখানো হয়েছিল খাবার ঘরে কিভাবে খাবার রাখলে পরে তা ভাল থাকবে, এপ্রসঙ্গে লোহার জাল লাগানো ছোট আলমারির কথা বলা হয়েছিল। রান্নাঘরের ধোঁয়া বেরনোর জন্য চিমনী রাখা উচিত। ভাঁড়ার ঘরে কি কি থাকা উচিত সব এই রচনাটিতে উল্লিখিত হয়েছিল।[১৮৮] "গৃহ মনুষ্যের আরামের স্থান। গৃহ সুখান্বেষীর সুখভবন, শান্তিহারার শান্তিআলয়, বাহিরের উৎপীড়নে উৎপীড়িত জনের আশ্রয়স্থান, জীবন সংগ্রামে পরিশ্রান্ত জনের বিশ্রাম ভবন, দুঃখদারিদ্র্যের সময় সান্ত্বনা লাভের স্থান। এবং সকল অবস্থায় সকলের চির আনন্দ নিকেতন। এককথায় গৃহ মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার অভাব পূর্ণ করিবার স্থান। রমণী এই গৃহের কর্ত্রী সেইজন্য এই অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের সর্ব্ববিধ অভাব মোচনের ভার রমণীর হস্তে। যে রমণী গৃহকে এইরূপ অভাব পূর্ণ করিবার স্থলরূপে প্রস্তুত করিতে পারেন, তিনিই আদর্শ, তিনি তাহার পারিবারিক কর্ত্তব্য সুন্দররূপে পালনে সর্মথ হইয়াছেন বলা যাইতে পারে।"[১৮৯]

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সময় যে আশঙ্কা সকলের মনে উদিত হয়েছিল যে শিক্ষিতা মেয়েরা আর রোজকার সাংসারিক কাজ করতে চাইবে না, কাজেই তাদের শিক্ষার বিষয় হোক ভিন্ন ধরনের যাতে গার্হস্থ্য কর্মকে অবহেলা করতে না শেখে, মেয়েরা লেখাপড়া শিখে এই আশঙ্কাকে সম্পূর্ণ অপনীত করেছিল। শিক্ষিতা মেয়েরা সংসারকে অবহেলা করতে না চেয়ে তাকে গড়তে চেয়েছিল আরো সার্থকভাবে, তারা চেয়েছিল তাদের শিক্ষা ও সেই শিক্ষা থেকে প্রাপ্ত বিবেচনা শক্তির সফল প্রয়োগ করে সুখের নীড় সৃষ্টি করতে।

গার্হস্থ্যের বাইরে নব শৃঙ্খলায় নারী

শিক্ষাপ্রসার ও সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি মেয়েরা বাইরে বেরিয়ে নানা রকম সামাজিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেছিল। অবশ্য উনবিংশ শতাব্দী থেকেই জমিদারীর অধিকারিণী মহিলাগণ অনেক ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতেন। এরকম দু'জন ভূম্যধিকারিণীর কথা লিখেছেন কৃষ্ণকুমার মিত্র। সন্তোষের জমিদার জাহ্নবী চৌধুরাণী মহাশয়া অনেক দুর্বল তালুকদারদের সম্পত্তি গ্রাস করেছিলেন তবুও "তিনি

১৮৭ *"গৃহস্থালীর কথা", অন্তঃপুর পত্রিকা,* কার্তিক ১৩০৯।
১৮৮ তদেব।
১৮৯ বনলতা দেবী, *"রমণীর পারিবারিক ও সামাজিক কর্তব্য, অন্তঃপুর পত্রিকা,* বৈশাখ ১৩১০ বঙ্গাব্দ।

দেশের উন্নতির জন্য অনেক কার্য করিয়া গিয়াছেন। জাহ্নবী হাইস্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয়, অতিথিশালা তাঁহার প্রধান কীর্তি।"[১৯০] জাহ্নবী চৌধুরাণী মহাশয়ার প্রতিবেশী জমিদার ছিলেন বিন্দুবাসিনী চৌধুরাণী। তিনি টাঙ্গাইলে বিন্দুবাসিনী হাইস্কুল, দ্বারকানাথ চিকিৎসালয় ও বিন্দুবাসিনী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।[১৯১] ১৮৬০-এর দশকে বগুড়া শহরে স্বেচ্ছায় ধাত্রীর কাজ করতেন ডাঃ শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়। এছাড়াও, তিনি রোগে শোকে সবার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন।[১৯২] ১৮৭৯ সালের মে মাসে কেশবচন্দ্র সেন "আর্য্য নারীসমাজ" প্রতিষ্ঠা করলে তাঁর পত্নী জগন্মোহিনী দেবী মেয়েদের যথেষ্ট উৎসাহিত করলেন। নববিধানের যে যে অনুষ্ঠান বাইরে পুরুষদের নিয়ে কেশবচন্দ্র সম্পাদন করলেন, জগন্মোহিনীদেবী অন্দরমহলে মেয়েদের নিয়েও তাই করলেন। একদিকে পুরুষরা জল সংস্কার করতে বেরোলেন, অন্যদিকে নারীরা জগন্মোহিনীর নেতৃত্বে জলসংস্কারে বেরোলেন। একদিকে পুরুষরা নগর সংকীর্তনে বেরোলেন তা জগন্মোহিনীও মেয়েদের নিয়ে খোল করতাল সহযোগে বেরোলেন।[১৯৩] ১৮৮৭ সনের মে মাসে আর্য্যনারী সমাজের পক্ষ থেকে কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠপুত্র করুণাচন্দ্র সেনের পত্নী মোহিনী দেবী "পরিচারিকা" পত্রিকার সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৭৮ সনের মে মাসে ঐ পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল। ১৮৯৫ সালে ঐ পত্রিকা সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছিলেন শ্রীমতী সুচারু দেবী, কেশবচন্দ্রের কন্যা। ১৯০৪ সাল পর্য্যন্ত তিনি ঐ পত্রিকার ভার গ্রহণ করেছিলেন। ১৯০৪ সালে সুচারু দেবীর বিবাহ পর্যন্ত ঐ পত্রিকার সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল।[১৯৪] ১৮৯২ সালের নভেম্বর মাসে বিহার প্রদেশের বাঁকিপুরস্থ বালিকা বিদ্যালয়টি অচল হয়ে যেতে বসল। কারণ ঐ সময় শিক্ষয়িত্রী পরলোক গমন করলেন। এই পরিস্থিতিতে স্বর্গত গুরুপ্রসাদ সেনের অনুরোধে অঘোরকামিনী রায় ঐ বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করলেন। "সে কিরূপ ভার? টাকা নাই, তুমি যেখান হইতে পার টাকার যোগাড় করিবে, না পারিলে নিজে দিবে। বালিকা নাই, বাড়ি বাড়ি গিয়া, বিদেশে দেশে ঘুরিয়া ছাত্রীসংগ্রহ করিবে। শিক্ষক নাই, শিক্ষকের বন্দোবস্ত করিবে ও নিজেও পড়াইবে। ছোট ছোট মেয়েদের শ্রেণীতে তুমি নিজেই পড়াইতে লাগিলে।"[১৯৫]—লিখেছেন তাঁর স্বামী প্রকাশ চন্দ্র রায়। বিংশ শতকের সূচনায় শিখ শহীদদের আত্মবলিদানের কাহিনী নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন কুমুদিনী বসু। "এই পুস্তক প্রকাশিত হইবার ফলে দেশের মধ্যে এক আলোড়ন হয়। ভারতবর্ষে ধর্ম্মের জন্য যে কেহ এরূপ আত্মত্যাগ করিয়াছে, মস্তক দান করিয়াছে তাহা সাধারণত লোকে জানিত না। এদেশের লোকে খ্রীষ্টান মার্টারদের কথাই পাঠ করিয়াছে। স্বদেশবাসীগণ যে ধর্ম্মের জন্য সদ্য প্রাণ দিয়াছে, নিষ্ঠুরতা অম্লান বদনে সহ্য করিয়াছে তাহা অপরিজ্ঞাত ছিল। এই পুস্তকে এই সকল বিবরণ পাঠ করিয়া বাঙ্গালার যুবসমাজের মধ্যে নতুন সাড়া পড়িল।

---

১৯০ কৃষ্ণকুমার মিত্র, *আত্মচরিত*, পৃ: ৬১।
১৯১ তদেব, পৃ: ৬২।
১৯২ অমৃতলাল গুপ্ত, *পুণ্যবতী নারী*, পৃ:পৃ: ৮৯-৯১।
১৯৩ প্রভাত বসু, মহারানী সুচারু দেবীর জীবনকাহিনী, পৃ:পৃ: ৫৬-৫৭।
১৯৪ তদেব, পৃ:পৃ: ৫০-৫১।
১৯৫ প্রকাশ চন্দ্র রায়, *অঘোর প্রকাশ*, পৃ:পৃ: ১৬৮-১৬৯।

"সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি তাঁহার 'বেঙ্গলী' পত্রিকার প্রথম আর্টিকেলে স্বয়ং এই পুস্তকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তিনি বলেন এ পুস্তক প্রত্যেক বালকের হস্তে থাকা উচিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পুস্তকের প্রশংসা শুনিয়া নিজেই পুস্তক আনাইয়া লন। তিনি পত্রে লেখেন "দুঃখের বিষয় ছেলেদের হাতে দিবার মত এমনতর বই আর বাঙ্গালায় নাই, ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে সকল প্রকার বীরত্বের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া তোমাকে বই লিখিবার জন্য অনুরোধ করিবার অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, আজ এই সুযোগে তাহা জ্ঞাপন করিলাম।"[১৯৬] এরপর কুমুদিনী মেরী কার্পেন্টারের জীবনী প্রকাশ করেন। ১৯০৭ সালের আগস্ট মাসে (বাংলা ১৩১৪ সনের শ্রাবণ) তিনি "সুপ্রভাত" নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন।[১৯৭]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে বাঙালী লেখিকাগণের গ্রন্থ প্রচার সম্বন্ধে একটি রচনা প্রকাশিত হল অন্তঃপুর পত্রিকায়, লেখিকা শ্রীহেমন্তকুমারী চৌধুরী। তাঁর বক্তব্য ছিল এই রকম যে আজকাল মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে সমানভাবে লেখাপড়া শিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অর্জন করে থাকলেও তাঁর লেখনী চালিত হচ্ছে কবিতা বা উপন্যাস রচনার দিকে। কিন্তু এই বিরাট দেশে যত রকম কুরীতি ও কুসংস্কার আছে তা দূর করার উদ্দেশ্যে তাঁরা লেখনী ধারণ করছেন না। হ্যারিয়েট বিচার স্টো নাম্নী একজন আমেরিকান লেখিকা যেমন "টমকাকার কুটীর" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করে দাসপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করেছে সেরকম গ্রন্থ এদেশের মহিলা রচনা করেন কোথায়?[১৯৮] অবশ্য কুমুদিনী বসু, মোহিনী দেবী বা সুচারু দেবীর মতো সংগঠনী প্রতিভাসম্পন্ন মহিলারা পত্রিকা সম্পাদনা বা অনুপ্রেরণামূলক গ্রন্থ রচনায় পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন।

স্বর্ণকুমারী দেবীর সাহিত্য প্রতিভার স্ফূরণ ঘটেছিল ইংরাজী গল্প তর্জমার মধ্য দিয়ে। এবিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। তিনি সন্ধ্যাবেলা বাড়ির মেয়ে বৌদের একত্রিত করে ইংরাজী গল্প রচনা করেছিলেন।[১৯৯] ১৮৭৬ সালে মাত্র এগার বছর বয়সে জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে স্বর্ণকুমারীর বিবাহ হয়। বিয়ের পর স্বর্ণকুমারীর শিক্ষায় ও সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রচুর উৎসাহ দিতেন ও সাহায্য করতেন জানকীনাথ। এ বিষয়ে স্বর্ণকুমারীর অকপট স্বীকৃতি : "আমার প্রিয়তম স্বামীর সাহায্য ও উৎসাহ ব্যতিরেকে আমার পক্ষে এতদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইত না। আজ বহির্জগতে আমাকে যেভাবে দেখিতে পাইতেছ, তিনিই আমাকে সেইভাবে গঠিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রেমপূর্ণ উপদেশে ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রেও যেমন সন্তরণনিপুণ ব্যক্তি সহজে ও অবলীলাক্রমে সন্তরণ করিয়া যায়, সাহিত্য জীবনের ঝটিকাময় ও উত্তাল তরঙ্গের মধ্য দিয়ে আমিও সেইরূপ অবলীলাক্রমে চলিয়া আসিয়াছি।"[২০০] স্বর্ণকুমারী সামাজিক মেলামেশায় আগ্রহী ছিলেন। এর একটি ছবি

---

১৯৬ *কুমুদিনী বসু, আমাদের রত্নদিদি , আখ্যাপত্র পাওয়া যায়নি*, পৃ: পৃ: ২২-২৩।

১৯৭ তদেব।

১৯৮ শ্রীহেমন্তকুমারী চৌধুরী, *"বঙ্গ মহিলার গ্রন্থ প্রচার"*, *অন্তঃপুর পত্রিকা*, অগ্রহায়ণ ১৩০৬ বঙ্গাব্দ।

১৯৯ শ্রী বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়, *জ্যোতিরিন্দ্র নাথের জীবনস্মৃতি*, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ, পৃ: ১১৯।

২০০ মন্মথ নাথ ঘোষ, *"স্বর্ণ স্মৃতি"* (১৯৩২), পৃ: ৬, মীনা চট্টোপাধ্যায়, *স্বর্ণকুমারী দেবী*, অনুভব, কলিকাতা ২৬, ২০০০ সাল, পৃ: ৩৪-এ উদ্ধৃত।

ধরা আছে সরলা দেবী চৌধুরাণীর স্মৃতি কথায় : "সিমলে বাড়ীতে বাড়ির ভিতরের দিকের সিঁড়ি উঠেই মায়ের শোবার ঘর। ঘরে এক প্রকাণ্ড পালঙ্ক। সেই পালঙ্কের উপর জোড়াসাঁকো থেকে সমাগত মাসী, মামী ও দিদিদের প্রায় নিত্যই মধ্যাহ্ন থেকে গড়ান পার্টি জমত। তাসখেলার অবসরে কাঁচা সরষে তেলমাখা টাটকা মুড়ি, ফুলুরি ও বেগুনির রসাস্বাদন, বর্ষা হলে সাঁৎলাভাজি—এই ছিল পার্টির মূল প্রোগ্রাম। প্রোগ্রামে কোন কোন দিন একটি বৈচিত্র্য ঢোকান হত গানে বা মায়ের বচিত কবিতা আবৃত্তিতে।"[২০১] কিন্তু এভাবে অলস আড্ডায় কাল কাটানোর ব্যক্তি ছিলেন না স্বর্ণকুমারী। ১৮৭৭ সালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী থেকে প্রকাশিত হল "ভারতী" পত্রিকা। যদিও দ্বিজেন্দ্রনাথ নামে সম্পাদক ছিলেন, কার্যত সম্পাদনা করতেন জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ও রবীন্দ্রনাথ, আর সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন অক্ষয় চৌধুরী, শরৎকুমারী এবং স্বর্ণকুমারী দেবী, ইতিমধ্যে স্বর্ণকুমারী রচিত পৃথ্বীরাজ ও মহম্মদ ঘোরীর সংঘর্ষের কাহিনী "দীপনির্ব্বাণ"—নামক উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। "ভারতী" পত্রিকাতে ১৮৭৮ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকল স্বর্ণকুমারীর লেখা "ছিন্ন মুকুল"। ঐ বছর রবীন্দ্রনাথ বিলাত যাত্রা করলে "ভারতী" সম্পাদনার পুরো ভার পড়ল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ওপর। তখন তাঁর প্রধান সহায়িকা হলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। "ভারতী" পত্রিকার সাফল্য সম্পর্কে লিখলেন শরৎকুমারী : "তখন জ্ঞানাঙ্কুরে'র চিহ্নমাত্র ছিল না, 'বঙ্গদর্শন' মধ্যাহ্ন-আকাশ হইতে ঢলিয়া পড়িয়াছে, আর 'আর্য্যদর্শন' ধূমকেতুর মত বোধ হয় ছয় মাস বা নয় মাস অন্তর কদাচিৎ দেখা দিত। এমন সময় 'ভারতী' যখন নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইতে লাগিল, তখন সাহিত্য সমাজে যে আন্দোলন ও তরঙ্গ' উঠিয়াছিল, তাহা এখনও থামে নাই। এখনও 'ভারতী'র পাঠক ও সেবকের অভাব হয় নাই।"[২০২] ১৮৮৪ সালে জ্যোতিরিন্দ্র নাথের সহধর্মিণী কাদম্বরী দেবীর আকস্মিক মৃত্যুতে ঠাকুর পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এল। তখন 'ভারতী' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হল। শরৎকুমারীর রচনা থেকে জানতে পারা যায় : "এই দুর্দিনে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী নারীর পালন-শক্তির পরিচয় দিলেন। ধূলা ঝাড়িয়া সস্নেহে 'ভারতী'কে কোলে তুলিয়া লইলেন; সেই সঙ্কটকালে তিনি রক্ষা না করিলে আজ 'ভারতী'র নাম বিলুপ্ত হইয়া যাইত।"[২০৩]

সুসাহিত্যিক স্বর্ণকুমারী দেবী নিজে 'ভারতী'র এই হস্তান্তরকে কোন এক কন্যার পিতৃগৃহ থেকে শ্বশুরগৃহে আগমন বলে বর্ণনা করেছেন ও আশ্বাস দিয়েছেন যে 'ভারতী' স্বর্ণকুমারীর গৃহে এসেও একইরকম যত্ন পাবে। এই আশ্বাসবাণী থেকে স্বর্ণকুমারীর সুগভীর আত্মবিশ্বাস ও গাঢ় অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। স্বর্ণকুমারীদেবী "ভারতী"র জন্য অসাধারণ পরিশ্রম করতেন। ছোট গল্প, বড় গল্প ছাড়াও হাস্যকৌতুক থেকে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পর্য্যন্ত তাঁকে লিখতে হত। বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য "পৃথিবীর পরিণাম", "ভূগর্ভ", "পৃথিবীর উৎপত্তি" "সৌর পরিবার", "সূর্য্য", "বিজ্ঞান শিক্ষা", "ছায়াপথ", "তারকা রাশি" প্রভৃতি।

---

২০১ সরলা দেবী চৌধুরী, *জীবনের ঝরাপাতা*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৮।
২০২ শরৎকুমারী চৌধুরানী, *'ভারতীর ভিটা'*, শরৎকুমারী চৌধুরানীর রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৭৫।
২০৩ তদেব।

সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়েও তাঁর রচনার অভাব ছিল না। যথা, "গিল্‌টির বাজার", "পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব", "বিধবা বিবাহ ও হিন্দুপত্রিকা", "নীলগিরির টোডা জাতি", "রমাবাই" ইত্যাদি।[২০৪] সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারীর প্রতিভার শ্রদ্ধাবিনম্র মূল্যায়ন করেছেন নিস্তারিণী দেবী : "ভারতীর মত পত্রিকা বড় বেশি ছিল না; এবং ভারতীয় স্থান মাসিকসাহিত্য জগতে প্রধান ছিল। মহিলা দ্বারা সাহিত্য রচনা দূরে থাক, তখন মহিলা পাঠিকার সংখ্যা বিরল ছিল বলিলেও চলে। এমনি সময়ে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতীর সম্পাদকীয় আসন গ্রহণ করিলেন। বাঙ্গালা মাসিক পত্রের সম্পাদক একজন বাঙ্গালি মহিলা হইতে পারেন—একথা তখন বোধহয় কেহ কল্পনায়ও আনিতে পারিতেন না। সেই সময় আবার মনে হইত, একদিকে মহারাণী ভিক্টোরিয়া রাজ্যশাসনদণ্ড হাতে লইয়া যেমন জগতে রমণীর গৌরববর্দ্ধন করিতেছেন, আর একদিকে আমাদের ক্ষুদ্র বাংলা দেশের সাহিত্য-শাসন-দণ্ড হাতে লইয়া স্বর্ণকুমারী আমাদের বঙ্গরমণীর মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন।"[২০৫] ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জ্ঞানদানন্দিনী সম্পাদিত 'বালক' পত্রিকা ভারতীর সঙ্গে যুক্ত হল, স্বর্ণকুমারী দেবী মন্তব্য করলেন : "আজ তিনি বালক ক্রোড়ে এক নতুন বেশে দেখা দিলেন"।

স্বর্ণকুমারী দেবী বন্ধুত্বপরায়ণ ছিলেন। তার প্রমাণ মেলে তাঁর সখি পাতানর অভ্যাসের মধ্যে। অক্ষয় চৌধুরীর স্ত্রী শরৎকুমারীর সঙ্গে তিনি বিহঙ্গিনী পাতিয়েছিলেন। আবার শরৎ কুমারীও ঠাকুর পরিবারের মেয়ে ও বউদের সঙ্গে সই পাতিয়েছিলেন। কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে তিনি 'শ্যাম্পেন' ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সঙ্গে তিনি 'চাঁদনী' পাতিয়েছিলেন। প্রতিভাশলিনী লেখিকা গিরীন্দ্র দাসীর সঙ্গে স্বর্ণকুমারী 'মিলন' পাতিয়েছিলেন। শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীনাথ মিত্রের স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর পাতানো ছিলো 'বকুলফুল' আর বৌবাজারের এটর্নী শ্রীনাথ দাসের পুত্র 'সময়' সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের পত্নী ছিলেন তাঁর 'মিষ্টি হাসি'।[২০৬] এতজন সখির সমভিব্যাহারে ১৮৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হল 'সখি সমিতি'। অবশ্য এর প্রকৃত উৎস ছিল থিয়জফিক্যাল সোসাইটি। ১৮৮২ সালে থিয়জফিক্যাল সোসাইটির বঙ্গীয় শাখা প্রতিষ্ঠিত হলে জানকীনাথ ঘোষাল তার সদস্য হলেন। তখন স্বামীর সঙ্গে স্বর্ণকুমারীও থিয়জফিতে বিশ্বাসী হলেন আর কাশিয়া বাগানে তাঁর বাড়িতেই বসত মহিলা থিয়জফিক্যাল সোসাইটির অধিবেশন। "মাদাম ব্লাভাটস্কির প্রতি শ্রদ্ধায় যখন মান্দ্য পড়ল, থিয়জফির দল ভঙ্গ হল, তখন থিয়জফির সূত্রেই যাঁদের সঙ্গে পরিচয় আরম্ভ হয়েছিল, সেই সব মহিলাদের নিয়ে 'সখি সমিতি' নাম দিয়ে মা একটি সমিতি স্থাপন করলেন।"[২০৭] এই সমিতির তিনটি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত, সম্ভ্রান্ত মহিলাদের একত্রীকরণ, পরস্পরের মধ্যে সদ্‌ভাববৃদ্ধি করা এবং তাঁদের জনহিত কাজে নিযুক্ত করা, দ্বিতীয়ত, অনাথা কিংবা সঙ্গতিহীনা বিধবা

২০৪ অভিজিৎ সেন ও অভিজিৎ ভট্টাচার্য সংকলিত ও সম্পাদিত, *"স্বর্ণকুমারী দেবীর সংকলিত প্রবন্ধ"*, বিকল্প প্রকাশনী, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩।

২০৫ শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী, *"ভারতী ও ভারতী সম্পাদিকা"*, অভিজিৎ সেন ও অভিজিৎ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ও সংকলিত, সেকেলে কথা : শতক সূচনায় মেয়েদের স্মৃতি কথা, নয়া উদ্যোগ, কলিকাতা - ৬, ১৯৯৭ পৃ:পৃ: ৮৩-৮৪।

২০৬ মীনা চট্টোপাধ্যয়, *স্বর্ণকুমারী দেবী*, পূর্বোক্ত, যত্রতত্র।

২০৭ *জীবনের ঝরাপাতা*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫৯।

অথবা কুমারী — যাঁরা সখি সমিতির বিভিন্ন সদনুষ্ঠান এবং ব্রতপালনে ইচ্ছুক তাঁদের আশ্রয় দেওয়া ও শিক্ষা প্রদান করা। ক্ষেত্রবিশেষে অনাথাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া, তৃতীয়ত, সমিতির পালিতারা সুশিক্ষিত হলে তাঁদের বেতন দিয়ে অন্তঃপুরে স্ত্রী-শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্যে অন্তঃপুবের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা।[২০৮]

সখি সমিতি প্রতিষ্ঠার ঠিক দু'বছর বাদে দেখা গেল যে সমিতির আর্থিক অক্ষমতার জন্য বেশিসংখ্যক মেয়েকে ভরণপোষণ ও শিক্ষা প্রদান করা যাচ্ছে না। সমিতির আর্থিক ক্ষমতা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ১৮৮৮ সালে সখিসমিতির বিশেষ অধিবেশনে স্থির হয় যে, সখিরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে সেই অর্থ থেকে প্রতি বছর একটি 'মহিলা শিল্পমেলা'-র আয়োজন করবে। মেলায় দেশীয় মহিলাদের ব্যবহারোপযোগী এবং বঙ্গললনাদের দ্বারা নির্মিত দ্রব্য প্রদর্শিত ও বিক্রীত হবে। বাংলা দেশের প্রতিটি ঘরের মহিলাই কিছু না কিছু শিল্পকলা জানে। কাঁথা সেলাই, ফুলতোলা, আলপনা শিল্প প্রভৃতি দেশী শিল্প এবং কার্পেট বোনা। উল বোনা, প্রভৃতি বিদেশী শিল্প এঁদের কাছে অজানা নয়। সখি সমিতি বঙ্গমহিলাদের এই ধরনের হস্তশিল্পের প্রতি আস্থা এবং ভরসা রেখে আবেদন করে যে যিনি যা জানেন তা যতটুকু সম্ভব প্রস্তুত করে যদি সখি সমিতিকে উপহার দেন তবে প্রভূত উপকার হয়। কারণ মেলায় বিক্রীত লাভের অংশ সখি সমিতির আশ্রিতা মেয়েদের ভরণপোষণে ব্যয় করা হবে আর মূলধন আবার পরের বছরের মেলার জন্য রেখে দেওয়া হবে।[২০৯] এই শিল্পমেলার অন্য উদ্দেশ্যেও ছিল। অন্তঃপুরের মহিলারা মেলায় এসে সহজেই শিল্প দেখে বেচাকেনা করতে পারবেন এবং এঁদের মধ্যে মেলা মেশার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। এভাবে অন্দরমহলের মহিলারা বহির্জগতের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। মহিলারা যাতে আরো ভালোভাবে শিল্পকর্মে নিযুক্ত হতে পারেন সেজন্য সেলাই এবং হাতের কাজের প্রতিটি বিভাগে সর্বোৎকৃষ্ট শিল্পীদের পুরস্কারদানের ব্যবস্থা করেছিলেন মেলার কর্তৃপক্ষ। এভাবে স্বর্ণকুমারী স্বদেশী শিল্প প্রচার করতে চেয়েছিলেন।

এই শিল্পমেলা উপলক্ষ্যে সরলা রায়ের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ "মায়ার খেলা" গীতিনাট্যটি রচনা করেন। বেথুন স্কুলের প্রশস্ত আঙিনায় মহিলা শিল্পমেলার দ্বারোদ্ঘাটন করেন বাংলার গভর্নরের পত্নী লেডী বেলী। লেডী ল্যান্সডাউনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে "মায়ার খেলা" অভিনীত হয়েছিল। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে নাটকাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করলেন।[২১০] এদিক দিয়ে বিচার করলেও সখি সমিতি ও মহিলা শিল্পমেলা মহিলাদের অবরোধ মোচনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

সখি সমিতির সাতবছর বয়স হলে স্বর্ণকুমারী দেবী এর একটা মূল্যায়ন প্রকাশ করেছিলেন "ভারতী" পত্রিকায়। তিনি স্বীকার করেছেন যে এই সমিতির দৌলতে মেয়েদের মধ্যে পারস্পরিক পরিচয় বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই, তারা যে "পরস্পর মিলিত হইয়া পরোপকার কার্য্যে, দেশহিতকর

---

২০৮ অরুণা চট্টোপাধ্যায়, *"সখি সমিতির মহিলা শিল্প মেলা"* *আজকাল*, *রবিবাসর* ১৭ আগস্ট, ১৯৮৬।

২০৯ তদেব।

২১০ মীনা চট্টোপাধ্যায়, *স্বর্ণকুমারী দেবী*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫৮।

কার্যে এরূপ একনিষ্ঠ অনুরাগ দেখাইতে পারেন, কিছুদিন পূর্বে তাহা কল্পনারাজ্যের অন্তর্গত ছিল, সখি সমিতির সাত বছর স্থায়িত্বে তাহা এখন প্রকৃত প্রত্যক্ষ ঘটনা।"[২১১] কিন্তু সমিতির আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য সমিতির সমাজকল্যাণমূলক ও নারী শিক্ষামূলক কাজগুলি রূপায়িত করা যাচ্ছে না। তবুও "...সমিতির যে সকল শুভাকাঙক্ষা দান দ্বারা বা অন্যান্য উপায়ে সমিতির উপকার সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও সমিতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছে। যে করুণাময় জগদীশ্বর এই সামান্য নারীগণের দ্বারা তাঁহার এই শুভ উদ্দেশ্য সাধিত করিতেছেন;তাঁহার প্রসাদে সমিতির উত্তরোত্তর মঙ্গল সাধিত হউক;কায়মনে এই প্রার্থনা করিয়া আমরা নবীন বলে নববর্ষের কার্যে প্রবৃত্ত হইলাম।"[২১২]

স্বামীর শিক্ষায় স্বর্ণকুমারী রাজনীতি চর্চা করেছিলেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইতে যে কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশন হয় তাতে যে ছয় জন মহিলা প্রতিনিধি ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। ১৮৯০ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনেও স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন প্রতিনিধি। স্বদেশী আন্দোলনের সময় স্বর্ণকুমারী দেবী দেশবাসীকে মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করার জন্য গান রচনা করেছিলেন :

"ঐ আহ্বান-গীতি বাজে
জয় জয় জয় জয় প্রণমি রাজরাজে,
সবে জাগি, এস লাগি জন্মভূমির কাজে।

হের দূরিত তিমির রাত্রি
মোরা দীপ্ত প্রভাতের যাত্রী,
চলি উৎসাহে কোটি ভ্রাতৃ
বীর সৈন্যের সাজে;

যাপি বৃথা আলস্য ঘুমে,
আর লুণ্ঠিত না রব ভূমে,

সব আসন লব করমে
জগত জাতির মাঝে।"[২১৩]

বাস্তবিক, স্বর্ণকুমারীর মতো বহুমুখী কর্মপ্রতিভা শুধু মেয়েদের মধ্যেই নয়, পুরুষদের মধ্যেও বিরল ছিল। তিনি পরিবেশের যে আনুকূল্য পেয়েছিলেন সহজাত প্রতিভার দ্বারা তাঁর পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। তিনি একাধারে যেমন গল্প, কবিতা উপন্যাস রচনা করেছিলেন অন্যদিকে চিন্তামূলক প্রবন্ধ, সংগঠনমূলক ও কল্যাণমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে নিজের সুযোগ্যতা প্রমাণ করেছিলেন। একথা ঠিক যে সকলে স্বর্ণকুমারী দেবীর মতো সুযোগ পান না। কিন্তু তাঁর জীবন ও কর্ম প্রতিনিধিস্থানীয় এই কারণে যে তিনি প্রমাণ করেছেন যে মেয়েদের কর্মদক্ষতা বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে, যদি তারা পরিবেশের আনুকূল্য পায়।

২১১ স্বর্ণকুমারী দেবী, *"সাত বৎসরে সখি সমিতি"*, *"ভারতী"*, আষাঢ় ১৩০০ বঙ্গাব্দ।
২১২ তদেব।
২১৩ মীনা চট্টোপাধ্যায়, *স্বর্ণকুমারী দেবী*, পৃ: ৫৫-তে উদ্ধৃত। মূল রচনাটি "ভারতী", পৌষ, ১৩৫২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চিরায়মানা ও নবীনা : নারীর দুই রূপ

নারীচেতনার নবোন্মেষ : জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

জ্ঞানদানন্দিনীর জীবন বাঙালী মহিলার আধুনিকায়নের যাত্রাপথে একটি উজ্জ্বল দিকচিহ্ন। অবরোধের সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে এসে জ্ঞানদা প্রাণভরে মুক্তজীবনের খোলা হাওয়া উপভোগ করেছিলেন। এরই ফলে বাঙালী জীবনযাপন প্রণালীতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম সূচিত হয়েছিল। ১৮৫২ সালে যশোহর জেলার এক অজ পাড়াগাঁয়ে জ্ঞানদানন্দিনীর জন্ম হয়েছিল। কন্যাসন্তান বলে তাঁকে কোন অবহেলা সহ্য করতে হয়নি। কারণ, তাঁর জন্মের পর থেকেই তাঁর পিতার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করেছিল। এজন্য, তিনি মাতা পিতা উভয়ের কাছেই অতি আদরণীয় ছিলেন। জ্ঞানদা বাল্যকালের কথা স্মরণ করতে গিয়ে বলেছেন "মা আমায় যখন তখন বলতেন যে, তুমি আমার গর্ভে এসে অবধি আমার দারিদ্র্য দুঃখের শেষ হয়েছে।"[১]

আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জন করে জ্ঞানদার পিতা বাড়ীতেই একটি পাঠশালা খুলেছিলেন। এই পাঠশালায় বড় বড় ছেলেরাও পাঠ নিত। স্নেহময় পিতা ভাবলেন "বাড়ীতেই যখন পাঠশালা হল, গুরুমশায়ও রাখা হল তখন আমার মেয়েটিকেও পাঠশালায় পড়তে দিই—ছোট মেয়ে তাতে বোধ হয় কোন দোষ হবে না।"[২] তাই অনায়াসেই জ্ঞানদা বাড়ীর পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস শুরু করলেন, "প্রথমে তালপাতায় যতটা চওড়া পাতা তত বড় অক্ষর আমাকে লিখতে দিলে, আর হাত পাকলে শেষে ষোল ভাঁজের কাগজে লেখালে, সেই হল চূড়ান্ত।"[৩]

মাত্র সাত বছর বয়সে জ্ঞানদার বিবাহ হয়। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যমপুত্র শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে। পাত্রের বয়স তখন সতের বৎসর। ঐ সুদূর শৈশবের স্মৃতি যখন বৃদ্ধা জ্ঞানদা কন্যা ইন্দিরার কাছে রোমন্থন করেছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন সম্ভবত তাঁর ভাবী শ্বশুরবাড়ী থেকে একজন দাসী খেলনা নিয়ে এসে তাঁকে দেখে গিয়েছিল। এরপরই তাঁকে বিবাহের জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল।[৪] ঘেরাটোপওয়ালা পাল্কী করে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীর কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা মিলে তাঁকে শ্বশুরবাড়ী নিয়ে এলেন। শ্বশ্রূমাতা শ্রীমতী সারদাদেবী মোটাসোটা শরীর নিয়েও অনায়াসে ঐ কৃশকায়া বালিকাকে কোলে করে অন্দরমহলে নিয়ে এলেন।[৫]

১ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী সম্পাদিত, পুরাতনী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর স্মৃতিকথা ও সত্যেন্দ্রনাথকে লেখা জ্ঞানদানন্দিনীর পত্রাবলী, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি, কলিকাতা, ১৯৫৭, পৃঃ ৭।

২ তদেব, পৃঃ ৮।

৩ তদেব।

৪ তদেব, পৃঃ ৯।

৫ তদেব, পৃঃ ১১।

তখন জোড়াসাঁকোর বাড়ীর অবস্থা ছিল এইরকম — "বাড়ীর ভিতরের ছাদ ছিল মেয়েদের দখলে। ভাঁড়ারের সঙ্গে ছিল তাঁদের বোঝাপড়া।[৬] সেখানে মেয়েরা বড়ি দেওয়া, আচার দেওয়া, কেয়া খয়ের বানানো ইত্যাদি নানা গৃহস্থালী কাজে সময় কাটাতো। সঙ্গে চলতো চুল শুকানো আর কাক তাড়ানো।[৭] এহেন অবরুদ্ধ অন্দরমহলেও যে ঘোমটার কিরকম বাড়াবাড়ি ছিল তা প্রতিফলিত হয়েছে জ্ঞানদার প্রথম দিকের বিবাহিত জীবনে। বধূমাতা রোগা বলে শ্বশ্রূ তাঁকে নিজের কোলে বসিয়ে ভাত খাইয়ে দিতেন। একগলা ঘোমটা দিয়ে জ্ঞানদাকে ভাত খেতে হত। বেশী খাওয়ানো হলেও ভয়ে কিছু বলতে পারতেন না। অপেক্ষা করে থাকতেন কখন ছাড়া পাবেন আর তিনি দালানে গিয়ে বমি করে আসবেন।[৮] কঠোর কর্তৃত্ব এমনিভাবে স্নেহকে করে তুলতো অত্যাচার। জর্জরিতা বালিকা বধূরা প্রয়োজনের সময় ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা জানাতে পারতো না এমনি কঠিন ছিল সেই অন্দরমহল। একটি ঘটনার কথা জ্ঞানদা মনে করতে পেরেছিলেন। একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে জোড়াসাঁকো বাড়ীর রীতি অনুযায়ী ডাক্তার এসে দেখে ওষুধ দিলেন ও নিয়মিত তা সেবনের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু এদিকে খিদেয় যে রোগিণীর প্রাণ যায় তা কারো খেয়াল নেই। অবসন্ন শরীর নিয়ে বালিকা জ্ঞানদা বড় ঠাকুরঝি অর্থাৎ ননদের আঁতুড়ঘরে গেলেন কিছু খাবারের আশায়। তিনি তখন, ঘিয়েভাজা চিঁড়ে খাচ্ছিলেন। একবার জিজ্ঞাসা করতে জ্ঞানদা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন। তখন লজ্জা করবার মতো অবস্থা তাঁর ছিল না। সেই চিঁড়ে খেয়ে জ্ঞানদার যেন ধরে প্রাণ এল।[৯] জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর মতো নামজাদা প্রগতিশীল পরিবারে যখন গৃহবধূদের এইরকম অবস্থা তখন সাধারণ অবস্থার পরিবারে কিরকম ছিল তা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয়।

কিন্তু সৌভাগ্যবশত সত্যেন্দ্রনাথ বিবাহের প্রথম থেকেই স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত মনোযোগী ও দরদী ছিলেন। সেই সঙ্গে সৎসাহসের অভাবও তাঁর ছিল না। শুধু তাই নয়, স্বামী যে তাঁর মস্ত বড় পৃষ্ঠবল একথা জ্ঞানদা নিঃসংশয়ে বুঝেছিলেন।

অন্দরমহলের প্রাণীদের কিভাবে প্রত্যহ তুচ্ছ বঞ্চনা ও অসহায়তার শিকার হতে হয় তা প্রত্যক্ষ করেই সম্ভবত সত্যেন্দ্রনাথ অবরোধ ভাঙতে বদ্ধপরিকর হন।

সত্যেন্দ্রনাথের কাছেই বিয়ের পর জ্ঞানদার লেখাপড়া শুরু হয়েছিল। তবে তিনি বেশীদিন জ্ঞানদাকে পড়াতে পারেননি কেননা তাঁকে ১৮৬২ সালে আই. সি. এস. পড়া ও পরীক্ষা দেবার জন্য বিলেত চলে যেতে হল। তখন জ্ঞানদার শিক্ষার ভার পড়ল দেবর হেমেন্দ্রনাথের ওপর। হেমেন্দ্রনাথ মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে খুবই উৎসাহী ও সক্রিয় ছিলেন। কিন্তু তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি ছিল খুবই কঠোর। জ্ঞানদা স্মরণ করেছেন, "আমার যা কিছু বাংলা বিদ্যা তা সেজ

৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছেলেবেলা, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪২।
৭ তদেব।
৮ পুরাতনী, পূর্বোক্ত, পৃ: ২১।
৯ তদেব, পৃ: ২২।

ঠাকুরপোর কাছে পড়ে। মাইকেল প্রভৃতি শক্ত বাংলা বই পড়াতেন আমার খুব ভাল লাগত, এখনো লাগে।"[১০] কিন্তু ইংরাজী বিদ্যা বেশীদূর এগোল না। কেবলমাত্র অক্ষর পরিচয় ঘটেছিল। সেজন্য পরে জ্ঞানদাকে স্বামীর কাছে বকুনি খেতে হয়েছিল।[১১]

এহেন পরিবেশ থেকে সত্যেন্দ্রনাথ যখন বিলাত গেলেন তখন সেখানকার মহিলাদের স্বাধীনভাবে বিভিন্ন সামাজিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ এবং পারিবারিক জীবনে মহিলাদের চমৎকার প্রভাব তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। একই সঙ্গে মনে পড়েছিল স্বদেশের মহিলাদের করুণ দুরবস্থা।

১৮৬৪ সালে ইংল্যান্ড থেকে ফেরার সময় সত্যেন্দ্রনাথ স্থির করেন যে কলকাতা হয়ে তারপর বোম্বাইতে কর্মক্ষেত্রে যোগ দেবেন।[১২] কলিকাতায় ফিরে তিনি স্ত্রীকে কর্মস্থলে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। এই ঝঞ্ঝাবাত্যা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে যে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল বালক রবীন্দ্রনাথকেও তা মথিত করেছিল। "মেজদাদা সিভিলিয়ন হয়ে দেশে ফিরেছেন। বোম্বাইয়ে প্রথম তাঁর কাজে যোগ দিতে যাবার সময় বাইরের লোকদের অবাক করে দিয়ে তাদের চোখের সামনে দিয়ে বউঠাকুরুনকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। বাড়ির বউকে পরিবারের মধ্যে না রেখে দূর বিদেশে নিয়ে যাওয়া এই তো ছিল যথেষ্ট, তার উপরে যাবার পথে ঢাকাঢাকি নেই—এ যে হল বিষম বেদস্তুর। আপন লোকদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।"[১৩] ব্রিটিশরাজের মানী চাকুরে ছেলেকে সরাসরি বাধা দেওয়া গেল না বটে কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি করা হল এক অতি তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে। তা হল জ্ঞানদা কিভাবে বাড়ী থেকে জাহাজ ঘাটে যাবেন। দেবেন্দ্রনাথ কিছুতেই বাড়ীর বধূকে খোলা গাড়ীতে চড়ে জাহাজঘাটে যাবার অনুমতি দিলেন না। পরিস্থিতি যে কতদূর হাস্যকর হয়েছিল তা ধরা পড়ল স্বর্ণকুমারীর লেখায়—"স্ত্রীকে মেজদাদা লইয়া যাইতেছেন বোম্বাই সমুদ্রপার, কিন্তু তখনো অন্তঃপুর হইতে তাঁহাকে বহির্বাটীর প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত হাঁটাইয়া গাড়ি চড়াইতে পারিলেন না। কুলবধূর পক্ষে ইহা এতই নূতন এতই লজ্জাজনক যে বাড়িসুদ্ধ সকলেই ইহাতে বিশেষ আপত্তি প্রকাশ করিলেন। অগত্যা পাল্‌কী করিয়া তাঁহাকে জাহাজে উঠিতে হইল।"[১৪]

স্বামীর সঙ্গে কর্মস্থলে যাবার সময়েই বাঙ্গালী মহিলার পোশাকের অশোভনতা ও অপ্রতুলতা ধরা পড়ল বেশী করে। জ্ঞানদা বলেছেন, "...সে সময়ে আমাদের খালি এক শাড়ি পরা ছিল, তা পরে তো বাইরে যাওয়া যায় না।"[১৫] সত্যেন্দ্রনাথও তাঁর আত্মজীবনীতে সমালোচনা করেছেন যে বাংলা দেশে মেয়েদের পোশাক পোশাকই নয়।[১৬]

১০ তদেব, পৃঃ ২৭।
১১ তদেব।
১২ তদেব।
১৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছেলেবেলা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৯।
১৪ পুরাতনী, পরিশিষ্ট, সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে শ্রী পুলিন বিহারী সেনের রচনায় উদ্ধৃত।
১৫ পুরাতনী, পৃঃ ২৯।
১৬ ভগবতী পত্রিকা, পূর্বোক্ত, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাঘ ১৩১৯।

প্রকৃতপক্ষে, বাঙালী অন্তঃপুরিকাদের পোশাক ছিল বাইরে বেরোনোর একেবারেই অনুপযুক্ত। ফ্যানি পার্কস্ বর্ণনা দিলেন যে শাড়ীর জমিন এতো পাতলা ছিল যে, তাকে স্বচ্ছ বলাই শ্রেয়। তা আচ্ছাদন হিসাবে অর্থহীন, এর ভেতর দিয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন ও চামড়ার রঙ দেখা যেত। শ্রীমতী পার্কস্ বুঝতে পারেন যে কেন বাঙালী অন্তঃপুরে স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।[১৭] এমতাবস্থায়, স্বাভাবিকভাবেই অনুভূত হল যে মেয়েদের অবরোধ মোচনের প্রথম শর্ত হল একটি শালীন পোশাক। ১৮৬৪ সালে বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদে দেখা যায় যে কেশবচন্দ্র সেন পরিচালিত সঙ্গত সভার সদস্যরা মহিলাদের পোশাকের সংস্কার করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছেন, যদিও ঠিক কি পরিবর্তন করা দরকার, এ নিয়ে তাঁরা কোন সুস্পষ্ট পরামর্শ দেননি।[১৮]

মেয়েদের পোশাক পরিবর্তন করা দরকার এ বিষয়ে প্রথম ভেবেছিলেন কিশোরী চাঁদ মিত্রের পত্নী কৈলাসবাসিনী দেবী। তিনি মনে করেছিলেন যদি মেয়েরা গণশিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ সুফল পেতে চায় তবে তাদের অন্যরকম পোশাক পরতেই হবে। জ্ঞানদানন্দিনী যখন সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থলে বোম্বাই যেতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখনই বাঙালী মহিলার পোশাক সমস্যা গুরুতর রূপ নিল। শেষে সত্যেন্দ্রনাথই এক উপায় বার করলেন। এখানকার অনেক দোকান ঘুরে তিনি এক ফরাসী মহিলার পরিকল্পনায় স্ত্রীর জন্য ফুলো ফুলো পায়জামা, পেশোয়াজ, মাথায় উড়ানী প্রভৃতি দিয়ে তুর্কী ধরনের এক পোশাক তৈরী করলেন।[১৯] সেটা পরা খুব কঠিন ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ সাহায্য না করলে জ্ঞানদানন্দিনীর পক্ষে তা পরা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু বোম্বাইতে গিয়ে তিনি যে পার্সী পরিবারে ছিলেন সেখানকার দুই মেয়ের শাড়ী পরার ধরন তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি দেখলেন ওরা সর্বদাই রেশমী কাপড় পরে, আর মাথায় একটা রুমাল বাঁধে ও একটা সাদা পাতলা পিরানমতো জামার তলায় পরে। বাড়ীসুদ্ধ সকলেই সেই ধাঁচটাই ধরে নিলেন। ক্রমে তাঁদের দেখাদেখি ব্রাহ্মসমাজের রুচিশালিনী কয়েকটি মেয়েও এটা গ্রহণ করলেন। পরে সব ব্রাহ্মপরিবারে এটা ছড়িয়ে পড়ল। এই রকমে পরা শাড়ির নাম ব্রাহ্মরা রেখেছিলেন 'ঠাকুরবাড়ির শাড়ি'। ব্রাহ্মমেয়েরা সবাই পরতে আরম্ভ করায় দেশের লোক তার নাম দিলে 'ব্রাহ্মিকা শাড়ি'।[২০]

তবে সরলাদেবী যত সহজে বর্ণনা করেছেন, শাড়ি পরার নতুন ঢং প্রচলিত হওয়া তত সহজে হয়নি। পোশাক নিয়ে বিতর্ক চলছিল, ১৮৬৫ সালের মার্চ মাসে বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার সময়ে রাজলক্ষ্মী মৈত্রেয়,

১৭ তদেব।

১৮ বামাবোধিনী পত্রিকা, পৌষ ১২৭২।

১৯ স্বর্ণকুমারী দেবী, সেকেলে কথা, মীনা চট্টোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, অনুভাব, কলিকাতা-২৬, ২০০০ সাল, পৃ: ২৯।

২০ সরলাদেবী চৌধুরানী, জীবনের ঝরাপাতা, রূপা, কলিকাতা ৭৩, ২য় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী ১৯৮২, পৃ:পৃ: ৫৩-৫৪।

পরবর্তীকালে সেন, নামে একটি ১৩ বছরের বালিকা জ্ঞানদানন্দিনীর মতো সংস্কৃত পোশাক পরে গভর্ণর জেনারেলের প্রশংসা অর্জন করেন। ১৮৭০-এর গোড়ার দিকে কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত বামহিতৈষিণী সভায় এই রাজলক্ষ্মী সেন এই মত প্রকাশ করেন যে ঐ সভায় উপস্থিত বেশ কয়েকজন মহিলা ব্লাউজ, জ্যাকেট ও জুতো পরে এসেছিলেন। আর রূপোপজীবিনীরাও এ পোশাক পরিধান করে। সুতরাং, এদের থেকে পৃথক হওয়ার জন্য ভদ্রমহিলারা সবকিছু পরার পর তার ওপর মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা একখানা চাদর পরবেন।[২১]

এই সময় বামাবোধিনী পত্রিকায় জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর একটি পত্র প্রকাশিত হল। এখানে তিনি দাবী করলেন যে তাঁদের পরিবারের অর্থাৎ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মহিলারা যে পোশাক পরেন তা যেমন সুন্দর তেমন শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সব ঋতুর উপযোগী। এ পোশাকের মধ্যে জুতো, মোজা, বডিস, ব্লাউজ, পেটিকোট এবং শাড়ি। আর বাইরে যাবার সময় এ সবের ওপর একটি চাদর। তাঁকে লিখলে তিনি এ পোশাকের একটি আলোকচিত্র অথবা এরূপ একটি পোশাক পাঠাতে পারেন। বোঝা যাচ্ছে যে জ্ঞানদানন্দিনীর বোম্বাই দস্তুর বা ঠাকুরবাড়ির বা ব্রাহ্মিকা শাড়ী পরার কায়দা খুব সহজে জনপ্রিয় হয়নি। তবে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর খুশী হয়েছিলেন বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন স্বর্ণকুমারী দেবী : "মেজবধূঠাকুরাণী বোম্বাই হইতে গুর্জ্জর মহিলার অনুকরণে সুশোভন সুদর্শন পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া যখন দেশে প্রত্যাগমন করিলেন তাঁহার (দেবেন্দ্রনাথের) ক্ষোভ মিটিল। দেশীয়তা, শোভনতা ও শীলতার সর্বাঙ্গীণ সম্মিলনে, এ পরিচ্ছদ যেমনটি চাহিয়াছিলেন ঠিক সেই রকম মনের মতনটি হইয়া বঙ্গবালাদিগের ঐকান্তিক একটি অভাবমোচনে তাঁহার অনেকদিনের বাসনা পূর্ণ করিল।"[২২]

অবশ্য জ্ঞানদানন্দিনী দেবী পোশাক প্রবর্তনের ক্ষেত্রে একলাই যে পথিকৃতের ভূমিকা দাবী করতে পারেন তা নয়। এক্ষেত্রে কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন কেশবচন্দ্র সেনের দুই কন্যা সুনীতি ও সুরুচি। সুনীতি দেবী প্রথম শাড়িতে ব্রোচ আটকানোর প্রথা চালু করলেন। "দিল্লীর দরবারে সমস্ত ভারতবর্ষের রাণী মহারাণী সম্মেলনে তাঁদের সঙ্গে সাজের সঙ্গতি রাখার জন্য কোচবিহার মহারাণী সুনীতি দেবী ও ময়ূরভঞ্জ মহারাণী সুচারু দেবী অধুনাতন নবীনতম পন্থায় শাড়ী পরতে লাগলেন এবং পরে দেশে ফিরে এসেও সেটি জারি রাখলেন। এ নাকি কোচবিহারের ও উড়িষ্যার—তাঁদের স্ব স্ব শ্বশুরকুলের নিজস্ব পন্থা। এতদিন তার থেকে নিজেদের বাঙালীর অভিমানে নিজেদের দূরে দূরে রেখেছিলেন। আজ ভারতের রাজকুলের সঙ্গে সাম্যে সেটি গ্রহণ করলেন। এই পরিধানপন্থার সুশ্রীতা বাঙালীমাত্রের মনোগ্রাহী হল। এই হয়ে গেল বাঙলাদেশের শাড়ির ফ্যাশান এবং এ ফ্যাশান সমগ্র ভারতবর্ষের সঙ্গে বাঙলার একতা এনে দিল।"[২৩]

২১ রাজলক্ষ্মী সেন, বঙ্গাঙ্গনাগণের পরিচ্ছদ, বামাবোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১২৭৮।

২২ স্বর্ণকুমারী দেবী, সেকেলে কথা, মীনা চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত গ্রন্থে, উদ্ধৃত, পৃ· ২৯।

২৩ সরলাদেবী চৌধুরাণী, জীবনের ঝরাপাতা, পৃ: ৫৪।

জ্ঞানদানন্দিনীর আগে মেয়েরা তাদের পোশাক পরিবর্তন সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা করেছিলেন, এমনকি পুরুষরাও এ বিষয়টি নিয়ে ভাবিত ছিলেন। বোম্বাই যাত্রার প্রাক্কালে জ্ঞানদানন্দিনী যেভাবে পোশাকজনিত অসুবিধা ভোগ করেছিলেন তা খুব কম বাঙ্গালী মহিলাই করেছেন। বিশেষত ঠাকুরপরিবাবের সদস্যা হয়ে তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ বিলিতি পোশাক পরা সম্ভব ছিল না। যেমন পরতেন মনোমোহন ঘোষের স্ত্রী স্বর্ণলতা। কারণ, দেবেন্দ্রনাথ নিজেই মেয়েদের পোশাক সম্বন্ধে খুব বিরক্ত ছিলেন। তাঁর মেয়ে স্বর্ণকুমারী জানিয়েছেন যে, "আমরা একটু বড় হইয়া অবধি...নিত্যনূতন পোশাকে সাজিয়াছি। পিতামহাশয় ছবি দেখিয়াছেন, আর আমাদের কাপড় ফরমাস করিয়াছেন, দরজি প্রতিদিনই তাঁহার কাছে হাজির, আর আমরাও। কিন্তু এত পরীক্ষাতেও তিনি আমাদের জন্য বেশ একটি পছন্দসই বেশ ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই।"[২৪] এই অবস্থায় জ্ঞানদানন্দিনী শাড়ি পরার শোভন রীতির সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন, যেখান থেকে পরবর্তী উন্নতিতে পৌঁছান যেতে পারে। কিন্তু এই রীতির প্রচলন ঘটানো বেশ কষ্টসাধ্য ছিল বিশেষ করে গ্রাম বাংলায়।

রবীন্দ্রনাথের সময়কার এই বিস্ময়মিশ্রিত কৌতূহলের কথা লিখেছেন প্রসন্নময়ী দেবী : "কাটা কাপড়" পরা (সেমিজ, জ্যাকেট) লেখাপড়া জানা (জানা কিছুই নহে) নববধূর আগমন বার্তা গ্রামময় প্রচার হইবামাত্র আবালবৃদ্ধবণিতা সময় অসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। আমি একটা দর্শনীয় পদার্থ হইয়া উঠিলাম, অনেকে আবার কৌতূহলবশত আমার পড়া শুনিতে চাহিলে ভদ্রতার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিতাম না ও দুর্ভাগ্যবশত খেলনার সঙ্গে একটা কনসার্টিনা বাদ্য ছিল তাহাও বাজাইয়া শুনাইতাম। এসব যে কোনরূপ দোষাবহ ও লজ্জাহীনতা তখন বুঝিতে পারিতাম না এবং প্রবাসে প্রবাসে থাকার জন্য উচিত প্রকার অবগুণ্ঠনে মুখাবৃত করিতে অসমর্থা কাজে কাজেই "মেম বৌ" পল্লীমধ্যে প্রচারিত হইয়া আমার ত্রুটির নিমিত্ত পিতামাতার শিক্ষার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ হইতে লাগিল।"[২৫] মনোদা দেবীর (জন্ম ১৮৭৮ সাল) অভিজ্ঞতাও তাঁর চেয়ে কুড়ি বছর আগে জন্মানো প্রসন্নময়ীর চেয়ে কিছু ভিন্নতর ছিল না। ১০ বৎসর ৪ মাস বয়সে বিবাহ হয়ে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলেন মনোদা দেবী। তাঁর নিজের মুখে নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা এই রকম : "বধূকে তার বাপের বাড়ি হইতে কি কি কাপড়-চোপড় দিয়াছে তাহাও তো একটু দেখা দরকার। খোল বাক্স, খোল ডেক্স, দেখ সবাই। একি? এটা আবার কি? ওটাকে কি বলে, এটা তো পরিতে দেখি না।—সেমিজ, জ্যাকেট, পেটিকোট ইত্যাদি ইত্যাদি। ও এসব তো সাহেব-বিবির পোশাক। ঠাকুর খুড়ার দেওয়া বহরমপুরের গরদের রুমালখানাও বাহির হইয়া পড়িল। কি সর্বনাশ।

২৪ স্বর্ণকুমারী দেবী, সেকেলে কথা, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩০।

২৫ প্রসন্নময়ী দেবী, পূর্বকথা, পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৫।

রুমাল, রুমাল, বৌর হাতে রুমাল। বৃদ্ধারা তো একেবারে হতবাক। ডেস্কে সেলাইর সব জিনিস—উল, কার্পেট, সাবান, কাঁচি, সুঁই, সুতা। ওমা এ যে একটা দোকান গো। মাথা নত করিয়া ঘরের এককোণে দাঁড়াইয়া সবই শুনিতে পাইলাম।"[২৬]

দেখা যাচ্ছে যে জ্ঞানদানন্দিনী নতুন ধাঁচের শাড়ি পরার প্রচলন করার সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক পরিধেয় হিসাবে সেমিজ ও জ্যাকেট পরার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল তা গ্রহণ করতে বাঙালী সমাজ তখনও প্রস্তুত ছিল না। প্রসন্নময়ী বা মনোদা দেবী দু'জনের আত্মকথা থেকেই বোঝা যায় যে শহরে পোশাকের পরিবর্তন গৃহীত হলেও গ্রামাঞ্চলে তা তখনও অপ্রচলিত ও অগ্রহণযোগ্য ছিল। এদিকে আবার শহরেও তখনও পর্যন্ত মহিলাদের জন্য কোন স্ট্যান্ডার্ড পোশাক স্থির করা যায়নি। শবৎকুমারী দেবী চৌধুরাণী লিখলেন : "যুবতীদের মধ্যে যে কত রকমবিরকমের পোশাক উঠেছে, সে আর লিখে ওঠা যায় না—প্রায়ই কারও সঙ্গে কারও মেলে না—না সাজগোজেই মেলে, না পোশাকেই মেলে। ...তারা সব এক একটি বিশ্রী ধরনের পাতলা ওড়না মাথায় দিয়েছে। ...তার ভিতরে একজন কোমর থেকে বোধ হয়, এক হাত ওসারের একটা মোটা কাপড় পরেছে—একজন হাঁটু পর্য্যন্ত— আর একজন বেশ পা পর্য্যন্ত পরেছে। যেমন বাঙ্গালীর মেয়েরা শাড়ি পরে, তেমনি ক'রে প'রে আঁচলটা কাঁধে ফেলে একটা ক'রে কোমর-বন্ধ পরেছে, এক ব্যক্তি কোমর-বন্ধ পায়নি, তিনি চারটে গাঁট-দেওয়া এক ন্যাকড়া কোমরে জড়িয়েছেন। ওড়নাগুলো খুব পাতলা ও তাই দিয়ে মুখে ঘোমটা দিয়েছে—ওড়নার ওসার এক হাত হবে, এতে যদি দাড়ি পর্য্যন্ত ঘোমটা দেয়, তা হ'লেই কাজেই সমস্ত পিঠটা বেরিয়ে থাকে—তাদেরও তাই হয়েছিল। ...কারও গায়ে জামা আছে—কারও গায়ে নেই।—কেহ বা পুরুষদের মত চায়না কোট পরেছে, কেহ বা ছেলেদের মত ঢলঢলে জামা পরেছে। কারও বা বেশ ভাল মেয়েলি জামা কিন্তু বেশির ভাগই চায়না কোট পরা। দু-বৎসর আগে যাদের খালি গা দেখেছিলেন, এবার তাদের গায়ে জামা দেখলেম, আগে যেমন খারাপ রুচির কাপড় পরা অধিকাংশ দেখেছিলেম—এবার আর প্রায়ই দেখতে পেলেম না। একটা ভারি মজার পোশাক দেখলেম। একটি ছোট মেয়ে, বোধ হয় বয়স আন্দাজ আট নয় বৎসর; একখানি বেশ ঢাকাই শাড়ি পরেছে, আর তার উপর একটা সাটিনের গাউন পরেছে—তাও আবার উল্টো অর্থাৎ সুমুখ দিক্‌টা পিছনদিকে দিয়েছে—পিছনটা সমুখদিকে দিয়েছে। এ কোন্ দেশী পোশাক বল দেখি? পায়ে জুতো মোজাও নেইই। রাজ্যের গয়না পরা মাথায় খোঁপা বাঁধা, শাড়ি পরা, সবই আছে— আবার মাঝে থেকে এক পেটিকোট কেন?"[২৭] ১২৯৮ বঙ্গাব্দে এই লেখাটি যখন "ভারতী ও বালক" পত্রিকায় বের হয়েছিল। তখনও দেখা

২৬ মনোদা দেবী, সেকালের গৃহবধূর ডায়েরি, নয়া উদ্যোগ, কলিকাতা-৬, অক্টোবর ১৯৯৬, পৃ: ৮৩।

২৭ শরৎকুমারী চৌধুরাণী, "কলিকাতার স্ত্রী-সমাজ", শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ৯৫-৯৬।

যাচ্ছে যে শাড়ি পরার কোন নির্দিষ্ট ভঙ্গিমা আয়ত্ত হয়নি, শরৎকুমারী পেটিকোট পরা পছন্দ করেননি, কিন্তু জুতা মোজা না পরাও তাঁর অনুমোদন পায়নি। এক দশক পরে অন্তঃপুর পত্রিকায় মহিলাদের পোশাক সম্বন্ধে একটি নামহীন লেখায় বলা হল যে ইংরাজ মহিলাদের অনুকরণে বাঙ্গালী মেয়েরাও সেমিজ জ্যাকেট পরছে, তা তাদের অসুস্থতার কারণ হচ্ছে, কেন না জ্যাকেটের ভেতর যে কর্সেট পরা হয় তাতে শরীরের কোন কোন অংশে রক্তসঞ্চালন ব্যাহত হয়ে নানা রোগের সৃষ্টি করছে। তবে, "বর্ত্তমান সময়ে পারসী পোশাকের অনুকরণে ব্রাহ্ম মহিলাদিগের যে পোশাকের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা অনেকেই গ্রহণ করিতেছেন। অন্তঃপুরেও অনেকে এই পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে শিখিয়াছেন, অনেক ইংরাজ মহিলার মুখেও উক্ত পোশাকের প্রশংসা শুনিয়াছি। ইহা সাধারণভাবে বিলাসিতা ও বিজাতীয় দোষবর্জ্জিত এবং সর্ব্বশ্রেণীর মহিলাগণ অবস্থানুসারে ব্যবহার করিতে পারেন কিনা এবং এই পরিচ্ছদ ভবিষ্যতে বঙ্গমহিলাদিগের সাধারণ পরিচ্ছদ হইতে পারে কিনা আলোচনা করিয়া দেখিলে ভালো হয়।"[২৮]

বিংশ শতাব্দীর সূচনায় উপনীত হয়ে দেখা গেল যে ব্রাহ্মিকা শাড়ী পরার ধরন আস্তে আস্তে সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠছে।[২৯] সন্তুষ্ট সত্যেন্দ্রনাথ মন্তব্য করলেন : "এমন একটা পোশাক ঠিক করতে হবে যা দেখতে সুশ্রী অথচ বিদেশী বলে ঘৃণিত না হয়। শেষে পার্সী শাড়ী ও জামার মধ্যে এ রকম একটি মডেল পাওয়া গেল। অবশ্য পার্সীরা এই শাড়ী পরার ধরন গ্রহণ করেছিল গুজরাটি মহিলাদের কাছ থেকে। তাই একটু একটু পরিবর্তন ক'রে আমরা এ রকম আমাদের শাড়ীর মত করে নিলুম, তাছাড়া মাথায় ওড়না সে আমাদের নিজস্ব জিনিস। এই বেশ ক্রমে বাঙ্গলাদেশে ভদ্রসমাজে প্রচলিত হয়ে পড়েছে। আশ্চর্য এই যে গোঁড়া হিন্দু পরিবারের মেয়েরাও এই পরিচ্ছদ গ্রহণ করতে এখন সঙ্কুচিত নন—এটা খুবই সুখের বিষয় বলতে হবে।"[৩০]

কলকাতা থেকেই ঠিক হয়েছিল যে বোম্বাইতে জ্ঞানদা মানেকজী করসেদজী নামে এক পার্শী ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে উঠবেন।[৩১] মানেকজি তাঁর দুই মেয়েকে দেশে লেখাপড়া শিখিয়ে পরে বিলেত ঘুরিয়ে এনেছিলেন। "ওরাঁ বেশ সম্ভ্রান্ত পরিবার ছিলেন, ইংরাজ বড়লোকের সঙ্গে যাতায়াত ছিল।"[৩২] প্রথমে জ্ঞানদা মানেকজীর পরিবারে বেশ অস্বস্তিতে পড়েছিলেন। একেই তো তিনি অসাধারণ রকমের লাজুক ছিলেন[৩৩] তার ওপরে তিনি তখন মোটেও ইংরাজী

২৮ "মহিলার পরিচ্ছদ", অন্তঃপুর পত্রিকা, আষাঢ় ১৩০৮।
২৯ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, "আমার বোম্বাই প্রবাস", ভারতী পত্রিকা, মাঘ ১৩১৯।
৩০ তদেব।
৩১ পুরাতনী, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৯।
৩২ তদেব।
৩৩ তদেব, পৃ: ২৫।

বুঝতে পারতেন না। কারণ তাঁর ইংরাজী শিক্ষার দৌড় অক্ষর পরিচয় পর্যন্ত হয়েছিল।[৩৪] তাই তিনি বেশির ভাগ সময়ে চুপ করে থাকতেন বলে মানেকজী তাঁকে বলতেন "মুগীমাসী" অর্থাৎ বোবা।[৩৫] এঁদের বাড়িতেই একদিন বোম্বাইয়ের গভর্ণর স্যার বার্টল্ ফ্রায়ার এসেছিলেন আর প্রথম দেশী সিভিলিয়ানেব স্ত্রী বলে ওঁরা জ্ঞানদার সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। স্যার বার্টল্ জ্ঞানদার সঙ্গে অনেক কথা বললেন কিন্তু জ্ঞানদা একটিও কথা বুঝতে না পেরে কোন উত্তর দিলেন না। পরে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে খুব তিরস্কার করলেন। বকুনি খেয়ে তিনি ঘরে গিয়ে কাঁদতে লাগলেন।[৩৬] "আমি তাঁকে আর কি বলব। তিনি ভেবেছিলেন হেমেন্দ্র বুঝি আমাকে তৈরি করে রেখেছেন। কিন্তু আমি যে কেবল দুতিন অক্ষর বানান করে পড়তে পারি, তা তো জানেন না।"[৩৭]

প্রায় দুবছর বোম্বাই থেকে ১৮৬৬ সালে সত্যেন্দ্রনাথ সস্ত্রীক কলকাতায় প্রথম ছুটি কাটাতে এলেন। তখন আর কেউ জ্ঞানদাকে পাল্কী করে আসতে বাধ্য করতে পারলেন না। "ঘরের বৌকে মেমের মত গাড়ী হইতে সদরে নামিতে দেখিয়া সেদিন বাড়ীতে যে শোকাভিনয় ঘটিয়াছিল তাহা বর্ণনার অতীত,"[৩৮] দেবেন্দ্রনাথ এই দুঃসাহসিক হঠকারিতার জন্য দীর্ঘদিন পুত্রবধূকে ক্ষমা করতে পারেননি। নিজপুত্রই যে সবকিছুর মূলে একথা বুঝে দীর্ঘদিন সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বাক্যালাপ করেননি। তখন সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদা ঐ বিরাট জোড়াসাঁকো বাড়ীতে একঘরে হয়ে পড়েছিলেন, "বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরা বধূঠাকুরানীর সঙ্গে অসঙ্কোচে খাওয়া দাওয়া করিতে বা মিশিতে ভয় পাইতেন।"[৩৯] সম্ভবত এই ঘটনার প্রভাবে পরে যখন সত্যেন্দ্রনাথ জ্ঞানদাকে নিয়ে ছুটিতে কলিকাতায় আসতেন তখন তাঁরা আলাদা ভাড়াবাড়ীতে উঠতেন। এইভাবে সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনী একক পরিবার সৃষ্টিতে উৎসাহিত হয়েছিলেন। কলকাতায় আসার কিছুদিন পরে তখনকার বড়লাট সত্যেন্দ্রনাথকে সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। পুলিনবিহারী সেনের বর্ণনানুযায়ী "ইতিপূর্বে কোন হিন্দুরমণী গভর্ণমেণ্ট হাউসে যান নাই।"[৪০] জ্ঞানদানন্দিনীও বলেছেন, "উনি আমাকে লাটসাহেবের বাড়ির দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। নিজে অসুস্থ বলে যেতে পারেননি, আমাকে এক মেমের সঙ্গে পাঠালেন বোধ হয় *Lady Phaer*। ...সেখানে ঠাকুরগুষ্টির যাঁরা ছিলেন তাঁরা ঠাকুরবাড়ির একজন বউ গিয়েছে শুনে লজ্জায় চলে গেলেন — পরে শুনলাম।

৩৪ তদেব, পৃ: ২৭।
৩৫ তদেব, পৃ: ৩০।
৩৬ তদেব।
৩৭ পুরাতনী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩০।
৩৮ তদেব, পৃ: ১৯৭।
৩৯ তদেব, পৃ: ১৯৮।
৪০ তদেব।

"...বাড়ির সকলে বল্লেন যে উনি নিজে গেলে ভাল হত, অন্য লোকের সঙ্গে পাঠানো ভাল হয়নি।"[৪১] সত্যেন্দ্রনাথ এই ঘটনায় নিজেও কম শিহরিত হননি, "সে কি মহা ব্যাপার! শত শত ইংরাজ মহিলার মাঝখানে আমার স্ত্রী — সেখানে একটিমাত্র বঙ্গবালা—তখন প্রসন্নকুমার জীবিত ছিলেন। তিনি ঘরের বৌকে প্রকাশ্য স্থানে দেখে রাগে লজ্জায় সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন।"[৪২]

উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথকে প্রায়ই ভোজসভার আয়োজন করতে হত। প্রথম সিভিলিয়ানের স্ত্রী হিসাবে জ্ঞানদাই প্রথম ভারতীয় মহিলা যাঁকে ঐ ভোজসভার আয়োজন করতে হয়েছিল।[৪৩] এ বিষয়ে জ্ঞানদার প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল এইরকম ঃ "উনি যেদিন প্রথম *dinner party* দিলেন, আমার মনে আছে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলুম যে খাবার টেবিলে কিছুতেই বসব না, যদিও টেবিলাদি সব সাজিয়ে দিয়েছিলুম। সেই একজন সাহেব আমার হাত তার হাতের ভিতর নিয়ে টেবিল পর্যন্ত নিয়ে গেল, অমনি আমি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলুম।"[৪৪] পরে অবশ্য খাবার নিমন্ত্রণ করা, টেবিল ভাল করে সাজানো ইত্যাদি খুব ভালভাবে শিখেছিলেন জ্ঞানদা।[৪৫]

বিভিন্ন ভোজসভায় বিভিন্ন লোকের সঙ্গে আলাপচারি করা আবশ্যিক ছিল, আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে জ্ঞানদার ইংরাজী জ্ঞান এর জন্য যথেষ্ট ছিল না।[৪৬] সত্যেন্দ্রনাথ তখন স্ত্রীর ইংরাজী শিক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। ১৮৬৬ সালে ছুটি কাটিয়ে কর্মস্থলে ফেরার সময় এবার জ্ঞানদা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গেলেন না। সম্ভবত এই সময় তিনি সন্তানসম্ভবা ছিলেন।[৪৭] সত্যেন্দ্রনাথ চিঠির পর চিঠিতে স্ত্রীকে "বিবি বা মেম রেখে ইংরাজী পড়তে বা বলতে শেখবার জন্য খুব উপদেশ দিতেন।"[৪৮] জ্ঞানদা বেশ অগ্রসর হচ্ছিলেন নিশ্চয়ই কারণ সত্যেন্দ্রনাথ "নিজে কি কি বই পড়ছে তাও লিখতেন।"

আনুমানিক ১৮৭০ সাল নাগাদ জ্ঞানদা আবার স্বামীর সঙ্গে পশ্চিম ভারতে তাঁর কর্মস্থলে চলে যান। ১৮৭২ সালের জুলাই মাসে পুণা শহরে তাঁর পুত্র সুরেন্দ্রনাথের ও ১৮৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে বিজাপুরের কালাদ্‌গি শহরে কন্যা ইন্দিরার জন্ম হয়েছিল, এ যাত্রাও তিনি

৪১ তদেব, পৃ: ৩৩।
৪২ তদেব, পৃ: ৩৪।
৪৩ তদেব।
৪৪ পুরাতনী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৪।
৪৫ তদেব।
৪৬ তদেব, পৃ: ৩০।
৪৭ তদেব, পৃ: ৩৩।
৪৮ তদেব, এছাড়া জ্ঞানদাকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের পত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ৩১, ৩২, ৩৫, ৩৯, ৪৫, ৪৯, ৫০, ৫৩, ৫৪, ৫৮, ৫৯, ৬২, ৬৭। এই চিঠিগুলি ১৮৬৮ সালের জুন থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে লেখা হয়েছিল।

স্বামীর সঙ্গে ভারতবর্ষের উত্তর ও পশ্চিমাংশের অনেক জায়গায় বাস করেছিলেন, যেমন, সিন্ধুদেশের হাইদ্রাবাদ ও শিকারপুর। রামমোহনের অন্তিম জীবনীর লেখিকা শ্রীমতী মেরী কার্পেন্টারের সঙ্গে এই সিন্ধুদেশেই তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। ইংল্যান্ডে থাকতেই সত্যেন্দ্রনাথ মেরী কার্পেন্টারের সঙ্গ ও স্নেহলাভ করে তাঁর গুণমুগ্ধ হয়েছিলেন। স্ত্রীর কাছে লেখা অনেক পত্রে তাঁর উল্লেখ সত্যেন্দ্রনাথ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কার্পেন্টারের বন্ধুত্ব হয়, এ তাঁর বড় সাধ ছিল।[৪৯]

পশ্চিম ভারতের সামাজিক প্রেক্ষাপট বাংলাদেশের তুলনায় অনেকটাই উদার ছিল।[৫০] সেখানকার জীবনচর্যা জ্ঞানদার দৃষ্টিভঙ্গীর যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। তিনি দেখেছিলেন যে পশ্চিম ভারতের মেয়েরা ছিলেন যথেষ্ট স্বাধীন, তাঁরা বিনা বাধায় যে কোন জায়গায় যেতে ও সবার সঙ্গে আলাপ করতে পারতেন। তবে, এঁরা সকলেই পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করেছিলেন, সামাজিক প্রতিপত্তি এবং অর্থও এঁদের যথেষ্ট ছিল। কিন্তু, বাংলাদেশে দেবেন্দ্রনাথ বা প্রসন্নকুমারের মতো শিক্ষিত ও প্রগতিশীল ব্যক্তিরাও মেয়েদের স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন না, আশ্চর্য এই যে এঁরা দুজনেই স্ত্রীশিক্ষার সক্রিয় সমর্থক ছিলেন। অথচ এঁরা কেউই অবরোধ মোচন করতে চাইতেন না।

পশ্চিম ভারতে কিছুকাল বাস করে জ্ঞানদা বহির্জগৎ সম্পর্কে কিছুটা ওয়াকিবহাল হয়ে উঠেছিলেন। এইবার ১৮৭৭ সালে তিনটি শিশুসন্তানসহ জ্ঞানদা ইংল্যান্ড গেলেন। এবারও আরেকটি আলোড়ন উঠল। ৫, ৪ ও ২ বছরের তিনটি শিশুসন্তানকে নিয়ে জ্ঞানদা যখন বিলাত গেলেন, বন্দরে তাঁকে নামিয়ে নেবার জন্য এলেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর। তিনি অস্ফুটে মন্তব্য করেছিলেন ঃ "সত্যেন্দ্র একি করলেন? নিজে এলেন না।"[৫১] তবে জ্ঞানদা যৎসামান্য ইংরাজী বিদ্যার পুঁজি নিয়ে কালাপানি পাড়ি দিয়েছিলেন এ অনুমান বোধহয় যথার্থ নয়। কারণ, আগেই জ্ঞানদা বাড়ীতে মেম শিক্ষয়িত্রী রেখে ইংরাজী শিখেছিলেন।[৫২] বিলেত যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানদার নিজের কথায় "বোধহয় ওদের ভাষা কায়দা কানুন শেখবার জন্য। কারণ আমার স্বামী ইংরাজ সভ্যতার খুব ভক্ত ছিলেন।"[৫৩] জ্ঞানদানন্দিনী যে ভুল বোঝেননি তা তাঁকে লেখা বিলাত প্রবাসী সত্যেন্দ্রের বেশ কয়েকটি চিঠিতে ছড়িয়ে রয়েছে। আনুমানিক একবছর পরে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর পরিবারের সঙ্গে বিলাতে গিয়ে যোগ দিয়েছিলেন, জ্ঞানদা ইংল্যান্ডের বিভিন্ন জায়গা ও ফ্রান্সে থেকেছিলেন। ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা ভালভাবেই তাঁর আয়ত্ত হয়েছিল। বিভিন্ন সভানুষ্ঠানে বিদগ্ধ আলাপচারিতে তিনি খুব দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। স্ত্রীকে বিলাতে পাঠানোর ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য—সত্যেন্দ্র দুই-ই পূর্ণ করেছিলেন।

৪৯ পুরাতনী, পূর্বোক্ত, সত্যেন্দ্রনাথের পত্রসংখ্যা ৩ এবং ৪, পৃ: ৪৮ ৫১।

৫০ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস, পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৬।

৫১ ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩১।

৫২ তদেব।

৫৩ পুরাতনী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৮।

স্বামীর সস্নেহ প্রশ্রয় ও সাহচর্যে জ্ঞানদা অন্দরমহলের কয়েদখানা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। তাঁর স্বামী জ্ঞানদাকে আমূল বদলে দিয়ে এক নতুন মানুষ করে তুলেছিলেন। জ্ঞানদাও তাঁর স্বামীর মতাদর্শ ও জীবন মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু কখনো তাঁর নিজস্বতা হারাননি, জ্ঞানদার সবিশেষ কৃতিত্ব এখানেই। আগেই বলা হয়েছে যে সত্যেন্দ্র ও জ্ঞানদা জোড়াসাঁকোর যৌথ পরিবারে প্রতি পদক্ষেপে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাই স্বভাবত তাঁরা নিজেদের একান্ত নীড় গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু, জ্ঞানদা কখনো তাঁর বৃহত্তর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেননি। বরঞ্চ দেখা যায় যে যার যখন প্রয়োজন তাকেই সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন জ্ঞানদা।[৫৪] এভাবে, আধুনিক পারিবারিক ছকের মধ্যে থেকেও পারিবারিক সৌহার্দ্য বাঁচিয়ে রাখার দুরূহ কাজটি অনায়াসে সম্পন্ন করেছিলেন জ্ঞানদা।

স্বামীর ইচ্ছাপূরণের জন্য জ্ঞানদানন্দিনী তাঁর সঙ্গে বোম্বাই গেলেন, এরপর স্বামীর সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন জায়গায় থাকলেন। স্বামীর ইচ্ছামত একলা লাটসাহেবের পার্টিতে গেলেন, শুধু তাই নয়, তিনটি শিশু পুত্রকন্যা, আর স্বল্প ইংরাজী জ্ঞান নিয়ে গেলেন ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স। ফিরে এসে তিনি দুটি জিনিসের প্রবর্তন করলেন বলে জানাচ্ছেন তাঁর ভাগিনেয়ী সরলাদেবী চৌধুরাণী। বিলাত থেকে ফিরে জ্ঞানদানন্দিনী বিলাতী কায়দায় তাঁর ছেলে সুরেন্দ্রনাথ ও মেয়ে ইন্দিরার জন্মদিন পালন করতে শুরু করলেন। এতদিন পর্যন্ত ঠাকুর পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্মতিথির পূজানুষ্ঠান বলে কিছু ছিল না কারণ ব্রাহ্ম হওয়ার পর থেকে সব রকমের পূজা অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল। জ্ঞানদানন্দিনী তাঁর ছেলেমেয়ের জন্মদিনে বাড়ীসুদ্ধ সকলকে বৈকালিক জলযোগে নিমন্ত্রণ করতেন, আর প্রতিঘরের ছেলেমেয়েরা হাতে কিছু উপহার নিয়ে আসত। এভাবে জন্মদিন আমোদপ্রমোদ, মেলামেশা ও খাওয়াদাওয়ার উৎসব মূর্তিতে দেখা দিয়েছিল। এর সঙ্গে জ্ঞানদানন্দিনী কিছু দানধ্যানের ব্যাপারও যোগ করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছিল বর্ষাকালে তাই তার জন্মদিনে বাড়ীর ভৃত্যরা পেত ছাতা আর ইন্দিরার জন্ম শীতকালে বলে তার জন্মদিনে পরিচারকরা পেত একখানি করে কম্বল। কিন্তু আশ্চর্য এই যে তিনি কেক কাটা বা মোমবাতি জ্বালানোর বরং বিরোধিতা করেছিলেন।

এছাড়া জ্ঞানদানন্দিনী বিলাত থেকে ফিরে মেয়েদের ও শিশুদের বিকালে বেড়ানোর প্রথা প্রচলন করেছিলেন। সরলাদেবী জানাচ্ছেন যে বিকেলে সুরেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা ইডেন গার্ডেনে হাওয়া খেতে যেত আর তাদের সঙ্গে পালা করে বাড়ীর একেকটি ছেলেমেয়ে বেড়াতে যেত। সরলা স্মৃতিচারণ করেছেন যে তাঁর পালা এলে কিভাবে সতীশ পণ্ডিতমশায়ের অযথা হস্তক্ষেপে তা বানচাল হয়েছিল। এছাড়াও ছোটদের জন্য একটি সচিত্র কাগজ বের করার জন্য তাঁর আগ্রহ জন্মেছিল। ১২৯২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (১৮৮৫ সালের মার্চে) তাঁর সম্পাদনায় আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত 'বালক' আত্মপ্রকাশ করল। তাঁর ইচ্ছা ছিল সুধীন্দ্র, বলেন্দ্র প্রমুখ

৫৪ ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৫।

বালকগণ এই কাগজে নিজেদের রচনা প্রকাশ করবে। শুধু তাই নয়, জ্ঞানদানন্দিনী নিজেও কলম ধরলেন, রচনা করলেন সাত ভাই চম্পা ও টাক ডুমা ডুম নামে দুটি বালকোপযোগী রচনা।[৫৫]

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, শুধু স্ত্রী হিসাবে নয় মা হিসাবেও তিনি তাঁর ভূমিকাকে যথেষ্ট আধুনিক ভাবনাচিন্তার সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন। এখানে স্বর্ণকুমারীদেবীর কথা বলা যেতে পারে। তিনি প্রতিভাময়ী সাহিত্যিক ছিলেন, সাহিত্যকর্মে তাঁর স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল তাঁকে যথেষ্ট সহায়তা ও উৎসাহ দান করতেন। কিন্তু নিজ সন্তানদের প্রতি তিনি ছিলেন উদাসীন। তাঁর কন্যা সরলা নিজের আত্মকথায় আক্ষেপ করেছেন যে শৈশবে তিনি মাতৃস্নেহ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিলেন, তিনি বড় হয়েছিলেন দাসীদের তত্ত্বাবধানে। বড় হতে যখন তাঁর পিতামাতা তাঁর সঙ্গীত প্রতিভার পরিচয় পেলেন তখনও তাঁরা তা পুস্তকাকারে গ্রথিত করার উৎসাহ দেখাননি। এদিক দিয়ে বিচার করলে জ্ঞানদানন্দিনী কিন্তু ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের যথাযথতা সম্পর্কে সচেতনতা দেখিয়েছেন। মূল পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও পারিবারিক ঐতিহ্য থেকে ছেলেমেয়েদের বঞ্চিত করেননি তিনি। বরাবর তিনি জোড়াসাঁকোর সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। এই সময় থেকে মায়ের দায়িত্ব যে শুধু সন্তান পালন তা নয় বরঞ্চ তারা যাতে ভবিষ্যতের অগ্রসর আলোকপ্রাপ্ত নাগরিক তৈরী হয় সেটা সুনিশ্চিত করাও মায়ের কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল। ফলে মায়ের দায়িত্ব বৃদ্ধি পেল। জ্ঞানদানন্দিনী দক্ষতার সঙ্গে মায়ের এই নতুন ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

মহিলাদের স্বনির্ভরতার চিন্তাও জ্ঞানদানন্দিনীর ছিল। ১৮৮৬ সালে স্বর্ণকুমারী যখন সখি সমিতি স্থাপন করলেন তখন জ্ঞানদানন্দিনী ও স্বর্ণকুমারীর বিহঙ্গিনী বান্ধবী শরৎকুমারী চৌধুরাণী যথেষ্ট উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। শরৎকুমারী লিখেছেন, "একদিন সন্ধ্যার সময় আমরা তিনজনে তেতলার ঘরের খাটের উপর কেহ বসিয়া কেহ শুইয়া গল্প করিতেছিলাম। শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বলিলেন যে, 'দেখ, আমার মনে হয়, আমরা চেষ্টা করিলে দেশের ও জনসাধারণের অনেক কাজ করিতে ও করাইতে পারি। মনে কর, তোমার স্বামী ডাক্তার,—কোন দরিদ্র বিনা চিকিৎসায় কষ্ট পাইতেছে, তুমি স্বামীকে বলিয়া তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিলে, কাহারও স্বামী ব্যারিষ্টার—স্বামীকে বলিয়া সুবিচারের প্রার্থী কোন দরিদ্রের তিনি কাজটি উদ্ধার করিয়া দিলেন।"[৫৬] এভাবে যে সখি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হল তার উদ্দেশ্য ছিল মেয়েদের মধ্যে পারস্পরিক মেলামেশা, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার ও উন্নতির চেষ্টা, বিধবা রমণীকে সাহায্য করা, অনাথাকে আশ্রয়

৫৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী, ১৯৫৬ সংস্করণ, পৃ: ১৩৫।

৫৬ শরৎকুমারী চৌধুরাণী, "নারীশিক্ষা ও শিল্পাশ্রম", শরৎকুমারী চৌধুরাণী রচনাবলী, শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা-৬, শ্রাবণ ১৩৬৭, পৃ: ২৬৯।

দান ইত্যাদি। জ্ঞানদানন্দিনী অবশ্য সখি সমিতির পরবর্তীকালে তার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন এমন কোন প্রমাণ পাওযা যায় না।

স্বামী যাঁকে বঙ্গমহিলাদের আধুনিকতার পথিকৃৎ করতে চেয়েছিলেন সেই জ্ঞানদানন্দিনী কিন্তু কখনো দেশীয় ঐতিহ্য ও রীতিনীতিকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে চাননি। ১২৯০ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে ভারতী পত্রিকায় তাঁর যে লেখা প্রকাশিত হয় "সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার"[৫৭] এই শিরোনামে সেখানে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিলাতিয়ানার তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন যে, কুসংস্কার দূর করার আগে কোনটা কুসংস্কার তা স্থির করা কর্তব্য। "অনেক বাধা অতিক্রম করিয়া বিস্তর অর্থব্যয় ও পরিশ্রমপূর্বক দেশী কাঁটাগাছটি উপড়াইয়া ফেলিয়া ভুলক্রমে বা স্বেচ্ছাক্রমে তাহার স্থানে যেন আবার একটি বিলাতি কাঁটাগাছ রোপণ করা না হয়। কারণ, ইহাতে যে কেবল শ্রমের অপব্যয় হয় তাহা নহে, বিলাতি কাঁটাগাছটি হয়তো দেশীটির অপেক্ষা অধিকতর হানিজনক হইতে পারে।" তিনি কঠোরভাবে তিরস্কার করলেন যে যাঁরা "স্বদেশীর কুসংস্কারে বিশ্বাস স্থাপন কবেন তাঁরা ক্ষমা ও শ্রদ্ধার দুয়েরই অযোগ্য। যাঁরা দেশী প্রথা পরিত্যাগ করে বিদেশী প্রথায় জন্মদিন, বড়দিন বা নববর্ষ পালন করেন জ্ঞানদানন্দিনী তাঁদের অসার হৃদয়সম্পন্ন বলে জ্ঞান কবেছেন। মেযেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য যাঁরা সম্প্রদান প্রথার বিরোধিতা করেছেন, তাঁদেরও একহাত নিয়েছেন জ্ঞানদানন্দিনী। "স্নেহ বা প্রেমবশত তুমি যখন কাহাকেও বল, তুমি আমার বা আমি তোমার তখন কি বুঝায় তুমি আমার ঘটিবাটি বা আমি তোমার ঘটিবাটি? তাই পিতা যখন তাঁর স্নেহের ধন কন্যাটিকে সম্প্রদান করেন' তখন বোঝায়, আমার ভাবনা তোমাকে দিলাম, আমার স্নেহ তোমাকে দিলাম, আমার পিতৃত্বের অনেকটা কর্তব্যভার তোমাকে দিলাম, আমার স্নেহের ধন, যত্নের ধন তোমাকে দিলাম।"

১৮৫৬ সালে "সম্বাদ ভাস্কর"-এ এক মহিলার একটি পত্র প্রকাশিত হয়েছিল তাতে তিনি তাঁর নামের সঙ্গে স্বামীর পদবি যুক্ত করেছিলেন, 'দাসী' বা দেবী না লিখে তিনি নাম স্বাক্ষর করেছিলেন শ্যামাসুন্দরী বসুমল্লিক, এটাই সম্ভবত নাম স্বাক্ষরিত মহিলা লিখিত প্রথম চিঠি। কিন্তু জ্ঞানদানন্দিনী মেয়েদের পদবী ব্যবহারের ঘোর বিপক্ষে ছিলেন। "এক্ষণে আমাদের মহিলাদের মধ্যে নামের শেষে পিতা বা স্বামীর পদবি যোগ করিবার একটি প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।" তাঁর মতে মহিলাদের স্বামীর পদবী গ্রহণ "শ্রুতিকটু" সুরুচি বিমুখ পুরুষদিগের কুপরামর্শেই এরকম হচ্ছে একথা বলতেও ছাড়লেন না জ্ঞানদানন্দিনী। তাঁর মতে এটি নিছকই ইংরাজদের অন্ধ অনুকরণ প্রচেষ্টা, কারণ ইংরাজ মহিলারাই বিয়ের আগে পিতার পদবী ব্যবহার

৫৭ জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, "সমাজ-সংস্কার ও কুসংস্কার", ভারতী পত্রিকা, আষাঢ়, ১২৯০ বঙ্গাব্দ, বাঙ্গালী মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য, সংকলন ও সম্পাদনা, সুতপা ভট্টাচার্য, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী-১, ১৯৯৯ পৃ: ১২২।

কবে ও বিয়ের পরে স্বামীর পদবী গ্রহণ করে। তার চেয়ে "আমাদের চিব প্রচলিত নাম লিখিবার রীতি (যেমন, শ্রীমতী সরোজা সুন্দরী দেবী,—তিনি বিবাহিতা বা অবিবাহিতা হউন) অতি প্রশংসনীয়, ইহাতে আমাদের নিজত্ব বজায় থাকে।" এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে জ্ঞানদানন্দিনী বিলাতী রীতিতে সম্বোধন করারও ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর স্মৃতিকথা 'পুরাতনী'তে তিনি বলেছেন, "সকলের সঙ্গেই যেন সকলের একটা কিছু পাতানো সম্পর্ক থাকত। মা মাসি দিদি দাদা যেখানে পাতানো না থাকত, সেখানে বয়স অনুসারে কায়েত ঠাকরুণ, মুখুজ্যে মেয়ে বা ঘোষমশায়—এইরকম কিছু বলা হত। এরকম সম্বোধন কেমন বেমালুম বাংলা ভাষার সঙ্গে মিশে যায়, যেমন ফুলের সঙ্গে ফুল গাঁথা। আর 'মিস্টার', 'মিসেস্' 'মিস' এইসব শুনলে মনে হয় যেন ফুলের গাঁথনীর ভিতের মাঝখান থেকে কঠোর খন্‌খনে ঝন্‌ঝনে ধাতুর টুকরো এসে পড়ল।" অন্ধ ইংরাজ অনুকরণ যে তিনি কতখানি অপছন্দ করতেন তা প্রমাণ হয় যখন তিনি বলেন, "আমাদের স্ত্রীলোকদের স্ত্রীধন নামক যে নিজস্ব সম্পত্তি থাকে তাহা তো কেহই বলপূর্বক কাড়িতে পারে না। শুনিয়াছি আইন অনুসারে কোনো ধনই ইংরাজ মহিলাদের নিজস্ব বলিয়া গণ্য হয় না, আর ইদানীং নূতন আইন দ্বারা ইহার কিঞ্চিৎ প্রতিকার হইতেছে। তবে ইংরাজদের দেখাদেখি কি আমাদের স্ত্রীধনের অধিকার বিসর্জন দিব? ইহাতে গান্ধারীর পাতিব্রত্যের ন্যায় আমাদেরও কি ইংরাজব্রততাব পরাকাষ্ঠা দেখানো হয় না? আমার মতে পদ্ম ও আম্র গোলাপ ও স্ট্রবেরি হইতে চেষ্টা না করিয়া যদি নিজের নিজত্ব রক্ষা করিয়া সামঞ্জস্যের সহিত আপন দোষ ও অভাবগুলি দূর এবং শোভা বর্ধন করেন তবেই ভালো হয়।"[৫৮]

পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের মুখে কি আমরা এই কথার প্রতিধ্বনি শুনি না? সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রীকে অবরোধ থেকে মুক্ত করে স্বাধীন ও আধুনিক জীবনের স্বাদ দিতে চেয়েছিলেন, স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী তা আস্বাদ করেছিলেন নিজ বিচারবুদ্ধির প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা বেখে। ইউরোপীয় জীবনযাত্রাকে তিনি নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। এই জীবনপ্রণালীর দোষ তিনি সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন, কোনভাবেই তিনি স্বকীয়তা বিসর্জন দিতে চাননি। যদিও তাঁর মতামত কিছুটা রক্ষণশীল, তবু স্বকীয়তা বজায় রাখার এই প্রয়াস তাঁকে যথার্থ আধুনিক করে তুলেছে।

বাংলাদেশের নারীমুক্তির অন্যতম পথিকৃৎ সত্যেন্দ্রনাথ একথা অনস্বীকার্য, তবুও জ্ঞানদানন্দিনীর মতো স্ত্রী না পেলে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য এতটা সফল করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। জ্ঞানদা এমন অনায়াসপটুত্বের সঙ্গে সমস্ত রকম পরিবর্তিত পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছিলেন যে তাঁর পরবর্তী মেয়েদের পথ অনেক সুগম হয়ে গিয়েছিল। মহিলাদের আধুনিকায়নের ধারাকে জ্ঞানদানন্দিনী একাই বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

৫৮ তদেব। পৃ:পৃ: ১২৪-১২৯।

বধূ থেকে সহধর্মিণী

১৮৬৭ সালের ২৪শে জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের *(Bengal Social Science Association)* সভায় সভাপতির ভাষণে মাননীয় বিচারপতি ফিয়ার *(Phear)* বলেছিলেন, "আমি একথা না ভেবে পারছি না যে আপনাদের সমাজে নারীদের অবস্থান কেবলমাত্র নারীদের নিজেদের অজ্ঞতা ও সংস্কৃতির অভাবপ্রসূত বৈশিষ্ট্যকে সূচিত করে না, বরঞ্চ তার ভিত্তি হল সমগ্র সম্প্রদায়ের অজ্ঞতা। আমরা পাশ্চাত্যের লোকেরা কিছুদিন আগে শিখেছি, যা আপনারা এখনও আয়ত্ত করতে পারেননি, তা হল এই যে নারীর শ্রেষ্ঠ গুণাবলী, যার কদর আপনারা নিজেরাই করেন, তা জেনানাদের বিচ্ছিন্নতায় কখনোই সবচেয়ে ভালভাবে চর্চিত হতে পারে না।"[৫৯] বর্তমানে ইংরাজরা তাদের অবসরের সবটুকু সময় বাইরের খেলাধুলা বা আমোদপ্রমোদে কাটায় না, তারা এখন স্ত্রীদের সঙ্গে সময় কাটায়, স্ত্রীরাই এখন তাদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু এবং আস্থাভাজন উপদেষ্টা। পুরুষ ও নারীর এই সম অবস্থান কি প্রমাণ করে না যে নারীরা যদি অজ্ঞানতা ও দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী থাকে তবে তা সমাজের পক্ষে অশুভকারক এবং সমগ্র মনুষ্যজাতির অগ্রগতি ও মঙ্গলের পক্ষে এক বিরাট প্রতিবন্ধক? যুক্তির কথা ছেড়ে যদি ব্যক্তিগত স্বার্থের কথায় আসা যায়, তাহলে যদি মনে করা যায় যে স্বাভাবিকভাবে সুন্দরী ও মাধুর্যময়ী স্ত্রী গার্হস্থ্য পরিচালিকার ভূমিকায় আরো বেশী, অন্তত দশগুণ বেশী সৌন্দর্য আহরণ করেছেন, কিংবা বয়োজ্যেষ্ঠাদের শাসনপাশ থেকে মুক্ত হয়ে আরো পরিশীলিত ও পবিত্র তবে কি তা আরো বাঞ্ছনীয় নয়? কিংবা তরুণী মা সংসারের দায়িত্বভার পেয়ে গর্বিতা, সে তার পুত্রকন্যাদের ন্যায় ও সত্যের পথে পরিচালিত করছে, সন্তানরা তাদের মায়ের শিক্ষা চিরজীবন মনে রাখছে—এই দৃশ্যকল্পের চিন্তা কি সত্যিই মধুময় নয়? সংসারে স্ত্রী এই অগ্রণী পরিচালিকার ভূমিকাকে যদি মাপকাঠি হিসাবে ধরা যায় তাহলে স্বীকার করতেই হয় যে ভারতীয় তথা বঙ্গসমাজে নারীর অবস্থান ও ব্যবহার সভ্যতার বর্তমান পর্যায়ের সঙ্গে সাযুজ্যময় নয়।[৬০] এরপরে ফিয়ার *(Phear)* উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, "যদি আপনারা যে মর্যাদা লাভ করেছেন তা বজায় রাখতে চান, আরো বেশী করে যদি আপনারা দেশের মঙ্গল দেশের বাইরে বহন করে নিয়ে যেতে চান, তবে

৫৯ "I for one cannot help thinking that not only is the status of your women characterised by ignorance and want of culture in the women themselves, but its very foundation is ignorance in the whole community. You have not yet acquired the knowledge which we of the West sometimes ago learned, as we believe, that the best attributes of women, as you youself appreciate them, cannot possibly be nurtured to the fullest extent in the seclusion of the zenana."—Bela Dattagupta, *Sociology of India*, Part II, p. 14.

৬০ তদেব। পৃ: ১৪-১৬।

আপনারা অবশ্যই স্ত্রী ও কন্যাদের দিকে হস্ত প্রসারিত করুন, আপনারা তাদের আপনাদের উচ্চতায় উন্নত করুন।'[৬১] উপরের বক্তব্যে যে দাম্পত্য আদর্শ প্রকাশিত হয়েছে অর্থাৎ পত্নী শুধুই কাজের যন্ত্র নয়, সে সহধর্মিণী, নর্মসহচরী, গৃহের শোভা এবং সংসারে তার উপস্থিতি সংশয়াতীতভাবে মঙ্গলজনক, তার প্রতি ইংরাজী শিক্ষিত ভদ্রলোকরা স্বভাবতই গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কারণ ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত ইংলণ্ডীয় সমাজের চিত্র এবং ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক কাঠামোয় চাকরি করার সুবাদে তাঁরা এই নতুন পারিবারিক ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। তাঁরা যে বিবাহ রীতিতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাতে স্ত্রী তাঁদের সঙ্গিনী হবেন তা সম্ভব ছিল না, অথচ তাঁদের কর্মস্থলের নতুন পরিবেশ স্ত্রীর এই নতুন ভূমিকা দাবী করছিল। ব্রিটিশ শাসনের অধীনে চাকরিস্থল ছিল কাজের জায়গা, যেখানে আরাম অবকাশের কোন সুযোগ ছিল না। কাজেই, কঠিন কর্মস্থলের টানাপোড়েন, সংশয়, আশঙ্কা, অনিশ্চয়তা-জনিত ক্লান্তি ও অবসাদ অপনোদনের জন্য গৃহকে এমন এক আশ্রয়স্থল হিসাবে গঠন করার প্রয়োজন দেখা দিল যেখানে স্ত্রী শুধু স্বামীর শারীরিক চাহিদাই মেটাবেন না, তাঁর যাবতীয় ক্ষোভ, শঙ্কা ও অনিশ্চয়তার অংশীদার হয়ে তাঁর মানসিক যন্ত্রণার উপশমকারিণী হবেন।[৬২]

দুর্ভাগ্যবশত ঊনবিংশ শতকের প্রথম অর্ধে বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের বিবাহিত জীবন উপরোক্ত আদর্শের সঙ্গে খাপ খাওয়া তো দূরের কথা বরঞ্চ ঐ আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। অবশ্য ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বা শেষাংশে যে এই অবস্থার খুব পরিবর্তন হয়নি ফিয়ারের বক্তৃতা তার প্রমাণ। দুর্গামোহন দাস, ক্ষেত্রমোহন দত্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বা কেশবচন্দ্র সেন—এঁদের প্রত্যেকেরই বালিকাবধূরা তাঁদের স্বামীদের কর্মজগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। এতে তাঁদের স্বামীরা যে অসুবিধার সম্মুখীন হতেন, এব ফলে হয় ঐ বালিকাবধূরা হতেন উপেক্ষিতা নতুবা তাঁদের স্বামীরা কঠোর তপশ্চর্যাপূর্ণ ধর্মীয় জীবনে আশ্রয় নিতেন।[৬৩]

আমাদের আলোচনার কেন্দ্রীয় চরিত্র জগন্মোহিনী বা গোলাপসুন্দরী ছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পত্নী। ১৮৫৬ সালের ২৭শে এপ্রিল[৬৪] যখন কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় তখন জগন্মোহিনী মাত্র নয় বছরের বালিকা আর কেশব আঠার বছরের তরুণ। বিবাহের

৬১ "...if you desire to hold the position which you have won, much more if you hope to carry the welfare of your country beyond it, you must hold out your hands to your wives and your daughters, you must fill them up to the level of your own standing ground, and ask them to cooperate you. On something like equal terms, in your efforts to promote social refinement at home and public well being abroad." তদেব।

৬২ Meredith Borthwick, *The Changing Role of Women in Bengal, 1849-1905,* Princeton, 1984, p. 115-116.

৬৩ তদেব, পৃ: ১১৭।

৬৪ প্রিয়নাথ মল্লিক, *ব্রহ্মনন্দিনী সতী-জগন্মোহিনী দেবী,* শ্রী ব্রহ্মানন্দাশ্রম, হাবড়া, ১৯১৪, পৃ: ২৫।

সময় কেশবের এমন কোন অর্থকরী কর্মজগৎ ছিল না, যার মানসিক চাপের প্রতিষেধক স্ত্রীর কাছ থেকে পাবার প্রত্যাশা জাগতে পারে। কারণ, কেশব ১৮৫৯ থেকে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান হিসাবে কাজ করেছিলেন। ১৮৬৬ সালে তিনি কয়েকমাসের জন্য কলিকাতা টাঁকশালের দেওয়ান হিসাবে কাজ করেছিলেন।[৬৫] কিন্তু স্ত্রীর প্রতি উপেক্ষা ও অবহেলা বিয়ের পরপরই শুরু হয়েছিল, কেশব ব্রিটিশ সরকারের চাকরি গ্রহণ করার আগেই। এ বিষয়ে একজন প্রত্যক্ষদর্শী, কেশবের মাতা শ্রীমতী সারদাসুন্দরীর সাক্ষ্য আমরা পাই। আবার, একজন ভুক্তভোগী, স্বয়ং কেশবজায়া জগন্মোহিনী দেবীর জীবনীতেও আমরা এই ঘটনার উল্লেখ পাই। শ্রীমতী সারদাসুন্দরী দেখলেন—"কিন্তু বিবাহ ক'রে যেমন অন্য ছেলের মনে স্ফূর্তি হয় কেশবের তাহার বিপরীত দেখা গেল। কোন কিছু বুঝতে পাল্লাম না। আমার মনে হ'ল বুঝি মেয়েটি ছোট বলে পছন্দ হয়নি।"[৬৬]

কেশবের এই বিপরীত ভাবের বর্ণনায় পাই "অষ্টাদশ বর্ষে যে ধর্ম্মজীবন দেখা দিল, তাহা দিন দিন ঘনীভূত হইয়া বৈরাগ্যের তীব্রতায় পরিণত হইল। ...ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে তাঁহার মনে সংসারের প্রতি ভয় উপস্থিত হইল। সংসার অনেকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাই সংসারের সুখসম্ভোগ আমোদপ্রমোদ তাঁহার নিকট বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল, এই সময় তিনি ভিতরে এই শব্দ শুনিতে পাইলেন—"ওরে তুই সংসারী হোস্ না, সংসারের নিকট মাথা বিক্রয় করিস্ না; কলঙ্ক পাপ এ সকল ভারি কথা, আপাতত আমোদ ছাড়, আমোদের সূত্র ধরিয়াই অনেকে নরকে যায়।"[৬৭] "কে যেন তাঁহার মনের ভিতরে থাকিয়া বলিতে লাগিল, সংসার বিলাসে তুমি সুখলাভ করিবে? স্ত্রীর কাছে তুমি বসিয়া থাকিবে? সংসারের কথা লইয়া তুমি আলাপ করিবে? এ সকল বিষয় তোমাকে সুখী করিবে?" এই কথা শুনিয়া কি হইল? উচ্চ পদার্থ জীবাত্মাকে স্ত্রীর অধীন করা হইবে না, এই প্রতিজ্ঞা মনে সুদৃঢ় হইল।"[৬৮]

মাতা সারদাসুন্দরীর সন্দেহ ছিল, "বিবাহের সময় বৌ অতি ছোট, রোগা ও কাল ছিলেন, মাথার চুল আদপেই ছিল না।"[৬৯] তাই হয়ত ছেলের বৌ দেখে পছন্দ হয়নি। কারণ, প্রদীপের আলোয় মেয়ে দেখে সারদাসুন্দরী কেঁদে ফেলে ভেবেছিলেন যে তাঁর ঐ অতীব সুপুরুষ ছেলের জন্য এই রূপহীনা বৌ। এ নিয়ে কেশবের কোন ক্ষোভ ছিল না। শুধু মেয়ে দেখার কথা উঠলেই তিনি মজা করে হেসে বোনেদের বলতেন, 'তোমরা কাহারও মেয়ে দেখিতে

৬৫ Chittabrata Palit "Keshub Chandra Sen (1838-1884) Being and Becoming" in the authors own title, *New View Points on 19th Century Bengal*, Progressive Publishers, Calcutta. September, 1980, p. 174.

৬৬ কেশবজননী দেবী সারদা সুন্দরীর আত্মকথা।

৬৭ *আচার্য কেশবচন্দ্র। আদি বিবরণ।* কলিকাতা। মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে শ্রী বিশ্বনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৬৮ তদেব, পৃ: ৪৬।

৬৯ সারদাসুন্দরীর আত্মকথা।

যাইও না।'[৭০] সারদাসুন্দরী আত্মকথায় লিখেছিলেন যে কেশবের চরিত্রস্খলন হওয়া আশ্চর্য ছিল না।

আসলে সারদাসুন্দরী বুঝতে পারেননি যে তখন কেশবচন্দ্রের মনে "ভয়ানক বৈরাগ্যের" উদয় হয়েছিল। কেশব নিজেই লিখেছেন—"সংসারে প্রবেশ করিবার কাল, আমার পক্ষে শ্মশানে প্রবেশ করিবার কাল। ঈশ্বর স্থির করিয়া দিলেন সুখ-উদ্যানের পথ আমার পক্ষে মৃত্যু। শোক সন্তাপ বৈরাগ্যে আমার ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হইল। অষ্টাদশ বৎসর বয়সে অল্প অল্প ধর্ম্মজীবনের সঞ্চার হয়।...তখন এমন হইল যে দিবসে শান্তি পাওয়া যায় না, রাত্রিতে শয্যাও শান্তিকর হয় না। কতপ্রকার সুখভোগ যৌবনে হয় তৎসমুদায় বিষবৎ ত্যাগ করিলাম।

"তখন ধর্ম্ম জানিতাম না, জানিতাম সংসারী হওয়া পাপ। সংসার বিলাসেই অনেক লোক মরিয়াছে। ভিতর হইতে তাই শব্দ হইল ওরে তুই সংসারী হোস্ না, সংসারের নিকট মাথা বিক্রয় করিস্ না।

"সংসারের প্রতি ভয় জন্মিল, সংসারের রূপকে ভীষণ দেখিতাম। স্ত্রী বলিয়া যে পদার্থ তাহাকে ভয় হইত।

"যখন বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিব, সংসারের বাড়ী যেখানে করিব, দেখি এই জায়গাই ত শ্মশান। স্ত্রী আসিতেছেন, সংসার আরম্ভ করিতে হইবে; ...প্রতিজ্ঞা করিলাম এ জীবনে স্ত্রৈণ হইব না; কেননা স্ত্রীর অধীন হইয়াই অনেককে মরিতে দেখিয়াছি।"

"এইরূপে জীবনের মূলে বৈরাগ্য হইল। তখন সংসার কাছে আসিতে পারিল না। আত্মপীড়ন ও ভার্যাপীড়ন দ্বারা ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হইল।"[৭১]

স্বাভাবিকভাবেই, এই যাঁর স্বামীর মনোভাব তাঁর বিবাহিত জীবন সুখে আরম্ভ হয়নি। "বিবাহের পর সতী পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন; এদিকে স্বামীও সংসার বৈরাগ্য সাধনের যত কিছু সুযোগ হইতে পারে তাহাই খুঁজিতে লাগিলেন।

গুরুজন আত্মীয়গণ তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া কত কি তাঁহার সম্বন্ধে জল্পনা করিতে লাগিলেন। কেহ যেমন ভাবিলেন স্ত্রীকে অপছন্দ বলিয়াই তাঁহার এরূপ ভাব হইয়াছে। আবার কেহ ভাবিলেন তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যাইবেন। কেহ ভাবিলেন তিনি খ্রীষ্টান হইয়া যাইবেন। এইরূপ নানাপ্রকার সন্দেহ, নানাপ্রকার আলোচনা করিয়া যাহাতে সংসারে তাঁহার মন বসে এজন্য তাঁহার নবপরিণীতা পত্নীকে শীঘ্র পিত্রালয় হইতে আনাইলেন। কিন্তু

৭০ চিত্রা দেব। *অন্তঃপুরের আত্মকথা*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা-৯, চতুর্থ মুদ্রণ, জুলাই ১৯৯২, পৃ: ৫৮।

৭১ কেশবচন্দ্র সেন, *জীবনবেদ*, শ্রী নববিধান ব্রাহ্মট্রাস্ট সোসাইটি, কলিকাতা, ভাদ্র, ১৮০৬ শক, ১৮৮৪ সাল (ইং)।

তাহাতে কেশবের বৈরাগানল নির্ব্বাণ না হইয়া আরো প্রজ্বলিতই হইল। তিনি স্ত্রীর মুখ দর্শন বা তাঁহার সহিত প্রায় বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিলেন না।"[৭২]

যে স্ত্রী স্বামীর সমাদর লাভে বঞ্চিতা, সে যে সংসারেও আদৃতা হবে না তা বলাই বাহুল্য। একান্নভুক্ত বৃহৎ সেন পরিবারে জগন্মোহিনীর জা, ননদ প্রভৃতি বয়স্কা আত্মীয়ার অভাব ছিল না। সকলে একসঙ্গে থাকা খাওয়া করতেন। প্রায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বামীর কাছ থেকে নানারকম সুন্দর সুন্দর উপহার পেতেন। শুধু জগন্মোহিনী স্বামীর সাক্ষাৎ পর্যন্ত পেতেন না, উপহার তো দূরের কথা। এতে আত্মীয়া মহিলারা সর্বদাই তাঁকে বিদ্রুপ করতেন ও বলতেন যে "পত্নীকে তাঁর পছন্দ হয় নাই বলিয়াই দেবীকে কখনও দেখিতে পর্য্যন্ত অন্তঃপুরে আসেন নাই, এবং কোন উপহারাদিও দেন নাই।"[৭৩]

স্বামীর অনাদর পর্যবসিত হয়েছিল সংসারের অবহেলায় ও নির্যাতনে। একদিকে পতিপ্রেমে বঞ্চিত হওয়ার নিদারুণ অপমান অন্যদিকে স্বামীর আদর না পাবার জন্য তাঁকেই দোষী করে আত্মীয়দের গঞ্জনা। জগন্মোহিনী যে শ্বশুরালয়ে কি অসহনীয় জীবনযাপন করতেন তার জন্য একটি কি দুটি উদাহরণই যথেষ্ট। একদিন মনোবেদনা সহ্য করতে না পেরে তিনি একটি ঘরে দরজা বন্ধ করে কাঁদছিলেন, এমন সময় এক আত্মীয়ার ঐ ঘরে প্রবেশ করার প্রয়োজন হলে তিনি দ্বার রুদ্ধ দেখলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করে তিনি জানতে পারলেন যে জগন্মোহিনী সেই ঘরে। তখন কুপিতা সেই আত্মীয়া দ্বারে পদাঘাত করে জানতে চাইলেন, "এত বড় স্পর্দ্ধা, আবার একটা ঘর চাই।"[৭৪] সুবৃহৎ সেন পরিবারের প্রাসাদোপম বাড়ীতে একটি ঘর নিজের করে পাওয়ারও অধিকার তাঁর ছিল না। অবশ্য জগন্মোহিনীর ভাগ্য যে ব্যতিক্রমীভাবে মন্দ ছিল তা নয়। সাধারণভাবে এই-ই ছিল উনিশ শতকের অন্দর মহলের চিত্র। জগন্মোহিনীর শ্বশ্রূমাতা সারদাসুন্দরী তাঁর কৃতী পুত্রের মাতা হিসাবে যতখানি সার্থক ও গৌরবান্বিতা ছিলেন সেন পরিবারের বধূ হিসাবে তিনি কতটুকু মর্যাদা পেয়েছিলেন? তাঁর শাশুড়ির বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে বৌয়ের বয়স মোটেই দশ নয়, নিশ্চয় তার চেয়ে অনেক বেশি। তাই একটু দোষ দেখলেই শ্বশুরকে বলে দিতেন ও বকুনি খাওয়াতেন।[৭৫]

তাঁর শাশুড়ীর আমলে বধূরা শ্বশুরগৃহে যে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগত জগন্মোহিনীর নিজের জীবনেও তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেনি।[৭৬] যেমন তাঁর শ্বশুরগৃহের কোন কক্ষে অধিকার ছিল না তেমনি ছিল না রোগে চিকিৎসার সুযোগ পাবার অধিকার। "একবার সতীর জ্বর-বিকার হয়, এমন কি সে সময় তাঁহার কিছুমাত্র সংজ্ঞাও ছিল না। সেই সময় পরিবারস্থ অপর

৭২ ব্রহ্মানন্দিনী সতী জগন্মোহিনী দেবী, পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ৩৩-৩৪।
৭৩ তদেব, পৃ:পৃ: ৩৪-৩৫।
৭৪ তদেব, পৃ:পৃ: ৩৫-৩৬।
৭৫ অন্তঃপুরের আত্মকথা, পূর্বোক্ত, পৃ: ২১।
৭৬ তদেব।

একটি মহিলারও পীড়া হয়।[৭৭] ডাক্তার সেই মহিলাকে দেখিয়া অন্যঘরে সতীর সংজ্ঞাহীন অবস্থা শুনিয়া দেখিতে চান।[৭৮] অমনি একজন বলিয়া উঠিলেন, "ফুলের সোহাগেই কলার ছোটার আদর", অর্থাৎ ফুলের মালা বাঁধিতেই কলার ছোটার দরকার, কিন্তু যদি ফুলের মালা বাঁধার আবশ্যক না হয়, তবে কলার ছোটার আর আবশ্যকতা কি? স্বামীর জন্য স্ত্রীর আদর, স্বামী যার বিমুখ তার আর আদর কি?"[৭৯]

কেশবের যখন বিবাহ হয় তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৮ বছর। এইরকম একটি কিশোরের পক্ষে বিবাহের তাৎপর্য কতখানি বোঝা সম্ভব এ বিষয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। উপরন্তু বিবাহের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি পরিচিত হন তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের অবিসংবাদিত নেতা শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে। "কেশবের সহপাঠী ছিলেন মহর্ষির দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দুজনেই হিন্দু কলেজের। সহপাঠের সুযোগে সখ্য গড়ে উঠেছিল। দুই বন্ধু মেতেছিলেন 'গুডউইল ফ্রেটারনিটির' কাজে। সেখানে সত্যেন্দ্রনাথ পিতাকে নিয়ে এলেন এক সভায় সভাপতিত্ব করবার জন্য। কেশবচন্দ্র তখন (১৮৫৭ খ্রীঃ) উনিশ বছরের যুবক —'উজ্জ্বল শিখার মত'। ঐ সভায় কেশব দেখলেন প্রবীণ ব্রাহ্মনেতা মহর্ষিকে। প্রথম দর্শনে প্রেম কথাটি বুঝি দেবেন্দ্র ও কেশবের প্রথম সাক্ষাতের ক্ষণে সত্য হয়ে উঠেছিল। আবাল্য হিন্দুসংস্কারে লালিত বৈষ্ণব পরিবারের ছেলে কেশব ঐ ক্ষণেই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করবেন বলে স্থির করে নেন।"[৮০] কাজেই, যে সময় কেশবের বিবাহ হয় সেই সময়ই তিনি এক নতুন জগতের সন্ধান পেয়েছিলেন, শৈশব থেকে ধর্মোৎসাহী কেশব যে পরিবেশ ও ধর্মের সংস্পর্শে এসেছিলেন সেখানে তাঁর ইংরাজী শিক্ষিত মন সম্পূর্ণ পরিপোষণ ও যোগ্য সহমর্মিতা পেত। তাঁর ঐ সময়কার মানসিক জীবনে তাঁব নবপরিণীতা নয় বৎসর বয়স্কা বালিকা স্ত্রীর প্রবেশ করার কোন উপায় ছিল না। দেবেন্দ্রনাথের সমুন্নত ব্যক্তিত্ব, সত্যেন্দ্রনাথের সখ্য, নতুন ধর্মগ্রহণের সিদ্ধান্ত ও তদ্বিষয়ক উত্তেজনা ও টানাপোড়েন সমস্ত কিছু কেশবের মনোজগৎকে এমনভাবে অধিগত করে রেখেছিল যে তখন নতুন বিবাহের রোমাঞ্চ একেবারে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। কেশবজায়ার জীবনীকারও প্রায় এইরকম কথা লিখলেন—"এরূপ শুনা যায় যে বিবাহের পর প্রায় চারি পাঁচ বৎসর কাল এইরূপে ব্রহ্মানন্দ স্ত্রীর সহিত প্রায় কোন সম্পর্কই রাখেন নাই। ইহা অবশ্যই তিনি তাঁহার ধর্ম্মজীবনের বৈরাগ্যের উত্তেজনায় করিয়াছিলেন।"[৮১] আসলে ১৮ বছরের একটি কিশোর ও নয় বছরের একটি বালিকার বিবাহ কখনোই পরিপূর্ণতা পেতে পারে না। কেশব ও জগন্মোহিনীর বিবাহ যে নিষ্ফল হয়নি এবং কেশবের প্রায় সর্বক্ষণের সঙ্গিনী ছিলেন তিনি তা ক্রমশ দেখা যাবে। কিন্তু বিবাহের প্রথমদিকে স্বামী ও স্ত্রী অপরিণত বয়স্কতা যাবতীয় সমস্যার মূল ছিল।

৭৭ সতী জগন্মোহিনী দেবী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৬।

৭৮ তদেব।

৭৯ তদেব।

৮০ ঝরা বসু, *কেশবচন্দ্র সেন ও তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজ,* প্রমা, কলিকাতা-১৭, অগ্রহায়ণ, ১৪০১, পৃ: ৩৪।

৮১ সতী জগন্মোহিনী দেবী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৪।

জগন্মোহিনীর জীবনীকার এ বিষয়ে যে মন্তব্য করেছেন তা কৌতুকাবহ—"স্বভাবত উচ্চ নীতিপরায়ণ কেশবচন্দ্র ঘটনাচক্রে বাল্যবিবাহ করিলেও পাছে তাঁহাকে বাল্যবিবাহের পাপে লিপ্ত হইতে হয়, এই জন্যই যেন ভগবানই তাঁর প্রাণে এই মহা বৈরাগানল উদ্দীপন করিয়া তাঁহাকে সে অপরাধ হইতে রক্ষা করিলেন।"[৮২]

১৮৫৭ সালে দেবেন্দ্রনাথ সিমলা পাহাড় গিয়েছিলেন একান্তে ধ্যানধারণাতে জীবন যাপন করবার জন্য। "তাঁহার অনুপস্থিতিকালে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন। দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫৮ সালে শহরে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সংবাদে পুলকিত হইলেন এবং তাঁহার যৌবন সুহৃদ প্যারীমোহন সেনের পুত্রকে সাদরে স্বীয় শিষ্যদলের মধ্যে গ্রহণ করিলেন।"[৮৩] কেশব যে প্রকৃতই দেবেন্দ্রনাথের পুত্রতুল্য ছিলেন, তা বোঝা যায় তাঁর সিংহলযাত্রায় কেশবের সঙ্গী হওয়া থেকে। এই সিংহল যাত্রা থেকে প্রত্যাবর্তন করার পরেই কেশব ও জগন্মোহিনীর দাম্পত্যজীবন এক নতুন মোড় নেয়। ১৮৫৯ সালে দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ও পুত্রতুল্য কেশবচন্দ্রকে জাহাজে করে সিংহল রওনা দেন। গোঁড়া সেন পরিবারের পক্ষে কালাপানি পেরোনোর মত ম্লেচ্ছাচার ছিল অসহনীয় ও অমার্জনীয় অপরাধ। কেশবের মা সারদাসুন্দরী ভীত হলেন পাছে জাতিভ্রষ্ট ও সমাজচ্যুত হতে হয়। কেশব গোপনে জাহাজে এসে উঠেছিলেন ও জাহাজ বন্দর ত্যাগ করা পর্যন্ত কেবিনে লুকিয়ে ছিলেন।[৮৪] পরে তাঁর একটি পত্রে পরিবারের লোকেরা সমস্ত বিষয়টি অবগত হন ও অতিশয় দুঃখিত হন। তাঁর বালিকাবধূ তখন অসুস্থ ছিলেন। কেশবের সিংহল গমনে ভীতা হয়ে বাড়ীর মেয়েরা ক্রন্দনরোল তুললেন। বযোজ্যেষ্ঠরা কেশবকে অবাধ্য ও নিষ্ঠুর বলে সমালোচনা ও তিরস্কার করলেন।[৮৫]

এই বিদেশযাত্রা ও একত্রবাস কেশবচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথকে এক সুদৃঢ় প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল। সিংহল থেকে ফেরার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক পদ ত্যাগ করলেন, তখন কেশবচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথ যুগ্মভাবে ঐ পদটি গ্রহণ করলেন। এই সময়ে কলুটোলার বাড়ীর নিচের তলায় ছোট্ট একটা ঘরে কেশবচন্দ্র ও আরও কয়েকজন ধর্মসমাজের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সভার নাম দিয়েছিলেন সঙ্গত সভা। উপবীত ত্যাগ, স্ত্রীশিক্ষা দান, পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধন, নৈতিক চরিত্রের উন্নতি বিষয়ে এখানে আলোচনার তুফান উঠত।[৮৬] এইভাবে, ধর্মসংস্কার ও আলোচনার

৮২ সতী জগন্মোহিনী দেবী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৪।

৮৩ শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ*, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, কলিকাতা-৯, ৫ই জুলাই, ১৯৭৯, পৃ: ৪০৪।

৮৪ ঝরা বসু, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪।

৮৫ দেবী সারদা সুন্দরী আত্মকথা, পূর্বোক্ত।

৮৬ ঝরা বসু, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫।

সঙ্গে সঙ্গে কেশব সমাজসংস্কারে উৎসাহী হয়ে উঠলেন। তখন সমাজসংস্কারের প্রশ্নের সঙ্গে অনিবার্যভাবে নারী প্রশ্নটি জড়িত ছিল। তাই কেশবও নারীদের উন্নতিকল্পে সচেষ্ট হলেন। তবে একথা অনস্বীকার্য যে নারীজাতির উন্নতি বা সমাজসংস্কার বিষয়টিকে কেশব কখনো এককভাবে দেখেননি। সংস্কারের যৌক্তিকতার সঙ্গে তিনি ধর্মীয় আবেগকে যুক্ত করেছিলেন। তাঁর সংস্কার ভাবনার মধ্যে মেয়েদের চেয়ে বেশী প্রাধান্য পেয়েছে ধর্ম ও ভক্তি।[৮৭]

ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ, তত্ত্ববোধিনী সভায় যোগদান, সঙ্গত সভা স্থাপন ইত্যাদি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে কেশবের পরিচয় ঘনিষ্ঠ করে তুলেছিল। বিশেষ করে, তাঁর সহাধ্যায়ী ও সুহৃদ সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর পত্নী জ্ঞানদানন্দিনীর প্রতি যে সযত্ন অনুরাগ প্রদর্শন করতেন, কেশবের পক্ষে তার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া খুবই সম্ভব। সাত বছরের মেয়ে জ্ঞানদানন্দিনীর যখন সবে পাঠশালাতে অক্ষর পরিচয় শুরু করেছিলেন তখনই বধূ হয়ে বিশাল ঠাকুরবাড়ীতে তাঁর প্রবেশ ঘটেছিল। স্বামী সত্যেন্দ্রনাথ বিলেতে গিয়ে দেখলেন স্বাধীনচেতা বিদেশিনীদের। ঘরে-বাইরে তাঁদের স্বচ্ছন্দ সুন্দর, সাবলীল ও অবাধ বিহার। এতে কোথাও কোন ছন্দপতন ঘটছে না, সমাজ রসাতলে যাচ্ছে না, তাহলে মেয়েদের আলো বাতাস থেকে বঞ্চিত করে ঘরের মধ্যে শুকিয়ে মারলে কি মঙ্গলের সম্ভাবনা? "সত্যেন্দ্র স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন। তিনি অন্তঃপুরের ঝরকা ভেঙে ফেলছেন, তাঁর স্ত্রী এসেছেন কালাপানি পাড়ি দিয়ে বিলেতে। মন জাগবার আগেই মনের মানুষ বলে তাঁর পরম আদরের 'জ্ঞেনুমণি' যাঁকে বরণ করে নিয়েছেন, জগৎসভায় স্বয়ম্বরা হয়ে সকলের মধ্যে বেছে নিয়ে তাঁকে আবার পরিয়ে দিচ্ছেন প্রেম-পারিজাতের বরণমালা। শুরু হল স্ত্রীকে গড়ে তোলার সাধনা।"[৮৮]

এছাড়া ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের ভগ্নীরা। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর মেয়ে সৌদামিনী ও ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বেথুন স্কুলে পাঠিয়েছিলেন লেখাপড়া শেখার জন্য। ১৮৬১ সালের ২৬শে জুলাই দেবেন্দ্রনাথের কন্যা সুকুমারীর বিবাহ হল নবপ্রণীত ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে। দেবেন্দ্রনাথের অপর কন্যা স্বর্ণকুমারী বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক লেখিকা।

"তাঁর সোনালি ছটায় ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল আলোকিত।" তখন ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে যে মুক্তির হাওয়া বইতে শুরু করেছে তার উদাহরণ পাওয়া যায় সৌদামিনীর রচনা 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থ থেকে। তিনি জানাচ্ছেন, "জোড়াসাঁকোর মহর্ষিভবনের কম্পাউন্ডের ওপারেই ছিল দেবেন্দ্রনাথের পিসতুত ভাই চন্দ্রবাবুর বাড়ি। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা খোলা ছাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখে তিনি একদিন এসে বললেন, "দেখ দেবেন্দ্র, তোমার বাড়ির মেয়েরা বাহিরে, খোলা ছাতে বেড়ায় আমরা দেখতে পাই, আমাদের লজ্জা করে। তুমি শাসন করিয়া দাও না কেন?" ...উদারপন্থী দেবেন্দ্রনাথ এর মধ্যে কোন দোষ দেখতে পাননি, তার চেয়েও বড় কথা তিনি

৮৭ চিত্তব্রত পালিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ: ৫।

৮৮ চিত্রা দেব, *ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৯, সপ্তদশ মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪০০, পৃ:পৃ: ২৪-২৫।

বুঝেছিলেন দিন-বদলের পালা শুরু হয়েছে। তাই হেসে বলেছেন, "আমি আর কিসের বাধা দিব। যাঁহার রাজ্য তিনিই সমস্ত ঠিক করিয়া লইবেন।"[৮৯] এসব ঘটনা কেশব প্রত্যক্ষ করেছিলেন, কাজেই ধীরে ধীরে তাঁরও যে মানসিক পরিবর্তন ঘটবে তা খুব কষ্টকল্পনা নয়।

পরিবর্তন যে সুনিশ্চিতভাবে ঘটেছিল জগন্মোহিনীকে নিয়ে কেশবের জোড়াসাঁকোয় গমন তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। এককালে যে স্ত্রীকে তিনি চরম অবহেলা করেছিলেন সে স্ত্রীকে সহধর্মিণী করে তিনি যেমন পত্নীপ্রেমের নিদর্শন রাখলেন তেমন জগন্মোহিনীও তাঁর পক্ষে স্বামীর প্রতি আনুগত্য ও সমর্থনের প্রমাণ দিলেন। ১৮৬২ সালের ১৩ই এপ্রিল, ১২৬৯ বঙ্গাব্দ বা ১৭৮৪ শকের ১লা বৈশাখ দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য পদে বরণ করলেন এবং 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি দান করলেন।[৯০] এই উপলক্ষ্যে দেবেন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে প্রচুর অর্থব্যয়ে এক উৎসবের আয়োজন করেন। উৎসবে যোগ দেবার জন্য কেশবচন্দ্র সস্ত্রীক দেবেন্দ্রনাথের গৃহে এসেছিলেন। এই আগমনকে কেন্দ্র করেই কেশব ও জগন্মোহিনীর জীবনে এক মস্ত পালাবদল ঘটল।

"তিনি তাঁহার পত্নীকে যে লইয়া যাইবেন একথা অবশ্যই মাতা সারদা দেবীর নিকট পূর্বেই বলিয়াছিলেন। ইহা লইয়া সেন পরিবারে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। এমন উচ্চ হিন্দু পরিবারের কুলবধূ পিরালী ঠাকুর বাড়ীতে প্রকাশ্যভাবে যাইবেন ইহা সেন পরিবারের পক্ষে বড়ই অমর্যাদাসূচক এবং লজ্জাজনক ব্যাপার। যাহাতে ব্রহ্মানন্দ পত্নীকে লইয়া যাইতে না পারেন এ জন্য পরিবারের কর্তৃপক্ষগণ বিশেষ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।"[৯১] যেমন নিজে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার সময় পরিবারের কারো বাধাই গণ্য করেননি, স্ত্রীর ব্রাহ্মোৎসবে যোগদান করার সময়ও তেমনি সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করলেন। "চারিদিকে সকলের অমত ও বাধাদান, দৃঢ়সঙ্কল্প কেশব একাই দেশের জন্য পরমব্রহ্মে জীবন উৎসর্গ করিবেন, তবে আর পত্নী সহধর্ম্মিণী নামে অভিহিত হইবেন কিরূপে? তিনি টলিলেন না। লজ্জাশীলা বালিকা হিন্দুগৃহের কুলবধূ। লজ্জায় ম্রিয়মান। চারিদিকে গুরুজনগণ দণ্ডায়মান। বধূকে সকলেই বাধা দিতেছেন। তাঁহার পা চলে না, কেশবচন্দ্র পিছনে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যদি আমার অনুবর্ত্তিনী হইতে চাও এই বেলা, এই সময়, অন্যথা আমি বিদায় গ্রহণ করিতেছি।" সত্যবাক বিবেকী স্বামীর আজ্ঞা সৎপত্নী অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। সহধর্ম্মিণীরূপে পশ্চাৎগামিনী হইলেন। দ্বারবানের সাধ্য কি যে অর্গল বদ্ধ করিয়া রাখে। ঐশ্বরিক শক্তিকে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। বাহিরে শিবিকা ছিল। পত্নীকে লইয়া তিনি মহোৎসবে যোগ দিলেন। কিন্তু তৎপরে তিনি অভিভাবকগণের পত্র পাইলেন। তাহাতে তাঁহাকে গৃহে ফিরিতে নিষধ করা হইয়াছিল।"[৯২]

---

৮৯ তদেব, পৃ: ২১ ২২।

৯০ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪০৫।

৯১ সতী জগন্মোহিনী দেবী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪২।

৯২ হরিপ্রভা তাকেদা, *আশাচন্দ্র শ্রী ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন,* ঢাকা, ১৮৯৬, পৃ: ২১-২২।

কলুটোলা থেকে জোড়সাঁকো, দূরত্ব বিচারে হয়ত এই পথটি খুবই সাধারণ, তবুও এই পথেই প্রোথিত হল ভারতীয় নারীমুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন। কোন হিন্দু কুলবধূ অবরোধ থেকে বেরিয়ে এসে পরগৃহে বসবাস করছেন এ ছিল ঊনবিংশ শতকে একটি অত্যন্ত ব্যতিক্রমী ঘটনা। কেশব ও জগন্মোহিনী এক্ষেত্রে একটি নতুন পথের দিশা রচনা করেছিলেন। কলুটোলার বাড়ীর দরোজা তাঁদের জন্য বন্ধ হয়ে গেল "এই অবস্থাতে তাঁহাকে ও তাঁহার পত্নীকে অনেকদিন দেবেন্দ্রনাথের ভবনে তাঁহাব পুত্র ও পুত্রবধূদিগের মধ্যে বাস করিতে হইল।"[৯৩] কেশব ও জগন্মোহিনীর দাম্পত্যজীবনেও একটি গভীর তাৎপর্য নিয়ে এল এই ঘটনাটি। এইভাবে পরগৃহে এই দম্পতির যুগ্মজীবন শুরু হল। জগন্মোহিনী এখন থেকে প্রকৃত অর্থে কেশবের সহধর্ম্মিণী হলেন। এরপর থেকে জগন্মোহিনী কেশবের প্রতিটি কাজের অংশীদার ও সাহায্যকারিণী হলেন।

এখন কেশব ও জগন্মোহিনী যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন তা তাঁর অনুগামীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরে" যে ২২ জন যুবক দীক্ষিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শ্রীনাথ দত্ত। তাঁর পত্নী হরসুন্দরী দত্ত "স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্তের জীবনকথা"[৯৪] নামক স্মৃতিকথামূলক একটি পুস্তকে বর্ণনা দিয়েছেন কিভাবে তিনি লেখাপড়া শেখার জন্য পরগৃহে বাস করেছিলেন শুধু তাই নয়, তিনি আশ্রয়দাতা পরিবারে নিজের শ্রমের বিনিময়ে শিক্ষার অধিকার অর্জন করেছিলেন। ১৪ বছরের শ্রীনাথ দত্ত বিবাহ করেছিলেন ৭ বছরের হরসুন্দরীকে। পত্নীর বয়স ১১ বছর তখন তিনি হরসুন্দরীকে লেখাপড়া শেখাতে চাইলেন। কিন্তু শ্রীনাথের পিতামাতা পুত্রবধূর শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। তখন শ্রীনাথ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য আয়াসের বলে পত্নীকে সকলের অনুমতি ব্যতিরেকে গোপনে কলকাতায় নিয়ে আসেন এবং শ্রীদুর্গামোহন দাসের গৃহে রাখেন। হরসুন্দরীর নিজের ভাষায়— "ইঁহারা যদিও আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন, তবু ইঁহাদের আদরযত্নে অল্পদিনের মধ্যেই আমি আমার পিতা-মাতার ও শ্বশুর-শাশুড়ীর অভাব ভুলিয়া তাঁহাদের পরিবারে চারি বৎসর অতি সুখে ছিলাম। তাঁহাদের ছোট সন্তানের লালন-পালনের ভার আমি লইয়াছিলাম। লেখাপড়া করিয়া যে সময়টুকু পাইতাম, তাহা ঐ কাজে ব্যয় করিয়া বড় তৃপ্তি বোধ করিতাম।"[৯৫]

কেশবচন্দ্রের সস্ত্রীক ঠাকুরবাড়ীতে বাস করা ও হরসুন্দরীর দুর্গামোহন দাসের গৃহে বাস করার মধ্যে পার্থক্য আছে। কেশব সস্ত্রীক দেবেন্দ্রনাথের কাছে ছিলেন ও উভয় পরিবার মোটামুটি সমমর্যাদাসম্পন্ন ছিল। নিতান্ত আত্মীয় বিরোধের সম্মুখীন না হলে কেশবের পক্ষে বাড়ীতে থেকে স্বধর্মাচরণ করা সম্ভব ছিল। তাঁর নিজস্ব গৃহে স্থান বা অর্থ কোনকিছুর অভাব ছিল না। কিন্তু শ্রীনাথ ও হরসুন্দরীর ক্ষেত্রে তা ছিল না। উচ্চশিক্ষার্থে শ্রীনাথ বিলাতে গমন

৯৩ *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪০৫।

৯৪ হরসুন্দরী দত্ত, *স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্তের জীবনকথা*, ঢাকা, ১৯২২।

৯৫ তদেব, পৃ: ১২।

করেছিলেন। ইত্যবসরে স্ত্রীকে শিক্ষাদান করে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য তিনি তাঁকে পরগৃহে রেখে যান। সেখানে হরসুন্দরী যেমন বাড়ীর শিশুদের দেখাশোনার ভার নিলেন বিনিময়ে তেমনি খাদ্য, বস্ত্র ও শিক্ষার অধিকার পেলেন। কেশব ও দেবেন্দ্রের মধ্যে এই দেওয়া নেওয়ার বিষয়টি অনুপস্থিত ছিল। তবুও উভয় ক্ষেত্রে পরগৃহবাস উভয়ের দাম্পত্য বন্ধনকে সুদৃঢ় করেছিল।

১৮৬৩ সালে সেন পরিবারের সম্পত্তিঘটিত গোলযোগ শুরু হয় এবং কেশব নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন মাতা সারদাসুন্দরী ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা নবীনচন্দ্র সেনের হস্তক্ষেপে কেশব আবার জগন্মোহিনীকে নিয়ে কলুটোলার পৈতৃক বাসভবনে ফিরে আসেন। "পিরালী ঠাকুর-বাড়ীতে বাস করাতে তাঁহার জাতি গিয়াছিল, তাই তাঁহার নিজ ঘরেই প্রথম প্রথম তাঁহার এবং তাঁর স্ত্রী ও সন্তানের আহার সামগ্রী দেওয়া হইত। তাহার পর তাঁহাদের কিছু স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হয়।

"এইখানে বলা আবশ্যক কলুটোলার বাটীতেই ব্রহ্মানন্দের এক একটি করিয়া তিন কন্যা ও চারিটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই ছেলেমেয়েগুলির লালনপালন করিতে এখানে সতী জগন্মোহিনী দেবীকে যে কি বিষম কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত।"[৯৬]

স্বামীর সম্মানার্থে জগন্মোহিনী সব কষ্ট সহ্য করেছিলেন। আসলে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে চলে যাওয়ার সময় তাঁরা যে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন, দ্বিতীয়বার পৈতৃক বাড়ীতে ফিরে এলেও সেই বিচ্ছিন্নতা আর ঘোচেনি, তাঁরা আর কখনো পরিবারের মূল স্রোতে মিশতে পারেননি। কেশবচন্দ্র তখন ব্রাহ্মসমাজের পুরোধা। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে স্বেচ্ছায় ব্রাহ্মসমাজের নেতৃপদ ছেড়ে দিয়েছিলেন কাজেই সমমনস্ক বান্ধব ও অনুগামীর অভাব কেশব কখনো ভোগ করেননি। তিনি বুঝতেই পারেননি যে জাতিচ্যুত হওয়ার কি নিদারুণ যন্ত্রণা। সম্ভবত তিনি জানতেই পারেননি, যখন তিনি ব্রাহ্ম আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নারীজাতির অগ্রগতির জন্য চেষ্টা করছেন তখন তাঁর স্ত্রী প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করতে করতে দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছেন। বাড়ীর আর সব মহিলারা, যেখানে এক ধর্মাবলম্বী সেখানে জগন্মোহিনী এককভাবে ব্রাহ্ম। তাই সর্বদা তাঁকে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও বিরুদ্ধভাব সহ্য করতে হত। এমনকি তাঁর ছেলেমেয়েদের অত্যন্ত দীনভাবে থাকতে হত। বাড়ীর আর সকলের সাথে তাঁদের আহার করা নিষেধ ছিল। স্বভাবতই অন্দরমহলে থাকার দরুন জগন্মোহিনী তা সর্বদা প্রত্যক্ষ করতেন এবং তাঁর অন্তর ব্যথায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠত। "একদিন কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সকল ছেলেমেয়েরা একত্র খেলাধূলা করিতেছিল, এমন সময়ে ছেলেদের খাবার জায়গা হইল। ছেলেদের খাইতে ডাকিলে অন্যান্য ছেলেরা কেশবচন্দ্রের ছেলেমেয়েদেরও ডাকিয়া কাছে বসাইল, ইহা দেখিয়া বাড়ীর একজন গিন্নী কেশবপুত্রকন্যাদের সেখান হইতে উঠাইয়া স্বতন্ত্র এক স্থানে বসাইয়া

৯৬ *সতী জগন্মোহিনী দেবী*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৯১।

দিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতি দেবী ইহাতে এতই প্রাণে আঘাত অনুভব করিলেন যে সেখান হইতে উঠিয়া আপনাদের ঘরে গিয়া মার কাছে কেবল কাঁদিতে লাগিলেন, এমনকি তাঁহাকে সকলে বারম্বার জিদ করিলেও তিনি কিছুতেই সেখানে আহার করিতে গেলেন না। শুনা যায় তাহার পর হইতে আর নাকি তিনি কখনই অন্য ছেলেদের সহিত একত্র আহার করিতে যাইতেন না।"[৯৭] অবশ্য সুনীতিদেবীর আত্মজীবনীতে এই ঘটনার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কলুটোলার গৃহে থাকাকালীন ব্রহ্মানন্দের "এক একটি করিয়া তিন কন্যা ও চারিটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন", জ্যেষ্ঠ পুত্র করুণাচন্দ্র ও জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতি দেবী ছাড়া আর সকলে এতই শিশু যে ঐ গৃহে বাস করার স্মৃতি তাঁদের মনে জাগরুক থাকা সম্ভব নয়। হয়ত সুনীতিদেবীও তাঁর আত্মকথায় এই সমস্ত তিক্ত স্মৃতিকে স্থান দিতে চাননি। তবে শৈশবে পিতৃগৃহে যে মানসিক অত্যাচার তাঁদের সহ্য করতে হয়েছিল তার যৎকিঞ্চিৎ আভাস তাঁর রচনায় তিনি না দিয়ে পারেননি। "যেমন আমি বড় হতে লাগলাম আমি অনুভব করতে লাগলাম যে অন্যান্য মেয়েরা যে সমস্ত অনুষ্ঠান উপভোগ করে সেখানে আমি বহিরাগতা এবং আমি আবিষ্কার করলাম যে এই সমস্ত আমার জাতি হারানোর কারণে, কিন্তু, যেহেতু কলুটোলার প্রত্যেকেই আমার প্রতি খুব অনুরক্ত ছিলেন, সেহেতু আমি শীঘ্রই আমার বাস্তব বা কাল্পনিক সমস্যাগুলি ঝেড়ে ফেললাম।"[৯৮]

এই সমস্ত সাংসারিক বিষয় সম্বন্ধে কেশব অত্যন্ত উদাসীন ছিলেন। এইসময় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য 'ব্রহ্মানন্দ' কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম আন্দোলন নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিলেন যে বাড়ীর ভেতরে কি ঘটছে না ঘটছে সে বিষয়ে তাঁর কোন খেয়াল থাকত না। গভীর রাত পর্যন্ত বহির্বাটীতে ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে নানাপ্রকার আলোচনা চলত। সে সব সেরে কেশব যখন ভিতরবাড়ীতে শয়ন করতে আসতেন, বেশির ভাগ দিনই জগন্মোহিনী তখন ঘুমিয়ে পড়তেন। তাই, পরিজনবর্গের নির্যাতনে যে স্বামীর সহানুভূতি পাবেন এমন উপায়ও ছিল না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আর্থিক অনটন, এই সময় কেশবের পারিবারিক ভরণপোষণের দায়িত্বভার ছিল কান্তিচন্দ্র মিত্র নামক এক ব্যক্তির উপর। ছেলেমেয়েদের কোন কিছুর আবশ্যক হলে জগন্মোহিনী দেবী তাদের বলতেন 'কাকাবাবুকে' বলতে।[৯৯]

---

৯৭ তদেব, পৃ: ৯৩।

৯৮ "As I grew older I began to feel that I was rather an outsider in the festivities which the other girls enjoyed, and I discovered this was due to my loss of caste, but, as everyone at Coolootola was very fond of me, I soon threw aside my real or imagery troubles."—*Autobiography of an Indian Princess : Memoirs of Maharani Sunity Devi of Cooch Behar*, Edited by Biswanath Das, Vikas Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi-14, 1995, pp. 27-28.

৯৯ সতী জগন্মোহিনী দেবী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৯৫।

স্বামী বর্তমান থাকলেও নিত্যকার প্রযোজনের কথা দ্বিতীয় একজন পুরুষকে বলতে হচ্ছে, জগন্মোহিনীব কাছে এটা কখনো অসম্মানজনক বলে মনে হয়েছিল কিনা, তার কোন প্রমাণ তাঁব জীবনী থেকে পাওয়া যায় না। পরোক্ষে প্রমাণের থেকে বরঞ্চ একথা মনে হয় জগন্মোহিনী তাঁর স্বামীর প্রতি অত্যন্ত মমতামযী ছিলেন। কেশবের শরীর স্বাস্থ্যের প্রতি তাঁর সদা সতর্ক নজর ছিল। অসুস্থ অবস্থায়ও তিনি কেশবের আগে কখনো আহার করতেন না।[১০০] সুনীতি দেবী তাঁর আত্মকথায় মায়ের যে ছবি এঁকেছেন, তাতেও জগন্মোহিনীর এই স্বামী অনুগত রূপটিই ধরা পড়েছে। "আমার মা আমার বাবাও তাঁর বিশ্বাসের জন্যই জীবন ধারণ করতেন। এই সংসার তাঁকে কোন কষ্ট দিত না কখনো। আমার বাবার দৃঢ় বিশ্বাসের মূল কথাই ছিল এই যে "তুমি কখনো আমার কাজে বাধা দান করতে পারবে না, কারণ এটি ঈশ্বরের কাজ, আর আমার মা নিখুঁত সমতার সঙ্গে তা গ্রহণ করতেন। মা কখনো তাঁর জাতি হারানোর জন্য বিপন্ন হননি, যদিও এজন্য তাঁকে অনেক পারিবাবিক অনুষ্ঠান থেকে বাদ পড়তে হয়েছিল।"[১০১] একদা যে কেশব তাঁকে পথের কাঁটা মনে করে চরম অবহেলা করতেন, এখন সেই কেশবই তাঁকে পরিপূর্ণ মর্যাদা সহকারে গ্রহণ করেছেন, এই গৌরবময় তৃপ্তি জগন্মোহিনীকে সমস্ত দারিদ্র্যক্লেশ, পরিজন নিগ্রহ ও অভাব অনটন ভুলিয়ে রেখেছিল। কেশবের ভালবাসা সহস্র মলিনতার মাঝেও তাঁকে মহামহিম মর্যাদা দান করেছিল।

জগন্মোহিনী এতদিনে শুধু কেশবের শয্যাসঙ্গিনীই নয় তাঁর মর্মসঙ্গিনীও যে হয়ে উঠেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় কেশবের লেখা অজস্র পত্রাবলি থেকে।[১০২] কলুটোলা বাড়ীতে অবস্থানকালীন ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কেশব ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। জাহাজ থেকেই কেশব তাঁব পত্নীকে নিয়মিত চিঠি লিখেছিলেন। এই চিঠিগুলির মধ্য দিয়ে কেশব জগন্মোহিনীর দাম্পত্য জীবনের একটি অন্তরঙ্গ ও পরিপূর্ণ ছবি পাওয়া যায়। কেশবের খুঁটিনাটি প্রয়োজনের কথা মনে রেখে জগন্মোহিনী স্বামীর যাত্রাকালে যতটা সম্ভব গুছিয়ে দিয়েছিলেন। কৃতজ্ঞ কেশব তা স্মরণ করে লিখলেন "তুমি যে মশলা দিয়াছিলে, তাহা এখনো আমরা খাইতেছি।"[১০৩] জাহাজে বসে গৃহবিচ্ছেদ ব্যথায় কাতর কেশব পত্নীর অদর্শনে বিশেষভাবে ব্যাকুল হয়েছিলেন। স্ত্রীর একটি ছবির জন্য তাঁর আগ্রহ অধীর হয়ে উঠেছিল। "সন্তানেরা কেমন আছে? প্রিয় রাজলক্ষ্মী কি করিতেছে? সুখ, পুঁটী, ছোট পুঁটী কেমন আছে? রাজলক্ষ্মী পত্র লিখিলে ভাল হয়। কলিকাতায়

১০০ তদেব, পৃঃ ১০২।

১০১ "My mother lived for my father and his beliefs. The world never troubled her. "You cannot impede my work, for it is God's work." were the words which formed the keynote of my father, steadfast faith, and my mother accepted it with perfect equanimity. She never seemed distressed by her loss of caste although she was left out of many a gathering in consequence" — *Autobiography of Sunity Devi,* op. cit. p. 34.

১০২ *ব্রহ্মানন্দ শ্রী কেশবচন্দ্রের পত্রাবলী,* শ্রীমতী মণিকা মহলানবীশ সম্পাদিত।

১০৩ এডেন থেকে ৭ই মার্চ, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ তারিখে লেখা পত্র, তদেব, পৃঃ ১২৪।

কি উত্তাপ আরম্ভ হইয়াছে? মিস পিগট্ কি তোমাকে ছবি করিবার জন্য সঙ্গে লইয়া যান নাই; ছবি হইয়া থাকিলে, তাহা ইংলন্ডে শীঘ্র পাঠাইবে।"[১০৪] লক্ষ্যণীয় যে কেশব তাঁর স্ত্রীকে ছবি তোলানো বা আঁকানোর জন্য গৃহের বাইরে যাবার অনুমতি দিয়েছেন অবশ্য তাঁর সঙ্গী হবার জন্য অপর একজন মহিলার, হোন তিনি বিদেশিনী, কথাও তিনি ভেবেছিলেন এবং পত্রের বয়ান অনুসারে মিস পিগট্‌কে এ কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

কলুটোলার বাড়ীতে কেশব পরিবার নিরতিশয় আর্থিক দুর্দশার মধ্যে পতিত হয়েছিলেন এবং জগন্মোহিনী হয় স্বামীর কাছে তা বলবার সুযোগ পেতেন না, নতুবা কেশব তাতে খুব কর্ণপাত করতেন না।...তিনিও কখনও বা শুনিতেন,হুঁ হাঁ করিতেন, কখনও বা শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িতেন, "ভগবান যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাহাতেই তুষ্ট হইয়া সহ্য করিতে হইবে" ইহাই উপদেশ দিতেন।"[১০৫] সেই কেশবই বাড়ীর বাইরে গিয়ে পরিবারের ভালমন্দ, সুখ সুবিধা, এমনকি যে আর্থিক বিষয় তিনি দেশে থাকতে এড়িয়ে যেতেন, সে সম্পর্কে সতর্ক অনুসন্ধান করেছেন। "কিন্তু তুমি আমাকে তোমার মঙ্গল সমাচার হইতে বঞ্চিত করিও না। আমি আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব। যখন যাহা হয়, বিস্তার করিয়া লিখবে। আমি যেন সমুদায় জানিতে পারি। কাগজের অভাব নাই, যত ইচ্ছা, তত লিখিবে। সুকোর পড়া কেমন হইতেছে? তোমার খরচ কেমন চলিতেছে? আমি যে একশত টাকা রাখিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা তুমি পাইয়াছ কিনা, বিশেষ করিয়া লিখিবে। উহাতে তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিবে, যখন যাহা বিশেষ প্রয়োজন হইবে, তাহা নির্ব্বাহ করিবে। মাসে মাসে যে খরচের টাকা পাইয়া থাক, তাহা স্বতন্ত্র, তাহা পূর্ব্বের ন্যায় নিয়মিত পাইবে। যদি কোন কিছু অভাব বোধ হয়, তখন আমাকে লিখিবে।"[১০৬]

স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ তাঁকে বুঝিয়েছিল যে জগন্মোহিনীর প্রতি তাঁর ভালবাসা কত নিবিড় ও অটুট। পরিবারের দুঃখ-কষ্ট তিনি দূরে বসে যতখানি অনুভব করেছিলেন কাছে থেকে ততখানি তিনি করতে পারেননি। জগন্মোহিনী স্বামীকে যে পত্র লিখতেন তার কোন নিদর্শন আমরা পাইনি, কিন্তু সেই সব পত্রে তিনি যে তাঁর দুঃসময় জীবনের কথা অকপটে লিখতেন কেশবের প্রত্যুত্তর থেকে আমরা তা জানতে পারি। "তোমার খেদোক্তি পাঠ করিয়া, হৃদয় ব্যথিত হইল; কিন্তু তোমরা ভাল আছ শুনিয়া, মনের দুঃখ দূর করিলাম। তোমাকে ও সন্তানদিগকে ছাড়িয়া কতদূর আসিয়াছি তোমরা কত কষ্ট পাইতেছ, আবার কতদিনের পর তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।...তুমি লিখিয়াছ যে, "আমার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিও।" আমি প্রতিদিন উপাসনার সময় এরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকি, যখন কলিকাতায় ছিলাম, তখন হইতে আমি ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তোমার হৃদয়ের সঙ্গে তিনিই আমাকে গ্রথিত করিয়াছেন; তোমার সম্বন্ধে মঙ্গল, তোমার সুখে আমার সুখ, এরূপ গূঢ় যোগ তিনিই সংস্থাপন করিয়াছেন।...প্রতিদিন

১০৪ তদেব।

১০৫ তদেব।

১০৬ কেশবচন্দ্রের পত্রাবলি, পূর্বোক্ত, সুয়েজ, ১০ই মার্চ, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে লেখা চিঠি, পৃ: ১২৬।

প্রাতঃকালে এইভাবে তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাই যে "হে দয়াময়, আমার দুঃখিনী স্ত্রীকে তোমার চরণে স্থান দেও।" তুমি সময়ে সময়ে আমার জন্য তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিও। তিনি আমাদের উভয়ের মনকে তাঁহার প্রেমরজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ করুন।"[১০৭]

বিলেতে থাকাকালীন নারীপুরুষের স্বচ্ছন্দ মেলামেশা দেখে কেশবের মনে পড়েছিল যে পারিবারিক ধর্ম ও রীতি লঙ্ঘন করার জন্য, তা-ও নিজ স্বামীর প্ররোচনায় ও সাহচর্যে, তাঁর স্ত্রীকে তাঁবই আপনজনেরা কিভাবে নিগ্রহ করেছেন। এমনকি স্বামীর নির্দেশে, তাঁরই বিরহ-তাপিত হৃদয় প্রশমিত করার ছবি আঁকাতে যাওয়ার জন্য তাঁকে সমালোচিত হতে হয়েছিল। কেশবের মনে হয়েছিল যে লণ্ডনের ঐ উন্মুক্ত পরিবেশে যদি তাঁর জগন্মোহিনী যোগ দিতে পারতেন তবে কেশবের আনন্দ পরিপূর্ণ হত। "গত বুধবারে আমরা প্রায় ৬০/৭০ জন সাহেব বিবি সঙ্গে লইয়া একটি পল্লীগ্রামে চড়ুইভাতি করিতে গিয়াছিলাম। ইহাকে ইংরাজেরা পিকনিক্ *(Picnic)* বলে। বাটি হইতে অনেক খাবার প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিল; গাছের তলায় বসিয়া আমরা সকলে আহার করিলাম। কেহ কেহ দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা করিতে লাগিলেন। অপরাহ্নে নৌকা করিয়া টেমস্ নদীতে বেড়াইলাম, আমি নিজে কিয়ৎকাল দাঁড় টানিয়াছিলাম। তুমি যদি সঙ্গে থাকিতে, আমাদের সকলের আনন্দ বৃদ্ধি হইত।"[১০৮]

তাঁরই অনুরোধে, তাঁকেই পাঠাবার জন্য জগন্মোহিনী মিস্ পিগটের সঙ্গে ছবি আঁকাতে গিয়েছিলেন তাঁরই কথামত। কিন্তু সেজন্য যখন স্ত্রীকে গঞ্জনা সহ্য করতে হল তখন কেশবের মনে পড়েছিল যে তিনি নিজেও একসময় স্ত্রীর সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহার করেছেন, সেজন্য তাঁর পরিজনেরা তাঁর বদলে তাঁর স্ত্রীকে গঞ্জনা দিয়েছেন। দূরত্ব সেই স্মৃতি জাগিয়ে তুলে কেশবকে অনুতাপবিদ্ধ করেছিল। "ছবি করিতে যাইবার জন্য তোমার প্রতি যে অনেকে বিরক্ত হইয়াছেন, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। তোমার নিরাশ্রয় অবস্থাতে সকলের কর্ত্তব্য যে তোমাকে শান্তি দান করেন। যদি না করেন, উপায় নাই। আমি এখান হইতে তোমার জন্য কি করিতে পারি, বল, আমি করিতে প্রস্তুত। জগন্মোহিনী, তুমি কি কেবলই সহ্য করিবে? আমিও তোমাকে কত কষ্ট দিয়াছি। তুমি যখন প্রফুল্ল হও, তখনই আমি সন্তুষ্ট হই। যে যাহা বলে বলুক, তুমি মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল করিয়া রাখিবে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন, তুমি তাঁহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও ভক্তি স্থাপন কর। লোকের কাছে সকল সময় সুখ পাওয়া যায় না; কিন্তু যে তাঁহাকে ডাকে, তাহাকে তিনি শান্তি দান করেন।"[১০৯]

ইংল্যান্ডের সমাজে গিয়ে সেখানে সাধারণ লোকের স্বচ্ছন্দবিহারী দাম্পত্য জীবন দেখে, সুখী স্বাধীন দম্পতি কিভাবে আনন্দময় পারিবারিক পরিবেশ রচনা করেছে, তা দেখে কেশব প্রীত হয়েছিলেন এবং নিজের জীবনেও তিনি তা অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এখানে

১০৭ তদেব, লন্ডন, ২৫শে মার্চ, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ, পৃ: ১২৯-১৩০।

১০৮ ৭ই মার্চ, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পত্র, পূর্বোক্ত।

১০৯ তদেব।

তিনি যেভাবে তাঁর পরিবারে ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা করেছিলেন তা লক্ষণীয়। কেশবের সমস্ত কাজই ছিল ধর্মাশ্রিত। দশ/এগারটি সন্তান নিয়ে গঠিত তাঁর পরিবারের সকল কাজে ঈশ্বরের অপার করুণা ঝরে পড়ুক কেশব তাঁর স্ত্রীর কাছে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন। স্ত্রীর মধ্যে যে ধর্মভাব, যে সহিষ্ণুতা, যে কোমলতা তিনি লক্ষ করেছিলেন, তাঁর "ধর্ম্ম ও শান্তির পরিবার" গড়ে তোলার কাজে ঐ সব সদ্‌গুণ কাজে লাগানোর জন্য তিনি জগন্মোহিনীকে অনুরোধ করেছিলেন। ধর্ম নিয়ে কেশবের বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও পরিবার গঠনের কাজে যে স্ত্রীর ভূমিকা অপরিহার্য এবং তা যে অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় একথা স্বীকার করতে কেশব কখনো পরাঙ্মুখ হননি। "আমাদের পরিবার ধর্ম্ম ও শান্তির পরিবার হইবে; তিনি সর্বদা নিকটে থাকিয়া আমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন। বিবাহের যে মহোচ্চ লক্ষ্য, তাহা তাঁহার প্রসাদে আমরা সাধন করিব, এবং উহার পবিত্র আধ্যাত্মিক আনন্দ আমরা প্রচুর রূপে সম্ভোগ করিব। হৃদয়ের বন্ধু প্রিয়তমা জগন্মোহিনী, এবার হইতে যাহাতে আমরা কলহ বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া, সদ্ভাবে মিলিত হইয়া, সংসারকে ধর্ম্মের সংসার করিতে পারি, এবং পিতার চরণ দ্বারা আমাদের গৃহকে ভূষিত করিতে পারি, তজ্জন্য এস আমরা চেষ্টা করি। দুইজনে মিলিয়া পরামর্শ করিতে হইবে। কি কি করিলে সংসার এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন ব্যাঘাত না হইতে পারে, তাহা স্থির করিতে হইবে। খরচের বিষয় কিরূপ করিলে, তুমি প্রসন্ন হও, বল। প্রতিদিন সকলে মিলে পিতার উপাসনা করিবার উপায় কি? সন্তানদিগকে ধর্ম্মের পথে, সত্যের পথে কিরূপে অগ্রসর করা যায়? গৃহে ফিরিবার সময় এই সকল কথা মনে পড়িতেছে, তাই তোমাকে বলিলাম। তোমাকে লইয়া, দয়াময়ের চরণে শান্তি ভোগ করিব, এই আমার আশা। আমার প্রতি তুমি সদয় হইয়া এই সকল বিবেচনা করিও। তোমার কোমল হৃদয়ে কত ভাল ভাব আছে, তাহা আমাদের দিয়া আমার উপকার করিতে হইবে। আমার কাছে যদি তুমি কিছু শিক্ষা করিয়া থাক, তোমার কাছে আমার অনেক শিখিবার আছে। তোমার হস্তে ধরিয়া মিনতি করি, তোমার সমস্ত হৃদয় প্রাণ আমাকে দান কর, দুই জনে মিলিয়া, পিতার দাসত্ব করি।"[১১০] পত্নীর প্রেম, সাহচর্য, সক্রিয়তা লাভের জন্য কেশবের আকুতি দেখে মনে হয় যে সম্পূর্ণ নিজ আদর্শে পরিচালিত একটি নিজস্ব পরিবারের ছবি তাঁর মানসপটে আঁকা হয়েছিল। ভারতবর্ষে তিনি যে পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করেছিলেন তাতে হয়ত ঐ চিত্রের পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল। ইংল্যান্ড ভ্রমণ ও সেখানে বসবাস[১১১] এই চিত্রকল্পকে গভীর মনস্কামনায় পরিণত করেছিল।

কেশবচন্দ্রের চিন্তা ও আদর্শের মূল ভিত্তি ছিল ধর্ম। তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টার সঙ্গে সংযোগ ছিল ধর্মপ্রচার, আন্দোলনের এবং সংস্কারের। ইংল্যান্ডে গিয়ে গার্হস্থ্যের যে ছবি তাঁকে মুগ্ধ

১১০ *কেশবচন্দ্রের পত্রাবলী,* পূর্বোক্ত, লন্ডন, ১৫ই জুলাই, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ।

১১১ কেশবচন্দ্র ১৮৭০ সালের মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইংল্যান্ডে ছিলেন। ১৮৭০ সালের ২০শে অক্টোবর তিনি হাওড়া স্টেশনে পৌছান। Meredith Borwthwick, Keshub Chander Sen, A Search for Cultural Synthesis, Minerva Associates, Calcutta, 1977, p.p. 117, 136.

করেছিল, দেশে ফিরে প্রথমে তিনি সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে একটি অভিনব সংগঠন তৈরী করতে চাইলেন। এইভাবে ১৮৭২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী প্রতিষ্ঠা হল ভারত আশ্রম। এটি আমাদের দেশে প্রথম যৌথ জীবনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল, যদিও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।[১১২] এই ভারত আশ্রমের একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা পাওয়া যায় শিবনাথ শাস্ত্রীর রচনায়—"কেশববাবু ইংল্যান্ডে ইংরাজদের গৃহকর্ম দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া আসিয়াছিলেন। সর্বদা বলিতেন, *middle class English home*-এর ন্যায় *institution* পৃথিবীতে নাই। তাঁহার মনে হইল, কতকগুলি ব্রাহ্ম পরিবারকে একত্র রাখিয়া, কিছুদিন সময়ে আহার, সময়ে বিশ্রাম, সময়ে উপাসনা এইরূপ নিয়মাধীন রাখিয়া, শৃঙ্খলামত কাজ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহারা সেইভাব লইয়া গিয়া চারিদিকের ব্রাহ্ম পরিবারের ব্যাপ্ত করিতে পারে। এই ভাব লইয়া তিনি ভারত আশ্রম স্থাপন করিলেন। তাঁহার অনুচর প্রচারকগণ সর্বাগ্রে গেলেন। তৎপরে আমরাও অনেকগুলি পরিবার বাহির হইতে গেলাম। আমরা কেশববাবুর মনের ভাবটা কাজে করিয়া দেখিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলাম।"[১১৩]

সকল ব্রাহ্মভক্ত যদি একই ঈশ্বরের সন্তান হয় তবে ব্রাহ্মমাত্রই ভ্রাতাভগিনী, কাজেই তাদের মধ্যে কোন আড়াল থাকা উচিত নয়, এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কেশবচন্দ্র ভারত আশ্রমের পরিকল্পনা করেন।[১১৪] অবশ্য এর সূচনা হয়েছিল কেশব বিলাত যাওয়ার আগে। ১৩ নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীটের বাড়িটি ভাড়া করে কয়েকটি ব্রাহ্মপরিবার একত্রে বসবাস করতে শুরু করে। ঐ বাড়িটিকে বলা হত 'ব্রাহ্ম আবাস'।[১১৫] সময় ছিল ১৮৭০ সাল, কারণ ঐ বছর যখন কেশব ইংল্যান্ড রওনা হন তখন জাহাজে তাঁর সহযাত্রী ছিলেন স্বনামখ্যাতা সরোজিনী নাইডুর পিতা শ্রী অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর স্ত্রী বরদাসুন্দরী ছিলেন নিতান্ত বালিকা। অঘোরনাথ তাঁর বালিকাবধূটিকে ব্রাহ্ম আবাসের নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে গিয়েছিলেন।[১১৬] ইংল্যান্ড থেকে ফিরে আসার পরে এই ব্রাহ্ম আবাসকেই কেশব ভারত আশ্রমে রূপান্তরিত করেন। অবশ্য তার আগেই কেশব ভারত আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন প্রথমে বেলঘরিয়ার এক বাগানবাড়ীতে, সেখান থেকে তা উঠে আসে কাঁকুড়গাছিতে মহারাণী স্বর্ণকুমারীর উদ্যানবাটিতে, সেখান থেকে ১৩ নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীটের বাড়িটিতে ভারত-আশ্রম পূর্বতন ব্রাহ্ম আবাসের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়।[১১৭]

ভারত-আশ্রমে কেশব নিজে সপরিবারে বাস করতে শুরু করলেন। সুনীতি দেবী লিখেছেন, "কলুটোলার কাছে আশ্রমটি ছিল দুটি বাড়ীর সংযোগে গঠিত। আর সেখানে আমরা কিছুকালের

১১২ শিবনাথ শাস্ত্রী, *আত্মচরিত*, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ শতবার্ষিক সংস্করণ, ১৯৯১, সম্পাদনা গৌতম নিয়োগী, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা-৬, পৃ: ৪৮৬-৪৮৭, সম্পাদকীয় সংযোজনে।

১১৩ শিবনাথ শাস্ত্রী, *আত্মচরিত*, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৫২।

১১৪ ঝরা বসু, পূর্বোক্ত, পৃ: ১১২।

১১৫ তদেব।

১১৬ তদেব।

১১৭ নিবন্ধে ব্যবহৃত ঝরা বসুর বইটি ও শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' বইটিতে যে সম্পাদকীয় সংযোজন রয়েছে তা পড়ে এই রকম ধারণা হয়েছে।

জন্য আবার বাবার অনুগামীদের সঙ্গে একটি সুবৃহৎ পরিবারের মত বাস করেছিলাম (এ রকমটি এ পর্যন্ত ভারতের অশ্রুত ছিল), আমরা পরস্পরকে ভগ্নী, কাকিমা, কাকা এবং ভ্রাতা বলে সম্বোধন করতাম।"[১১৮]

ঐ আশ্রমেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নেটিভ লেডিস্ নরম্যাল স্কুল। সেখানে আশ্রম বালিকারা শিক্ষালাভ করতেন। এই স্কুলে শিক্ষকতার কাজ নিয়ে ভারতাশ্রমে সপরিবারে বাস করতে এসেছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। কেশব কন্যা সুনীতি ছাড়াও প্রথমদিকের ছাত্রীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রাধারাণী লাহিড়ী, সৌদামিনী খাস্তগীর, রাজলক্ষ্মী সেন ও সুদক্ষিণা গঙ্গোপাধ্যায় (পরে সেন)। আশ্চর্য এই যে, কেশবচন্দ্র কিন্তু তাঁর পত্নীকে নিজের প্রতিষ্ঠা করা মহিলা বিদ্যালয়ে পড়তে পাঠাননি অথচ বিলাতে থাকতেই তিনি জগন্মোহিনীকে ইংরাজী শেখানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। কারণ, ইংল্যান্ডে থাকাকালীন তিনি যে সব ইংরাজ মহিলার সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের পরিচয় জগন্মোহিনী গ্রহণ করুন, এ অভিলাষ যে তাঁর ছিল তা এই চিঠিটি থেকে বোঝা যায়—"আমার পত্রের সঙ্গে একখানি ইংরাজী পত্র পাঠাইতেছি, কৃষ্ণবিহারীকে বলিও, ইহা অনুবাদ করিয়া তোমাকে বুঝাইয়া দেন। ইহার মর্ম্ম বুঝিলে তুমি যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যিনি পত্র লিখিয়াছেন, তাঁর নাম মিস্ শার্প, *Miss Sharpe,* ...তাঁহাকে একজন ব্রাহ্মিকা বলা যাইতে পারে।...বাস্তবিক তাঁহার হৃদয় ব্রহ্মসমাজের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত। তুমি যদি ইংরাজী শিক্ষা করিতে, তাহা হইলে এই পত্রের উত্তর লিখিতে পারিতে। যাহা হউক, বাঙ্গালাতে উত্তর লিখিবে। তিনি তোমাকে ভগ্নী বলিয়া শ্রদ্ধা করেন, এবং তোমার উত্তর পাইলে আনন্দিত হইবেন। তোমাকে যদিও এখানে কেহ দেখে নাই, তথাপি এখানে তোমার অনেক বন্ধু হইয়াছে।[১১৯] সমমানসিকতাসম্পন্ন যে সমস্ত মহিলার সঙ্গে কেশবের পরিচয় হয়েছিল, তিনি চেয়েছিলেন জগন্মোহিনীও তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হোন এবং তাঁর ধর্মভাব তথা ব্রাহ্মধর্মের প্রতি বিশ্বাস আরো সুদৃঢ় হোক। এখানে অবশ্য উল্লেখ করা যেতে পারে যে কেশব কিন্তু জগন্মোহিনীর শিক্ষার ভার মিস্ পিগটের হাতে দেননি। অথচ মিস্ পিগট কেশব ও তাঁর পরিবারের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন, শুধু তাই নয়, তাঁর নিজস্ব একটি স্কুল ছিল, যা কেশবের বাড়ীর সংলগ্ন ছিল। এই স্কুলের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় খ্রীষ্টান মহিলাদের শিক্ষা দেওয়া যাতে তারা হিন্দুগৃহে গিয়ে মহিলাদের শিক্ষা দিতে পারেন। এছাড়াও, যে সব হিন্দু যুবক বিলাত যেতেন তাঁদের পত্নীদের দেখাশোনার দায়িত্ব নিতেন

১১৮ "The Ashram near Coolootola consisted of two houses joined together, and there we lived for a time with many of my father's follower as one large united family (a thing hitherto unheard of in India), addressing each other as sisters and aunts, uncles and brothers. "Autobiography of Sunity Devi," পূর্বোক্ত, পৃ: ৩১।

১১৯ কেশবচন্দ্রের পত্রাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৪৫ লন্ডন, ১০ই জুন, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ তারিখে লেখা চিঠি।

পিগট।[১২০] "তিনি সর্বদাই আমাদের পরিবারের প্রতি আগ্রহশীল ছিলেন এবং আমার ঠাকুরমাকে 'মা' ডাকতেন।

মিস্ পিগট এখনও জীবিত রয়েছেন; এই প্রিয় বৃদ্ধা মহিলাটির প্রতি আমি খুব অনুরক্ত, তিনি আমাদের সকলের প্রকৃত বন্ধু।"[১২১] — স্মৃতিচারণা করেছেন সুনীতি দেবী। আসলে, হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে স্বামীর অনুগামিনী হয়ে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার ফলে জগন্মোহিনীকে পরিবারের মধ্যেই একঘরে হয়ে থাকতে হয়েছিল। প্রবাসী স্বামীর অনুরোধে তিনি এই মিস্ পিগটের সঙ্গে ছবি করাতে গিয়ে পরিবারের সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন।[১২২] এরপরে আবার স্ত্রীর ইংরাজী শিক্ষার নির্দেশ দিয়ে তিনি তাঁর ক্লেশ বৃদ্ধি করতে চাননি, বিশেষ কেশব নিজে যখন অনুপস্থিত।

সুতরাং, পারিবারিক চৌহদ্দীর বাইরে এসে কেশব যখন তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে ভারত আশ্রমে এসে বসবাস করতে লাগলেন এবং মেয়েদের জন্য নেটিভ ফিমেল নরম্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন স্ত্রীকে শিক্ষা দেওয়ার কথা তাঁর মনে পড়ল এবং তিনি শিবনাথ শাস্ত্রীকে ডেকে বললেন, "ওহে, তুমি ওঁকে ইংরাজী শেখাও তো।"[১২৩] জগন্মোহিনীকে ইংরাজী শেখানোর উপলক্ষ্যে শিবনাথ এই দম্পতির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং তাঁর স্মৃতিচারণা থেকে এঁদের দাম্পত্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। কেশব যে ক্রমে ক্রমে তাঁর পত্নীর প্রতি অত্যন্ত স্নেহানুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন তা বুঝতে পারি শিবনাথ শাস্ত্রীর সাক্ষ্য থেকে। "কেশববাবু তাঁহার প্রকৃতির সরলতার কথা জানিতেন। তিনি বিলাত হইতে *Children's Magazine* ও *reading books* আনিয়াছিলেন। তাহার একখানি তাঁহাকে পড়াইবার জন্য দিলেন। আমি হাসিয়া বলিলাম, "এ যে ছোট ছেলেদের বই।" তিনি বলিলেন, "আরে, উনি প্রথম ইংরেজী পড়বেন ত? হ'লই বা ছোট ছেলেদের বই। তুমি পড়াতে আরম্ভ কর না, দেখবে উনি মনে ছোট ছেলেই আছেন।"[১২৪]

যে স্ত্রী তাঁর কাছ থেকে অবহেলা ও যন্ত্রণা পেয়েও তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে কখনো কুণ্ঠিতা হননি, সেই স্ত্রীর প্রতি তাঁর অনুরাগের অন্ত ছিল না। বিলেতে থাকতে যেমন তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, "এবার হইতে যাহাতে আমরা কলহ বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া, সদ্ভাবে মিলিত হইয়া, সংসারকে ধর্ম্মের সংসার করিতে পারি,"[১২৫] বিলাত থেকে ফিরে এসে তা তিনি বিস্মৃত হননি। "একদিন আমি কেশববাবুর সহিত কোন বিশেষ বিষয়ে আলাপ করিবার

১২০ *Autobiography of Maharani Sunity Devi*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩২।

১২১ "She always showed the greatest interest in our family, and called my grandmother "Mother". Miss Pigot is still alive ; I am very fond of the dear old lady, she has been a true friend to us all."

১২২ জগন্মোহিনীকে লেখা কেশবের চিঠি, ২৫শে জুলাই, ১৮৭০ লিভারপুল, পূর্বোক্ত।

১২৩ শিবনাথ শাস্ত্রীর *আত্মচরিত*, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৫৪।

১২৪ তদেব।

১২৫ লন্ডন, ১৫ই জুলাই, ১৮৭০ খৃ: তারিখে লেখা পত্র, পূর্বোক্ত।

জন্য তাঁহার ঘরে গেলাম। তখন তাঁহার বিশ্রাম করিবার সময়। কিন্তু দেখিলাম, তিনি ঘরে নাই। তাঁহার পত্নীকে জিজ্ঞাসা কবাতে তিনি বলিলেন, "আমাকে কোন কারণে রাগতে দেখে, তিনি প্রথমে বললেন, 'তাই তো, তুমিও রেগে উঠলে?' এই ব'লে এই ঘরেই কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে ব'সে রইলেন, পাষাণের মূর্তি;তারপর বার হ'য়ে গেলেন। খুঁজে দেখুন, বোধ হয় বাগানের কোন গাছতলায় চোখ বুঁজে ব'সে আছেন।" শুনিয়া আমি হাসিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন, "হাসেন কি? ঐ চোখ বুঁজে বুঁজেই আমায় মেরে আসছেন। আমি কিছু অন্যায় করলেই, রাগ নাই, উষ্মা নাই, চোখ বুঁজে একেবারে পাষাণ প্রতিমা হ'য়ে যান। আমি লজ্জায় ম'রে যাই। ভবিষ্যতে যাতে আর ওরূপ না করি, তার জন্য ঈশ্বরচরণে বার বার প্রার্থনা করতে থাকি।"[১২৬]

এই অদ্ভুত আত্মসংযম এবং সমঝদারিতার বিনিময়ে কেশব পেয়েছিলেন পত্নীর নিঃসংশয় ভালবাসা, যার জন্য জগন্মোহিনী সবকিছু ত্যাগ করতে পারতেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর স্মৃতিচারণা থেকে আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। একদিন মিস্ পিগট নানা কথার আলোচনার মধ্যে বলেছিলেন যে তাঁরা অর্থাৎ খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করেন যে যাঁরা খ্রীষ্টীয় ধর্ম গ্রহণ না করে তাঁদের অনন্ত নরকবাস হবে। জগন্মোহিনীকে উদ্দেশ্য করে তিনি যেই বললেন ... "তোমার পতিও যদি খ্রীষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত না হন, তাঁর ভাগ্যেও নরকবাস।" এই কথা শুনিয়া আচার্য-পত্নী গম্ভীর মূর্তি ধারণ করিলেন; তাঁর চক্ষে দরদর ধারে অশ্রু পড়িতে লাগিল।...তৎপরে কুমারী পিগটের নিকট আসা ত্যাগ করিলেন। ...কত বলা গেল "খ্রীষ্টিয়ান ধর্মে যাহা আছে তাহাই তিনি বলিয়াছেন, কেশববাবুর প্রতি ঘৃণা প্রকাশের জন্যে কিছু বলেন নাই।" তথাপি শুনিলেন না।"[১২৭]

কেশবচন্দ্র যখন ক্রমাগত ব্রাহ্মআন্দোলনে জড়িয়ে পড়তে লাগলেন, তখন আর কলুটোলার বাড়ীতে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী উভয়েই দীর্ঘদিন যাবৎ প্রতিকূল পারিবারিক পরিবেশে শ্বাসরুদ্ধ হবার উপক্রম হচ্ছিলেন, এই সময় ১৮৭৭ সালে তিনি পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার লাভ করেন এবং কলুটোলা বাড়ীর নিজ অংশ কনিষ্ঠা ভ্রাতা শ্রী কৃষ্ণবিহারী সেনকে বিক্রী করে ৭২ নম্বর (এখন ৭৮ নম্বর) আপার সার্কুলার রোডে মিস্ পিগটের স্কুল-বাড়ী ক্রয় করলেন এবং তাকে সংস্কার করে সপরিবারে বসবাস করতে লাগলেন। এই বাড়ীটির নাম হল "কমল-কুটীর"।[১২৮] কমল কুটীরে এসে জনন্মোহিনীর দারিদ্র্যদশা ঘুচল না বটে কিন্তু তিনি এখানে নিজস্ব ঘরকন্নার অধিকারিণী হলেন। এর এক বছর পরেই ১৮৭৮ সালে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতিদেবীর বিবাহ হয় কুচবিহারের মহারাজা শ্রী নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের সঙ্গে। এই কুচবিহার বিবাহকে কেন্দ্র করে কেশব সেন ও তাঁর সমর্থকদের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের তরুণতর গোষ্ঠীর বিচ্ছেদ ঘটে গেল এবং কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করলেন নববিধান ব্রাহ্মসমাজ।

১২৬ শিবনাথ শাস্ত্রীর *আত্মচরিত*, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৫।
১২৭ তদেব, পৃঃ ১৫৭।
১২৮ সতী জগন্মোহিনী দেবী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৫।

এই সমাজ প্রতিষ্ঠা জনম্মোহিনীর জীবনচর্যায় এক নতুন মাত্রা যোগ করল। বৃহত্তর কর্মজগতে এবার জগম্মোহিনী তাঁর স্বামীর অনুগমন করলেন।

"নববিধানের এই নব আন্দোলনে ব্রহ্মানন্দ যেমন একদিকে পুরুষদিগকে মাতাইলেন, তেমনি ব্রহ্মানন্দিনী সতী জগম্মোহিনী দেবীর সহায়তায় নারীদিগকেও যথেষ্ট উৎসাহিত করিলেন। নববিধানের যে যে অনুষ্ঠানে বাহিরে পুরুষদিগকে লইয়া ব্রহ্মানন্দ সম্পাদন করিলেন, অন্দরে স্বতন্ত্রভাবে জগম্মোহিনী দেবীও নারীদিগকে লইয়া তাহা সাধন করিতে লাগিলেন। তিনি নারীদিগের একটী স্বতন্ত্র দলই গঠন করিয়া তুলিলেন এবং তাঁহাদিগকে লইয়া উপাসনা, কীর্ত্তন এমনকি নারীদিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারেরও অনুষ্ঠান করিলেন। একদিকে পুরুষেরা জল সংস্কার লইয়া চলিয়া গেলেন, তাহার পরেই সতী আপন নারী দলবল লইয়া জল সংস্কার লইলেন। একদিকে পুরুষেরা কীর্ত্তন করিতে বাহির হইলেন, অপরদিকে সতীও নারীদের দ্বারা খোল করতাল বাজাইয়া মঙ্গলপাড়ায় কীর্ত্তন করিতে গেলেন। এইরূপে নারীদিগের মধ্যেও সতী নববিধানে নব ভাবাভিনয়ে সতী জগম্মোহিনী অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া অভিনেতাদের সেবা ও সহায়তা করেন, এমনকি আপন শরীরের অসুস্থতা সত্ত্বেও অভিনয়ের সাহায্য ও ব্যবস্থাদি করিতে ত্রুটি করেন নাই।"[১২৯]

জগম্মোহিনীর উৎসাহে ১৮৭৯ সালের ৯ই মে 'আর্যনারী সমাজ' প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৩০] শ্রী ব্রহ্মানন্দ দেহে অবস্থান কালে এই 'আর্য নারীসমাজে'র নেতা ও সভাপতি ছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মানন্দের স্বর্গারোহণের পর ক্রমে সতী জগম্মোহিনী দেবী এই সমাজের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়া জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ইহাকে প্রাণপণে রক্ষা করেন। এই কার্যে সতীর এতই নিষ্ঠা ছিল যে একবার কনিষ্ঠ পুত্রের মরণাপন্ন অবস্থা দেখিয়াও তাহাকে ফেলিয়া যথাসময়ে 'আর্য্য নারীসমাজে'র সমুদায় আয়োজন করেন।[১৩১]

১২৮৫ বঙ্গাব্দের ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে গিরিশচন্দ্র সেনের প্রস্তাবে ও উদ্যোগে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় "পরিচারিকা" নামে একটি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। কয়েক বছর পর ১২৯৯ বঙ্গাব্দ বা ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ঐ পত্রিকাটি পরিচালনার ভার নিলো "আর্য নারীসমাজ"। আরম্ভ থেকেই যে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে "পরিচারিকা" পত্রিকার যোগাযোগ ছিল, কেশব প্রবর্তিত নারীজাতির উন্নতিমূলক অভিনব প্রচেষ্টাসমূহের সকল বিবরণ বিস্তারিতভাবে "পরিচারিকা" পত্রিকায় প্রকাশিত হত।[১৩২] সতী জগম্মোহিনী দেবী সর্বদাই এই পত্রিকায় প্রবন্ধ পদ্যাদি লিখতেন। তাঁরই নির্দেশে ও অনুরোধে, তাঁর জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ মোহিনী দেবী এবং কেশব কন্যাগণ এই পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ

১২৯ তদেব, পৃ: ১৪০-১৪১।
১৩০ প্রভাত বসু, মহারানী সুচারু দেবীর জীবন কাহিনী, পৃ: ৫৭।
১৩১ তদেব, পৃ: ৫৯।
১৩২ যোগেশচন্দ্র বাগল, *কেশবচন্দ্র সেন,* তদেব।

করেছিলেন।[১৩৩] ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে 'আনন্দবাজার' মহিলাদের শিক্ষাসাধনের একটি আনন্দজনক অনুষ্ঠান। কেশব যদিও এই অনুষ্ঠানের প্রবর্তক ছিলেন তবুও তাঁর জীবদ্দশায় এই অনুষ্ঠান কার্যকরী হতে পারেনি। তাঁর মৃত্যুর পরে জগন্মোহিনী দেবী ও সুনীতি দেবীর উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান হতে থাকে। "এই মেলা উপলক্ষে মহিলাদিগের দ্বারা নির্মিত কারুকার্যাদি সকল মহিলাগণ নিজে প্রদর্শন ও বিক্রয় করেন এবং তদ্ব্যতীত উপাসনা সাধনের সহকারী আসন, গৈরিক, একতারা, খোল, করতাল, পতাকা, মটো *(motto)*, ধূপ, ধুনা, ধুনুচি, ধূপদান ইত্যাদি ও মহিলা এবং বালকবালিকদিগের উপযোগী নানাপ্রকার দ্রব্যাদিও প্রদর্শন ও বিক্রয় হয়।"[১৩৪]

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের জীবনাবসানের পরও জগন্মোহিনী ১৪ বৎসর বেঁচেছিলেন। এই সময়কালে তিনি নববিধানের সমস্ত অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে এসেছিলেন। ১৮৯৮ সালের ১লা মার্চ তাঁর মৃত্যু হয়। কন্যা সুনীতি দেবী তাঁর আত্মজীবনীতে মাতৃবিয়োগের কথা এইভাবে লিখেছেন—"১৮৯৮ সালে আমরা আমাদের প্রিয় মাকে হারালাম আর আমার মনে হয় না যে তিনি খুব দুঃখের সঙ্গে গেছেন। পিতার থেকে বিচ্ছেদের কালটি ছিল তাঁর পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের কাল আর মৃত্যু ছিল সেই বন্ধু যা তাঁদের পুনর্মিলন ঘটিয়েছিল। তাঁর সুন্দর মুখে জড়ান ছিল হাসি আর তাঁকে মনে হচ্ছিল যে তিনি যেন সুখস্বপ্নে বিভোর আছেন। যদিও আমাদের হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল তবুও আমরা চাইনি তিনি আমাদের মধ্যে ফিরে আসুন।"[১৩৫]

মা সম্পর্কে তৃতীয়া কন্যা সুচারুদেবী বলেছেন—"তিনি আত্মপ্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন না:; নিজেকে গোপনে আড়ালে রেখে আচার্য অনুমোদিত প্রতিটি কাজ নিপুণভাবে ক'রে যেতেন। আচার্যের পরলোকগমনের পর সকল দায়িত্ব নিয়ে তিনি প্রচারকদের পরিচর্যা করেছেন, আত্মপর বিচার না করে সকলকে আপনার অন্তরে স্থান দিয়েছেন।"[১৩৬] এভাবে, কেশবচন্দ্রের কর্মজীবনের অংশীদার হয়ে উঠেছিলেন জগন্মোহিনী। শুধু তাই নয়, কেশবের মৃত্যুর সময়ে তাঁর পাঁচ পুত্র ও পাঁচ কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র করুণাচন্দ্র ও জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতি ছাড়া আর সকলেই ছিলেন খুবই ছোট। তাঁদের সামনে কেশবের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তুলে ধরার কঠিন কাজটিও জগন্মোহিনী অতি আন্তরিকতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন। তাই, যে নারী একদিন স্বামীর চোখে ছিলেন পথের কাঁটা, শেষপর্যন্ত তিনি স্বামীর প্রতিটি কাজে কি ঘরে কি বাইরে

১৩৩ মহারানী সুচারু দেবীর জীবন কাহিনী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫৯।

১৩৪ তদেব, পৃ: ৬১।

১৩৫ "We lost our dear mother in 1898 and I do not think she was sorry to go. The time of separation from my father had been a period of continual sorrow to her, and Death was a friend who reunited them. Her beautiful face wore a smile and she looked like one asleep, dreaming of happiness. We could not wish her back again, although our hearts were aching at her loss'—Autobiography of Maharani Suniti Devi, Op. cit,. p. 150.

১৩৬ সুচারু দেবীর জীবন কাহিনী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫৪।

যোগ্য সঙ্গিনী হয়ে উঠেছিলেন। সুচারু দেবী লিখেছেন—"দেব স্বামীর প্রত্যেক ইচ্ছাটি মহামন্ত্র জ্ঞানে আজীবন সাধন করিয়াছিলেন। পিতৃদেবকে অতি বাল্যকালেই হারাই, কিন্তু পিতার স্বর্গারোহণের পর মাতৃদেবী যে চৌদ্দ বৎসর জীবিত ছিলেন, আমাদের সম্মুখে পিতৃদেবের সেই মহান্ চরিত্র জীবন্তভাবে ধরিয়া রাখিতেন।"[১৩৭]

জগন্মোহিনী তাঁর এই অতুলনীয় পতিপরায়ণতার স্বীকৃতি নিজ স্বামীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তাঁর স্বভাব মাধুর্য ও কর্মকুশলতার স্বীকৃতি দিয়ে কেশব লিখলেন—"মা" অনেক দিন, পৃথিবীর রৌদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জীবনের অপরাহ্নে সতী স্ত্রীর শীতল ছায়া শ্রান্ত স্বামীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন।" জগন্মোহিনী কখনো তাঁর স্বামীকে এই "শীতল ছায়া" প্রদান করতে বিমুখ হননি। স্বামীর চোখে অপরিহার্য হয়ে উঠে জগন্মোহিনী তাঁর যোগ্যতাকে সকল সংশয়ের ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন।

১৩৭ সুচারু দেবী, ভক্তি অর্ঘ্য, পূর্বোক্ত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রগতির পদসঞ্চারে শতাব্দীর পুরুষ

ঘটনা যেখানে অনুঘটক : কুচবিহার বিবাহ ও বঙ্গীয় নারী জাগরণ

কুচবিহার বিবাহের পাত্রী কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুনীতি দেবী তাঁর আত্মচরিতে তাঁর বিবাহপূর্ব প্রণয়ের কথা জানিয়েছেন।[১] এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর প্রণয়ী সম্পর্কে যা জানিয়েছেন, তা সংক্ষেপে এই রকম—কুচবিহারের মহারাজা তরুণ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর ব্রিটিশ সরকারের তত্ত্বাবধানে বড় হয়ে উঠেছিলেন। বাল্যকাল থেকেই ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন কুচবিহার রাজ্যে শিক্ষার বিকাশ তখনো ঘটেনি, তাই আত্মনির্ভরতার অভাবে এই রাজ্যটি দলাদলি ও ষড়যন্ত্রের অবাধ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ সরকাব চেয়েছিল নৃপেন্দ্রনারায়ণকে আদর্শ শাসক হিসেবে গড়ে তুলতে।[২] প্রাসাদের কুপ্রভাব থেকে দূরে রাখার জন্য তাঁকে পাঁচ বছরে বেনারসে ও ১১ বছর বয়সে পাটনায় পাঠিয়ে এদেশে লেখাপড়ার পাঠ সাঙ্গ করা হল।[৩] এদেশের শিক্ষা শেষে দেখা গেল যে ব্রিটিশ-সরকারের উচ্চতম প্রত্যাশাকেও ছাপিয়ে গিয়েছেন মহারাজা। তিনি হয়ে উঠেছেন এক বুদ্ধিমান যুবক, একজন দক্ষ ক্রীড়াবিদ এবং সর্বোপরি, তাঁর পিতৃভূমি ও পিতৃভূমির অধিবাসীদের সম্পর্কে অনুরাগী আর সকল বিষয়েই আগ্রহসম্পন্ন।[৪] পক্ষান্তরে, কুচবিহার রাজ্যটি ছিল অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে ভরা। রাজদরবার ছিল অমিতব্যয়ী, ষড়যন্ত্রশীল, অত্যাচারী এবং বহুবিবাহের অনুগামী। ব্রিটিশ সরকারের অভিভাবকত্বে তরুণ রাজাকে এই পরিবেশ থেকে বাইরে এনে কোনভাবে রক্ষা করা হয়েছে। রাজ্যের প্রশাসনের উন্নতি ঘটান হয়েছে, শিক্ষা, পুলিস, রাজস্ব, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সমস্ত কিছুই উন্নতি করেছে যোগ্য প্রশাসকদের পরিচালনায়, যাদের নিয়োগ করেছিল ব্রিটিশ সরকার।[৫]

---

১ "The fairy Prince in my romance was the young Nripendra Narayan Bhup Bhadur, Maharajah of Cooch Behar, who had been a ward of the British government since his infancy, and carefully educated to be a model ruler."—"*Autobiography of an Indian Princess : Memoirs of Maharani Sunity Devi of Cooch Behar.* পূর্বোক্ত p. 49.

২ Prosanto Kumar Sen, *Keshub Chunder Sen and the Cooch Behar Betrothal, 1878,* The Book Company Limited, College Square, Calcutta 1933, p.p. 1-2.

৩ সুনীতি দেবী, *আত্মজীবনী,* পূর্বোক্ত, পৃ: ৫০, প্রশান্ত কুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ: ২।

৪ সুনীতি দেবী, *আত্মজীবনী,* পূর্বোক্ত, পৃ: ৫১।

৫ "Here is the Cooch Behar State, the den of ignorance and superstition, with a corrupt court given to dissipation, polygamy, intrigue and oppression. The young Rajah has been saved by the British Government acting as his guardian...The administration of the *affairs* of the State has *greatly*

এখন, ব্রিটিশ সরকারের এই প্রভাব যাতে বজায় থাকে, ব্রিটিশ সরকারের ভাষায় কুচবিহার রাষ্ট্রটিকে একটি আদর্শ রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলতে হবে, তাই ভবিষ্যৎ মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরকে ব্রিটিশ সরকার উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলেছিল। "এরপর প্রশ্ন দাঁড়াল এই যে মহারাজাকে ইংল্যান্ড পাঠিয়ে তাঁর শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে একটি পরিণতি নিয়ে আসা এবং মহারাজাকে মানুষ ও কর্মজগৎ সম্পর্কে একটি বিস্তৃত জ্ঞানের অধিকারী করে তোলার ব্যাপারে কি করা যেতে পারে? এর ফলে রাজপরিবারের নারীদের মধ্যে এক আতঙ্কের সৃষ্টি হল কারণ, তাঁরা গভীর শঙ্কা প্রকাশ করলেন যে তরুণ মহারাজা ইউরোপীয় ভাবধারায় আক্রান্ত হবেন।"[৬] বাংলার তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল স্যার রিচার্ড টেম্পল মহারাজার মায়ের সঙ্গে পরিস্থিতি আলোচনা করে লিখলেন : "রাজার মা ও পিতামহীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের সময় তাঁরা এই আশঙ্কা প্রকাশ করলেন যে ইউরোপ দেখার পরে রাজা আর কখনো কুচবিহারের মতো স্থান বা তাঁর আত্মীয়দের মতো ঘরোয়া লোকদের জন্য পরোয়া করবেন না। আমি বললাম যে রাজা ইংল্যান্ড যাবেন কিনা তা এখনো স্থির হয়নি, যদি যান তবে তা স্বল্প সময়ের জন্য, যা তাঁর মনের প্রসার ও শক্তির বৃদ্ধি ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু তা এত দীর্ঘ নয় যে তিনি তাঁর স্বদেশ ও স্বজনদের বিস্মৃত হবেন, আর যখন তাঁকে আমরা ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ দেব তখন আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করব তাঁকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিতে এবং প্রস্তুত করতে, যাতে তিনি রাজ্যের প্রধান হিসাবে তাঁর কর্তব্যসমূহ পালন করতে পারেন।"[৭]

---

improved in all departments, education, police, revenue, health etc. under the management of competent officers appointed by the British government".—B. Mozoomdar, *God-Man Kashub and Cooch Behar Marriage* (Calcutta 1912) p. 8, quoted in Meredith Borthwick, *Keshub Chunder Sen : A search for Cultural Systhesis*, Minerva Associates, Calcutta, 1977, p. 176.

৬ "...and then arose the question of sending him to England for giving a finish to education and enabling him to have a wider knowledge of men and affairs. This caused consternation amongst the ladies of the Raj household who expressed great concern at the prospect of the young Maharaja being Europeanised". প্রশান্ত কুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ: ২।

৭ "During my interview with the Raja's mother and grandmother these ladies expressed anxiety regarding the Raja's visiting England, which they deprecated on the ground that after seeing Europe he would never care for such a place as Cooch Behar nor such quiet homely people as his relatives. I explained that it had not been decided whether the Raja should visit England; but if he did, it would only be for a short time, enough indeed to enlarge and strengthen his mind but not enough to forget his home and kindred; and that while giving him the benefit of an English education, we should take every pains to train and prepare him for the duties he would here after have to discharge as the head of a state."—তদেব, পৃ: পৃ: ২-৩।

ছোটলাটের এই কথায় রাজপরিবারের মহিলারা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলেন এবং তাঁরা সাব্যস্ত করলেন যে স্বদেশ ও স্বজনের প্রতি মহারাজার আকর্ষণ সুদৃঢ় করার জন্য সুনিশ্চিত উপায় হচ্ছে ভারতবর্ষ ত্যাগ করার আগে মহারাজার বিবাহ দেওয়া। সুতরাং ব্রিটিশ সরকারের এখন কর্তব্য হল মহারাজার জন্য একজন উপযুক্ত পাত্রী খুঁজে বার করা, ঐ পাত্রী হবে শিক্ষিতা ও গুণসম্পন্না যে মহারাজার প্রকৃত জীবনসঙ্গিনী হবে।[৮] এই 'প্রকৃত জীবনসঙ্গিনী' খোঁজার পেছনে ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থ ছিল। কুচবিহারের উপর ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখার জন্য প্রয়োজন ছিল মহারাজের সঙ্গে এক সমা অগ্রসরশীল মেয়ের বিয়ে দেওয়া, যে মহারাজা তথা ব্রিটিশ সরকারের প্রচেষ্টা সার্থক করতে সর্বতোভাবে সহায়তা করবে।[৯]

এরপর সমস্যা দেখা দিল যে একজন শিক্ষিতা মেয়ে কুচবিহারের বধূ হতে রাজী হবে কিনা কারণ, সেখানে তখনও বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এছাড়াও সেই মেয়ে হিন্দু রাজদরবারে প্রচলিত বহু প্রাচীন প্রথা ও জীবনধারা মেনে নেবে কিনা। ব্রিটিশ সরকার সম্পূর্ণ অবহিত ছিল যে ঐ বিবাহ তাদের পরীক্ষা সফল অথবা বিফল দুইই করতে পারে এবং তাই তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল যে মহারাজের সম্ভাব্য বিবাহকে কোনরকমেই ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না। অথচ ব্রিটিশ সরকারের নীতি হল ভারতের বিবাহপদ্ধতি সম্পর্কে কিছু না বলা, তাই এই বিবাহকে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী সম্পন্ন করানোর জন্য তাদের অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হতে হল। কোচবিহারের ম্যাজিস্ট্রেট যাদবচন্দ্র চক্রবর্তীকে পাঠানো হল গোপনে পাত্রী অনুসন্ধান করার জন্য। ঐ পাত্রীকে শিক্ষিত হতে হবে এবং ব্রিটিশ সরকার যেন তাকে কুচবিহারের মহারানী হবার জন্য অনুমোদন করে।[১০] সরকারী আদেশে যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী কনে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন সারা ভারতে। কিন্তু মনোমত পাত্রী পাওয়া খুব শক্ত হয়ে দাঁড়াল।[১১] শোনা যায় এই বিয়ের প্রস্তাব প্রথমে করা হয়েছিল দুর্গামোহন দাশের কাছে, সম্ভবতঃ তাঁর বড় মেয়ের জন্য।[১২] এ বিষয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন : "আবার ইহাও শুনিলাম যে, যাদববাবু বিবাহের প্রস্তাব

৮ "The above agrument conciliated the Palace ladies to a certain extent but they maintained that the surest method of riveting his attachment to his country and kindred was to get the Maharaja married before he left India. It thus became the duty for the Government to look for a suitable bride for the Maharaja, an educated and accomplished girl who would be his true partner in life. —তদেব, পৃ: ৩।

৯ "But now arose the question of the future. To ensure final success for the Government's scheme, it was necessary that the young ruler should marry an equally advanced girl, who would second him in his (and incidentally the Government's) efforts for Cooch Behar."—সুনীতি দেবী, *আত্মজীবনী*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫১।

১০ সুনীতি দেবী, *আত্মজীবনী*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫১।

১১ ঝরা বসু, পূর্বোক্ত, পৃ: ৭৮।

১২ চিত্রা দেব, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫৮।

লইয়া দুর্গামোহন দাশ মহাশয়ের ভবনে গিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী ব্রহ্মময়ী হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "না, না, আমার মেয়ের রাজারাজড়ার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হবে না। প্রথমত, ছেলে অপ্রাপ্তবয়স্ক; তারপর রাজারাজড়ার সঙ্গে বিবাহ-সম্বন্ধ ভাল নয়, আমার ছেলেমেয়েরা রানী বোনের সঙ্গে ভাল ক'রে মিশতে পারবে না।" যাদববাবু সেখানে হইতে নিরাশ হইয়া আসিয়া কেশববাবুর কাছে গিয়াছেন।"[১৩] কিন্তু এই তথ্যের সত্যতা সন্দেহজনক, কারণ স্বয়ং ব্রহ্মময়ীর মৃত্যু হয় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে।[১৪] তখন যাদববাবু কেশবচন্দ্রের বন্ধু ও শিষ্য রেভারেন্ড প্রসন্নকুমার সেনের কাছে এই ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন। প্রসন্নকুমার ও যাদববাবু নিজেদের মধ্যে বেশ কয়েকবার সাক্ষাৎ ও আলোচনার পরে কেশবচন্দ্রের কাছে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে সুনীতির বিবাহ প্রস্তাব দিলেন।[১৫]

কেশবচন্দ্র এই প্রস্তাব শুনে প্রথমে বিস্মিত হলেন। কেশবের কাছে এই প্রস্তাব যেমন ছিল অপ্রত্যাশিত তেমনি ছিল অবাঞ্ছিত। কারণ, তিনি ব্যক্তিগতভাবে বাল্যবিবাহ অপছন্দ করতেন। কুচবিহার বিবাহ গোলযোগের আট বছর আগে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে মে লন্ডন থেকে স্ত্রী জগন্মোহিনীকে লিখলেন : "বড় পুঁটির কি যথার্থ বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে? তাহাকে বলিও, তাহার ন্যায় এখানে অনেক ছোট ছোট মেয়ে দেখিয়াছি, কৈ, তাহারা তো বিবাহ করিতে চায় না। এখানে স্ত্রীলোকেরা ২০/২২ বৎসর পর্যন্ত বিবাহ না করিয়া থাকে, কেবল পড়াশুনা করে এবং খেলা করে। বড় পুঁটী যদি খেলনা চায় তাহা আমি বাটী ফিরিয়া দিব, কিন্তু বিবাহের নামটি এখন নয়।"[১৬] এখন, পত্রে উল্লিখিত বড় পুঁটি কেশবের মেয়ে সুনীতি হোন বা না হোন কেশব যে বাল্যবিবাহের বিরোধী তাতে কোন সংশয় থাকছে না। শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের একটি দেশের, ইংল্যান্ডের বালিকাদের আনন্দময় ক্রীড়ারত অবস্থা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। মেয়েদের ২০/২২ বছর পর্যন্ত অবিবাহিত থাকা, লেখাপড়া ও প্রয়োজনমতো আমোদপ্রমোদে অংশগ্রহণ করা কেশব অনুমোদন করেছিলেন। বালিকাবস্থায় বিবাহ দিলে যে মেয়েরা এই সুন্দর জীবন থেকে বঞ্চিত হবে একথাও কেশব বুঝেছিলেন। ইংল্যান্ডের এই স্মৃতি তাঁর মনে জাগ্রত ছিল বলেই নৃপেন্দ্র নারায়ণের সঙ্গে সুনীতির বিবাহ প্রস্তাব তিনি প্রথমে এককথায় নাকচ করে দিলেন। কারণ, তিনি যদিও উচ্চকুলজাত এবং অভিজাত পরিবেশে বড় হয়েছিলেন কেশবের মন ছিল বিনীত এবং সহজাতভাবে তা সমস্ত জাঁকজমক থেকে বিমুখ থাকত।[১৭]

---

১৩ শিবনাথ শাস্ত্রী *আত্মচরিত*, সম্পাদনা গৌতম নিয়োগী, পাদটীকা, পূর্বোক্ত, দ্রষ্টব্য।

১৪ তদেব, পূর্বোক্ত, পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

১৫ প্রসন্ন কুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩।

১৬ মণিকা মহলানবীশ সম্পাদিত, ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশব সেনের পত্রাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৪৩।

১৭ "High born and brought up under aristocratic influence, Keshub's heart was essentially humble and shrank almost instinctively from anything that savoured the pomp and circumstance. He straightaway declined the offer." প্রশান্ত কুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫।

এই বিবাহ প্রস্তাব সম্পর্কে সুনীতি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন : *"তিনি [কেশবচন্দ্র]* কখনো কোন জাগতিক বা পারিবারিক বিষয়ে মনোযোগী ছিলেন না; তাঁর মন ধর্মীয় কার্যে পরিপূর্ণ ছিল;এবং তিনি প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন। কিন্তু (ব্রিটিশ) সরকার এবং (কুচবিহার) রাজ্যের প্রতিনিধিরা নিরস্ত হলেন না। তাঁরা ক্রমাগত আমার পিতাকে চিঠি লিখতে লাগলেন, সাক্ষাৎ করলেন এবং খবর পাঠাতে লাগলেন এই মর্মে যে তরুণ মহারাজা এবং আমার বিবাহ সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়। আমার পিতা ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান করতে লাগলেন। তাঁর একটি চিঠিতে তিনি লিখলেন যে আমি খুব সুন্দরী নই বা উচ্চশিক্ষিতা নই, এবং সেজন্য আমি তরুণ মহারাজার জন্য খুব উপযুক্ত পাত্রী নই।"[১৮]

ব্রিটিশ সরকার দেখল যে কেশবচন্দ্র রাজী না হলে তাদের সমস্ত পরিকল্পনা নিষ্ফল হয়ে যেতে বসেছে। তাই তারা যে কোন উপায়ে কেশবকে রাজী করাতে বদ্ধপরিকর হল। সরকারী পক্ষে এমন চতুর লোকের অভাব ছিল না, যারা কেশবচন্দ্রের দুর্বল স্থান বের করতে না পারত। তাঁরা ক্রমাগত কেশবচন্দ্রকে বোঝাতে লাগল যে এই বিবাহ দেশের আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে সহায়ক হবে। কারণ, তারা জানত যে কোন ঐহিক সুবিধার কথা বলে কেশবচন্দ্রের সম্মতি লাভ করা সম্ভব ছিল না। অশান্ত চিত্তে কেশবচন্দ্র কেবলই প্রার্থনা করতে লাগলেন, শেষপর্যন্ত তিনি উপর থেকে আলোকনির্দেশ লাভ করলেন যে এই বিবাহে ঈশ্বরের নির্দেশ রয়েছে এবং যদি তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ করবেন।[১৯]

১৮ "He never gave a thought to worldly or family affairs; his mind was too full of his religious work; and he refused the offer. But the Government and the representatives of the State would not be discouraged. They continued writing to my father, interviewing him, and sending messages urging that the marriage of the young Prince and myself was most desirable. My father repeatedly refused. In one of his letters he said that I was neither very pretty nor highly educated, and therefore, I was not a suitable bride for the young Maharajah."—সুনীতি দেবী, *আত্মজীবনী*, পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ৫২-৫৩।

১৯ "This unexpected opposition was a setback to the plans of the Government and they determined to overcome it at any cost. Those in authority were clever enough to understand that they must discover my father's weak point and work upon it, as it was evident the worldly advantages of the match made no appeal to him.

The Messenger went backwards and forwards several times,........My father, with a troubled mind, prayed and prayed until at last he obtained light from above and realised that the marriage would be for the spiritual good of the country. Only then was he persuaded that such a union was a Divine Command, and if he allowed me to marry this young ruler he would be fulfilling the will of God."—তদেব। পৃ: ৫৩।

Frances Power Cobbe-কে লেখা একটি চিঠিতে[২০] কেশব জানালেন; *[ব্রিটিশ]* সরকার, এই সমস্ত যুক্তি আমার সামনে উপস্থিত করে, মনে হল এ কথাই জিজ্ঞাসা করতে চাইল যে আমি মহারাজার সাথে আমার কন্যার বিবাহ দেব কিনা এবং এইভাবে, আমাদের প্রজানুরাগী শাসকরা লক্ষ লক্ষ প্রজাসাধারণের স্বার্থে কুচবিহার রাজ্যে যে সৎকার্য গৌরবজনকভাবে শুরু করেছেন তা আরো অগ্রসর করতে সাহায্য করব কিনা। আমি দ্বিধা করতে পারিনি এবং বিবেকের নির্দেশে তৎক্ষণাৎ বলেছি 'হ্যাঁ'। আপনি ঠিকই বলেছেন যে যদি আমি সরকারী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতাম তাহলে এক কঠিন দায়িত্ব আমার ওপর বর্তাতো।"[২১]

পরবর্তীকালে *Max Muller*-কে একটি চিঠিতে[২২] কেশব লিখলেন : "...একটি সম্পূর্ণ রাজ্যের সংস্কার হবার কথা ছিল, এবং আমার সমস্ত ব্যক্তিগত স্বার্থ ঈশ্বরের ধর্মরক্ষার গভীরতায় বা লোকে যাকে বলে জনস্বার্থ তাতে নিমজ্জিত হল।" *Cobbe* এবং *Max Muller*-কে লেখা চিঠি দুটি প্রমাণ করে যে কুচবিহারের আধুনিকীকরণের ব্রিটিশ পরিকল্পনার বাঞ্ছনীয়তা সম্পর্কে কেশবচন্দ্রের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল এবং তাদের মতোই তিনিও বিশ্বাস করতেন যে মহারাজার পক্ষে একজন আলোকপ্রাপ্তা পত্নীর প্রয়োজন রয়েছে।[২৩] কেশবচন্দ্রের আপত্তি খণ্ডন করার জন্য কুচবিহারের ব্রিটিশ ডেপুটি কমিশনার *Mr. Dalton* পরামর্শ দিলেন যে সুনীতির বয়স যেহেতু ১৪ বৎসর পূর্ণ হয়নি, তাই এই বিবাহ সাধারণ অর্থে বিবাহ হবে না, এটি হবে "ধর্ম্যানুষ্ঠানিক বিবাহার্থ বাগদান"।[২৪] প্রকৃত অর্থে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ প্রস্তাব করল একটি আইনানুগ

---

২০ Frances Power Cobbe-কে লেখা কেশবচন্দ্রের এই চিঠির তারিখ ২৯শে এপ্রিল ১৮৭৮ সাল। কোচবিহার বিবাহের ঘটনাকালে এই চিঠিটি হল কেশবের তরফে দেওয়া একমাত্র ব্যক্তিগত প্রতিবেদন। তবে এই ব্যক্তিগত চিঠিটি কখনোই 'বাগদান' অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবার আগে প্রকাশিত হয়নি। সূত্র : Meredith Borthwick, Keshub Chander Sen : *A search for Cultural Systhesis*, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৭৭ প্রশান্ত কুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৩।

২১ "...the Government, in presenting these views before me, seemed to ask me whether I would give my daughter in marriage to the Maharaja and thus help forward the good work so gloriously began in that State by our benevolent rulers in the interests of millions of the subject population. I could not hesitate but said at once under the dictates of conscience, 'Yes', you have justly said that a grave responsibility would have rested upon me had I refused the overtures of the Government." প্রশান্ত কুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ১২-১৩।

২২ ১৮৮১ সালের ২রা মে এই চিঠিটি লেখা হয়েছিল। "A whole kingdom was to be reformed, and all my individual interests were absorbed in the vastness of God's saving economy, or in what people would call public good." —Meredith Borthwick, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৭৮।

২৩ তদেব।

২৪ "Solemn betrothal".

বিবাহনুষ্ঠানের যা পাত্রপাত্রী ১৮৭২ সালের তিন আইন অনুযায়ী বিবাহযোগ্য বয়সে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত আইনত বৈধ বলে বিবেচিত হবে না। এটি ছিল এমন একটি সমঝোতা যা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এবং কেশবচন্দ্র উভয়ের উদ্দেশ্য ও অসুবিধাকে সমন্বিত করেছিল। একজন ইংরাজী শিক্ষিতা, আলোকপ্রাপ্তা, মানানসই বালিকাকে শেষপর্যন্ত কুচবিহারের তরুণ মহারাজার জন্য মনোনীত করা গিয়েছিল—যা ব্রিটিশ সরকারের দিক থেকে একান্তভাবে কাম্য ছিল কুচবিহার রাজ্যে ব্রিটিশ আধিপত্য বজায় রাখার জন্য। অন্যদিকে কেশবচন্দ্রকে বোঝানো গেল যে যদিও অনুষ্ঠানটির বহিরঙ্গে বিবাহের রূপ থাকবে, তবুও বিবাহ নয়। তাই বিবাহের পাত্রপাত্রী উভয়ের বয়সই কেশবচন্দ্রের স্থির করা ন্যূনতম বিবাহযোগ্য বয়ঃসীমা স্পর্শ করেনি—বিবেকের এই দংশন থেকে কেশবচন্দ্র মুক্তিলাভ করবেন।[২৫]

১৮৭৮ সালের ২৪শে জানুয়ারি মাঘোৎসব চলাকালীন কুচবিহার থেকে যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী কলকাতা এলেন কেশবচন্দ্রের কাছ থেকে প্রাথমিক আশ্বাস লাভের জন্য এবং তারপর বিস্তারিত বন্দোবস্ত সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য। কেশবচন্দ্র বিবাহের প্রস্তাবে কতকগুলি শর্ত আরোপ করলেন। কেশবচন্দ্র বললেন যে বিবাহ অনুষ্ঠানের পরিবর্তে শুধু প্রথাবদ্ধ বাগদান অনুষ্ঠান হবে। বর ও কনে প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর প্রকৃত বিবাহ হবে। এই অনুষ্ঠানে কোন পৌত্তলিক ধর্মাচরণ হবে না। বিয়ে ব্রাহ্মমতানুসারে হবে।[২৬] ১৮৭৮ সালের ২৭শে জানুয়ারী ইংরাজ ডেপুটি কমিশনার মিঃ ডাল্টন একটি চিঠিতে কেশবের কাছে লিখলেন : "আমি আপনার স্মারকলিপি পাঠ করেছি। কয়েকটি এমন অনুচ্ছেদ সেখানে আছে যা আমার মনে হয় আমরা পুরোপুরি মানতে পারব না, উভয় পক্ষই যদি না সামান্য কিছু ছাড়ে, আমার কোন সন্দেহ নেই যে যদি আপনি প্রকৃত বিবাহ প্রস্তাবে খুশী মনে সম্মত হন, তবে আমরা উভয় পক্ষের উপযুক্ত এক সমঝোতায় উপনীত হতে পারি। রানির শর্তাবলির মধ্যে একটি হল এই যে আপনার আত্মীয়ের মধ্যে একজন, আপনি নন, কন্যাদান করবেন।"[২৭] এর কারণ, মিঃ ডাল্টন লিখলেন

২৫ "In effect, the British authorities proposed a legal marriage which would not be consummated till the parties were of age. This was a compromise which would also help to overcome Keshub's scruples about the couple being under he had decided was the minimum marriageable age." তদেব, পৃঃ ১৭৭।

২৬ প্রশান্ত কুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭।

২৭ "I have read through your memo. There are some paragraphs which I think we can hardly consent to in their entirely, but by a little concession on both sides, I have no doubt that, if you are really well disposed to this marriage, we may come to an agreement which will suit both parties. One of the Rani's conditions is that one of your relatives, not yourself, should give away the bride".– সুনীতি দেবী, *আত্মজীবনী*, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৬।

যে কেশব ইংল্যান্ড গিয়েছিলেন।[২৮] এই চিঠির পরবর্তী অংশ ব্রিটিশ চাতুরী এবং দম্ভের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। মিঃ ডাল্টন কেশবচন্দ্রকে লিখলেন : "আমার মনে হয় যে, যেহেতু আপনি প্রকৃতই উপস্থিত থাকবেন (হয়ত বা যদি আপনি চান), তবে কোন ভাই বা কাকা একই কর্তব্য করলে আপনার কাছে কিছু যাবে আসবে না। এই শর্তের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে, এবং আশা করি এটি মানতে অস্বীকার করে আপনি আলোচনার পথ রুদ্ধ করবেন না। মনে রাখবেন যে আমাদের দিক থেকে বহু সমস্যা সমাধান আমাদের করতে হয়েছে আর ইতিমধ্যে আমাদের পক্ষ থেকে যতদূর ছাড় দেওয়া সম্ভব তা দেওয়া হয়েছে।

এও মনে রাখবেন, যদি আপনি এই প্রস্তাব বিবেচনা করেন, তবে প্রশ্ন এই যে হয় তা এখুনি অথবা কখনো নয়,........."[২৯]

ইতিপূর্বে, ব্রিটিশ সরকার, বাগদান অনুষ্ঠান হবে এই যুক্তি দেখিয়ে কেশবচন্দ্রের আপত্তি দূর করেছিলেন। এভাবে, বয়স সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হল। ধর্মীয় বিষয়ে যে ছাড় দেওয়া হল তাও সুনিশ্চিত ছিল। কিন্তু 'এখন অথবা কখনো নয়' এই শব্দসমূহ ব্রিটিশ নীতিকে সুস্পষ্ট করে তুলেছিল। কুচবিহার রাজ ও সেন পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া ব্রিটিশদের পক্ষে জরুরী ছিল, এবং শেষপর্যন্ত কেশবচন্দ্রের মুখ থেকে সম্মতিবাক্য কেড়ে নেওয়া হল।[৩০]

১৮৭৮ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী মিঃ ডাল্টন কেশবচন্দ্রকে এই মর্মে এক তার পাঠালেন : "আপনার তার পাওয়া গিয়েছে। আশা করি আর কোন সমস্যা হবে না। গতকাল পণ্ডিত কলিকাতা যাত্রা করেছেন অনুষ্ঠান বিধি ঠিক করার জন্য, যা আপনার অনুমোদনের ভিত্তিতে হবে, যেমন হিন্দু পৌত্তলিকতার অংশ বাদ দেওয়া হবে এবং ভাই কন্যাদান করবেন। বাগদান অনুষ্ঠানের বিস্তারিত যাদবের সঙ্গে আলোচনা করুন, তার কাছে নির্দেশ দেওয়া আছে।"[৩১]

---

২৮ "The objection to you is principally based on the fact that you have been on England." তদেব, পৃ: পৃ: ৫৬-৫৭।

২৯ "I imagine that, as you will be actually present (Or may be, if you like), it will not make any great difference to you should a brother or uncle actually repeat the formula. This is a condition on which great stress is laid, and I hope you will not arrest negotiations in limine by refusing to accede to it. Remenber that we on our side have had great difficulties to smooth away and that we have already conceded almost all that we have the power of conceding.
Remember, also, that if you care about this alliance, it is a question of now or never,..."—সুনীতি দেবী, *আত্মজীবনী*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫৭।

৩০ তদেব।

৩১ "Your telegram received. Anticipate no further difficulty. Pundit started yesterday for Calcutta to arrange formula of ceremony on basis heretofore approved by you viz. Hindu form idolatrous portion omitted and in addition brother to give away bride. Arrange details betrothal with Jadub who has instructions." ঝরা বসু, *কেশবচন্দ্র সেন ও সমকালীন ব্রাহ্মসমাজ*, পূর্বোল্লিখিত, পৃ: ৮০।

ইতিপূর্বেই, মিঃ ডাল্টন সুনীতিকে দেখে গিয়েছিলেন। সুনীতির বর্ণনা : "কয়েক ঘণ্টা পরে আমাকে তৈরী হতে বলা হল। মা আমাকে কয়েকটি সুন্দর গহনা দিয়েছিলেন যা আমার সোনালী ও মভ (ফিকে লাল) রংয়ের শাড়ীর ওপর সুন্দর মানিয়েছিল। আমার চুল বাঁধা হয়েছিল। আমরা গাড়ী করে প্রিয় মিস পিগটের স্কুলবাড়ীতে গেলাম। সেখানে আমি সাধারণত পাঠ নিতে যেতাম।......"

"সেখানে আমাকে বসবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল, সেখানে মিঃ ডাল্টন ও বাঙ্গালী কর্মচারীরা আমার জন্য অপেক্ষা করে ছিলেন। মিঃ ডাল্টনকে দেখাচ্ছিল সদয় অথচ কঠোর।" ...."আমি অনুগতভাবে পিয়ানোতে গিয়ে বসলাম আর একটি সরল সুর বাজালাম। যখন আমি পিয়ানোতে গিয়ে বসলাম, আর সেখান থেকে নিজের আসনে ফিরে এলাম আর তাঁর সাথে কথা বলছিলাম, মিঃ ডাল্টন আমাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করছিলেন;আর পরে তরুণ মহারাজকে একটি বর্ণনামূলক চিঠি লিখলেন। "চমৎকার," এমন ভঙ্গীতে তিনি বললেন যে আমার মনে হল না তিনি আমাকে পরীক্ষা করছিলেন। তাঁকে অনুকূলভাবে প্রভাবিত হয়েছেন বলে মনে হল আর এ রকমই প্রমাণিত হল, কারণ বাবার কাছে একটি চিঠিতে তিনি লিখলেন : "আমার মনে হল আপনার কন্যা অত্যন্ত মনোহারিণী এক তরুণী, এবং সবদিক দিয়েই তিনি মহারাজার যোগ্য বধূ হবেন।"[৩২]

কাজেই তরুণ মহারাজা আগেই মিঃ ডাল্টনের চিঠিতে জেনেছিলেন সুনীতির রূপ ও গুণের কথা। তাই কেশবচন্দ্র বিবাহ প্রস্তাবে সম্মত হবার পর তিনি কেশবচন্দ্রকে চিঠি লিখলেন :

"প্রিয় মহাশয়,

বহুবিবাহ সম্পর্কে আমার প্রকৃত মত কি আমাকে তা আপনাকে জানাতে বলা হয়েছে। উত্তরে আমি সবিনয়ে জানাই যে আমি সর্বদা এই মত পোষণ করি যে কোন মানুষেরই একের বেশী স্ত্রী গ্রহণ করা উচিত নয়, এবং আমি আপনাকে নিশ্চিত করতে পারি যে আমি এখনো

৩২ "After a few hours I was told to get ready, Mother gave me some lovely jewels which looked beautiful on my mauve and gold sari. My hair was dressed. We drove over to dear Miss Pigot's school house. Where I usully went for lessons..." Then I was taken to the drawing-room, where Mr. Dalton and the Bengali officials awaited me. Mr. Dalton looked kind but critical..." I obediently seated myself at the piano and played a simple piece of music Dalton scrutinised me as I went up to the piano and back to my seat and as I talked to him; and wrote a descriptive letter to the young Maharajah afterwards. "Very nice", he said, in such a charming way that I did not think he was examining me. He seemed favourably impressed, and so it proved for in one of his letters to my father he wrote. "I thought your daughter a very charming young lady, and in every way a suitable bride for the Maharajah."— সুনীতি দেবী, *আত্মজীবনী,* পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ৫৪-৫৫।

এই মত পোষণ করি। নীচে আমি আমার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী এবং মত সম্পর্কে জানাচ্ছি। আমি একমাত্র প্রকৃত ঈশ্বরে বিশ্বাস করি এবং অন্তরে আমি একজন একেশ্বরবাদী।

আপনার বিশ্বস্ত

নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ।[৩৩]

এরপর কেশবচন্দ্রের মনে আর কোন দ্বিধা রইল না। তিনি মহারাজের সঙ্গে সুনীতির সাক্ষাৎ ও পরিচয় করানোর ব্যবস্থা করলেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ কমলকুটীরে সুনীতির সঙ্গে দেখা করলেন। সুনীতি দেবী এই সাক্ষাতের একটি বিবরণ দিয়ে লিখলেন : "বসবার ঘরে একটি বড় টেবিল ঘিরে আমরা বসেছিলাম। মহারাজার সঙ্গে মিঃ নেলার এসেছিলেন। তাঁরা উভয়েই আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ ধরে কথাবার্তা বললেন।... অনতিবিলম্বে সবচেয়ে জমকালো পোশাক পরে একজন ব্যক্তি ঘরের মধ্যে এলেন। তিনি সঙ্গে করে কিছু এনেছিলেন যা টেবিলের ওপর রাখা হল। কয়েক মিনিট পরে আমার বাবা বললেন, "সুনীতি, মহারাজার তরফ থেকে তোমার প্রতি এই উপহার।" আমি যেই চোখ তুলে তাকালাম, অমনি মহারাজার ভালবাসাভরা চোখ, যা আমার উপরই নিবদ্ধ ছিল, আমার চোখে মিশল, আর আমি লজ্জায় লাল হলাম। সেই মুহূর্ত থেকে আমি আর ভাবী স্বামী পরস্পরকে ভালবাসলাম।

এরপরে, আমরা কয়েকবার দেখা করেছিলাম, কিন্তু তা সর্বদাই অপরের উপস্থিতিতে। তবুও আমি জানতাম যে মহারাজা আমাকে ভালবাসেন।"[৩৪]

---

৩৩ "My dear Sir,

I have been asked to let you know what my honest opinion is on the subject of polygamy.

In reply I beg to inform you that it has always been my opinion that no man should take more than one wife, and I can assure you that I hold that opinion still.

I give below a statement of my religious views and opinions. I believe in one true God and I am in heart a Theist.

Yours truly,
Nripendra Narayan Bhup

—সুনীতি দেবী, আত্মজীবনী, পৃ:পৃ: ৫৮-৫৯।

৩৪ "We sat round a big table in the drawing-room. Mr. Kneller came with the Maharajah.They both talked to us for some time...Presently a man most gorgeously dressed came into the room. He brought something which was placed on the table. After a few minutes my father said, "Sunity, this is a present from the maharajah to you." I looked up, and as I did so I met the Maharajah's eyes fixed on me full of love, and I blushed. From that moment my future husband and I loved each other......We met several times later, but always in the presence of others. Yet I knew the Maharajah loved me."—সুনীতি দেবী, *আত্মজীবনী*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৬০-৬১।

এরপরে, বিবাহে আর কোন বাধা রইল না। ১৮৭৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী মহারাজার তরফ থেকে এল জুড়ুনি, যা কিনা ভাবী বধূ ও তার পরিজনবর্গের জন্য উপহার সামগ্রী প্রেরণ, দুই পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপনের চিহ্ন হিসাবে।[৩৫] ১১ই ফেব্রুয়ারী এই বিবাহের অনুষ্ঠানিক বাগদান সম্পন্ন হল।[৩৬] সেই সঙ্গে ব্রাহ্মমতে উপাসনা অনুষ্ঠিত হল। ১৯শে ফেব্রুয়ারী কমল কুটীরে একটি অনুষ্ঠানে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণকে কেশবচন্দ্রের আত্মীয়, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পরিচিত করানো হল। এই অনুষ্ঠানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা যে সকলে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন তা নয়। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র, আবদুল লতিফ খাঁন এবং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর মতো ব্যক্তিত্বরা ঐ পরিচিতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।[৩৭] ২৫শে ফেব্রুয়ারী কলকাতা থেকে বিবাহদল কুচবিহারের উদ্দেশ্যে রওনা হল। একবার যখন কেশবচন্দ্র বিবাহে সম্মতি দান করলেন তখন বোঝা গেল যে তাঁকে সহজেই প্রভাবিত করা সম্ভবপর হবে। কারণ, এই বিবাহের দ্বারা কেশবচন্দ্রের একাধিক উদ্দেশ্য সাধিত হল। তাঁর শিক্ষিতা কন্যার জন্য তিনি এক উপযুক্ত পাত্র খুঁজে পেলেন, ব্রাহ্মধর্মের প্রসারে উৎসাহ দেবার সুযোগ পেলেন এবং ব্রিটিশ শাসনের সুফল বিস্তার কল্পে সহযোগিতা করলেন।[৩৮]

এরপরে আলাপ আলোচনার রাশ সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে চলে গেল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এখন কেশবকে আরো বেশী করে রাণীদের শর্ত মেনে নেবার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে লাগল।[৩৯] এর প্রমাণ পাওয়া যায় যাদবচন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা মিঃ ডাল্টনের চিঠি থেকে। এখানে অবশ্য একটি ক্ষুদ্র দরবার-রাজনীতি কাজ করেছিল। সুনীতি দেবী তাঁর লেখায় এ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন যে কুচবিহারের দেওয়ান কালিকা দাস দত্ত ছিলেন যে কোন ইংরাজ কর্মচারী অপেক্ষা বেশী ক্ষমতাবান। তিনি তাঁর অধস্তন কর্মচারী যাদবচন্দ্র চক্রবর্তীর মাধ্যমে কেশবচন্দ্রের সাথে চিঠির আদানপ্রদান পছন্দ করেন নি অথচ তিনি ছিলেন কেশবচন্দ্রের গোঁড়া অনুগামী। নিজেকে অবহেলিত মনে করে তিনি এই বিবাহের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁরই হস্তক্ষেপে মিঃ ডাল্টন যাদবচন্দ্রকে লিখলেন : "দেওয়ান আমাকে বলেছেন যে তিনি ইতিমধ্যেই আপনাকে কেশবচন্দ্র সেনের কুচবিহারে বিবাহ উপলক্ষ্যে সদলবলে আগমন সম্বন্ধে আমার তার নিয়ে চিঠি লিখেছেন। অবশ্যই আমার উদ্দেশ্য হল ব্রাহ্মধর্মের অপ্রয়োজনীয় প্রদর্শন এড়িয়ে যাওয়া। ব্রাহ্ম বালিকা বিবাহ করেই রাজা আলোকপ্রাপ্ত ধ্যানধারণার প্রতি যথেষ্ট পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন, কিন্তু

৩৫ প্রশান্ত কুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ: ৮।

৩৬ তদেব।

৩৭ *ইন্ডিয়ান মিরার*, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৮।

৩৮ "...the marriage actually seemed to resolve many problems for Keshub. He had arranged a suitable husband for his educated daughter, found an oppprtunity to further encourage the spread of Brahmoism, and co-operated with the British to extend the benefits of their rule". —Meredith Borthwick, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৮৩।

৩৯ তদেব, পৃ: ১৭৯।

ার ও অন্যত্র তাঁর যে পরিজনবর্গ রয়েছেন, তাঁদের কাছে এই বিষয়টি যত কোমল করে দেখানো যায় তত ভাল, কারণ তাঁরা এখনও কুসংস্কারে আবদ্ধ, আর হিন্দু রীতি থেকে কোনরকম বিচ্যুতি তাঁদের কাছে আতঙ্কজনক।

সুতরাং, ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ব্যতীত অন্য কোন অনুগামী আনতে আমি বাবু কেশবচন্দ্রকে নিবৃত্ত করতে চাই। প্রকৃতপক্ষে কোন ব্রাহ্মমতের প্রদর্শন আমরা অনুমোদন করতে পারি না। যাঁরা আসবেন তাঁরা অবশ্যই মনে রাখবেন যে একেশ্বরবাদ বনাম মূর্তিপূজা সম্বন্ধে একটি কথাও চলবে না।

যতদূর সম্ভব, শুধুমাত্র হিন্দু রীতিই নয়, তা থেকে উদ্ভূত ধারণা এমনকি সংস্কারসমূহও মানতে হবে। যথা, কনের সহচরীদের ধারণা আমি পুরোপুরি নিষেধ করছি, কারণ এই ধারণাটি কট্টর এবং গোঁড়া হিন্দুধর্মের পক্ষে অভিনব এবং গ্রহণযোগ্য নয়। তাই কনের সঙ্গে যে সব মহিলারা থাকবেন তাঁরা পেছনে থাকবেন, সার্বজনীন রীতির দ্বারা অনুমোদিত না হলে তাঁরা কখনো সামনে আসবেন না। এও আমি সুপারিশ করব যে বিবাহদলের সঙ্গে বেশীসংখ্যক মহিলা আসা অপ্রয়োজনীয় এবং অবাঞ্ছিত।

আমার মনে হয় যে কেশববাবুর পরিবার এবং একজন বা দুজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মধ্যেই মহিলাদের সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। আর পুরুষ অভ্যাগতদের সম্পর্কে অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এখানে তাঁদের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করা হবে, তা কলিকাতায় তাঁদের সামাজিক মর্যাদার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করবে। যাঁরা লেফটেনান্ট গভর্ণরের দরবারে প্রবেশাধিকার ও আসন লাভ করে থাকেন, কেবলমাত্র তাঁরাই এখানে বিবেচিত হবেন।

এ সমস্ত কিছুর পেছনে আমার যে যুক্তি কাজ করছে বাবু কেশবচন্দ্র সেন তা বোঝার মত যথেষ্ট বিচক্ষণ।...”[৪০]

৪০ "My dear Jadab Babu,

The Dewan tells me that he has already written to you regarding my wire as to the extent of Babu Keshub Chander Sen's party coming to Cooch Behar for the wedding. Of course, my object is to avoid any unnecessary display of Brahmoism. In marrying a Brahmo girl the Rajah makes a great concession to enlightened ideas, but it is most desirable that this connection should be softened as much as possible in the eyes of his relatives, at Cooch Behar and elsewhere, who are still wedded to the old superstitions and who would look with horror upon any departure from the old Hindu formula.

I was, therefore, to dissuade Babu Keshub Chander Sen from bringing with him any of those who might be called his followers, apart from such as are his immediate relatives. In fact, we can not permit any Brahmo demonstration whatever, and those who come must bear in mind that a single speech in any way whatever relating to Theism versus Idolatry will not be permitted.

মিস্টার ডাল্টনের লেখা এই চিঠির ভিত্তিতে কুচবিহার রওনা হবার দুদিন আগে কেশবচন্দ্র কুচবিহার থেকে একটি তার পেলেন যে বিবাহ অনুষ্ঠানের ব্রাহ্ম অংশটি গ্রহণযোগ্য নয়। এর প্রতিবাদ জানিয়ে কেশবচন্দ্র পাল্টা তার পাঠালেন। এর উত্তরে কেশব আবার একটা তার পেলেন, সেখানে ইতিমধ্যেই নির্ধারিত শর্তগুলি মেনে নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছিল।[৪১] তখন কেশব সপরিবারে ও সবান্ধবে কুচবিহার রওনা দিলেন। বিবাহের দলটি আকারে বেশ বড় হয়েছিল। এতে ছিলেন সুনীতির পিতামহী, মা, কেশবচন্দ্রের বন্ধুবান্ধব, পুরোহিত গৌরগোবিন্দ রায়, মিস পিগট, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, প্রসন্নকুমার সেন, গিরিশচন্দ্র সেন এবং আরো অনেক আত্মীয়স্বজন।[৪২] রেলের আসন সংরক্ষিত হয়ে গিয়েছিল বলে যে কেশবচন্দ্র কুচবিহার রওনা হতে বাধ্য হয়েছিলেন তা নয়, আসলে তখন পরিস্থিতি ছিল যেমন বিপজ্জনক তেমন অনিশ্চিত। যদিও কেশবচন্দ্র ঈশ্বরাদেশের অন্তরালে তাঁর স্বাভাবিক বিচক্ষণতাকে চাপা দিয়ে রেখেছিলেন, তবুও তাঁর পক্ষে আর প্রত্যাবর্তনের পথ ছিল না, ফিরলে তাঁকে আরো হতমান হতে হতো কারণ, ইতিমধ্যেই তিনি বিবাহে তাঁর সম্মতি দান করেছিলেন, বিবাহের সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়ে গিয়েছিল।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে কেশবচন্দ্র কেন এই বিবাহে রাজী হলেন? কেন না এই বিবাহে তাঁর আদর্শ যে সম্পূর্ণ রক্ষিত হবে না এ কথা কেশবচন্দ্রের না বোঝার কথা নয়। কিন্তু তবুও তিনি এ বিবাহে সম্মত হলেন তার কারণ হল এই যে সুনীতি দেবী এবং মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন, কন্যার এই অনুরক্তি কেশবচন্দ্র

So far as possible, not only Hindu customs, but also the ideas and even the prejudices which arise from these customs must be respected; for instance, I disapprove altogether of the idea of bridesmaids, and at *once novel and responsible to strict and bigoted Hinduism. The maiden* attendants of the bride should remain in the background and on no account be put prominently froward except when universal custom allows. Also I would suggest that it is quite unnecessary and undesirable that a large company of ladies should accompany the party. I fail to see what good their presence can do.

I think the ladies should be limited to Keshub Babu's immediate family and one or two intimate friends, and as regards the male guest, please remember that the amount of distinction shown to them here will be dependent entirely as to their social status in Calcutta and that only such as are entitled to be admitted and given a seat at the Lieutenant Govenor's Durbars will be considered here.

Babu Keshub Chander Sen is too sensible a man not to understand my reasons for all this"—সুনীতি দেবী, *আত্মজীবনী*, পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ৬৩-৬৫।

৪১ Meredith Borthwick, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৮৭।

৪২ ঝরা বসু, পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ৮০-৮১।

অগ্রাহ্য করতে পারেননি। সুনীতি দেবী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখলেন, "আমি চোখ তুলে তাকালাম, আর যেই তা করলাম অমনি আমার প্রতি নিবদ্ধ মহারাজের ভালবাসাভরা দৃষ্টির সঙ্গে মিলিত হলাম, এবং আমি লজ্জারুণ হলাম।... পরে আমরা আরো কয়েকবার দেখা করেছিলাম, কিন্তু সর্বদাই অপরের উপস্থিতিতে। তবুও আমি জানতাম যে মহারাজা আমাকে ভালবাসেন।"[৪৩]

বিবাহানুষ্ঠানের জন্য যখন কেশবচন্দ্র সপরিবারে ও সপার্ষদ কুচবিহার গেলেন, তখনও সুনীতি ও নৃপেন্দ্রনারায়ণের পূর্বরাগের প্রমাণ পাওয়া গেল। "কুচবিহার পৌঁছানোর পরেই আমি আমার বোনকে জিজ্ঞাসা করলাম, কখন মহারাজার সঙ্গে আমার দেখা হবে, কিন্তু চূড়ান্ত হতাশাজনকভাবে আমাকে বলা হল যে আমার বিবাহের দিনের আগে ছাড়া আমার পক্ষে তাঁকে দেখা সম্ভব নয়।"[৪৪] কুচবিহারের ভাড়াবাড়ী থেকে সুনীতি দেবী বিবাহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন রাজপ্রাসাদের অভিমুখে। চোদ্দ বছরের বালিকা সকলের কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, এছাড়া বিবাহানুষ্ঠান নিয়ে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে রাজকর্তৃপক্ষের বিতর্কের কথা তাঁর অজানা ছিল না। সুনীতি এ-ও জানতেন যে এই বিবাহে সম্মত হওয়ার জন্য তাঁর পিতার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজ উত্তাল হয়ে উঠেছে। সব মিলিয়ে সুনীতি যখন ভীত ও ক্লান্ত, তাঁর দেহ ও মন বিশ্রামের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে, "তখন হঠাৎ আমি বাইরে এক মৃদু শিসের আওয়াজ শুনলাম। এ মহারাজা। আমি তাঁর শিস খুব ভাল করে চিনি, কারণ আমি কমল-কুটীরে তা প্রায়ই শুনতাম। তৎক্ষণাৎ আমি বুঝতে পারলাম আমি বিস্মৃত হইনি, অন্ধকারের মধ্যেও এমন একজন আনন্দময় সঙ্গী আছেন যিনি আমাকে ভালবাসেন এবং আমার ভালবাসা চান।"[৪৫] বরপক্ষ ও কনেপক্ষের মতবিরোধের চূড়ান্ত পর্যায়ে যখন বিবাহ বন্ধ হবার উপক্রম হল তখন তা মহারাজার কর্ণগোচর হল। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন : "এখন খুব মন দিয়ে আমার কথা শোন, আমি বিছানায় যাচ্ছি। যদি এই কন্যাকেই আমায় বিবাহ করতে হয়, তবে আমায় ডেকে তুলো। নয়ত আমার ঘোড়া তৈরী রাখ, কারণ আগামীকাল ভোরে আমি চিরদিনের

---

৪৩ "I looked up, and as I did so I met the Maharajah's eyes fixed on me full of love, and I blushed...We met several times later, but always in the presence of other. Yet I knew the Maharajah loved me".—সুনীতি দেবী, পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ৬০-৬১।

৪৪ "Soon after my arrival I asked my sister when I should see the Maharajah, but to my great disappointment I was told that I was not to see him until my weddeing day."—সুনীতি দেবী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৬।

৪৫ "...When suddenly I heard a gentle whistle outside. It was the Maharajah! I knew his whistle well, for I had often heard it at Lily Cottage. I felt at once that I was not forgotten, that in the darkness there was a cheery companion who loved me and wanted my love."—সুনীতি দেবী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৮।

মতো কোচবিহার ছেড়ে চলে যাব। যদি আমি এই মেয়েকে বিবাহ করতে না পারি, তবে আমি কারুকেই বিবাহ করব না।"[৪৬]

এখন, দুইটি তরুণ হৃদয়ের স্বাভাবিক ও প্রকৃত আকর্ষণই কি কেশবচন্দ্রকে এই বিবাহে সম্মত করিয়েছিল? বাবংবার কেশবচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে কেন তিনি এই বিবাহে সম্মত হলেম? কেশবচন্দ্র বারংবার একই উত্তর দিয়েছিলেন : "কারণ, আমার ভেতরের অলৌকিক কণ্ঠস্বর আমাকে বলেছিল, "হ্যাঁ" এগিয়ে যাও।"[৪৭] কেশবচন্দ্র তাঁর অন্তরাত্মার কাছে কি জানতে চেয়েছিলেন যার উত্তর তিনি নিজের ভিতর থেকেই পেয়েছিলেন যে তিনি অগ্রসর হতে পারেন? ১৮৭৮ সালে ২৯শে এপ্রিল মিস কবকে কেশবচন্দ্র একটি পত্র লিখেছিলেন, কুচবিহার বিবাহ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব কৈফিয়ৎ সম্বলিত এই চিঠিটি অবশ্য বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি[৪৮] তাতে তিনি লিখেছিলেন যে "সরকার ... আমার কাছে জানতে চাইল যে আমি আমার মেয়েকে মহারাজার সাথে বিবাহ দেব কিনা আর এইভাবে ঐ রাজ্যে আমাদের প্রজানুরাগী শাসকরা লক্ষ লক্ষ লোকের স্বার্থে যে সুকার্য শুরু করেছেন তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করব কিনা।"[৪৯]

"ব্রিটিশ সরকার আমাকে আর আমার মেয়েকে যাচনা করেছিলেন;আমাকে একজন ব্রাহ্ম নেতা হিসাবে জেনেও একটি খ্রীষ্টান সরকার এই বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন, আর একটি রাজ্যের গুরুভার স্বার্থ আমার উপর চাপানো হয়েছিল এই উদ্দেশ্যে যাতে আমি এই প্রস্তাবে সম্মত হই আর প্রয়োজনীয় ছাড় দিতে রাজী থাকি।"[৫০] এরপর কেশবচন্দ্র আর দ্বিধা করতে পারেননি, বিবেকের নির্দেশে তাঁকে হ্যাঁ বলতে হয়েছিল, কারণ আরো কোন এক শক্তি কি তাঁকে চালিত করেছিল, তা কি তাঁর অপরিসীম অপত্যস্নেহ?

স্ববিরোধিতার এই শেষ নয়, কুচবিহারের রাজ পরিবার আর কলুটোলার সেন পরিবারের মধ্যে যে আত্মীয়তা স্থাপিত হয়েছিল তা বিবাহ ছিল, না ছিল না? এই প্রশ্নের অনুসন্ধান

৪৬ "Now give good heed to my words. I am going to bed. If I am to marry this girl, wake me up. Otherwise have my horse in readiness, for I shall ride away from Cooch Behar for good and all tomorrow morning. If I cannot marry this girl, I will marry no one."—সুনীতি দেবী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৯।

৪৭ "Because the spirit voice within me said", "Yes, go forward". প্রশান্ত কুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ: ১১।

৪৮ তদেব, পৃ: ১৩।

৪৯ তদেব, পৃ: ১২।

৫০ "The British government sought me and my daughter, a Christian government that knew me thoroughly to be a Brahmo leader, proposed the alliance, and the weighty interests of a state were pressed upon me with a view to induce me to accept the proposal and make the needful concessions." মিস কবকে কেশবচন্দ্র, উদ্ধৃত, Meredith Borthwick, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৭৮।

কেশবচন্দ্রের স্ববিরোধিতাকে প্রকট করে তোলে। তাঁর নিজের উদ্যোগে পাশ হওয়া ১৮৭২ সালের তিন আইনকে কেশবচন্দ্র নিজে কখনো এই বিবাহের পক্ষে অনতিক্রম্য প্রতিবন্ধক বলে মনে করেননি। এর জন্য তিনি যে যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন তা অত্যন্ত কর্তৃত্বব্যঞ্জক। তিনি দাবী করেছিলেন যে, যেহেতু তিন আইন পাশ করার পেছনে তাঁর দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী সেহেতু তিনি যে কোন লোকের থেকে এই আইন পাশ করার কারণ বেশী ভাল জানেন।[৫১] কেশবচন্দ্রের সমর্থকরা তাঁদের প্রকাশ্য বিবৃতিতে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করলেন যে এই আইন পাশ হয়েছিল এই কারণে যে কন্যার ঋতুদর্শনের আগে যাতে বিবাহিত দম্পতির শারীরিক সম্পর্ক না ঘটে, কিন্তু সুনীতির ক্ষেত্রে এই কারণ অচল ছিল, যেহেতু সুনীতি ইতিমধ্যেই এই শর্ত পূরণ করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাবে যদি তিনি রাজী না হতেন তবে এক বিরাট দায়িত্ব তাঁর ওপর বর্তাতো, একটি রাজ্যের ভালমন্দের বিষয় এই আহ্বান স্বয়ং ঈশ্বরের, যিনি কুচবিহারের তরুণ মহারাজাকে কেশবচন্দ্রের সামনে এসে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় কেশবচন্দ্র বিবেকের নির্দেশে 'হ্যাঁ' বলতে বাধ্য হয়েছিলেন।[৫২]

এখানে লক্ষণীয় যে কেশবচন্দ্র তাঁর "বিবেক" এই বিষয়টির ওপর বেশ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি দাবী করেছেন যে তাঁর "বিবেক" পরিচালিত হয় ঈশ্বরের নির্দেশে। তাঁর বিবেকের কণ্ঠস্বরের মধ্যে তিনি ঈশ্বরের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি শুনতে পান। আবার যখন ব্রিটিশ সরকার তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করছে এই বিবাহে রাজী হবার জন্য, তখন তার মধ্যেও তিনি ঈশ্বরের নির্দেশ লক্ষ্য করেছিলেন।[৫৩] কিন্তু বিস্ময় জাগে সুনীতি ও মহারাজার মধ্যে যে প্রণয় জন্ম নিয়েছিল, কয়েকবার সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে যা ঘনীভূত হয়েছিল, তাতে কিন্তু কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের কোন নির্দেশ লক্ষ্য করেননি। সেখানে তিনি বলেছেন যে এই দুই তরুণ হৃদয়ের মধ্যে যে স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম অনুরাগ সৃষ্টি হয়েছে তার পরিণতি হল এই বিবাহ।[৫৪] তাহলে এই প্রশ্ন করা যেতে পারে যে ঈশ্বর অবান্তর?[৫৫] আসলে, বিবাহ প্রস্তাবের আলোচনার প্রথম পর্যায়ে কেশবচন্দ্র যখন আপত্তি জানিয়েছিলেন যে তাঁর কন্যার চৌদ্দ বছর না হওয়া পর্যন্ত তিনি তার বিবাহ দেবেন না, তখন মিঃ ডাল্টন প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে এটি সাধারণ অর্থে বিবাহ হবে না, এটি হবে "সমারোহময় বাগদান"[৫৬] অনুষ্ঠান। কিন্তু সত্যিই কি শুধু বাগদান

৫১ Meredith Borthwick, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৭৯।

৫২ প্রশান্ত কুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৩।

৫৩ "...it is clear that pressure from the British authorities was the earthly correlate of this divine voice."—Meredith Borthwick, পৃ: ১৭৭।

৫৪ "....the marriage was the result of a "natural and genuine attachement between the young people..." Indian Mirror, Sunday edition, 1 June 1879.

৫৫ *Brahmo Public Opinion* 23 May, 1878 পত্রিকায় উল্লিখিত এই বিতর্কটি ছাপা হয়েছিল *Bengal Times*-এ। তদেব।

৫৬ "Solemn bethrothal".

অনুষ্ঠান হয়েছিল? পাত্রপক্ষ এবং পাত্রীপক্ষ উভয়েই বারংবার "বিবাহ" এই কথাটি উল্লেখ করেছেন। স্বয়ং সুনীতি দেবী তাঁর আত্মজীবনীর[৫৭] যে পরিচ্ছেদে কুচবিহার অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়েছেন সুনীতিদেবী সেই পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন *"My Marriage"*। বালিকা সুনীতিদেবীকে বলা হয়েছিল যে যে কারণে তাঁরা কুচবিহার যাচ্ছেন তা তাঁর বিবাহ অনুষ্ঠান। তিনি নিজেই লিখেছেন : "ঐ সময়ের মধ্যে আমি আমার বিবাহের কথায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম"[৫৮] মহারাজার সঙ্গে তাঁর বিবাহের প্রস্তাব চলাকালীন যে টালবাহানা চলেছিল কুচবিহাররাজ, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এবং কেশবচন্দ্রের মধ্যে বালিকা সুনীতির মনে তখনই রোমান্সের সঞ্চার ঘটেছিল, বয়োজ্যেষ্ঠরা যখন অনুষ্ঠানের শর্ত নিয়ে সূক্ষ্মবিচারে ব্যস্ত তখন সুনীতি তাঁর স্বপ্নের রাজপুত্রের চিন্তায় বিভোর হয়েছিলেন। "আমার ভালবাসায় কল্পনার রাজপুত্র ছিলেন নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর, কোচবিহারের মহারাজা..."[৫৯] কেশবচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ অনুগামী এবং ধর্মপ্রচারক প্রশান্ত কুমার সেন বেশ রক্ষণাত্মক ভঙ্গীতে লিখলেন ব্রাহ্মবিবাহ অনুষ্ঠান প্রকৃতপক্ষে হিন্দু অনুষ্ঠানের নামান্তর যেখানে পৌত্তলিক অংশ বর্জন করা হয়ে থাকে। কোন সময়েই অতীতে বা বর্তমানে ব্রাহ্ম আচার অনুষ্ঠান বলতে আলাদা করে কিছু নেই। এখানে বারবার সপ্তপদীর মতো শুভ অনুষ্ঠান গ্রহণ করার মতো নমনীয়তা আছে। তাই ব্রাহ্মরাও হলুদ, খই, নারকেল, মাকু বা 'শ্রী'র মতো শুভ প্রতীক গ্রহণ করে পৌত্তলিকতা দোষ না ঘটিয়েই।[৬০] তাই সুনীতির "বিয়ের দিন"[৬১] যখন তাঁকে মহারাজার মা ফুল ও প্রদীপ দিয়ে বরণ করেন,[৬২] অথবা বিবাহমণ্ডপে নারায়ণ শিলা, মঙ্গল ঘট ইত্যাদি রাখা হয়, তখন তা ব্রাহ্ম পৌত্তলিকতা বিরোধিতাকে লঙ্ঘন করে না। এ এক আশ্চর্য কৌতুক যে কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরা মনে

৫৭ সুনীতি দেবী, আত্মজীবনী, —পূর্বোক্ত।

৫৮ "By this time I had become accustomed to the talk of my marriage".—তদেব, পৃ: ৬০।

৫৯ তদেব, পৃ: ৪৯।

৬০ "The Brahmo marriage ceremonial is really the Hindu divested of its idolatrous portions. It was so at that time, and it is so even to this day. Indeed, there is no stereotyped Brahmo ritual. It is elastic enough to admit of certain characteristically picturesque variations such as by introduction of the Saptapadi (the seven steps) or other symbolic ceremonials of venerable associations. As regards the use of turmeric, puffed rice, cocoanut, the Shuttle, the 'Shree' and other similar ancient symbols it is a matter of common knowledge that they are welcomed at the most up-to-date Brahmo weddings when introduced as auspicious by Hindu relations, without the slightest apprehension of any idolatrous taint in them."—প্রশান্ত কুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৩।

৬১ সুনীতি দেবী, আত্মজীবনী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৮।

৬২ তদেব।

করলেন যে ব্রাহ্মবিবাহের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হল না, আবার কুচবিহাররাজ মনে করল যে বিবাহ হল হিন্দুমতে। তাই, সরকারীভাবে বলা হল যে বিবাহরীতি যদিও প্রধানত হিন্দু ছিল তবুও কন্যার পিতার ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে পৌত্তলিক মন্ত্র বাদ দেওয়া হল আর কোন দেবমূর্তিও রাখা হল না। যাই হোক্, ব্রাহ্মণরা বিবাহের বৈধতা সম্পাদনের জন্য যা প্রয়োজন মনে করেছিলেন তা বজায় রাখা হল। সাধারণভাবে যা হিন্দু অনুষ্ঠান বলে পরিগণিত তা কেশবচন্দ্রের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সংশোধিত হল। কিন্তু ব্রাহ্মণরা যখন এই বিবাহে অনুমোদন দান করেছিলেন তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে তা গোঁড়া হিন্দু ধর্ম অনুসারেই সম্পাদিত হয়েছিল।[৬৩]

সুনীতিদেবী দুঃখিত হয়েছিলেন এই কথা ভেবে যে যখন তাঁর পিতার অনুগামীরা ভুল বুঝল তাঁর বিবাহ হিন্দুমতে হয়েছে বলে, তখন ব্রিটিশ সরকার কেন কেশবচন্দ্রের পক্ষ অবলম্বন করলেন না এবং সত্য ঘটনা প্রকাশ করলেন না, কারণ তাঁর বিবাহ কখনোই পৌত্তলিক ছিল না। তবে, সুনীতিদেবী এ কথা অস্বীকার করেননি যে তাঁর বিবাহানুষ্ঠান "বিবাহ" ছিল, তিনি কখনো "বাগদান" এই শব্দটি ব্যবহার করেননি এবং স্পষ্টই বলেছেন যে "যাই হোক, বিবাহটি এখন একটি সম্পাদিত ঘটনা। আমি হলাম কুচবিহারের মহারানী, এবং ঐতিহ্যিক রীতিকে অগ্রাহ্য করা প্রথম ভারতীয় বিবাহকে সফল অথবা ব্যর্থ করার দায় আমার ওপর পড়ল।"[৬৪] ঠিক এর পরেই তিনি বললেন যে মহারাজা ১৮৭২ সালের তিন আইন অনুসারে বিবাহিত হতে পারেন না, কারণ তাঁর নিজের রাজ্যে তাঁর নিজের আইন রয়েছে, এছাড়া তিনি একজন স্বাধীন শাসক আর ব্রিটিশ বিবাহ কুচবিহার রাজ্যে মূল্যহীন। ব্রিটিশ সরকার আর কুচবিহার রাজ্য আমাদের বিবাহকে হিন্দুবিবাহ বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। মহারাজা নিজে যদিও ব্রাহ্ম

৬৩ "The rules observed were Hindu in all essential features though, in deference to the religious principles of the bride's father, idolatrous mantras were omitted and the presence of an idol was dispensed with."

"Care was however taken to retain whatever, the Brahmin's considered essential to the validity of the marriage...the ordinary Hindu ceremony was modified so as to meet the wishes of Babu Keshub Chunder Sen; but the fact that the Brahmins consented to perform it shows that the marriage was recognised by the Hindoos as orthodox."—*Administration Report, 1877-78, of the Kuch Behar State, Indian Mirror, Sunday Edition, 22 December, 1878* সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল।

৬৪ "However, the marriage was now an accomplished fact. I was Maharani of Cooch Behar, and it was left for me to prove the success or failure of the first Indian marriage which had defied traditional custom" —সুনীতি দেবী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৭৩।

ছিলেন কিন্তু তিনি একটি হিন্দুরাজ্যের শাসক ছিলেন। তাই তাঁরা যেহেতু তিন আইনের ধারায় বিবাহিত হননি কাজেই বয়সের সীমারেখা তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।[৬৫]

অথচ, সুনীতি কবুল করেছেন যে তিন আইন ব্যতীত অন্য কোন ব্রাহ্মবিবাহ আইন নেই। তাহলে, সম্পূর্ণ ঘটনাটি এক কঠিন অনিশ্চয়তা, স্ববিরোধিতা এবং অস্পষ্টতার বেড়াজালে ঘেরা। কেশবচন্দ্রের মতো একজন স্বীকৃত জননেতা কেন এই বেড়াজালে নিজেকে বন্দী করলেন? কেন তিনি এ বিষয়ে কোন সদুত্তর দিতে পারলেন না? এর কারণ, তাঁর নিজের ভেতরকার স্ববিরোধ। ইংল্যান্ডে গিয়ে মহিলাদের স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ বিচরণ ও জীবনযাপন তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। নিজের জীবনে তিনি পত্নীকে একান্নবর্তী পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। মেয়েদের লেখাপড়া শেখার প্রয়োজনীয়তার কথা বারবার বলেই ক্ষান্ত হননি, মেয়েদের শিক্ষার প্রসারে তাঁর ভূমিকা সক্রিয় ছিল আজীবন। কিন্তু মনের গভীরে তিনি এই বিশ্বাস থেকে কোনদিন মুক্ত হতে পারেননি যে মেয়েদের যত কিছু উন্নতি যদি সংসার গড়ার কাজেই না লাগল তবে তা বৃথা। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে সুনীতি দেবীর বিবাহে তখনই তিনি রাজী হয়েছিলেন যখন ব্রিটিশ সরকার তাঁকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে সুনীতি কুচবিহারে গেলে ঐ পিছিয়ে থাকা রাজ্যটিতে উন্নতির জোয়ার আসবে। কুচবিহার রাজ্যকে কেশব বৃহত্তর সংসার হিসাবে কল্পনা করেছিলেন, তাই তাঁর উন্নতিকল্পে তিনি একজন নারীর ভূমিকাকে এতখানি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু কুচবিহার বিবাহের জেরে যখন ব্রাহ্মসমাজ দ্বিতীয়বারের জন্য দ্বিখণ্ডিত হল এবং কেশবচন্দ্র তাঁর নিজস্ব সমাজ নববিধান ব্রাহ্মসমাজ গড়ে তুললেন, তখন কিন্তু তিনি নারীদের বৃহত্তর সংসারের পরিবর্তে ক্ষুদ্রতর সংসারেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে বলেছিলেন। ১৮৭৯ সালের ৯ই মে প্রতিষ্ঠিত হল "আর্য্যনারী সমাজ"। এটিকে নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের মহিলা শাখা বলা যেতে পারে। এই আর্য্যনারী সমাজের উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হল যে "হিন্দুজাতীয় স্ত্রীদিগের সমাজিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে বিজাতীয় রীতি অনুকরণ ভাল নহে। জাতীয় ব্যবহারে যাহা কিছু কল্যাণকর আছে তাহা রক্ষা করা কর্তব্য। ....ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারে নারীভাব প্রস্ফুটিত করাই নারীজাতির উন্নতি চেষ্টার প্রধান উদ্দেশ্য।[৬৬] সেইজন্য "সংসারে পতিসেবা স্ত্রীর প্রধান কর্তব্য। পাতিব্রত্য ব্রত গ্রহণ করিয়া কায়মনোবাক্যে উহা পালন করিতে হইবে। ... সন্তানদিগকে

৬৫ "The maharaja could not be married under this Act as he had his own law in his State, besides he was an independent ruler and a British marriage was of no value in Cooch Behar. Our marriage was recognised by the government and the State as Hindu marriage. The Maharaja himself was a Brahmo but he was the ruler of a Hindu Raj. As we were not married under Act III the age limit did not affect us." তদেব, পৃ: ৭৪।

৬৬ মহারানী সুচারু দেবীর জীবন কাহিনী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫৭-৫৮।

সৎশিক্ষা দিতে হইবে। রন্ধন প্রভৃতি সাংসারিক কার্যে সুদক্ষ হইতে হইবে।[৬৭] আর্য্যনারী সমাজের এক অধিবেশনে বক্তৃতাকালে কেশব লক্ষ্মীশ্রী সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করলেন।[৬৮] "ঈশ্বরের কোটী স্বরূপমধ্যে লক্ষ্মীস্বরূপ একটি। তিনি লক্ষ্মীরূপে আমাদের সকলের সংসারমধ্যে বিরাজিত রহিয়াছেন। আমাদের গৃহের সমুদয় ধনরত্ন সামগ্রী তাঁহার প্রদত্ত। সংসারের সমুদায় কার্য সুনিয়ম ও শৃঙ্খলার সহিত করা উচিত। নতুবা সেই লক্ষ্মীর অবমাননা করা হয়। সামান্য দ্রব্যকে অবহেলা বা অপচয় করা হইবে না। গৃহকর্মে অলস হইয়া সংসারে অনিয়ম আনয়ন করিলে পাপ হয় ইহা মনে করিতে হইবে। ... সাংসারিক সমুদায় কর্ম লক্ষ্মীর আদেশে সম্পন্ন করিয়া গৃহপরিবারে লক্ষ্মীশ্রী যাহাতে আনয়ন করিতে পার তাহারই চেষ্টা করিবে।"[৬৯] ব্রিটিশ সরকারের অনুরোধে কুচবিহার রাজ্যে তার উন্নতির যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল তা যাতে অব্যাহত থাকে তার জন্য কেশবচন্দ্র কন্যাকে কুচবিহারের মহারাজার সাথে বিবাহ দিতে সম্মত হয়েছিলেন। এ বিষয়ে তিনি ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ পেয়েছেন বলে দাবী করেছিলেন। কিন্তু কুচবিহার বিবাহের সমালোচনার ঝড় তাঁকে যখন নিঃসঙ্গ করে দিল, তখন পুনরায় তিনি হিন্দুধর্মাশ্রিত গার্হস্থ্য ও সমাজব্যবস্থার গুণগান শুরু করলেন। ব্রিটিশ আদর্শের প্রতি কেশবচন্দ্রের আনুগত্য কি তাহলে নিতান্তই অগভীর? নাকি অপরিসীম পিতৃস্নেহের কাছে তাঁর আর সমস্ত আনুগত্য পরাস্ত হয়েছিল? যখন তিনি দেখেছিলেন যে সুনীতি ও নৃপেন্দ্রনারায়ণ পরস্পরের প্রতি আসক্ত তখনই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে এঁদের বিবাহ দেওয়াই কর্তব্য। অপরিণত বাল্যপ্রেম পিতার প্রশ্রয়ে বেড়ে উঠল ও পরিণতি পেল, এই ঘটনা মেয়েদের সম্পর্কে কেশবচন্দ্রের যে ভাবনাচিন্তা তার সঙ্গে ঠিক সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলেই কি তাকে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের কুজ্ঝটিকায় আবৃত করতে হয়েছিল? কারণ যাই হোক্ কুচবিহার বিবাহ কেশবচন্দ্রের প্রকৃতিগত স্ববিরোধিতাকে প্রকট করে তুলেছিল। ইংরাজী বা দেশীয় কোন রীতিতে সুনীতির শিক্ষা সম্পূর্ণতা পাবার আগেই কেশবচন্দ্র তাঁর বিবাহে সম্মতি দান করলেন। বিবাহের আগে পাত্র ও পাত্রীর সাক্ষাৎ ঘটিয়ে তিনি সেই বিবাহকে অনিবার্য করে তুললেন। বিবাহ সম্পন্ন হবার জন্য হিন্দু রীতি মেনে নিতে বাধ্য হলেন, মহারাজের অভিভাবকদের দাবীর কাছে নতি স্বীকার করলেন। তারপরেই তিনি মেয়েদের জীবন গঠন করার জন্য "সাধ্বী নারীদিগের জীবন" অধ্যয়নের কথা প্রকাশ্যে বললেন, 'বললেন যে "হিন্দুজাতীয় স্ত্রীদিগের সামাজিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে বিজাতীয় রীতি অনুকরণ ভাল নহে।" অথচ তাঁর কন্যাকে বিবাহ দিলেন বিজাতীয় প্রভাবের অধীন একটি রাজ্যে এমন এক পুরুষের সাথে যে ঐ বিজাতীয় শিক্ষায় বেড়ে উঠছিল, যেখানে কেশবতনয়াকে মনোনীত করা হয়েছিল ঐ বিজাতীয় প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখাতে এবং দৃঢ়তর করতে সাহায্য করতে পারবেন বলে।

৬৭ তদেব, পৃ: ৫৮।

৬৮ *আচার্য্য কেশবচন্দ্র, অন্ত্যবিবরণ, দ্বিতীয় অংশ,* কলিকাতা ১৮২৩ শক, পৃ: ১৭০।

৬৯ তদেব।

বাঙালী পুরুষের নারীভাবনা : কুচবিহার বিবাহের পরবর্তীকাল

নারীভাবনার অন্তরালে মাতৃ সমাচার :

বিতর্কিত কুচবিহার বিবাহের প্রথম মুদ্রিত উল্লেখ ঘটল ১৮৭৮ সালের ৯ই ফেব্রুয়াবী।[৭০] কেশবচন্দ্রের সমর্থক এই পত্রিকা কুচবিহার বিবাহকে সমর্থন করেছিল স্বাভাবিকভাবেই। প্রতিবেদক এই বিবাহের ঘটনাকে উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসা করলেন এই বলে যে দুটি তরুণ আলোকপ্রাপ্ত ও আধুনিক হৃদয় মিলিত হচ্ছে, কেবল যদি পাত্র ও পাত্রী বয়সে আরো একটু বড় হত।[৭১] কিন্তু ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৮৭৮ সালে ২৩ জন ব্রাহ্ম প্রতিবাদী প্রথম এই বিবাহের বিরুদ্ধে আপত্তি জ্ঞাপন করলেন। এঁদের মধ্যে দুর্গামোহন দাশ, আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী এবং শিবচন্দ্র দেব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৭২] তাঁদের অভিযোগ ছিল এই যে কেশবচন্দ্র যে গর্হিত উদাহরণ স্থাপন করলেন তা অনুসরণ করে অন্যান্য ব্রাহ্মরাও বিবাহ আইন লঙ্ঘন করবেন এবং পাত্রের বংশকৌলীন্য, পদমর্যাদা এবং সম্পদের দ্বারা প্রলুব্ধ হবেন ঠিক যেমন কেশবচন্দ্রের ক্ষেত্রে ঘটেছে।[৭৩] আসলে, বহুদিন ধরেই কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে নানা মতবিরোধ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল কিন্তু বিরোধীরা সংখ্যালঘু হওয়ার জন্য তা প্রকট হতে পারছিল না। কুচবিহার বিবাহ দ্বারা কেশবচন্দ্রের প্রতি সাধারণের বিশ্বাস এমনভাবে নাড়া খেল যে প্রতিবাদী কণ্ঠসমূহ সোচ্চার হয়ে উঠল।[৭৪] তাঁরা কেশবচন্দ্রের কাছে আবেদন জানালেন ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজের একটি অধিবেশন ডাকার জন্য। কেশবচন্দ্র সেই আবেদনে কর্ণপাত করলেন না, কিন্তু ২১শে মার্চ ১৮৭৮ সালে নিজেই একটি সভা ডাকলেন। দুর্গামোহন দাশ কেশবচেন্দ্রর সম্মতিক্রমে ঐ সভায় সভাপতিত্ব করতে রাজী হলেন।[৭৫] এর পরের ঘটনার বিবরণ শিবনাথ শাস্ত্রীর মুখেই শোনা যাক : "তদনন্তর কেশববাবু নিজের পদচ্যুতি সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করিতে চাহিলেন দুর্গামোহনবাবু সভাপতিরূপে সে প্রস্তাব উত্থাপনের ভার আমার প্রতি অর্পণ করিলেন। আমি সেই প্রস্তাব করিতে দাঁড়াইলাম, অমনি কেশববাবু সদলে সভা ত্যাগ করিয়া গেলেন। ... আমরা সেই গোলযোগের মধ্যে কয়েকটি নির্ধারণ (রেজোলিউশান) পাস করিলাম। একটির দ্বারা কেশববাবুকে আচার্য্যের পদ হইতে নামানো হইল, অপরটির দ্বারা কয়েকজন আচার্য্য নিয়োগ করা হইল।"[৭৬] এরপর ব্রাহ্মমন্দিরের ও আচার্য্যের বেদীর দখল নিয়ে কেঁশবচন্দ্রের সমর্থক ও বিরোধী গোষ্ঠীর মধ্যে আক্ষরিক অর্থে হাতাহাতি শুরু হল। লজ্জিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে শেষপর্যন্ত প্রতিবাদীরা ডাঃ উপেন্দ্র চন্দ্র বসুর বাড়ীতে উপাসনা করলেন।

৭০ Indian Mirror, 9th February 1878.
৭১ তদেব।
৭২ Indian Mirror, 14th February 1878.
৭৩ তদেব।
৭৪ Meredith Borthwick, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮২।
৭৫ শিবনাথ শাস্ত্রী, *আত্মচরিত*, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৪-১১৫।
৭৬ তদেব।

এইভাবে একটি পৃথক সমাজ প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত ঘটল।[৭৭] ১৮৭৮ সালের ১৫ই মে প্রতিবাদী গোষ্ঠী সাংবিধানিকভাবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন।[৭৮]

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনুগামীরা কেশবচন্দ্রের জনকল্যাণমুখী আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বেশী। আবার এঁদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পালের মতো জাতীয়তাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ তরুণও ছিলেন।[৭৯] বিশেষত নারীদের অবস্থার উন্নতির জন্য শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাশ প্রমুখ অত্যন্ত সচেষ্ট ছিলেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বীকৃতি আদায় করেছিল একথা শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে শিবনাথ শাস্ত্রী একবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির নির্মাণের জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন করেছিলেন। তাঁর প্রার্থিত অর্থের পরিমাণ ছিল দুই হাজার টাকা। একদিন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরভবনে শিবনাথ মহর্ষির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। তখন মহর্ষি তাঁকে নিজের হাতে মিষ্টান্ন ভোজন করাতে লাগলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী যখন তাঁকে অধিকতর আহারের অক্ষমতা জানালেন, তখন মহর্ষি... আর একটি সুখাদ্য লইয়া আসিয়া বলিলেন, "তা বললে চলবে না বাপু। এসব জিনিস বাড়ির মেয়েরা নিজের হাতে করেছেন, না খেলে নারীর সম্মান করা হবে না; তোমরা তো স্ত্রীস্বাধীনতার দল।"[৮০] মহর্ষির উক্তি ঠাট্টাচ্ছলে হলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে শিবনাথ শাস্ত্রীর নারীজাতির উন্নয়ন প্রয়াস সম্পর্কে মহর্ষি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন, শুধু তাই নয় নারীজাতির উন্নতিসাধনে তাঁর ভূমিকা যথেষ্ট অগ্রণী ছিল।

আসলে, স্ত্রীস্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়ে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজের তরুণতর সদস্যদের বিরোধ বেশ কিছুদিন ধরেই ঘনিয়ে উঠেছিল। "স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীস্বাধীনতা নিয়ে নবীন সমাজে মতভেদ এমন পর্যায়ে যায় যে কেশবচন্দ্র বিরোধী দুর্গামোহন দাশ এবং অন্নদাচরণ খাস্তগীরের নেতৃত্বে একটি দল পৃথক উপাসনাগৃহে প্রকাশ্যে স্ত্রী-পুরুষের সমবেত উপাসনা শুরু করেন।"[৮১] এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পাওয়া যায় রাজনারায়ণ বসুর জবানীতে : "১৮৭২ সালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য স্ত্রীস্বাধীনতার বিষম পক্ষ কতকগুলি ব্রাহ্ম সমাজমন্দিরে যে পর্দ্দার ভিতরে স্ত্রীলোকেরা বসিতেন সেই পর্দ্দার বাহিরে আপনাদিগের বাটীর স্ত্রীলোকদিগকে বসাইবার অধিকারের জন্য সমাজমন্দিরের অধ্যক্ষদিগের নিকট আবেদন করেন; কিন্তু অধ্যক্ষেরা সম্মত না হওয়াতে উক্ত সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ রহিত করিয়া বাহির হইয়া পড়েন। এই দলের নেতা ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীর, দুর্গামোহন দাশ, রজনীনাথ রায়

৭৭ তদেব।
৭৮ তদেব, পৃ: ১১৬।
৭৯ Meredith Borthwick, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৯৫।
৮০ শিবনাথ শাস্ত্রী, *আত্মচরিত*, পূর্বোক্ত, পৃ: ১২৪।
৮১ তৃপ্তি চৌধুরী ও সুজাতা মুখোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবন ও মনন : একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ৩৭এ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩, মে, ১৯৯৯, পৃ: ৯৫।

প্রভৃতি ছিলেন এবং ইঁহাদিগের সহিত দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীও যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরামর্শমতে আমি দিনকতক এই নূতন সমাজের আচার্য্যের কার্য্য করি। ... নূতন সমাজে আমার অব্যবহিত সম্মুখে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির আকারে স্ত্রীলোকেরা বসিতেন, তাহার পেছনে পুরুষেরা বসিতেন। বহুবাজারে একটা ভাড়াটিয়া বাড়ীতে প্রতি রবিবারে ঐ সমাজ হইত। স্ত্রীলোকেরা সমস্বরে গান করিতেন। বরিশালের নিকটস্থ লাখুটিয়ার জমিদারবাবু রাখালচন্দ্র রায়ের প্রথম সহধর্মিণী প্রধান গায়িকা ছিলেন। তিনি ধর্মপরায়ণা স্ত্রীলোক ছিলেন।"[৮২] শিবনাথ শাস্ত্রী নিজ আত্মজীবনীতে[৮৩] একই ঘটনার উল্লেখ করে বলেছেন : "আমার বন্ধু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই স্ত্রী-স্বাধীনতা পক্ষের প্রধান নেতা হইলেন। তাঁহার সঙ্গে অনেকদিন আমি এক পরিবারে বাস করিয়াছিলাম। হৃদয়ে হৃদয়ে একটা প্রীতির যোগ ছিল। আমি তাঁহাদের স্ত্রী-স্বাধীনতা দলের একজন পাণ্ডা হইলাম না বটে, কিন্তু তাঁহাদের সহিত আমার মনের যোগ ছিল। স্ত্রীলোকদিগকে বাহিরে বসিতে দিতে আমার আপত্তি ছিল না। বরং, যখন তাঁহারা বসিতে চাহিতেছেন, তখন বসিতে দেওয়া উচিত, এই মনে করিতাম। তবে দ্বারিকবাবুর ন্যায় মনে করিতাম না যে, বাহিরে বসিতে দিলেই পরিত্রাণের পথ উন্মুক্ত হইবে।"[৮৪] দেখা যাচ্ছে যে দ্বারকানাথ স্ত্রীস্বাধীনতার প্রশ্নে যতটা সক্রিয়তা পছন্দ করতেন শিবনাথ ঠিক অতটা চাইতেন না, মেয়েরা বাইরে আসুক এ বিষয়ে তাঁর কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু দ্বারকানাথ যেমন মনে করতেন যে মেয়েদের বাইরে নিয়ে এলেই তাঁদের স্বাধীনতার প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যাবে, তেমন তিনি ভাবতেন না। তাঁর মত ছিল যে বাইরে আসার তাগিদ আসুক মেয়েদের ভিতর থেকেই। এই তাগিদ আনার জন্য প্রয়োজন মেয়েদের শিক্ষার, আর এ ব্যাপারে পুরুষদের সঙ্গে কোন প্রভেদ তাদের থাকবে না। এ নিয়ে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বহুদিন ধরেই মতবিরোধ চলছিল। শিবনাথ লিখলেন : "আশ্রমে যে মহিলা বিদ্যালয় ছিল, তাহাতে কেশববাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি অনুসারে শিক্ষা দিবার বিরোধী ছিলেন। এমন কি জ্যামিতি পড়ানো লইয়াও তাঁহার সহিত আমার তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। আমি জ্যামিতি, লজিক ও মেটাফিজিক্স্ পড়াইতে চাহিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, "এ সকল না পড়াইলে প্রকৃত চিন্তাশক্তি ফুটিবে না।" কেশববাবু বলিলেন, "এ সকল পড়াইয়া কি হইবে? মেয়েরা আবার জ্যামিতি পড়িয়া কি করিবে? তদপেক্ষা এলিমেন্টারি প্রিনসিপলস্ অব সায়েন্স মুখে মুখে শিখাও।" আমি সায়েন্স-এর মধ্যে মেন্টাল সায়েন্স আনিলাম।... আমি মুখে মুখে মেন্টাল সায়েন্স বিষয়ে ও লজিক বিষয়ে উপদেশ দিতাম, ছাত্রীরা লিখিয়া লইতেন। সে সকল নোট এখনো আমার পুরাতন ছাত্রীদের কাহারও কাহারও নিকট থাকিতে পারে। আমার প্রধান ছাত্রী ছিলেন তিনজন, রাধারানী লাহিড়ী, সৌদামিনী (যিনি পরে মিসেস বি. এল. গুপ্ত হইয়াছিলেন) ও প্রসন্ন কুমার সেনের স্ত্রী রাজলক্ষ্মী সেন। ইঁহারা সকলেই তখন বয়স্কা ও জ্ঞানানুরাগিণী,

৮২ রাজনারায়ণ বসু, *আত্মচরিত*, পৃ.পৃ: ১৯৬-১৯৭।
৮৩ শিবনাথ শাস্ত্রী, *আত্মচরিত*, পূর্বোক্ত, পৃ.পৃ: ৮৭-৮৮।
৮৪ তদেব, পৃ: ৮৮।

ইঁহাদিগকে পড়াইতে আমার অতিশয় আনন্দ হইত।"[৮৫] নারীর প্রতি এই সমদর্শিতা তখনকার প্রগতিশীলদের মধ্যেও বিরল ঘটনা। তখন নারীমুক্তি বলতে পুরুষরা যা বুঝতেন তা হল অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থা থেকে তাঁদের অর্থাৎ নারীদের কিছুটা অনুকূল অবস্থায় নিয়ে আসা। "মা ও স্ত্রীরূপে ঐতিহ্যিক ভূমিকায় মহিলাদেরকে অধিকতর ও ভালোভাবে ব্যবহার করার জন্য এবং সে সময়ের ইংরেজানুসারী ক্রমপরিবর্তনশীল ফ্যাশনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার উপযোগী এবং আধুনিকা করে তোলার উদ্দেশ্যে পুরুষরা মহিলাদের কেবল ন্যূনতম স্বাধীনতা প্রদান করেছিলেন।"[৮৬] এঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো মুষ্টিমেয় সংখ্যক ব্যক্তি ছিলেন ব্যতিক্রম। কলকারখানার শ্রমিক ও নারীদের অবস্থার উন্নতির জন্য ইংল্যান্ড ও আমেরিকাতে যে ইউনিট্যারিয়ান আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, তার দ্বারা প্রথমে রামমোহন ও তাঁর বন্ধুরা এবং পরবর্তীকালে অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, দুর্গামোহন দাশ, শিবনাথ শাস্ত্রী এমনকি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন।[৮৭]

শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্ম "প্রসিদ্ধ জয়নগর গ্রামের পূর্বপার্শ্বে অবস্থিত" মজিলপুর নামে একটি গ্রামে। তাঁর পিতামহ ছিলেন শান্ত ও সহৃদয়, পিতামহী ছিলেন প্রখর তেজস্বী। শিবনাথের পিতা শ্রীযুক্ত হরানন্দ বিদ্যাসাগর পিতার সহৃদয়তা ও মাতার তেজস্বিতা উভয়েরই উত্তরাধিকার লাভ কবেছিলেন।[৮৮] নিজের আত্মজীবনীতে শিবনাথ লিখেছেন যে তাঁর মাতামহী ছিলেন "কোমলহৃদয়া, স্বজনবৎসলা, উদার প্রকৃতি এবং সত্যপরায়ণা।" "আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, আমাতে যে কিছু ভালো আছে, তাহার অনেক অংশ তাহাকে দেখিয়া পাইয়াছি"[৮৯]— একথা বলেছেন শিবনাথ। পরবর্তীকালে শ্বশুরগৃহে ননদের দুর্ব্যবহারে তাঁর মায়ের দুরবস্থার কথা বলেছেন তিনি, বলেছেন কিভাবে প্রতিকূল পরিস্থিতি তাঁর মায়ের মধ্যে অলঙ্ঘণীয় আত্মমর্যাদার জন্ম দিয়েছিল।

"তাঁহার মর্যাদার অণুমাত্র লঙ্ঘন হইলে, তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না;লঙ্ঘনকারীকে জানিয়ে দিতেন যে, স্ত্রীলোকটির ভিতরে স্নেহের বারিধারার ন্যায় আগ্নেয়গিরির অগ্নিও আছে।"[৯০] দুটি উদাহরণ সহযোগে শিবনাথ এই আত্মমর্যাদার কথা বুঝিয়েছেন। শিবনাথের মা লেখাপড়া জানেন জেনে পাঠশালের গুরুমহাশয় যখন তাঁকে আপত্তিকর পত্র দেন তখন তিনি পুত্রকে ঐ অসচ্চরিত্র শিক্ষকের পাঠশালা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসে "গ্রামের নবপ্রতিষ্ঠিত হার্ডিঞ্জ মডেল স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলেন।" আবার যে মহিলা পুত্রকে পাশ্চাত্য প্রভাবিত

---

৮৫ তদেব।

৮৬ গোলাম মুরশিদ, *সংকোচের বিহ্বলতা,* পূর্বোক্ত, পৃ: ১০৪।

৮৭ তদেব, পৃ: ১৬।

৮৮ শিবনাথ শাস্ত্রী, *আত্মচরিত,* যত্রযত্র।

৮৯ তদেব।

৯০ তদেব, পৃ: ৯।

বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন তিনিই আবার সেন্ট জেভিয়ার্স বা বিশপ্‌স্ কলেজের সংস্কৃতের পণ্ডিত জ্ঞাতিভ্রাতাকে তাঁর ঔদ্ধত্যের জন্য শিক্ষার খোঁটা দিতে ছাড়েন না।[৯১]

কিন্তু এই তেজস্বিনী নারী স্বামী রুদ্রপ্রতাপের সামনে ছিলেন অসহায়। সমবয়স্ক আত্মীয় বালকের সঙ্গে মারামারি করার অপরাধে পিতা তাঁকে একটি চেলাকাঠ দিয়ে প্রহার করে মৃতপ্রায় করে ফেলেছিলেন। শিবনাথের মা স্বামীর হাত থেকে ছেলেকে বাঁচানোর জন্য তাঁকে স্থানান্তরে (গ্রামের যাত্রার আসরে) পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। স্বামী যে ছড়িগাছ দিয়ে পুত্রকে প্রহার করবেন বলে স্থির করেছিলেন তা পুকুরের জলে ফেলে দিয়েছিলেন কিন্তু কখনো সরাসরি স্বামীকে বারণ করতে পারেননি। বরঞ্চ স্বামীর চণ্ডমূর্তি তাঁকে যেমন ভীত করেছিল তার বর্ণনা দিয়েছেন শিবনাথ : "তখন আমার মা প্রস্তরের মূর্তির ন্যায় অদূরে দণ্ডায়মানা, সাড়া নাই শব্দ নাই, নড়া নাই চড়া নাই। বাবার সহিত চোখাচোখি হওয়াতে তিনি বলিলেন, "তুমি আমাকে দেখ কি? ছেলে মেরে ফেলতে হয় মেরে ফেল, আমি এক পা-ও নড়ব না।"[৯২] সম্ভবত মায়ের চোখের সামনে নির্মম প্রহার করে পুত্রকে মৃতপ্রায় করে তোলার মধ্যে যে নিষ্ঠুরতা আছে শিবনাথের মা তাঁর উপস্থিতিকে অনড় করে স্বামীকে সে সম্বন্ধে সচেতন করতে চেয়েছিলেন কিন্তু কর্তৃত্বপরায়ণ স্বামী তা আদপেই খেয়াল করলেন না। এইভাবে শিবনাথের পিতার মধ্যে দুর্জয় এবং নির্বিকার এক পুরুষের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়, এর বিপরীত দিকে শিবনাথের মা যেন এক নির্বিকার অসহায়ত্বের প্রতিমূর্তি।

তবে সর্বদা যে নারী এরকম অসহায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতেন তা নয়। বিপিনচন্দ্র পালের পিতা ও মাতার ভূমিকা ছিল শিবনাথের পিতা ও মাতার ভূমিকার বিপরীত। এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন স্বয়ং বিপিনচন্দ্র : "আমার ছ'বছর বয়স পর্যন্ত পিতার কাছে আমি ছিলাম একটি দেবশিশু। আমার প্রতিটি খেয়াল চরিতার্থ হত। আমার গায়ে হাত তোলা নিষিদ্ধ ছিল। যদিও মা এসব কানুন পারতপক্ষে মানতেন না কিন্তু পিতৃদেব আন্তরিক যত্নের সঙ্গে এগুলি পালন করতেন এবং মাও এর বিরুদ্ধাচরণ করলে তিনি বিরক্ত হতেন।"[৯৩] সেই কারণে, "আমাকে সর্বক্ষণ যথাসম্ভব নিজের কাছে রাখার চেষ্টা করতেন পিতা।... এখনো আমার সে দৃশ্য মনে পড়ে কেমন পিতৃদেব বসে বসে তাঁর নথীপত্র দেখতেন বা 'রায়' লিখতেন আর আমি অদূরে 'পোলোর' ভিতর বসে খেলা করিতাম।... পিতা নিজের হাতে আমাকে খাইয়ে দিতেন। একই থালায় পিতাপুত্রের আহার চলত। প্রতিদিন নিজে স্নান করিয়ে দিতেন। এবং প্রতি রাত্রে তাঁর সুরক্ষিত আলিঙ্গনের মধ্যে আমি নিদ্রা যেতাম।"[৯৪] অপরদিকে বিপিনচন্দ্রের মা ছিলেন এমন এক কাঠিন্যে গড়া ব্যক্তিত্ব যা বাঙালী সমাজ পুরুষের মধ্যে দেখতে অভ্যস্ত। পুত্র নিজেই

---

৯১ তদেব, পৃ: ১০।

৯২ তদেব, পৃ: ৩৪।

৯৩ Bipin Chandra Pal, *"Memories of my life and time,* ওই গ্রন্থের অনুবাদ শ্রীমতী শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত *আমার জীবন ও সমকাল,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৫, পৃ: ৮।

৯৪ তদেব, পৃ:পৃ: ৯-১০।

মায়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন ঃ "তিনি কঠোর নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলতেন। আমার মনে পড়ে না কি শৈশবে কি বাল্যকালে কখনো তিনি বাইরের স্নেহ প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে আমাব বাল্যে দেখা সমস্ত মায়ের থেকে তিনি স্বতন্ত্র।"[৯৫] শিবনাথের পিতার ক্রোধ যেমন অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাবোধ লুপ্ত করত, তেমনই বিপিনচন্দ্রের মাও কুপিতা হলে পুত্রকে কোন কারণ অনুসন্ধান না করেই প্রহার করতেন। বিপিনচন্দ্রের লেখায় এরকম বিবরণ পাওয়া যায় : "যে সময় আমরা কোটের হাট ছেড়ে সিলেট টাউনে স্থায়িভাবে বাস করতে এলাম তখন প্রতিবেশী বালবৃদ্ধের সঙ্গে আমার ফলতঃ যথেষ্ট ঝগড়াবিবাদ হত। আর কমজোরী ছিলাম, তাই মারধোরও খেতাম মন্দ নয়। আমার দুর্ভাগ্য দ্বিগুণ হত যখন এই ধরনের কোনো ঝগড়ার সংবাদ মায়ের কানে পৌঁছাতো — সাধারণত পৌঁছেও যেত বটে। মা একবারও তার কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন বোধ করতেন না; ঠিক বেঠিক দেখতেন না।"[৯৬]

বিপিনচন্দ্র ও শিবনাথের মায়ের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য যতই থাক, উভয়েই ছিলেন তেজস্বিনী ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, দুই পুত্রই তাঁদের মায়েদের এই গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে এই সমস্ত গুণের কথা নিজ নিজ আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। কিভাবে গ্রামের কলুষময় পরিবেশে একাকী রমণী সংসারযাত্রা নির্বাহ করে পুত্রের চরিত্র ও শিক্ষার ভিত তৈরী করেছিলেন তা আগেই বলা হয়েছে। বিপিনচন্দ্রও তাঁর আত্মজীবনীতে মার উন্নত চরিত্রের একটি উজ্জ্বল ছবি অঙ্কন করেছেন। তাঁর অর্থাৎ বিপিনচন্দ্রের মায়ের সংসার জীবন আর পাঁচজন মেয়ের মতো শুরু হয়নি। তিনি ছিলেন তাঁর স্বামীর দ্বিতীয়া পত্নী। প্রথম পত্নী সন্তানহীনা ছিলেন এবং সন্তানহীনতার দায়ভাগ তাঁর — একথা মেনে নিয়ে স্বামীর জন্য নিজেই পছন্দ করে দশ এগার বছরের বালিকাকে সপত্নীরূপে নিয়ে আসেন। যদিও স্বামীর সঙ্গে মধ্যেমধ্যেই তাঁর মতপার্থক্য হতো তবুও তিনি সপত্নীর সঙ্গে কখনোই দুর্ব্যবহার করেন নি বরঞ্চ "তিনি সব সময়ই অত্যন্ত স্নেহশীলা এবং সহানুভূতিপূর্ণ ছিলেন। এমনকি কখনই রাগতঃ দৃষ্টি বা কটুবাক্যও প্রয়োগ করেননি।"[৯৭] তবুও সপত্নীগৃহে বিবাহ হওয়াতে এবং সপত্নী ঘরের কর্ত্রী হওয়াতে ("যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন পিতার গৃহস্থালীর কর্ত্রী ছিলেন আমার বিমাতা"[৯৮]) তাঁকে আত্মসংযম অভ্যাস করতে হয়েছিল পাছে সপত্নীর সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটে। পরিণত বয়সের স্মৃতিচারণেও যখন শিবনাথ ও বিপিনচন্দ্র মায়েদের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন তখন অনুমান করা কঠিন নয়, তাঁরা সমস্তজীবন এই চরিত্র ধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন।

৯৫ তদেব, পৃ: ১০।

৯৬ তদেব।

৯৭ তদেব, পৃ:পৃ: ৪-৫।

৯৮ তদেব, পৃ: ১২।

কষ্টসহিষ্ণু মা অসীম কৃচ্ছ্রসাধনে একাকিনী সংসার প্রতিপালন করছেন এরকম চিত্র ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে বিরল নয়। ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের জীবনী[৯৯] লিখতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী লিখেছেন কিভাবে তাঁর অকালবিধবা শাশুড়ী ঘোর বিপদের মধ্যেও পুত্রদের মানুষ করে তুলেছিলেন। "পূজনীয়া শ্বশ্রূদেবীর মুখে শুনিয়াছি, আমার শ্বশুরমহাশয়ের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না, বিবাহের পর অল্প কয়েক বৎসর মাত্র তিনি জীবিত ছিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে বহুদিন রোগশয্যায় পড়িয়া ছিলেন; নিজের যাহা কিছু সঞ্চয় ছিল সব ফুরাইয়া গেল, তাহার পর বাড়ীতে কয়েকটি ভাল আমগাছ ছিল তাহাও বিক্রয় করিতে হইল, — ঘটী, বাটী, তৈজসপত্র যাহা কিছু সঞ্চয় ছিল সব ফুরাইয়া গেল, তিনি মৃত্যুর সময় জীর্ণ কুটীরখানি ছাড়া আর কিছুই রাখিয়া যান নাই। মা দুইটি শিশুসন্তান লইয়া কুড়ি বৎসর বয়সে অকূলসাগরে ভাসিলেন।"[১০০] এই অকূলসাগর কিভাবে তাঁর শ্বশ্রূমাতা সহায়সম্বলহীন অবস্থায় পাড়ি দিয়েছিলেন তাঁর বিবরণ দিয়েছেন তাঁর পুত্রবধূ : "...চরিত্রের অপূর্ব তেজস্বিতা ও নির্ভীকতাই তাঁহাকে নানা বিপদ ও পরীক্ষার সহিত সংগ্রাম করতে সমর্থ করিয়াছিল, কোনও দিন একাহার, কোনও দিন বা উপবাস, এইরূপ চলিতে লাগিল। ঘরখানির অবস্থা এইরকম যে বেড়াখানি কোনওরূপে আছে; একটু জোরে আঘাত করিলেই বুঝি পড়িয়া যায়; কোনও কোনও স্থানে আবার চট দিয়া ঢাকা। সেইসময়ে পাবনা এখনকার শহর ছিল না। আশেপাশে চারিদিক জঙ্গলে পূর্ণ ছিল; রাত্রিতে আঙিনায় বাঘ আসিত। মা দুই পাশে দুটি শিশুপুত্রকে লইয়া শয়ন করিতেন। একদিন শেষরাত্রিতে সেই ভাঙ্গা বেড়ার পাশে বসিয়া বাঘ গর্জন করিতেছিল; সেই গর্জনে ছেলেদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, এবং তাহারা ভয়ে মাকে জড়াইয়া ধরিল। মা ছেলেদিগকে মুখে আশ্বাস দিলেন "ভয় কি? কোনও ভয় নাই", এবং মনে মনে বিপদভঞ্জন হরিকে ডাকিতে লাগিলেন। বাঘ কিছুক্ষণ ডাকিয়া ডাকিয়া চলিয়া গেল। বুঝি, এরূপ নিঃসহায় অবস্থা দেখিয়া হিংস্র ব্যাঘ্রের প্রাণেও দয়া হইয়া থাকিবে।"[১০১]

হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতা শ্রীমতী সোনামণি অকালে স্বামীকে হারানোর পর অসীম দারিদ্র্য দুঃখ সহ্য করে পুত্রকে প্রতিপালন করেছিলেন।[১০২] পুত্রের হিতের জন্য তিনি যে দৃঢ়তা অবলম্বন করেছিলেন তার উদাহরণ সহজে মেলে না। একবার শিশু গুরুদাস আম খাবার বায়না ধরলে সোনামণিদেবী তা কিছুতেই তাকে দিলেন না কারণ "এই বায়নার উপর আঁবটি দিলেই দিন দিন ভয়ানক আবদারে হয়ে উঠবে তখন কোথায় পাব? আজ দিব না, কাল দিব, না হলে বিকালে দিব কিন্তু এখন দিব না।"[১০৩] আবার, স্যার

৯৯ ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য : জীবনপ্রসঙ্গ ও উপদেশাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, প্রথম সংস্করণ ১৯৩৬, সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৭৩। প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের জন্ম ১৮৬১ সালের ২৫শে আগষ্ট পাবনা জেলায়।

১০০ তদেব, পৃ: ২।

১০১ তদেব, পৃ:পৃ: ২-৩।

১০২ *Reminiscences, Writings and Speeches of Sri Gooroo Das Banerjee,* Complied by M. C. Banerjee, এর অন্তর্বর্তী স্বর্গীয় সোনামণি দেবীর জীবনচরিত।

১০৩ তদেব, পৃ: ৫।

গুরুদাস কিছুতেই 'ক' অক্ষরটি ঠিক করে লিখে উঠতে পারছিলেন না, শ্রীমতী সোনামণি দেবী স্থির করলেন "যত বেলাই হউক ঠিক করিয়া 'ক' লিখতে না পারিলে পুত্রকে কিছুই খাইতে দিবেন না। অনেক বেলায় অনেক চেষ্টার পর ঠিক করিয়া 'ক' লিখিয়া মাতাকে দেখাইলেন এবং খাইতে পাইলেন।"[১০৪]

এই ধরনের সুমাতার সন্তানরা স্বভাবতই মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ হবেন এবং সমাজ সংস্কারে ব্রতী হয়ে নারীজাতির উন্নয়ন প্রয়াসে আগ্রহী হবেন। তবে, এঁদের মায়েরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছিলেন পল্লীবাসী হিন্দুরমণী, যাঁরা হিন্দুধর্মের ও সমাজের রীতিনীতি মেনে চলতে পছন্দ করতেন। শ্রীমতী সোনামণি দেবীকে গ্রামবাসিনী বলা যায় না কারণ তিনি ছিলেন কলিকাতার নারকেলডাঙ্গা নিবাসিনী, কিন্তু তবুও তিনি হিন্দুধর্মের রীতিনীতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। গৃহের বাইরে পারতপক্ষে জলপান না করতে পুত্রকে তিনি আদেশ দিয়েছিলেন।[১০৫] তিনি "পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের শিশুপালন নীতি-বিবরণ কখনও অবগত ছিলেন না; কিন্তু স্বভাবগুণে আপনাআপনি সেগুলি তাঁহার উচ্চচরিত্রে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছিল। বধূমাতাদের কেহ কখন পুত্রকন্যা শাসনকালে "মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব" বলিলেই তিনি বলিতেন, "কখনও অমন অন্যায় ও অসভ্য কথা বলিও না। তুমি ত ওর একখানি হাড়ও ভাঙ্গিবে না, তবে বল' কেন? ছেলের কাছে তোমার কথার মর্যাদা থাকিবে না। এতেই মিথ্যা বলার অভ্যাস প্রবল হইয়া পড়িবে। নানা রকমে অনিষ্ট হইবে। যাহা করিবে না, তাহা বলিও না।"[১০৬] ঐতিহ্যানুসারী প্রবীণতার মধ্যে আধুনিকতার এহেন স্বচ্ছন্দ প্রকাশ বিস্ময়ের উদ্রেক করতেই পারে।

১০৪ তদেব।

১০৫ তদেব, পৃ: ১০।

১০৬ তদেব, পৃ: ১৫।

নবপ্রজন্মের দৃষ্টিকোণ

হিন্দু ঐতিহ্য অনুসারে কেশবচন্দ্রের পরবর্তী ব্রাহ্মযুবকদের অনেকেরই বাল্যবিবাহ হয়েছিল। বিয়ের পরে কলকাতায় পড়বার বা কাজের জন্য এসে এঁরা পাশ্চাত্য প্রভাবাধীন হয়েছিলেন এবং জীবনের প্রতি, বিশেষভাবে নারীজাতির প্রতি এঁদের দৃষ্টিভঙ্গীও পরিবর্তিত হয়েছিল উল্লেখযোগ্যভাবে। শিবনাথ শাস্ত্রী পড়াশোনার জন্য ১৮৫৬ সালে কলকাতায় আসেন, ১৮৫৭ সাল নাগাদ তিনি বৌবাজার অঞ্চলের জেলিয়াপাড়াতে একটি ভাড়াবাড়ীতে বসবাস করতেন।[১০৭] "এই জেলিয়াপাড়ার বাসায় থাকিতে থাকিতে আমার প্রথমবার বিবাহ হয়। সাল তারিখ মনে নাই, তখন ঠিক কত বয়ঃক্রম ছিল, তাহাও স্মরণ নাই, ১২/১৩ বৎসরের অধিক হইবে না।"[১০৮] বিয়ের পাত্রী রাজপুর গ্রাম নিবাসী নবীন চন্দ্র চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রসন্নময়ী। "প্রসন্নময়ীর বয়ঃক্রম তখন দশ বৎসরের অধিক হইবে না।"[১০৯] এই বিবাহের সম্বন্ধে আরও উল্লেখ্য যে "আমাদের দাক্ষিণাত্য বৈদিকদিগের কুলপ্রথা অনুসারে প্রসন্নময়ীর বয়ঃক্রম যখন একমাস ও আমার বয়ঃক্রম যখন দুই বৎসর, তখন তাঁহার সহিত আমার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল।"[১১০] বালক শিবনাথের বিবাহ পরবর্তী আচরণ অতি কৌতুককর। নববিবাহিত বালক বর বালিকা বধূ নিয়ে বাড়ী ফিরছে, "মেয়েটি ঘোমটা দিয়া সম্মুখে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। হাত পা ছড়াইতে পারি না, কিছু বলিতে পারি না, মহা বিপদ।"[১১১] কিন্তু স্বাভাবিকভাবে শিবনাথ শাস্ত্রীব মন ছিল সহানুভূতিশীল। বাল্যাবস্থায়ও তার প্রকাশ ঘটত। পথিমধ্যে একজায়গায় পালকী থামানো হল। সেটি ছিল একটি পোড়ো বাগান। শিবনাথ বাইরে বেরিয়ে হাত পা ছড়িয়ে শারীরিক জড়তা কাটাতে কাটাতে দেখতে পেলেন গাছে লিচু পেকে রয়েছে। বালকসুলভ চাঞ্চল্যবশত গাছে উঠে লিচু খেতে খেতে মনে হল "মেয়েটি একা বসে আছে, তারও খিদে পেয়েছে, তাকে গোটাকতক লিচু দিই। এই ভাবিয়া কতকগুলি লিচু লইয়া প্রসন্নময়ীর অঞ্চলে ফেলিয়া দিয়াই দৌড়। যদি কেহ দেখিতে পায়।"[১১২] এই সহৃদয়তার সঙ্গে যতখানি সৌজন্য আর অস্বস্তিকর পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা আছে প্রকৃত সহমর্মিতা বা ভালবাসা ততটা নেই, আর তা থাকতেও পারে না, কারণ এরপরেই শিবনাথের স্মৃতিচারণে দেখা যাচ্ছে যে তখন তাঁর পোষা কুকুর রবার্ট ওরফে রবা তাঁর পত্নী প্রসন্নময়ী অপেক্ষা বহুগুণে প্রিয়। তাই পালকী থেকে নেমেই শিবনাথ দৌড়ে রবাকে দেখতে গেলেন, পেছনে পড়ে রইল তাঁর নবোঢ়া পত্নী আর মঙ্গলাচরণের যাবতীয় উপাচার।[১১৩]

১০৭ শিবনাথ শাস্ত্রী, *আত্মচরিত*, পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ২৭-২৮।
১০৮ তদেব, পৃ:পৃ: ৩১-৩২।
১০৯ তদেব, পৃ: ৩২।
১১০ তদেব।
১১১ তদেব।
১১২ তদেব।
১১৩ তদেব, পৃ: ৩৩।

শিবনাথের স্মৃতিকথায় বাল্যবিবাহের যে চিত্র বিধৃত হয়েছে তাতে বালকসুলভ চঞ্চলতার ফাঁকে অত্যল্প পরিমাণে হলেও স্নেহ ও দরদ মিশে ছিল। কিন্তু সকল বালিকা বধূই যে প্রসন্নময়ীর মত ভাগ্যবতী ছিলেন না তা বোঝা যায় ব্যারিষ্টার দুর্গামোহন দাশের পত্নী ব্রহ্মময়ীর জীবনালেখ্য[১১৫] থেকে। ১৮৪৫ সালে বিক্রমপুর তেলীরবাগ নিবাসী কাশীশ্বর দাস মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র দুর্গামোহন দাশের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। এই বিবাহের একটি চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য হল যে কাশীশ্বরবাবুর ইচ্ছা ছিল যে "বালক বর ও বালিকা বধূর ক্রীড়া দেখিয়া কৌতুক বোধ করিবেন..."[১১৬] তখন অবশ্য এই মনোভাব আদৌ ব্যতিক্রম ছিল না। বিবাহের সময় কন্যার বয়স ছিল চার বছর আর পুত্রের বয়স ছিল নয়। কিন্তু বালক দুর্গামোহন তাঁর বালিকা পত্নী ব্রহ্মময়ীর ওপর অত্যাচার করতেন আর আদৌ ঐ বালিকাটির প্রতি তাঁর কোন অনুরাগ ছিল না। কিন্তু দুর্গামোহন যখন কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে আসেন তখন ইতিহাসের অধ্যাপক এডওয়ার্ড কাউএলের সংস্পর্শে আসেন।[১১৭] কাউএলের প্রভাবে তিনি খৃষ্টধর্মের প্রতি আসক্ত হলেন এবং তখন বুঝতে পারেন যে পত্নীর, তিনি যতই অমনোনীতা হন, প্রতি সদাচরণ করা কর্তব্য। তখন থেকে ব্রহ্মময়ী তাঁর স্বামীর ভালবাসার অধিকারিণী হলেন।[১১৮]

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা জেলার অন্তর্গত রায়পুরা থানার আকানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শ্রীসুধারাম সেন ও শ্রীমতী যশোদা সেনের পুত্র শ্রীমাধবচন্দ্র সেন। মাত্র চার বৎসর বয়সে ভাটপাড়ার গুপ্ত পরিবারে দত্তক রূপে গৃহীত হয়ে কালীনারায়ণ গুপ্ত নামে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর মা শ্রীমতী যশোদার সবকটি পুত্রকন্যা অকালে মারা গিয়েছিলেন, তাই কালীনারায়ণ মাঝে-মাঝেই গর্ভধারিণী মাতাকে দেখতে আসতেন। এর ওপর আবার পালয়িত্রী শ্রীমতী ভাগীরথী দেবীর অকালবৈধব্য ঘটল। বৈধব্যযন্ত্রণা ভোলবার জন্য তিনি মাত্র তের বছর বয়সে পুত্রের বিবাহ দিলেন। পাত্রীর বয়স তখন আট বছর, কন্যার পিতা মাধবরাম সেন কন্যাকে গৌরীদান করলেন।[১১৯] কালীনারায়ণের পত্নী অন্নদা ঐ বাল্যকালেই, বরঞ্চ বলা ভাল শৈশবাবস্থায়, গৃহিণীপনার ক্ষেত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন, তাই, শ্বশুরবাড়িতে তাঁকে খুব নিগৃহীতা হতে হয়নি। তদুপরি, কালীনারায়ণ যদিও তখন অল্পবয়স্ক ছিলেন, তবু তিনি স্বামীর দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং স্ত্রীকে শিক্ষাদানের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন।[১২০]

---

১১৫ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *জীবনালেখ্য*, আখ্যাপত্র বিনষ্ট।

১১৬ তদেব, পৃ: ৭।

১১৭ শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৫।

১১৮ জীবনালেখ্য, পূর্বোক্ত, পৃ: ৭।

১১৯ শ্রী বঙ্কুবিহারী কর, ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্তের জীবন বৃত্তান্ত, কলিকাতা, ১৩৩১, পৃ:পৃ: ১-৮।

১২০ তদেব, পৃ: ৯।

শিবনাথ শাস্ত্রী বা কালীনারায়ণ গুপ্তের মতো ব্যক্তিরা যদিও নিজ প্রকৃতি ধর্ম অনুসারে মেয়েদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, তবুও কলকাতায় এসে তাঁদের চরিত্রের এই দিকটি আরো বিকাশিত হয়েছিল। কোন কারণে শিবনাথের পিতা তাঁর প্রথম পুত্রবধূ প্রসন্নময়ী ও তার বাড়ীর লোকের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে পুত্রের আবার দ্বিতীয়বার বিবাহ দেবেন। শিবনাথ নিজেই বলেছেন : "প্রসন্নময়ীর প্রতি তখন আমার যে বড় ভালবাসা ছিল, তাহা নহে। তবে তাঁহার ও তাঁহার বাড়ির লোকের সামান্য অপরাধে তাঁহাকে গুরুতর সাজা দেওয়া হইতেছে, ইহা অনুভব করিয়াছিলাম।"[১২১] কিন্তু দোর্দণ্ডপ্রতাপ পিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নিষ্ফল হল। ১৮৬৫ কি ১৮৬৬ সালে বর্ধমান জেলার দেপুর নামক গ্রামের অভয়াচরণ চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠাকন্যা বিরাজমোহিনীর সঙ্গে শিবনাথের দ্বিতীয়বার বিবাহ সম্পন্ন হল। এই বিবাহের পরেই শিবনাথ দারুণ অনুতপ্ত হলেন। মানসিক গ্লানির এই অবস্থাতে উমেশচন্দ্র দত্ত তাঁকে থিওডোর পার্কারের 'টেন্ সারমান্স্ অ্যান্ড প্রেয়ার্স' বইটি পাঠিয়ে দিলেন। এরপরই শিবনাথের মানসিক পরিবর্তনের সূচনা হল : "পার্কারের প্রার্থনাগুলি যেন আমার চিত্তে নবজীবন আনিল। আমি প্রতিদিন রাত্রে শয়নের পূর্বে একখানি খাতাতে একটি প্রার্থনা লিখিয়া পাঠ করিয়া শয়ন করিতে লাগিলাম। কেবল তাহাই নহে, দিনের মধ্যে প্রত্যেক দশ-পনরো মিনিট অন্তর ঈশ্বর স্মরণ করিতাম ও প্রার্থনা করিতাম।"[১২২] এই সময় থেকেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে যেতে শুরু করলেন। এবারও তাঁর পিতা তাঁকে নিষেধ করলে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, "বাবা, আপনি জানেন আপনার আজ্ঞা কখনো লঙ্ঘন করি নাই। আপনার সকল আজ্ঞা পালন করিতে রাজি আছি। কিন্তু আমার ধর্মজীবনে হাত দিবেন না। আমি ব্রাহ্মসমাজের উপসনাতে যাওয়া ত্যাগ করিতে পারিব না।"[১২৩]

ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের পর থেকেই শিবনাথ শাস্ত্রী ক্রমশঃ সমাজসংস্কারের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধনেই তাঁর মন বেশী নিবদ্ধ হয়েছিল। প্রথমেই তিনি তাঁর প্রথমা পত্নী "নিরপরাধ প্রসন্নময়ীর প্রতি যে অন্যায়াচরণ হইয়াছে..." তার প্রতিবিধান করবার জন্য প্রসন্নময়ীকে মামাবাড়ীতে নিয়ে আসেন, প্রতি শনিবার তিনি সেখানে যেতে লাগলেন। পুত্র এভাবে তাঁর পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জেনে শেষপর্যন্ত শিবনাথের পিতা প্রসন্নময়ীকে নিজগৃহে ফিরিয়ে নিলেন। শুধু তাই নয়, বন্ধু যোগেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিপত্নীক হয়ে পুনরায় বিবাহ করতে ইচ্ছুক হলে তিনি তাঁকে বিধবাবিবাহ করতে রাজী করান এবং অপর বন্ধু ঈশানচন্দ্র রায়ের বিধবা ভগ্নী মহালক্ষ্মীর সাথে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন করেন। এই বিবাহের ফলে যেমন যোগেন্দ্রকে তেমন শিবনাথকে প্রচুর পারিবারিক নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হল। শিবনাথের পিতা পুনর্বার ভয় দেখালেন যে প্রসন্নময়ীকে তিনি গৃহ থেকে বিতাড়িত করবেন। অপরদিকে যোগেন্দ্রকেও তাঁর মাতা ও অপর আত্মীয়রা মহালক্ষ্মীকে ত্যাগ করে অপর একটি বালিকাকে

১২১ শিবনাথ শাস্ত্রী, *আত্মচরিত*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৮।
১২২ তদেব, পৃ:পৃ: ৪৯-৫০।
১২৩ তদেব. পৃ: ৫১।

বিবাহ করার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করলেন। এমতাবস্থায় শিবনাথ সেখানে হস্তক্ষেপ করেন এবং যোগেন্দ্রের মাতাকে নিরস্ত করেছিলেন।[১২৪] মহালক্ষ্মীর সঙ্গে শিবনাথের এই সূত্র ধরে যে সখ্য স্থাপিত হয়েছিল তা দুটি অনাত্মীয় নারী পুরুষের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে অত্যন্ত ব্যতিক্রমী ঘটনা। মহালক্ষ্মীকে লেখাপড়া শিখিয়ে এবং তাঁর সঙ্গে ধর্মালোচনা করে শিবনাথ যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন, ঠিক সেইরকম বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল কেশবচন্দ্রের পত্নী জগন্মোহিনী দেবীর সঙ্গে, শিবনাথ যখন ভারত আশ্রমে বাস করতে গেলেন। এ বিষয়ে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁকে দেখিয়েছিল যে কিভাবে পুরুষের কর্তৃত্বের দম্ভ নাবীর ইচ্ছা ও মর্যাদাকে অবদমিত করে রাখে। তাই ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কখনো মেযেদের অমর্যাদা করার চেষ্টা করেননি।

ধর্মীয় প্রভাব কিভাবে সামাজিক ও পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন নিয়ে আসে দুর্গামোহন দাসের জীবনীতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কাওএল সাহেবের প্রভাবে তিনি খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। সে আকর্ষণ এতটাই ছিল যে ১৮৬২ সালে যখন তিনি ময়মনসিংহে ওকালতি করাব সিদ্ধান্ত নেন তখন স্ত্রী ব্রহ্মমযী দেবীকে এক খ্রীষ্টান ধর্মযাজকের বাড়ীতে তিনি রেখে দিয়েছিলেন। এর জন্য দাস দম্পতিকে সমাজচ্যুত হতে হয়েছিল। এই সামাজিক নির্যাতনের জের অনেকদিন পর্যন্ত তাঁদের পোহাতে হয়েছিল। এই সময় দুর্গামোহন বরিশালে সরকারি উকিল নিযুক্ত হলেন। ব্রহ্মময়ী তাঁর সদ্যজাত কন্যাকে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে পৃথক সংসার পাতলেন। কিন্তু এখানেও তাঁদের খৃষ্টান সহবাসের কথা পৌঁছল এবং পরিণামে অশেষ সামাজিক নির্যাতন সহ্য করতে হল।[১২৫] কিন্তু ওকালতিতে প্রভূত প্রসার হওয়ায় দাশ দম্পতি যে আর্থিক প্রতিপত্তির অধিকারী হলেন তা তাঁদের আবার সমাজে প্রতিষ্ঠিত করল।

দুর্গামোহন ব্রহ্মময়ীর দাম্পত্য জীবন অভিনবত্বের দাবী করতে পারে। কারণ শুধু এই নয়, তাঁদের দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে ওঠা-পড়া ছিল। কারণ, তাঁদের দেখা গেছে, প্রথমে স্ত্রীর প্রতি বীতরাগ হলেও পরে কর্তব্য বুদ্ধির উন্মেষ দুর্গামোহনকে স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত করে তুলেছিল। এই অনুরক্তি যে তাঁদের নিজস্ব একান্ত নীড় স্থাপনে ফলপ্রসূ হয়েছিল তা নয়, তাঁরা নিজেদের সামাজিক নির্যাতনের অভিজ্ঞতাকে সমাজসেবাতে পরিণত করেছিলেন। তাই, দেখতে পাই যে, ব্রহ্মময়ী নিরন্ন ব্যক্তিদের অন্নদান করতে ও নির্ধন বালকদের শিক্ষাদানে অকাতরে অর্থব্যয় করেছিলেন। শুধু তাই নয় বিধবাদের দুরবস্থার প্রতি তাঁব সমবেদনা অসমসাহসিক কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছিল। পুলিশের সাহায্য নিয়ে তাঁরা দুটি বিধবা কায়স্থ কন্যার বিবাহ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, ব্রহ্মময়ী নিজে ঐ বিবাহ দুটিতে স্ত্রী আচার সম্পাদন করেন।[১২৬]

দুর্গামোহন ও ব্রহ্মময়ীর পারিবারিক জীবনের বিবর্তন আরো অনেক বাকী ছিল। খ্রীষ্টান পাদ্রীর কাছে স্ত্রীকে রাখার অপরাধে যখন তাঁদেব একঘরে হতে হয়েছিল তখন দুর্গামোহনের

১২৪ তদেব, পৃ:পৃ: ৫৪-৫৮।

১২৫ *জীবনালেখ্য*, পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ৯ ১৩।

১২৬ তদেব, পৃ:পৃ. ১৯ ২২।

জ্যেষ্ঠভ্রাতা কালীমোহন দাশ মহাশয় বরিশালে ওকালতি করতেন। তিনি নিজ ভ্রাতা দুর্গামোহনকে বরিশালে ডেকে নিলেন এবং তাঁকে থিওডোর পার্কারের বই পড়তে দিলেন। এই বই দুর্গামোহনকে খ্রীষ্টধর্মের দিক থেকে "উদার, আধ্যাত্মিক ও সার্বভৌমিক একেশ্বরবাদ"-এর পথে নিয়ে গেল। এ থেকেই দুর্গামোহনের চিত্ত ব্রাহ্মধর্মের দিকে আকৃষ্ট হল। দুর্গামোহন বরিশালে গিয়ে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য উৎসাহী হলেন। শুধু তাই নয়, কলকাতা থেকে ব্রাহ্ম প্রচারক নিয়ে গিয়ে তাঁদের সাহায্যে ব্রাহ্মদের পত্নীদের শিক্ষিত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। "অচিবকালের মধ্যে বরিশাল ধর্ম ও সমাজসংস্কারের একটি কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার স্বর্গীয়া পত্নী ব্রহ্মময়ী সকল কার্যে তাঁহার সহায় ও উৎসাহদায়িনী হইয়া উঠিলেন।"[১২৭] লাখুটিয়ার জমিদার পরিবার যখন ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী হল তখন যে তুমুল বিবোধিতা ঐ পরিবারকে সহ্য করতে হয়েছিল সেই পরিপ্রেক্ষিতে ব্রহ্মময়ী ঐ পরিবারের মেয়েদের প্রতি বিলক্ষণ সদ্ব্যবহার প্রদর্শন করেছিলেন।[১২৮]

এই সময় দুর্গামোহন দাশ আরেকটি অসমসাহসিক কাজ করলেন, যা বরিশালকে তো বটেই কলকাতাকেও তোলপাড় করে তুলল। ঘটনাটি এইরকম যে পূর্ববঙ্গে কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তি স্বাক্ষর করে এই প্রতিজ্ঞাতে বদ্ধ হয়েছিলেন যে তাঁরা নিজেদের স্থানে ও বন্ধুদেব মধ্যে হিন্দুবিধবাদের পুনর্বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করানোর চেষ্টা করবেন। এঁদের সবার থেকে এগিয়ে গিয়ে দুর্গামোহন স্থির করলেন যে তিনি তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে তাঁর বিধবা বিমাতার বিবাহ দেবেন। এই সঙ্কল্প প্রকাশ পেলে তাঁর আত্মীয়স্বজনরা এমন অস্থির হয়ে উঠলেন যে তাঁরা ঐ মহিলাকে কৌশলে চুরি করে কাশীধামে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু দুর্গামোহনের বিমাতা কোনভাবে সপত্নীপুত্রকে জানিয়েছিলেন যে তিনি পুত্রের বন্ধুর প্রতি অনুরক্তা। তখন চোরের ওপর বাটপাড়ি করে অনেক ব্যয় ও কৌশলে বিমাতাকে কাশী থেকে চুরি করে এনে বিদ্যাসাগরের সাহায্যে বিবাহ দেওয়া হল।[১২৯] এই অভূতপূর্ব কাজ সমস্ত বাংলাদেশে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল। প্রবল আর্থিক ও সামাজিক নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছিল সস্ত্রীক দুর্গামোহনকে। বহুদিন পর্যন্ত দুর্গামোহন সরকারী মামলা ছাড়া আর কোন মোকদ্দমা পাননি। রাস্তায় বেরোলেই তাঁর গায়ে ধুলা নিক্ষেপ করা হত আর কটূক্তি বর্ষণ তো ছিলই। কিন্তু তাঁর থেকেও বেশী অসহায় অবস্থা ছিল ব্রহ্মময়ী দেবীর। কারণ, দুর্গামোহনের একটি বহির্জগৎ ছিল যেখানে তিনি সমমনস্ক ব্যক্তিদের সাহচর্য পেতেন, "কিন্তু ব্রহ্মময়ী রাত্রিদিন গৃহ পরিবারে আবদ্ধ থাকিতেন; পাড়ার লোকের সমালোচনা শুনিতেন, এবং আত্মীয়া মহিলাগণের গঞ্জনা সহ্য করিতেন।"[১৩০]

১২৭ *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, পূর্বোক্ত. পৃ: ৪৪৭।

১২৮ *জীবনালেখ্য*, পূর্বোক্ত. পৃ:পৃ: ২৫-২৮।

১২৯ *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ৪৪৭-৪৪৮।

১৩০ তদেব, পৃ: ৪৪৮।

দুর্গামোহন ও ব্রহ্মময়ীর দৃষ্টান্ত ও প্ররোচনাতে বরিশালে নব্যযুবকদেব মধ্যে বিশেষত তাদের স্ত্রীদের মধ্যে উন্নতিস্পৃহা ও সৎসাহস প্রচুর পরিমাণে দেখা দিয়েছিল। এর একটি নিদর্শন হল এই যে পূর্বোল্লিখিত লাখুটিয়ার জমিদাব শ্রী বাজচন্দ্র রায়ের পুত্ররা পত্নীদের সঙ্গে নিয়ে স্থানীয় কমিশনাব সাহেবেব ভবনে আহার করতে গেলেন। "ইহার পূর্বে ইংরাজের গৃহে খানা খাওয়া দূরে থাক বাঙ্গালি সম্ভ্রান্ত ভদ্রগৃহের কুলাঙ্গনারা কোনও দিন অন্তঃপুরের বাহিরে আসেন নাই। এই অসমসাহসিক কার্য করাতে বরিশাল সহর, কেবল বরিশাল কেন সমস্ত বঙ্গদেশ, আন্দোলিত হইয়া যাইতে লাগিল।... ইহার পর বরিশালে দিন দিন বিভিন্ন জাতীয়দিগের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে লাগিল। বরিশাল তপ্ত খোলার মত হইয়া উঠিল।"[১৩১] এই ভোজসভায় দুর্গামোহন দাশের সঙ্গে ব্রহ্মময়ীরও নিমন্ত্রণ ছিল। কিন্তু ইংবাজ আদব কায়দা জানা না থাকায় ব্রহ্মময়ী সেখানে যেতে রাজী হননি অথচ তাঁর যে প্রকাশ্য জায়গায় যেতে আপত্তি ছিল তা নয়, কারণ তিনি বরিশালে ব্রাহ্মমন্দিরে উপাসনা করতেন আর কলিকাতায এসেও তিনি উপাসনা সভায় প্রকাশ্যে যোগ দিয়েছিলেন।[১৩২] পৈতৃক পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে দুর্গামোহন ও ব্রহ্মময়ী শুধু যে নিজেদের পৃথক পরিবার গড়ে তুলেছিলেন তা নয় তাঁরা সমাজসংস্কারের নানা কাজে বিশেষত নারীদের দুঃখ মোচনে ও উন্নতিকল্পে নানা প্রকার প্রয়াস নিয়েছিলেন। এ বিষয়ে শীঘ্রই কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে দুর্গামোহন দাশ ও তাঁর বন্ধুদের প্রভেদ স্পষ্ট হয়েছিল।

১৮৭০-৭১ সালে হাইকোর্টে ওকালতি করবার জন্য দুর্গামোহন সপরিবারে কলকাতা চলে এলেন। এখানে এসে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটল 'অবলাবান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের। দ্বারকানাথ ইতিমধ্যেই "নারীজাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতা বিষয়ে আন্দোলনে প্রবৃত্ত" হয়েছিলেন। এঁর সঙ্গে ছিলেন রজনীনাথ রায়, যিনি পরে ডেপুটি কন্ট্রোলার জেনারেল হয়েছিলেন, এবং একদল ব্রাহ্ম যুবক। "ইঁহারা দুর্গামোহন দাশকে পাইয়া, খোঁটার জোরে মেড়ার ন্যায়, বলশালী হইয়া স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন।"[১৩৩] ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা সভায় প্রকাশ্যে মহিলাদের বসানোর জন্য এঁদের আন্দোলন পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। মেয়েদের কি রকম শিক্ষা দেওয়া হবে তা নিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে কেশবচন্দ্রের যে মতবিরোধ উপস্থিত হয়েছিল তাতে দুর্গামোহন দাশ ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় শিবনাথ শাস্ত্রীর পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। "তাঁহারা নারীদিগকেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অবলম্বিত উচ্চশিক্ষা দিতে চাহিতেন। সুতরাং দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির উদ্যোগে এবং দুর্গামোহন দাশ মহাশয়ের অর্থসাহায্যে, অনুমান ১৮৭৩ সালে, কলিকাতার সন্নিহিত বালিগঞ্জ নামক স্থানে, কুমারী এক্রয়েডকে তত্ত্বাবধায়িকা করিয়া, হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় নামে নারীগণের উচ্চশিক্ষার জন্য এক বোর্ডিং স্কুল স্থাপন

১৩১ তদেব, পৃ: ৪৪৯।

১৩২ *জীবনালেখ্য*, পূর্বোক্ত, পৃ.পৃ: ২৫-২৮।

১৩৩ *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৪৯।

করিলেন।"[১৩৪] এই বিদ্যালয়ে দুর্গামোহন যে শুধু তাঁর মেয়েদের দিলেন তা নয়, এই স্কুলের অনেক ছাত্রীর মাতৃস্থান অধিকার করলেন ব্রহ্মময়ী। পূর্ববঙ্গের নানা স্থান থেকে কয়েকজন হিন্দু বিধবা পালিয়ে এসে ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় গ্রহণ করলে তারা ব্রহ্মময়ীর গৃহে স্থান পেল। এখান থেকে শিক্ষা লাভ করে এদের মধ্যে অনেকেই সৎপাত্রে পরিণীতা হয়েছিল।[১৩৫]

নারী জাতির উন্নতির জন্য নিবেদিত প্রাণ দ্বারকানাথ ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁর নারীজাতির উন্নতি সাধন প্রয়াস অব্যাহত রেখেছিলেন। অ্যানেত অ্যাক্রয়েডের পরিচালনায় যে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার একজন ছাত্রী শ্রীমতী কাদম্বিনী বসু সবার আগে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিলেন ১৮৭৮ সালে।[১৩৬] তিনি সরকারী বৃত্তি নিয়ে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ১৮৮০ সালে তিনি এফ. এ. ফার্স্ট আর্টস্ পরীক্ষা পাশ করে ১৮৮৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েট হন।[১৩৭] বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ে পড়বার সময়ে তিনি দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছাত্রী ছিলেন। পরবর্তীকালে, তাঁর সঙ্গে কাদম্বিনীর বিবাহ হয়। দ্বারকানাথের মতো নারী হিতৈষী ব্যক্তি দুর্লভ। মেয়েদের সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্ত করে শিক্ষিত, স্বাধীন এবং উপার্জনক্ষম করে তোলাই ছিল তাঁর স্বপ্ন। তাঁর আগ্রহাতিশয্যেই কাদম্বিনী কলিকাতার মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়তে শুরু করেছিলেন। 'পরিচারিকা' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল 'নারীগণ চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা না করিলে নারীজাতিসুলভ নানাপ্রকার কঠিন পীড়ার সুচিকিৎসা হইতে পারিবে না, এবং নারীজাতির স্বাধীন জীবিকা অর্জনের পথ উন্মুখ হইবে না এজন্য তিনি সর্বপ্রথম আপনার পত্নীকে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করিয়া দিয়াছিলেন।"[১৩৮] এই ভর্তি করানোর পেছনে দ্বারকানাথের অনেক সংগ্রাম ছিল। ১৮৮১ সালে এফ. এ. পাশ করে যখন কাদম্বিনী মেডিকেল কলেজে পড়বার আবেদন জানিয়েছিলেন, তখন মহিলাদের ডাক্তারি পড়া অনুমোদনযোগ্য কিনা তা স্থির করতে শিক্ষা-বিভাগ গড়িমসি করতে লাগল, তা দেখে কাদম্বিনী বি. এ. পড়ায় মন দিলেন কারণ স্নাতক মাত্রেই মেডিকেল কলেজে পড়তে পারতেন। ১৮৮৩ সালে গ্র্যাজুয়েট হয়ে যখন কাদম্বিনী আবার মেডিকেল কলেজে পড়তে চাইলেন তখন ডি. পি. আই. মেডিকেল কাউন্সিলকে চিঠি পাঠালেন এই মর্মে যে এবার কি করা হবে? একজন মহিলা স্নাতক হয়ে এসে মেডিকেল কলেজে ভর্তির দাবী তুলবেন তা একেবারেই অচিন্তনীয় ছিল। এবার কাদম্বিনীর

১৩৪ *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৫০।

১৩৫ তদেব।

১৩৬ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীশিক্ষার পত্তন, ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩৫০, পৃ: ৪৯৪, গোলাম মুরশিদ, সংকোচের বিহ্বলতা গ্রন্থের পাদটীকায় উল্লিখিত, পৃ: ৩৮।

১৩৭ Meredith Borthwick, *The changing Role of Women in Bengal*, ১৮৪৯-১৯০৫, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৬৮।

১৩৮ চিত্রাদেব, মহিলা ডাক্তার : ভিন গ্রহের বাসিন্দা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৪, পৃ: ৮৪তে পরিচারিকা পত্রিকা থেকে এই উদ্ধৃতিটি দেওয়া হয়েছে, পত্রিকার কোন সন তারিখ উল্লিখিত হয়নি।

ঘটনা ব্রাহ্মসমাজে ঝড় তুলল।[১৩৯] অবশ্য ঝড়ের ঝাপটা দ্বারকানাথকে আরো আগে থেকে সহ্য করতে হয়েছিল। কারণ, ১৭ বৎসরের ছোট ছাত্রীকে সহধর্মিণী রূপে গ্রহণ করায় দুই সন্তানের পিতা বিপত্নীক দ্বারকানাথকে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মেধাবী এই ছাত্রীটিকে বিয়ে করে দ্বারকানাথ গৃহবন্দি করে ফেলবেন এই আশঙ্কায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা দ্বারকানাথের বিবাহে এমনকি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু শিবনাথ শাস্ত্রীও এলেন না। তিন আইন অনুসারে ব্রাহ্মপদ্ধতিতে বিয়ের অনুষ্ঠান হয়, বিয়ের রেজিস্ট্রার হয়েছিলেন দুর্গামোহন দাশ।[১৪০] আসলে, প্রগতিশীল ব্রাহ্মদের আশঙ্কা অমূলক ছিল না। আগেই দেখা গেছে যে স্বয়ং দুর্গামোহন দাশের দুই মেয়ে অবলা ও সরলা বিয়ের পরে পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কনিষ্ঠা অবলা দাশ ১৮৮২ সালে মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন। মেয়েদের হস্টেলের অভাবে তাঁকে থাকতে হত জেনসেন পদবীধারী কোন খ্রীষ্টান ব্যক্তির বাড়ীতে। তাতে নিশ্চিন্ত হলেন অবলার পিতৃবন্ধু শিবনাথ শাস্ত্রী, অবলাকে লিখলেন : "নাবিক সমুদ্রে পোত পাঠাইয়া যেরূপ অপেক্ষা করে, তোমাকে মাদ্রাজে পাঠাইয়া ব্রাহ্ম সমাজ সেইরূপ অপেক্ষা করিতেছে জানিবে।"[১৪১] কিন্তু এই অপেক্ষার দাম দেওয়া হয়ে ওঠেনি অবলার, বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে বিবাহ করে তিনি পুরোপুরি সাংসারিক জীবনে আবদ্ধ হয়ে পড়লেন।[১৪২] একই খাতে অবলার দিদি সরলার জীবনও প্রবাহিত হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল অধ্যাপক ডঃ প্রসন্নকুমার রায়ের। পরীক্ষার আগেই তাঁর বিবাহের দিন ধার্য হওয়ায় কাদম্বিনী বসু (গঙ্গোপাধ্যায়)-র সহাধ্যায়ী সরলার আর প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়া হল না।[১৪৩] তাঁর সম্ভাবনাময় ছাত্রীজীবনে এখানেই ছেদ পড়ল।

কাজেই, কাদম্বিনীর বিবাহে আরো একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের অকাল নির্বাপণের সম্ভাবনা দেখেছিলেন প্রগতিশীল ব্রাহ্মরা। কিন্তু এখানে ব্যতিক্রম ছিলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। পত্নী যাতে মেডিকেল কলেজে পড়তে পারেন তার জন্য লড়াই করে অনুমতি আদায় করলেন। শুধু তাই নয়, ১৮৯৩ সালে তাঁকে পাঠালেন বিলাতে চিকিৎসা বিদ্যা আরো ভালো করে শিখে আসার জন্য।[১৪৪] এই সময় কাদম্বিনীর আটটি সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রের বয়স ছিল মাত্র এক বছর। সৎকন্যা, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পত্নী বিধুমুখীর হেপাজতে পুত্রকন্যাদের রেখে বিলাত গিয়েছিলেন কাদম্বিনী। বিধুমুখীর মেজ মেয়ে পুণ্যলতা চক্রবর্তীর স্মৃতিকথা[১৪৫] থেকে জানা যায় যে বিলাত থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে কাদম্বিনী যখন ফিরে এলেন তখন এই শিশুটি তার মায়ের কাছে কিছুতেই গেল না। দ্বারকানাথ কাদম্বিনীর চিকিৎসাকে পেশা হিসাবে

---

১৩৯ তদেব, পৃ:পৃ: ৮৪-৮৫।

১৪০ তদেব, পৃ: ৮৬।

১৪১ তদেব, পৃ: ৬৬।

১৪২ তদেব, পৃ:

১৪৩ *The Changing Role of Women in Bengal*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৩৪।

১৪৪ তদেব, পৃ: ৩৬৮।

১৪৫ পুণ্যলতা চক্রবর্তী, *ছেলেবেলার দিনগুলি*, নিউস্ক্রিপ্ট, কলিকাতা ১৯৭৫, যত্রতত্র

গ্রহণ করাতেও বাধা দেননি। পুণ্যলতা তাঁর স্মৃতিকথায় দিদিমার যে ছবি এঁকেছেন তাতে দেখা যায় যে ঘোড়ার গাড়ি করে কাদম্বিনী সারা শহরময় রোগী দেখে বেড়াতেন, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাবার জন্য যে সময় পাওয়া যেত তা নষ্ট না করে তিনি লেস বুনতে বুনতে যেতেন। তিনি নেপালের রাজমাতার চিকিৎসা করে যে সব মহার্ঘ উপহার লাভ করেছিলেন, তার মধ্যে ছিল একটি টাট্টু ঘোড়া, যা প্রত্যহ বিকালে উপেন্দ্রকিশোরের ১০০ নম্বর গড়পাড় রোডের বাড়ীর বিশাল ছাদে হাওয়া খেয়ে বেড়াত।[১৪৬] এ ছাড়াও কাদম্বিনী তাঁর বসতগৃহে রোগী দেখতেন। ১৮৮৮ সালে 'বেঙ্গলি' কাগজে কাদম্বিনী একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, এক বছর ধরে সেটি নিয়মিতভাবে ছাপা হত :

ACARD

Mrs. Gangulee, B.A.

(45/5 Beniatola Lane, College Square North East Corner, Calcutta)

Having studied in the Medical College for five years and obtained a college deploma to practise.

MEDICINE, SURGERY and MIDWIFERY has commenced practise and treats WOMEN AND CHILDREN

Consultation free for poor patients at her home between 2 and 3 daily.[১৪৭]

কাদম্বিনী তাঁর পেশায় উত্তরোত্তর উন্নতি করছিলেন। তিন বছর বাদে তাঁর বিজ্ঞাপনটি প্রমাণ করে যে তিনি ক্রমশঃই চিকিৎসক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করছেন।

বিজ্ঞাপনটি এইরকম ঃ

MRS. GANGULI

BA GMCB

Medical Practitioner

Can be consulted at her residence 57 Sukia Street, Calcutta where she has now removed, term moderate.[১৪৮]

সন্দেহ নেই, যে একজন সফল এবং অনিবার্যভাবে ব্যস্ত চিকিৎসকের পেশা বজায় রাখতে কাদম্বিনীর দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনে অভ্যস্ত ধারাবাহিকতার অভাব ঘটেছিল, কিন্তু 'অবলাবান্ধব' দ্বারকানাথ তা অবলীলায় সহ্য করেছিলেন। তাঁরই প্রেরণায় কাদম্বিনী ১৮৮৯

১৪৬ তদেব।

১৪৭ মহিলা ডাক্তার : *ভিনগ্রহের বাসিন্দা*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৯৮।

১৪৮ তদেব।

সালে কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। শুধু তাই নয়, সে সভায় বক্তৃতাও দিয়েছিলেন কাদম্বিনী।[১৪৯]

দ্বারকানাথ যেমন স্ত্রীর কর্মজীবনের সাফল্যের জন্য পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের চিরাচরিতভাবে অভ্যস্ত স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়েছিলেন সেইরকমভাবে স্বামীর উন্নতির জন্য কৃচ্ছ্রসাধন করেছিলেন শ্রীনাথ দত্তের পত্নী হরসুন্দরী দত্ত। এঁদেরও হয়েছিল বাল্যবিবাহ। বিবাহ-কালে হরসুন্দরীর বয়স ছিল ৭ বৎসর এবং শ্রীনাথ দত্তের বয়স ছিল ১৮ বৎসর।[১৫০] ১৮৬৯ সালে শ্রীনাথ দত্ত নবপ্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরে দীক্ষিত হন। অবশ্য দীক্ষাগ্রহণের আগে থেকেই তিনি স্ত্রীকে শিক্ষাদানের কথা পিতামাতাকে বলে আসছিলেন। কিন্তু যখন তিনি এ ব্যাপারে কারো অনুমোদন পেলেন না তখন তিনি স্ত্রীকে কলকাতায় নিয়ে আসতে চাইলেন। কিন্তু বালিকা স্ত্রী শ্বশুরবাড়ীর বিরুদ্ধে যেতে সাহসী হলেন না। প্রায় একবছর নিরন্তর চেষ্টার পর শ্রীনাথ দত্ত মহাশয় তাঁর স্ত্রীকে পিতৃগৃহে নিয়ে আসতে সমর্থ হন। একাজেও অবশ্য শ্রীনাথ দত্ত তাঁর পিতামাতার সমর্থন পাননি। তাহলেও পিতৃগৃহেই হরসুন্দরীর শিক্ষারম্ভের সূচনা হল। এর কিছুদিন পরেই শ্রীনাথ দত্ত হরসুন্দরীকে কলকাতায় আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। শ্রীনাথ দত্তের পিতা এই ঘটনায় যে আদৌ খুশী হননি তা হরসুন্দরীর লেখা থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায় : "আমি যখন ১৪ বৎসর বয়সে তাঁহার গৃহত্যাগ করিয়া স্বামীর সঙ্গে চলিয়া আসি, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমিই সংসার ছারখার করিলাম, কারণ আমি গৃহে থাকিলে তাঁহার পুত্র বিধর্ম্মী হইতেন না বা গৃহত্যাগ করিতেন না।"[১৫১] শ্বশুরবাড়ির এই দোষারোপ মাথায় নিয়ে হরসুন্দরী কলকাতা এসে প্রসিদ্ধ দুর্গামোহন দাশের বাড়ীতে বাস করতে লাগলেন। "এখানে আমি শ্বশুরবাড়ীর মতন আদরযত্ন লাভ করিয়াছিলাম। দুর্গামোহন বাবু ও পরিবারের সকলেই আমাকে বৌ বলিয়া ডাকিতেন। ইঁহারা যদিও আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন, তবু ইঁহাদের আদরযত্নে অল্পদিনের মধ্যেই আমি আমার পিতামাতার ও শ্বশুরশাশুড়ির অভাব ভুলিয়া তাঁহাদের পরিবারে চারি বৎসর অতি সুখে ছিলাম। তাঁহাদের ছোট সন্তানের লালন-পালনের ভার আমি লইয়াছিলাম। লেখাপড়া করিয়া যে সময়টুকু পাইতাম, তাহা ঐ কাজে ব্যয় করিয়া বড় তৃপ্তি বোধ করিতাম। দুর্গামোহনবাবু আমাকে তাহার কন্যাদের সঙ্গে আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। তখনো আমার বর্ণপরিচয় হয় নাই। আমি ১৪ বৎসর বয়সে ৫/৬ বৎসরের মেয়েদের সঙ্গে ক, খ পড়িতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু নিজের চেষ্টায় দুই তিন মাসের মধ্যেই আমি উপরের শ্রেণীতে উঠিলাম। আমার স্বামী উচ্চ শিক্ষার্থে বিলাত গিয়াছেন, তাঁহার উপযুক্ত হইবার জন্য আমি সত্বর উন্নতির চেষ্টায় ছিলাম।"[১৫২]

---

১৪৯ তদেব।

১৫০ হরসুন্দরী দত্ত, *স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্তের জীবন কথা*, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯।

১৫১ তদেব।

১৫২ তদেব, পৃঃ ১২।

এইভাবে হরসুন্দরী শুধু নিজেকে বিলাতফেরত স্বামীর উপযুক্ত করেই তোলেননি উপরন্তু নিজেকে স্বামীর দুর্দিনে পরম বন্ধু হিসাবে প্রতিপন্নও করেছিলেন। হরসুন্দরীর আত্মকথা থেকে জানা যায় যে শ্রীনাথ দত্ত "ব্যবসায়ী" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রী আনন্দমোহন বসু, শ্রীদুর্গামোহন দাশ এবং শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয় আসামে চা-বাগান খুলবার পরিকল্পনা করলেন ও শ্রীনাথ দত্তকে সেখানকার ম্যানেজার করবার প্রস্তাব করে আসামে জমি দেখতে পাঠালেন। তখন "প্রবন্ধ রচনা ব্যতীত অপর সমস্ত কার্য — যথা গ্রাহকদিগের কাগজ পাঠান, চিঠির উত্তর দেওয়া, কাগজ ছাপানোর তত্ত্বাবধান ও হিসাবপত্র রাখা ইত্যাদি আমাকে করিতে হইত।"[১৫৩] যে সময় কেশবচন্দ্র মেয়েদের শিক্ষায় অগ্রণী হয়েও মনে করছেন যে তাদের পুরুষোচিত শিক্ষা দেবার আবশ্যকতা নেই সে সময় স্বামীর হয়ে হরসুন্দরীর পত্রিকার কাজ চালানো যথার্থই ব্যতিক্রমী ঘটনা। যা হোক, শ্রীনাথ দত্ত ১৫০টাকা বেতনে চা বাগানের ম্যানেজারের চাকরি নিয়ে আসাম গেলেন এবং নানা পারিবারিক প্রতিকূলতায় আকণ্ঠ ঋণে নিমজ্জিত হলেন। একটি চিঠিতে শ্রীনাথ দত্ত স্ত্রীকে লিখেছিলেন : "আমি দিন দিন ঋণে ডুবিতেছি, আর ভাবিতেছি, তোমাকেও আমার সঙ্গে ডুবাইলাম। আমি কি নিষ্ঠুর! এই ঋণ আমার দ্বারা কখনই শোধ হইবে না। তুমি কি আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে? বল করিবে?"[১৫৪]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালী জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন আসছিল এই চিঠিটি সেই পরিবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করছে বলা যেতে পারে। এই সময় বৃহত্তর কর্মজীবনে বাঙ্গালী পুরুষরা অনেক বেশী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও হতাশার মুখোমুখি হচ্ছিল। তখন তারা তাদের জীবনসঙ্গিনীদের মধ্যে পেতে চেয়েছিল এমন এক সহধর্মিণীকে যারা তাদের অনুপ্রেরণা ও শক্তি দেবে জীবন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য। হরসুন্দরী স্বামীকে তাঁর দুঃসময় অতিক্রান্ত করতে সাহায্য করেছিলেন এভাবে : "লোকে যেমন জলে ডুবিবার সময় হাতখানা তুলিয়া দিয়া বলে, আমাকে রক্ষা কর, তেমনি আমার স্বামীও ঋণে ডুবিয়া, আমার দিকে তাঁহার হাতখানা তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। বাস্তবিকই তাঁহা হইতে আমার মনের বল ও শক্তি বেশী ছিল, তাই আমি সাহস করিয়া, তাহার হাতখানা ধরিয়া, সংসারের নানা কষ্ট ও অভাবের ভিতর দিয়া, তাঁহাকে ঋণমুক্ত করিয়া, সন্তানদের মানুষ করিয়া ও তদুপায় এই বাড়ীখানা করিয়া, আমি তাঁহার প্রত্যেকটি আশা পূরণ করিয়াছি।"[১৫৫] স্বামীর প্রয়োজনের সময় তাঁকে যথোপযুক্ত সহায়তা দান করে এমন আত্মপ্রত্যয়ের অধিকারী হয়েছিলেন হরসুন্দরী যে তিনি স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন "তাঁহার কোন আশা অপূরণ রাখি নাই।" এখানে পাশ্চাত্য ধারায় রচিত দাম্পত্য অংশীদারিত্বের (*Conjugal Partnership*) একটি উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কর্মজীবনে সাময়িক ব্যর্থতার দরুন স্বামী যখন ঋণগ্রস্ত তখন সংসারটিকে শক্তভাবে দাঁড় করিয়ে রাখার কঠিন কাজটি কৃতিত্বের সঙ্গে করেছিলেন হরসুন্দরী।

---

১৫৩ তদেব, পৃ: ১৮।

১৫৪ তদেব, পৃ: ২।

১৫৫ তদেব, পৃ:পৃ: ২-৩।

বাল্যবিবাহ করেও স্ত্রীকে কোনদিন অবহেলা বা অত্যাচার করেননি কালীনারায়ণ গুপ্ত। নিজের দাম্পত্য জীবনেই শুধু নয়, পুত্রকন্যাদের দাম্পত্যজীবনও তাঁর উদার স্নেহের স্পর্শ লাভ করেছিল। তাঁর ঔদার্য দ্বারা তিনি তখনকার প্রচলিত সামাজিক বিধিনিষেধ অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র কৃষ্ণগোবিন্দ এগার বৎসরের যে প্রসন্নতারা নামক বালিকার পাণিগ্রহণ করেছিলেন ১৮৬৯ খ্রিঃ তার পরিবার ছিল ব্রাহ্মধর্মের অনুরাগী। কৃষ্ণগোবিন্দ নিজেও কেশবচন্দ্রের সঙ্গতসভার উৎসাহী সভ্যদের মধ্যে অন্যতম। "কৃষ্ণগোবিন্দ বালিকা পত্নীর আগ্রহে প্রতি সপ্তাহে সঙ্গতসভার বিবরণ পত্নীকে লিখিয়া পাঠাইতে বাধ্য হইতেন। সভ্যগণের প্রতিদিনের জীবন সংগ্রাম ও জয়পরাজয়ের বৃত্তান্ত প্রসন্নতারার কোমল মনে ধর্ম্মভাব জাগ্রত করিয়া দিত।"[১৫৬] এই সময় জালালউদ্দিন মিঞা নামে একজন মুসলমান যুবক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে সঙ্গতসভায় প্রবেশ করলেন। কৃষ্ণগোবিন্দ নিজ বিবাহ উপলক্ষ্যে বন্ধুদের খাওয়াবেন স্থির করে জালালউদ্দিনকে নিমন্ত্রণ করেই ক্ষান্ত থাকলেন না, বঙ্গচন্দ্র রায়, প্রসন্নকুমার রায়, প্যারীমোহন, গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত, ভুবনমোহন সেন প্রমুখ বন্ধুবর্গের সঙ্গে একত্রে বসে আহার করলেন। ফলে এঁদের সকলকেই প্রবল সামাজিক উৎপীড়নের শিকার হতে হয়েছিল। কালীনারায়ণ তাঁর পুত্রকে বর্জন তো করলেনই না উপরন্তু তিনি এ সময় প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করলেন। এখন প্রশ্ন দাঁড়াল যে কালীনারায়ণের স্ত্রী অন্নদা কি করবেন? তিনি কি স্বামীর সঙ্গে কলকাতা যাবেন না আত্মীয়পরিজনের ইচ্ছানুসারে শাশুড়ী ভাগীরথীদেবীর সঙ্গে গ্রামে থেকে যাবেন? তখন কালীনারায়ণ সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন : "স্বামী-স্ত্রী একাঙ্গ হইয়া ধর্ম্মসাধন করিবে, সতী যেমন এক পতিতে রতা থাকে সেইরূপ পরমপতিকে বরণ করিবে ইহাই প্রকৃত সতীধর্ম্ম। এই নিমিত্ত স্ত্রী স্বামীর সহধর্ম্মিণী।" ঐতিহ্যাশ্রয়ী ভারতীয় দাম্পত্য ধারণাকে এইভাবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজে লাগিয়ে কালীনারায়ণ স্ত্রীকে যে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন তা ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য প্রভাবিত রেনেসাঁর ফলের সঙ্গে একাঙ্গীভূত হয়ে গেছে। তাঁর জীবন যে ধর্ম অনুসারে প্রভাবিত হয়েছে, তিনি যে তাঁর মনোমত আদর্শ অনুসরণ করে তাঁর জীবন সার্থক করতে পেরেছিলেন এর জন্য যে তাঁর স্ত্রীর অবদান অনেকখানি মুক্তকণ্ঠে তা স্বীকার করে বলেছেন কালীনারায়ণ : "ব্রাহ্মসমাজে আসিবার প্রথম মারামারি স্ত্রীকে লইয়া। ব্রাহ্মসমাজের কত বড় বড় লোক পাঁচ সাত বৎসর পরে স্ত্রীকে পাইয়াছেন। কিন্তু আমার পক্ষে এক ঘণ্টায় সব ফর্সা হইয়াছিল। স্ত্রীকে সঙ্গে না পাইলে ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মানুষ্ঠান কি করিতে পারিতাম কে জানে?"[১৫৭] শুধু ধর্মাচরণই নয় পত্নীর সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত তাঁর পক্ষে সংসারযাত্রা নির্বাহ করা যে কঠিন হত বারংবার একথা স্বীকার করেছেন তিনি। "পত্নীকে সঙ্গিনী না পাইলে যেমন ধর্ম্মসাধনে, তেমনি তাঁহার সাংসারিক উন্নতির পথেও কত অন্তরায়ের সম্ভাবনা ছিল, পত্নীর প্রতিকূলতায় পুত্রগণের বিলাত যাত্রায় বাধা জন্মিলে তাঁহাদের উচ্চপদ, সম্মান, মর্যাদা এ সকলও হয়ত অন্য আকার ধারণ করিত।

১৫৬ ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্তের জীবন বৃত্তান্ত, পূর্বোক্ত, পৃ: ২১।
১৫৭ তদেব, পৃ: ২৪।

যাহা হউক, পত্নীর সহায়তা তিনি সকলদিকেই অনুভব করিয়াছেন।"[১৫৮] শুধু পত্নীকে মর্যাদা দেওয়াই নয়। কন্যাসন্তানদের প্রতিও তাঁর স্নেহ ছিল পুত্রসন্তানদের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। তিনি পুত্রকন্যাদেব শিক্ষার জন্য নিজেকে তুল্য রূপে দায়ী মনে করতেন। নিজে বাল্যবিবাহ করলেও মেয়েদের তিনি কখনো বাল্যবিবাহ দেননি। অবিবাহিতা বয়স্কা মেয়েদের নিয়ে গ্রামে বাস করা সম্ভব নয় বুঝে তিনি ঢাকা এসে বসবাস করতে লাগলেন। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করত যে মেয়েদের বিবাহের কি ব্যবস্থা তিনি করছেন;তাহলে এতটুকু বিচলিত না হয়ে কালীনারায়ণ বলতেন যে ভগবান যখন পাত্র জুটিয়ে দেবেন তখনই তাদের পাত্র জুটবে। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ স্থির হয়েছিল অসবর্ণ পাত্রের সঙ্গে, কালীনারায়ণ খুশী হয়ে বলেছিলেন যে এতদিন তিনি কেবল বক্তৃতায় ও কথায় জাতিভেদ অস্বীকার করে এসেছেন, আজ তা কাজে পরিণত করার সময় উপস্থিত হয়েছে। খুব সহজে তিনি ক্ষুদ্রতর সামাজিক বিধিনিষেধ কাটিয়ে উঠতে পারতেন। যেমন, হিন্দু পরিবারের চিরাচরিত কুপ্রথা এই যে পুত্রবধূ শ্বশুরশাশুড়ির সঙ্গে কথা বলে না। কিন্তু কালীনারায়ণ তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণগোবিন্দের পত্নী প্রসন্নতারাকে অনায়াসে বলেছিলেন, "তুমি আমার মা. সুতরাং সন্তানের সঙ্গে কথা বলতে আপত্তি কোরো না। লোকে যখন দেখবে যে এতে দোষের কিছু নাই তখন আর তারা কিছু বলবে না।"[১৫৯] শ্বশুরের কথা মান্য করতে গিয়ে নির্লজ্জ বৌ আখ্যা পেয়েছিলেন প্রসন্নতারা। গ্রামের লোক প্রথম প্রথম মজা দেখতে আসত। কিন্তু বালিকা তাতে ভ্রূক্ষেপ না করে সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। "জনসমাজে স্বামীভক্তির দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কিন্তু কালীনারায়ণ আপনার প্রণয়িনীকে স্নেহ, মমতা, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা এবং কোমলতার আধার জানিয়া তাঁহাকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনদ্বারা দাম্পত্য জীবন চারিতার্থ এবং স্ত্রীকে যথার্থ সম্মান করিয়া সমগ্র স্ত্রীজাতির প্রতিই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যতে রমন্তে তত্র দেবতা।" এই বাক্য তাঁহার জীবনে সার্থক হইয়াছে।"[১৬০] কালীনারায়ণের দাম্পত্য প্রেম নিঃসন্দেহে সেকালে নজির স্থাপন করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

নিজ বিবাহের অভিজ্ঞতা ও দাম্পত্য জীবন শিবনাথের মনেও যথেষ্ট পরিবর্তন এনেছিল। মেয়েদের প্রতি, তাদের সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীও পরিবর্তিত হয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে যে তাঁর বাল্যবিবাহ হয়েছিল, কর্তৃত্বপরায়ণ কোপনস্বভাব পিতা কিভাবে তাঁকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে বাধ্য করেছিলেন। ফলতঃ বাল্যবিবাহের প্রতি বিরাগ তাঁর মধ্যে জন্ম নিয়েছিল, কিন্তু এই বিরাগ ঘৃণায় পরিণত হয়েছিল কলিকাতায় এসে একটি বিবাহিতা অথচ দুঃখী বালিকাকে দেখে। শাঁখারীটোলায় জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে শিবনাথ থাকতেন। সেই সময় জগৎবাবুর পত্নীর ভ্রাতুষ্পুত্রী একটি ১৫/১৬ বৎসরের বালিকা সেখানে আশ্রয় লাভ করল। এই বালিকাটির শৈশবে একটি পরিণতবয়স্ক বিপত্নীক লোকের সহিত বিবাহ

১৫৮ তদেব, পৃ: ৩৪।
১৫৯ তদেব, পৃ:পৃ: ৯৯-১০১।
১৬০ তদেব।

হয়। কিন্তু শ্বশুরগৃহে সে ভালো ব্যবহার পেত না বলে শ্বশুরবাড়ির কথা বললেই সে অঝোরে কাঁদত। তারপর শিবনাথ শাস্ত্রী যখন ঐ বাড়ি ছেড়ে চলে আসেন তখন ঐ বালিকাটির অসহায় ক্রন্দন তাঁর মনে বাল্যবিবাহের প্রতি যে ঘৃণা প্রোথিত করেছিল, সারাজীবনে শিবনাথ শাস্ত্রীর মনে তা জাগ্রত রয়েছিল।[১৬১]

ইতিপূর্বে, কেশবচন্দ্র সেন, দুর্গামোহন দাশ, শ্রীনাথ দত্ত বা কালীনারায়ণ গুপ্তের বিবাহিত জীবনে সঙ্কট আসতে দেখা গেছে, কিন্তু তার প্রকৃতি যতখানি বহিরাগত কোন কারণে, তাঁদের মানসিক কারণে ততখানি নয়। যদিওবা মনোগত কোন কারণ ছিল তবুও তার মধ্যে জটিলতা ছিল অপেক্ষাকৃত কম। কেশবচন্দ্রের বিবাহ জীবনের সূচনায় যে সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছিল তা ছিল তাঁর ধর্মজীবন বনাম দাম্পত্যজীবনের সংগ্রাম। কেশবচন্দ্র তাঁর দাম্পত্যজীবনের বিনিময়ে ধর্মকে চেয়েছিলেন। কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্কট ছিল তাঁর সমসাময়িকদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। শিবনাথ শাস্ত্রীর ধর্মজীবনে প্রধান প্রতিবন্ধক ছিলেন তাঁর পিতা। তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রতি উৎসাহী হয়েছেন জেনে যখন পিতা তাঁকে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে যেতে নিষেধ করলেন তখন "আমি ধীরভাবে বলিলাম, "বাবা, আপনি জানেন আপনার আজ্ঞা কখনো লঙ্ঘন করি নাই। আপনার সকল আজ্ঞা পালন করিতে রাজি আছি। কিন্তু আমার ধর্মজীবনে হাত দিবেন না। আমি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে যাওয়া ত্যাগ করিতে পারিব না।"[১৬২]

বস্তুতঃ পিতার সকল কথাতে রাজি হতে গিয়েই শিবনাথ দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এরপর ১৮৭২ সালে শিবনাথের পক্ষে তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজমোহিনীকে আনা প্রয়োজন হয়ে পড়ল কারণ বছর দুই আগে তাঁর পিতা মাতা ভাইবোন সকলেই অকালে মারা যান, ফলে বিরাজমোহিনী পিতৃব্যগণের গলগ্রহ হয়ে পড়লেন। শিবনাথ ইতিপূর্বে তাঁর দ্বিতীয়া পত্নীর পুনর্বিবাহ দিতে চেয়ে তাঁকে কলকাতায় আনার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হননি। এখন শিবনাথের ব্রাহ্মবন্ধুদের মধ্যে অনেকেই আপত্তি তুললেন : "ব্রাহ্ম দুই স্ত্রী লইয়া একত্র বাস করিবে, ইহা বড়ই খারাপ কথা। বহুবিবাহের প্রতিবাদ আমাদের প্রধান কাজ দুই স্ত্রী লইয়া একত্র থাকিলে তুমি বহুবিবাহের প্রতিবাদ করিবে কিরূপে?"[১৬৩] কিন্তু শিবনাথের মনে হয়েছিল যে বহুবিবাহের দায় তাঁর, কারণ বিবাহ তিনি করেছেন, হিন্দুসমাজে পুরুষ বিবাহ করে আর কন্যার বিবাহ দেওয়া হয়। তাই একটি পরিজনহীনা নিরাপরাধা বালিকাকে তারই উন্নতির উদ্দেশ্যে এনে আশ্রয় দেওয়ার মধ্যে অপরাধ কিছু নেই। কারণ, বিরাজমোহিনীকে লেখাপড়া শিখিয়ে তাঁকে নিজের পায়ে দাঁড় করানো অথবা উপযুক্ত অন্য পাত্রে তাঁকে বিবাহ দেওয়াই ছিল শিবনাথের উদ্দেশ্য। পরবর্তীকালে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে যদিও তাঁর মতপার্থক্য এমনকি প্রকাশ্যে বিরোধের অবধি ছিল না, তবুও শিবনাথ এই সমস্যা নিয়ে কেশবচন্দ্রের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। কেশবচন্দ্র বিরাজমোহিনীকে আনতে পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন :

১৬১ *আত্মচরিত*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫৩।
১৬২ *আত্মচরিত*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫১।
১৬৩ তদেব, পৃ: ৮৬।

"বাল্যবিবাহের দেশে বহুবিবাহে মেয়েদের অপরাধ কি? একজন যদি দশটি মেয়ে বিবাহ করে ব্রাহ্ম হয়, পরে সে দশজনকে আশ্রয় দিতে বাধ্য। এমনকি, আশ্রয় না দেওয়াতে উক্ত স্ত্রীলোকদের কেহ যদি বিপথে যায়, তার জন্য সে দায়ী।"[১৬৪]

সমস্যা দেখা দিল, যখন বিরাজমোহিনী ও প্রসন্নময়ী এসে বাড়ীতে বাস করতে লাগলেন। "আমি বিরাজমোহিনীকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিতে বিরত রহিলাম, তখন প্রসন্নময়ী হইতেও সেই সময়ের জন্য আমার স্বতন্ত্র থাকা উচিত বোধ হইতে লাগিল। তখন তাঁহার সঙ্গে বহুদিনের স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ রহিয়াছে, তৎপূর্বে হেমলতা, তরঙ্গিণী ও প্রিয়নাথ তিনজন জন্মিয়াছে।" অতঃপর শিবনাথ শাস্ত্রী হিন্দু কলেজের বারান্দাতে রাত্রিযাপন করে তাঁর নিদারুণ সঙ্কটকে ধামাচাপা দিয়ে রাখলেন।

তাঁর সমসাময়িক ব্রাহ্মরা তাঁদের একপত্নীনিষ্ঠতা নিয়ে যখন নতুন সমাজ ও পরিবার গঠনে প্রয়াসী, তখন শিবনাথের জীবনে এই সঙ্কট তাঁর দাম্পত্য জীবনকে এক অবাঞ্ছনীয় অভিনবত্ব দান করেছিল। এই সঙ্কট তাঁর মধ্যে যে স্ববিরোধিতা সৃষ্টি করেছিল, তার উৎস ছিল তাঁর জীবনের পরিস্থিতির মধ্যে, তাঁর মনোলোকে নয়। মেয়েদের স্বাধীনতার প্রশ্ন ও তাদের অবস্থার উন্নতি সাধনের প্রশ্ন একসঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে যে স্ববিরোধিতা সৃষ্টি করেছিল বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্দ্রের মধ্যে শিবনাথের স্ববিরোধিতা সেরকম ছিল না। কারণ, মেয়েদের মুক্তি পেতে হবে, তা পেতে হবে শিক্ষার মাধ্যমে, এই শিক্ষায় নারী ও পুরুষ কোন ভেদাভেদ থাকবে না— শিবনাথের এই ঋজু মানসিকতার তুলনা একমাত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যেই মেলে। দেবেন্দ্রনাথ জ্ঞানদানন্দিনীর বিলাতযাত্রায় আপত্তি জানিয়ে পুত্রকে হতাশ করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনীর বিচ্ছেদ দীর্ঘায়িত হয়েছিল, এমনকি সত্যেন্দ্রনাথের পত্রগুচ্ছ সাক্ষ্য দেয় যে তাঁদের দাম্পত্য জীবন শুরু হতেও বিলম্ব ঘটেছিল। কিন্তু শিবনাথের সঙ্কট এরকম ছিল না। তিনি প্রথম জীবনে তাঁর প্রথমা স্ত্রী প্রসন্নময়ীর সঙ্গে যে সংসার গড়ে তোলেন তা তাঁর পৈতৃক সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ ও উপবীত ত্যাগকে কেন্দ্র করে পিতার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ উনিশ বছরের বিচ্ছেদ শুরু হয়েছিল। সেই সময় সামান্য ছাত্রবৃত্তি অবলম্বন করে অসীম দারিদ্র্যকে পাথেয় করে শিবনাথ যে যৌথ জীবন শুরু করেছিলেন তাতে সর্বতোভাবে তাঁকে সহায়তা করেছিলেন প্রসন্নময়ী দেবী। পরপর তিনটি সন্তানের জন্ম এই দারিদ্র্য বৃদ্ধি করেছিল। সেই সময়কার অপরাপর ব্রাহ্মপত্নীদের মতে প্রসন্নময়ী বিপুল শ্রমে হাসিমুখে সেই দারিদ্র্য বরণ করেছিলেন। শিবনাথ স্বয়ং তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন : "তিনি সংসারের শত কষ্ট ও অশান্তির মধ্যে পরকে সুখী করিয়া সুখী হইয়াছেন, নিজে কাঁদিয়া অপরের অশ্রু মুছাইয়াছেন এবং অনলস শ্রমশীল ও কর্তব্যপরায়ণ জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। যথার্থই তিনি খাটিতে বাঁচিয়াছেন ও বাঁচিয়া খাটিয়াছেন।"[১৬৫] দ্বিতীয় পত্নী বিরাজমোহিনীর আগমন তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও তাঁর সংসার যাত্রায় ছন্দপতন ঘটিয়েছিল। বালিকা ও অশিক্ষিতা

১৬৪ তদেব।

১৬৫ তদেব, পৃ: ২২৭।

বিরাজমোহিনী শিবনাথকে এমন একটি প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছিল যার উত্তর তাঁর মতো স্বীকৃত নারীবাদী নেতারও জানা ছিল না। তিনি ১৪।১৫ বৎসরের বিরাজমোহিনীকে পুনর্বিবাহের প্রস্তাব দিলেন, এইভাবে : "আমি যে এতদিন তোমাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করি নাই, তাহার কারণ এই যে, আমার মনে আছে তুমি বড় হইয়া যদি অন্য কাহাকেও বিবাহ করিতে চাও, করিতে দিব। আর যদি লেখাপড়া শিখিয়া কোনো ভালো কাজে আপনাকে দিতে চাও, দিতে পারিবে, এজন্য তোমাকে স্কুলে দিতেছি। তুমি এখন লেখাপড়া কর।" এই বলিয়া তাঁহাকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলাম। কিন্তু দিলে কি হয়? তিনি প্রথম প্রস্তাব শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, "মা গো! মেয়েমানুষের আবার ক'বার বিয়ে হয়।" তাঁহার ভাব দেখিযা, পুনর্বিবাহের প্রতি দারুণ ঘৃণা দেখিয়া, আমার এতদিনের পোষিত ভূত এককথাতে নামিয়া গেল। আমি বুঝিলাম, দ্বিতীয় প্রস্তাবই কার্যে পরিণত করিতে হইবে।"[১৬৬]

এখন, শিবনাথ যে পোষাভূতের কথা বলেছেন তা কি তাঁর মেয়েদের দ্বিতীয় বিবাহে আপত্তি? তাহলে কোন্ আদর্শের বশবর্তী হয়ে তিনি বিধবাবিবাহে উৎসাহী হয়েছিলেন? বন্ধু যোগেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও উপেন্দ্রনাথ দাসের বিধবাবিবাহে তিনি প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তা কি কেবল সমাজসংস্কারক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য না বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার দরুন তাঁর প্রতি শিবনাথের যে ব্যক্তিগত আনুগত্য ছিল তার জন্য? তিনি পিতার চাপে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেও একপত্নীনিষ্ঠ থাকতে চেয়েছিলেন, তাঁর এই চাওয়াতে কি কোন আন্তরিকতা ছিল না? একটি ১৪।১৫ বছরের বালিকার বিস্ময়োক্তি তাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ দেবার প্রচেষ্টাকে নির্মূল করে দিল, শিবনাথ শাস্ত্রী পরোক্ষভাবে হলেও তাঁর দ্বিতীয়া পত্নীকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হলেন। বিরাজমোহিনীর উপস্থিতিতে তিনি তাঁর গৃহিণী স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসে বিরত হলেন। অর্থাৎ বিরাজমোহিনীকে তিনি স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারছেন না, এই ব্যর্থতাবোধকে আবৃত করার জন্য তিনি সাময়িকভাবে হলেও তাঁর দাম্পত্য জীবনে ছেদ টেনেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্ত্রীর আত্মিক উন্নতির খাতিরে বিরহযন্ত্রণা সহ্য করতে রাজী ছিলেন, দ্বারকানাথের প্রেরণা ছাড়া গৃহিণী, জায়া ও জননীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতেন না কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীনাথ দত্তের স্ত্রী হরসুন্দরী স্বামীর উচ্চশিক্ষা সম্ভব করার জন্য এবং নিজে লেখাপড়া শেখার জন্য দুর্গামোহন দাশের বাড়ীতে আশ্রিতা হিসাবে থাকতে দ্বিধান্বিত হননি। অথচ শিবনাথের এই আত্মত্যাগ তাঁকে কোন মহত্তর লক্ষ্যে উপনীত করতে পারল না। তিনি সহমর্মিণী স্ত্রী ও শরণাগত স্ত্রী উভয়কে প্রকৃত মর্যাদাদানে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাঁর আদর্শ তাঁর ব্যক্তিগত জীবন থেকে অনেক দূরে রয়ে গেল। ১৮৭৬-৭৭ সালে যখন তিনি দুরারোগ্য "ক্ষয়কাশ" রোগে আক্রান্ত হলেন, তখন তাঁর মাতা বিরাজমোহিনী ও শিবনাথকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র বাসা ভাড়া করে থাকতে লাগলেন। এইভাবে শিবনাথ শাস্ত্রী বিরাজমোহিনীকেও তাঁর দাম্পত্যজীবনে অঙ্গীভূত করলেন। তখন প্রসন্নময়ী পুত্রকন্যাদের নিয়ে পূর্ববাসাতেই থাকতে লাগলেন। রোগমুক্তির পর শিবনাথ উভয় স্ত্রীকে নিয়ে মুঙ্গেরে বায়ুপরিবর্তনের জন্য গেলেন।

১৬৬ তদেব, পৃ: ৮৬।

সেখান থেকে তিনি একা প্রথমে কলকাতায় চলে আসেন, তারপর মুঙ্গের থেকে দুই স্ত্রীই কলকাতা চলে এলে তিনজনে পুত্রকন্যাসহ একই বাড়ীতে বাস করতে লাগলেন।[১৬৭]

শিবনাথের দাম্পত্য জীবনের ট্র্যাজেডি প্রমাণ করেছিল যে প্রচলিত বঙ্গীয় সমাজের মধ্যে ব্রাহ্মরা যদিও পরিবর্তনের হাওয়া এনেছিল, তবুও সনাতন হিন্দুসমাজের প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া কত কঠিন ছিল। শিবনাথ পরিস্থিতির ফেরে পড়ে যদিও দুই স্ত্রী নিয়ে জীবন যাপন করেছিলেন, তবুও সমাজসংস্কারের, আরো বিশেষভাবে বলতে গেলে মেয়েদের অবস্থার উন্নতি ঘটানোর কাজে তিনি ছিলেন অগ্রগণ্য। কুচবিহার বিবাহের পর থেকে ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের নেতা হিসাবে কেশবচন্দ্র আর তত মান্য রইলেন না। অল্পকাল পরেই তাঁর মৃত্যু সংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্বে এক শূন্যতা সৃষ্টি করেছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী তখন যুবক দলকে আকৃষ্ট করেছিলেন। "পণ্ডিত হলেও শিবনাথ ছিলেন শিশুর মত সরল। অহংবোধহীন এই মানুষটির প্রতি আমরা আশ্চর্যভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। আমরা তাঁর পরিবারের সদস্য হয়ে উঠেছিলাম। শিবনাথের যুক্তিবাদী ব্রাহ্ম আদর্শ আমাকে কেশব ও তাঁর অনুগামীদের নীতির চেয়ে অনেক বেশী মুগ্ধ করেছিল। তাঁর আদর্শ মধ্য উনিশ শতকীয় ইউরোপীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও স্বাধীনতার সঙ্গে একাত্ম ছিল অনেক বেশী। থিয়োডোর পার্কারের মতো পবিত্র ও পরিশীলিত ছিল শিবনাথের মতবাদ। শিবনাথের ধর্ম ও ঈশ্বরানুরাগের প্রধান উপাদান ছিল সামাজিক স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তি। আমাদের যৌবনের আদর্শের সঙ্গে শিবনাথের ব্রাহ্মমতের এক গভীর সৌসাদৃশ্য ছিল।... ব্রাহ্মধর্মের এই বৃহত্তর পূর্ণতর আদর্শের সঙ্গে আমরা শিবনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলাম"[১৬৮] বলেছেন বিপিনচন্দ্র পাল।

১৮৮৮ সালের ১৫ই এপ্রিল বন্ধু দুর্গামোহন দাশ ও পার্বতীচরণ রায়ের সঙ্গে শিবনাথ ইংল্যান্ড যাত্রা করলেন। ১৯শে মে লন্ডনে পৌঁছে তিনি ছয়মাস ইংল্যান্ডে ছিলেন। তখন ইংরাজ মহিলাদের অবস্থা ও জীবন সম্যকভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। সেখানে মিস কলেট ও মিস্ কবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। শিবনাথ এঁদের সঙ্গে দেখা করে সন্তোষ লাভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে মুগ্ধ করেছিল মধ্যবিত্ত ইংরাজ মেয়েদের জীবনধারা। "আমি যখন সেখানে গিয়াছিলাম তখন নারীকুলের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিবার জন্য, নারীকুলের রাজনৈতিক অধিকার স্থাপনের জন্য, নারীকুলের সর্ববিধ উন্নতি বিধানের জন্য নানা চেষ্টা চলিতেছিল। তাহার ফলস্বরূপ নারীগণের মধ্যে এক নূতনভাব ও উন্নতি স্পৃহা দেখা দিয়াছিল। সকল ভালো কাজে, সকল উন্নতির চর্চাতে, সকল আলোচনাতে, সকল সদনুষ্ঠানে নারীদিগকে দেখিতাম। কোন সদনুষ্ঠানের সভাতে গিয়া দেখি, অর্ধেকের অধিক নারী; কোনো প্রসিদ্ধ ধর্মাচার্যের উপদেশ শুনিতে গিয়া দেখি, নারীদের ভিড় ঠেলিয়া প্রবেশ করিতে হয়; কোনো বন্ধুর ভবনে কোনো সদালোচনার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া দেখি অর্ধেকের অধিক নারী।[১৬৯] এ

---

১৬৭ *আত্মকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ: ১০৮-১০৯, ১২৮-১২৯।

১৬৮ *আমার জীবন ও সমকাল* (প্রথম পর্ব), পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ১৬৯-১৭০।

১৬৯ *আত্মকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৮২।

দেখে শিবনাথের প্রত্যয় হয়েছিল যে, "এ দেশের লোক অবরোধ প্রথার মধ্যেই বর্ধিত, সুতরাং তাঁহাদের মনে এই সংস্কার বদ্ধমূল যে নারীগণ স্বাধীনভাবে সর্বত্র যাতায়াত করিলে তাহারা আপনাদের চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারিবে না। এ যে কি ভ্রান্ত ধারণা, তাহা একবার ইংলন্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীগণের সহিত মিশিলেই বুঝিতে পারা যায়।"[১৭০] এত স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও ইংল্যান্ডে সামাজিক অনুশাসনের কঠোরতা শিবনাথের পছন্দ হয়েছিল। তাঁর মনে হয়েছিল যে ঐ অনুশাসনের বাড়াবাড়ি না থাকলে নারী স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব হত না। "মেয়ে-পুরুষে বৈঠকঘরে বসা, মেশা, রাস্তাঘাটে একত্রে বেড়ানো নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু আদবকায়দার এত বাঁধাবাঁধি যে, তাহার একটু লঙ্ঘন করিলে বন্ধুতার বিচ্ছেদ ঘটে। এইরূপ আদবকায়দার অনেক বাঁধন আছে, স্বাধীনতার সঙ্গে শাসনও আছে।"[১৭১] শিবনাথ আরো দেখেছিলেন যে ইংরাজগৃহে নারী সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারিণী, নারীরা তাঁদের গৃহকে যেভাবে পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খল করে রাখতেন শিবনাথ তা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। "গৃহিণীর সর্বময় কর্তৃত্বের সঙ্গে সঙ্গে নারী জাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতা থাকাতে অতি চমৎকার ফল ফলিতেছে। নারীগণ সর্ববিধ জ্ঞানচর্চার অংশী ও সর্ববিধ শুভ চেষ্টার সহায় হইতেছে।"[১৭২] ইংল্যান্ডে গিয়ে মেয়েদের শিক্ষার সুফল দেখে তিনি প্রভাবিত হয়েছির্লেন এবং চেয়েছিলেন যে তাঁর দেশের মেয়েরাও শিক্ষালাভ করে স্বাধীন হোক। এই স্বাধীনতা আসবে তাদের ভেতর থেকে, যা গৃহ এবং বৃহত্তর অর্থে সমাজের পক্ষে অতীব মঙ্গলকারক হবে। এইভাবে সূত্রপাত হল ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের : "ব্রাহ্মপাড়ায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদিগকে সর্বদা সমাজের মাঠে খেলিতে দেখিয়া মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, ইহাদিগকে বেথুন স্কুল প্রভৃতি বিদ্যালয়ে না পাঠাইয়া এদের জন্য একটি ছোট স্কুল করা যাক। স্কুলটি তিন ঘণ্টা বসিবে, এবং কিন্ডারগার্টেনের অনুরূপ প্রণালীতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই ভাবিয়া প্রথমে কতকগুলি শিশু সংগ্রহ করিয়া পড়াইতে আরম্ভ করা গেল। স্কুলটিতে বালিকাই অধিক জুটিল, সঙ্গে শিশুবালকও থাকিত। নাম রাখা গেল ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়। আমি নিজে সর্বনিম্ন শ্রেণীতে বোর্ডের সাহায্যে ছবি আঁকিয়া পড়াইয়া দেখাইতাম, কেমন করিয়া পড়াইতে হয়। সে সময়কার কোনো কোনো শিক্ষক সেই সময় হইতে শিশুশিক্ষার একটা নূতন ভাব পাইলেন, এবং উত্তরকালে কিন্ডারগার্টেন শিক্ষক হইয়া উঠিলেন।"[১৭৩]

তাঁর জীবনের শেষভাগে শিবনাথ ইংল্যান্ড গিয়েছিলেন, তাঁর কর্মজীবনের সিংহভাগ ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। সেখানেই মেয়েদের প্রতি তাঁর উদার এবং যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। ইংল্যান্ডে বাসের অভিজ্ঞতা তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গীতে আরো কোন পরিবর্তন সাধন করেছিল কিনা তা জানা যায়নি। এদেশে থাকতেই তিনি মেয়েদের

১৭০ তদেব।
১৭১ তদেব, পৃ: ১৮৫।
১৭২ তদেব, পৃ: ১৯১।
১৭৩ তদেব, পৃ: ১৯৯।

প্রকাশ্যে চলাফেরা সমর্থন করেছিলেন, যার প্রমাণ পাওয়া যায় ব্রাহ্মমেয়েদের একত্রে বসে উপাসনা করার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে, মেয়েদের শিক্ষা দেবার ব্যাপারে তিনি ছিলেন সমদর্শী, পুরুষদের সঙ্গে তাদের শিক্ষার কোন প্রভেদ রাখতে তিনি চাইতেন না, বিধবাদের পুনর্বিবাহ দেবার ব্যাপারেও তাঁর উৎসাহ ছিল সমধিক। তাঁর এইসব কাজের পশ্চাতে যে নারীদরদী মন ছিল তা গঠিত হয়েছিল তাঁর ইংল্যান্ড বাসের অভিজ্ঞতা অর্জন করার আগেই তবুও বলা যেতে পারে যে শিবনাথ সুখী, মুক্ত ও শিক্ষিতা মেয়েদের যে চিত্রকল্প মনে মনে রচনা করেছিলেন, ইংল্যান্ড গিয়ে তার প্রতিচ্ছবি দেখে তিনি অত্যন্ত সুখী হয়েছিলেন, তাঁর নিজস্ব প্রত্যয় দৃঢ়তর হয়েছিল যে শিক্ষাই মেয়েদের ভেতর থেকে যে স্বাধীনতার বোধ জাগ্রত করবে তাই হবে তাদের প্রকৃত মুক্তির পথ।

১৮৭৬ সালের মাঝামাঝি শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে একটি সমিতি গড়া হয়েছিল। ১৮৭৭ সালের হেমন্তকালে হেয়ার স্কুলের দোতলার একটি ঘরে বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরী মোহন দাস, শরৎচন্দ্র রায়, আনন্দচন্দ্র মিত্র, কালীশঙ্কর সুকুল, তারাকিশোর চৌধুরী—এই কয়জন এইদলের সদস্য হিসাবে দীক্ষামন্ত্র উচ্চারণ করলেন। এই শপথকারীরা ধর্মীয় ও সমাজসংস্কারের কাজে আত্মোৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। সমাজসংস্কারের মধ্যে তাঁরা গুরুত্ব দিয়েছিলেন জনগণের শিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষা, হিন্দু বিধবাবিবাহ ও পর্দাপ্রথার অপসারণ।[১৭৪] বিপিনচন্দ্র ব্যক্তিগত জীবনেও সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা পালন করলেন। ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেছিলেন বলে তাঁর পিতা তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন। ১৮৭৭ থেকে ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় তিনি পিতার সাহায্য বঞ্চিত ছিলেন। পুনরায় পুত্রলাভ করার জন্য তিনি ৬৪ বছর বয়সে আবার এবং তাঁর জীবনে তৃতীয় বার বিবাহ করেন। পুত্রের কাছে কঠোরে করুণে মেশানো এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন, "...এই বিবাহ দ্বারা আমি তোমার ধর্মকার্যের সুবিধার জন্য একটি অপ্রত্যাশিত সুযোগ দিলাম। তুমিও দুর্গামোহন দাশের মতো আত্মসন্তোষ লাভ করো নিজ বিধবা বিমাতার পুনর্বিবাহ দিয়ে।"[১৭৫] ১৮৮১ সালে তিনি শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রতিপালিতা নৃত্যকালী নামে এক ব্রাহ্মণ বিধবাকে বিবাহ করেন। বোম্বাই এর প্রার্থনাসমাজের অন্যতম নেতা মাধোদাস রঘুনাথ দাস এবং ব্রাহ্ম প্রচারক রজনীনাথ রায়ের উৎসাহে সেই বিবাহ বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত হল। শিবনাথের উপস্থিতিতে বোম্বাই শহরের প্রার্থনাসমাজ মন্দিরে অনুষ্ঠিত সেটিই ছিল ঐ শহরের প্রথম ব্রাহ্মবিবাহ।[১৭৬] প্রখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ সুন্দরীমোহন দাস ১৮৮২ সালে বিবাহ করেন বৈদ্যবংশীয়া বিধবা হেমাঙ্গিনী রায়কে, ইনি মেডিকেল কলেজে নার্সিং পড়তেন, সেখানেই তরুণ চিকিৎসকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় নিবিড় হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মমতে এই বিবাহের অনুষ্ঠান হয়েছিল, পৌরহিত্য করেছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।[১৭৭] শ্রীনাথ চন্দ্রের বালবিধবা ভগিনী

---

১৭৪ *আমার জীবন ও সমকাল*, পৃ:পৃ: ১৭০-১৭২।

১৭৫ তদেব, পৃ: ১৮০।

১৭৬ তদেব, পৃ:পৃ: ২২৭-২২৮।

১৭৭ মহিলা ডাক্তার, ভিনগ্রহের বাসিন্দা, পূর্বোক্ত, পৃ: ২২।

শ্রীমতী সারদার সঙ্গে ১৮৭২ সালের অক্টোবর মাসে গোপালচন্দ্র ঘোষ নামে এক বিপত্নীক ভদ্রলোকের বিবাহ সম্পন্ন হল।[১৭৮] বিধবাদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করেছিলেন শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৮৭ সালে পোষ্ট অফিসের সুপারিন্টেন্ডেন্টের চাকরি ছেড়ে বরানগরে বিধবাশ্রম ও মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন এবং ১৮৯০ সরকার বরানগর মহিলা বিদ্যালয়ের জন্য ৭৫ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করলেন। বিধবাশ্রম চালাতে শশীপদকে অসীম বাধা পেরোতে হয়েছিল। তবুও এখানে থেকে বিধবা মহিলারা শিক্ষা লাভ করে উপযুক্ত পাত্রের সহিত পরিণীতা হয়েছিলেন বা শিক্ষয়িত্রীর কাজ পেয়েছিলেন। ১৮৮৭ সালে সিলেট থেকে আগত এক বিধবা মহিলা এই আশ্রমে আশ্রয়লাভ করে লেখাপড়া শেখেন। ১৮৯০ সালে তাঁর বিবাহ এই আশ্রম থেকেই সম্পন্ন হয়। আরেকজন এখানে লেখাপড়া শিখে শিক্ষিকা হিসাবে তাঁর জীবন নির্বাহ করেছিলেন।[১৭৯]

১৮৭৬ সালে শিবনাথের নেতৃত্বে গঠিত যে সমিতিতে বিপিনচন্দ্র পাল সহ কয়েকজন তরুণ দীক্ষা নিয়েছিলেন, সেখানে শিবনাথ শাস্ত্রী কয়েকজন সঙ্গীসহ শপথ গ্রহণ করলেন যে যদি তাঁরা অবিবাহিত হন তবে পুরুষরা একুশ বছর ও কন্যার ষোল বছর বয়সের আগে তাঁরা বিবাহ করবেন না।[১৮০] অবশ্য বহুদিন থেকেই বাল্যবিবাহের ত্রুটিসমূহ সম্বন্ধে সমাজ সচেতনতার প্রকাশ ঘটেছিল। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় মহেশচন্দ্র দেব নারীর অবরোধ, অভিভাবক নির্দিষ্ট বিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবার পুনর্বিবাহের উপর বিধিনিষেধ ইত্যাদি সমস্যা আলোচনা সূত্রে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে তীব্র মত ব্যক্ত করেছিলেন।[১৮১] ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গ ল স্পেক্টেটর পত্রিকায় 'কস্যচিৎ বঙ্গো' স্বাক্ষরিত একটি পত্রে বাল্যবিবাহের দোষগুলি প্রকাশ করে এই প্রথা নিবারণ করার আহ্বান জানানো হয়েছিল। ১৮৪৩ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হলে শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্ত অত্যন্ত বলিষ্ঠ যুক্তির সাহায্যে বাল্যবিবাহ যে অনিষ্টময় তা প্রমাণ করলেন এবং এই প্রথার বিরোধিতা করলেন। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকাতে কয়েক কিস্তিতে বাল্যবিবাহবিরোধী পত্র প্রকাশিত হল।[১৮২] ১৮৫০-এর দশকে বাল্যবিবাহ বিরোধী আলোচনা আরো ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়ল। ১৮৫০ সালে 'সর্বশুভকরী পত্রিকা'য় বিদ্যাসাগর মহাশয় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। ঐ প্রবন্ধটির নাম 'বাল্যবিবাহের দোষ'। যে বিদ্যাসাগর পরবর্তীকালে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে বারংবার শাস্ত্রের দোহাই দিয়েছিলেন, তিনি কিন্তু বাল্যবিবাহ যে অত্যন্ত নির্দয় ও নৃশংস প্রথা তা প্রমাণ করতে কোন শাস্ত্রের সাহায্য নেননি। সহজ বুদ্ধি ও নিজস্ব যুক্তির সাহায্যেই তিনি কাজটি করেন।[১৮৩] বাল্যবিবাহের বিরোধিতায়

১৭৮ শ্রীনাথ চন্দ্র, *ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর,* ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ, পৃ:পৃ: ১২২-১২৩।

১৭৯ শ্রী কুলদাপ্রসাদ মল্লিক, ভাগবতরত্ন, বি. এ., ব্রহ্মর্ষির জীবনে ভগবানের কৃপার জয়, কলিকাতা, ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ।

১৮০ আমার জীবন ও সমকাল, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৭১।

১৮১ *স্পন্দিত অন্তর্লোক,* পূর্বোক্ত, পৃ: ৫৯।

১৮২ যোগেশ চন্দ্র বাগল, *বাংলার নব্য সংস্কৃতি,* বিশ্বভারতী, ১৯৫৮, পৃ: ৭৪।

১৮৩ স্বপন বসু, *সমকালে বিদ্যাসাগর,* পূর্বোক্ত, পৃ: ৩।

পিছিয়ে ছিলেন না রক্ষণশীলরাও। রক্ষণশীল কালীপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার'-এর মতো পত্রিকাতেও ধারাবাহিকভাবে *"Early Marriage — the source of much evil in India"* নামে একটি রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।[১৮৪] ১৮৬০-এর দশকে কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজের সমাজসংস্কার প্রচেষ্টা বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে চালিত হল। কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত সঙ্গতসভা এ বিষয়ে জনমত সচেতন করার কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। বাল্যবিবাহ বিরোধী আন্দোলন ঢাকা, বরিশাল ইত্যাদি শহরেও প্রবলাকার ধারণ করল। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর ভ্রাতা নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঢাকায় 'বাল্যবিবাহ নিবারণী সভা' স্থাপন করেছিলেন। কিছুদিন পরে ঐ সভা থেকে 'মহাপাপ বাল্যবিবাহ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকল। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে 'হিন্দু রঞ্জিকা পত্রিকা' বাল্যবিবাহই যে দেশের উন্নতির অন্যতম প্রতিবন্ধক এরকম সচেতনতা গড়ে তুলতে চেষ্টা করল। কেশবচন্দ্রের বহু আয়াসসাধ্য সক্রিয় আন্দোলনের পর ভারত সরকার ১৮৭২ সালে বিশেষ বিবাহ বা তিন আইন পাস করলেন। এই আইন অনুসারে বিবাহে কন্যার নিম্নতম বয়স চৌদ্দ ও পাত্রের নিম্নতম বয়স আঠারো নির্দিষ্ট হয়।

এই আইন বাল্যবিবাহকে অবৈধ বলে ঘোষণা করল, বহুবিবাহকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য করল, বিধবাবিবাহ এবং অসবর্ণ বিবাহকে স্বীকৃতি দিল এবং বিবাহ অনুষ্ঠানকে ধর্মীয় বিধি বিধান থেকে মুক্তি দিল। তবে, এই আইনটি সমাজের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশে প্রযোজ্য ছিল। কারণ এই আইন অনুযায়ী বিবাহ করতে গেলে বিবাহকারীকে প্রতিজ্ঞা করতে হত যে তিনি প্রচলিত হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদি প্রভৃতি কোন ধর্মে বিশ্বাস করেন না এবং ঐসব ধর্মের নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করবেন না। তাই বৃহত্তর হিন্দুসমাজ এই আইন বিষয়ে উদাসীন ছিল, কারণ এই আইন তাদের সম্পর্কে প্রযোজ্য ছিল না।[১৮৫]

কাজেই, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ অগ্রণী সমাজসংস্কারকরা যখন বাল্যবিবাহ না করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন তখনও সমাজব্যবস্থায় বাল্যবিবাহ বেশ প্রচলিত ছিল। বাল্যবিবাহের দোষগুণ নিয়ে পত্রপত্রিকায় যথেষ্ট লেখালেখি হচ্ছিল। ভারতী[১৮৬] পত্রিকায় জনৈক রসিকলাল সেন বাল্যবিবাহের দোষগুণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। রসিকলাল সেন অবশ্য প্রথমেই বলে নিয়েছেন যে বাল্যবিবাহ বলতে এখন আমাদের দেশে বোঝায় মেয়েদের ১০ থেকে ১৪ এবং ছেলেদের ১৬ থেকে ২২ বছরের মধ্যে বিবাহ। অর্থাৎ রসিকলাল সেন প্রথমেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে এদেশে আর আদৌ বাল্যবিবাহ নিয়ে আলোচনার অবকাশ আছে কিনা কারণ, বাল্যবিবাহ কি এদেশে আর আছে? তবুও তিনি বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন যে এইরকম বিবাহে "বালক পতি ও বালিকা পত্নী উভয়েরই শরীর সঙ্গে সঙ্গে মনও শীঘ্র রুগ্ন ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। তাহাদের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলি সম্যক বিকাশ

১৮৪ তদেব।

১৮৫ *শাণিত অন্তর্লোক*, পৃঃ পৃঃ ৬১-৬৩।

১৮৬ *ভারতী পত্রিকা, "বাল্যবিবাহ"*; শ্রী রসিকলাল সেন, ফাল্গুন ১২৯১।

পায় না; তাহাদের শরীর ও মনের সৌন্দর্য নষ্ট হইয়া যায়, এবং তাহারা শীঘ্রই অকর্ম্মণ্য জীবন ত্যাগ করিয়া ভবলীলা সম্বরণ করে।" তা সত্ত্বেও রসিকলাল মনে করেন যে "যে স্ত্রী মতিগতি মনপ্রাণ স্বামীতে অর্পণ করিয়াছে (কথাগুলো একটু তলাইয়া বুঝিবেন—অর্থাৎ যে স্ত্রী সর্ব-বিষয়ে স্বামীর অধীন হইতে ও নিজেদের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ লোপ করিতে শিখিয়াছে) সেই স্ত্রীই আমাদের আদর্শ সতী।" আর এরকম আদর্শ সতী বাল্যবিবাহ ছাড়া হওয়া সম্ভব নয়। বাল্যবিবাহ জোর করে উঠিয়ে দিয়ে "দেশে গুপ্ত প্রণয়, আর্থিক সম্বন্ধ, পরিত্যক্ত-সন্তানাদি এবং আরো অনেক প্রকার অনিষ্টের সংখ্যা বাড়িবে কিনা এটা কি বিশেষ ভাবনার কথা নহে"? তাছাড়া, এদেশে একান্নবর্তী পরিবার প্রথা প্রচলিত, "বাস্তবিক যৌবন বিবাহ ও একান্নভুক্ত পরিবার কখনই এক সমাজে একত্র প্রচলিত থাকিতে পারে না।" কারণ "বাল্যবিবাহিত স্ত্রী শ্বশুরালয়ে আসিলে সে ছেলেমানুষ বলিয়া স্বামীর আত্মীয়গণ তাহার কোন প্রকার আচরণেই প্রায় অসন্তুষ্ট হন না অন্তত অনেকটা মাপ করিয়া লন। এবং তাহার প্রতি যত্ন ও ভালবাসা দেখাইতে ত্রুটি করেন না। সেও তাঁহাদিগকে পিতা মাতা ভ্রাতা ইত্যাদি স্থানীয় করিয়া লয়। "বালিকা পত্নীরা বিধবা হলে তাদের ইহজীবনে আর কোন সুখ বর্তমান থাকে না, এই বিধবাদের সন্তান "সম্বন্ধেও একটি ঘোরতর অনিষ্ট লক্ষিত হয়।" এক্ষেত্রে রসিকলাল সেন পরামর্শ দিয়েছেন "বিধবাবিবাহ প্রচলিত করতে চেষ্টা কর।" বাল্যবিবাহে দোষ ও গুণ পর্যায়ক্রমে অবলোকন করে তিনি সিদ্ধান্তে এসেছেন যে আইন দ্বারা বাল্যবিবাহ করার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করা উচিত নয়, তার চেয়ে "মেয়েদের অধিক বয়সে বিবাহ দিবার যে সামাজিক প্রতিবন্ধক আছে তাহা রহিত করিয়া স্বাধীন বিবাহ প্রবর্তিত করার চেষ্টা করা উচিত। বিবাহ সম্বন্ধে বয়সের কোন বাধা না থাকিলে যার ইচ্ছা সে নিজ সুবিধামত অল্প বা অধিক বয়সে বিবাহ করিতে পারে।... অধিক বয়সে বিবাহিত হইবার বাধা রহিত করা ও বাল্যবিবাহের প্রথা রহিত করা একই কথা নহে।"

ভারতী পত্রিকাতেই[১৮৭] শ্রী রসিক লাল সেনের প্রবন্ধের একটি প্রতিবাদ প্রকাশিত হল। শ্রী হরকালী সেন পাল্টা মত প্রকাশ করলেন যে, "...বাল্যকাল হইতে স্বামী ও স্ত্রী একত্রে বাস করিলে তাহাদের দাম্পত্য প্রেম দৃঢ় হয়। এ কথা কি সত্য? দুই এক স্থলে হইলেও হইতে পারে কিন্তু অধিকাংশ স্থলে হয় না। বালক বালিকাদের পরস্পরের প্রতি যে ভালাবাসা থাকে তাহা কি দাম্পত্য প্রেম না তাহা হইতে দাম্পত্য প্রেম সঞ্চারিত হয়।" বাল্যবিবাহ মেয়েদের সমস্ত রকম প্রগতি হন্তারক একথা দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করতে গিয়ে হরকালী সেন বললেন : "স্বার্থপর পুরুষ। তোমার সুখের ব্যাঘাত হইবে বলিয়া তুমি স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্যজ্ঞান ও ধর্ম্মবুদ্ধিকে মলিন করিতে চাহ, তুমি স্ত্রীলোককে শিক্ষা দিতে চাহ না, পাছে সে শিক্ষিত হইয়া আপনার স্বাধীন মত দ্বারা পরিচালিতা হয়, পাছে সে তোমার মতে মত না দেয়। আজ যদি আমাদের স্ত্রীলোকেরা শিক্ষা ও স্বাধীনতা পাইত তাহা হইলে অনেক স্বামীকে স্ত্রীর সহিত সাবধানে কথাবার্তা ও ব্যবহার করিতে হইত যথেচ্ছাচারী হইয়া স্ত্রীকে পদ দ্বারা দলন করা বড় কঠিন

১৮৭ *ভারতী পত্রিকা, "বাল্যবিবাহ প্রতিবাদ"*, শ্রী হরকালী সেন, চৈত্র ১২৯১।

হইয়া পড়িত।" কিন্তু স্ত্রী যদি স্বামীর পাশে দাঁড়াতে না পারে তাহলে শেষপর্যন্ত যে পুরুষের সমূহ ক্ষতি তা জানাতে দ্বিধা করেননি লেখক : "আমার স্ত্রী যদি আমার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের সহায় না হন তাহা হইলে বিবাহ করিয়া সুখ কোথায়? যে স্ত্রীর সহিত আমার এত নিকট সম্বন্ধ সেই যদি আমার দরিদ্রতার সময় কিছু সাহায্য করিতে না পারেন যদি আমার পাপকার্য্য করতে ইচ্ছা হইলে আপনাদের স্বাধীন মত ও ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা আমাকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে না পারেন, যদি আমি কোন ভ্রমে পড়িলে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আমার ভ্রম সংশোধন করিয়া দিতে না পারেন, যদি অন্যায় কার্য্য করিলে আমাকে ভর্ৎসনা না করেন তাহা হইলে বিবাহ করিয়া লাভ কি?"

বাল্যবিবাহের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দিহানই শুধু নয় এর কট্টর বিরোধী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্রূপ শাণিতকলমে লিখলেন : "বাল্যবিবাহ আর এক বিষম রীতি। শুধু বঙ্গদেশে নয় ভারতের সর্ব্বত্রই ইহার গরলময় ফল প্রত্যক্ষ করা যায়। কন্যাকে কত ছোট বয়সে পিতামাতা গৃহ হইতে বিদায় করিয়া যে কি স্বর্গসুখ লাভ করেন তাহা আমি ভাবিয়া পাই না। পুত্রের বিদ্যা শিক্ষা তাহার স্বাধীন বৃত্তি উপার্জ্জনের উপায় করিয়া দেওয়া—এ সকল গুরুতর কর্ত্তব্য ছাড়িয়া দিয়া সর্বাগ্রে তাহার বিবাহ পুতুলে পুতুলে বিয়ের মতন। একজন গাইকওয়াড় ছিলেন তিনি পায়রার বিয়ে দিতে বড় ভালবাসিতেন—তাঁহার সভাসজ্জন নিমন্ত্রণ করিয়া খুব ধূমধামে কপোত কপোতীর বিবাহোৎসব অনুষ্ঠান করিতেন—এইসব বালকবালিকার বিবাহ অনেকটা সেইরূপ।"[১৮৮] সত্যেন্দ্রনাথ যে সময় এই পত্র 'ভারতী' পত্রিকায় লিখেছিলেন সে সময় বোম্বাইয়ের বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক বেহরামজি মারওয়ানজি মালাবারি বাল্যবিবাহ ও বিধবাসমস্যা সংক্রান্ত পুস্তিকা *Notes on Infant Marriage and Endorced Widowhood (1884)* পদস্থ কর্মচারী ও জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার করেন। ফলে বাল্যবিবাহের কুফলগুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতনতা জাগ্রত হয় এবং সরকারও সমস্যাগুলি বিষয়ে সম্যক অবহিত হন। এই সচেতনতা বহন করে সত্যেন্দ্রনাথ লিখলেন : "মালাবারি নামক প্রসিদ্ধ পারসী লেখক বাল্যবিবাহ ও বলাৎকার বৈধব্য বিষয়ে এক প্যামফ্লেট লিখিয়াছেন, তাহা লইয়া সংবাদপত্রে অনেক বাদানুবাদ চলিতেছে। এখন প্রশ্ন এই যে বাল-বিবাহ নিবারণের জন্য কোন আইন করা বিধেয় কিনা? অনেকে ইহার বিপক্ষে মত দিবেন সন্দেহ নাই, তাঁহারা বলিবেন আচার সংশোধনের জন্য গবর্নমেন্টের শরণাপন্ন হওয়া অন্যায়। কিন্তু আমি দেখিতেছি ইহার পক্ষে অনেক কথা বলিবার আছে। সমাজের সুখশান্তি রক্ষণ অনিষ্ট নিবারণ এই উদ্দেশ্যেই আইন প্রবর্তিত হয়—তাহাতে কখন যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার খর্বতা হয় তাহার উপায়ান্তর নাই। এই স্বাধীনতাটুকু হরণ করা সমাজের উপকারের জন্যই অনেক সময় আবশ্যক হয়।"[১৮৯] তবে সত্যেন্দ্রনাথ একথাও বিশ্বাস করতেন যে শুধু আইন করে এ কুপ্রথা দূর করা যাবে না, "সে যাহা হউক আমাদের সমাজসংস্কারকেরা চেষ্টা করিলে এ কুরীতি উৎপাটনে কতক

১৮৮ *প্রবাস পত্র*, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ভারতী পত্রিকা*, বৈশাখ ১২৯১।

১৮৯ তদেব।

পরিমাণে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই, আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা মিলিয়া যদি এক সমাজ বন্ধন করিয়া অমুক বয়সের আগে বিবাহ করিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন তাহা হইলে আপনা হইতেই ক্রমে বিবাহের নিয়ম পরিশুদ্ধ হইয়া আসিবে।"[১৯০]

সত্যেন্দ্রনাথ যেমন মালাবারির প্রচেষ্টা সম্পর্কে একটি সুষম দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন যে আইন করে বাল্যবিবাহ বন্ধ করার মধ্যে কোন অন্যায় নেই, ক্ষমতাসীন সরকারের সে ক্ষমতা আছে, যদিও সে সরকার ভিন্নদেশী, আবার সমাজসচেতনতা না থাকলে আইন করে কোন কুপ্রথা বন্ধ করা যায় না, কিন্তু সে সময় অধিকাংশ সমাজ সচেতন ব্যক্তিই হয় এই প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন নতুবা বিপক্ষে ছিলেন। ১৮৯১ সালে যখন ভারতীয় আইনসভায় যে সহবাস সম্মতি বিল পেশ করা হল মালাবারির উদ্যোগে তার পক্ষে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ প্রগতিবাদী ব্যক্তিরা জনসমর্থন লাভ করার চেষ্টা করতে লাগলেন।[১৯১] আবার, বালগঙ্গাধর তিলক এই বিলকে জাতীয় স্বার্থবিরোধী বলে আখ্যা দিলেন। তাঁর মতে এটি ছিল হিন্দু সমাজব্যবস্থায় ব্রিটিশরাজের হস্তক্ষেপের একটি উদাহরণ, যার বিরুদ্ধে তিনি মহারাষ্ট্রে এক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুললেন। অন্যদিকে, বিপিনচন্দ্র পাল নিজে বিদেশীদের অনুকরণে সমাজসংস্কারের বিরোধী হলেও তৎকালীন পরিবেশে এই বিলের প্রয়োজন অনুভব করে একে স্বাগত জানালেন।[১৯২] বাল্যবিবাহ প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্রের মত ও দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটা কাছাকাছি ছিল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দেই পাশ হল সহবাস সম্মতি বিল। এর দ্বারা স্ত্রীর বার বছর পূর্ণ হওয়ার আগে তার সঙ্গে সহবাস করা নিষিদ্ধ হল। বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ করার বিষয়ে এই আইন একটি অতি দুর্বল বিকল্প[১৯৩] কিন্তু গোঁড়া হিন্দুদের মধ্যে প্রতিবাদের 'ঝড় উঠত' তা সতীদাহ প্রথারোধের বিরুদ্ধবাদীদের কথা মনে পড়িয়ে দিল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় এক প্রতিবাদ সভায় জগন্নাথ কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ কুঞ্জলাল নাগ প্রবল প্রতিবাদ করলেন। ঢাকায় অনুষ্ঠিত পরবর্তী আর এক প্রতিবাদ সভায় বহু মুসলমান জমিদার ও আইনজীবী তীব্র প্রতিবাদ করে জানালেন যে এর ফলে সুযোগসন্ধানীরা মেয়েদের ইজ্জৎ নষ্ট করবে। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও অন্যান্য রক্ষণশীল নেতাদের উদ্যোগে কলকাতায় যেসব বড় বড় সভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে শিক্ষিত হিন্দুসমাজে অধিকাংশের মত আইনটির বিরুদ্ধে ছিল। এঁদের আপত্তির প্রধান কারণ ছিল এই যে কন্যা যদি বার বৎসরের আগেই ঋতুমতী হয় তবে হিন্দুশাস্ত্র মতে তার গর্ভাধান সংস্কার হতে পারে না আর উপযুক্ত সংস্কারের আগেই যদি গর্ভসঞ্চার হয় তাহলে সেই গর্ভজাত পুত্র "শাস্ত্রানুসারে বর্ণাশ্রম

১৯০ তদেব।

১৯১ *স্মপিত অন্তর্লোক*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৪।

১৯২ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবন ও মনন, পূর্বোক্ত, পৃ: ২০১।

১৯৩ *"It was a poor substitute for the prohibition of early marriage of girls,..."* R. C. Majumdar ed. *The British Paramountcy and Indian Renaissance II.* পূর্বোক্ত, p. 283.

ধর্মের, পিণ্ডদান, তর্পণাদির উপযুক্ত অধিকারী হয় না।"[১৯৩(ক)] এই মতের আক্ষরিক সমর্থন জানালেন বিদ্যাসাগর : "...উক্ত বিল আইনে পরিণত হইলে সর্ববিধায়ে গর্ভাধান সংস্কারানুষ্ঠানের প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইবে। গর্ভাধান সংস্কার শাস্ত্রবিহিত; সকলের পক্ষে অনুষ্ঠেয় ও সাধারণ বঙ্গদেশে প্রচলিত।...সুতরাং রাজবিধি দ্বারা উক্ত ধর্মানুষ্ঠানের প্রতিরোধ করিলে ... জনসমাজে ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ... আমার প্রস্তাব এই যে, স্ত্রী রজঃস্বলা হইবার পূর্বে তৎসহবাস দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া নির্দিষ্ট হউক। অধিকাংশ বালিকা ত্রয়োদশ, চতুর্দশ অথবা পঞ্চদশ বর্ষের পূর্বে প্রায় রজঃস্বলা হয় না। সুতরাং আমার প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হইলে, তাহাদিগকে প্রস্তাবিত আইন অপেক্ষাকৃত বাস্তবিক ও অধিকতর প্রশস্ত আশ্রয় প্রদানে সমর্থ হইবে, তৎসঙ্গে ধর্মানুষ্ঠানের বিরোধী বলিয়া উক্ত বিধির বিরুদ্ধে কোনপ্রকার আপত্তি উত্থাপিত হওয়া সম্ভবপর নহে।"[১৯৩(খ)]

বিদ্যাসাগর ১৮৯১ সালের সহবাস সম্মতি আইনের যে বিরোধিতা করলেন, তাতে ঠিক বাল্যবিবাহের বিরোধিতা প্রতিফলিত হল না। বরঞ্চ, এই আইন হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রের অনুশাসনকে লঙ্ঘন করছে এরকম একটা সমালোচনা প্রতীয়মান হল। এই অনুশাসন হল হিন্দু বালিকা রজঃস্বলা হবার পরে তার গর্ভাধান সংস্কার অবশ্যকর্তব্য আর বিবাহ না হলে বৈধভাবে গর্ভাধান সংস্কার হওয়া সম্ভবপর নয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও সহবাস সম্মতি আইনের বিরোধিতা করলেন, তবে এই বিরুদ্ধতা বিদ্যাসাগরের প্রতিবাদের চেয়ে ভিন্নজাতের ছিল। শ্রীকৃষ্ণের প্ররোচনায় ও সমর্থনে অর্জুন সুভদ্রাকে বলপূর্বক হরণ করে রাক্ষসবিবাহ সম্পন্ন করলে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে সমর্থন করে লিখলেন : "আমাদিগের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, "রিফর্মরই" আদর্শ মনুষ্য, এবং কৃষ্ণ যদি আদর্শ মনুষ্য, তবে মালাবারি ধরনের রিফর্মর হওয়াই তাঁহার উচিত ছিল, এবং এই কুপ্রথার প্রশ্রয় না দিয়া দমন করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা মালাবারি ঢংটাকে আদর্শ মনুষ্যের গুণের মধ্যে গণি, সুতরাং এ কথার কোন উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করি না।"[১৯৩(গ)] কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আবশ্যক বিবেচনা না করার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে রাক্ষস বিবাহ এই প্রথাটি তিন কারণে নিন্দনীয় হতে পারে, কন্যার প্রতি অত্যাচার, তার পিতৃকুলের প্রতি অত্যাচার আর সমাজের প্রতি অত্যাচার। অর্জুনের সঙ্গে বিবাহ হয়ে সুভদ্রার পরম মঙ্গল সাধিত হয়েছিল বলে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেছিলেন, সুভদ্রার পিতৃকুলও অত্যাচারিত হয়নি, কারণ কৃষ্ণ স্বয়ং এই বিবাহের মঙ্গলময়তা সম্বন্ধে যাদব কুলপতিদের বিশ্বাস অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং যাদবগোষ্ঠী পরে মহাসমারোহে অর্জুন ও সুভদ্রার বিবাহ সম্পন্ন করেছিলেন। সমাজের প্রতি অত্যাচার সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বললেন : "যে বলকে সমাজ অবৈধ বল বিবেচনা করে, সমাজ মধ্যে কাহারও প্রতি বল প্রযুক্ত

১৯৩(ক) *সমকালে বিদ্যাসাগর*, পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ১১ ১২।

১৯৩(খ) বিহারীলাল সরকার, *বিদ্যাসাগর*, পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ৩৬৭-৩৬৯।

১৯৩(গ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিম রচনাবলী*, ২য় খণ্ড (উপন্যাস ব্যতীত সমগ্র বাংলা রচনা), সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা ৯, কৃষ্ণচরিত্র, পৃ: ৫০৩।

হইলেই সমাজের প্রতি অত্যাচার হইল। কিন্তু যখন তাৎকালিক আর্য্যসমাজ ক্ষত্রিয়কৃত এই বলপ্রয়োগকে প্রশস্ত ও বিহিত বলিত, তখন সমাজের আর বলিবার অধিকার নাই যে, আমার প্রতি অত্যাচার হইল। যাহা সমাজসম্মত, তদ্দ্বারা সমাজের উপর কোন অত্যাচার হয় নাই।"[১৯৪] কৃষ্ণকে সমর্থন করা বাহুল্য বোধ করেও বঙ্কিমচন্দ্র এত বিশদ ব্যাখ্যা দিলেন এই কারণে "বিলাত হইতে যে ছোট মাপকাঠিটি আমরা ধার করিয়া আনিয়াছি, সে মাপকাঠিতে মাপিলে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষাগত অতুল সম্পত্তি অধিকাংশ বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। আমাদিগের সেই একবারি গজ বাহির করা চাই।"[১৯৫]

বঙ্কিমের বিদ্রূপাত্মক মন্তব্যের প্রতিচ্ছায়া দেখতে পাওয়া যায় সহবাস সম্মতি আইন সম্পর্কে তিলকের মন্তব্যে : "আমরা অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং নির্লজ্জভাবে এক অসভ্য জাতিরূপে চিত্রিত হয়েছি; সমাজ সংস্কারকগণ নির্লজ্জভাবেই তা প্রমাণ করেছে, এই সমাজ সংস্কারকগণ অন্য একটি জাতি গড়ে তুলুক। আমাদের স্বজাতীয়দের মধ্যে এরূপ বন্ধুরূপী শত্রুদেরকে থাকতে দেওয়া আদৌ উচিত নয়।"[১৯৬] তিলকের মতো বঙ্কিমচন্দ্রের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিলেন মালাবারি, তাঁর উদ্যোগে পাশ হওয়া সহবাস সম্মতি আইনটি নয়। বিদ্যাসাগর যখন বহুবিবাহ বন্ধ করার জন্য সরকারী আইন প্রণয়ন করানোর কথা ভাবছিলেন তখনও বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনা করেছিলেন "যদি বহুবিবাহ নিবারণ জন্য আইন হওয়া উচিত হয়, তবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্বন্ধেই সে আইন হওয়া উচিত। হিন্দুর পক্ষে বহুবিবাহ মন্দ, মুসলমানের পক্ষে ভাল, এমত নহে। কিন্তু বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া, মুসলমানের পক্ষেও তাহা কি প্রকারে দণ্ডবিধি দ্বারা নিষিদ্ধ হইবে?"[১৯৭]

বঙ্কিমচন্দ্রের আপত্তি ছিল এইখানে যে, যে সমাজের কল্যাণের জন্য মালাবারি গোষ্ঠী আন্দোলন করছিলেন সেই সমাজকেই মসীলিপ্ত করতে তাঁরা দ্বিধা করেননি। এই সংস্কারকার্যে তাঁরা সর্বদা শাস্ত্রের সহায়তা গ্রহণ করার চেষ্টা করেছিলেন। এর ফল কখনোই শুভ হতে পারে না বলে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন। তাই তিনি মন্তব্য করলেন : "বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক, বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করা তাহার একটি প্রধান। ...মনে করুন দেশসুদ্ধ লোক সকলেই স্বীকার করিল যে, বহুবিবাহ প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র বিরুদ্ধ। তাহাতে কি বহুবিবাহ প্রথা নিবারিত হইবে? আমরা সে বিষয়ে বিশেষ সংশয়াবিষ্ট। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে যে সকল সামাজিক প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা সকলই শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রচলিত হইবে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় পূর্ব্বে একবার বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়াছেন; প্রমাণ সম্বন্ধে কৃতকার্যও হইয়াছেন; অনেকেই তাঁহার মতাবলম্বী; কিন্তু কয়জন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক

১৯৪ তদেব, পৃ:পৃ: ৫০৩-৫০৪।

১৯৫ তদেব।

১৯৬ Charles H. Heimsath, *Indian Nationalism and Hindu Social Reform*, Princeton University Press, Princeton, 1964, p. 173.

১৯৭ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *"বহুবিবাহ", বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ, বঙ্কিম রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩১৮।

বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা বা অনুষ্ঠেয়তা অনুভূত করিয়া আপন পরিবারস্থা বিধবাদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ দিয়াছেন?"[১৯৮] তাই, যখন মালাবারির বাল্যবিবাহ নিবারণ প্রচেষ্টা সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করল, আর সেই সময় তাঁর "বিবিধ প্রবন্ধ" (দ্বিতীয় ভাগ) গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় প্রকাশিত "বহুবিবাহ" প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত করতে সম্মত হলেন, তখন তার ভূমিকায় তিনি লিখলেন : "...বহুবিবাহ বিষয়ক প্রবন্ধটি অখণ্ড পুনর্মুদ্রিত করতে পারিলাম না। বিদ্যাসাগর মহাশয় এক্ষণে স্বর্গারূঢ়, তীব্র সমালোচনায় তাঁহার আর কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।... অতএব যেটুকু তাঁহার গ্রন্থের সমালোচনা, এবং যাহা মল্লিখিত প্রবন্ধের তীব্রাংশ, তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি। যাহা পুনর্মুদ্রিত করিলাম, তাহা যাঁহারাই রাজব্যবস্থার দ্বারা অথবা প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের বিচারের দ্বারা সমাজসংস্কার বা সমাজ বিপ্লব উপস্থিত করিতে চাহেন, তাঁহাদের সকলের পক্ষেই খাটে। তাঁহাদের দিল এখনও অপরাজিত ও অক্ষুণ্ণ। সেই সম্প্রদায়ভুক্ত খ্যাতি বা অখ্যাতির জন্য লালায়িত মালাবারি নামে একজন পারসী সে দিন একটা হুলস্থূল উপস্থিত করিয়াছিল। অতএব স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন হইয়াও এ প্রবন্ধের সম্পূর্ণ বিলোপও করিতে পারিলাম না।"[১৯৯]

অতএব, বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা ছিল "মালাবারির দলের সমাজসংস্কারকদের প্রতি", সমাজসংস্কারের প্রতি নয়। কারণ, মালাবারির আক্রমণের ফলে যে আইন বিধিবদ্ধ হয়েছিল তার দ্বারা সমস্ত হিন্দুসমাজ নাবালিকা ধর্ষণকারী ও যৌন অপরাধী বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল। কাজেই যে সমাজের উন্নতির জন্য এঁরা সক্রিয় ও সচেষ্ট হয়েছিলেন সেই সমাজকেই এঁরা চূড়ান্ত অবমাননার বিষয় করে তুলেছিলেন।[২০০] বিবেকানন্দও সমাজসংস্কারকদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না, তিনিও তাঁদের সমালোচনা করেছিলেন। অবশ্য এর পেছনে বিবেকানন্দের কিছু ব্যক্তিগত অসন্তোষ ছিল। কারণ শিকাগো ধর্মমহাসভার সাফল্যের পর যারা বিবেকানন্দের প্রতি অসূয়াপরবশ হয়ে "আমাকে তাড়িয়ে দিতে এবং না খাইয়ে মেরে ফেলতে তারা আমেরিকাবাসী সকলকে বলতে লাগল,"[২০১] দুর্ভাগ্যবশত "আমার একজন স্বদেশবাসীও এতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি ভারতের এক সংস্কারক দলের নেতা।...আমাদের বড় বড় সংস্কারকরা যে বলে থাকেন, খ্রীষ্টধর্ম এবং খ্রীষ্টশক্তি ভারতবাসীদের উন্নতি বিধান করবে, তা কি এ রকমভাবে করবে? অবশ্য যদি ঐ ভদ্রলোককে তার উদাহরণের মতো ধরা যায়, তাহলে বড় আশা আছে বলে মনে হয় না।"[২০২] ১৮৯৭ সালে বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে ফিরে এলে সমাজসংস্কারকরা এই বলে তাঁকে আক্রমণ করেছিলেন যে তাঁর সন্ন্যাসী হওয়ার কোন অধিকার নেই। প্রত্যুত্তরে বিবেকানন্দ নিজেকে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলে দাবী করে বললেন : "উক্ত সম্পাদকের আমাদের

১৯৮ তদেব, পৃ: পৃ: ৩১৫-৩১৬।
১৯৯ তদেব, *বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ*, বিজ্ঞাপন, পৃ:পৃ: ৩১।
২০০ রাখালচন্দ্র নাথ, উনিশ শতক: ভাব-সংঘাত ও সমন্বয়, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলিকাতা ১২, ১৯৮৮, পৃ: ৮৫।
২০১ *বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র*, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা-৭৩, *আমার সমরনীতি*, পৃ: ৭২৩।
২০২ *তদেব*।

দেশের ইতিহাস জানা উচিত ছিল। আমাদের তিন বর্ণ সম্পর্কে তাঁর কিছু জ্ঞান থাকা উচিত ছিল; তাঁর জানা উচিত ছিল যে, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈশ্য — তিন বর্ণেরই বেদে সমান অধিকার।" এরপরেই তিনি তাঁর নিন্দাকারীদের প্রতি আক্রমণ করে বলেছেন যে "প্রায় একশ বছর ধরে এই সংস্কার আন্দোলন চলছে। কিন্তু তা দ্বারা খুব নিন্দা ও ঘৃণাহীন সাহিত্যের সৃষ্টি ছাড়া কী উপকার হয়েছে? ভগবানের ইচ্ছায় এটা না হলেই ভাল ছিল। তাঁরা পুরোনো সমাজের কঠোর সমালোচনা করেছেন;ওটার ওপর সাধ্যমতো দোষারোপ করেছেন, ওর ভীষণ নিন্দা করেছেন; শেষে পুরোনো সমাজের লোকেরা তাঁদের সুর ধরেছেন, ঢিলটা খেয়ে পাটকেলটা মেরেছেন; আর তার ফল হয়েছে এই যে, প্রত্যেকটা দেশীয় ভাষায় এমন এক সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে, যাতে সমস্ত জাতির সমস্ত দেশের লজ্জিত হওয়া উচিত। এটাই কি সংস্কার?"[২০৩]

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ উভয়েই সমাজসংস্কার প্রণালীর প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করেছেন। তাঁদের দুজনেরই সমাজসংস্কার সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা ছিল। বিবেকানন্দ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন : "আমি সাময়িক সংস্কারে বিশ্বাস করি না, আমি স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী। আমি নিজেকে ভাগবানের জায়গায় বসিয়ে সমাজকে এই বলে আদেশ করতে সাহস করি না যে, 'তোমায় এদিকে চলতে হবে, ওদিকে নয়।' আমি শুধু সেই কাঠবিড়ালের মত হতে চাই, যে রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের সময় যথাসাধ্য একমুঠো বালি বয়েই নিজেকে ধন্য মনে করেছিল — এই আমার ভাব।"[২০৪] অথচ বিবেকানন্দ যে ভারতীয় সমাজের দোষত্রুটি স্বীকার করতে পরাঙ্মুখ ছিলেন তা নয়, তিনি নিরপেক্ষভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজের তুলনা করে বলেছেন : "আমাদের সমাজে যথেষ্ট দোষ আছে; অন্যান্য সমাজেও আছে। এখানে বিধবার কষ্টে মাঝে মাঝে পৃথিবী ভেজে, সেখানে পাশ্চাত্য দেশে অবিবাহিত কুমারীদের দীর্ঘশ্বাসে বায়ু দূষিত। এখানে গরীবের জীবন বিষে জর্জরিত, সেখানে বিলাসিতার ছায়ায় সমস্ত জাতি বেঁচে মরে আছে;..."[২০৫] বিবেকানন্দের মতে সমাজসংস্কারকরা ভারতীয় সমাজের দোষগুলি এমনভাবে প্রচার করছেন যে বালক থেকে বিদেশী পর্যটক সকলেই একবাক্যে এই সম্বন্ধে দীর্ঘ ভাষণ দিতে পারবে, কিন্তু এই সমস্যা থেকে বেরোনোর রাস্তা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সমাজসংস্কার নয়, এ ধরনের সংস্কার ব্যর্থ হতে বাধ্য। বিবেকানন্দ নিজ বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করার জন্য একাধিক উদাহরণ উপস্থাপিত করেছেন। দাস ব্যবসায় বন্ধ করার জন্য আমেরিকায় যে গৃহযুদ্ধ হয়েছিল তা মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এক অতি গুরুত্বপূর্ণ যুগান্তকারী আন্দোলন। কিন্তু এর ফল দাঁড়াল এই যে যখন নিগ্রোরা দাস ছিল তখন তারা মালিকদের সম্পত্তি বলে গণ্য হত এবং মালিকরা নিজ স্বার্থেই দেখত যে তারা যেন দুর্বল বা অকর্মণ্য হয়ে না পড়ে। কিন্তু নিগ্রোরা যখন মুক্তি পেল তখন আর তাদের রক্ষা করার দায় কারো রইল না, তাদের জ্যান্ত পুড়িয়ে বা গুলি করে মেরেও ঘাতক আইনের কাছে মুক্তি পেয়ে যায় কারণ দাস ব্যবসা বন্ধ হয়েছিল ঠিকই কিন্তু নিগ্রোরা যে মানুষ, পশু নয়, এই

২০৩ তদেব, পৃ: ৭২৫।

২০৪ তদেব, পৃ: ৭২৪।

২০৫ তদেব।

অনুভূতির কোন অস্তিত্ব ছিল না।[২০৬] ভারতবর্ষেও আইন করে বিধবাবিবাহের প্রচলন করা হয়েছে কিন্তু এতে "শতকরা সত্তরজন ভারতীয় নারীর কোন স্বার্থই নেই। আর সবাইকে বঞ্চিত করে যে সকল ভারতীয় উঁচু জাতি শিক্ষিত হয়েছেন, তাঁদেরই জন্য এ রকমের সব আন্দোলন। নিজেদের ঘর পরিষ্কার করতে এবং বিদেশীদের চোখে ভালো হবার জন্য তাঁরা কিছুমাত্র চেষ্টার ত্রুটি করেননি। একে তো সংস্কার বলা যায় না। সংস্কার করতে হলে ওপর ওপর দেখলে চলবে না, ভেতরে ঢুকতে হবে, মূলদেশ পর্যন্ত যেতে হবে। একেই আমি 'সম্পূর্ণ সংস্কার' বা প্রকৃত সংস্কার বলে থাকি।"[২০৭]

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে সমাজসংস্কারের ধারণাতে একটা বড় রকমের পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তনের ভাবটি ছিল এইরকম যে ওপর থেকে আইন করে চাপিয়ে দেওয়া সংস্কার শেষপর্যন্ত অর্থহীন কারণ যে সমাজের সংস্কার করতে চাওয়া হচ্ছে সেই সমাজ সংশোধিত হবার বদলে আরো দুর্বল হয়ে পড়ছে, কারণ এই সব সংস্কার কেবল সমাজের ওপর তলাতেই সীমাবদ্ধ থাকছে, সমাজের মূলে এই সব সংস্কার কার্যের প্রভাব পৌঁছতে পারছে না। কাজে সমাজসংস্কার করতে গেলে আগে সমাজ পরিবর্তন করা দরকার, তাহলে আর আইন কবে বা আন্দোলন করে সংস্কার করতে হবে না, সমাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সংস্কৃত হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের চোখে যিনি আদর্শ সমাজসংস্কারক সেই শ্রীকৃষ্ণ "সমাজ সংস্থাপক বা *Social Reformer*" হইবার প্রয়াস পান নাই। দেশের নৈতিক এবং রাজনৈতিক পুনর্জ্জীবন *(Moral and Political Regeneration)*, ধর্ম্মপ্রচার এবং ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ইহা ঘটিলে সমাজসংস্কার আপনি ঘটিয়া উঠে—ইহা না ঘটিলে সমাজসংস্কার কোন মতেই ঘটিবে না। আমাদের খ্যাতিপ্রিয়তাই ইহার এক কারণ। সমাজসংস্কারক হইয়া দাঁড়াইলে হঠাৎ খ্যাতিলাভ করা যায়—বিশেষ সংস্করণ পদ্ধতিটা যদি ইংরেজি ধরনের হয়।...সমাজ সংস্করণ আর কিছুই হউক না হউক, একটা হুজুক বটে। হুজুক বড় আমোদের জিনিস। এই সম্প্রদায়ের লোকদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, ধর্ম্মের উন্নতি ব্যতীত সমাজসংস্কার কিসের জোরে হইবে। রাজনৈতিক উন্নতিরও মূল ধর্ম্মের উন্নতি। তাহা হইলে আর সমাজ সংস্করণের পৃথক্ চেষ্টা করিতে হইবে না। তা না করিলে, কিছুতেই সমাজসংস্কার হইবে না।"[২০৮]

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র আইন করে বা আন্দোলন করে সমাজসংস্কার করার পক্ষপাতী ছিলেন না। অথচ বাঙ্গালী সমাজে যে কোন সংস্কারযোগ্য গলতি নেই তিনি কখনো অস্বীকার করেননি। তিনি সমাজসংস্কারকদের কার্যধারা লক্ষ করে এবং তা অনুসরণ করে বাংলাদেশের মেয়েদের দুরবস্থার একটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা দিয়েছেন : "অস্মদেশে স্ত্রীপুরুষে যে ভয়ঙ্কর বৈষম্য তাহা এক্ষণে আমাদিগের দেশীয়গণের কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এবং

২০৬ তদেব, পৃ: ৭২৫।
২০৭ তদেব, পৃ: ৭২৫।
২০৮ কৃষ্ণচরিত্র, বঙ্কিম রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫০৬।

কয়েকটি বিষয়ে বৈষম্য বিনাশ করিবার জন্য সমাজ মধ্যে অনেক আন্দোলন হইতেছে। সে কয়টি বিষয় এই—

১ম। পুরুষকে বিদ্যাশিক্ষা অবশ্য করিতে হয়; কিন্তু স্ত্রীগণ অশিক্ষিত থাকে।

২য়। পুরুষের স্ত্রীবিয়োগ হইলে, সে পুনর্বার দার পরিগ্রহ করতে অধিকারী। কিন্তু স্ত্রীগণ বিধবা হইলে, আর বিবাহ করিতে অধিকারিণী নহে; বরং সর্বভোগ সুখে জলাঞ্জলি দিয়া চিরকাল ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে বাধ্য।

৩য়। পুরুষে যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যাইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকে গৃহপ্রাচীর অতিক্রম করিতে পারে না।

৪র্থ। স্ত্রীগণ স্বামীর মৃত্যুর পরেও অন্য স্বামী গ্রহণে অধিকারী নহে, কিন্তু পুরুষগণ স্ত্রী বর্ত্তমানেই, যথেচ্ছ বহুবিবাহ করিতে পারেন।"[২০৯] ১৮৭২ সালে যখন বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশ করলেন, তখন তিনি ঐ পত্রিকার লেখকদের বলেছিলেন যে সাহিত্যের আলোচনায় পাশ্চাত্য সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা প্রয়োগ করতে।[২১০] বঙ্কিমচন্দ্র শুধু যে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ্‌দের লেখার সঙ্গে সম্যক পরিচিত ছিলেন তা নয়, তাঁর দৈনন্দিন জীবনচর্যাতেও পাশ্চাত্য প্রভাব ছিল লক্ষণীয়। কলকাতায় তাঁর বৈঠকখানাতে সুন্দর এমব্রয়ডারী করা কার্পেট পাতা ছিল, দেওয়ালে অয়েল পেন্টিং ঝোলানো ছিল, বঙ্কিমের পিতার ও তাঁর নিজের প্রতিকৃতি ছিল। এছাড়া ছিল আকর্ষণীয় ডিভান চেয়ার প্রভৃতি রুচিসম্মতভাবে সাজানো। ঘরের কোণে একটি টেবিলের উপর ছিল হারমোনিয়াম। সুরেশ সমাজপতির এই বর্ণনা আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে যখন মনে করা যায় যে এই পশ্চিমীভাবাপন্ন বাঙ্গালী বা ভারতীয় সিভিলিয়ানের কলম থেকে বেরিয়েছে ধর্মতত্ত্বের মতো রচনা কিংবা নিবেদিতপ্রাণ সন্তানদলের কঠোর সাধনার প্রশংসা।[২১১] এর কারণ হল "ভাবতে আশ্চর্য লাগে, সার্ধ শতাব্দীর ঘোর আবর্তসঙ্কুল চিন্তাসমুদ্রে কি নির্ভয়ে পাড়ি দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। প্রত্যেকটি বিদেশী ভাবনার সঠিক মূল্যায়নের চেষ্টা করে, তার সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যের চিরকালীন মূল্যবোধগুলি যথাযথ তুলনা করে, যা মঙ্গলময় (শুধু ব্যষ্টি নয়, সমষ্টির পক্ষে) তা গ্রহণ করে এবং জীবনচর্যায় তা প্রতিফলিত করে, বঙ্কিম এক অসাধারণ তীক্ষ্ণ মনীষা, এক সৎ ও অবিচলিত বিবেকবুদ্ধির অনন্য নিদর্শন রেখে গেছেন।"[২১২] অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে যে প্রাচ্যবিদ্যার জন্ম হয়েছিল তাকে দুভাবে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত, উইলিয়ম জোন্স, এইচ. টি. কোলব্রুক, হোরেস হেম্যান উইলসন প্রমুখ বেদ উপনিষদ, আর্যভট্ট ও কালিদাসের ভারতের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি রচনা করেছিলেন, দ্বিতীয়ত, অন্যদিকে চার্লস গ্রান্ট, জেমস ইমলের মত কোম্পানীর কর্মচারী ও ইভানজেলিক্যাল

২০৯ *"সাম্য", বঙ্কিম রচনাবলী, পূর্বোক্ত*, পৃ: ৪০০।

২১০ Lou Ratte. *The Uncolonised Heart*, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলিকাতা ৭২, ১৯৯৫, পৃ: ১৮।

২১১ তপন রায়চৌধুরী, *Europe Reconsidered, OUP.* নিউদিল্লী, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৯, পৃ: ১২৩।

২১২ অমলেশ ত্রিপাঠী, *বঙ্কিমচিন্তায় পাশ্চাত্য প্রভাব, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা*, ১৩৯৫, পৃ: ৩৬।

পাদ্রীরা প্রচার করেছিলেন যে ভারত বহুদিন মৃতপ্রায়, আত্মনিয়ন্ত্রণের কোন শক্তি তার নেই। সৌভাগ্যক্রমে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ কিছু কিছু ডিরোজিয়ানদের মতো প্রথম ধরনের প্রাচ্যবিদ্যার শিকার হননি। এঁদের মূল প্রোথিত ছিল আপন ঐতিহ্যের গভীরে। এঁরা পশ্চিমী দর্শন, ধর্ম ও সাহিত্যে অধিকার অর্জন করে তার স্বাধীন বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।[২১৩] এভাবে বঙ্কিমচন্দ্র হয়ে উঠেছিলেন জাতীয়তাবাদের প্রথম উদ্‌গাতা। "বাঙ্গালী আজকাল বড় হইতে চায়,—হায়! বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক স্মৃতি কই? বাঙ্গলার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না।"[২১৪] এভাবে তিনি বাঙালিকে নিজের জাতিকে চিনতে ও ভালবাসতে শেখাতে চেয়েছিলেন। তাঁর ইতিহাস চর্চা জাতীয় চেতনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। কিন্তু এখানে মনে রাখা দরকার যে বঙ্কিমচন্দ্র কখনো ব্রিটিশ শাসনকে চ্যালেঞ্জ করেননি, তাঁর আপত্তি ছিল ব্রিটিশ ও ইউরোপীয়রা যেভাবে ভারতের অতীতকে নির্মাণ করেছিলেন, তার বিরুদ্ধে।[২১৫] ভারত আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে পশ্চিম জগতের থেকে অনেক বেশী বলীয়ান। এই দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্নভাবে বিবেকানন্দ গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে ভারতের অতীত সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছিলেন তার ফলে ভারতের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কোন আবেগপূর্ণ সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হননি। যুক্তিবাদী দর্শনের অবিরত চর্চার দ্বারা তিনি ভারতীয় দর্শন এবং আধুনিক ইউরোপীয় চিন্তাধারার মধ্যে যে সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন তার থেকে বেরিয়ে এসেছিল জাতীয় পুনর্জাগরণের আদর্শ ও কর্মসূচী।[২১৬]

এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে হিন্দুসমাজে নারীর স্থানের পুনর্মূল্যায়ন ঘটেছিল। "মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকার বিশিষ্ট। স্ত্রীগণও মনুষ্যজাতি, অতএব পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী। যে যে কার্য্যে পুরুষের অধিকার আছে, স্ত্রীগণেরও সেই সেই কার্য্যে অধিকার থাকা ন্যায়সঙ্গ ত। কেন থাকিবে না? কেহ কেহ উত্তর করিতে পারেন যে, স্ত্রী পুরুষে প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে ....অতএব যেখানে স্বভাবগত বৈষম্য আছে, সেখানে অধিকারগত বৈষম্য থাকাও বিধেয়।...ইহার দুইটি উত্তর সংক্ষেপে নির্দেশ করিলেই আপাতত যথেষ্ট হইবে। প্রথমত স্বভাবগত বৈষম্য থাকিলেই যে অধিকারগত বৈষম্য থাকা ন্যায়সঙ্গত, ইহা আমরা স্বীকার করি না। এ কথা সাম্যতত্ত্বের মূলোচ্ছেদক।...

...যেসকল বিষয়ে স্ত্রী-পুরুষে অধিকার বৈষম্য দেখা যায়, সেসকল বিষয়ে স্ত্রী-পুরুষে যথার্থ প্রকৃতিগত বৈষম্য দেখা যায় না। যতটুকু দেখা যায়, ততটুকু কেবল সামাজিক নিয়মের দোষে। সেই সকল সামাজিক নিয়মের সংশোধনই সাম্যনীতির উদ্দেশ্য। বিখ্যাতনামা জন স্টুয়ার্ট মিলকৃত এতদ্বিষয়ক বিচারে, এই বিষয়টি সুন্দররূপে প্রামাণীকৃত হইয়াছে।"[২১৭] এখানে

২১৩ তদেব, পৃ: ৩৭।

২১৪ *বঙ্গদর্শন*, ১২৮৭, অগ্রহায়ণ, "বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা"—*বিবিধ প্রবন্ধ (দ্বিতীয় খণ্ড), বঙ্কিম রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৩৬।

২১৫ *The Uncolonised Heart*, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৮।

২১৬ *Europe Reconsidered*, পূর্বোক্ত, পৃ.পৃ: ১৩৬-১৩৭।

২১৭ *"সাম্য"*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৯৯।

বঙ্কিমচন্দ্র পুরুষ ও নারীর বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। যেভাবে হিন্দুসমাজে নারীর প্রতি আচরণ করা হয়, পাশ্চত্যের প্রগতিবাদী দর্শন প্রয়োগ করে বঙ্কিমচন্দ্র তার সমালোচনা করেছেন, এক্ষেত্রে তিনি যে জন স্টুয়ার্ট মিলের *Subjection of Women* গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। মেয়েদের উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা, তাদের অবরুদ্ধ রাখা, সম্পত্তির অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত রাখা, তদানীন্তন সমাজের এই সমস্ত রীতিই বঙ্কিমচন্দ্র ঘৃণ্য বলে বিবেচনা করতেন। মেয়েরা সমাজের বিচারে অসতী হলে তাকে স্বামীর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়। কিন্তু পুরুষ যদি একই অন্যায় করে তবে তাকে কোন শাস্তি পেতে হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র প্রশ্ন করেছেন : "ধর্ম্মভ্রষ্ট পুরুষ,—যে লম্পট, যে চোর, যে মিথ্যাবাদী, যে মদ্যপায়ী, যে কৃতঘ্ন, সে-সকলেই বিষয় পাইবে; কেন না, সে পুরুষ; কেবল অসতী বিষয় পাইবে না; কেন না, সে স্ত্রী। ইহা যদি ধর্ম্মশাস্ত্র, তবে অধর্ম্মশাস্ত্র কি? ইহা যদি আইন তবে বেআইন কি?"[২১৮] বঙ্কিমচন্দ্রের মনে হয়েছে এ সমস্তকিছুর উদ্দেশ্য মেয়েদের পুরুষের দাসীতে পরিণত করা। তাই তিনি লিখেছেন, "দেশে অনেক এসোসিয়েশন, লীগ, সভা, ক্লাব ইত্যাদি আছে—কাহারও উদ্দেশ্য রাজনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য সমাজনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য ধর্ম্মনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য দুর্নীতি, কিন্তু স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য কেহ নাই। পশুগণকে কেহ, প্রহার না করে, এজন্যও একটি সভা আছে, কিন্তু বাঙ্গালার অর্ধেক অধিবাসী, স্ত্রীজাতি — তাহাদিগের উপকারার্থ কেহ নাই।"[২১৯] একমাত্র রামমোহন রায় ছাড়া মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার থাকা উচিত শুধু নয় তা একান্ত জরুরী একথা আর কেউ তেমনভাবে বলেননি। বঙ্কিমচন্দ্রও অনুধাবন করেছিলেন যে যদি অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা থাকত তবে মেয়েদের অবস্থা এত শোচনীয় হত না। শুধু তাই নয় একদা তিনি একথাও বলেছিলেন যে মেয়েরা যে উপার্জন করতে পারে না এটাই পুরুষদের সঙ্গে তাদের বৈষম্য সৃষ্টি করার মূল কারণ। "আর একটি অনুচিত বৈষম্য এই যে, সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোক ভিন্ন, এদেশীয় স্ত্রীগণ উপার্জ্জন করিতে পারে না। সত্য বটে, উপার্জনকারী পুরুষেরা আপন আপন পরিবারস্থ স্ত্রীগণকে প্রতিপালন করিয়া থাকে। কিন্তু এমন স্ত্রী অনেক এদেশে আছে যে, তাহাদিগকে প্রতিপালন করে, এমন কেহই নাই। বাঙ্গালীর বিধবা স্ত্রীগণকে বিশেষতঃ লক্ষ্য করিয়াই আমরা লিখিতেছি। অনাথা বঙ্গবিধবাদিগের অন্নকষ্ট লোকবিখ্যাত; তাহার বিস্তারে প্রয়োজন নাই। তাহারা উপার্জন করিয়া দিনপাত করিতে পারে না, ইহা সমাজের নিষ্ঠুরতা। সত্য বটে, দাসীত্ব বা পাঠিকাবৃত্তি করিবার পক্ষে কোন বাধা নাই, কিন্তু ভদ্রলোকের স্ত্রী কন্যা এ সকল বৃত্তি করিতে সক্ষম নয়—তদপেক্ষা মৃত্যুতে যন্ত্রণা অল্প।"[২২০] স্ত্রীলোকেরা কেন উপার্জনক্ষম হতে পারে না বঙ্কিমচন্দ্র তাও বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন। তাঁর মতে বাংলাদেশের মেয়েরা সর্বদা গৃহে অবরুদ্ধ, তারা বাইরে যেতে পারে না, তারা সুশিক্ষিত নয়, আর ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে পুরুষরাই

২১৮ তদেব, পৃ: ৪০৫।
২১৯ তদেব, পৃ: ৪০৬।
২২০ তদেব।

কর্মহীন, সেখানে মেয়েদের প্রবেশ সুদূরপরাহত। বঙ্কিমচন্দ্র কারণ নির্ণয় করেই ক্ষান্ত থাকেননি তিনি সমাধানও নির্দেশ করেছেন :

"লোকে সুশিক্ষিত হইলে, বিশেষত স্ত্রীগণ সুশিক্ষিত হইলে, তাহারা আনায়াসেই গৃহমধ্যে গুপ্ত থাকার পদ্ধতি অতিক্রম করিতে পারিবে। শিক্ষা থাকিলেই, অর্থোপার্জ্জনে নারীগণের ক্ষমতা জন্মিবে। এবং এদেশী স্ত্রীপুরুষ সকল প্রকার বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলে, বিদেশী ব্যবসায়ী, বিদেশী শিল্পী বা বিদেশী বণিক, তাহাদিগের অন্ন কাড়িয়া লইতে পারিবে না।"[২২১] "সাম্য" প্রবন্ধের সমগ্র পঞ্চম পরিচ্ছেদ জুড়ে এভাবে নারী ও পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এখানে স্পষ্টত তিনি জন স্টুয়ার্ট মিলের ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।[২২২]

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসসমূহে দেখা যায় যে উপন্যাসের চরিত্ররা প্রায়শ প্রচলিত সামাজিক রীতি লঙ্ঘন করতে চেয়েছেন। যেমন, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীতে মুসলমান নারী আয়েষা হিন্দু পুরুষ জগৎসিংহকে ভালবেসে সমাজ ও ধর্মকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। মৃণালিনী উপন্যাসে বিধবা বলে জ্ঞাত মনোরমার প্রতি পশুপতির ভালবাসা নিষিদ্ধপ্রেমের চরিত্র গ্রহণ করেছে। বিষবৃক্ষ রচনায় বিধবা কুন্দর প্রতি নগেন্দ্রর যে বিবাহ অতিরিক্ত প্রেম তা বিবাহে পরিণতি পাবার প্রচেষ্টা শেষপর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। ইন্দিরা বাড়ীর পরিচারিকারূপে যে পুরুষ আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছে এবং উক্ত যে পুরুষ তার আকর্ষণে ধরা পড়েছে সে ইন্দিরার স্বামী ভিন্ন আর কেউ নয়। কৃষ্ণকান্তের উইল আখ্যানে গোবিন্দ বিধবা রোহিণীর জন্য তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছিল।[২২৩] আবার আনন্দমঠ উপন্যাসে ভবানন্দ তার মনের অবৈধ বাসনাকে জীবন বিসর্জন দিয়ে বিলোপ করছে। এমনকি বৈধ প্রেমও যদি কোন উচ্চতর আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিহীন হয় তবে তাও পরিত্যজ্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে মাধবাচার্য মৃণালিনীর সঙ্গে হেমচন্দ্রের মিলন ঘটতে দেননি কারণ হেমচন্দ্রের জন্য মহত্তর কর্তব্য নির্দিষ্ট ছিল, তা হ'ল আক্রমণকারী তুর্কীদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা। সমাজকে অস্বীকার করতে চাওয়া এবং এই চাওয়ার দণ্ডস্বরূপ শাস্তি লাভ বঙ্কিমের রচনায় এই দুইটি ঘটনা অনিবার্যভাবে এসেছে। এর থেকে বোঝা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে নিরন্তর এক দ্বন্দ্ব চলত। রক্ষণশীলতা ও প্রগতিশীলতার দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের একটি সুস্পষ্ট চিত্রণ পাওয়া যায় 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসে। এই আখ্যায়িকার কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রফুল্ল বিবাহিতা হয়েও স্বামী পরিত্যক্ত হওয়ার কারণে একক। নানা গুণযুক্ত এই নারীকে ভবানীপাঠক বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিখিয়েছিলেন মল্লযুদ্ধ। গৃহের বাইরে স্বাধীন স্বনির্ভর আত্মানুশীলনের মধ্য দিয়ে প্রফুল্লর যে আত্মজাগরণ ঘটেছিল তা বিলীন করে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে পুনরায় সংসারে পুনর্বাসিত করেন, সেখানে প্রফুল্ল দুই সপত্নীর সঙ্গে স্বামীকে ভাগ করে নিয়েছিল, স্বামীর সংসারে সে ছোটবড়

২২১ তদেব, পৃ:পৃ: ৪০৫ -৪০৬।

২২২ অমলেশ ত্রিপাঠী, *বঙ্কিমচিন্তায় পাশ্চাত্য প্রভাব*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৯, তপন রায়চৌধুরী, *Europe Reconsidered*, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৪৩।

২২৩ তদেব, পৃ: ১১।

সকল গার্হস্থ্যকর্মে নিযুক্ত হল। প্রফুল্ল বলল, "এই ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম রাজত্ব স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম নয়। কঠিন ধর্ম্মও এই সংসারধর্ম্ম; ইহার অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নয়।"[২২৪] তাঁর হিন্দু ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শ এই দুয়ের টানাপোড়েনে বিধ্বস্ত বঙ্কিমচন্দ্র শেষপর্যন্ত রক্ষণশীলতাকে বেছে নিয়েছিলেন। শেষ জীবনে এসে "সাম্য" রচনার পরিমার্জন করতে গিয়ে তিনি পঞ্চম পরিচ্ছেদটি বাদ দিয়েছিলেন। যে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই তাঁর পূর্ব্বেকার রচনায় ব্যক্ত করেছিলেন "দৈহিক বৈষম্য" সামাজিক সাম্যের দাবির বিরুদ্ধে বৈধ যুক্তি নয়, সেই বঙ্কিমচন্দ্রই লিখলেন :

"গুরু। সাম্য কি সম্ভবে? পুরুষে কি প্রসব করিতে পারে, না শিশুকে স্তন্য পান করাইতে পারে? পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকের পল্টন হইয়া লড়াই চলে কি?

শিষ্য। তবে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনের কথা যে পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, তাহা স্ত্রীলোকের পক্ষে খাটে না?

গুরু। কেন খাটিবে না? যাহার যে শক্তি আছে, সে তাহার অনুশীলন করিবে। স্ত্রীলোকের যুদ্ধ করিবার শক্তি থাকে, তাহা অনুশীলিত করুক; পুরুষের স্তন্য পান করাইবার শক্তি থাকে, অনুশীলিত করুক।"[২২৫]

ঐ একই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন : "সমাজগঠনের পক্ষে একটি প্রথম প্রয়োজন বিবাহ-প্রথা। বিবাহপ্রথার স্থূল মর্ম্ম এই যে, স্ত্রী-পুরুষ এক হইয়া সাংসারিক ব্যাপার ভাগে নির্ব্বাহ করিবে। যাহার যাহা যোগ্য, সে সেই ভাগের ভারপ্রাপ্ত। পুরুষের ভাগ — পালন ও রক্ষণ। স্ত্রী অন্যভারপ্রাপ্ত, পালন ও রক্ষণে সক্ষম হইলেও বিরত। বহুপুরুষ পরম্পরায় এইরূপ বিরতি ও অনভ্যাসবশত সামাজিক নারী আত্মপালনে ও রক্ষণে অক্ষম। এ অবস্থায় পুরুষ স্ত্রীপালন ও রক্ষণ না করিলে অবশ্য স্ত্রীজাতির বিলোপ ঘটিবে।"[২২৬] সুতরাং, নারীর ধর্ম তার পালক ও রক্ষক পুরুষের প্রতি আনুগত্য ও সমর্থন। বঙ্কিমচন্দ্র নারীর সহধর্মিণী অর্থাৎ স্বামীর আধ্যাত্মিক কর্মের সহায়িকা এই ভূমিকার ওপর জোর দিয়েছেন। 'দেবী চৌধুরাণী'তে প্রফুল্ল বা 'আনন্দমঠে' শান্তি এই সহধর্মিণী নারীর উজ্জ্বল উদাহরণ, এঁদের নারীসুলভ নিষ্ঠা দৈব মহিমায় উন্নত হয়েছে। এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের মানসপটে নারী হয়ে উঠেছে পুরুষের পরিচালিকা শক্তি। সে পুরুষ তথা স্বামীর সহধর্মিণী হয়েও পরিস্থিতি দাবী করলে সে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সম্পূর্ণ পরাঙ্গম। তাই যে সীতার মধ্যে নারীর কোমল গুণসমূহ মূর্ত হয়ে উঠেছে, পুরুষের স্বেচ্ছাচারের প্রতিবাদে নিজ সতীত্ব সপ্রমাণ করতে সে অনায়াসে পাতালে প্রবেশ করে আত্মোৎসর্গ করতে পারে। অনুরূপভাবে, দ্রৌপদী পঞ্চপতিযুক্ত হয়ে যে সমাজনিন্দনীয় পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছিলেন,

২২৪ *বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ* (উপন্যাস খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, কলিকাতা ৯, তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারী ১৯৮২, পৃ: ৮১৮।

২২৫ *বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ*, পূর্বোক্ত, *"ধর্মতত্ত্ব"*, ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়, স্বজন প্রীতি, পৃ: ৬৫৮।

২২৬ তদেব।

নিজ সতীত্ব ও পাতিব্রত্যের জোরে দ্রৌপদী তা জয় করেছিলেন। "পঞ্চপতি দ্রৌপদীর নিকট এক পতি মাত্র, উপাসনার এক বস্তু এবং ধর্মাচরণের একমাত্র অভিন্ন উপলক্ষ্য।...তিনি গৃহধর্ম্মে নিষ্কাম, নিশ্চল, নির্লিপ্ত হইয়া অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত।"[২২৭] কাজেই, নারী গৃহে আবদ্ধ, নারীর অবমাননার কারণ তা নয়। কেননা, গৃহধর্মের প্রতিপালন নারীর কর্তব্য, তার মর্যাদা সেখানেই। নারীকে তার এই মর্যাদার স্থানটি ফিরিয়ে দিতে হবে। এইভাবে, বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুসমাজ ও ধর্মের চিরাচরিত প্রথা বজায় রেখে নারীর মর্যাদা উন্নয়ন করতে চেয়েছিলেন। এখানেই, নারী মুক্তির উপায় নিহিত রয়েছে। উপর থেকে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংস্কার সাধন করলেই যে নারী তার বর্তমান দুরবস্থা থেকে মুক্তি পাবে তা নয়। সমাজ মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করতে পারলেই তা সম্ভব হবে।

বিবেকানন্দও সেই সময়ের স্বীকৃত অর্থে সমাজসংস্কারক ছিলেন না। কিন্তু ভারতবর্ষে যে সমাজ সংস্কারের প্রয়োজন আছে তা তিনি মানতেন। তিনি বলতেন যে রামকৃষ্ণের পরেই তিনি বিদ্যাসাগরের অনুগামী। অবশ্য বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁর আনুগত্য তিনি তাঁর পিতা বিশ্বনাথ দত্তের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন নতুন পাশ্চাত্য শিক্ষার সার্থক ফসল। হিন্দু অধ্যাত্মবাদ সঠিক কিনা তা বিচার করার চেয়ে তিনি নিজের ও অপরের ঐহিক কল্যাণ সাধন বেশী ভাল বলে মনে করতেন। তিনি হিন্দু আচার-আচরণ খুব শুদ্ধভাবে পালন করতেন না। সমস্ত দেশ ভ্রমণ করে তিনি ভারতব্যাপী কুসংস্কারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত হয়েছিলেন এবং এ সম্পর্কে একটি বই রচনা করেছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের একজন সমর্থক ছিলেন। আসলে বিশ্বনাথের পরিবারে হিন্দু, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিশ্রণ থাকলেও পৌরাণিক হিন্দুত্বের ঐতিহ্যবাহী আচারব্যবহার অনুসরণ করা হতো। এই ঐতিহ্যের ধারক ছিলেন পরিবারের মহিলারা, যদিও তাঁরা যথেষ্ট আধুনিক ছিলেন। বিশ্বনাথের মা "গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী" নামক একটি গ্রন্থ রচনার মতো যথেষ্ট শিক্ষিতা ছিলেন। বিশ্বনাথের পত্নী ভুবনেশ্বরী এক ইংরাজ মিশনারী মহিলার কাছে ইংরাজী শিক্ষা করেছিলেন। পুত্র নরেন্দ্রনাথকে তিনিই প্রাথমিক ইংরাজী পাঠ দিয়েছিলেন। তাঁর কন্যাদের একজনকে বেথুন বিদ্যালয়ে ও অপরজনকে রামবাগানের মিশনারী স্কুলে পাঠান হয়েছিল। তাঁদের এলাকায় বিধবাবিবাহ হতে বাধাদান করা হলে দত্ত দম্পতি প্রতিবাদ করেছিলেন। দত্ত পরিবারের মহিলারা জাতীয়তাবাদের নতুন জাগরণে সাড়া দিয়ে নবগোপাল মিত্রের হিন্দুমেলায় যোগদান করেছিলেন। সুতরাং, বিবেকানন্দের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছিল এক উদার পরিবেশে অথচ বাঙ্গালী পরিবারের চিরাচরিত ঐতিহ্য থেকে তা বিযুক্ত ছিল না।[২২৮]

স্বাভাবিকভাবেই নরেন্দ্রনাথ দত্তও পিতার মতোই পাশ্চাত্য সংস্কৃতির উত্তম ফসল ছিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতা তাঁকে বিস্মিত করেছিল। তাঁর সংবেদনশীল মন প্রাচীন গ্রীসের সভ্যতার দ্বারা এত গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল যে তিনি প্রাচীন গ্রীসের এক কাব্যময় বর্ণনা দিয়েছিলেন ঃ

---

২২৭ *বঙ্কিম রচনাবলী,* পূর্বোক্ত, "বিবিধ প্রবন্ধ"—"দ্রৌপদী (দ্বিতীয় প্রস্তাব)", পৃঃ ১৯১।
২২৮ *Europe Reconsidered,* পূর্বোক্ত, পৃ.পৃ: ২২৩–২২৪।

"ভূমধ্যসাগরের পূর্বকোণে সুঠাম সুন্দর দ্বীপমালাপরিবেষ্টিত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-বিভূষিত একটি ক্ষুদ্র দেশে অল্পসংখ্যক অথচ সর্বাঙ্গসুন্দর, পূর্ণাবয়ব অথচ দৃঢ় স্নায়ু পেশী সমন্বিত, লঘুকায় অথচ অটল-অধ্যবসায় সহায়, পার্থিব সৌন্দর্য সৃষ্টির একাধিরাজ, অপূর্ব ক্রিয়াশীল, প্রতিভাশালী এক জাতি ছিলেন। অন্যান্য প্রাচীন জাতিরা ইঁহাদিগকে 'যবন' বলিত; ইঁহাদের নিজ নাম গ্রীক।"

"মনুষ্য-ইতিহাসে এই মুষ্টিমেয় অলৌকিক বীর্যশালী জাতি এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। যে দেশে মনুষ্য পার্থিব বিদ্যায় সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি, দেশশাসন, ভাস্কর্যাদি শিল্পে অগ্রসর হইয়াছেন বা হইতেছেন, সেই স্থানেই প্রাচীন গ্রীসের ছায়া পড়িয়াছে। প্রাচীনকালের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক, আমরা আধুনিক বাঙ্গালী আজ অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া ঐ যবন গুরুদিগের পদানুসরণ করিয়া ইউরোপীয় সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে তাঁহাদের যে আলোটুকু আসিতেছে, তাহারই দীপ্তিতে আপনাদিগের গৃহ উজ্জ্বলিত করিয়া স্পর্ধা অনুভব করিতেছি।"

"সমগ্র ইওরোপ আজ সর্ববিষয়ে প্রাচীন গ্রীসের ছাত্র এবং উত্তরাধিকারী; এমনকি, একজন ইংলন্ডীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, 'যাহা কিছু প্রকৃতি সৃষ্টি করেন নাই, তাহা গ্রীক মনের সৃষ্টি।'"[২২৯]

মাতাপিতার কাছ থেকে বিবেকানন্দ তাঁর বাল্যাবস্থা থেকেই জাতীয়তাবোধে উদ্দীপিত হয়েছিলেন। এই বোধ তাঁর মধ্যে যে আত্মনির্ধারণের প্রয়োজন সৃষ্টি করেছিল তা তাঁর জীবনে নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি ভারতীয় সমাজের দুরবস্থা ইংরাজী সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে নিষেধ করতেন। তিনি কোন সামাজিক রীতিনীতির পাশ্চাত্যকরণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি যে ভারতীয় অতীত সম্বন্ধে গর্বিত ছিলেন বিশেষত আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের হিন্দু ঐতিহ্য তাঁকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছিল, সমসাময়িক পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালীর মধ্যে এই মনোভাব বিরল ছিল না। কিন্তু দেশের প্রতি ভালবাসা বিবেকানন্দের এক ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি ভারতের দারিদ্র্যক্লিষ্ট ও নিপীড়িত জনসাধারণের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম বলে বোধ করতেন এবং সভ্যতার প্রকৃত স্থপতি যারা তাদের প্রতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে অবিচার বর্ষিত হয়েছে তা তাঁর অন্তরে ঘৃণার উদ্রেক করত।[২৩০] "ভূত-ভারত-শরীরের রক্তমাংসহীন কঙ্কালকুল তোমরা, কেন শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্ছে না? হুঁ, তোমাদের অস্থিময় অঙ্গুলিতে পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত কতকগুলি অমূল্য রত্নের অঙ্গুরীয়ক আছে, তোমাদের পূতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে পূর্বকালের অনেকগুলি রত্নপেটিকা রক্ষিত রয়েছে। এতদিন দেবার সুবিধা হয় নাই। এখন ইংরেজ রাজ্যে অবাধ বিদ্যাচর্চার দিনে উত্তরাধিকারীদের দাও — যত শীঘ্র পার দাও। তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্যে হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে, তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি।

২২৯ *"বর্তমান সমস্যা"* (উদ্বোধনের প্রস্তাবনা), *বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র,* পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৯।
২৩০ *Europe Reconsidered,* পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ২২৩-২২৪।

এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারে আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন।"[২৩১] এই দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে নারীকুলের দুরবস্থা সম্পর্কে যতটা সচেতন করেছিল, ততটা আশান্বিত করেছিল নারীর অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ ও প্রয়োগ সম্বন্ধে। তিনি বারংবার এর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। তবে নারীজাতির উন্নয়ন তাঁর কাছে পৃথক কোন সংস্কার কর্মসূচীর অন্তর্গত ছিল না। "ভারতবর্ষে সর্বপ্রকার (সামাজিক) উন্নয়ন সর্বাগ্রে ধর্মে উজ্জীবন দাবী করে। ভারতবর্ষে সমাজতান্ত্রিক অথবা রাজনৈতিক চিন্তার বন্যা ডাকিবার পূর্বে আধ্যাত্মিক ভাবনার প্লাবন বহাইয়া দাও। যে কর্মটি সর্বাগ্রে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে তাহা হইল আমাদের উপনিষদে, ধর্মগ্রন্থে, পুরাণে সেই সকল বিস্ময়কর তথ্য ও সত্য বন্দী হইয়া আছে, গ্রন্থ হইতে, মঠ হইতে, অরণ্য হইতে এবং মুষ্টিমেয় মানুষের সংস্থা হইতে সেই সব উদ্ধার করিয়া আনিয়া সমগ্র দেশের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়া প্রচার করিতে হইবে যাহাতে ঐ সব সত্য অগ্নির ন্যায় উত্তর দিগন্ত হইতে দক্ষিণ সীমান্তে, পূর্ব হইতে পশ্চিমে, হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা, সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।"[২৩২] কাজেই বিধবাবিবাহ প্রচলন বা বাল্যবিবাহ রোধ ইত্যাদি সমাজসংস্কারমূলক আইন প্রণয়নের চেয়েও নারীশিক্ষার ওপর বিবেকানন্দ গুরুত্ব দিয়েছিলেন বেশী। তবে এই শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মতামত ছিল তাঁর নিজস্ব এবং অত্র মধ্যে স্বাজাত্যবোধের সমস্ত বৈশিষ্ট্য বর্তমান। "শিক্ষা বলিতে ব্যক্তিকে এমনভাবে গঠিত করা, যাহাতে তাহার ইচ্ছা সদ্বিষয়ে ধাবিত হয় এবং সফল হয়। এইভাবে শিক্ষিতা হইলে ভারতের কল্যাণসাধনে সমর্থ নির্ভীক মহীয়সী নারীর অভ্যুদয় হইবে।"[২৩৩] এই "নির্ভীক মহিয়সী নারী"-র রূপকল্প তিনি দেখেছিলেন আমেরিকান মেয়েদের মধ্যে। পাশ্চাত্য মেয়েদের যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়ে থাকে বা তাদের প্রতি যে ধরনের আচরণ করা হয়ে থাকে তা দেখে মোহিত হয়েছিলেন বিবেকানন্দ। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী স্বর্ণকুমারী দেবীকে তিনি লিখেছিলেন যে পশ্চিমে মেয়েরা রাজ্যের অধীশ্বরী, তাদের আছে ক্ষমতা, তাদের আছে সর্বোচ্চ পদমর্যাদা। অবশ্য এখানেও তিনি তাঁর স্বদেশকে বিস্মৃত হননি। তিনি মনে করতেন যে পশ্চিমে মেয়েদের যে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা হয় ভারতবর্ষে তাই শক্তির উপাসনারূপে দেখা দিয়েছে। তবে ভারতবর্ষে যেমন কয়েকটি তীর্থক্ষেত্রেই শক্তির উপাসনা দেখা যায়, পশ্চিমে তা সর্বত্র বিদ্যমান।[২৩৪] "প্রকাশ্য, সর্বসাধারণ, শক্তিপূজা বামাচার, — মাতৃভাবও যথেষ্ট। প্রটেস্ট্যান্ট তো ইউরোপে নগণ্য ধর্ম তো ক্যাথলিক। সে ধর্মে জিহোবা যীশু ত্রিমূর্তি — সব অন্তর্ধান, জেগে বসেছেন 'মা'। শিশু যীশু কোলে 'মা'। লক্ষ স্থানে, লক্ষ রকমে, লক্ষরূপে অট্টালিকায়, বিরাট মন্দিরে, পথপ্রান্তে, পর্ণকুটিরে 'মা' 'মা'।

"আর মেয়ের পূজা। এ শক্তিপুজো কেবল কাম নয়। কিন্তু যে শক্তিপুজো কুমারী-সধবা-পুজো আমাদের দেশে কাশী, কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থস্থানে হয়, বাস্তবিক প্রত্যক্ষ, কল্পনা নয় —

২৩১ *"পরিব্রাজক", বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র,* পূর্বোক্ত, পৃ: ৬২।

২৩২ এই উদ্ধৃতিটি উনিশ শতক : *ভাব সংঘাত ও সমন্বয়,* পূর্বোক্ত গ্রন্থে ৮৮ পৃষ্ঠায় সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

২৩৩ *অমলেশ ত্রিপাঠী,* ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা ৯, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৯৯, পৃ: ৯৬।

২৩৪ *Europe Reconsidered,* পূর্বোক্ত, পৃ: ৩০০।

সেই শক্তিপুজো। তবে আমাদের পুজো ঐ তীর্থস্থানেই, সেইক্ষণ মাত্র ; এদের দিনরাত, বার মাস। আগে স্ত্রীলোকের আসন, আগে শক্তির বসন, ভূষণ, ভোজন, উচ্চস্থান, আদর, খাতির।"[২৩৫] নারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে আমেরিকার তুলনা নেই একথা কবুল করে রামকৃষ্ণানন্দকে এক চিঠিতে লিখলেন বিবেকানন্দ : "এদেশে মেয়ের মতো মেয়ে জগতে নাই। কি পবিত্র, স্বাধীন, স্বাপেক্ষ আর দয়াবতী মেয়েরাই এদেশের সব। বিদ্যেবুদ্ধি সব তাদের ভেতর। 'যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষু' (যিনি পুণ্যবানদের গৃহে স্বয়ং লক্ষ্মীস্বরূপিণী) এদেশে, আর 'পাপাত্মানাং হৃদয়ে লক্ষ্মীঃ (পাপাত্মগণের হৃদয়ে অলক্ষ্মীস্বরূপিণী) আমাদের দেশে, এই বোঝায়। হরে, হরে, এদের মেয়েদের দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম। ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীঃ ইত্যাদি (তুমিই লক্ষ্মী, তুমিই ঈশ্বরী, তুমি লজ্জাস্বরূপিণী) 'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা' (যে দেবী সর্বভূতে শক্তিরূপে অবস্থিতা) ইত্যাদি। এদেশের বরফ যেমনি সাদা, তেমনি হাজার হাজার মেয়ে আছে, যাদের মন পবিত্র। আর আমাদের দশ বৎসরের বেটা-বিউনিরা!!! প্রভো, এখন বুঝতে পারচি। আরে দাদা, 'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা :' (যেখানে স্ত্রীলোকেরা পূজিতা হন, সেখানে দেবতারাও আনন্দ করেন) — বুড়ো মনু বলেছে। আমরা মহাপাপী ; স্ত্রীলোককে ঘৃণ্যকীট, নরকমার্গ ইত্যাদি বলে বলে অধোগতি হয়েছে।"[২৩৬] বিবেকানন্দ আপশোষ করেছিলেন যে যদি এরকম এক হাজার নারীর জন্ম হত এদেশে, তাহলেও ভারতের কিছু আশা ছিল। তিনি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন যে বহুসংখ্যায় মহিলারা তাদের নিজেদের জীবিকা নিজেরা নির্বাহ করছে। তিনি এও দেখেছিলেন যে হাতেকলমে তাদের কাজ করার ক্ষমতা বিপুল।

পশ্চিম জগতের মেয়েদের এই ঝলমলে অবস্থা দেখে বিবেকানন্দের মনে স্বভাবতঃই ভারতীয় সমাজে মেয়েদের হীনাবস্থা বেদনার সঞ্চার করেছিল। ভারতীয় নারীদের অবস্থা দেখে তিনি সন্তুষ্ট কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে "নারীদিগের সম্বন্ধে আমাদের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার শুধু তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া পর্যন্ত; নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে। তাহাদের হইয়া অপর কেহ এ কার্য করিতে পারে না, করিবার চেষ্টা করাও উচিত নহে। আর জগতের অন্যান্য দেশের মেয়েদের মতো আমাদের মেয়েরাও যোগ্যতালাভে সমর্থ।"[২৩৭] এইভাবে হিন্দু সমাজে নারীর স্থানের পুনর্মূল্যায়ন করতে চেয়েছিলেন বিবেকানন্দ। নারী সম্পর্কে সংকীর্ণ ধারণা বর্জন করে তিনি যে উদার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন "জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই, একপক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।

"সেইজন্যেই রামকৃষ্ণাবতারে 'শ্রীগুরু' গ্রহণ, সেইজন্যই নারীভাব সাধন, সেইজন্যই মাতৃভাব প্রচার।"

---

২৩৫ "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য", *বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র,* পূর্বোক্ত, পৃ: ৯২।

২৩৬ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত পত্র, চিকাগো, ১৯শে মার্চ, ১৮৯৪, বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৫৫।

২৩৭ স্বামী বিবেকানন্দ, *"নারী জাগরণের পথ"* (প্রশ্নোত্তর), স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা ৩ ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ, ভাদ্র, ১৪০৫, পৃ: ১।

"কোন জাতির প্রগতির শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি নারীদের প্রতি তাহার মনোভাব"[২৩৮] কিভাবে নারীর ভেতরকার শক্তিকে জাগ্রত করা সম্ভব হবে এ প্রশ্নের উত্তরে বিবেকানন্দ বলেছিলেন "বাল্যবিবাহ তুলে দেওয়া, বিধবাদের পুনরায় বে দেওয়া প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আমাদের কাজ হচ্ছে স্ত্রী-পুরুষ সমাজের সকলকে শিক্ষা দেওয়া। সেই শিক্ষার ফলে তারা নিজেরাই কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ সব বুঝতে পারবে এবং নিজেরা মন্দটা করা ছেড়ে দেবে। তখন আর জোর করে সমাজের কোন বিষয় ভাঙতে হবে না।"[২৩৯] এই প্রসঙ্গে শিক্ষার অর্থ ব্যাখ্যা করে বিবেকানন্দ বলেছেন : "শিক্ষা অর্থে মানবের মধ্যে পূর্ব হইতেই যে দেবত্ব রহিয়াছে, তাহাই প্রকাশ করা। অতএব শিশুদের শিক্ষা দিতে হইলে...বিশ্বাস করিতে হইবে যে, প্রত্যেক শিশুই অনন্ত ঈশ্বরীয় শক্তির আধারস্বরূপ, আর আমাদিগকে তাহার মধ্যে অবস্থিত সেই নিদ্রিত ব্রহ্মকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। শিশুদের শিক্ষা দিবার সময় আর একটি বিষয় আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে — তাহারাও যাহাতে নিজেরা চিন্তা করতে শিখে, সেই বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে হইবে। এই মৌলিক চিন্তার অভাবই ভারতের বর্তমান হীনাবস্থার কারণ।"[২৪০] বিশেষ করে মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রম কি হবে তা নিয়ে বিবেকানন্দের মত ছিল এই রকম : "ধর্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, ঘরকন্না, রন্ধন, সেলাই, শরীর পালন এসব বিষয়ের স্থূল মর্মগুলিই মেয়েদের শেখানো উচিত।...তবে কেবল পূজাপদ্ধ তি শেখালেই হবে না;সব বিষয়ে চোখ ফুটিয়ে দিতে হবে। আদর্শ নারীচরিত্রগুলি ছাত্রীদের সামনে সর্বদা ধরে উচ্চ ত্যাগরূপ ব্রতে তাদের অনুরাগ জন্মে দিতে হবে : সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লীলাবতী, খনা, মীরা—এঁদের জীবনপঞ্জী মেয়েদের বুঝিয়ে দিয়ে তাদের নিজেদের জীবন ঐরূপে গঠিত করতে হবে।"[২৪১]

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে ভারতীয় নারীর উন্নয়নের যে পরিকল্পনা বিবেকানন্দ করেছিলেন পৌরাণিক হিন্দুধর্মের মধ্যে তার মূল প্রোথিত ছিল। এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বিবেকানন্দ ও তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। মেয়েদের সহধর্মিণী রূপটি তাঁদের আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু দুজনের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য লক্ষ করা যায়। পারিবারিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ পুরুষ শিশু বা নারী শিশুর মধ্যে পার্থক্য করেননি। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের তিনি পৌরাণিক সতী নারীদের আদর্শের সঙ্গে পরিচয় করানোর কথা বলেছেন। এখানে বলা যেতে পারে যে বিবেকানন্দ নারীর অন্তর্নিহিত শক্তি জাগ্রত করার কথা বলেও শেষপর্যন্ত তিনি নারীর আত্মবিলীনকারিণী ভূমিকাকে বড় করে দেখিয়েছেন। "ভারতবর্ষের নারী সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই বিকাশ লাভ করিবে এবং পরিপূর্ণতা অর্জন করিবে, এবং সেই একমাত্র পথ।"[২৪২] ভগিনী নিবেদিতা এ বিষয়ে বিবেকানন্দের মত বিস্তারিতভাবে লিখেছেন : "অপরপক্ষে একজন আধুনিকতাপ্রাপ্ত ভারতীয় নারীর মধ্যেও

২৩৮ তদেব, পৃঃ ২।

২৩৯ তদেব, পৃঃ ১।

২৪০ তদেব, পৃঃ ৬।

২৪১ তদেব, পৃঃ ৮।

২৪২ *ঊনিশ শতক : ভাব-সংঘাত ও সমন্বয়*, পূর্বোক্ত, গ্রন্থের ৯৯ পৃষ্ঠায় এই উদ্ধৃতিটি আছে।

তিনি পুরাকালে প্রাপ্তব্য স্বামীর প্রতি গভীর বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্যপূর্ণ-সাহচর্য দেখেছিলেন। বিবাহ দ্বারা লব্ধ আত্মীয়স্বজনের প্রতি অতীতসুলভ আনুগত্য তখনো তাঁর কাছে হিন্দু পত্নীর আদর্শ বলে গণ্য হতো। প্রকৃত নারীত্ব, প্রকৃত সন্ন্যাসের মতো বাহ্যিক ব্যাপার নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রকৃত নারীত্ব স্থিত ও বিকশিত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত নারীশিক্ষা সার্থকতা লাভ করবে না।"[২৪৩] কিন্তু এই বিবেকানন্দই আমেরিকায় গিয়ে মেয়েদের স্বনির্ভর স্বাধীন জীবন ও কর্মক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং ভারতীয় নারীরা যদি এরকম হয় তা হলে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারবেন এমন কথাও তিনি বলেছিলেন। বিবেকানন্দ আশ্চর্য দক্ষতায় এই সুগৃহিণী ও আত্মনির্ভরশীলা রূপের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। তিনি ভবিষ্যৎ নারীর বিকাশ সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে তাঁকে কোনভাবেই ধ্যানের প্রাচীন ক্ষমতা রহিত বলে ভাবতে পারেননি। মেয়েরা অবশ্যই আধুনিক বিজ্ঞান শিখবে কিন্তু তা প্রাচীন আধ্যাত্মিকতা বিসর্জন দিয়ে নয়। তিনি স্পষ্টভাবে এই মত জ্ঞাপন করেছিলেন যে আদর্শ শিক্ষা হল তা যা সামগ্রিকভাবে সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম হলেও সকল সম্ভাব্য প্রভাবকে কাজে লাগাবে। শিক্ষা যেন প্রতিটি নারীকে অতীতকালের নারীদের শ্রেষ্ঠতা হৃদয়ঙ্গম করার শক্তি দেয়"[২৪৪]

এভাবে বিবেকানন্দ নারীকে শুধু গৃহেই সংস্থাপিত করতে চাননি, তিনি চেয়েছিলেন নারীরা নিজেরাই সমাজ পরিবর্তনের কাজটি সাধন করুক। এই উদ্দেশ্যে তিনি অতি সহজে নারীদের বিবাহ না করার অধিকার, তাদের সন্ন্যাসিনী হবার অধিকার স্বীকার করেছিলেন, যা বিবেকানন্দের পূর্বে আর কেউ করেননি। "ঠাকুরের কত ভক্তিমতী মেয়েরা রয়েছেন। তাঁদের দিয়ে স্ত্রী-মঠ Start (আরম্ভ) করে দিয়ে যাব। শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণী তাঁদের *Central figure* (কেন্দ্রস্বরূপা) হয়ে বসবেন। আর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তদের স্ত্রী-কন্যারা ওখানে প্রথমে বাস করবে। কারণ তারা ঐরূপ স্ত্রী-মঠের উপকারিতা সহজেই বুঝতে পারবে। তারপর তাদের দেখাদেখি কত

---

২৪৩ "A modernised Indian woman, on the other hand, in whom he saw the old time intensity of trustful and devoted companionship to the husband, with the old time loyalty to the wedded kindred, was still to him, 'the ideal Hindu wife', True womanhood, like true monkhood, was no matter of more externals. And unless it held and developed the spirit of true womanhood, there could be no education of woman worthy of the...' Sister Nivedita, *The Master As I saw him,* Udbodhan Office, Calcutta 700 004. 13th edition, March 1983, পৃ:পৃ: ২৩৮-২৩৯।

২৪৪ "He could not foresee a Hindu woman of the future, entirely without the old power of meditation Modern science, women must learn : but not at the cost of the ancient spirituality. He saw clearly enough that the ideal education would be one that should exercise the smallest possible influence for direct change on the soical body as a whole. It would be that which should best enable every woman, in time to come, to resume into herself the greatness of all the women of the Indian past." — তদেব, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৩৯।

গেরস্ত এই মহাকার্যে সহায় হবে।"[২৪৫] এই মঠের কাজ কি হবে তা নিয়ে বিবেকানন্দের অভিমত ছিল এইরকম : "ব্রহ্মচারিণীরা ছাত্রীদের শিক্ষার ভার নেবে। এই মঠে ৫/৭ বছর শিক্ষার পর মেয়েদের অভিভাবকেরা তাদের বিয়ে দিতে পারবে। যোগ্যাধিকারিণী বলে বিবেচিত হলে অভিভাবকদের মত নিয়ে ছাত্রীরা এখানে চিরকুমারী ব্রতাবলম্বনে অবস্থান করতে পারবে। যারা চিরকুমারীব্রত অবলম্বন করবে, তারাই কালে এই মঠের শিক্ষয়িত্রী ও প্রচারিকা হয়ে দাঁড়াবে এবং গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে *Centres* (শিক্ষাকেন্দ্র) খুলে মেয়েদের শিক্ষাবিস্তারে যত্ন করবে। চরিত্রবতী, ধর্মভাবাপন্ন ঐরূপ প্রচারিকাদের দ্বারা দেশে যথার্থ স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হবে। ধর্মপরায়ণতা, ত্যাগ ও সংযম এখানকার ছাত্রীদের অলঙ্কার হবে; আর সেবাধর্ম তাদের জীবনব্রত হবে। এইরূপ আদর্শ জীবন দেখলে কে তাদের না সম্মান করবে কেই বা তাদের অবিশ্বাস করবে? দেশের স্ত্রীলোকদের জীবন এইভাবে গঠিত হলে তবে তো তোদের দেশে সীতা সাবিত্রী গার্গীর আবার অভ্যুত্থান হবে।"[২৪৬]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বিবেকানন্দ মেয়েদের নিজেদের পছন্দমত জীবন বেছে নেবার স্বাধীনতা দেবার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনিই প্রথম হিন্দু সংগঠক যিনি নারীকে সন্ন্যাসিনী জীবন যাপনের স্বীকৃতি দিয়েছেন, যা এ পর্যন্ত কেবল পুরুষদের অধিকারে ছিল। তিনি নারীকে এমনভাবে জীবনযাপনের ক্ষেত্র দিয়েছেন যেখানে বিবাহ হওয়া নারীর পক্ষে অনিবার্য কিংবা বাধ্যতামূলক নয়। এভাবে তিনি নারীকে তার শক্তি প্রকাশ ও বিকাশের জন্য অধিকতর স্বাধীনতা ও সুযোগ করে দিয়েছেন। যে গোঁড়া হিন্দুসমাজে নারীর বিবাহের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হত এবং স্বামীর সন্তোষ বিধান যেখানে স্ত্রীর একমাত্র বাঞ্ছিত ধর্মাচার সেখানে নারীর এই অধিকার প্রাপ্তি একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস সন্দেহ নেই। বিবেকানন্দ নারীকে নিজের শিক্ষার আলোতে নিজের জীবনের পথ চিনে নিতে পারার মতো উপযুক্ত হয়ে উঠতে বলেছিলেন। এ বিষয়ে পুরুষের উপর নির্ভরশীলতাকে তিনি শুধু অপ্রয়োজনীয় বলে গণ্য করেননি, মনে করেছিলেন তা অনধিকার চর্চা এবং হঠকারিতা। যেসময়ে বিবেকানন্দ মেয়েদের এই স্বাধিকার অর্পণ করার কথা ভাবছেন সেসময়ে বাঙালী পুরুষেরা মনে করছেন যে মেয়েদের অবরোধ থেকে মুক্ত করে খোলা আঙিনায় নিয়ে আসা তাঁদের সুমহান দায়িত্ব, যেসময় তাঁরা মেয়েদের কতটুকু শিক্ষা এবং স্বাধীনতা দিতে হবে তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হচ্ছেন সে সময় বিবেকানন্দ মেয়েদের নিজেদের উদ্যোগী হতে বলেছেন, তাদের নিজেদের ভেতরের শক্তি জাগাতে বলেছেন, তা প্রয়োজন ও পছন্দমতো পরিবার অথবা দেশের কাজে লাগাতে বলেছেন। এ দিক দিয়ে বিবেকানন্দ নারীদের যে উচ্চ মর্যাদার আসন দান করেছেন তা নিঃসন্দেহে তুলনাহীন।

উনবিংশ শতকের শেষ দুটি দশক বিশেষভাবে জাতীয় জাগৃতি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এর ফলে সমাজসংস্কার আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ল। নারী জাগরণ নিয়ে

২৪৫ *নারী জাগরণের পথ*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩।
২৪৬ নারী জাগরণের পথ, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৫।

যাঁরা সক্রিয় হয়েছিলেন তাঁদের মনোযোগ রাষ্ট্রিক চেতনার দিকে ধাবিত হল।[২৪৭] কিন্তু গোলাম মুরশেদ বলেছেন যে ১৮৬০-এর দশক থেকেই জাতীয়তাবাদ এবং দেশপ্রেম উন্মেষ লাভ করেছিল। ফলে সংস্কারের উদ্দীপনায় ভাঁটা পড়েছিল। ১৮৬১ সালে রাজনারায়ণ বসু জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা স্থাপন করেছিলেন। তবে এই সভা ভদ্রলোকদের ওপর তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কিন্তু ১৮৬৭ সালে নবগোপাল মিত্র যে হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠা করলেন তা জাতীয়তাবোধের বিকাশে নিঃসন্দেহে সাহায্য করেছিল।[২৪৮] হিন্দুমেলার গুরুত্ব সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন বিপিনচন্দ্র পাল : "গত শতাব্দীর সত্তর দশকের শুরুতে বাবু নবগোপাল মিত্র ও তাঁর উদ্ভাবিত হিন্দুমেলা সম্পর্কে যদি আমরা পূর্ণ এবং কৃতজ্ঞ দৃষ্টিপাত না করি তবে বোধ হয় বাংলার নব জাতীয়তাবাদী জাগরণের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।"[২৪৯] অবশ্য এ প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র রাজনারায়ণ বসুর নাম উল্লেখ করতে ভোলেননি। তাঁর মতে ইউরোপীয় চিন্তাধারার আগ্রাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রথম রুখে দাঁড়িয়েছিলেন রাজনারায়ণ। যখন কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর অনুগামীরা আধুনিক ইউরোপীয় তথা খ্রীষ্টীয় নৈতিকতার প্রতি নির্ভুল প্রবণতা দেখাতে শুরু করেছিলেন তখন রাজনারায়ণ হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে বাংলায় বক্তৃতা করলেন, তাঁর প্রতিপাদ্য ছিল এই যে ইউরোপীয় ধর্মতত্ত্ব ও সভ্যতার চেয়ে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি শ্রেষ্ঠতর।[২৫০] বিপিনচন্দ্র মন্তব্য করলেন : "বর্ণগর্বী, আগ্রাসী ইউরোপীয় সভ্যতার অবদমন আমাদের এ চিন্তায় ও জীবনে যে ঘটেছিল তার বিরুদ্ধে ভারতের যুগ যুগ সঞ্চিত জাতীয় চেতনারই যেন বহিঃপ্রকাশ এটি। বৃটিশ প্রভুরা দেশ শাসন করছে সেই তো যথেষ্ট। আমাদের বাক্যে, মননে, সামাজিক ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনেও প্রভুত্ব করুক তা আমরা রুখবোই"[২৫১] এই রাজনারায়ণ বসুর কাছ থেকেই নবগোপাল মিত্র তাঁর নিজস্ব জাতীয়তাবোধের ধারণা বহুলাংশে গ্রহণ করেছিলেন। নবগোপল "ন্যাশনাল পেপার" নামে একটি ইংরাজী সাপ্তাহিকের মালিক ও সম্পাদক ছিলেন। যদিও এই কাগজের ইংরাজী ভাষায় মান খুব উঁচু ছিল না তবুও নবগোপাল বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়ে বলতেন যে ইংরাজী তাঁর মাতৃভাষা নয়। তিনি বাঙ্গালী তরুণদের আত্মশক্তিতে বলীয়ান করার উদ্দেশ্যে একটি ব্যায়ামাগার স্থাপন করেন। এখানে কুস্তি, লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, তরোয়াল খেলা প্রভৃতি শেখানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্যরা নবগোপালের আন্দোলনে খুব উৎসাহী ছিলেন এবং তাঁরা আর্থিক সাহায্য দিয়ে নবগোপালকে উৎসাহ ও সমর্থন জানাতেন।[২৫২] জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে হিন্দুমেলার অনুপ্রেরণা থেকেই তিনি নাটক লিখতে উৎসাহী হয়েছিলেন, যার মধ্যে পুরুবিক্রম অন্যতম। রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে হিন্দুমেলা প্রথমে ও পরে সঞ্জীবনী সভা তাঁকে কম বয়সেই দেশপ্রেমিক

২৪৭ *স্পন্দিত অন্তর্লোক*, পূর্বোক্ত, ভূমিকা, পৃ: ৭।

২৪৮ *সংকোচের বিহ্বলতা*, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৪৭।

২৪৯ *আমার জীবন ও সমকাল (প্রথম পর্ব)*, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৪৪।

২৫০ তদেব।

২৫১ তদেব, পৃ: ১৪৫।

২৫২ তদেব, পৃ: ১৪৭।

করে তুলেছিল। সত্যেন্দ্রনাথও হিন্দুমেলা উপলক্ষ্যে গান রচনা করেছিলেন।[২৫৩] এই পটভূমিতে ১৮৭৬ সালে আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাশ, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করলেন। এরপর থেকেই শিক্ষিত শহুরে ভদ্রলোকরা ক্রমশ রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে বেশী করে জড়িয়ে পড়তে লাগলেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মুখে সমাজসংস্কারের উদ্দীপনা ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে পড়ল। স্বদেশী সমাজ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সমালোচনার বদলে আবার নতুন করে হিন্দুধর্মীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সমর্থন পেতে শুরু করল। যে বিধবাবিবাহ আন্দোলন একসময় ভদ্রলোকদের প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল, এখন তাঁরা যে শুধু বিধবাবিবাহকে অপবিত্র ও নীচজনোচিত কাজ বলে মনে করতে লাগলেন, তাই নয়, তাঁরা ১৮৬৬ সালে পাশ হওয়া কুলীন বহুবিবাহ নিরোধক আইনের বিরোধিতা করতে লাগলেন।[২৫৪] আসলে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির নতুন প্রবণতা ছিল ভারতবর্ষের অতীতকে গৌরবান্বিত করে দেখা ও সমস্ত প্রাচীন ঐতিহ্যের জয়গান করা। দেশজ প্রথা বা জীবনধারার যে কোন রকম পরিবর্তনকে মনে করা হচ্ছিল পশ্চিমী সভ্যতার ও ধারণার অন্ধ অনুকরণ। তাই পরিবর্তনের প্রচেষ্টার প্রতি এল সন্দেহ এবং বিরোধিতা। ফলে জাতীয়তাবাদী আদর্শের মধ্যে সামাজিক বিশ্বাস ও কার্যকলাপের ক্ষেত্রে এল এক রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী।[২৫৫] বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করে হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা লিখল যে এই পত্রিকা সর্বদাই বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করে এসেছে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চারিত্রিক সততা, পাণ্ডিত্য এবং বিধবাদের দুর্দশা সম্পর্কে তাঁর মহান অনুভূতির বিষয়ে কারো কণামাত্র সন্দেহ না থাকলেও এই আন্দোলনের দিকে মুখ ফিরিয়ে হিন্দুসমাজ সঠিক কাজ করেছে।[২৫৬] কারণ, নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহবন্ধন একটি পবিত্র প্রতিশ্রুতি, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তা শেষ হয়ে যায় — এরকম ধারণা হিন্দুসমাজের বিরোধী, হয়ত কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে নারীরা দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছেন, কিন্তু বিবাহ সম্পর্কের স্থায়িত্বের উপরই বিবাহ প্রতিশ্রুতির পবিত্রতা নির্ভর করে।[২৫৭] এইভাবে পাশ্চাত্য সংস্কার আন্দোলন জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের সরাসরি বিরোধী হয়ে পড়ল।[২৫৮]

কিন্তু এই সরাসরি বিরোধিতার ধারণা সকলে গ্রহণ করতে চাননি। যেমন, পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন যে এই দৃষ্টিভঙ্গী অতি সরলীকরণ দোষে দুষ্ট। এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে যে উনিশ

---

২৫৩ *সংকোচের বিহ্বলতা*, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৪৭।

২৫৪ Report of the Committee appointed by Government to consider the Question of Legislative Interfernce for Preventing the "Excessive abuse", of Polygamy as practised by the Kulin Brahmans dated 7th February, 1867, Calcutta, Bengal Secretariat Press, 1867.

২৫৫ বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবন ও মনন : একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৬১।

২৫৬ *"Hindu Betrothal", Hindoo Patriot,* 1891.

২৫৭ প্রদীপ সিন্হা, *Nineteenth Century Bengal : Aspects of Social History*, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃ: ১২৮।

২৫৮ সংকোচের বিহ্বলতা, পৃ: ১৪৮।

শতকে যে সংস্কার আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তার উৎস ইউরোপের প্রগতিবাদী ধ্যানধারণার প্রভাব। এর ফলে ভারতেও পশ্চিমী দেশগুলোর মত উদারতন্ত্রী মূল্যবোধের চরম বিকাশ হতে পারত, কিন্তু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সৃষ্টি তাতে প্রতিবন্ধকতা করেছিল, কারণ, এই জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি হয়েছিল বর্ণবিদ্বেষ এবং বিদেশীদের সম্পর্কে অহেতুক ভয় এবং ঘৃণা থেকে, এটি মূলত রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াই ছিল।[২৫৯] শ্রী চট্টোপাধ্যায় আরো বলেছেন যে কলকাতার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের চেতনার অন্যতম দিক ছিল ইংরাজদের অধীন জগৎ সম্বন্ধে চরম ভীতি। "রামকৃষ্ণ কথামৃত" গ্রন্থের ভাবধারা বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে যে এই ভয়ের বোধ থেকে জন্ম নিয়েছিল এক অন্তর্মুখী জগতে আশ্রয় নিয়ে পরিত্রাণ খোঁজার কৌশল। জাতীয়তাবাদী কল্পনায় সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবহারকে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলা হয়েছিল। অর্থনীতি, রাষ্ট্র, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এইসব বিষয়গুলি পার্থিব বা ব্যবহারিক জগতের অন্তর্ভুক্ত, যেখানে পাশ্চাত্য জগৎ প্রাচ্যজগৎ থেকে অনেক প্রাগ্রসর। আবার, প্রাচ্য জগৎ হল এমন এক আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র যেখানে প্রাচ্য সংস্কৃতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতীয়মান। ঔপনিবেশিকতাবিরোধী জাতীয়তাবাদ এই আভ্যন্তরীণ জগৎকে স্বজাতির সার্বভৌম এলাকা বলে ঘোষণা করেছিল। ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব এখানে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এইভাবে সৃষ্টি হয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পৃথকীকরণ। প্রাচ্যের ভাষা, ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য এই সবকিছুকে নিয়ে গড়ে উঠল জাতির এক আভ্যন্তরীণ জগৎ বা কল্পিত সাংস্কৃতিক সত্তা। এই সত্তা সম্পূর্ণভাবে "আমাদের", যা পশ্চিম অর্থাৎ "ওদের" থেকে পৃথক।[২৬০] এই ধরনের চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছিল নারীভাবনার ক্ষেত্রেও। জাতীয়তাবাদী আদর্শ স্ত্রীজাতিসংক্রান্ত প্রশ্নকে সফলভাবে জাতির সার্বভৌম অন্তর্জগতের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছিল, যেখানে বিদেশী রাষ্ট্রশক্তির হস্তক্ষেপের কোন প্রশ্ন ওঠে না। কারণ, পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক আধুনিকতার মূল্যবোধের নিরিখে ভারতের নারী সমস্যার বিচার করা যাবে না। ভারতীয় ঐতিহ্য ও পরম্পরা নিয়ে গঠিত ভারতীয় সংস্কৃতি স্বাধীন ও সার্বভৌম। এইভাবে নারীদের উন্নয়নমূলক যাবতীয় প্রশ্ন ভারতীয়দের সার্বভৌম অন্তর্জগতের অন্তর্গত হয়ে গেল।

তবে, সুমিত সরকার এই বিষয়টি একটু অন্যরকমভাবে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর মতে, ঊনবিংশ শতকের সমাজসংস্কারকরা আগাগোড়া সামাজিকভাবে রক্ষণশীল ছিলেন। ইউরোপের উদারপন্থী ধ্যানধারণাকে তাঁরা সর্বতোভাবে গ্রহণ না করে যথেষ্ট বিচারবিবেচনা করে আংশিকভাবে নিয়েছিলেন। তাঁরা কখনোই প্রচলিত সমাজব্যবস্থার কাঠামো ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারেননি। তাই তাঁদের সংস্কার প্রচেষ্টায় জাতিভেদ প্রথা, পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের মূল্যবোধ, শাস্ত্রীয় অভ্রান্ততায় বিশ্বাস, ইত্যাদির থেকে বেরিয়ে আসার কোন উদ্যোগ ছিল না।[২৬১] অন্যত্র তিনি বলেছেন যে নারীদের পুনর্জাগরণের কর্মসূচীতে পুরুষ সমাজসংস্কারকরা

২৫৯ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *The Nation and its Fragments : Colonial and Post Colonial Histories, Delhi*, ১৯৯৪, পৃ:পৃ: ১১৬-১৩৪।

২৬০ তদেব, পৃ: ৫৬-৬১।

২৬১ বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবন ও মনন;একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা, পৃ: ১৬১।

কখনো নারীদের অংশগ্রহণ করানোর চেষ্টা করেননি, তাঁরা নারীদের সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত মুক্তি চেয়েছিলেন।[২৬২] উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমে যে জাতীয়তাবাদী উন্মেষ দেখা দিল তার পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালী ভদ্রলোকেরা তাঁদের গার্হস্থ্য জীবনকে ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপের বাইরে রাখতে চেয়েছিলেন। তাই এই সময় নারীপ্রগতির সমস্যাটি একটি ভিন্নতর রূপ ধারণ করল। ঔপনিবেশিক শক্তির দ্বারা উপস্থাপিত নারীপ্রগতির আদর্শকে কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় কিংবা সমঝোতার মাধ্যমে গ্রহণ করা যায় বাঙালী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের কাছে তাই সমস্যা হয়ে দাঁড়াল।[২৬৩] কারণ, এই সময় মহিলারা ছিলেন দেশীয় ঐতিহ্যকে নিয়ে গড়ে ওঠা তর্ক-বিতর্ক এবং এর নবমূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণের জন্য বেছে নেওয়া রণক্ষেত্র। তাঁদের দেখা হত কখনো নায়িকা রূপে কখনো দুরবস্থার শিকার রূপে।[২৬৪] তাঁর *History of Birtish India* গ্রন্থে, যা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮২৬ সালে, জেম্‌স্ মিল মন্তব্য করেছিলেন যে হিন্দু পুরুষেরা তাঁদের মহিলাদের ঘৃণার চোখে দেখতে অভ্যস্ত তাই হিন্দু মহিলাদের অবস্থা যারপরনাইভাবে শোচনীয়।[২৬৫] ভারতীয়দের মধ্যে অনেকেই স্বীকার করতেন যে হিন্দু মহিলারা যথার্থই দুরবস্থার মধ্যে বাস করেন। ১৮৩৯ সালে *Society for the Acquisition of General Knowledge*-এর অধিবেশনে বক্তৃতা করলেন মহেশ চন্দ্র দেব : "এটুকু বলাই যথেষ্ট যে যাঁরাই মন দিয়ে হিন্দু মহিলাদের অবস্থা পরীক্ষা করবেন, তাঁরাই এঁদের শোচনীয় পরিস্থিতি দেখে করুণা না করে পারবেন না। তাঁদের সদয় মনোযোগ, শুদ্ধ এবং কর্তব্যপরায়ণতা, স্বামীর প্রতি বশ্যতামূলক ব্যবহার এসব সত্ত্বেও তাঁরা প্রায়ই প্রচণ্ড তিরস্কার, এমন কি কখনো ভিত্তিহীন ঈর্ষা বা অত্যাচারমূলক খামখেয়ালির শিকার হতেন।"[২৬৬] কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে মহিলাদের সম্পর্কে এই করুণামিশ্রিত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটেছিল।

২৬২ সুমিত সরকার *"The Women's Question in Nineteenth Century Bengal", Women and Culture, ed. Kumkum Sangari and Sudesh Vaid,* Research Centre for Women's Studies, Bombay, 1994, p. 106.

২৬৩ Ranjit Kumar Roy, *ed. Retrieving Bengal's Past : Society and Culture in the Nineteenth and Twentieth Centuries.* Rabindra Bharti University, Calcutta - 50, 1995, এই বইয়ে অপরাজিতা সেনগুপ্ত, "From Nation' to 'Gender' Indentity, 'Order' and Women in Nationalist Thought in Late Nineteenth and Early Twentieth Century Bengal. পৃ: ৬১।

২৬৪ Lata Mani, "Contentious Traditions : The Debate on Sati in Colonial India", *Recasting Women : Essays in Colonial History ed.* Kum-Kum. Sangari and Suresh Vaid, পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ১১৭-১১৮।

২৬৫ James Mill, *The History of Birtish India, 2 vols,* New York. Chelsea House, 1968, p.p. 309-10, উল্লিখিত Geraldine Forbes, *The New Cambridge History of India, IV. 2, Women in Modern India,* Cambridge University Press, First Indian edition, 1996. p. 13.

২৬৬ মহেশ চন্দ্র দেব, "A Sketch of the conditions of the Hindoo Women" (1839), *Awakening in the Early Nineteenth Century, ed* Goutam Chattopadhyay. Progressive Publishers, ১৯৬৫, পৃ:পৃ: ৮৯-১০৫।

একথা ভালভাবেই জানা আছে যে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মেয়েদের অবস্থার উন্নতির জন্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন পুরুষেরা। এর ফলে সতীদাহ প্রথা বন্ধ হয়েছিল, বিধবাবিবাহের প্রচলন ঘটেছিল এবং মেয়েদের শিক্ষার সূচনা হয়েছিল। এখন এই প্রক্রিয়া কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক শূন্যতা থেকে সৃষ্টি হয়নি। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে রেখে দেখলে বোঝা যাবে যে এই প্রক্রিয়ার দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল। প্রথমত গ্রাম্যজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এক ধরনের নাগরিক সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটল, দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত পেশাদার প্রজন্মের সৃষ্টি হল যারা ঐতিহ্যবাহী জমিদারশ্রেণীর বিপরীত মেরুতে অবস্থান করত। স্বাভাবিকভাবেই এরা তদানীন্তন পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো ভাঙবার কোন চেষ্টা করেনি বা পুরুষরা যে ক্ষমতা ও পদমর্যাদা ভোগ করে, তার ব্যত্যয় ঘটাতে চেষ্টা করেনি। এমনকি পরিবারের বাইরে সামাজিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের সমান ভূমিকা গ্রহণ করার ব্যাপারেও এরা ছিল অনিচ্ছুক। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো বজায় রেখে মহিলাদের অবস্থার উন্নতি ঘটান যাতে পরিবারের মধ্যেই স্ত্রী ও মা হিসাবে তারা উন্নততর ভূমিকা পালন করতে পারে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, মহিলাদের এমনভাবে উন্নত করার চেষ্টা হচ্ছিল যাতে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় তারা পুরুষদের আরো ভালোভাবে সামাজিক সমর্থন দিতে পারে আর পরবর্তী প্রজন্মকেও আলোকিত করে গড়ে তুলতে পারে।[২৬৭] এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে সংস্কারকরা যে আদর্শ নারীর রূপকল্প নির্মাণ করেছিলেন তাতে ভিক্টোরীয় আদর্শের সঙ্গে ভারতীয় নারীর ঐতিহ্যিক গুণাবলীও যুক্ত হয়েছিল। সুতরাং, সমাজ সংস্কারকরা কোনদিনই ঐতিহ্যকে অতিক্রম করে নারীদের উন্নতির কথা ভাবেননি। ভারতীয় ঐতিহ্যের পাশাপাশি তাঁরা কিছু পাশ্চাত্য গুণাবলিকেও আয়ত্ত করতে চেয়েছিলেন, যা মহিলাদের হীনাবস্থার উপশম ঘটিয়ে তাঁদের আধুনিক পুরুষের উপযুক্ত সঙ্গিনী করে তুলতে পারবে। কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষে যখন জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন হতে শুরু করল তখন কিন্তু এই চিন্তাধারার পরিবর্তন দেখা গেল। এই সময় জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ বাঙ্গালী ভদ্রলোকরা ঔপনিবেশিক শক্তির চাপিয়ে দেওয়া সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বকে চ্যালেঞ্জ জানানোর চেষ্টা করলেন তাঁর নিজস্ব সাংস্কৃতিক অস্তিত্বকে দৃঢ়তার সঙ্গে জারি করে। এতদিন পর্যন্ত খ্রীষ্টান মিশনারীরা এবং উপযোগিতাবাদীরা একযোগে ভারতীয় সভ্যতাকে আক্রমণ করে আসছিলেন এই বলে যে এই সভ্যতা বর্বর কারণ এখানে মেয়েরা অবহেলিত ও অত্যাচারিত, আর কোন সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হওয়া উচিত, মেয়েদের অবস্থা বিবেচনা করে। যে সভ্যতা যত উন্নত, সেখানকার মেয়েদের অবস্থা তত ভাল। কোণঠাসা ঔপনিবেশিক এলিট গোষ্ঠী তাদের আহত জাত্যভিমান প্রশমিত করার জন্য তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়েছিল। এইভাবে সুপরিকল্পিত উপায়ে এক গৌরবজনক অতীতকে তুলে ধরা হয়েছিল, যেখানে নারীদের মর্যাদা ছিল সুউচ্চ।[২৬৮]

---

২৬৭ Bharati Ray *ed., From the Seams of History : Essays on Indian Women,* Oxford University Press, 1995, এই বইয়ে Bharati Ray, "*The Freedom Movement and Feminist Consciousness in Bengal,* 1905-1929", p. 179.

২৬৮ তদেব, পৃ:পৃ: ১৭৯-১৮০।

শুধু তাই নয়, ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনতার চাপে যখন স্বাজাত্যবোধ ও নিজস্ব অস্তিত্ব বিপন্ন তখন হিন্দু পরিবার, আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে হিন্দুনারীর মধ্যে এমন একটি ক্ষেত্র পাওয়া গেল, যেখানে স্বাধীনতা এবং স্বাধীন ইচ্ছার অবাধ বিচরণ। তাই হিন্দুবিবাহ পদ্ধতি ও তার আনুষঙ্গিক আচারসমূহের মধ্যে নারীর অবস্থান হয়ে উঠল সংবেদনশীল এবং ভঙ্গুর, যাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা জরুরী হয়ে উঠল—বলেছেন তনিকা সরকার।[২৬৯] তাঁর মতে ১৮৭০-এর দশক থেকে হিন্দুবিবাহ রীতি ক্রমাগত আক্রান্ত হয়ে হয়ে বিলুপ্ত হবার আশঙ্কায় কণ্টকিত। জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এর বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল তাঁরা ফলে এই বিষয়ে আন্দোলন করতেও প্রস্তুত ছিলেন, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটল ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সহবাস সম্মতি আইনের বিরুদ্ধে ময়দানে প্রতিবাদস্বরূপ এক বিশাল জনসমাবেশে।[২৭০] ঔপনিবেশিক পরিকাঠামোতে রাজনৈতিক অধীনতা ছাড়াও কর্মক্ষেত্রে যে দৈনন্দিন হীনতা বাঙালী ভদ্রলোকদের সহ্য করতে হত পরিবারগুলি ছিল তার ঠিক বিপরীত। তা ছিল বাঙালী পুরুষের একমাত্র স্বাধীন ক্ষেত্র। কর্মক্ষেত্রে যে নিয়ন্ত্রণাধিকার, যে ফলপ্রসূ উদ্যোগ থেকে সে বঞ্চিত ছিল, পরিবারে সে তাই লাভ করতে পারত। কাজেই ভিক্টোরিয়ান মধ্যবিত্তদের ক্ষেত্রে পরিবার যেমন ছিল কর্মব্যস্ত দিনের অবসানে এক শান্তির নীড়, বাঙালী মধ্যবিত্তের ক্ষেত্রে তা হয়ে উঠল স্বাধীন কর্মক্ষেত্র। একে আদর্শায়িত করতে গিয়ে বোঝা গেল যে বহির্জগতে যে পরাধীনতা তাঁরা ভোগ করছেন, অন্তর্জগতে অর্থাৎ পরিবারের মধ্যে মেয়েদের তাঁরা সেই অধীনতার বশবর্তী করে রেখেছেন।[২৭১]

এই আত্মোপলব্ধি বাঙ্গালী নারীর অবস্থানে এক ধরনের রূপান্তর ঘটিয়েছিল। এই সময় শাসনাধীন *(Colonised)* "আমরা" আর শাসক *(Colonisers)* "ওরা"র যে দ্বিত্বকরণ হয়েছিল তার "আমরা"র মধ্যে মেয়েদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হল এবং যে ভারতীয় জাতির কল্পনা করা হল তার দুইটি উপাদান, একটি হল নারী, আরেকটি হল পুরুষ, যারা উভয়েই জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অংশীদার। যখন ভারতীয় সামাজিক কাঠামোয় পুরুষ প্রাধান্য সুস্পষ্ট, তখন জাতীয় পর্যায়ে নারী ও পুরুষকে নিয়ে সম্মিলিত "আমরা" এর নির্মিতি যে আত্মপরিচয় গড়ে তুলতে চেয়েছিল তা লিঙ্গ-বিভেদকে অতিক্রম করে গিয়েছিল।[২৭২] কিন্তু একই সময় পুরুষরা তাদের গৃহাভ্যন্তরে খুঁজে পেয়েছিল তাদের স্বাধীনতার ক্ষেত্র, যা বজায় রাখার জন্য গৃহের শৃঙ্খলা বজায় রাখা দরকার ছিল, আর এখানেই সৃষ্টি আরেক ধরনের

২৬৯ Jasodhara Bagchi, *ed. Indian Women : Myth and Reality,* এই বইয়ে Tanika Sarkar, "Hindu Conjugality and Nationalism in Late Nineteenth Century Bengal, পৃ:পৃ: ৭৪-৭৭।

২৭০ তদেব।

২৭১ তদেব, পৃ:পৃ: ১০০-১০১।

২৭২ অপরাজিতা সেনগুপ্ত, "From Nation to Gender". Indentity, 'Order' and Women in Nationalist thought in Late Nineteenth and Early Twentienth Century Bengal", পূর্বোক্ত, পৃ:পৃ: ৬১-৬২।

লিঙ্গ বিভেদের—পুরুষোচিত গুণাবলী ও নারীসুলভ গুণাবলী। এর ভিত্তি ছিল স্বাভাবিক নিয়ম *(Natural Law)*, যার দ্বারা নির্ধারিত হবে পুরুষ ও নারীর পৃথক কাজের ক্ষেত্র। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত এক গ্রন্থে এই পার্থক্য বেশ সুন্দরভাবে বিধৃত হয়েছে : "সমস্ত জীবিত প্রাণীই নারী এবং পুরুষ এই দুই ভাগে বিভক্ত। এই (জীবনবিজ্ঞান বিষয়ক) পার্থক্য সব জীবন্ত প্রাণী মানুষ থেকে শুরু করে পাখী এবং পশুদের মধ্যেও মেনে চলা হয়...সৃষ্টিকর্তা নারী এবং পুরুষের এই বিশেষ পার্থক্য দান করেছেন শারীরিক কাঠামো, মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং আচরণগত বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে। সাধারণত পুরুষরা দীর্ঘ এবং বলিষ্ঠগঠন, সক্ষম, পরিশ্রমী এবং স্থিরসংকল্প। বিশেষভাবে মনন, সাহস এবং অধ্যবসায়ের ক্ষেত্রে পুরুষ শ্রেষ্ঠতর...অপরপক্ষে, স্ত্রীচরিত্র এর সম্পূর্ণ বিপরীত। স্ত্রীজাতির শরীর হল কোমল আর তাদের মন হল সূক্ষ্ম....সাহস, মনন এবং সক্ষমতার বিচারে তারা (পুরুষের) অনেক পিছনে। এই কারণে নারী সর্বদাই চেষ্টা করে পুরুষের সহায়তা পেতে। একই কারণে, পুরুষের ওপর নির্ভরতা ব্যতীত নারীর আর গত্যন্তর নাই। একটি লতা যেমন গাছকে ঘিরে এবং ভর করে বৃদ্ধি পায়, তেমন নারী প্রকৃতিও পুরুষ প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে বিকশিত হয়...অপরপক্ষে, নারীপ্রকৃতির কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুণ পুরুষের থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী। বিনয়, শান্তভাব, সহিষ্ণুতা, ভদ্রতা, মাতৃস্নেহ—এইসব গুণ নারীমানসকে অলঙ্কৃত করেছে...নারীর শরীর ও মন পুরুষ অপেক্ষা অনেক মৃদু, আর সেজন্য কঠিন কার্য সম্পাদনে নারী কখনোই পুরুষকে ছাপিয়ে যেতে বা তার সমকক্ষ হতে পারে না। আবার, নারী যে দক্ষতায় গৃহকার্য এবং সন্তান পালন করে তাতে পুরুষ কখনোই সমকক্ষ হতে পারে না। এই কারণেই (সমাজে) শ্রম বিভাজন যার যার ক্ষমতা অনুযায়ী হয়েছে। যদি পুরুষ ও নারী তাদের যার যার স্বাভাবিক গুণ বজায় রাখতে পারে তবে সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে।[২৭৩] ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রচিত সাহিত্যিক উপাদান বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে তখনকার একটি প্রহসনে পুরুষালি নারী ও মেয়েলি পুরুষ চরিত্রের মাধ্যমে এই আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে এই ধরনের পাশ্চাত্যকরণ সমাজের নৈতিক শৃঙ্খলা নষ্ট করে দেবে। কালীঘাটের পট ও যাত্রায় শিক্ষিত মেয়েদের চিত্রিত করা হয়েছে ভুইফোঁড় এবং দজ্জাল হিসাবে। এই ধরনের প্রবণতার মধ্য দিয়ে সমাজে পুরুষ প্রাধান্যের ঝোঁক চিহ্নিত করা যায়, যার দ্বারা নারীর বশ্যতা সুনিশ্চিত করা যায়।[২৭৪]

এই সময় বিদেশী শাসনের অধীনে যে পরিবর্তন আসছিল, যাকে আধুনিকতা বলে চিহ্নিত করা হত, সে সম্পর্কে এক আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে এই পরিবর্তনশীল সময়ে এক নতুন নৈতিকতা প্রয়োজন। কারণ, এই পরিবর্তন ছিল নিতান্তই বহিরাগত এক উপাদান যা বাঙালীর

২৭৩ প্রসন্নতারা গুপ্ত, পারিবারিক জীবন (কটক, ১৯০৩), পৃ: পৃ: ৩-১১ যত্রতত্র। অপরাজিতা সেনগুপ্তের পূর্বোক্ত প্রবন্ধে উদ্ধৃত, পৃ:পৃ: ৬৩-৬৪।

২৭৪ Sumanta Banerjee, The Parlour and the Streets. Elite culture and popular culture in nineteenth century Calcutta (Calcutta, 1989), p. 200.

দৈনন্দিন একান্ত জীবনের ওপর আঘাত হানছিল। এমত পরিস্থিতিতে এক আদর্শ নতুন নারীর রূপায়ণ প্রয়োজন হয়ে পড়ল। পরিবার এবং সমাজে এই আদর্শ নারীর প্রকৃতি কি হবে এবং গার্হস্থ্য ক্ষেত্রে এই নারীর যথাযোগ্য স্থান কি হবে তা নির্ধারণ করাও দরকার ছিল। যেহেতু, জাতীয়তাবাদী ধারণা ও রচনায় নারীর যথার্থ স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল গৃহাভ্যন্তরে, আর গৃহই ছিল হিন্দুজাতির স্বাধীন বিচরণক্ষেত্র সেহেতু হিন্দুজাতির উন্নতির সঙ্গে হিন্দুনারীর উন্নতির প্রশ্নটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়ল। এই উন্নতির পরিকল্পনায় স্বাধীনতাকে যথেচ্ছাচার থেকে সযত্নে পৃথক করা হল, স্বাধীনতার সঙ্গে সর্বদাই সমপরিমাণ শাসনের উপস্থিত থাকা উচিত বলে বিবেচনা করা হল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত একটি গ্রন্থে বলা হল যে আদর্শ পরিবার হবে এমন যেখানে স্বাধীনতা ও শাসনের সহাবস্থান থাকবে। স্বাধীনতা ব্যতীত যেমন সুখলাভ হয় না, চিত্তের বিকাশ হয় না, তেমন যে স্বাধীনতা বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয় তা পারিবারিক সুখের ক্ষেত্রে বিষবৎ। সুতরাং, আদর্শ পরিবার হল তাই যেখানে সঙ্গত স্বাধীনতা ও সঙ্গত শাসনের সহাবস্থান রয়েছে।[২৭৫] এই সহাবস্থান তখনই সম্ভব যখন স্ত্রী তার স্বামীর বশবর্তী হবে এবং স্বামী স্ত্রীর প্রতি যত্নবান হবে এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রকৃত প্রণয় ঘটবে। এভাবে, জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক ভাবনায় "আমরা" আর "ওরা"র যে প্রভেদ রচিত হয়েছিল, সেই "আমরা"র মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়ের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছিল, কিন্তু নারী ও পুরুষের প্রকৃতির পার্থক্য নির্দেশ করে, আবার একটি বিভেদ রচনা করা হয়েছিল। একদিকে, ঔপনিবেশিক শক্তির বিপরীতে ভারতীয় জাতি, অপরদিকে ভারতীয় জাতির মধ্যে স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী নারী ও পুরুষের প্রভেদ রচনা ভারতীয় তথা বাঙ্গালী নারীকে তার 'স্বাভাবিক' আচরণবিধির মধ্যে স্থাপন করেছিল।[২৭৬] এখানে উল্লেখ করা দরকার যে নারীর স্বাভাবিক গুণাবলি ও কর্তব্য বোঝাতে আবার ইউরোপীয় মহিলাদের উদাহরণ গ্রহণ করা হয়েছে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত এরকম একটি গ্রন্থের চরিত্র হরিহর তার স্ত্রী পদ্মাবতীকে উপদেশাচ্ছলে ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল, হানা মোর, মারগারেট মরসর, প্রমুখের কথা বলছে। এঁরা প্রত্যেকেই অনাত্মীয় মানুষের সেবায় রত ছিলেন।[২৭৭] দেখা যাচ্ছে যে দয়া, সেবা, করুণা ইত্যাদি নারীসুলভ গুণ মেয়েদের মধ্যে থাকা আবশ্যিক এ কথা প্রতিপন্ন করার জন্য পাশ্চাত্য নারীদের উদাহরণ স্থাপন করা হচ্ছে। এখানে লক্ষণীয় যে "হরিহর" তার স্ত্রীকে যে কয়জন মহিলার উদাহরণ দিয়েছে তাঁরা সকলেই প্রয়োজনবোধে তাঁদের নারীসুলভ কোমলতা ও গুণাবলি নিয়ে বহির্জগতের দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। যেমন, ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল ক্রিমিয়ার যুদ্ধে দুর্গত পুরুষদের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন, হানা মোর দরিদ্র শিশুদের শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করেছিলেন। মার্গারেট মরসর তাঁর পিতৃদত্ত বিপুল অর্থ ক্রীতদাসদের মুক্তির জন্য ব্যয় করেছিলেন।[২৭৮] তাহলে নারী

২৭৫ শিবনাথ শাস্ত্রী, গৃহধর্ম, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৮৮৫, পৃ: ৬।
২৭৬ অপরাজিতা সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ: ৭৭।
২৭৭ প্যারীচাঁদ মিত্র, রামারঞ্জিকা, কলিকাতা ১৮৬০, পৃ:পৃ: ২০-২২।
২৭৮ তদেব।

শুধু তার গৃহেই সুখের নীড় রচনা করবে না। প্রয়োজনে বিধ্বস্ত ও পীড়িত পুরুষের সেবায় সে গৃহের বাইরে পা বাড়াতেও দ্বিধা করবে না, সেখানেও তাঁর সেবার মূর্তি থাকবে অম্লান, বিংশ শতকের সূচনায় নারীর এইরকম ভূমিকাই কি পুরুষের কাছে কাম্য ছিল? তাই, দেখি যে "ঘর" ও "বাহির" এই পৃথকীকরণ সত্ত্বেও "বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যখন নতুন রাজনৈতিক উদ্বোধন আরম্ভ হল তখন নতুন করে মেয়েরা বাড়ীর বাইরে আসতে শুরু করল। জীবিকার তাড়নায় নয় অন্য কোন বৃহত্তর দেশাত্মবোধের টানে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মেয়েরাও গৃহস্থালীর বেড়া ভেঙে গণআন্দোলনের ঝোঁকে বাইরের উদ্বেলিত মানবসমাজের কর্মকাণ্ডে সামিল হলেন।"[২৭৯] এ প্রসঙ্গে মহিষাদল থানার অন্তর্গত রাজারামপুরের লক্ষ্মীমণি হাজরা এবং ব্যবর্তার হাটের তরুলতা ভট্টাচার্যের নাম করা যেতে পারে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হয় তাতে তমলুক মহকুমার যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। এই আন্দোলনের সূত্র ধরে বিদেশী দ্রব্য বর্জন শুরু হলে বাংলার অন্যান্য স্থানের মেয়েদের মতো এখানকার অনেক মেয়ে বিদেশী দ্রব্য বর্জন করেন। তমলুক মহকুমার একজন উল্লেখযোগ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী নীলমণি হাজরার পত্নী লক্ষ্মীমণি হাজরা এই আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেছিলেন।[২৮০] তরুলতা ভট্টাচার্যের ভূমিকা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। "১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবর্ত্তার হাটে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় তরুলতা দেবী উপস্থিত ছিলেন এবং গ্রামের মেয়েদের তিনি এই আন্দোলনে ভাগীদার হওয়ার জন্য প্রচার চালান।"[২৮১] ১৯৮৫ সালে তরুলতা দেবীর বয়স ছিল ৯২ বছর। তখন তাঁর কাছে ১৯০৫ সালের এই আন্দোলনের কথা জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, "আমরা বাড়ীর বৌ, তখন শাশুড়িদের সঙ্গে নিকটে স্বদেশী যাত্রার আসরে গিয়েছি, গান শুনে চুড়ি ভেঙেছি। পরের দিন অনেকে মিলে পাড়ায় ঘুরে চুড়ি ভাঙার অভিযান করেছি, আর বিলাতি কাপড় পুড়িয়েছি।"[১৭৮]

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে যখন মেয়েদের নিয়ে ভাবনার মধ্যে আবার রক্ষণশীলতা প্রকাশ পাচ্ছিল, গৃহের মধ্যেই মাতা, স্ত্রী ও কন্যা হিসাবে তার দয়া, মায়া, করুণা, কোমলতা ইত্যাদি নারীসুলভ গুণগুলিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছিল তখন কিন্তু আবার অন্যভাবে গৃহস্থালীর রক্ষণশীলতা ভেঙে যাচ্ছিল। "এইভাবে নতুন একটি দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর সূচনার সঙ্গে সঙ্গে। এটি কোন সমাজসংস্কারের যুগ নয়। কিন্তু নতুন রাজনৈতিক আন্দোলনের হাওয়া কখন কিভাবে গৃহস্থালীর খোলা জানালা দিয়ে অন্দরমহলে প্রবেশ করল তা জানা যায় না। তা নীরবে প্রবেশ করেছিল এবং নিবিড় নৈঃশব্দ্যের মধ্য দিয়ে তা কিন্তু বাঙ্গালী রক্ষণশীল গৃহস্থালীর দরজা খুলে দিয়েছিল।"[২৮৩]

২৭৯ ডঃ রঞ্জিত সেন, ভাবিত পুরুষ অভাবিত নারী, অরুণা প্রকাশনী, কলিকাতা-৯, জুন, ২০০২, পৃঃ ৪২

২৮০ প্রদ্যোত কুমার মাইতি, "ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনে তমলুকের নারীসমাজ (১৯০৫-১৯৩৪)", আব্দুল ওয়াহাব মামুদ সম্পাদিত ইতিহাস অনুসন্ধান ৮, কলিকাতা ১৯৯৩, পৃ: ২৬৮।

২৮১ তদেব।

২৮২ তদেব।

২৮৩ ডঃ রঞ্জিত সেন, পূর্বোক্ত।

উপসংহার

উনিশ শতকে বাঙ্গালী অন্তঃপুর বহির্জগতের কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করেছিল না বহির্জগৎ প্রবেশ করেছিল অন্তঃপুরে তা বলা কঠিন। হয়ত এই দুটি ধারা সমান্তরালভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। আসলে সমাজ কখনো একটি প্রবণতা নিয়ে চলে না। উনিশ শতকের বাঙ্গালী সমাজও চলেনি। রামমোহনের যুক্তিশীলতা যেমন যুক্ত হয়েছিল বিদ্যাসাগরের আবেগ ও করুণাঘন মননশীল সমাজ চেতনার সঙ্গে সেই রকম জ্ঞানদানন্দিনীর যুক্তিশীল নারীমর্যাদা সংরক্ষণের কর্মসূচী মিলিত হয়েছিল হরসুন্দরী দত্তের নিমজ্জমান স্বামীকে তুলে ধরার আত্মপ্রত্যয়ে। আসলে উনিশ শতকে কোন একটি ব্যক্তির বা একটি গোষ্ঠীর কাজের ফলে নারীমুক্তির ঘটনাবহুল ইতিহাস রচিত হয়নি। নারীপুরুষের দ্বৈত ভূমিকা শেষপর্যন্ত এক অদ্বৈত আকাঙ্ক্ষার অর্থবহ পরিণতি ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। নারী বন্ধনমুক্তি চেয়েছিল আর পুরুষ চেয়েছিল সহমর্মী অর্ধাঙ্গিনী। নারী চেয়েছিল অন্তঃপুরের বাইরে এসে সমাজে একটি ন্যূনতম অবস্থান। পুরুষ তাকে দিতে চেয়েছিল শিক্ষা যা বাদ দিয়ে এই অবস্থান সম্ভব নয়। নারী চেয়েছিল অবরোধ থেকে মুক্তি, পুরুষ তাকে করতে চেয়েছিল তার জীবনসখা, একাধারে প্রাণিত এক সত্তা অন্যদিকে প্রেরণার সঞ্চারসাধিকা। এই দুই চাওয়া আসলে পুরুষের প্রভুত্ব এবং নারীর অধীনতা পুরুষের প্রতাপ এবং নারীর অজ্ঞতা। পুরুষেব শাসন ও নারীর নিমজ্জন সমাজের ভারসাম্য নষ্ট করে দিচ্ছিল। উনিশ শতকে নারীমুক্তির সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত প্রয়াস এবং সমস্ত কর্মসূচী এই ভারসাম্যকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা মাত্র। এই প্রচেষ্টা যেমন একের দ্বারা সাধিত হয় না, সেইরকম একের উদ্বোধনও এর কাম্য নয়। উনিশ শতকের বাংলা দেশে নারী কোন শ্রেণী হিসাবে জেগে ওঠেনি, জেগে উঠেছিল একটি বর্গ হিসাবে। এটি যতখানি সামাজিক বর্গ ততখানি জৈবিক বর্গ। আসলে একটি অপরিশীলিত ও অপরিণত বর্গ হিসাবে নারী যতখানি সমাজে শক্তির আধার ছিল ঠিক ততখানি ছিল তার অগ্রগতির মুখে একটি বিশাল অচলায়তন। এই অচলায়তনকে অপসারণই ছিল সমাজের লক্ষ্য। সমাজের অগ্রগতিকে অবাধ করাই ছিল সমাজ পরিবর্তনের মূল কর্মসূচী। কখনো তা এসেছে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে, কখনো এসেছে বিধবাদের জন্য আশ্রয় নির্মাণ করে, কখনো তা এসেছে ধর্মপত্নীরূপে নারীকে সামাজিক উপাসনায় অংশগ্রহণ করিয়ে আর কখনো তা এসেছে পালকীতে বা ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে অবরোধের দুর্গ ভেঙে, অন্তঃপুর থেকে তাকে সমাজের মুক্ত পরিসরের মধ্যে নিয়ে এসে। এই বৃহত্তর প্রয়াসে কখনো যৌথ পরিবার ভেঙেছে কখনো উদীয়মান প্রজন্মের পুরুষরা বিদ্রোহী হয়ে ঘর ছেড়েছে। ভিন্ন ধর্মকে আশ্রয় করেছে অথবা স্ত্রীকে নিয়ে মফস্বল থেকে কলকাতা পলায়ন করেছে। আসলে পাশ্চাত্য শিক্ষা যে নতুন সমাজকে গড়ে তোলার স্বপ্ন মানুষকে দেখিয়েছিল তার থেকেই জন্ম নিয়েছিল সমাজের ক্ষয়িষ্ণু সংগঠনকে ভেঙে নববিধানের নতুন বার্তাকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়া। উনিশ শতকের নারী জাগরণ যতখানি সমাজকে ভেঙে দেওয়ার আলেখ্যটিকে প্রকাশ করে তার থেকে অনেক বেশী প্রকাশ করে এই নববিধানের বিমূর্ত আশ্বাসকে মূর্ত করা কখনো অস্পষ্ট কখনো স্পষ্ট অথচ নিশ্চিতভাবে ক্রমপ্রকাশমান

এক ছবি। বর্তমান সন্দর্ভে কখনো খণ্ডিত কখনো পূর্ণভাবে এই চিত্রটিকে প্রকাশ করার চেষ্টা হয়েছে। এই অর্থে বর্তমান গবেষণা নানা ব্যর্থতার চোরাবালিতে নিমজ্জমান কোন সমাজের অ্যানাটমি নয়। এটি ইতিহাসের পরিবর্তনশীলতার মধ্যে অপসৃয়মান মূল্যবোধের পরিমণ্ডলের মধ্যে একটি সমাজের মধ্য থেকে উদীয়মান নতুন জীবনবোধের আলোচনা মাত্র। এক শতাব্দী ধরে বাঙ্গালী সমাজে ব্যর্থতার কথা যত বলা হয়েছে তার প্রতিশ্রুতির কথা তত বলা হয়নি। ইতিহাসের দিকচক্রবাল থেকে উনিশ শতকের প্রতিশ্রুতিময় সমাজচিত্র উপস্থাপনা দরকার, না হলে আমাদের উনিশ শতকে ফিরে চাওয়াটা কোন প্রেরণার উৎসমুখে ফিরে যাওয়া হবে না। হবে শুধু মৃত্যুর ভগ্নস্তূপে বাঙ্গালীর বিবর্ণ অস্তিত্বের ব্যবচ্ছেদ মাত্র।

গ্রন্থপঞ্জী

প্রধান উৎস

(ক) সরকারী নথিপত্র

Basu Anath Nath ed; Adam's Report on the State of Education in Bengal, Calcutta 1941.

Long Reverend James, ed; Adam's Reports on Vernacular Education in Bengal and Bihar, London, 1868.

Richey J. A. ed; Selections from Educational Records Part II, Bengal Secretarial Press, Calcutta, 1922.

General Report on Public Instruction in the Lower Provinces Bengal Presidency for 1857-58, Calcutta, 1859.

Consultations of the Education Department, 5th August 1858, No. 16.

Consultations of the Education Department, 20th January, 1859, No. 9.

General Report on Public Instruction in Bengal for 1877-78, Calcutta, 1878.

General Report on Public Instruction in Bengal for the years 1863-64.

General Report on Public Instruction in Bengal for the years 1890-91.

Administration Report of Kuch Behar State, 1877-78.

Census of India, 1901, vol. VI. A, Part II, Calcutta : Bengal Secretarial Press, 1902.

Census of India, 1891, vol. III, The Report.

(খ) জীবনী গ্রন্থ ঃ ইংরাজী

Banerjee U. C. compiled by, Reminiscences, Writings and Speeches of Sri Gooroo Das Banerjee.

Deb Bahadur, Raja Rajendra Narayan, ed;Raja Sir Radhakanta Deb Bahadur, KCSI. A Brief Account of his Life and Character, Calcutta.

Mozoomdar B., God-Man Keshub and Cooch Behar Marriage, Calcutta 1912.

Mazoomdar P. C., Life and Teachings of Keshub Chunder Sen, Calcutta, Baptist Mission Press, Calcutta, 1887.

Mazoomdar P. C., Keshub Chunder Sen, Calcutta, Baptist Mission Press, Calcutta, 1887.

Mazoomdar P. C., Keshub Chunder Sen and His Times (No title page).

Sen P. K., Biography of a New Faith, 2 vols, Calcutta, 1950-54.

Sen Prasanto Kumar, Keshub Chunder Sen and the Cooch Behar Bethrothal, 1878, The Book Company Limited, Calcutta, 1933.

(গ) জীবনী গ্রন্থ : বাংলা

আচার্য কেশবচন্দ্র আদি বিবরণ, কলিক:তা, মঙ্গলাগঞ্জ মিশন প্রেসে শ্রী বিশ্বনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮১৩ শক (১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ)।

আচার্য কেশবচন্দ্র, মধ্যবিবরণ (প্রথম অংশ), কলিকাতা, ১৮১৪ শক।

আচার্য কেশবচন্দ্র, অন্ত্যবিবরণ, দ্বিতীয় অংশ, কলিকাতা, ১৮২৩ শক (১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ)।

আচার্য ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ, জীবন প্রসঙ্গ ও উপদেশাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৩৬।

স্বর্গীয় আনন্দ চন্দ্র বর্ধনের জীবনের কতিপয় স্মৃতি, ত্রিপুরা, ১৯২৭।

কর বঙ্কুবিহারী, ভক্ত কালীনারাণ গুপ্তের জীবন বৃত্তান্ত, কলিকাতা, ১৩৩১।

গঙ্গোপাধ্যায় দ্বারকানাথ, জীবনালেখ্য, আখ্যাপত্র বিনষ্ট।

চট্টোপাধ্যায় নগেন্দ্রনাথ, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, কলিকাতা, ১৮৮১।

চট্টোপাধ্যায় বসন্তকুমার, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতি, কলিকাতা ১৩২৬ বঙ্গাব্দ।

তাকেদা, হরিপ্রভা, আশাচন্দ্র শ্রী ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, ঢাকা, ১৮৯৬।

দত্ত হরসুন্দরী, স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্তের জীবনকথা, কলিকাতা, ১৯২২।

বিদ্যারত্ন শম্ভুচন্দ্র, বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ, বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৬, ১৯৬২।

মল্লিক কুলদাপ্রসাদ, ভাগবতরত্ন, বি. এ. ব্রহ্মর্ষির জীবনে ভগবানের কৃপার জয়, কলিকাতা ১৯১৮।

মহলানবিশ শ্রীমতী মণিকা, সম্পাদিত, ব্রহ্মানন্দ শ্রী কেশবচন্দ্রের পত্রাবলী, কলিকাতা, ১৯৪১।

মিত্র কৃষ্ণকুমার, আত্মচরিত, কলিকাতা, বাসন্তী চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৩৭।

মুরশিদ গোলাম, সম্পাদিত, বিদ্যাসাগর, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৯, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯।

লাহিড়ী শ্রী গিরীশ চন্দ্র, সংকলিত, মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবনচরিত, আখ্যাপত্র পাওয়া যায়নি।

শাস্ত্রী শিবনাথ, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, সাক্ষরতা প্রকাশন, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, কলিকাতা ৭৩, জুলাই, ১৯৭৯, আষাঢ়, ১৩৮৬।

সেন কেশবচন্দ্র, জীবনদেব, শ্রী নববিধান ব্রাহ্মট্রাস্ট সোসাইটি, কলিকাতা, ভাদ্র, ১৮০৬ শক, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে।

(ঘ) মহিলাদের জীবনী

গুপ্ত অমৃতলাল, পুণ্যবতী লাহিড়ী, শ্রী গিরীশ চন্দ্র, মহারাণী শরৎ সুন্দরীর জীবনচরিত, আখ্যাপত্র বিনষ্ট।

বসু কুমুদিনী, আমাদের রতনদিদি, আখ্যাপত্র পাওয়া যায়নি।

বসু প্রভাত, মহারাণী সুচারু দেবীর জীবন কাহিনী, কলিকাতা, ১৯৬২।

বামাচরিত, শ্রদ্ধেয়া বামাসুন্দরী দেবীর জীবনকথা, ঢাকা, শ্রাবণ, ১৩০২ বঙ্গাব্দ।

মল্লিক প্রিয়নাথ, ব্রহ্মনন্দিনী সতী জগন্মোহিনী দেবী, শ্রী ব্রহ্মানন্দাশ্রম, হাবড়া, ১৯১৪।

লেখক, প্রকাশক ও প্রকাশকাল নেই, লালীবতী মিত্র।

(ঙ) আত্মজীবনী

চন্দ শ্রীনাথ, ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বছর, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ।

ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথ, আত্মজীবনী, কলিকাতা ১৯৬২।

ঠাকুর সত্যেন্দ্রনাথ, আমার বাল্যকাল, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, বৈতানিক, ১৯৬৭।

পাল বিপিনচন্দ্র, আমার জীবন ও সমকাল (প্রথম পর্ব), ভাষান্তর শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৩, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫।

বন্দ্যোপাধায় তারাশঙ্কর, আমার কালের কথা, কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৮।

বসু রাজনারায়ণ, আত্মচরিত, কলিকাতা, ১৯৫২।

বসু রাজনারায়ণ, সেকাল আর একাল, ১৭৯৬ শক।

মিত্র কৃষ্ণকুমার, আত্মচরিত, কলিকাতা, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ।

মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাসবিহারী, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত, কলিকাতা, ১৮৮১।

রায় শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র, অঘোর প্রকাশ, মাঘোৎসব, ১১ই মাঘ, কলিকাতা, ১৩৬৪।

শাস্ত্রী শিবনাথ, আত্মচরিত, সাক্ষরতা প্রকাশন, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, কলিকাতা-৭৩, জুলাই, ১৯৭৯, আষাঢ়, ১৩৮৬।

শাস্ত্রী শিবনাথ, আত্মচরিত, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ শতবার্ষিক সংস্করণ, সম্পাদনা, গৌতম নিয়োগী, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা-৬।

সেন নবীনচন্দ্র, আমার জীবন, নবীনচন্দ্র রচনাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ৬, সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত প্রথম সংস্করণ, ৫ই বৈশাখ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ।

হালদার শ্রী সাতকড়ি, পূর্বস্মৃতি, কলিকাতা, ১৮৯৮।

(চ) মহিলাদের আত্মজীবনী

কেশব জননী সারদা সুন্দরীর আত্মকথা, শ্রী যোগেন্দ্রলাল খাস্তগির, ব্রাহ্মট্রাস্ট সোসাইটি, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ।

দাস কৃষ্ণভাবিনী, ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা, সম্পাদনা, সীমন্তী সেন, স্ত্রী, কলিকাতা, ২৬, ডিসেম্বর, ১৯৯৬।

গুপ্তা প্রসন্ন তারা, পারিবারিক জীবন, কটক, ১৯০৩।

দেবী ইন্দিরা, আমার খাতা, আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস, কলিকাতা, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

দেবী জ্ঞানদানন্দিনী স্মৃতিকথা, এক্ষণ পত্রিকা, শারদীয়, ১৩৯৭।

দেবী মনোদা, সেকালের গৃহবধূর ডায়েরি, নয়া উদ্যোগ, কলিকাতা-৬, অক্টোবর, ১৯৯৬, কার্তিক ১৪০৩ বঙ্গাব্দ।

দেবী রাসসুন্দরী, আমার জীবন, কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।

চৌধুরাণী ইন্দিরা দেবী, সম্পাদিত, পুরাতনী, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড লিমিটেড পাবলিশিং কোম্পানি, কলিকাতা, ১৯৫৭।

চৌধুরাণী সরলা দেবী, জীবনের ঝরাপাতা, রূপা অ্যান্ড কোম্পানি, কলিকাতা-৭৩, দ্বিতীয় রূপা সংস্করণ, মাঘ, ১৩৮৮, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২।

Devi Sunity, Autobiography of an Indian Princess : Memoirs of Maharani Sunity Devi of Cooch Behar, ed. by Viswanath Das, Vikas Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi-14, 1995.

(ছ) মহিলাদের অন্যান্য রচনা

অমলপ্রসূন বা প্রভাবতী কবিতাবলী, প্রভাবতী দেবী কর্তৃক প্রণীত, শ্রী মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা সংগৃহীত ও প্রকাশিত, যশোহর হিন্দু পত্রিকা প্রেসে কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ।

চৌধুরাণী শরৎকুমারী, শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সম্পাদক শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী সজনীকান্ত দাস, শ্রাবণ, ১৩৫৭।

দেবী কৈলাসবাসিনী, হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি, কলিকাতা, ১৭৮৭ শক।

মুস্তোফী নগেন্দ্রবালা, মর্ম্মগাথা, আখ্যাপত্র পাওয়া যায়নি।

Cattle Mily, Bhind the Purdah, The Lives and Legends of Our Hindu Sisters, Thacker, Spinks and Co., Calcutta and Simla, 1916.

Urquhart Margaret, Women of Bengal : A Study of the Hindu Pardanasins of Calcutta, Calcutta-25.

(জ) অন্যান্য পুস্তক

অবলা বান্ধব, প্রকাশকাল ১৯৪৯।

ঘোষ অবিনাশ চন্দ্র, উপহার, সিটি বুক সোসাইটি, কলিকাতা, ১৩১৮।

ঠাকুর ক্ষিতীন্দ্রনাথ, আর্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা, এলগিন প্রেস, কলিকাতা, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ।

ঠাকুর শ্রী টেকচাঁদ, অভেদী, ১৮৭১, প্রথম সংস্করণ।

ঠাকুর শ্রী টেকচাঁদ, আলালের ঘরের দুলাল, কলিকাতা (রোজরিও কোম্পানির যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত), ১২৬৪ বঙ্গাব্দ, ১৮৫৭।

দত্ত অক্ষয় কুমার, ধর্ম্মনীতি, প্রথম ভাগ, নবম মুদ্রণ, কলিকাতা, দি নিউ সংস্কৃত প্রেস, ১৮৮০।

বিদ্যালঙ্কার গৌরমোহন, স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক, কলিকাতা, ১৮২২।

মিত্র প্যারীচাঁদ, আধ্যাত্মিকা, কলিকাতা, ১২৮৬ বঙ্গাব্দ।

মিত্র প্যারীচাঁদ, বামাতোষিণী, কলিকাতা, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং কর্তৃক বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে স্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, সন ১২৮৮ বঙ্গাব্দ, ইংরাজী ১৮৮১ সাল।

মিত্র প্যারীচাঁদ, রামারঞ্জিকা, কলিকাতা, ১৮৬০।

মুখোপাধ্যায় ভূদেব, আচার প্রবন্ধ, হুগলী, ১৩০১ বঙ্গাব্দ।

শাস্ত্রী শিবনাথ, গৃহধর্ম, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৮৮৫।

(ঝ) পত্র / পত্রিকা

অন্তঃপুর

কার্তিক, ১২৯০ বঙ্গাব্দ।

অগ্রহায়ণ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ।

পৌষ, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ।

বৈশাখ, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ।

ভাদ্র, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ।

আশ্বিন, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ।

ভাদ্র, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ।

কার্তিক, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ।

পৌষ, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ।

বৈশাখ, ১৩১০ বঙ্গাব্দ।

আষাঢ়, ১৩১০ বঙ্গাব্দ।

চৈত্র, ১৩১০ বঙ্গাব্দ।

বৈশাখ, ১৩১১ বঙ্গাব্দ।

আষাঢ়, ১৩১১ বঙ্গাব্দ।

অগ্রহায়ণ, ১৩১১ বঙ্গাব্দ।

আজকাল, রবিবাসরীয়

আগস্ট, ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দ।

দাসী পত্রিকা

অগ্রহায়ণ, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ।

জ্ঞানাঙ্কুর, আশ্বিন, ১২৮২ বঙ্গাব্দ।

চৈত্র, ১৭৭৭ শক, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৮ শক (১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ)

নভেম্বর, ১৮৭৮ বঙ্গাব্দ।

ডিসেম্বর, ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ।

দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ।

পশ্চিমবঙ্গ, রামমোহন সংখ্যা, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ।

বঙ্গদর্শন

অগ্রহায়ণ, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ।

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা

কার্তিক, ১২৬২ বঙ্গাব্দ।

বঙ্গমহিলা

বৈশাখ, ১২৮৩ বঙ্গাব্দ।

শ্রাবণ, ১২৮৩ বঙ্গাব্দ।

জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৩ বঙ্গাব্দ।

চৈত্র, ১২৮৩ বঙ্গাব্দ।

বামাবোধিনী পত্রিকা

ভাদ্র, ১২৭০ বঙ্গাব্দ।

পৌষ, ১২৭০ বঙ্গাব্দ।

ফাল্গুন, ১২৭০ বঙ্গাব্দ।

জ্যৈষ্ঠ, ১২৭১ বঙ্গাব্দ।

ফাল্গুন, ১২৭১ বঙ্গাব্দ।

বামাবোধিনী পত্রিকা

ভাদ্র, ১২৭২ বঙ্গাব্দ।

আশ্বিন, ১২৭২ বঙ্গাব্দ।

পৌষ, ১২৭২ বঙ্গাব্দ।

আশ্বিন, ১২৭৩ বঙ্গাব্দ।

কার্তিক, ১২৭৩ বঙ্গাব্দ।

অগ্রহায়ণ, ১২৭৩ বঙ্গাব্দ।

ভাদ্র, ১২৭৪ বঙ্গাব্দ।

জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৫ বঙ্গাব্দ।

জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৬ বঙ্গাব্দ।

ভাদ্র, ১২৭৮ বঙ্গাব্দ।

পৌষ, ১২৭৮ বঙ্গাব্দ।

শ্রাবণ, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ।

জ্যৈষ্ঠ, ১২৮২ বঙ্গাব্দ।

আশ্বিন, ১২৮৩ বঙ্গাব্দ।

ফাল্গুন, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ।

জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৯ বঙ্গাব্দ।

কার্তিক, ১২৯০ বঙ্গাব্দ।

বৈশাখ, ১২৯১ বঙ্গাব্দ।

শ্রাবণ, ১২৯১ বঙ্গাব্দ।

মাঘ, ১২৯১ বঙ্গাব্দ।

ফাল্গুন, ১২৯১ বঙ্গাব্দ।

কার্তিক, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ।

আষাঢ়, ১২৯৬ বঙ্গাব্দ।

বৈশাখ, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ।

ভাদ্র, ১৩০১ বঙ্গাব্দ।

বালক

ভাদ্র, ১২৯২ বঙ্গাব্দ।

বিচিত্রা

ভাদ্র, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ।

বিদ্যাদর্শন

কার্তিক, ১৭৬৪ শক।

ভারতবর্ষ

অগ্রহায়ণ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ।

ভারতী

বৈশাখ, ১২৮৪ বঙ্গাব্দ।

বৈশাখ, ১২৯১ বঙ্গাব্দ।

ফাল্গুন, ১২৯১ বঙ্গাব্দ।

চৈত্র, ১২৯১ বঙ্গাব্দ।

আষাঢ়, ১৩১০ বঙ্গাব্দ।

মাঘ, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

সর্বশুভকরী পত্রিকা

আশ্বিন, ১৭৭২ বঙ্গাব্দ, ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ।

সমাচার দর্পণ

১৭.০৪.১৮৩০

২৭.০৬.১৮৩২

০৩.০৩.১৮৩৮

১৪.০৩.১৮৪৪

সম্বাদ কৌমুদী

ফাল্গুন, ১২৩৭ বঙ্গাব্দ।

সম্বাদ ভাস্কর

২৯.০৫.১৮৪৯

৩১.০৫.১৮৪৯

১১.১১.১৮৫৬

০২.১২.১৮৫৬

সংবাদ প্রভাকর

১০.০৫.১৮৪৯

০১.১০.১৮৫৬

২১.০৪.১৮৪৯

০৭.০৫.১৮৪৯

২৩.০৫.১৮৫৫

২৪.০৫.১৮৫৫

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৬২

সাধনা

অগ্রহায়ণ, ১২৯৮ বঙ্গাব্দ।

সাহিত্য

আশ্বিন, ১২৯৮ বঙ্গাব্দ।

মাঘ, ১২৯৮ বঙ্গাব্দ।

আষাঢ়, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ।

সোমপ্রকাশ

১৫ই ফাল্গুন, ১২৬৭ বঙ্গাব্দ।

৩০ শ্রাবণ, ১২৭৮ বঙ্গাব্দ।

১৩ই ভাদ্র, ১২৭৮ বঙ্গাব্দ।

Bengal Spectator

April, 1842.

Brahmo Public Opinion

23 May, 1878.

The Calcutta Journal

11 March, 1822.

Calcutta Review

Vol. 25, 1855.

The Citizen

24.03.1855

The Friend of India

30 March, 1865

The Hindu Intelligencer

Vol. IV. No. 27, Monday July 2, 1849.

The Indian Mirror, Sunday Edition

31 March 1878

1 June, 1878,

22nd December, 1878.

The Indian Mirror

9th February, 1878.

14th February, 1878.

18th March, 1883.

The Morning Chronicle

28.05.1855

08.09.1855

The Reformer

19th December, 1831.

অপ্রধান উৎস

(ক) ইংরাজী গ্রন্থ

Ahmed A. F. Salahuddin, Social Ideas and Social Change in Bengal, 1818-1835, Riddhi, Calcutta, Second Edition, June, 1976.

Bagchi Josodhara, ed Indian Women : Myth and Reality, Sangam Books, 1995.

Banerjee Sumanta, The Parlour and the Streets, Elite Culture and Popular Culture in Nineteenth Century Calcutta, Calcutta, 1989.

Borthwick Meredith, The Changing Role of Women in Bengal, 1849-1905, Princeton University Press, New Jersey, 1985.

Borthwick Meredith, Keshub Chunder Sen : A Search for Cultural Synthesis, Minerva Associates Calcutta, 1977.

Bose Nemai Sadhan, The Indian Awakening and Bengal, Calcutta, 1969.

Chapman, Priscila, Hindoo Female Education, London, 1939.

Chaterjee Partha, The Nation and its Fragments : Colonial and Post Colonial Histories, Delhi, 1994.

Chattopadhyay Gautam ed Awakening in the Early Nineteenth Century, Progressive Publishers, Calcutta-73, 1965.

Datta Gupta Bela, Sociology of India, Centre for Sociological Research, Calcutta, 1972, Part I and Part II.

Dyson, Ketaki Kushari ed The Various Universe : A Study of the Journals and Memoirs of British Men and Women in Indian Sub-Continent, 1765-1856, Oxford University Press, 1978.

Evans, R. T., The Feminists : Women's Emancipation Movement in Europe, America and Australia, London, Croom Helm, 1977.

Forbes Geraldine, Women in Modern India, The New Cambridge History of Modern India, Vol. IV.2, First Indian Edition, 1996.

Heimsath Charles H., Indian Nationalism and Hindu Social Reform, Princeton University Press, Princeton, 1964.

• Kayal, Kashinath, Keshub Chunder Sen : A Study in Encounter and Response, Minerva Associations (Publications) Private Limited, Calcutta-29, 1998.

Kopf David, British Orientalism and Bengal Renaissance, Cambridge University Press, London, 1969.

Majumdar R. C. ed. British Paramountcy and Indian Renaissance, Part II, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay.

Mill James, The History of British India, 2 vols, New York, Chelsea House, 1968.

Mukherjee Amal Kumar, ed. The Bengal Intellectual Tradition : From Rammohon to Dhirendra Nath Sen, K. P. Bagchi, Calcutta-12, 1979.

Nag Kalidas and Burman Debajyoti, ed. The English Works of Raja Ram Mohan Roy, Calcutta, 1945.

Palit, Chittabrata, New Viewpoints on Nineteeth Century Bengal, Progressive Publishers, Calcutta-73, September, 1980.

Raate Lou, The Uncolonised Heart, Orient Longman, 1995.

Ray, Bharati, ed. From the Seams of History, Oxford University Press, 1995.

Roy Manisha, Bengali Women, Stree, Calcutta-26, January, 1993.

Ray Rajat Kanta, ed. Mind. Body and Society — Life and Mentality in Colonial Bengali, Oxford University Press, 1995.

Ray Ranjit ed. Retrieving Bengal's Past : Society and Culture in the Nineteeth and Twentieth Century, Rabindra Bharati University, Calcutta-50, 1995.

Ray Chowdhury Tapan, Europe Reconsidered : Perceptions of the West in Nineteenth Century Bengal, Oxford University Press, Second Impression, 1989.

Said Edward, Orientalism, Penguin Report, 1995.

Sangari Kumkum and Vaid Sudesh ed Women and Culture, Research Centre for Women's Studies, Bombay. 1994.

—Recasting Women : Essays in Colonial History, Kali for Women, Delhi, 1989.

Sarkar Sumit, A Critique of Colonial India, Calcutta, 1985.

Sarkar Sushobhan, Bengal Renaissance and other Essays, New Delhi, 1970.

Sen Ashok, Iswar Chandra Vidaysagar and His Elusive Milestones, Riddhi India, Calcutta, 1977.

Sen Priya Ranjan, Western Influence on Bengal Literature, University of Calcutta, 1932.

Sengupta Shyamalendu, A conservative Hindu of Colonial India : Raja Radha Kanta Dev and His Milieu, Navrang, New Delhi, 1990.

Sinha Pradip, Nineteenth Century Bengal : Aspects of Social History, Firma K. L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1965.

Sister Nivedita, The Master As I Saw Him, Udbodhan Office, Calcutta-3, 13th edition, March, 1983.

Stokes, Eric, The English Utilitarians and India, Indian Print, 1982, Oxford University Press, 1982.

Tattvabhusan, Sitaram, Social Reform in Bengal, Calcutta, 1982.

Tripathy Amales, Vidyasagar : A Traditional Moderniser, Punascha, Calcutta-9, 1998.

(খ) বাংলা গ্রন্থ

আজাদ হুমায়ুন, নারী, নদী কর্তৃক ঢাকা থেকে প্রকাশিত, পরিবেশক, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, মার্চ, ১৯৯২।

ঘোষ বিনয়, বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, প্রথম ওরিয়েন্ট লংম্যান সংস্করণ (৩ খণ্ড একত্রে), পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৩।

চক্রবর্তী পুণ্যলতা, ছেলেবেলার দিনগুলি, নিউস্ক্রিপ্ট, কলিকাতা, ১৯৭৫।

চক্রবর্তী সম্বুদ্ধ, অন্দরে অন্তরে, স্ত্রী, কলিকাতা-২৬, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫।

চট্টোপাধ্যায় মীনা, স্বর্ণকুমারী দেবী, অনুভাব, কলিকাতা-২৬, ২০০০।

চৌধুরী তৃপ্তি ও মুখোপাধ্যায় সুজাতা, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবন ও মনন : একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলিকাতা-৭৩, মে, ১৯৯৯।

চৌধুরী নীরদচন্দ্র, বাঙালী জীবনে রমণী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৭৩, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আশ্বিন, ১৩৯৬।

জানা নরেশচন্দ্র, জানা মানু ও সান্যাল কমল কুমার সম্পাদিত, আত্মকথা, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮১।

ত্রিপাঠী অমলেশ, ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল, ১৯৯৯।

দত্ত অমর, ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ান্স্, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলিকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, মার্চ, ১৯৯৬।

দত্ত কল্যাণী, থোড় বড়ি খাড়া, থীমা, কলিকাতা-২৬, ১৯৯২।

দত্ত কল্যাণী, পিঞ্জরে বসিয়া, স্ত্রী, কলিকাতা-২৬, জানুয়ারী, ১৯৯৬।

দে লালবিহারী, গোবিন্দ সামন্ত, মনীষা সংস্করণ, আশ্বিন, ১৩৭৪ (১৯৬৭)।

দেব চিত্রা, অন্তঃপুরের আত্মকথা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৯, সপ্তদশ মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৪০০।

দেব চিত্রা, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৯, সপ্তদশ মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৪০০।

দেব চিত্রা, মহিলা ডাক্তার : ভিনগ্রহের বাসিন্দা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী, ১৯৯৪।

দেবী আশাপূর্ণা, প্রথম প্রতিশ্রুতি, মিত্র ঘোষ, কলিকাতা-৭৩, ঊনবিংশ মুদ্রণ, ফাল্গুন, ১৩৮৭।

নাথ রাখালচন্দ্র, উনিশ শতক : ভাবসংঘাত ও সমন্বয়, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলিকাতা-১২, ১৯৮৮।

বন্দ্যোপাধ্যায় চণ্ডীচবণ, বিদ্যাসাগর, দে বুক স্টোর, কলিকাতা-৭৩, প্রথম কলেজ স্ট্রিট সংস্করণ, রথযাত্রা ১৩৯৪।

বসু ঝরা, কেশবচন্দ্র সেন ও তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজ, প্রমা, কলিকাতা-১৭, অগ্রহায়ণ, ১৪০১।

বসু স্বপন, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৮৫।

বসু স্বপন, সমকালে বিদ্যাসাগর, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা-৯, জানুয়ারী, ১৯৯৩।

বাগল যোগেশ চন্দ্র, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, কলিকাতা, ১৯৬৩।

বাগল যোগেশ চন্দ্র, বাংলার নব্যসংস্কৃতি, বিশ্বভারতী, ১৯৫৮।

বাগল যোগেশ চন্দ্র, বাংলার স্ত্রীশিক্ষা, কলিকাতা, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ।

বিশ্বাস দিলীপ কুমার, রামমোহন-সমীক্ষা, সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা-৬, মার্চ ১৯৮৩।

মুরশিদ গোলাম, সংকোচের বিহ্বলতা : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণীর প্রতিক্রিয়া, ১৮৪৯-১৯০৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।

রায় বাণী, সম্পাদিত, কবিচতুষ্টয়ী, মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৭৩, আশ্বিন, ১৩৮৮।

রায় বিনয়ভূষণ, অন্তঃপুরের স্ত্রীশিক্ষা, নয়া উদ্যোগ, কলিকাতা-৬, জানুয়ারী, ১৯৯৮।

সরকার বিহারীলাল, বিদ্যাসাগর, সম্পাদনা, প্রহ্লাদ কুমার প্রামাণিক, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, নভেম্বর, ১৯৯১।

সামন্ত ডঃ বসন্ত কুমার, সম্পাদিত, বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম দুটি মুদ্রিত গ্রন্থ, সাহিত্যলোক, কলিকাতা-৬, অক্টোবর, ১৯৯৪।

সেন রঞ্জিত, ভাবিত পুরুষ অ-ভাবিত নারী, অরুণা প্রকাশন।

সেন সুকুমার, মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী, কলিকাতা, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ।

সেনগুপ্ত গীতশ্রী বন্দনা, স্পন্দিত অন্তর্লোক, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলিকাতা-৭৩, জানুয়ারী, ১৯৯৯।

(গ) স্মারক গ্রন্থ

দ্বিশততম জন্মবার্ষিক স্মরণিকা—রাজা রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৯৮৪) শোভাবাজার রাজবাটি, ১৯৮৫।

বেথুন বিদ্যালয় সার্ধশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ ১৮৪৯-১৯৯৯, সম্পাদনা সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি বেথুন বিদ্যালয়, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬, মে ১৯৯৯।

বেথুন স্কুল ও নারীশিক্ষার দেড়শো বছর ১৮৪৯-১৯৯৯, বেথুন স্কুল প্রাক্তনী সমিতি, অগাস্ট, ১৯৯৯।

(ঘ) রচনা সংগ্রহ

চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ (উপন্যাস খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, কলিকাতা-৯, তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারী ১৯৮২।

চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৩৬৬।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী. অগ্রহায়ণ, ১৩৯৭, ইংরাজী, ১৯৮৮।

চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শরৎ রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ শরৎসমিতি, কলিকাতা-২৯, শিবরাত্রি, ফাল্গুন, ১৩৮৩।

বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্র, বিদ্যাসাগর রচনাসমগ্র ২ খণ্ড, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলিকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ১৯৮৭।

স্বামী বিবেকানন্দ, বিবেকানন্দ রচনাসমগ্র, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা-৭৩, একবিংশ মুদ্রণ, আশ্বিন, ১৪০৪।

রায় রামমোহন, রামমোহন রায় রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩।

(ঙ) সংকলন গ্রন্থ

ঘোষ বিনয়, সম্পাদিত, সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭৮, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭৮, তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা ১৯৮০, পঞ্চম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮১, ষষ্ঠ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮৩।

চট্টোপাধ্যায় কানাইলাল, সাময়িক পত্রে সমাজচিত্র সংকলন ও সম্পাদনা, সঞ্জীবনী, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা-৭৩, জানুয়ারী, ১৯৮৯।

বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, সংবাদপত্রে সেকালের কথা (প্রথম খণ্ড), কলিকাতা, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ।

বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, সংবাদপত্রে সেকালের কথা (দ্বিতীয় খণ্ড), কলিকাতা, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ।

ভট্টাচার্য সুতপা, বাঙালী মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য, সাহিত্য একাদেমী, নতুন দিল্লী-১১০ ০০১, ১৯৯৯।

মামুদ, আব্দুল ওয়াহাব, সম্পাদিত, ইতিহাস অনুসন্ধান-৮, কলিকাতা, ১৯৯৩।

রায় ভারতী, সম্পাদিত, সেকালের নারীশিক্ষা, বামাবোধিনী পত্রিকা, উইমেন্স স্টাডিজ রিসার্চ সেন্টার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৯৪।

সেন অভিজিৎ ও ভট্টাচার্য অভিজিৎ সম্পাদিত ও সংকলিত, সেকেলে কথা : শতকের সূচনায় মেয়েদের স্মৃতিকথা, নয়া উদ্যোগ, কলিকাতা-৬, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭।

সেন অভিজিৎ ও ভট্টাচার্য অভিজিৎ সম্পাদিত ও সংকলিত, স্বর্ণকুমারী দেবীর সংকলিত প্রবন্ধ, বিকল্প প্রকাশনী, কলিকাতা-৭৩, মার্চ ১৯৯৮।
